কিন্তু কে খবর রাখে !

হরি নারায়ণ আপটে-রচিত

পণ লক্ষ্যাঁত কোণ ঘেতো !

প্রখ্যাত মারাঠি সামাজিক উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ

কিন্তু কে খবর রাখে !

অনুবাদ

সরোজিনী কমতনুরকর

সাহিত্য অকাদেমি

নয়া দিল্লী

Hari Narayan Apte's Marathi Novel
Pan Lakshyant Kon Gheto !
Translated into Bengali by
Sarojini Kamatnurkar

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নয়া-দিল্লী-১
ব্লক ৫বি রবীন্দ্র স্টেডিয়ম, কলিকাতা-২৯
২১ হ্যাডোস রোড, মাদ্রাজ-৬

মুদ্রক : শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় শংকর ঠাকুর

এবং

যাঁরা মত, চিন্তাধারা ও আচরণে তাঁর সম্পূর্ণ সুহৃদ

তাঁদের সকলের চরণে,

তাঁদের ধর্মাভিমান, তাঁদের সমাজহিতে নিষ্ঠা, তাঁদের

সদাচার, তাঁদের বিদ্যা ও বিশেষত তাঁদের

আন্তরিক সহৃদয়তা ইত্যাদি অলৌকিক গুণের ও সেই সব গুণের ফলে জগতের,

বিশেষত আমার মতো অবলাদের, যে উপকার হয়

সেই উপকারের স্মারকস্বরূপ,

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকথা শ্রদ্ধার সঙ্গে,

তাঁদের অনুমতি না নিয়েই

উৎসর্গ করলাম।

তাঁদেরই কৃপা-আশীর্বাদে অবিলম্বে

ধরণী থেকে মুক্তির আশায়

তাঁদের আদরের

যমুনা

And afterwards she came back without a word
To her own house............
And for the great grief of her soul's travailing
He gave consent she should endure in peace
Till her life's end ; yea till her time should cease
She should abide in fellowship of pain.
And, having lived a holy year or twain,
She died of pure waste and weariness.

—Swinburne

...

অবশেষে নিজগৃহে ফিরিল রমণী
কথাটি না কহি। বুঝি তার অন্তরের
সীমাহীন ব্যথা, প্রভু দিলেন সম্মতি—
"শান্তচিত্তে বহো তব বেদনার ভার,
যতদিন আয়ুকাল না হইবে শেষ
ততদিন রহো তুমি ব্যথিতজনের
বিশ্বভরা সভাতলে।" দু'এক বছর
শুদ্ধজীবনের পর গেল হারাইয়া
শুষ্ক শ্রান্ত জীবনের ক্ষীয়মান ধারা।

—সুইনবার্ন।

হরি নারায়ণ আপটে লিখিত

ভূমিকা

সেদিনের কথা আমি কখনো ভুলতে পারব না। কোনো কাজে আমি বোম্বাই গিয়েছিলাম। দুপুরে কাজ সেরে আন্দাজ চারটে সাড়ে চারটের সময়ে রাস্তার দিকের জানালার পাশে একটি আরাম কেদারায় বসে রাস্তায় লোকের আনাগোনা দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম। একটু দূরে আমার এক বন্ধু আর একটি জানালার পাশে বসে একমনে বই পড়ছিলেন। আমি অন্যমনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এমন সময়ে দেখলাম ১৬।১৭ বছর বয়সের একটি রূপসী তরুণী আসছে। রং ফরসা, শরীরের গড়ন সুন্দর, গায়ে গয়নাগাঁটি কিছুই নেই, পরনে সাদামাটা শাড়ি; চলেছিল ধীর পদক্ষেপে। যখন সে এগিয়ে কাছে এল তখন দেখলাম তার ফরসা রং একেবারে ফ্যাকাশে আর শরীরে ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকট। আমার মনটা কেমন করে উঠল। তার শীর্ণতা, তার পাণ্ডুরতা ইত্যাদি দেখে আমার মনে হল, 'আহা, এর এমন দশা কেন? না জানি ওর কীসের দুঃখ!' এমন সময়ে সে কাছে এল—আর কী আশ্চর্য! যেন আমার চিন্তা জানতে পেরে আর বোধকরি আমার কৌতূহলের উত্তর পাই এজন্য—মুখ তুলে চাইল। আমাকে দেখতে পেয়েই সে তৎক্ষণাৎ মাথা হেঁট করে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। তার সেই ফরসা ধবধবে* কপাল, সেই গালদুটি যা কোনো কালে গোলাপী ছিল কিন্তু চোখের জলে ভেসে এখন যার রং ধুয়ে গেছে, সেই আয়ত চোখদুটি যা পূর্বে নিশ্চয় উজ্জ্বল ছিল কিন্তু অবিরাম অশ্রুপ্রবাহের ফলে যা নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে—ওই আধ মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলে ফেলল। সে কাহিনী আমার বুকে বাজল আর তৎক্ষণাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'আহা!' আমি চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিলাম।

সেই বিলাপধ্বনি আমার মুখ দিয়ে এত জোরে বেরিয়েছিল যে আমার বন্ধু বই বন্ধ করে চট করে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে, কী হল?' কিন্তু খানিকক্ষণ আমার মুখ থেকে কোনো কথাই বেরুল না।

* মহারাষ্ট্রীয় মহিলারা—কুমারী এবং সীমন্তিনী সকলে কপালে কুংকুমের টিপ পরেন। শুধু বিধবারা কপালে কোনো টিপ পরেন না।

সেই অভাগিনী তরুণীর বিষণ্ণ, শীর্ণ, রক্তহীন চেহারা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মন থেকে দূর করতে পারছিলাম না। আর কী জানি কেন, সে-ছবি মুছে যাক এমন সত্যিকারের ইচ্ছাও হচ্ছিল না। সে চেহারা আমার চোখের সামনে ছিল তাই আমার মনে সীমাহীন চিন্তা গোল পাকাতে লাগল। দুঃখময়, আবেগপূর্ণ, ক্ষোভকর আর বিরক্তিকর নানান রকমের চিন্তা এসে মনে একেবারে গোলমাল বাধিয়ে দিল। তখন আমার চারদিকে অবস্থিত কোনো কিছুর জ্ঞান আমার একেবারেই ছিল না। আমি সম্ভবত হাত নাড়তে আর ছুঁড়তে শুরু করেছিলাম। কেন না, আমার বন্ধু কাছে এসে আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'কী মশাই, অত কী ভাবছেন?' সে কথা শুনে আমি চমকে জেগে উঠলাম, 'কী বলব ভাই?'—বলে আবার চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিলাম।

আমার উত্তর শুনে বন্ধু আবার আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী? কী হয়েছে?' তখন আমি বললাম, 'এখন এখানে কিছু বলব না। চলুন, সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাই, সেখানে সব বলব।'

পথ চলতে চলতে আমি তাঁকে সব কথা বললাম। শুনে তাঁরও বড়ো কষ্ট হল; কিন্তু তিনি বললেন, 'আপনি আজ এই একজন অভাগিনীকেই লক্ষ্য করে দেখেছেন। তার সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না, তবু আপনার এত দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু যদি আমার মতো নিজের চোখে কোনো দুঃখিনীর জীবন দেখতেন তাহলে কী মনে করতেন?'

তার সে কথা শুনে আমার খানিকটা অবিশ্বাস, খানিকটা উৎকণ্ঠা, খানিকটা বিষাদ হল আর সে-সব ভাবের অভিব্যক্তি আমার মুখভাবে স্পষ্ট ফুটে উঠল। আমি চট করে বন্ধুর দিকে ফিরে বললাম, 'বলেন কী? আপনি এমন কোনো দুঃখিনী মেয়ের জীবন নিজের চোখে দেখেছেন?'

তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'—আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেল; আর অনেকক্ষণ তিনি স্তব্ধ হয়ে আমার সঙ্গে চলতে লাগলেন। আমার মনের অবস্থাও তখন এমন হয়েছিল যে আমিও চুপ করে তার পাশে পাশে চলছিলাম। বন্ধুর মন যে এত কোমল আর গভীর তা আমি ভাবিনি, তাঁকে আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, 'আপনি জানতেন কিন্তু সেকথা আমাকে আজ পর্যন্ত বলেন নি যে?'—এমন সময়ে তিনি নিজেই বললেন, 'কতো দিন আপনাকে সে-কথা বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু সময় হয়নি। আজ অনায়াসে

সময় এসেছে, এখন বলছি। আপনার গল্প লেখার শখ, এ নিয়ে কিছু লিখতে পারেন।' এই কথা বলে তিনি আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে সেই জীবন কাহিনী আমাকে বলতে শুরু করলেন। শেষের দিকে তিনি খুব বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, চাদরের খুঁটে চোখ মুছে তিনি নীরব হলেন। আমার মনও খুব বিচলিত হয়ে উঠেছিল; শেষে আমি বললাম, 'বলেন কী? শেষকালে সত্যি এমন ব্যাপার ঘটল?'

'হ্যাঁ, সত্যি সত্যি ঘটেছিল আর···আর···আর কিন্তু এখন আমি আপনাকে যা বলছি তা আর কাউকে বলবেন না, তাহলেই আপনাকে সে-কথা বলতে পারি।'

তিনি যে কী বলবেন তা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তাই আমি বললাম, 'না, কাউকে বলব না' আর খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। তখন তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'যমুনাবাই নিজের সমস্ত জীবনকাহিনী লিখে রেখে গিয়েছেন!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'নিজে লিখে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ, নিজে লিখে রেখেছেন,' তিনি উত্তর দিলেন।

তাঁর কথায় বিশ্বাস না করে আমি বললাম, 'একটা যা হোক কথা বললেন আপনি! সত্যিই তিনি লিখে রেখেছেন? আপনি তা জানলেন কেমন করে?'

গণপতরাও-এর সঙ্গে আমার সদ্ভাব আছে। তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে সে-সব ঘটনা বলে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। চান তো আপনার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। সম্প্রতি তিনি এখানে এসেছেন, দুদিন পরে পুণায় ফিরে যাবেন।'

আমি মনে মনে বললাম, 'পুণার ভদ্রলোক, আর আমি চিনি নে?' বন্ধুকে বললাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন। এতদিন এসব আপনি গোপনে রেখেই ভুল করেছিলেন। হয়তো আপনি আমাকে ঠিক বিশ্বাস করেন না—'।

'না তা নয়, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার পর আপনার সঙ্গে আমার তেমন দেখাই হয়নি। ভাবছিলাম যে বলব···কিন্তু থাক সে কথা··· এখন সুযোগ হয়েছে···যাক গে···'।

'বাঃ! এমন সুযোগ কি ফস্কে যেতে দিই? তা ভাববেন না। এক

কথা জানবার পরও কি আমি গণপতরাওয়ের সঙ্গে আলাপ না করে থাকতে পারি? চলুন, আজ রাত্রেই তাঁর ওখানে যাই।'

'আজ রাত্রে? তা আমার কোনো আপত্তি নেই। খাওয়ার পরেই যাওয়া যাবে। তাদের বাড়ির আর সকলের সঙ্গেও দেখা হবে। সেখানে আর একজন গণপতরাও আছেন তাঁর সঙ্গেও আলাপ করতে পারলে বেশ...'

এইভাবে বন্ধু তাঁদের সকলের বিষয়ে আরো অনেক কথা আমাকে বললেন। তখন আমার কৌতূহল আরো বাড়ল, কখন খাওয়াদাওয়ার পাট শেষ হবে আর আমরা তাদের বাসায় যাব—এই ভেবে আমি খুব উতলা হলাম।

শীঘ্র শীঘ্র খাওয়াদাওয়া সেরে বন্ধুর সঙ্গে যেখানে বিষ্ণুপন্ত, নানাসাহেব আর দুই গণপতরাও ছিলেন সেখানে গেলাম। বন্ধু আমার নাম ধাম জীবিকা ইত্যাদির কথা বলে আমার পরিচয় দিলেন। অনেকক্ষণ নানা বিষয়ের গল্পে আনন্দে সময় কেটে গেল। সে-সব বলবার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। সেকথার এখানেই ইতি দিয়ে শুধু এই কথাই বলতে চাই যে গণপতরাও যে-কাজের জন্ম এসেছিলেন তা সারা হওয়ার পরের দিনই তাঁর ফিরে যাবার কথা ছিল। আমার কাজও শেষ হয়েছিল, আর গণপতরাওয়ের সঙ্গে আলাপ—না বন্ধুত্ব—করবার ইচ্ছা খুব বেশি হয়েছিল তাই আমি স্থির করলাম যে দুজনে একসঙ্গেই ফিরব। পরদিন আবার তাঁর বাসায় গেলাম আর সেখানকার সব চোখে দেখে এলাম। বন্ধু আমাকে শুধু কাহিনী বলেছিলেন, কিন্তু তাতেই আমার মনে যমুদিদিমণির চিত্র অংকিত হয়ে গিয়েছিল। তাই সেদিন—রঘুনাথরাও বোধ হয় এরকম ছিলেন, যমুদিদি এরকম ছিলেন—এইসব কল্পনা করে মনের চোখে তাঁদের ছবি দেখতে লাগলাম। তখনো অবশ্য আমি সে জীবনকাহিনী পড়িনি।

কথায়তো আমি আর গণপতরাও দুজনে একসঙ্গেই পুণায় গেলাম। পাঁচ ছ' ঘণ্টা দুজনে একসঙ্গে ছিলাম; আর দুজনের স্বভাবের এতটা ঐক্য ছিল যে এই অল্পসময়ের মধ্যেই আমাদের গভীর বন্ধুত্ব হল। এত ঘনিষ্ঠতা হল যে পুণায় পৌঁছবার পরের দিনই গণপতরাও আমার বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ কাটালেন। তারপর আমি গেলাম, তিনি এলেন, পরস্পরের সুখদুঃখের ভালোমন্দের কথাবার্তা হতে লাগল। এর মধ্যে একদিন তিনি তাঁর ভগ্নীর জীবনের কাহিনী মোটামুটিভাবে আমাকে বললেন, একথাও

বললেন, এক সময়ে তিনি সে-কাহিনী আমাকে পড়তে দেবেন। কিন্তু অতিরিক্ত কৌতূহল দেখানো ঠিক হবে না মনে করে ইচ্ছে করেই সে-লেখা চেয়ে নিই নি। পরে যখন বন্ধুত্ব খুব গভীর হল তখন একদিন আমি সে-জীবন কাহিনী চেয়ে নিয়ে পড়লাম।

সে-সময়েই আমি 'করমণুক'* পত্রিকা প্রকাশ করব স্থির করেছিলাম। যমুদিদির জীবনকাহিনী পড়ে মনে হল যে এই পত্রিকায় 'আজকালকার কথা' এই পর্যায়ের দ্বিতীয় কথা হিসাবে যদি এই কাহিনী প্রকাশিত করতে পারি তাহলে বেশ হবে। আমি তক্ষুনি গণপতরাওয়ের মত চাইলাম। এতদিনে তাঁর আর আমার মধ্যে খুব প্রীতি জন্মেছিল, তাই তিনি 'না' বললেন না; কিন্তু বললেন, 'আপনার কথা সত্যি, কিন্তু সে সাত-আট মাস ধরে—নিজের মনে কিছু সান্ত্বনা পাবার জন্য, আর আমার খুব ইচ্ছা ছিল তাই—একটানা যেমন-তেমন করে লিখেছে। তাতে আপনি কোনো শৃঙ্খলা বা ধারাবাহিকতা দেখতে পাবেন না। লোকে এ লেখা পছন্দ করবে না। তা ছাড়া আমরা সবাই...'

আমি বললাম, 'আপনার এসব আশংকার কোনো হেতু নেই। কোনো শৃংখলা থাকুক বা না থাকুক, আমার এ কাহিনী অত্যন্ত ভালো লেগেছে। আমার ভারি ইচ্ছা এটা 'করমণুক'-এ প্রকাশ করি। আপনি অনুমতি দিন, আর কিছু চাই না। বাস্তবিক, যমুদিদি যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকে আপনার, দুর্গাদিদির আর বোম্বায়ের সেই মণ্ডলীর চরিত লিখে রেখে—'

'বেশ, সময় পেলে আমি নিশ্চয়ই লিখব।'

আমি যখন খুবই চেপে ধরলাম তখন তিনিও আর বেশি ইতস্তত করলেন না। সেই সময়েই 'করমণুক' পত্রের নমুনা সংখ্যা বার হবার কথা ছিল। প্রথম পরিচ্ছেদটা তাতে ছেপে ফেললাম। ভাবলাম, একবার তো শুরু হোক, পরে যা হয় হবে। মাঝে মাঝে কিছু ব্যাঘাত হওয়া সত্ত্বেও, কিছু আগে পিছে হয়ে ভালোয় ভালোয় শেষ পর্যন্ত ছাপলাম। আজ পুস্তকরূপে প্রকাশ করবার আর ভূমিকা লিখবার সুযোগ লাভ করেছি।

এখন এই বইয়ের সম্বন্ধে আর কী লিখব? উপসংহারে গণপতরাও নিজে অনেক কথা লিখেছেন। তাতে যা কিছু উক্ত আছে তার উপরে তাঁর কিংবা আমার কোনো হাত নেই।

* মারাঠি চলিত ভাষার একটি শব্দ। করমণুক মানে প্রমোদ।

হরি নারায়ণ আপটে-র সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, আলাপের জন্য ব্যগ্র ওষ্ঠাধর, হাসি হাসি মুখ, উচ্চ, প্রশস্ত কপাল, গোলগাল দোহারা নাতিদীর্ঘ চেহারা—এই রকমের ছিল স্বর্গত হরি নারায়ণ আপটে-র বাহ্য রূপ। তাঁর প্রিয় কন্যার বিয়োগের দিন থেকে তাঁর মুখের সেই হাসি মিলিয়ে গিয়ে তার স্থানে একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের ছায়া দেখা গিয়েছিল। সে-বিষাদ তাঁর দেহের উপরে বেশ প্রবল ক্রিয়া করেছিল। ফলে পঞ্চাশ বছর বয়স হবার আগেই তাঁকে ষাট বছরের বৃদ্ধের মত দেখাত। তার পর মাত্র সাত বছর তিনি ইহলোকে ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁর জন্ম হয় আর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের তিন তারিখে তাঁর দেহান্ত হয়। মোটের ওপর, পাঁচদিন কম পঞ্চান্ন বছর তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, আর সেই অর্দ্ধশতাব্দীর জীবনে মহারাষ্ট্র-শারদার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সম্মানিত স্থানে ও চিরস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হয়ে চলে গিয়েছেন।

তিনি ছিলেন নারায়ণ চিমনাজী ওরফে নানাসাহেব আপটে-র জ্যেষ্ঠ পুত্র। নামকরণের দিন ছেলের নাম রাখা হয়েছিল বালকৃষ্ণ। কিন্তু পরে যখন জানতে পারা গেল যে গোষ্ঠীতে আর একজন বালকৃষ্ণ আছে, তখন সে-নাম বদলে তাঁর নাম রাখা হল হরি। হরিভাউয়ের কপালে মাতৃসুখ বেশি দিন লেখা ছিল না। তিনি যখন চার বছরের বালক তখন তাঁর মাতা ইহলোক ছেড়ে চলে যান। মাতৃবিয়োগের পর হরিভাউকে তাঁর কাকা-কাকিমা—মহাদেব চিমনাজী আপটে আর তাঁর স্ত্রী পার্বতীবাই—লালনপালন করেন। আর সেই কাকিমাকেই তিনি মায়ের মতো ভালোবাসতে আরম্ভ করেন। হরিভাউ একটু বড়ো হতেই তাঁর মমতাময়ী কাকিমাকে কাল কেড়ে নিয়ে গেল। নানাসাহেবের মাসিমা—চিমা মাসিমা—কাকিমার মৃত্যুর পর হরিভাউয়ের যত্ন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারী কর্মচারী; তাঁর চিন্তাধারা ও আচরণ ছিল একেবারে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মতো। কাকা মহাদেব চিমনাজী—ইনি পরে খ্যাতনামা উকীল হন—ছিলেন সম্পূর্ণ সংস্কারপন্থী। হরিভাউ ছেলেবয়সে এঁর কাছে ছিলেন, এবং মাতৃহীন বালককে ইনিই আদর করে তার সব শখ পূর্ণ করতেন।

হরিভাউয়ের হাতে খড়ি হয় বোম্বায়ে। কিন্তু নানাসাহেব যখন পুণায় বাস করতে গেলেন তখন হরিভাউকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সেখানকার হাই স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সে সময়ে হরিভাউয়ের বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। পুণার বাড়িতে তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার জন্য একজন শাস্ত্রীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর কাছে হরিভাউ কাব্যনাটকাদি পাঠ খুব অভ্যাস করেন। হরিভাউ পুণায় আসবার দু'বছর পরে নিউ ইংলিশ স্কুল* নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিভাউ হাইস্কুল ছেড়ে এই স্কুলে ভর্তি হলেন আর এখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পরের শিক্ষার জন্য তিনি ডেকান কলেজে যান। নিউ ইংলিশ স্কুলের চালকেরা ফার্গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠা করামাত্র তিনি ডেকান কলেজ ছেড়ে ঐ কলেজে গেলেন। সেখানে এক বছর শিক্ষা নিয়ে তিনি আবার ডেকান কলেজে ফিরে গেলেন। দুটি কলেজে মোট তিনি পাঁচ বছর পড়েছিলেন। হরিভাউয়ের অনুরাগ ও আসক্তি একটি বিষয়েই ছিল, গণিতশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর কখনো মিল হয় নি। তাই কলেজের পরীক্ষায় তিনি ভালো করতে পারেননি, এবং য়ুনিভার্সিটিও তাঁকে পদবী দিতে পারেনি। কিন্তু তাঁর রসজ্ঞতা এবং মর্মজ্ঞতা এই দুই গুণের উৎকর্ষ স্কুল এবং কলেজের গুরুজনেরা দেখতে পেয়েছিলেন বলে, হরিভাউ তাঁদের স্নেহ আর শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। বই পড়া তাঁর একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল। এজন্য তিনি হাজার হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। পাঠতৃষ্ণা তৃপ্ত করার জন্য তিনি ফরাসী এবং জার্মান ভাষা শিখেছিলেন। সব ভাষায় মিলিয়ে তিনি হাজার হাজার বই পড়েছিলেন এবং সাহিত্যপ্রাসাদের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই প্রবেশ লাভ করেছিলেন।

হরিভাউয়ের রচিত উপন্যাসগুলিই তাঁর জীবনের মহত্তম কর্ম। এই উপন্যাসগুলি তিনি শুধু জনমনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচনা করেন নি। পতিতদের উন্নতি সাধন করবার জন্য, দীনের দুঃখমোচন করবার জন্য, মার্গভ্রষ্টদের সন্মার্গ দেখাবার জন্য, হতাশ হৃদয়ে নবচৈতন্য জাগাবার জন্য, সমাজকে বিশুদ্ধ করবার জন্য; রাষ্ট্রীয়ভাব স্বদেশানুরাগ উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তিনি উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

'আজকালচ্যাটা গোষ্ঠী-মধলী স্থিতি' (আজকালকার কথা-মাঝের অবস্থা)

* লোকমান্য তিলক, আগরকর ও চিপলুনকর তিনজনে মিলে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস। এখানি তিনি কলেজে পড়বার সময়ে লিখেছিলেন। অধুনালুপ্ত 'পুণে বৈভব' সাপ্তাহিক পত্রে এটি প্রকাশিত হয়। এ-উপন্যাসের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হওয়ামাত্র কেবল পুণাতেই নয় সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় পাঠকদের মধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। এর পরবর্তী আজকালকার কথা-র দ্বিতীয় কথা 'গণপতরাও' কানিটকর মণ্ডলীর 'মনোরঞ্জন' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এই রচনা পাঠকদের এত পছন্দ হয় যে, কখন আগামী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হবে আর তা পড়তে পারা যাবে—এ নিয়ে পাঠকদের বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। এ থেকেই বুঝতে পারা যাবে পাঠকদের মন তোলপাড় করবার কতখানি ক্ষমতা এই উদীয়মান লেখকের ছিল। 'মনোরঞ্জন' মাসিকে হরিভাউ 'গণপতরাও' 'চাণাক্ষপণাচা কলুস' (চাতুর্যের চরমসীমা) এই দুখানি উপন্যাস, 'শ্রুতকীর্তিচরিত্র' ও 'জয়ধ্বজ' এই দুখানি নাটক, 'মারুন মুটকুন বৈদ্যবুবা' (মারকুটে কবিরাজ) ও 'পলুপুট্যা বৈদ্য' (পলাতক বৈদ্য) ইত্যাদি মোলিয়ের-অবলম্বনে লেখা প্রহসন, কিছু ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছিলেন।

জনশিক্ষা এবং সমাজে বিস্তৃতভাবে বিচারবোধ জাগাবার জন্য ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হরিভাউ 'করমণুক' পত্র আরম্ভ করেন। সে-সময়ে পুরাতনে ও নতুনে বিশেষ বিবাদ চলছিল। সংস্কারকদের মতের উচ্চারণ পর্যন্ত সমাজের বহু লোক অশুচিকর মনে করত, সংস্কারের সম্বন্ধে লোকের মনে এত অপ্রীতি ছিল। 'করমণুক'-এর মাধ্যমে এই অপ্রীতি দূর করে ইষ্টসংস্কারের দিকে লোকমত অনুকূল করার কাজে হরিভাউ যথেষ্ট কৃতকার্য হয়েছিলেন।

'করমণুক' পত্রিকা তিনি আঠাশ বছর ধরে চালিয়েছিলেন। পত্রিকার মাধ্যমে তিনি প্রধানত মাতৃভাষা ও স্বদেশের সেবাই করেছিলেন। 'পুণে বৈভবে' প্রকাশিত 'মাঝের অবস্থা' আর তারপর 'মনোরঞ্জনে' প্রকাশিত 'গণপতরাও' (এটি অসম্পূর্ণই রইল) ও 'চাতুর্যের চরমসীমা' এই দুখানি উপন্যাস ছাড়া তাঁর আর সব উপন্যাস তিনি 'করমণুকে'ই প্রকাশ করেন। তাঁর বহু ও বিচিত্র রচনার মধ্যে ছিল উপন্যাস ছাড়া প্রায় একশো ছোট বড় গল্প, কবিতা, ছোট ছোট প্রবন্ধ, সংক্ষিপ্ত জীবনী, সংকলিত সংবাদ, কৌতুক রচনা ইত্যাদি। প্রচলিত রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদপত্রে যে-ধরনের বিবাদ-বিতর্ক চলে তা থেকে 'করমণুক'কে আলাদা রাখবার

নীতি তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে নিজের মত তিনি উপন্যাসের চরিত্রের মাধ্যমে কুশলভাবে আর অবলীলাক্রমে করেছেন, কিন্তু অন্য সব সংবাদপত্রের মতো এসব বিষয়ে আলোচনা তিনি 'করমণুক'-এ কখনো করেন নি। যখন তাঁর মনে হল যে সব বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে তখন তিনি 'সুধারক'-এর* পুনরুজ্জীবন করলেন।

হরিভাউ 'করমণুক'-এ আঠারোটি বড় উপন্যাস লিখেছিলেন, তার মধ্যে আটটি সামাজিক আর দশটি ঐতিহাসিক। 'চাতুর্যের চরমসীমা'-র মতো নিছক মনোরঞ্জনকারী উপন্যাস তিনি পরে আর লেখেন নি। তা ছাড়া তিনি 'গড় আলা পণ সিংহ গেলা!' (দুর্গ পেলাম কিন্তু সিংহ হারালাম)† নামে সুবৃহৎ উপন্যাস লিখেছিলেন; 'মহৈস্বরচা বাঘ' (মৈশুরের বাঘ), 'সূর্যগ্রহণ' ও 'কালকূট'—এই তিনখানি উপন্যাস অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাঁর 'করমণুক' এবং কোনো কোনো উপন্যাস যখন অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়েছিল তখন তাঁর একজন হিতৈষী ও মহৎ বন্ধুর চেষ্টায় সে বিপদ কেটে গেল তাই রক্ষা, না হলে তাঁর অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাস হয়তো চিরদিনের মতো মহারাষ্ট্র হারিয়ে ফেলত। 'মী' (আমি) এবং 'যশোবন্তরাও খরে' এই দুটি উপন্যাস পুস্তকরূপে প্রকাশ করার সময়ে শেষের পরিচ্ছেদ দুটির পরিবর্তন করার ইচ্ছা তাঁর হল কিন্তু উপরোক্ত গোলযোগের জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে সে ইচ্ছা ছাড়তে হয়েছিল। 'বজ্রাঘাত' তাঁর শেষ সম্পূর্ণ উপন্যাস। যে বছরে তিনি এই উপন্যাসখানি লিখতে সুরু করেন সেই বছরেই তাঁর অতি স্নেহের কন্যার মৃত্যুর ফলে তাঁর বুকে যেন বজ্রাঘাত হয়। 'করমণুক'-এর পরিচালক গোবিন্দরাও ভুকলে সে-বছরেই লোকান্তরিত হলেন; বাবাজী সখারাম কোম্পানীর মাথায় বজ্রাঘাত হল—আর হরিভাউয়ের উপন্যাস রচনার উপরেও বজ্রাঘাত হল। এরপর তিনি 'করমণুক'-এ আর কোনো

* মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা সংস্কারক ও সমাজসেবক স্বর্গীয় গোপাল গণেশ আগরকর তাঁর 'সুধারক' (সংস্কারক) নামক পত্রিকায় বিবিধ বিষয়ের আলোচনা খুব স্পষ্ট এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবে করতেন। সেই লুপ্ত পত্রিকার হরি নারায়ণ পুনঃপ্রকাশ করেন॥

† সিংহদুর্গ-বিজয়ের কাহিনী। শিবাজীর বন্ধু বীর তানাজী মালুসরে সিংহদুর্গ জয় করলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে তাঁর প্রাণাহুতি হল। তখন শিবাজী সখেদে বলেছিলেন, "দুর্গ পেলাম কিন্তু সিংহ হারালাম!"

নতুন উপন্যাস লেখেন নি। ‘পুণেঁবৈভব’, কানিটকর মণ্ডলীর ‘মনোরঞ্জন’ আর নিজের ‘করমণুক’ ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। অকালের সম্বন্ধে তিনি যে-লম্বা কাহিনী লিখেছিলেন তা তিনি নিজে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন কিন্তু অনুবাদকের নাম দেন রামজী। সে-অনুবাদ বিলাতের খ্যাতনামা প্রকাশক ফিশার আন্‌উইন কোম্পানী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

‘মনোরঞ্জন’-এ প্রকাশিত নাটকগুলি ছাড়াও ‘সন্ত সখুবাই’ ও ‘সতী পিঙ্গলা’ নামে দুটি নতুন নাটকও তিনি লিখেছিলেন। নানা বিদ্বান সমাজে তিনি সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং প্রবন্ধ পড়েছিলেন। বিদ্যার্থী অবস্থায়ও তিনি কতকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন ও নাট্যরচনা করেছেন। সাপ্তাহিক এংলো-মারাঠি ‘জ্ঞানপ্রকাশ’*—আর পরে ঐ পত্রিকা দৈনিকে রূপান্তরিত হলে তার—সম্পাদকীয় সূত্র তাঁর হাতে ছিল। ‘সুধারক’ পুনরুজ্জীবিত করার পর তাতে হরিভাউ অনেক সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলী দেখলে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি সংখ্যার দিক দিয়েও কত প্রচুর তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মোটামুটি জীবনের পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি সাহিত্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁর বিশেষ বলিষ্ঠ এবং উৎসাহপূর্ণ কর্ম ‘করমণুক’ পত্র প্রকাশের পরের কুড়ি-একুশ বছরের ভিতরেই বিধৃত।

সাহিত্যরচনার এ বিরাট উদ্‌যোগ তিনি জনশিক্ষা ও বহুজনহিতের জন্যই করেছিলেন, অর্থ বা কীর্তি উপার্জনের জন্য করেন নি। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে কীর্তি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল কিন্তু লক্ষ্মী আকৃষ্ট হন নি। লক্ষ্মী আর সরস্বতী দুজনাতে কখনো মিল হয় না একথা মহারাষ্ট্রের ঔপন্যাসিক-কুলগুরুর জীবনে আবার প্রমাণিত হয়েছে। সুবিখ্যাত ‘আর্যভূষণ মুদ্রণালয়’ এবং এর একনিষ্ঠ সেবক স্বর্গত কেশবরাও বাল তাঁকে সময়ে সময়ে যা সাহায্য করে-ছিলেন তা যদি না করতেন, আর শেষদিকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গোপালরাও গোখলের সার্ভেন্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি তাঁকে ঋণমুক্ত করবার জন্য এবং তাঁর পরিবারের আজীবন ভরণপোষণের জন্য যদি ব্যবস্থা না করত, তাহলে তাঁর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বেড়েই চলত।

পিতৃব্য আন্নাসাহেব যদিও নিজের সম্পত্তির কাণাকড়িটি পর্যন্ত

* খ্যাতনামা মারাঠি সংবাদপত্র।

হরিভাউকে দেননি, তবু নিজের জীবনের শেষদিকে তিনি 'আনন্দাশ্রম'* নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করে তাঁর সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এই আশ্রমের কাজকর্ম সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব হরিভাউয়ের হাতে সঁপে দিয়ে আশ্রমের খরচপত্র থেকে তাঁর সংসার চলবার কিছু সুবিধা পিতৃব্য করে গিয়েছিলেন। এই আশ্রমে হরিভাউ পঁচিশ বছর বাস করেছিলেন। এখানেই তাঁর সাহিত্যের বেশীর ভাগ রচিত হয়েছে।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে বিধাতা এই ঔপন্যাসিকের ভাগ্যে পারিবারিক সুখ লেখেননি। একেবারে শৈশবে মাতৃসুখ থেকে বঞ্চিত হলেন; প্রাচীন সংস্কারের বিরোধিতা করার ফলে পিতার ভালবাসা লাভ হল না; যৌবনে প্রথমপক্ষের পত্নী এবং তাঁর তিনটি সন্তান অকালে গত হল; দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহের অনেকদিন পরে তাঁর একটি কন্যা হয়েছিল, কিন্তু জীবনের শেষ প্রহরে সে কন্যাটিকেও কাল ছিনিয়ে নিয়ে গেল; আর তার ঠিক এক বছর পরে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু গোপালরাও গোখলের মৃত্যু হল। এইভাবে তাঁর পারিবারিক জীবনের উপরে বিপদের পর বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাঁর প্রীতিপূর্ণ স্বভাব, সৌজন্য, আতিথ্য কিংবা স্নেহশীলতার কখনো পরিবর্তন ঘটেনি। অহংকার তাঁকে স্পর্শ করেনি, বিনয় তাঁকে ত্যাগ করেনি।

সাহিত্যরচনা ছাড়া তাঁর কর্মক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত ছিল, সম্মানও তিনি অনেক পেয়েছিলেন। পুণার প্রধান নেতাদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হত। একদা তিনি পুণা মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষ ছিলেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা একদিন তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন নি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ই পরে তাঁকে অত্যুচ্চ পরীক্ষার পরীক্ষকপদে নিযুক্ত করেছিল। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উইলসন ফিলোলজিক্যাল লেকচারার-পদ দিয়ে সম্মানিত করেছিল; ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মারাঠি ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' (Marathi—its Sources & Development)—এই বিষয়ে দু'টি ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ বছরই তিনি পুণায় পঞ্চদশতম প্রাদেশিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চারপাশে একটি বিস্তীর্ণ বন্ধুমণ্ডলী রচনা করেছিলেন; তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ছিলেন।

অবশেষে দীপনির্বাণের দিন এল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে

* আনন্দাশ্রম পুণায় অবস্থিত।

তাঁর একটি চক্ষু পক্ষাঘাতে পীড়িত হয়। আরোগ্যলাভের পর তিনি বাংলাদেশের রেলওয়ের শেয়ার বিক্রয় করার জন্য কলকাতায় গেলেন, সেখান থেকে ফেরবার সময়ে পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার বললেন যে তাঁর উদরী হয়েছে। চিকিৎসার জন্য তিনি বোম্বাই এলেন, কিন্তু রোগ বেড়েই চলল। তখন ১৯১৯-এর মার্চ মাস পড়েছে। এই মাসের তিন তারিখে তিনি বোম্বাই থেকে পুণায় ফিরে গেলেন। দুপুর একটার সময়ে তিনি আনন্দাশ্রম পৌঁছুলেন, আর সে-দিনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে তাঁর চৈতন্য শাশ্বতে বিলীন হল।

অনুবাদিকার ভূমিকা

বস্তুত আমার স্বতন্ত্র ভূমিকা লেখার বিশেষ প্রয়োজন নেই, কারণ ঔপন্যাসিক হরি নারায়ণ আপটে যে-ভূমিকা লিখেছেন এবং হরিভাউয়ের যে জীবনচরিত অন্যত্র দেওয়া হয়েছে, তা থেকে অনেক কথাই জানতে পারা যায়। তবু দুএকটি কথা এখানে বলা আবশ্যক, তাই বলছি।

স্বর্গত হরি নারায়ণ আপটে মহারাষ্ট্রের আদি উপন্যাসকার। তাঁকে মহারাষ্ট্রীয় ঔপন্যাসিককুলগুরু বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে। তাঁর উপন্যাসগুলি তখনকার মহারাষ্ট্রে নবচেতনার ঢেউ তুলে ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে নতুন চিন্তার ধারা জাগিয়ে তুলেছিল।

'কিন্তু কে খবর রাখে!' উপন্যাসে তিনি তখনকার মারাঠি সমাজের, বিশেষত মহিলাজীবনের, সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সে-সময়ে মেয়েদের খুব অল্প বয়সে বিবাহ দেবার প্রথা ছিল। আর দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা বিধবা হতেন, অত্যন্ত কচি-বয়সেও তাঁদের কেশমুণ্ডন করে, বিদ্রূপ করে, একেবারে কোনঠাসা করে ফেলা হত। এইসব বালবিধবার জীবন একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠত। এই সামাজিক কুপ্রথার ভীষণতা লোকের সামনে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে মহিলা-জীবনের যথাসাধ্য উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে হরি নারায়ণ আপটে এই উপন্যাসখানি লিখেছিলেন। শেষের দু'তিনটি পরিচ্ছেদে যে 'জনরীতি'র উল্লেখ আছে তা বিধবার মস্তকমুণ্ডনেরই সম্পর্কে।

এই উপন্যাসের ভাষা সহজ। পড়লে মনে হয় উনিশ শতকের একজন 'সাধারণ মারাঠি মেয়ে' যেন নিজের জীবনচরিত লিখেছেন। তিনি ছেলেবেলায় মায়ের কাছে আর বিবাহের পর স্বামীর কাছে বাড়িতেই অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখেছেন, হাইস্কুল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সুযোগ পান নি। এমন সাধারণ মেয়ে যে-ভাষা লিখতে পারেন তেমন ভাষাই হরি নারায়ণ আপটে এই উপন্যাসে সহজ ও সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই কোনো কোনো স্থানে ভুল আছে, বাক্যগঠনে গোলমাল আছে, শব্দের ও বাক্যের পুনরুক্তি আছে: যেমন, "...তার সীমা নেই," "...বলতে পারছি নে," "...বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার

নেই" ইত্যাদি। কিন্তু সেটা ঔপন্যাসিকের শৈলীর দোষ নয়, বরঞ্চ গুণ, উপন্যাসের নায়িকা যমুনাবাইয়ের লেখার ভাব বা ধরন প্রকাশ করার একটা পদ্ধতি। সে-সময়ের মেয়েরা যেসব সংস্কৃত শব্দ সহজভাবে চলতি কথায় ব্যবহার করতেন সেগুলি অবশ্য হরি নারায়ণ যমুনাবাইয়ের জবানে ব্যবহার করেছেন। আমি তাঁর পদ্ধতি অপরিবর্তিত রেখেছি। 'এখন' এই শব্দটি দুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; বহু স্থানে 'এখন' মানে উপন্যাসে লিখিত ঘটনাগুলি যখন ঘটেছিল সেই সময়, আর কোনো কোনো স্থানে 'এখন' মানে যখন যমুনা বসে তাঁর জীবনকথা লিখছেন সেই সময়। অবশ্য উপন্যাস পড়বার সময়ে সে বিশেষ অর্থ বুঝতে তেমন মুশকিল হবে না। অনুবাদ করবার সময়ে আমি নিজের বিচার খাটাই নি। গ্রন্থকার যা লিখেছেন তা কেবল বাংলাভাষায়, মূল লেখার রূপ ও রস যথাসাধ্য বজায় রেখে সরল ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছি। প্রয়োজন মতো নিচে টীকা দিয়েছি।

আশা করি বাংলার সাহিত্যিক ও সহৃদয় পাঠকেরা অনুবাদটি পছন্দ করবেন এবং অনুবাদের দোষত্রুটি মার্জনা করবেন।

সাহিত্য একাদমি আমাকে এই উপন্যাসখানি অনুবাদ করবার সুযোগ দিয়েছেন এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারি না।

সরোজিনী কমতনুরকর

ছেলেবেলার কথা

সে দিনকার কথা মনে পড়লে এখনও আমার হাসি পায় আর মজা লাগে। কী আনন্দের দিন সে দিন আমাদের! ক'দিন আগেই পাশের বাড়ীর ঠকুর ভায়ের বিয়ে হয়েছিল, তাই তাদের বাড়ীতে 'রুখবতের'[১] খাবার-দাবার আর জিনিষপত্র তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল। মা আমাকেও কিছু কিছু ভালো খাবার তৈরী করে দিতে রাজি হয়েছিলেন। দাদা 'মুগুাবলী'[২] করে দেবে বলেছিল। এই ভাবে সব জোগাড়যন্ত্র হয়ে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় পুতুলের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলাম। আমি বরের মা আর ঠকু কনের মা। কার মা কে হবে তাই নিয়ে বিযের আগের দিন আমাদের মধ্যে বেশ একটু ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। ঠকু বলে "আমি বরের মা হব" আর আমি বলি "না ভাই, আমি হব।" শেষে দাদা আমাদের বিচার করে দিল। "লটারি করে দেখলেই তো হয়," এই বলে দাদা কয়েকটি কাগজের টুকরোয় ঠকুর আ- আমার নাম লিখে, কাগজগুলো বেশ করে ভাঁজ করে ছড়িযে ফেলল আর ঠকুকে চোখ বুজে একটি তুলে নিতে বলল। ঠকু মনে করেছিল সে বরের মা হবে, কিন্তু তার তোলা কাগজখানা খুলে দাদা আমার নাম পড়ে শোনালো। আমরা সবাই দাদাকে খুব বিশ্বাস করতাম; দাদা যা বলবে তাই সত্যি আর দাদার কথামতোই সকলকে চলতে হবে। ঠকুকে দাদা আরও বুঝিয়ে বলল, "তোদের বাড়ীতে সত্যি-সত্যি ছেলের বিয়ে হয়েছে তো? তবে কেন এমন করছিস ভাই? আমাদের বাড়ীতে

১ বিয়ের সময় বরকে কনেব বাড়িতে নিয়ে আসবার জন্য কনের বাড়িব মেয়েরা—এয়োরা—নানা রকমের মিষ্টান্ন নিয়ে বরের বাড়িতে যায় আর বরকে খাইয়ে-দাইয়ে বাজনা বাজিয়ে কনের বাড়িতে নিয়ে আসে। সেই মিষ্টান্ন আর তার সঙ্গের সাজানো জিনিসপত্রকে 'রুখবত' বলে।

২ বিয়ের সময় বর ও বধূর মাথায়, কপালেব উপরেব দিকে, একবকম 'শীর্ষালংকার' বাঁধা হয়, কপালের দু পাশে তার দুগাছা ঝুলতে থাকে। সোনালী কাগজ, মোতী কিম্বা ফুল দিয়ে এই এক রকমের মালা বললেও চলে বানানো হয়। এই অলঙ্কারের নাম 'মুণ্ডাবলী।' বাংলা দেশের কনেমুকুট 'সিথী'র মত। এই কনেমুকুট মোটামুটি ভারতবর্ষে সর্বত্রই আছে বিভিন্ন নামে।

খেলাঘরের বিয়ে, হোক্ না কেন যমুনাই ছেলের মা।" দাদার কথা শুনে ঠকুর রাগ কমে গেল, ও আবার আগের মত খুশী হয়ে উঠল। কিন্তু দাদার কথা আমার বুকে একটুখানি বাজল। ঠকু তার ভায়ের বিয়েতে সেজেগুজে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত, তখন আমি ভাবতাম আমার দাদার বিয়েতে আমিও অমন সেজেগুজে ঘুরে বেড়াব; আর দাদার বিয়ের জন্য আমার মন কেমন উতলা হয়ে উঠত। কোন পাত্রী দেখা হলেই আমি মনে করতাম বুঝি পছন্দ হয়েছে; কিন্তু শেষে দেখতাম কিছুই ঠিক হয় নি। এমনি করে সবগুলো বিয়ের দিন চলে গেল।

দাদার কথা শুনে আমার মন কেমন করে ওঠাতে আমি বললাম, "ও কী ভাই দাদা, আসছে বছরে তোর বিয়ে হবে না বুঝি? জানিস, মা কাল বলছিল, 'ছেলের বিয়ে না দিয়ে এ বছরের অগ্রাণ মাসটা কাটতে দেবো না'। আর কনে কে জানিস?" এই বলে মুচকি হাসি হেসে আমি ঠকুর দিকে চাইলাম; অমনি ঠকু মুখ ঘুরিয়ে কপাল কুঁচকিয়ে হেসে বলল, "ধ্যেৎ! যা ভাই যমুনা, তুই ভারি দুষ্টু। অমন করলে আমি ভাই আর তোদের বাড়ি আসব না। এই জন্য বুঝি আমাকে খেলতে ডেকেছিলি?" আমি আরও খিল খিল করে হেসে বললাম, "বাবা গো! কী রাগ! যেন এখনই তুই আমার বৌদি হয়ে গেছিস।" এই শুনে ঠকু সত্যি-সত্যি চলে যেতে পা বাড়াল। তখন চট করে তাকে ধরে ফেলে দাদা বলল, "ওর কথা কানে দিসনে ঠকু; ও বড্ড বজ্জাত। যমু, আমি তোর মোতীর পুঁতী গেঁথে দেবো না আর তোর সঙ্গে আড়ি করব বলে দিচ্ছি।" এই শেষের কথাটা দাদা খুব রাগের ভাণ করে বলেছিল; কিন্তু আমি ঠিক দেখেছিলাম যে সে লুকিয়ে-লুকিয়ে ঠকুর দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসছিল। তার কথা শুনে আমি আরও জোরে হেসে বললাম, "দাদা, এখনও বিয়ে হয়নি, এরি মধ্যে ঠকুর দিক নিয়ে আমার সঙ্গে আড়ি! বেশ তো!"

তাই শুনে, ব্যাস! ঠকু একেবারে দরজার বাইরে চলে গেল আর দাদা আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল। তখন আর কী উপায়? আমি ঠকুর বাড়ি গেলাম আর ঠকুকে ডাকতে আরম্ভ করলাম; কিন্তু ঠকু সাড়া দিল না। তাকে খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত হয়ে বিষণ্ণমনে বাড়ি ফিরে এসে দেখি ঠকু আর দাদা দিব্যি গল্প গুজব করছে। আমার মনে হল ঠকু দাদাকে বলছে যে আমি তার পায়ে না পড়লে সে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমি তাদের

খুব মিনতি করে 'আর কখনো এমন দুষ্টুমি করব না' বলে স্বীকার করায় তবে তারা আমাকে মাফ করল। তার পর আবার আমাদের খেলা সুরু হল, আমাদের ছেলে মেয়ে পুতুলের বিয়ে! সব ঠিক হয়ে গেল।

সেদিনটা ছিল শনিবার। তাই দাদা সকালবেলাতেই ইস্কুল থেকে ফিরে এসেছিল। দুপুর বেলায় খুব অবসর ছিল। আমাদের ঝামেলা মিটে বিয়ে ঠিক হওয়া মাত্র আমরা একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। যেন বিয়ের সময় ফসকে যাবে! আমি আমার পুঁতির পুঁটুলিটি দাদার সামনে ফেলে দিলাম। দাদা মালা গাঁথা নিয়ে পড়ল। মা তাঁর কাঁচুলী সেলাই করবার সময় আমাকে খানকতক জরি, মখমল, রেশমী আর সাধারণ কাপড়ের টুকরো দিয়েছিলেন। সেগুলো আমি ভাল করে পাট করে রাখলাম। কনেকে কোন সময় কী দিতে হবে, কনের মাকে কী কী দেওয়া যেতে পারে, আমি কী কী জিনিস দাবি করব এই সব ভাবনা নিয়ে পড়লাম এবার। বরকে আংটির জন্যে দাবি করতে বলতেই হবে;[১] আগে চেন চাওয়া যাবে; তারপর নিদেন পক্ষে হীরের আংটি; নয় তো তিন ভরি সোনার আংটি না নিয়ে ছাড়া হবে না। কথায় কথায় ঠকুকে মাথা হেঁট করতে হবে। সে তো কনের মা, আর আমি বরের মা! যখন তখন তাকে খুঁচিয়ে কথা বলব এমনতরো নানা রকমের চিন্তা আমার মাথায় জটলা পাকাচ্ছিল। সে সব সম্বন্ধে দাদা আর আমি মাঝে মাঝে কথা কইছিলাম।

দাদার পুঁতির মালা গাঁথা হলে গায়ে হলুদ নিয়ে আসতে ঠকুকে ডেকে পাঠালাম। এমন সময়, কি ঝঞ্ঝাট, মা সুন্দরীকে নিয়ে ওপরে এলেন। সুন্দরী আমার ছোট বোন। তার আড়াই বছর বয়েস। মা বললেন, "যমু, সুন্দরীকে নিয়ে খেলা কর।" আমি মাকে বুঝিয়ে বললাম যে, সুন্দরী আমাদের খেলনা ছড়িয়ে ফেলবে, কাঁদবে, নোংরা করবে। কিন্তু মা আমার কথা মোটেই কানে তুললেন না। সুন্দরীকে আমার সামনে রেখে চলে গেলেন। ভারি রাগ হল আমার। তার উপর আবার সুন্দরী ভ্যাঁ করে কাঁদতে আরম্ভ করল। তখন আমি তাকে খপ্‌ করে কোলে তুলে নিয়ে

১ ঠিক বিয়ের সময় বর কোনো একটি জিনিস চাইলে সেটি যতক্ষণ না দেওয়া হত ততক্ষণ সে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকত। কোনোরকমে বুঝিয়ে বললে কিংবা অন্য কোন জিনিস দিতে রাজি হলেও বরের রাগ যেতো না। শেষে সে যে-জিনিস কিংবা টাকাকড়ি দাবি করেছে সেটি দিলে তবে সে খুসি হয়ে বিয়ের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াত।

বললাম, "মা ভারি জ্বালাতন করে। খেলতেও দেয় না পুরো।" খেলা যখন জমে আসে তখন যদি কেউ কোনো কাজ করতে বলে কিংবা ছোটো ভাইবোনকে সামলাতে বলে, তাহলে যে কী রকম রাগ হয় তা যাঁরা জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমার কথা কিছু অস্বাভাবিক মনে করবেন না। দাদা কিন্তু আমার কথা শুনে রেগে বলল, "যমু, মা তোকে জ্বালাতন করে? আজকাল তুই বড্ড বেড়ে গেছিস দেখছি।"

"না ভাই দাদা, আমি অমনি বললাম। আর অমন বলব না।" এই বলে আমি দাদার রাগ কমালাম।

খানিক পরে পাঁচ-ছ'জন মেয়ে সঙ্গে করে ঠকু গায়ে হলুদ নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এল। তাই দেখে আমার মনে হল, আমার দিকে মেয়েমানুষ বেশী নেই, আমি একলা। তাই গায়ে হলুদ মিটে গেলে আমিও অন্য কয়েকজন মেয়ে জড়ো করে আনলাম। মা তাঁর কথামত সব জিনিসপত্র এনে দিলেন আর আমাদের হুড়োহুড়ি সুরু হল। আমি দুড় দাড় করে এখানে সেখানে দৌড়তে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে একবার সুন্দরীকে নিয়ে ধপাস্ করে আছাড় খেলাম। অমনি সুন্দরী কান্না জুড়ে দিল। তার আওয়াজ শুনে মা ছুটে এলেন আর বকুনী সুরু করলেন, "দাঁড়া, তোদের খেলাই বন্ধ করে দিচ্ছি।" আমি চোরের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। দাদা অনেক করে মাকে বুঝিয়ে বলল, তখন আবার খেলা সুরু হল। চারটের সময় আমাদের কোলাহল সইতে না পেরে ঠকুর মা আমাদের খেলা আমাদের বাড়িতেই খেলতে বললেন। তখন বরকনের দু বাড়ির বিয়ের ঘর আমাদের বাড়িতে জমা হল আর বাড়িতে খুব ভিড় হয়ে গেল। হাসি-খুসি, চেঁচামেচির আর সীমা রইল না। শেষে পাঁচটার সময় 'অন্তরপাট'[১] ধরে আমরা 'মঙ্গলাষ্টক'[২] গাইতে লাগলাম। তখন সবাই মিলে হাসি-খুসির যে উচ্ছসিত বান ডাকিয়ে দিলাম তা বলবার সাধ্য নেই। দাদা আবার অনেক রকমের মঙ্গলাষ্টক গাইতে পারত সে সেই সব আরম্ভ

১ বিয়ের সময় বর ও বধূ মালা হাতে মুখোমুখি দাঁড়ায়। তাদের মাঝখানে একটা বস্ত্র ধরে পুরোহিতরা বিয়ের 'মঙ্গলাষ্টক' বলে। 'মঙ্গলাষ্টক' শেষ হলে মাঝের বস্ত্রটি সরিয়ে নেওয়া হয় ও বধূ বরের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেয় এবং বর বধূর গলায় মালা পরায়। মাঝখানে ধরবার সেই বস্ত্রটিকে 'অন্তরপাট' বলে।

২ বিয়ের সময় বর ও বধূর মাঝখানে 'অন্তরপাট' ধরে পুরোহিতরা উচ্চৈঃস্বরে বর ও বধূর মঙ্গল কামনায় স্তোত্র গায়। সেই স্তোত্র 'মঙ্গলাষ্টক' নামে পরিচিত।

করল। দাদার গান সুরু হলে আমরাও তাতে আমাদের সুর জুড়ে দিয়ে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলাম।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সেই গোলমাল চলেছিল, তারপর এক মুহূর্তে সব চুপচাপ হয়ে গেল। বাবা অফিস থেকে এসে এইসব দেখে খুব রেগে গিয়ে বললেন, "লক্ষ্মীছাড়ারা যা কাণ্ডটাই না বাধিয়েছে। যা সব্বাই নিজের নিজের বাড়ীতে পালা। আর হ্যাঁরে, গাধাছেলে, এতবড় বারো বছরের গাধা হয়েছিস তবু তোর এই খেলা! বেরো এখান থেকে। আর এই মেয়েটা—" এই শুনে আমি ছুটে পালালাম। কিন্তু পা বাড়ানো মুস্কিল মনে হল; ভয়ে থর্ থর্ করে আমার পা কাঁপতে লাগল। সুন্দরী সেই ওখানে বসে কাঁদছিল। মেয়েরা সবাই আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। আমি পালিয়ে নিচে রান্নাঘরে গিয়ে মায়ের পিছনে লুকোলাম।

"ও কী! কী হল?" বলে মা বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, কিন্তু আমার মুখ ফুটে একটি কথাও বেরোল না। খানিকপরে একটু সাহস পেয়ে কিছু বলতে যাবো এমন সময় দাদাও ভয়ে ভয়ে নিচে এসে বলল, "মা, মা, বাবা তোমায় শিগগির ওপরে ডাকছেন।" তারপর বলল, "বাবা আজ কী জানি কেন এমন করছেন।" দাদার কথা শুনে মার মুখ একেবারে চুণ হয়ে গেল। দাদার কাছে দু'একটি কথা জিজ্ঞেস করে মা দোতলায় চলে গেলেন। দাদাও মার পিছু পিছু যাচ্ছিল কিন্তু আমি ওর কাপড় ধরে টানতেই ও ফিরে এল। আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোকে বাবা আরও বকলেন নাকি?" তখন দাদা গোঁ হয়ে বলল, "যা, আমি তোর সঙ্গে আড়ি করেছি। তুই বড্ড স্বার্থপর। বাবার সামনে আমাকে একলা ফেলে নিজে পালিয়ে এলি।" দাদার কথা শুনে আমার ভারি খারাপ লাগল। আমি তাই তাকে খুব তোষামদ করে বললাম, "রাগ করিসনে ভাই দাদা, আমি একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তোর বয়েস যদি আমার মতো কম হত আর আমি যদি তোর মতো বড় হতাম তাহলে তুইও নিশ্চয় আমার মতো করে ফেলতিস। তাতে আবার বাবা আজ ভয়ানক রেগে আগুন হয়েছেন। এমন রাগ তিনি এর আগে কক্ষনো করেননি।"

এত বুঝিয়ে বলার পর দাদাতে আমাতে আবার বন্ধুত্ব হল আর আমরা বাবার অমন ব্যবহারের সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম। দাদা বলল, "বাবা আমাদের দুজনের ওপর এত ক্ষেপে গেছেন যে তিনি আমাদের

দুজনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন। তিনি আমাকে বললেন, 'দাঁড়া হতভাগা, তোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি এখনই—আর তোর সঙ্গে ওই ছুঁড়িটাকেও—লক্ষীছাড়ারা মাথা খারাপ করে দিল!' ”

দাদার এই সব কথা শুনে আমি একেবারে ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু দাদা আমাকে ধৈর্য্য ধরতে বলল। সবাই জানে যে কচি বেলায় ছোট্ট একটু বিপদকেও মস্ত বড় বলে মনে হয় আর ছেলেমেয়েরা সেটিকে পর্ব্বতপ্রায় বড় করে তোলে। আমরা ধরে নিলাম যে বাবা আমাদের নিশ্চিত তাড়িয়ে দেবেন, আমরা ভিখারী হব। দাদা বলল, “এখনও আমার হাতের লেখা ততটা ভালো নয়, নইলে কেরাণীর চাকরি করে আমি দুজনের পেট চালাতাম। আমরা ভাই বাবার হাতে পায়ে পড়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব। বলব যে আর কক্ষণো অমন করব না। অত করে মিনতি করলেও বাবা যদি না শোনেন তবে আর উপায় থাকবে না। আমি 'মাধুকরী'[১] আনব আর তোর আর আমার পেট চালাব। তোকে আমি ফেলে যাব না।”

আমরা এই সব জল্পনা কল্পনা করছি আর দুঃখ করছি এমন সময় ধীরে ধীরে পা ফেলতে ফেলতে মা সেখানে এলেন। মায়ের তখনকার চেহারা এখনও আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তাঁর দু চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে গালে পড়েছিল, আর চোখ দুটি হয়েছিল একটু আরক্ত। আমাদের দেখে মা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে গভীর স্বরে বললেন, “চলো বাছারা! আজ রাত্তিরের গাড়ীতেই আমাদের ঠাকুরদার ওখানে যেতে হবে। যাও ওপরে যাও, নিজের নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাওগে।” মার কথাগুলি শুনে আমাদের মনের অবস্থা যে কী হল তা কল্পনা করাই ভালো। ছেলেবেলায় মানুষের মন ভারি অস্থির হয় এই কথাটি মনে রেখে আমার লেখা পড়লেই আমার মনের ভাবটি ঠিক বোঝা যাবে। মার কথা শুনে প্রথমত আমরা অবাক হলাম, দ্বিতীয়ত মনে কেমন একটু ব্যথা পেলাম। আমি কিন্তু মনের তলায়

১ যাদের পৈতে হয়েছে এমন ব্রাহ্মণকুমাররা কয়েক বাড়ি থেকে 'ওম্ ভবতি ভিক্ষান্ দেহি' বলে কিছু নিয়ে আসে ও তাই দিয়ে কোন রকমে পেট চালিয়ে লেখাপড়া করে থাকে। এইভাবে ব্রাহ্মণকুমাররা যে অন্ন গ্রহণ করে তাকে মহারাষ্ট্রে 'মাধুকরী' বলা হয়। আজকাল শহরে এই প্রথাটি লোপ পেয়ে গেছে।

একরকমের আনন্দও বোধ করলাম। যখন একেবারে ছোটো ছিলাম তখন আমরা একবার ঠাকুরদার বাড়ি যাই। কিন্তু তখনকার কিছুই আমার মনে ছিলনা। দাদার অনেক কিছুই মনে ছিল। সে-সব দাদা কখনো কখনো আমাকে বলত, কিন্তু আমার মোটেই কিছু মনে পড়ত না। তাই আমি সব সময়ে ভাবতাম যে আমরা যেন একবার ঠাকুরদার বাড়ি যাই। যখন ঠাকুরদার বাড়ির কথা শুনতাম তখন আমার মনে হত ঠাকুরদার বাড়িতে খুব খুব মজা। কিন্তু সেদিন যে কীসের জন্য আর কী রকমে ঠাকুরদার বাড়িতে যাবার পালা এসেছিল তা আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি।

মায়ের কথা শুনে আমি দাদার দিকে চাইলাম। কিন্তু দাদার মুখে আনন্দ দেখতে পেলাম না। মাও একটিবার যা বললেন তারপর একেবারে মুখ বুঁজে রইলেন। আমার মনে হল মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করাই ভাল। তাই আমি মাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাব এমন সময় সিঁড়ির ওপরে ভারি ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ মন যেন ভয়ে হিম হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি, বাবা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের দেখেই বললেন, "এ্যাঁ! হতচ্ছাড়ারা এখানে জুড়ে বসেছে দেখছি। দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোদের। আজ তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন।" এই বলে দাদার হাত ধরে তার মুখে এক চড় মেরে বললেন, "যা, বেরো এখান থেকে। পড়াশুনো করগে যা। সারাদিন বদমাসেরা—যেন মগের মুলুক পেয়েছে। আর তুই যে ওখানে সব ছড়িয়ে রেখে এসেছিস তা গুছিয়ে রাখবে কে শুনি?" এই বলে বাবা আমারও হাত ধরে টানলেন কিন্তু মা তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "ও কী! ওদের ওপরে এত রাগ করছ কেন? ওরা কী করেছে?"

ওই একটু অবসর পাওয়া মাত্র আমি ছুটে পালালাম। এত জোরে দৌড়তে লাগলাম যে সিঁড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক হাতের চুড়ি ক'গাছি ভেঙে গেল। তবুও আমি থামিনি। অমনি একটু কাপড় ঠিক করবার জন্য দাঁড়াতেই বাবার গলার স্বর কানে গেল, "ওরা কী করেছে মনে? যত্ত সব লক্ষ্মীছাড়া! খুব বরাত নিয়েই জন্মেছে আর কি!"

আমি ওপরে গিয়ে আগে আমার সব খেলনা গোছাতে আরম্ভ করলাম। সেই গয়নাগাঁটি, সেই মালা, পুতুল, আর খেলাঘরের আসবাবপত্র কোনরকমে গোছানো হয়েছে এমন সময় দাদাও এল। তার চেহারাটি কেমন যেন ম্লান দেখাচ্ছিল। আমি তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। দাদাও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কারো মুখ ফুটে কথা বেরোচ্ছিল না। দাদার সুকোমল গালে বাবার হাতের চড়ের দাগ বেশ ফুটে উঠেছিল। তাই দেখে আমার বড় দুঃখ হল আর কাঁদতে ইচ্ছে করল। কান্না উথলে আসছিল, কিন্তু আমি আত্মসংবরণ করলাম। অনেকক্ষণ আমরা অমনি শুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমাদের সেই সময়ের অবস্থা ফটো তুলে রাখার মত। দাদার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে একসময়ে আমি তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করলাম। দাদার চোখেও জল এল। কিন্তু চট করে আমার হাত ছাড়িয়ে দাদা বলল, "মমু, তুই কি পাগল হয়েছিস নাকি? যদি বাবা আসেন আর আমাদের এমন দেখেন তাহলে কী বলবেন? চল, ও সব নিয়ে ওপরের তলায় যাই।" আমার হাত ছাড়াবার সময় দাদা দেখতে পায় যে আমার এক হাতে চুড়ি নেই। বাবা যদি দেখতে পান যে চুড়ি গাছি খুইয়েছি তাহলে যে কী বলবেন তাই ভাবতে ভাবতে আমরা তেতলায় গেলাম।

আমাদের তেতলার ছাদ ভালো করে বাঁধানো ছিল না। মাঝ-খানটায় উঁচু আর দুদিকে ঢালু হয়ে গেছে। তেতলায় বাড়ীর বাজে জিনিসপত্র রাখা হত আর সেখানটায় দাদা পড়াশোনা করত।

ওপরে যাওয়া মাত্র আমার চুড়ির বিষয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হল। বাবা যদি জানতে পারেন যে আমার হাতের চুড়ি নেই তাহলে আর নিষ্কৃতি নেই। বেদম মার খাওয়ার ভয় ছিল। ইতিমধ্যে আমার মনে পড়ল যে ক' দিন হল মা এয়োদের চুড়ি বিলিয়েছিলেন। তার থেকে ক' গাছি চুড়ি বাকি ছিল। তাই আমি দাদাকে বললাম, "দাদা, মা সেদিন এয়োদের চুড়ি দিয়েছিল না, তার ক' গাছি বাড়ীতে আছে। কিন্তু মা কোথায় রেখেছে কী জানি। হ্যাঁ, বোধহয় ঠাকুর ঘরে তাকের ওপরে রেখেছে। ছাখ্ দেখি যদি এনে আমার হাতে পরিয়ে দিতে পারিস।"

বলা তো সোজা, কিন্তু নিচে যাবে কে? নিচে যাওয়া মানে নির্ঘাৎ বেশ ক'ঘা মার খাওয়া বই আর কিছু নয়। মানে, আমার সে কল্পনা মতো কাজ হওয়া অসম্ভব। তখন দাদাই এক যুক্তি ঠাওরাল। আমার যে হাতে চুড়ি ছিল তার থেকে দুতিনটি নিয়ে খালি হাতে পরালেই বেশ হয়, এই মনে করে আমরা তৎক্ষণাৎ আমার দুহাতে চুড়ির ব্যবস্থা করে ফেললাম। কিন্তু কপালদোষে ন্যাড়া হাতটায় চুড়ি পরবার সময় এক-গাছি ভেঙ্গে গেল। তবু ভাগ্যের কথা, দুহাতে চুড়ি হল এই যথেষ্ট। এই রকমে সব ব্যবস্থা হলে পরে আমি আমার সব জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে বাকসয় তুলে রাখতে আরম্ভ করলাম। দাদা বই হাতে করে আমার পাশে বসে বসে আমাকে সাহায্য করতে লাগল। মাঝে মাঝে আবার আমরা বাবার ওরকম ব্যবহারের বিষয়ে কথা কইতে লাগলাম।

সিঁড়ির ওপরে পড়ে যাবার সময়ে আমি বাবার যে কথাগুলি শুনতে পেয়েছিলাম তা সব দাদাকে বলে ফেললাম। দাদাও আরো অনেক কিছু শুনতে পেয়েছিল, সে সব আমাকে বলল। সে সব মিলিয়ে আর বাবার সেদিনকার বিশেষ রাগের ভাবগতিক দেখে আমরা ঠিক করলাম যে দুদিন পর্য্যন্ত বাবার সামনে না যাওয়াই ভালো হবে।

বাবার বিষয় যখন কিছু লিখছি তখন তার আরও একটু বর্ণনা দেওয়া যাক্। তাহলে আমি পরে আমার যে-জীবনকাহিনীটি লিখব সেটি ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে।

আমাদের বাবা বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর লম্বা। তিনি বেশ ফরসা কিন্তু তাঁর চোখ দুটি কিছু লালচে—পিঙ্গলবর্ণ। দেখতে তিনি খুব গম্ভীর আর উগ্র ছিলেন, আর তাঁর ব্যবহারও ছিল ঠিক তেমনিই। তাঁর সামনে যেতে সবাই ভয় করত আর কাঁপত।

আমাদের পুরাণো চাকর শিবরাম আমার ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়ীতে ছিল। কিন্তু সেও বাবার সামনে যেতে ভয় পেত। কেবল মা বাবাকে ভয় করতেন না। মাকেও বাবা কখনো কখনো বকতেন, কিন্তু খুব বেশী নয়। উল্টে তিনিই মাকে একটু ভয় করতেন বললেও ভুল হয় না। সে যে কেন তা আমি অনেকদিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম। কারণটি এই যে বাবা যখন ক্ষেপে উঠতেন তখন মা কখনো প্রত্যুত্তর করতেন না। সেই সময়, "হ্যাঁ, বেশ, বেশ, অমনি

করলেই ঠিক হবে” বলে সময়টি কাটিয়ে দিতেন আর বাবার রাগ শান্ত হলে পরে যার জন্য বাবা অত রেগেছিলেন তা ভালো করে, মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে দিতেন আর নিজের মনের মতো আর উচিত মতো কাজ করতে তাঁকে বাধ্য করতেন। মার সেই গুণের প্রশংসা আমি স্বয়ং বাবার মুখেও অনেকবার শুনেছি। মা সত্যিই ভারি লক্ষ্মী আর বেশ বুদ্ধিমতী ছিলেন। মা বলতেন, যে-ব্যাপারের সাথে নিজের কিম্বা সংসারের কোনও রকম সম্বন্ধ নেই এমন বিষয়ে মুখবুজে চুপ করে থাকাই ভাল। ঠকুর মা রাধাবাই আর আমাদের মায়ে ভারি বন্ধুত্ব। একদিন রাধাবাই মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হ্যাঁলো, যশোদাবাই, তোর উনি তো সব্বার উপর রাগ করেন আর আথাড়ি-পাথাড়ি বকেন, কিন্তু তোর ওপরে তো কক্ষনো রাগতে দেখিনি! আমার উনি তো ভাই যখন তখন বলেন যে, ‘এই বাসুদেবরাওটা অত কড়া, কিন্তু বউয়ের কাছে কেমন যেন পোষা বেড়ালটি!’—সত্যি, কি মন্তরটন্তর জানিস বলদেখি। আমার উনিও ভারি গরম মেজাজের কিনা—কখনো কখনো ওঁরও মাথার বিকৃতি ঘটে। তখন একেবারে ঘটি-বাটি ছুঁড়ে ফেলাফেলি, পৈতে ছিঁড়ে ফেলা আর একেবারে তেলেবেগুণে হয়ে ওঠা—তাইতো অত যেচে জিজ্ঞেস করছি ভাই! মন্তরটি জানতে পারলে আমিও আউড়ে দেখব।”

রাধাবাইয়ের কথা শুনে মুচকি হেসে মা বলেছিলেন, “করো ভাই হাসি তামাসা। আমি একেবারে সাধারণ আর সরল তাই ঠাট্টা করছ, করো আর কী।” দুই বন্ধুদের এই রকম কথাবার্তা চলছিল। তখন মা তাঁর ব্যবহারের ইঙ্গিতটি রাধাবাইকে বলে ফেললেন। সে-কথাগুলি এখনও আমার এত স্পষ্ট মনে রয়েছে যে আমি আমরণ তা ভুলতে পারব না। কী আশ্চর্য্য, আমি তখন অত ছোট ছিলাম আর তার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছু বুঝতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবু মায়ের সে দিনকার কথাগুলি আমার মনে যেন বাসা বেঁধে আছে। আমার সমস্ত জীবনটি যেন তাঁর সেদিনের সেই কথার প্রতিবিম্ব হয়ে রইল। জীবনের নানারকমের বিপদের সময় তাঁর সেদিনের কথাগুলি আর তাঁর অন্য সকল শিক্ষা আমাকে সাহায্য করেছে। মনে হয় যদি মায়ের নিপুণ ব্যবহার আমি চোখে দেখতে না পেতাম আর সেদিন মা রাধাবাইকে যা বলেছিলেন তা যদি শুনতে না পেতাম তাহলে নানা রকমের বিপদ থেকে

নিস্তার পাওয়া আমার পক্ষে বড় মুস্কিল হত। আজ যখন এই সব ঘটনাবলী লিখতে বসেছি তখন মায়ের চরিত্রখানি যেন ছবির মতো সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর মনে হচ্ছে যে মেয়েদের মহলে যে বলা হয়, "কারো হতে নেই চাকর আর কারো হতে নেই বৌ" সে কথা সত্যি খুব অর্থপূর্ণ। তাই কোন মেয়ে হবার খবরে আমরা, মেয়েরাও, খুশি হই না আর সকলেই যে তা শুনে মুক বেঁকায় তাতে আর অবাক হবার কি আছে! নিজের গল্প লিখতে বসে আমি এ কী লিখতে আরম্ভ করেছি।

বাবার বর্ণনা করতে করতে মার বর্ণনাও দেওয়া হল। কিন্তু আমার গল্পটি এগোবার আগে মার আর আমাদের আত্মীয়স্বজনদের বিষয়ে অল্প কিছু লেখা উচিত। মা দেখতে বেশ সুন্দরী ছিলেন। তাঁর চোখে মুখে কেমন যেন একরকম কমনীয় ভাব ছিল। তাঁকে দেখলেই মনে হত তাঁর মন নিশ্চয় খুব বড় আর উদার হবে; আর ছিলও তাই। মার কাজকর্ম কত পরিপাটি, চালচলন আর মুখের কথা এবং আমাদের শিক্ষা দেবার পদ্ধতি কী সুন্দর ছিল! তার বর্ণনা দেওয়াই মুস্কিল। আমার জীবনে আমি ভালোমন্দ যা কিছু করতে পেরেছি তা কেবল দুজনের শিক্ষার ফল। একজন আমার মা, আর অন্যজন—তাঁর নাম লেখার আর দরকার কী? উনি অন্য আর কে হতে পারেন? যদি মায়ের শিক্ষায় আমার মনে পরিপাটি কাজের ভাব, বিনয়, উদ্যোগপ্রিয়তা, মিতব্যয় ইত্যাদি অনেক গুণের বীজ বোনা না হত, তবে তাঁর শিক্ষায় সেই বীজের অঙ্কুর বৃক্ষ হয়ে ফুল ফল ধরতে পারত না। আমাদের মা যেন কোনো দেবতা ছিলেন বলতে অত্যুক্তি মনে করছি না। নিজের মানুষকে সকলেই ভালোবাসে তাই আমি মার স্তুতি, গুণগান করছি তা নয়। মার শিক্ষার জোরে পরে কী হওয়া সম্ভব হল তা যখন জানা যাবে তখন আমি মার বিষয়ে যা লিখছি তা খুবই অল্প বলে মনে হবে। সত্যি বলতে কি মার আরও গুণগান করা উচিত—তাই যদি অত্যুক্তি করেই থাকি, তাহলে মাতৃভক্ত মেয়ে মার স্তুতি গেয়েছে মনে করে আমাকে ক্ষমা করবেন আশা করি।

বাবা কালেক্টারের অফিসে হেডক্লার্ক ছিলেন, মাসে দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন। আমাদের ক্ষেতে ফসলও বেশ হত। বাবা ঠাকুরদার একমাত্র ছেলে। কিন্তু অনেক কারণে দুজনের মোটেই বনত না। একে

তো দু'জনের স্বভাব এক। দু'জনেই ছিলেন ভারী জেদী। যা বলবেন তাই করবেন এমন দু'জনেরই স্বভাব। তাতে ঠাকুরদা বিশেষ কড়া—যেন জমদগ্নির অবতার। মা বলতেন যে ঠাকুরদার অনেক গুণই বাবা পেয়েছেন। ঠাকুরমাও অনেকটা ওরকমই ছিলেন। তাই ঠাকুরমার আর ঠাকুরদার কখনো মিল হত না। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো ছ'মাস ধরে তাঁরা কথা কইতেন না। ঠাকুরমা মাকে সব সময় বকা-বকি করে ত্রস্ত-ব্যস্ত করে শ্বশুরবাড়ির যে-সুখ দেখিয়েছিলেন তা বিস্তৃতভাবে লিখতে গেলে এক রামায়ণ হবে। মা ঐরকম লক্ষ্মী বৌটি ছিল বলে সব কিছু সহ্য করে শাশুড়ির মুখ থেকে বাহবা পেয়েছিলেন।

আগেই লিখেছি যে ঠাকুরদা আর ঠাকুরমাতে কখনো বনেনি। কখনো কখনো ঠাকুরমা বাবার কাছে এসে থাকতেন। কিন্তু ঠারকুদা কখনও আসতেন না। কেননা, তিনি যখন আসতেন তখন আমাদের বাড়িতে 'বৈশ্বদেব' হত না। অনেকে হয়ত বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু সত্যি বলছি, ঠাকরদা একদিন বললেন যে আমাদের বাড়িতে 'বৈশ্বদেব' হওয়া দরকার আর সেও স্বয়ং বাবাকেই করতে হবে—তা যদি নিতান্তই না হয়, তবে যেন দাদা করে—হ্যাঁ, দাদার ক'দিন আগেই পৈতে হয়েছিল। বাবা বললেন যে চাকুরির জন্য তাঁকে হাজার জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়, তাঁর দ্বারা ও সব হবে না। ব্যস্, এই নিয়ে এক কথা দু'কথা হতে হতে একেবারে ঝগড়া বেধে গেল। শেষে ঠাকুরদা বললেন, "যে বাড়িতে সব নাস্তিক আর অর্বাচীন লোক থাকে, ঠাকুরের নৈবেদ্য, বৈশ্বদেব কিছু নেই, সে বাড়িতে যে অন্ন গ্রহণ করবে সে ছুঁচোর কুলে জন্ম গ্রহণ করবে।" এই বলে বৃদ্ধ রেগে তর তর করে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। বাবা যেখানে ছিলেন সেখানেই বসে রইলেন, একটু নড়াচড়াও করলেন না। শেষকালে মা মর্য্যাদার বাধা অতিক্রম করে, ঠাকুরদার পিছন পিছন গিয়ে তাঁর হাতে পায়ে পড়ে, "আপনি ফিরে না এলে আমি অন্ন গ্রহণ করব না" বলে, অনুনয় বিনয় করে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা তামাশা দেখতে জড়ো হল। কী যে কাণ্ড হল তা মা ভেবে পান না। শেষে ঠাকুরদা কী মনে করলেন কী জানি, উঠে মুখহাত ধুয়ে দু' গ্রাস খেয়ে নিলেন। বিকেলবেলায় আবার কোন কারণে দু'জনের বেশ জোর ঝগড়া হল আর পরের দিন সকাল বেলায় না খেয়েদেয়েই ঠাকুরদা প্রথম গাড়ীতে চলে গেলেন। তারপর

থেকে তিনি কখনও বাবার বাসায় আসবার নামটিও করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি বাবার সঙ্গে কিংবা আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলতেন না। মাকে কিন্তু তিনি বড় ভালবাসতেন, দাদাকেও। আমাকে দেখতে পেলে কিংবা কাছে পেলেই বলতেন, "এই মেয়েটা ঠিক ওর ঠাকুরমার আর বাপের মতো হবে। ছেলেটা কিন্তু ওর মার মতো হবে।" তাঁর এই কথা শুনে ঠাকুরমা খুব রাগতেন, কেননা তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। দাদাকে মোটেই ভাল বাসতেন না তা নয় তবে একটু কম আর কি। বোধ হয়, দাদা ঠাকুরদার আদুরে ছিল তাই ঠাকুরমা ওকে ততটা ভাল বাসতেন না। ঠাকুরদার বাড়ীতে যাওয়ার কথায় একদিকে আমার আনন্দ হত আর অপরদিকে খানিকটা ভয় করত। ঠাকুরমা সেখানে আছেন বলে আনন্দ হত আর ঠাকুরদার কথা মনে হলে ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠত।

আমাদের কুটুম্বদের বিবরণ বড্ড লম্বা হয়ে গিয়েছে, তাই সেটাকে এইখানেই শেষ করে, যে দিনের কথা বলছিলাম তাই আবার সুরু করা যাক। কিন্তু তার আগে এইটুকু জানিয়ে রাখছি যে আমি যা বলব কিংবা যে সব ব্যক্তি বা ঘটনার সম্বন্ধে লিখব, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে রক-মানুষ ও ঘটনা যার ইচ্ছা হয় সে আজকালও দেখতে পারে। কেউ যদি আমার এ কথায় অত্যুক্তির আশঙ্কা করে, তা হলে নিজের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি কতটা আছে একবার ভেবে দেখবেন। আমি যা লিখছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

মজার কথা

আগের পরিচ্ছেদে বলেছি যে দাদা আর আমি অনেক বিষয়ে কথা বলছিলাম। সে সব কথা বাবার রাগ ছাড়া আর কী বিষয়ই হতে পারে? কথা কইতে কইতে অন্ধকার হয়ে এল। রাত্রে কেউ আমাদের ওপরের তলায় বসতে দিত না। তখন দাদা পড়াশুনা দোতলার ঘরের আলোর পাশে বসেই করত। আমিও খাওয়া দাওয়া সারা হয়ে গেলে ঘুমোবার আগে পর্য্যন্ত দাদার পাশেই বসে থাকতাম। কিন্তু আজ দুজনের একজনও নিচে নামতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছিল। আমি তো খিদেয় একেবারে কাতর হয়ে পড়েছিলাম। খাবার সময় যে সব খাবার আমাদের দেওয়া হয়েছিল তা খেতেও সময় পাই নি। কেননা বিয়ের পরে জামাই আর বেয়ানরা খুব জাঁকজমক করে নেমন্তন্ন খাবেন বলে ঠিক হয়েছিল। বাবার রাগের জ্বালায় সে সব যেন কোথায় গুলিয়ে গেল! শুধু তাই নয়, মান-সম্মানের জন্য অভিমান করে যিনি কনের মাকে মাটিতে নাক ঘষতে বাধ্য করবার মতলব করেছিলেন সেই অভিমানিনী এখন অন্ধকারে বসেছিলেন এবং মার খাবার ভয়ে নীচে তাঁর যাবার ভরসা হচ্ছিল না। বেয়ানের তো এমনি দুর্গতি, যে তিনি নিজের ছেলেকে পর্যন্ত, মানে জামাইবাবুকে, খেলনার বাকসে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। কনে বেচারীর খবর কে রাখে? পোড়ারমুখী মেয়ে ছিল পড়ে কোন ঘরের কোণে! মাঠাকরুণই যেখানে নিশ্চিন্তে নেই, সেখানে বৌঠাকরুণ থাকেন কোন যায়গায়! আজ বেশ আনন্দে সেদিনকার কথা মনে করে লিখছি, কিন্তু সেদিন আমার মনের অবস্থা যে কেমন হয়েছিল তা আমিই জানি।

যখন বেশ অন্ধকার হল তখন দাদা বলল, "অমু, চল্ নীচে গিয়ে বসি। নইলে খাওয়া হয়ে গেলে, 'এখনো কেন আসেনি' বলে রেগে বাবা ওপরে আসবেন।" আমারও তাই মনে হল। দু'জনে এক

কথাই বললাম, কিন্তু একজনও জায়গা ছেড়ে উঠলাম না। কতক্ষণ আর অমন চলে? দাদা কী একটা বই তুলে নিয়ে আবার হাত ধরে বলল, "ওঠ্।" আমিও ভাবলাম এখন আর নীচে খাওয়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু, সত্যি বলছি, সেদিন কেবল বাধ্য হয়েই আমাকে নীচে যেতে হল। সন্ধ্যে হলে আমি কখনো একদণ্ডও তেতলায় থাকুতাম না। কিন্তু সেদিন সমস্ত রাত্রি সেখানে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বড্ড খিদে পেয়েছিল কেননা, খেলায় যেতে আর নেমন্তন্নের শখে দুপুর বেলায় কিছু খাইনি। তাই খিদের জ্বালা সহ্য হচ্ছিল না। তবুও মার খাবার ভয়ে মনে হচ্ছিল যে বরং খেতে না পেলেও সই কিন্তু নিচে না যাওয়াই ভালো।

দাদা আর আমি নিচ গেলাম সে একরকম ভাণ করেই। দাদা গিয়ে একেবারে ঠাকুরের কাছের প্রদীপের পাশে বই খুলে বসল। মাথা নুইয়ে যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিল। কিন্তু দাদার মন পড়ায় ছিল বলে আমার মোটেই মনে হচ্ছিল না। আমিও দাদার পাশে গিয়ে বসে ওকে বারবার করে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। কিন্তু দাদা আমার গা টিপে আমাকে চুপ করতে বলল। বাবার জামা আর পাগড়ী দেখতে পাচ্ছিল" না বলে বাবা কোথায় জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল আর তাই আমি দাদাকে বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম। কিন্তু দাদা কিছুই উত্তর দিচ্ছিল না। মুখ তুলে দেখছিলও না। ইতিমধ্যে মা ওপরে এলেন আর আমাদের দেখে বললেন, "এখানেই আছ? চলো, খেতে চলো। বাইরে গিয়েছেন, কখন আসবেন তার ঠিক নেই। তোমরা খেয়ে নিয়ে ঘুমোও। চলো, তোমাদের খেতে দিই। নির্ঝঞ্ঝাট হোক।"

"ঘুমিয়ে পড়ো" শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। আমরা যখন রান্নাঘরে ছিলাম আর মা প্রথম সেখানে এসেছিলেন তখন বলেছিলেন যে আমরা ঠাকুরদার বাড়ী যাবো। তাই আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ঠাকুমার ওখানে যাবো না?" মা বললেন, "না, সে এখন রইল, অন্ততঃ সাত আট দিন পর্য্যন্ত যাবো না।" মার এই উত্তর শুনে আমার যে কী মনে হল তা আর লিখে দরকার নেই। আমার আনন্দও হল, কষ্টও হল। এমন মত পরিবর্ত্তন কেন হল তা জানতেও ইচ্ছে হল। কিন্তু সবচেয়ে সৌভাগ্যের কথা এই মনে হল যে বাবা বাইরে গিয়েছেন আর তাঁর

ফেরার আগে আমরা খেয়ে নেব। রোজ সকালে আমরা বাবার সঙ্গে খেতাম; দাদা ছুটির সময় ইস্কুল থেকে এলে তার সঙ্গে জল খাবার খাওয়া হত, আর আবার সন্ধ্যেবেলায় বাবার সঙ্গেই খেতাম। বাবার সঙ্গে খেতে, সব সময় যদিও নয়, তবু অনেক সময় বড় সঙ্কোচ বোধ হত। বাবার মেজাজ যেদিন গরম থাকত সেদিন আমাদের খাওয়া মাটি হত আর কি। হয়তো আশ্চর্য মনে হবে, কিন্তু বাবার যত রাগ হত সব ঠিক খাবার সময়। তিনি কখনও হাসিখুসিতে সন্তুষ্ট মনে খাননি। দাদাকে তার ক্লাসের পড়াশুনার বিষয়ে যা জিজ্ঞেস করবার তা খাবার সময়, আপিসে কিছু ভালো-মন্দ হয়ে থাকলে সে রাগও সেই খাবার বেলায়; আরো যে সব কিছু রাগের বিষয়, সবই খাবার সময়টিতে এসে হাজির হত।

বাবার রাগের বিষয় লিখতে গেলে আমার মাথা ঘুলিয়ে যায়। যা কারো কাছে বলা ঠিক নয় তাই সব বলে ফেলতে ইচ্ছে হয়। এই দেখ, একটি কথা মনে হয়েছে আর তা না লিখে পারছি না। একদিন খাবার সময়ে বাবা ভাতের গ্রাস তুলে মুখে দেবেন, এমন সময় দেখতে পেলেন যে ভাঁতে একগাছি চুল। তখন আর কী। এরি মধ্যে মা কী যেন পরিবেশন করতে এলেন, আর বাবা অমনি তেড়ে মার হাতের বাসনটি ঠেলে ফেলে দিলেন, জলের ঘটিটি ঠাঁই করে জোরে মেজের ওপর রেখে ভাত ফেলে উঠে চলে গেলো। তাঁর রাগ এমন ভয়ানক ক্ষ্যাপার মতো ছিল। কিন্তু মা সত্যি ধন্যি মেয়ে! সে সময় একটি কথাও না বলে চুপ করে রইলেন। আমাদের খেতে দিয়ে অনেকক্ষণ পরে বাবার কাছে গিয়ে নিজের আজব যুক্তিতে আর মিষ্টি কথায় তাঁকে বুঝিয়ে আবার খেতে নিয়ে এলেন।

আমার ছোটবেলার যে ঘটনাগুলি বেশ স্পষ্ট মনে আছে কিংবা যেগুলি আমি আজও ছবিব মত স্পষ্ট দেখতে পাই, এ ঘটনাটি তারই একটি। মার নিশ্চয়ই চমৎকার কর্মক্ষমতা আর ধী-শক্তি ছিল। আমি বড় হলে সব সময় ভাবতাম, বাবার স্বভাব যদি শান্ত হত আর তিনি যদি সব ব্যাপারে মার কথামতো চলতেন তবে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও অসুখী হতেন না। সত্যিই. মার গুণাবলী বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। মাকে স্মরণ করলেই তাঁর নাম জপ করতে ইচ্ছে হয়, আর মনে হয় শুধু তাঁর গুণগানই করতে থাকি। আমি এ কথা বলছি না যে অমন মেয়ে অন্য সংসারে থাকতে পারে না—হয়ত প্রত্যেক সংসারেই থাকতে পারে, কিন্তু আমার

মায়ের কথাই আলাদা।

বাবার অমন বদরাগী মেজাজ, সত্যি বলতে গেলে মার সব সময়ই দুঃখে কাটত, কিন্তু মা একদিনও সে বিষয়ে আশেপাশের লোককে কিছু বলেন নি। ওঁর নিজের মা কাশী-যাত্রা সেরে বাড়ি ফিরে যাবার সময় আটদিন আমাদের বাসায় ছিলেন কিন্তু তার কাছেও মা কখনো নিজের দুঃখ খুলে বলেন্‌নি। ওঁদের কথাবার্তা আমি শুনতাম। খাওয়াপরা আর মা ও দিদিমার আশে-পাশে এদিকে-ওদিকে ঘোরা ছাড়া আমার আর কাজই বা কী ছিল!

আমরা খেতে গেলাম। তবু, বাবা এসে পড়বেন এই ভয়ে বুক দুর দুর করছিল। শেষে খাওয়া হয়ে গেল, আমরা আবার ওপরে গেলাম। গিয়ে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করতে না করতেই আমার ঘুম পেয়ে গেল, আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

এরপর আমি যা বলব তা আমি কেমন করে শুনতে পেয়েছিলাম তা ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের বিছানা কোথায় আর কী ভাবে পাতা হত তা বলা দরকার। আমাদের বেশ বড়ো রকমের একটি দেওয়ানখানা—হলঘর বললেও হয়—ছিল, তার একপাশে দাদা আর আমি শুতাম। অপর দিকের একেবারে শেষ দিকটায় বাবা শুতেন। আমরা ছোটো ছিলাম কিনা, আর বাড়িতে আমাদের কাছে থাকতে পারবে এমন অন্য কেউ ছিল না। অন্য ঘরে শুলে পাছে ভয়টয় পাই তাই ওরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাস্তবিক বাবা আর মা সব সময় বলতেন যে এটা ভালো নয়। কিন্তু যার উপায় নেই তার আর কী করা যায়? আমি এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম যে পরে দাদা কখন এসে আমার পাশে ঘুমোলো, বাবা ফিরে এলেন কিনা, এসে থাকলে কখন এলেন, তারপরে বাড়িতে আরো কী কী ঘটল তা আমি কিছুই জানতে পারিনি। সারাদিন হৈ চৈ করেছিলাম বলে কিংবা হয়তো ছেলেবেলার কচিঘুম ছিল বলে আমি একেবারে নিঝুম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সেজন্য আবার খুব ভোরেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন বোধহয় ভোর চারটে হবে। কেন না তার অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেলাম কোথায় যেন পাঁচটার ঘণ্টা বাজল। আমি জেগে উঠে শুনি—কথাবার্তা বেশ জোরেই হচ্ছিল—

"তোমরা এখানে না থাকাই ভালো। কোন সময় কী বিপদ ঘটবে তার ঠিক কী?"

"যেতে আমার মোটেই আপত্তি নেই, কিন্তু আমি বলি, আমরা এখানে থাকলে, যা বিপদ হবার তা নিশ্চয়ই বাড়বে না। আর আমরা না হয় গেলাম, কিন্তু যদি কোনো বিপদ হবারই হয়, তবে তা নিশ্চয়ই আটকাবে না।"

"আমি বাদানুবাদ চাইনে। মুখ বুঁজে এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো। তোমরা স্ত্রীলোকেরা যে সব ব্যাপার বুঝতে পারো না তাতে কথা কওয়া মোটেই উচিত নয়। যা করার নয় তা করে বসেছি, তুমি মানা করেছিলে তবু শুনিনি, এখন তার ফল ভুগতেই হবে। ঠিক এই বেলায় তুমিও যদি অবাধ্য হও তাহলে ছাই-ভস্ম মেখে বৈরাগী হওয়া বই আর অন্য উপায় নেই!"

এই ধরণের আরও অনেক কথা বাবা বললেন। তারপরে মা কিছুই কথা কইলেন না। পাঁচটার সময় উঠে নিচে চলে গেলেন। আমি বিছানায় শুধু শুধুই শুয়ে রইলাম। আমার মনের অবস্থা এমন ভয়ানক হয়েছিল যে তা লিখতে পারছি না। একে তো মা ও বাবার গোপন কথোপকথন শুনেছি, মানে নেহাৎ খারাপ কর্ম করেছি মনে হচ্ছিল। মার কাছে শিখেছি যে কারো গোপন কথাবার্তা শোনা ভালো নয়; নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তেমন অবস্থা যদি কখনো আসে, তবে নিজের উপস্থিতি যাঁরা কথা বলছেন তাঁদের কোন উপায়ে জানিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু 'নিরুপায় হয়ে শুনতে হল, তাতে আমার কি দোষ?' ইত্যাদি সাফাই গেয়ে নিজেকে দোষমুক্ত করে নিয়ে অন্যদের গুপ্তকথা শোনা নিতান্তই খারাপ। ছোটবেলা থেকে মা যে অনেক শিক্ষা দিয়েছিলেন এইটি তার মহত্তম। বাস্তবিক বাবার কথা শোনামাত্র কেশে নয় অন্য কোনো উপায়ে আমি জেগে আছি বলে বাবাকে জানিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত ছিল। অন্য কোনো সময়ে হলে আমি নিশ্চয়ই তাই করতাম। কিন্তু সেদিন, 'এখন কি বিপদ ঘটতে পারে তার ঠিক নেই' এই কথা বাবার মুখে শুনে আমার মনে যে ধাক্কা লেগেছিল তাতে মার সব শিক্ষা ভুলে গেলাম। আর তার পরের কথা না শোনবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, আমি আরও উৎসুক হয়ে শুনতে লাগলাম। আমার মনে হল, "এ আবার কী জঞ্জাল।" মার তখনকার কথাগুলিও আশ্চর্য্য মনে হল। বাবা আর মা কোন্ বিপদের আশঙ্কা করছেন? আর কী

হবে? বাবা এমন কী করেছেন, আর তার কী ফল ভুগতে হবে তা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

এই. সব ভাবতে ভাবতেই বাইরে বেশ ফরসা হয়ে এলো। দাদাও উঠল। ভোরের বেলা যা শুনেছি তা দাদাকে বলি কি না বলি ভাবছিলাম। কিন্তু আমরা কোথাও যাবই বলে ঠিক হওয়ায়, জিনিসপত্র গোছানো, পাড়াপড়শীদের কাছে বিদায় নেওয়া আর খাওয়া-দাওয়া—এতেই বেলা হয়ে গেল; দুপুর সাড়ে বারোটার গাড়িতে আমরা রওনা হলাম।

"দাদা, তোকে একটা মজার কথা বলব", এইটুকুই আমি দাদাকে বলে রেখেছিলাম। যাতে নিজের কোনো ক্ষতি নেই ছোট বেলায় সেটা মজাই মনে হয়।

আমাদের প্রবাস

আনন্দই হোক কিংবা খেদই হোক তার রেশ ছেলেবেলায় মনের উপর বেশিক্ষণ থাকে না। সেটা প্রত্যেকেই অনুভব করে থাকবেন; তাই তা আর বেশী করে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। আমি শুধু এই বলতে চাই সে দুপুরে গাড়ি ধরবার, আর অন্য সব তাড়াহুড়ায়, ভোরের বেলায় আমি যে সব কথা শুনেছিলাম তা একেবারে যেন ভুলেই গেলাম। রেলগাড়িতে চড়বার আনন্দের কাছে সকালে যা সব শুনে দুঃখভাবনা হয়েছিল তা কি আর টিকতে পারে? তখনকার মতো আমি সে সব একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম বললেও ভুল বলা হয় না। যে বয়সে রেলগাড়িতে চড়ে বেড়ানো চলে, আর কেউ বেরোলেই তার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে হয়, সে বয়সে নিজে রেলে ঘুরবার বাস্তবিক সুবিধা পেলে, আর যখন-তখন যিনি বকে ওঠেন সেই বাবা সঙ্গে না থাকলে (আমাদের বাবা আমাদের সঙ্গে ছিলেন না তা আর বলার দরকার নেই; তাঁর অফিসের কুঞ্জজীপন্ত কেরাণীকে তিনি আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন) সে যে কী আনন্দ, তা কি বলা যায়? তেমন আনন্দের কাছে, যা হঠাৎ শোনা আর যার মানে মোটেই বুঝতে পারিনি বললেও হয়, সে কথায় যে খেদ হয়েছিল তা আর কতক্ষণ টিঁকতে পারে?

বড় বয়সে অনেকেই বনশ্রীর শোভা ইত্যাদি দেখতে ভালবাসে না। কিন্তু ছোটোবেলায় তেমনটি হয় না, সে বয়সে সব কিছু দেখতে ইচ্ছে হয়। যা কিছু হোক্ তার কিছু বুঝি বা না বুঝি, তা দেখবার বড় একটা কৌতুহল থাকে। তাই রেলে চড়েই জানলার পাশে কে বসবে এই নিয়ে আমাদের ভাইবোনেতে ঝগড়া সুরু হল। দাদা বলল সে বড় কাজেই সে জানালার ধারে বসবে, আর আমি বললাম আমি বসব। শেষে ঝগড়ার মধ্যে জানালার বাইরে উঁকি মারতে গিয়ে দাদার টুপি পড়ে গেল। কিন্তু ভাগ্যের কথা যে গাড়ি তখনও চলতে আরম্ভ করেনি। আর যে মুটিয়াটি মালপত্র এনেছিল সে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে বলে মা টুপিটি আনিয়ে নিলেন।
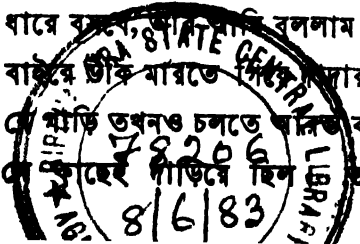
তারপর কার ধাক্কায় টুপি পড়েগিয়েছিল তাই নিয়ে কম তর্ক হয়নি। শেষে মা দাদাকে, "তুই বড় তো? এ দিকে আয়, আমার পাশে বোস," বলে নিজের কাছে টেনে নিলেন; আর আমার দিকে চোখ রাঙিয়ে চাইলেন। কিন্তু আমার সে খবর নেবার দরকার কী? অতক্ষণ তর্ক আর ঝগড়া করে শেষটায় আমিই জানলার পাশের যায়গাটি পেলাম, সেই আনন্দেই আমি মশগুল। মার একটু বকুনি খেতেই দাদা চুপ করে রইল। আমি একঁবার শুধু শুধু চোখ মটুকে দাদার দিকে চাইতেই দাদা, "আচ্ছা, দেখে নেব, তোর সঙ্গে আড়ি" এই ভাব প্রকাশ করল তার তাকানর মধ্যে। কিন্তু আমি নিজের আনন্দেই মত্ত। তখন আমি কি তার পরোয়া করি?

কিন্তু কী মজা হল দেখুন। কথায় বলে, যে খায় চিনি, জোগান চিন্তামণি, তা মিথ্যে নয়। আমরা যে কামরায় বসেছিলাম, সেই কামরাতেই অন্য দু'জন স্ত্রীলোক অপর দিকের জানলার পাশে বসেছিলেন, তাঁরা দাদার মুখভার দেখে তাকে কাছে ডেকে জানলার পাশে জায়গা করে দিলেন। তখন গাড়ি চলতে সুরু করল। কিন্তু আমার যা স্বভাব! দাদা ওদিকে জায়গা পেতেই আমার মনে হল, "আমি যদি ও দিকের জায়গাটি পেতাম আমার তাহলে বড় ভালো হত। ওদিকের মজা দাদা দেখতে পারে, আমি দেখতে পাবো না।" আর তখন উঠে সেদিকে যেতে না পেরে, যেখানে ছিলাম সেখান থেকেই ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলাম। এই সব ছোটোখাটো ব্যাপার আমি খুঁটিনাটি ভাবে বর্ণনা করে বলছি বলে হয়ত কেউ কেউ আশ্চর্য্য হবেন। কিন্তু মানুষের আসল স্বভাব জানতে হলে এই সব ঘটনায় অনেক সাহায্য হয়। ছেলেবেলায় এমন অনেক কিছু থাকে যা পরে বেড়ে বেড়ে মানুষের স্বভাবের অঙ্গ হয়ে বসে, মা-বাবা যদি সে সব তখনই উৎপাটন করে ফেলেন তবেই তা একেবারে নির্মূল হয়। ভালোমন্দ দুই ব্যাপারেই এই একই রকম হতে পারে, এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

যখন আমার নিজের জীবনকাহিনীটি প্রথম থেকে বলব বলে ঠিক করেছি, তখন বাল্যকাল থেকে আমার স্বভাব কেমন ছিল, কোন কোন ভালোমন্দ ঘটনার ফলে আমার স্বভাব তেমনটি হয়, সে সবই বলতে হবে। আমি আমার নিজের কথা বলছি বটে, কিন্তু আমি তো কোনো অদ্বিতীয়া নারী নই, কাজেই যা আমার কাহিনী তা অন্য দশজন স্ত্রীলোকেরও কাহিনী

বলে মনে করলে দোষ হবে না। আমার জীবনের কোনো কোনো ঘটনাই শুধু ভিন্ন হতে পারে। তবে সব নারীর জীবনস্রোত কেমন একই ধারায় চলেছে বললেও যেন ক্ষতি নেই। তাই, যতটা পারি সব খুঁটিনাটি-গুলিও লেখা ভালো ভেবে সেই রকমই লিখব ঠিক করেছি।

তবু রেলগাড়ীতে সে দিন যা যা হয়েছিল সে সমস্ত কথা এখন আর বলব না। দাদাতে আমাতে কতবার ঝগড়াঝাঁটি হল, আমি তার কাছে কতবার ক্ষমা চাইলাম, আবার অন্য কোন কারণে নিজের কথাটাই সত্যি প্রমাণ করতে তার সঙ্গে আবার ঝগড়া হল; আর কথায় বলে, তোতে আমাতে বনেনা, আর তোকে ছেড়ে চলে না—সেইরকম আবার দাদার কাছে মিষ্টি মিষ্টি কথায় কতবার আব্দার করলাম। ষ্টেশনে কোনো ফেরীওয়ালা এলেই অমনি আমি সুবুঝ আর সুন্দরী অবুঝ; দু'জনে মিলে মাকে জালাতন করি। যাঁরা আমার এই জীবনকাহিনী পড়বেন তারা নিজেদের ছেলেবেলার মনের ভাব স্মরণ করে এ সব বুঝে নিতে পারবেন। সেদিন আমার গোঁয়ারগোবিন্দের মতো হঠকারিতায় মা যে কত কষ্ট পেয়েছিলেন তা যদি বুঝতে পারতাম তবে কত ভালো হত, নিশ্চয়ই মাকে অত কষ্ট দিতাম না। সে দিন মার কত ভাবনাচিন্তা, সে যেন আজ দু'চোখে দেখতে পাচ্ছি। মার ক্ষীণ চেহারা, আর আমরা তাঁকে খুব বিরক্ত করলে তিনি যে দু'একটি বিরক্তিভরা কথা বলছিলেন তাতে তাঁর সে দিনের মনের অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছিল। এ সব কিন্তু আমি আজ দেখতে পাচ্ছি, সে দিন কিছুই মনে হয়নি। শুধু তাই নয়, দু'একবার মা আমার কথামতো কিছু না করলে তাতে তাঁর উপর রাগও করেছিলাম। কিন্তু—আচ্ছা, এখন থাক সে কথা। এখন আর সেজন্য মন কেমন করায় লাভ কী? এখন যাঁরা বেশ খোসমেজাজে আছেন তাঁরাও বোধহয় ছেলেবেলায় নিজের মা-বাবাকে যা কষ্ট দিয়েছেন তা মনে করে, কখনো কখনো দুঃখিত হন।

আমাদের ঠাকুরদাদার বাড়ি ছিল রেলের ষ্টেশন থেকে সাত আট কোশ দূরে; সেখানে যাবার রাস্তা বেশ ভালো ছিল। চারটে সাড়ে চারটের সময় আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। মা তখনই কৃষ্ণজীপন্তকে গরুর গাড়ি আনতে বললেন। ষ্টেশনের কাছেই থাকা যেতে পারে এমন বাড়ি ছিল না তা নয়। কিন্তু মা পরের বাড়িতে থাকতে ভাল বাসতেন না, তাই অত তাড়াতাড়ি করে গাড়ি আনতে বললেন। গাড়িও তক্ষুণি পাওয়া

গেল, তাই কোনো বাধা হল না। তবু কৃষ্ণজীপন্ত জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেপুলেদের না খাইয়ে-দাইয়ে যাওয়ার চেয়ে এখানে কেলকরদের বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে ভোরবেলা রওনা হলে হয় না?" কিন্তু মা সে কথা মোটেই কানে তুললেন না। বললেন, "কারো বাড়িতে গিয়ে দরকার নেই। খাবার-দাবার আমি সঙ্গে করে এনেছি, পরে ছ'টা সাড়ে ছ'টার সময় সেই তাদের পাতকুয়োর ধারে ছেলেদের খাওয়াব। সুন্দরীর জন্য পায়সও একটু রয়েছে।" এই বলে মা পুঁটলিপোঁটলা তুলে নিলেন। আমাদের বেড়ানোর সখ তো ছিলই, তাই আমরাও কিছু মনে করিনি। কৃষ্ণজীপন্ত গাড়ির ভাড়া ঠিক করে তাতে জিনিসপত্র তুলে দিলেন আর আমরা রওনা হয়ে পড়লাম।

কৃষ্ণজীপন্ত কিন্তু গাড়িতে চড়লেন না। বললেন, "এখন দিব্যি সন্ধ্যে-বেলা, আমি হেটেই চলি, একটু পর খালি হবে।" তাঁর কথা শুনে দাদাও ভাবল তাই করবে আর মার অনুমতি চাইল। মাও তাতে রাজি হলেন। তখন কি আর আমি থাকতে পারি? আমিও জিদ ধরলাম। মা দু'একবার ভাল ভাবেই বললেন, "না, তুই হাঁটতে পারবিনে, ওকেও আমি একটু পরে গাড়ীতে বসতে বলব।" কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা, জিদ ধরে বসলাম। তখন মার মুখে যে বিরক্তি আর রাগের ভাব দেখতে পেলাম তা এখনও দু'চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। "যা ইচ্ছে তাই করগে যা, আবার আমাকে জিজ্ঞেস করবি তো খবরদার", এই বলে মা আমাকে দূরে ঠেলে দিলেন আর সুন্দরীকে কোলে করে গাড়িতে উঠে পড়লেন। আমাকে ঠেলে দেবামাত্র আমি মাটিতে পড়ে গেলাম আর কান্না জুড়ে দিলাম। এত ব্যাপারের পর কোথায় পায়ে হেঁটে যাওয়া আর কোথায় কী? কৃষ্ণজীপন্ত চট্‌ করে আমাকে গাড়িতে তুলে দিলেন আর গাড়ি চলতে লাগল। দাদা বেশ আগে আগে আসছিল। পিছনে যে কী ব্যাপার হল তা ও মোটেই জানতে পারে নি বোধহয়। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণজীপন্তও আগে গেলেন। আমি গাড়ীতে বসে অনবরত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম। মা সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন নি চুপটি করে বসেছিলেন। সুন্দরী যখন খুব ঘুমে ঢুলে পড়ল তখন মা তাকে একপাশে শুইয়ে দিলেন। আমার কান্না চলছিলই।

এমনি করে প্রায় একঘণ্টা কেটে গেল। এমন সময় কী জানি কেন মা

আমাকে তাঁর কোলের কাছে বুকে টেনে নিলেন আর নিজেও কাঁদতে লাগলেন। আমি তখন একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম, আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল আর মার গলা জড়িয়ে চুপ করে রইলাম।

পাঁচ দশ মিনিট হতে না হতেই মা আমাকে বললেন, "যমু, এখনও তুই সব বুঝতে পারিস নে তো?" এই কথাগুলি বলবার সময় মার কণ্ঠস্বর যে কত ভারী হয়েছিল তা বলতে পাচ্ছি না। তখনকার কথা আমার মনে এমন গভীর দাগ কেটে বসে আছে যে ততটা তারপর কারো কথায় কখনও হয়নি। ঐ কথাগুলোয় মা যেন তাঁর মনপ্রাণ একেবারে ঢেলে দিয়েছিলেন। কিংবা যেন মার সমস্ত হৃদয়টি ছিঁড়ে এসে সেই কথাগুলির মধ্যে নেবে এসেছিল। সে ভাবনায় মার মন যে কত জলছিল তা যেন তাঁর কথার ভাবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে তো আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি, তখন বুঝতে পারলে কত ভালো হত। তা হলে তার পরেও মাকে যে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তা নিশ্চয়ই দিতাম না। অন্ততঃ খুবই কম দিতাম।

মার কথা শুনে আমি তাঁর গলা আরও জোরে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা দু'জনে কাঁদতে লাগলাম। বোধ হয় সকাল থেকে, কিংবা আগের রাত থেকে মার বুকে চেপে-রাখা সব দুঃখ একান্ত পেয়েই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বুক ফেটে বেরিয়ে এল। মনে হচ্ছিল যে পরে অনেক কথা বলবার ইচ্ছে মার ছিল। কিন্তু, বোধহয় এই একরত্তি মেয়ের কাছে কী বলা যেতে পারে মনে করে, কিংবা এ আমি যা নয় তাই করছি মনে করে, মা একেবারে মুখ বুঁজে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে আমাকে শুধু এইটুকু বললেন,—যমু, আমি কেঁদেছি-টেঁদেছি বলে ঠাকুরমাকে কিন্তু কিছু বলিসনে। তারপর অনেক সময় কেটে গেল। আমরা দু'জনে মুখোমুখি চেয়ে বসে-ছিলাম। এমনি করে এক সময়ে আমার ঘুম এল, আমি শুয়ে পড়লাম। এমন সময় কৃষ্ণজীপন্ত আমাদের গাড়ির কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কই গজপতিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিনে যে?"

"তার মানে?" মা ঘাবড়ে গিয়ে চীৎকার করে বল্লেন।

পথের বিপদ

প্রশ্নটি করবার সময়ে মার মুখের ভাব যা ভয়াবহ হয়েছিল তা দেখে সে ভদ্রলোকটি কী যে মনে করেছিলেন তা বলা যায় না। তবে তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বেরোলো না। সামনের দিকে গাড়িওয়ালা আপন মনে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছিল। বোধ করি ঘটনার সে কিছুই জানতে পারেনি। "মানে?" বলে চেঁচিয়ে মা থামেননি। চলন্ত গাড়ি থেকে নিচে লাফ দিয়ে, "চলুন, চলুন, ওকে খুঁজি" বলে, তাঁর আসবার অপেক্ষা না করেই মা সামনে ছুটে চললেন। যাবার বেলা কিন্তু, "যমু, সুন্দরী ঘুমিয়েছে, দেখিস," শুধু এই কথা বলে গেলেন। কৃষ্ণজীপন্ত এক মুহূর্ত ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি খুব জোরে কান্না জুড়ে দিলাম। কৃষ্ণজীপন্ত যে কখন মার পিছু পিছু গেলেন তা আমি একেবারে জানতে পাইনি। ইতিমধ্যে গাড়োয়ান পিছন ফিরে আমায় জিজ্ঞেস করল, "ও খুকী, কাঁদছিস কেন?" তাকে ভাল করে কিছু না বলে করুণ সুরে আরও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আমি বললাম, "জিজ্ঞেস করছ কী? দাদা আমার কোথাও নেই যে!"

"এ্যাঁ? আবার গেল কোথায়? আর দিদিমণিই বা কোথায় গেলেন?" তাকে কিছুই উত্তর না দিয়ে আমি শুধু কাঁদতে থাকলাম। তা দেখে তার কী মনে হল কী জানি। সে গাড়ী দাঁড় করিয়ে, বলদ দু'টিকে খুলে তাদের সামনে চারটি শুকনো ঘাস ফেলে দিয়ে নিজেও চলে গেল। আমার কান্নার জন্য আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। সেও চলে গেলে পরে এই গাড়ীতে দু'টি মেয়ে একলা কী করতে পারে, তা সে বেচারী স্বপ্নেও বোধহয় ভেবে দেখেনি। সে যখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে তখন আমি নিজেকে সামলে নিয়ে তাকে ডাকতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। তখন আর কী করা যায়? একেবারে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, পথে কোন মানুষ দেখা যাচ্ছেনা, কিংবা কারো আওয়াজও শোনা যাচ্ছে

না, এ হেন সময় আমি, এতটুকু একলা মেয়ে, মাঠে পড়ে রয়েছি! এখন সেই ঘটনা কেবল মনে পড়ছে, তবুও আমার দুচোখ বেয়ে জল না গড়িয়ে পারছে না। তবে সে সময় আমি কত যে কেঁদেছিলাম তা কি কেউ আন্দাজ করতে পারেন? আমরা, কচি মেয়েরা, রান্নাঘর থেকে মাঝঘরে বাতি নিয়ে যেতে হলেও কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আর সেদিন অতবড় প্রকাণ্ড মাঠে সব পোঁটলাপুঁটলি আর কাপড়চোপড় নিয়ে, আমি সেই এতটুকু মেয়ে, আর আমার পাশে সুন্দরী শুয়ে।

তখন সেই শৈশব-কল্পনায় নানারকমের ভয়ানক বিপদের আশঙ্কায় মন কেঁপে উঠল। কোথাও অল্প একটু আওয়াজ শুনলেই মন থরথর করে কেঁপে উঠত। শেষে আমার কান্না থামল, ভয়ে মন শিউরে উঠল আর গা জড়সড় হয়ে এল, পোঁটলাপুঁটলিগুলো এদিকে সেদিকে করে তাদেরই ওপরে উপুড় হয়ে, চাদর মুড়ি দিয়ে আমি যে কেমন করে শুয়ে পড়লাম তা আমিই জানি। বুক যা ধুক্‌ধুক্ করছিল। কোথাও একটু শব্দ শুনতে পেলেই মনে হচ্ছিল ওই কে এল বুঝি! এ বয়সে চোরের চেয়ে ভূতের ভয় হয় বেশি। আমি গায়ের চাদরটি পায়ের তলা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জড়িয়ে নিয়েছিলাম। অত বড় খোলা মাঠে গাড়ি দাঁড়িয়ে, কিন্তু আমি একেবারে ঘেমে উঠেছিলাম, তবুও গায়ের চাদর একটুখানি আলগা করতেও কি আমার ভরসা হচ্ছিল! তেমন অবস্থায় এক এক মুহূর্তও যেন এক এক ঘণ্টার মতো আর এক একটি ঘণ্টা যেন প্রহরের মত মনে হল। আমি তখন যে কত মানত করেছি তার ঠিক নেই। আমার মানতগুলি অবশ্য সব ছেলেমানুষের মানতের মতই ছিল। কোথাও দু পয়সার পেঁড়া, কোথাও বা দেড় পয়সার মিছরি কোথাও খন-নারিকেলের* পূজো—অবশ্য খন আর নারিকেল আমার খেলাঘরের। তা ছাড়া রোজ তুলসী গাছকে একশোবার প্রদক্ষিণ করব বলেও মানত করলাম। কিন্তু থাক সে কথা। কেন না, যদি তখনকার সব কুলকাহিনী বলতে আরম্ভ করি তাহলে সে

* খন-নারিকেল—মহারাষ্ট্রে সীমন্তিনীদের সম্মান করতে হলে তাঁদের আঁচলে এক বিশেষ রকমের চোলীর কাপড় আর তার সঙ্গে নারিকেল—শ্রীফল তুলে দেওয়া হয়। সেই বিশেশ রকমে বোনা রঙিন কাপড়কে মারাঠীতে 'খন' বলা হয়। খন ও নারিকেল আঁচলে তুলে দেবার সময় আগে সীমন্তিনীর কপালে হলুদ ও কুঙ্কুমের টিপ পরাতে হয়, খন ও নারিকেলের গায়েও আগে একটু হলুদ কুঙ্কুম দিয়ে তবে সে দুটি তাদের আঁচলে দিতে হয়—আর তারা আঁচল পেতে নেয়। দেবীকে পূজা দিতে হলেও এই বিশেষ চোলী কাপড় ও নারিকেল দেবীকেও দেওয়া হয়।

এক মস্ত রামায়ণ হয়ে বসবে। তাই, তারপরের ঘটনাগুলি বলতে আরম্ভ করি সেই ভালো।

আমি সেই গাড়িতে একলা, আর বেলা অনেক গড়িয়ে গেল। পাখীদের কিলি বিলি কম হতে হতে অন্ধকার বাড়ছে বলে আমার মনে হল। তার ওপর সে হতভাগা পাগলা গাড়োয়ানটা গাড়িখানাকে রাস্তার মাঝখান-টাতেই দাঁড় করিয়েছিল। হঠাৎ আমার কী মনে হল, পিছন থেকে অন্য একটি গাড়ি আসছে। আমি কান পেতে শুনতে লাগলাম। পিছন থেকে যা আসছে তা নিশ্চয়ই গাড়ি বলে আমার বিশ্বাস হতে লাগল। সে গাড়ি আমাদের মতই কারো হয়তো ভালো লোকের, কিন্তু তা না হয়ে যদি কোন খারাপ লোকের হয়, তবে আমার কী দশা হবে? আমি এই রকম ভাবছি, আর দেখতে দেখতে সেই গাড়িটি আমাদের গাড়ির পিছনে এসে দাঁড়াল। গাড়িটি এসে পড়েছে মনে হতই আমি চট্ করে উঠে বসলাম। আমি কিছু বলতে যাব এমন সময়ে সেই অপর গাড়িওয়ালা, "ও গাড়ি-ওয়ালা, ওহে গাড়িওয়ালা, এই চাষা কোথাকার গাড়ি সরিয়ে নে"—বলে চেঁচাতে লাগল।

তার কথা শুনেই আমি বললাম, "আমাদের গাড়িওয়ালা দাদাকে খুঁজতে গিয়েছে।" আমার এই কথা শুনে সে কী ভাবল তা সেই জানে। সে তার গাড়ি থেকে নেমে আমাদের গাড়ির কাছে এল, আর এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল যে গাড়িতে জিনিষ পত্রের বোঝা আর মানুষের মধ্যে এতটুকু মেয়ে আমি। সুন্দরী গামুড়ে গুড়িগুড়ি হয়ে শুয়েছিল, তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু সে গাড়িওয়ালাও তার গাড়িতে একলাই ছিল। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে সে কাঠ পৌঁছে দিতে গিয়েছিল আর শূন্য গাড়ি নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল।

আমাকে দেখে তার যেন দয়া হয়েছে এই রকম অভিনয় করে সে, আমি একলা যে, গাড়িওয়ালা কোথায় গেল, ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে লাগল। আমিও তাকে সব কথা বললাম। একেবারে আমরা বাড়ি থেকে বেরোনোর থেকে সুরু করে সব বলে দিয়েছি বললেও চলে। সে সব শোনবার ভাণ করে আমাদের পোঁটলা পুঁটলি হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখ্‌তে লাগল। একটা টিপে দেখে নিচে ফেলে, অন্যটা তুলে ধরে দেখে, একটু ভারি মনে হলেই সেটা খুলে দেখে—ভাগ্যের বিষয়

সুন্দরীকে সে হাতে পায় নি। তাকে সেই সব করতে দেখে আমি কেঁদে ফেললাম আর খুব জোরে, "এ কীরে বাবা, এ কী করছিস"—এই শুধু বলতে লাগলাম। অমনি আমার দিকে চোখ পাকিয়ে সে বলল, "চুপ কর্ ছুঁড়ি! নইলে ওই কুয়োয় ফেলে দেব।" আমি যতই চেষ্টা করি আমার কান্না থামে না। শেষে আমি মাকে, কৃষ্ণজীপন্তকে, গাড়িওয়ালাকে খুব জোরে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম। দু তিন ডাক দিয়েছি না দিয়েছি এমন সময় সে লক্ষ্মীছাড়াটা ঠাই করে আমার গালে এক চড় লাগিয়ে দিল আর, "চেঁচাচ্ছিস যে হারামজাদি," এই বলে আমাকে তুলে ধরল। তার চড়ের জোরে আমার দাঁত সির্‌সির্ করে উঠল আর জোরে ঠোঁটে বিঁধে ঠোঁট ফুটে রক্ত পড়তে লাগল। এর পর অবশ্য আমি চেঁচানো বন্ধ করলাম। কিন্তু, জোরে না হলেও আমার কান্না চলতেই লাগল। সে হতভাগা আমাকে তুলে, আমার হাত পা গুটিয়ে পোঁটলা করে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে ধপাস করে ফেলে দিল। আমার পায়ে একটি কাঁটা পর্য্যন্ত বিঁধে গেল। আর, "যদি বেশী চেঁচাবি তো আমি এইখানেই আছি, পাথর দিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে দেব হারামজাদি!" বলে সে চলে গেল। আমি তেমনই আর্তনাদ করে গোঙাতে গোঙাতে পড়ে রইলাম। সুন্দরীকে যেন তখন আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। জোরে চেঁচাবার তখন জোই ছিল না। কিন্তু সে রকম অবস্থায় আমি কতক্ষণ থাকতে পারি! আমি আবার জোরে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। নিজের হাতে কাঁটা তুলে ফেলে, ছুটে পালাবার জন্যে আমি উঠব, এমন সময় শুনি,— "যমু, ও যমু, কোথায় আছিস?" সেই শুনে আমার মন কত যে শান্ত হল আর আমি যে কত আনন্দ বোধ করতে লাগলাম তা আমি লিখে প্রকাশ করতে পারব না। দাদাকে আমি কত ভালোবাসতাম তা আমি তখন বুঝতে পেরেছি। আমি সেই একরত্তি মেয়ে, কিন্তু দাদার সাড়া পেয়েই গায়ে যেন কত জোর পেলাম।

"আমি এইখানে আছি"—বলে খুব জোর চেঁচিয়ে আমি তাকে জানিয়ে দিলাম। পরে কৃষ্ণজীপন্ত আর মাও ছুটে এসে, "আমি সেখানে কি করে গেলাম, গাড়িওয়ালা কোথায় গেল," ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। গাড়িতে পোঁটলাপুঁটলী ছড়াছড়ি দেখে, আর আমি নেই, সুন্দরী একলা জোরে জোরে কাঁদছে দেখে তারা মনে করেছিলেন, নিশ্চয়ই

কিছু অনর্থ ঘটেছে। আমি সব বলবার পর মা আমাকে বুকে তুলে নিলেন আর চেপে ধরে, "কী বুদ্ধিতেই না তোদের দু'জনকে ফেলে গিয়েছিলাম"—বলে জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন। তখন দাদা আর কৃষ্ণজীপন্ত ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আমাদের গাড়ির কাছে নিয়ে এলেন। পোঁটলাগুলির কিছুই হারায়নি দেখে সকলের বড় আশ্চর্য্য মনে হল। কৃষ্ণজীপন্ত আন্দাজ করলেন যে তাঁরা যখন জোরে কথা কইতে কইতে আসছিলেন আর আমাকে ডাকছিলেন, তখন সেই গাড়িওয়ালা তা শুনতে পেয়ে আর এখানে থাকা ভালো হবেনা মনে করে পালিয়ে গিয়ে থাকবে। খানিক পরে আমাদের গাড়িওয়ালাও এল। আমার মন কিছু শান্ত হলে আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু, দাদা তুই কোথায় গিয়েছিলি?" তাই শুনে দাদা হাসতে লাগল। শেষে হাসবার জন্য দাদা মার কাছে বেশ বকুনি খেল।

দাদার ব্যাপারটা তেমন বিশেষ কিছু নয়। সে আপন মনে সামনে এগিয়ে চলেছিল। আরও কয়েকজন পথিক তার সঙ্গে ছিলেন। কৃষ্ণজীপন্ত কিন্তু কিছু পিছে ছিলেন। ইতিমধ্যে পথিকদের একজন একদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ওই দেখো, চাষ পাখি।" দাদা কোন এক গল্পে শুনেছিল যে চাষ পাখির ডানদিক দিয়ে গেলে ভাল হয়। আর কী! অমনি আমাদের ছন্দ নারায়ণ সেই এক ছন্দেই মত্ত হলেন। অন্য পথিকরা আগে চলে গেলেন। সেই পাখিটি এ গাছ থেকে সে গাছ উড়তে উড়তে রাস্তা পেরিয়ে খুব দূরে চলে গেল। মশাই তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। অনেক বেলা হয়ে গেলো আর সে পাখিটি এদিক ওদিক করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজশ্রী সেটিকে অনেক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়িয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন তাঁর হুঁশ হল। তার পর ভোলা পথটি খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু সে কি সোজা কথা? ক্রমে ক্রমে পথ যেন আরও গুলিয়ে গেল। এদিকে কৃষ্ণজীপন্ত অনেক আগে দাদা চলেছে আর গাড়ী পিছন দিক থেকে আসছে মনে করে পথ চলছিলেন। কিন্তু শেষে দাদাকে দেখতে না পেয়ে, অথচ সে বেশি দূর যায়নি মনে করে তাকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সাড়া যখন পেলেন না তখন তাঁর মন আশঙ্কিত হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক দেখে, পরে তার মনে হল যে আর মাকে খবর না দিয়ে অমনি খুঁজে বেড়িয়ে কোন সুবিধা হবে না। কারণ, দাদাকে খুঁজতে খুঁজতে যদি দেরি হয়ে যায়, আর ততক্ষণে গাড়ি যদি ঠিকানায় পৌঁছে যায়, তাহলে

তাঁদের দুজনকে দেখতে না পেয়ে মার ভাবনার একটি কারণ হবে। তাছাড়া সে ভদ্রলোকটির কাণ্ডজ্ঞানের একটু অভাব ছিল। তিনি এসে মাকে হঠাৎ বলে ফেললেন। তখন আর কি বলতে? মা তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রাণাধিক ভালবাসতেন। টপ করে নিচে নেমে খুঁজতে আরম্ভ করলেন, দুটি মেয়ে ফেলে যাচ্ছেন বলে তাঁর মনেই হল না। তারপর গাড়িওয়ালাও চলে গেল। সকলে অনেকক্ষণ খুঁজলেন। কাছাকাছি যে ক্ষেত ছিল সেখানে গিয়ে কৃষকদের কাছে খোঁজ নিলেন। ছেলেটার কানের ভিকবালী* হয়তো ছিঁড়ে নিয়েছে মনে করে মা একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলেন।

ঠিক সেই সময় তাঁর মন ও প্রাণের ধন আমার দাদাকে দেখা গেল। একজন কৃষককে সঙ্গে করে সে আসছিল। কৃষকরা তাদের চতুঃসীমানার দশ যোজন দূরের গ্রামের এবং সেখানকার প্রধান প্রধান লোকের খবর রাখে। আমাদের দাদাও মুখচোরা ছিল না। যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে তাকেই সে আমাদের বাড়ির রাস্তা জিজ্ঞেস করছিল। একটি ক্ষেতে ধানের রাশির পাশে দুজন কৃষক বসেছিল, শেষকালে সে তাদের কাছে গিয়ে আমাদের বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করল। তাদের একজন দাদাকে, "তুমি কে? কোথাকার?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করতেই দাদা গড় গড় করে বাবার, ঠাকুরদার নাম সব বলে দিল। সেই কৃষকটি আমাদের বাড়ির খবর জানত। সে বলল, "চল, আমি তোমাকে গাড়ী ধরিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে সে দাদার সঙ্গে চলতে লাগল। তারপর কৃষ্ণজীপন্ত আর মার সঙ্গে তাদের দুজনের দেখা হল।

এইভাবে সব কথা বলাবলি হলে আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই পাতকুয়োর কাছে পৌঁছুলাম। সেখানে মা আমাদের খাইয়ে নিলেন। কৃষ্ণজীপন্তকেও খাবার জন্য খুব পেড়াপীড়ি করলেন। আমি মাকে যখন আমার সব মানতের কথা বললাম তখন দাদা হো হো করে হাসতে লাগল। আমি চটে গিয়ে বললাম, "অত হাসার কী হয়েছে? আচ্ছা, বেশ তো, আমি তোকে আর কক্ষণো বলব না।" আমার কথা শুনে সে আরও বেশী হাসতে লাগল আর আমাকে বলল, "ভাই যমু, যাই হোক, তুই শেষ পর্য্যন্ত

* মহারাষ্ট্রে সেকালে ছেলেদের ডান কানের উপরের দিকে ফুঁড়ে একরকম গহনা পরানো হত, সে গহনাটি বড় আংটার মত গোল হত আর তার উপরের দিকে দুটি মোতি আর নিচে একটি লোলক গাঁথা থাকত। ছেলেদের এই গহনাটির নাম ছিল 'ভিকবালী'। আজকাল আর কেউ ছেলেদের ভিকবালী পরায়না।

মেয়েরই জাত। চুপি চুপি কাঁদবি আর মানত করবি। আমি অমন কাঁদিনি। উল্টে ভিকবালীটা যাতে দেখা না যায় সেজন্য গায়ের এই চাদর দিয়ে কান ঢেকে বেঁধে ফেলে কায়দা করে রাস্তা দেখিয়ে দিতে বলেছিলাম।"

"ঢের হয়েছে থাক্। সেই আমার গাড়িওয়ালার মতো কোনো দস্যুর সঙ্গে দেখা হলে দেখতাম তোর কত কায়দা!"

"কক্ষণো না। আমাকে যদি সে তুলে ধরত তবে তার হাতে এমন জোরে কামড়ে দিতাম যে—ব্যাস্! তোর মতো কেঁদেই সারা হতাম না কি।"

"বেশ, বেশ! শুধু মুখে বল্লেই হল আর কী! যত মুখ ফট্টাই শোনো মশায়ের।"

"আহা হা, নিজে হচ্ছেন 'ভীতুর বগলে কুকুর ছানা', আর অন্যকে বলে, 'ওগো, মুখের কথা বোলো না'।"

দাদার এই কথা শুনে আমার খুব কষ্ট হল আর আমি মাকে বললাম, "ওমা, দেখ না ও কেমন করছে।"

মা আমাদের দুজনকেই চুপ করিয়ে দিলেন। শেষে দাদা মার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে জ্বালাতন করা ছেড়ে দিল। যথাসময়ে আমরা আমাদের বাড়িতে পৌঁছলাম।

আমরা আমাদের ছেলেবেলার অনেক কথা হয়তো ভুলে গিয়েছি কিন্তু বড় হবার পরে যখনই দাদার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে আর ছেলেবেলার গল্প করেছি, তখনই সেই প্রবাসের গল্প করিনি এমন কখনো হয় নি।

বিয়ে হলে ওঁর সঙ্গে যখন আমার বেশ ভাব হল, তখন একদিন পরস্পর ছোটবেলার গল্প বলা হচ্ছিল। আমি সেদিনকার কথা বলতে উনি বললেন, "বেশ তো। তা হলে চোরের হাত থেকে রেহাই পাওয়া এই রত্নটি আমি পেয়েছি আর কী!" সেই থেকে আমার নাম রেখেছিলেন চোরের হাতের রত্ন। দাদা এলেই সেই সব গল্প-গুজব চলত আর আমাকে লক্ষ্য করে পরিহাসচ্ছলে দাদাকে উনি বলতেন, "কিহে গণপত রাও, চোরেও যে রত্নটি নিয়ে গেল না, সেটি আপনি আমার গলায় বেঁধে দিলেন তো?"

ঠাকুরদা আর ঠাকুরমা

আগের পরিচ্ছেদে বলেছি যে শেষে আমরা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছলাম। তারপরে অবশ্য পথের বিপদের সম্বন্ধে ঘরেবাইরে পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে বেশ খানিক কথাবার্তা হল। কেউ বলে, "কী রকম মা! এই একরত্তি মেয়েটাকে ধু ধু মাঠে একলা ফেলে ছেলেটাকে খুঁজতে চলে গেল! ছেলেটাকে কি কেউ খেয়েছিল?" কেউ এ কথা কেউ সে কথা,—কিন্তু সবাই সেই এক ঘটনার কথাই বলছিল। কেউ বললে, "তোকে মা মোটেই ভালবাসে না। তোকে চোরে নিয়ে গেলেও কেউ কিছু মনে করত না।" —বলে আমাকে খুঁচিয়ে ক্ষ্যাপাবার চেষ্টা করছিল, আর আমি পাগলিও তাদের কথা শুনে সত্যি মনে করে ক্ষেপে যাচ্ছিলাম। এ রকম সময়ে দাদা যখনই কাছে থাকত, তখনই সে কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে বলত।

এমনি করে প্রথম প্রথম দু একদিন কেটে গেলে পরে বাড়িতে আর এক আলাদা খুঁতখুঁতি সুরু হল। মনে পড়ছে, ঠাকুরদা একদিন দাদাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে, "কীরে গমু, তুই কেন এখানে এসেছিস? হঠাৎ আসবার কী দরকার?"—ইত্যাদি জিজ্ঞেস করেন। সে বেচারী কী জানে? সে সোজা উত্তর দিল যে সে কিছু জানে না। আর সত্যিই আমরা ছেলেমেয়েরা কিছু জানতাম না। বৃদ্ধরা এই রকম সব কিছু খুব জানতে চান। কোন কিছু তাঁদের না জানিয়ে করা হয়েছে টের পেলেই তাঁদের একেবারে পিত্ত চড়ে যায়। বাবা আর ঠাকুরদা এঁদের কেউ কাউকে কখনো কোন বিষয়ে চিঠিপত্র লিখেছিলেন বলে আমার মনে নেই। তখন যে কারণে বাবা আমাদের চারজনকে বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন সে কারণটিও তিনি বোধহয় ঠাকুরদাকে লেখেন নি। ঠাকুরদা মনে করলেন, নিজে থেকে চিঠি পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলে ছেলেটা যে ভালো ভাবে উত্তর পাঠাবে তার নিশ্চয় কী? "যে কাজে আপনার কোনো কর্তব্য নেই তার খোঁজ করার দরকার কী?" বলে উল্টে জবাব দেবেন না

তারই বা ঠিক কি? এই রকম কি-যেন ঠাকুরদা ঠাকুমার কাছে বলছিলেন, তা আমি আড়াল থেকে শুনতে পাই। আর ঠাকুরদার ভয়ও যে অহেতুক তা বলা যায় না। আমি নিশ্চয়ই জানি ঠাকুরদা যদি বাবাকে চিঠি লিখতেন তাহলে ঠাকুরদা যে-ভাষায় বলেছিলেন ঠিক সেই ভাষায় না হলেও ওই রকমই কিছু উত্তর বাবা পাঠিয়ে দেবেন।

মাকে ঠাকুমা যে কতবার জিজ্ঞেস করলেন তার ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু, কি জানি কেন, মা শুধু এইটুকু উত্তর দিলেন, "আমি জানিনে। আমাকে বললেন, বাছাদের নিয়ে যাও, আর আমি চলে এলাম।" মার সে উত্তর শুনে আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমাদের আসবার কারণটি মা নিশ্চয় জানেন। অথচ মা ঠাকুমাকে কেন অমন উত্তর দিলেন! আমি দাদাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে দাদা বলল, "মা হয়তো সত্যি কোনো কারণ জানেন না, তাই ঠাকুমাকে ওরকম বলেছেন। যমু, যার সঙ্গে তোর কোনও সম্বন্ধ নেই তার তুই এত খবর রাখতে যাস কেন বলত। তোর জিভ বোধহয় একটু ভোঁতা, তাই তোর যেখানে সেখানে সব বিষয়ে কথা বলে বেড়াবার ইচ্ছা!" এই বলে দাদা সত্যি সত্যি আমার মুখ খুলে জিভ দেখল আর অমনি বলল, "আমি বলিনি তোর জিভ ভোঁতা, তাই তো তুই যা নয় তাই নিয়ে সব কথা বলতে পারিস।"

দাদার কথা শুনে আমার ভারি রাগ হল। আমি কি উৎসাহে তাকে বলতে গেলাম আর সে আমাকে এ কি বলল? বড় আশা করে যদি কারও কাছে যাই, আর সে যাচ্ছেতাই দোষ দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, তবে কে না রাগ করে? তাতে আবার আমার মত একটুকুতেই রাগ-করা মেয়ে হলে তো আর কথাই নেই। দাদার ওপর কত যে রাগ হল তা আমি বলতে পারি না।

আমি তাকে খুব বকলাম। কিন্তু সেও কি কম যায়! চুপ করে না থেকে, "তোর জিভ ভোঁতা" বলে আমাকে সে আরও ক্ষ্যাপাতে লাগল। দাদা যতই বার-বার এই কথা বলতে লাগল, আমারও ততই মনে হতে লাগল যে সত্যিই হয়ত আমার জিভ ভোঁতা। তাই মনে করে আমি আরও বেশী রেগে উঠলাম।

শেষে দাদা যখন আবার আমার মুখ খুলে জিভ দেখতে চাইল, তখন

আমি তাকে আমার মুখের ভিতর আঙুল দিয়ে জিভ দেখতে দিয়ে, এমন জোরে আঙুল কামড়ে দিলাম যে সে জোরে চেঁচিয়ে উঠল। তখন আমার মনে হল এবার মা নিশ্চয়ই আমাকে শাস্তি দেবেন। তাই আমি নিজেই চীৎকার করে কান্নাকাটি করতে করতে ঠাকুমার কাছে গেলাম। তিনি যখন, "কেষ্ট? কী হ'ল?" ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তখন শুধু, "আমাকে—দাদা—এঁ্যা—এঁ্যা—দাদা—এঁ্যা" এ ছাড়া আর কিছুই বললাম না। বেলা তখন দুপুর একটা, অনেক করে জিজ্ঞেস করেও যখন আমার মুখ ফুটে বেশি কথা বেরুল না, তখন ঠাকুমা দাদাকে বেশ করে বকে দিলেন। "ও লক্ষীছাড়াটা এমনি দুরন্ত! অন্য কার মতো আর হবে! ঠিক ওর মতোই চাল চলন হয়েছে আর কি! দাঁড়া, দুপুরে ওকে আচ্ছা করে দেখাব—আয়, তুই ঘুমো এখন", এই বলে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু বোধহয় আমার চঞ্চলতার জন্য তাঁর ঘুম আসছিল না। তখন কি জানি কি মনে করে ঠাকুমা আমাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেম, "যমু, বাছা, তুই জানিস তোর মাকে আর তোকে অমন হঠাৎ কেন এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল?"

হে পাঠক মহাশয়, আপনার প্রিয় ঠাকুমা কি কখনো আপনার কাছে এমন কিছু জানতে চেয়েছেন যা জেনেও আপনি বলেছেন জানেন না? ছেলেমেয়েরা বোধহয় যা কিছু শোনে, কিংবা যা কিছু দেখতে পায়, তা তাদের আদরের ঠাকুমাকে না বলে থাকতেই পারে না। তার ওপর ঠাকুমা যদি একটু আদর করে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আর তো কথাই নেই! সত্যি বলতে গেলে, আমি মোটেই কিছু ঠিক ভাবে জানতাম না। কিন্তু ঠাকুমার স্বরে এমন কি-যেন একটা ছিল যে তা শুনেই আমি যেন কেমন একটা বিশ্বাস পেলাম, আর আমরা সেদিন, ঠাকুরদার বাড়িতে আসবার আগের রাতে ভোরের দিকে বাবা আর মার মধ্যে যে-কথা শুনেছিলাম তা আমার মনে পড়ল। তাছাড়া গাড়িতে মা আমাকে বুকে চেপে ধরে হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিলেন, তাও আমার মনে পড়ল। তারপর আর কি? "আমি কেঁদেছি বলে ঠাকুমাকে বলিস নে" বলে মা যে আমাকে বারণ করে দিয়েছিলেন, সে সব আমি ভুলে গেলাম। ঠাকুমার গলা জড়িয়ে আর তাঁর পাশে শুয়ে আমি সেদিন

ভোরের বেলা যে-কথা শুনেছিলাম, আর তার পরে দুঃখে ব্যাকুল হয়ে মা যে কেঁদেছিলেন, সে-সব আমি ঠাকুমার কানে কানে গুন গুন করে বলে ফেললাম। তা শুনে সেই সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু ঠাকুমা আমাকে খুঁটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমি কিন্তু বেশি কিছুই জানতাম না, তাই ঘুরে ফিরে সেই একই কথা বলা ছাড়া আমি আর কি করতে পারি? আমি যা-সব বললাম তা শুনে ঠাকুমার প্রাণ যেন ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও যখন আমি বললাম, "আর কিছু জানিনে" তখন ঠাকুমা চট্ করে উঠে যেখানে ঠাকুরদা শুয়েছিলেন সেখানে চলে গেলেন। আমার মনে হল যে আমি যা-যা সব বলেছি তা এখন ঠাকুমা ঠাকুরদাকে বলবেন, আর তাই আমিও ঠাকুমার পিছু পিছু গেলাম। আমাকে তিনি আসতে বারণ করেন নি।

"দেখলে তো, মেয়েটি আমার কেমন চালাক। আমাকে সব বলেছে। নইলে তোমার ওই গণার কাছ থেকে···!" (আমাদের দুজনের সম্বন্ধে ঠাকুমা আর ঠাকুরদা যখন কথা বলতেন তখন এই রকমই হত। ঠাকুমা বলতেন, "মেয়েটি আমার! আর তোমার ওই গণা!" আর ঠাকুরদাও বলতেন, "আমার গণু! আর তোমার ওই ছুঁড়ি!")

"কী, কী ব' ্ছে? ও আবার কি জানে! না জানে ভালো করে কাপড় পরতে, না জানে নাকের পোঁটা মুছতে।"

"আহা হা, আর ছেলেটার বুঝি খুব আক্কেল! চোদ্দ বছরের ধাড়ি ছেলে, তবু ভাল করে চিঠিও পড়তে পারে না। গুণাজী পাটিল বলছিল কি-একটা কালেক্টারের রিপোর্ট না কি যেন পড়তে দিয়েছিল, তা পড়তেও পারেনি। আর মা এখানে আসবার আগে যা-যা হয়েছে সব আমাকে আগাগোড়া বলে দিয়েছে!"

ঠাকুমার কথার এই শেষের ভাগটা শুনে ঠাকুরদার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। আর আমাদের ভাইবোনের দোষ গুণ নিয়ে তর্ক বন্ধ করে, আমি কি বলেছি তাই শুনবার জন্য উৎকণ্ঠা দেখালেন। ঠাকুমা তো তাই বলতেই এসেছিলেন। তবু কিছুক্ষণ আমৃতা আমৃতা করে, শেষে আমি যা বলেছিলাম তাতে একটু মসলা দিয়ে সব বলে ফেললেন। সে-সব শুনে ঠাকুরদা মনে মনে খুব ভয় পেলেন। ঠাকুমাও আমার কথা ছেড়ে চিন্তামগ্ন হয়ে গেলেন। শেষে ঠাকুরদা বললেন, "ব্যাপার কী? ছেলেটা যে

আমাদের কিছুই জানায় না। আমরা কি ওর কেউ নই?" তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "যা তো যমু, মাকে এদিকে পাঠিয়ে দে। আর তুই যেন সঙ্গে আসিস না। বজ্জাত কোথাকার! মা-বাপের কথা আড়াল থেকে শুনে অমনি এসে একে বলেছে। আর আমি জিজ্ঞেস করলাম যখন তখন 'আমি জানিষে' বললি যে? যেমন ঠাকুমা তেমনি তার নাতনী! যা বেরো, মাকে পাঠিয়ে দে।"

ঠাকুরদার কথা শুনে আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। আমার পক্ষ নিয়ে ঠাকুমা কিছু বলতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু আমি কি আর সেখানে দাঁড়াই! আমি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে পিছনের উঠোনে যেখানে মা ছিলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে ডাল শুকোতে দেওয়া হয়েছিল, মা তা হাত দিয়ে নেড়ে দিচ্ছিলেন। ভয়ে ভয়ে আমি মাকে বললাম, "মা, মা, তোমাকে ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি একবার ওপরে ডাকছেন।" মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে মা, "কী, কেন?" বলে জিজ্ঞাসা করতে না করতেই আমি সেখান থেকে এক ছুটে পালিয়ে গেলাম। মা এ-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে কি বলব? মা যে এবার আমার ওপর খুবই রাগ করবেন তাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। একে তো আড়াল থেকে যা শুনেছি তা তাঁকে না বলে ঠাকুমাকে বলেছি, আর তার ওপর ঠাকুমাকে সব কথা বলতে স্পষ্ট বারণ করা সত্ত্বেও বলেছি।

মা যে এতে শাস্তি দেবেন মনে করব তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি যা করেছি তা অত্যন্ত নিন্দনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করি? ঠাকুমা যখন জিজ্ঞেস করলেন পেটে আর কিছু রাখা গেল না। যতক্ষণ ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেন নি ততক্ষণও যে কি করে আমি নিজের থেকে সব বলিনি, তাই আমার থেকে থেকে আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। কিন্তু অন্য ব্যাপারে মন মগ্ন ছিল তাই তখন আমার কিছু মনে ছিল না। মনে থাকলে সব ঠিক বলে ফেলতাম। তা ছাড়া ঠাকুমাকে বললে তিনি মাকে বলবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু নিশ্চয় জানতাম যে অন্য কাউকে, এমন কি মাকে বললেও, "সেদিনই কেন বলিস নি?" বলে মা নিশ্চয়ই বকতেন। যাই হোক, বড় একটা ভুল করে বসেছি। মার আজ্ঞা অমান্য করেছি, তিনি এখন নিশ্চয়ই রাগ করবেন। ঠাকুমা কাছে থাকতে শাস্তি অবশ্য পাব না, কিন্তু কি জানি? এখন কি করা যায়? আমি এক মহা ফাঁপরে

পড়ে গেলাম। মনে হল, আমার সকল বিপদের ত্রাণকর্তা আমার দাদা! সে হয়তো কোনো উপায় বলতে পারে। কিন্তু কি উপায়? তার সঙ্গে যে আজ বেশ ঝগড়া করে বসেছি। সে কি আজ আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলবে? নিদেনপক্ষে তার আঙুলে দাঁতের দাগগুলি ত সারা চাই? তা যতক্ষণ সারছেনা ততক্ষণ তার নিশ্চয়ই মনে থাকবে। কিছুক্ষণ এই কথা ভাবলাম। শেষে উঠোনে গিয়ে দেখি দাদা কুলের ডাল দিয়ে গাড়ী তৈরি করছে। তখন তার কাছে গিয়ে সে কিছু বলার আগেই আমি সব কিছু খুব মিনতি করে বললাম।

কিন্তু সে কি কম ওস্তাদ! আমার দিকে মোটেই না তাকিয়ে সে তার ডালপালা গুছিয়ে ছুরি তুলে নিল, আর সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হল। অমনি একটু এগিয়ে আমি তার হাত ধরতে গেলাম, কিন্তু আমার হাত সরিয়ে দিয়ে দাদা বলল, "যমু, আমি তোর সঙ্গে মোটেই কথা বলব না ঠিক করেছি। এখন আর মিষ্টি কথার দরকার নেই। এই দেখতে পাচ্ছিস আঙুলের ঘা? আর কক্ষনো তোর সঙ্গে কথাও বলব না, খেলবও না। ছাড় আমার হাত।" এই বলে সে তর্ তর্ করে চলে গেল। তখন আমার বড় দুঃখ হল আর আমি পাছ-দুয়ারের ডুমুর গাছের তলায় গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে কাঁদতে লাগলাম। সত্যি বলছি, দাদাকে আমি ঠাকুর-দেবতার মত মানতাম। সে যখন এত রাগ করল, আর যে-কাজ করে বসেছি তার জন্য মা যে নিশ্চয়ই খুব বকবেন এই কথা ভেবে মন যখন ধুক্ ধুক্ করতে লাগল, তখন আমার মতো বোকা মেয়ের চোখের জলে ভেসে যাওয়ারই তো কথা। অবিরল কান্না সুরু করে দিলাম। মন বলছিল যা করেছি তা নিশ্চয় ভালো কাজ নয়। তখন আমার ঠাকুরদা, ঠাকুমা আর মা কি করছে সে আর এক চিন্তা। কিন্তু সে চিন্তা এক মুহূর্তও মনে টিকল না। সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল দাদার আর মার রাগের। এই দুজনের রাগের ফলে যে-সংকটটি হয়েছে তা কি করে দূর করা যায়? আমি যে ডুমুর গাছটির নিচে বসেছিলাম সেই গাছতলায় ছিল একটি শিবলিঙ্গ, আর তার সামনে নন্দী আর শ্রীদত্তাত্রেয়র পাদুকা। সেদিকে দৃষ্টি যেতেই—পাদুকায় নাক ঘষতে ঘষতে আর প্রণাম করতে করতেই সারা হলাম। তখন যে কত মানত করেছি! আগের পরিচ্ছেদে বলেছি যে আমাদের মেয়েদের মানত

আর কিই না হতে পারে! মা তুলসীকে কতবার প্রদক্ষিণ করব, কোথাও খণ-নারকেল দিয়ে পুজো দেব, কোথাও দেড় পয়সার মিছরি বিতরণ করব, কোথাও রোজ তুলসী গাছে জল না দিয়ে জলগ্রহণ করব না, এই রকম যত সব মানত করলাম। বার বার প্রণাম করলাম। এভাবে সন্ধ্যে হয়ে এল, তবু আমার ঘরে যাবার সাহস হল না। কিন্তু অন্ধকার হয়ে এলে কি আর সেখানে থাকা যায়?

আমি উঠব এমন সময় শুনতে পেলাম মা "যমু" বলে ডাকছেন। মার রাগত স্বরের সেই ডাক শুনেই আমার বুক কেঁপে উঠল।

বুক কেঁপে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য্য কী? স্পষ্টাস্পষ্টি অপরাধ করেছি, তার জন্যে শাস্তি পেতে হবে তা নিশ্চয় জানি। চোর যেমন ভয়ে ভয়ে, কাঁপতে কাঁপতে বিচারকের সামনে যায়, সেই রকম এক পা দু-পা ফেলে আমি হাঁটতে লাগলাম। শুধু এই অসুবিধা ছিল যে মা দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। দরজার ভিতর দিয়ে যাই কি করে? সেখানে যাওয়া মাত্র চপেটাঘাত খেতে হবে। কিন্তু ভাগ্যের বিষয়, মা আমাকে আসতে দেখেই ভিতরে চলে গেলেন। আমি চুপটি করে আস্তে আস্তে দরজার কাছে গেলাম আর মা আশে পাশে কোথাও আছেন কিনা দেখবার জন্য আগে শুধু উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। তারপর মা সেখানে নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সটান ভিতরে গিয়ে বসলাম। ঠাকুমার পিঠ মানে ছোট ছোট নাতি-নাতনীদের আশ্রয়ের মজবুত দুর্গ। আমার তো মনে হল যে এখন আর স্বয়ং ব্রহ্মাও আমাকে শাস্তি দিতে পারবেন না। অন্যের কি সাধ্য?

সে সমস্ত দিনটি ঠাকুমার কাছে থেকেই সব কাজ কর্ম্ম চলল। এদিকে সেদিকে যাবার সুবিধা ছিল না। কারণ ঠাকুমাকে ছেড়ে একলা কোথাও গেলে মার কবলে পড়া সম্ভব ছিল। খাওয়া হওয়ামাত্র ঠাকুমার বিছানা পেতে, তাঁর চাদরটাই গায়ে মুড়ি দিয়ে আমি খাসা শুয়ে পড়লাম। ঠাকুমা যদিও আমাকে খুব ভালবাসতেন, তবু আমরা বেশীদিন একসঙ্গে থাকিনি বলে রাত্রে তাঁর কাছে শোবার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু সেদিনকার কথা সবই ছিল আলাদা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, সেদিন আমি আর কোনো স্বপ্ন দেখতে পাইনি, কেবল এক মা আর দাদার রাগ ছাড়া। আর ভোর বেলায় ঘুম ভেঙেই দেখি—ওরে বাবারে!—আমার গায়ে হাত দিয়ে মা বসে রয়েছেন। আমি জেগে উঠছি

দেখে মা আমাকে কত আদর করে বললেন, "যমু, বাছা, তোকে আজ পর্য্যন্ত যত শিক্ষা দিয়েছি তা একেবারে বিফল হয়েছে বলে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। একে তো ওসব কথা তোর মতো ছোট মেয়েদের শুনতে নেই! বেশ, যদিও বা শুনেছিস, তবে তা যাকে বলা উচিত তাকে না বলে অন্য কাউকে বলা কি ভাল? মা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম শুনেছিলি তো? এখন তোর এই এঁচোড়ে-পাকামিতে আমি মিছিমিছি মিথ্যেবাদী হলাম তো? বাছা, উনি যদি কিছু বলতে বারণ না করে দিতেন, তবে কি আমি অমনি একটা কিছু বলে কাটিয়ে দিতাম? বেশ, বলেছিস তো বলেছিস,—আমার তাতে ততটা দুঃখ নেই; কিন্তু বাছা অমন অভ্যাস যে বড খারাপ! তোর মনের গঠন যদি অমনি হয়ে যায়, তা হলে শ্বশুরবাড়িতে কি আর রক্ষে পাবি? এখন তো একেবারে কচি মেয়েটি ন'স! আমি যখন তোর মতো বড় ছিলাম তখন আমার বিয়ে হয়ে চার বছর পেরিয়ে গেছে। না, না, না! তুই যে এমন দুষ্টু হবি, তা আমি কক্ষণো ভাবিনি। এর জন্য তোকে অন্য কোনো শাস্তি দিচ্ছিনে, শুধু তোর সঙ্গে কিছু দিন আর কথা বলব না।" মার এ কথা শুনে আমার ভারি মন কেমন করতে লাগল। কেন না, আমি নিশ্চয় জানতাম যে, মা যা বলবেন তা না করে ছাড়বেন না। মা সে-সময় যদি আমাকে দু-চার ঘা প্রহার করতেন তবুও আমার ততটা দুঃখ হত না। কিন্তু আমার সঙ্গে মা কথা বলবেন না শুনে প্রথমে যদিও ততটা কষ্ট বোধ হয় নি কিন্তু পরে আমার বড্ড কষ্ট হয়েছিল।

এই যে তোমার হুণ্ডি

মা কত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তা আগে একবার বলেছি। কোন কাজ করবেন না বলে একবার স্থির করলে তারপর যাই ঘটুক না কেন নিজের মত পরিবর্তন করতেন না। আমার সঙ্গে কথা বলবেন না বলে সেই যে সঙ্কল্প করেছিলেন, তারপর পনেরো দিন ধরে তাঁর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ রইল। কথা বলতে আমি খুব চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে সব চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয়েছিল। ইচ্ছে করেই আমি ঠাকুমার সামনে মাকে উদ্দেশ করে কথা বলেছি, কিন্তু তিনি শুধু "হুঁ"র চেয়ে বেশী উত্তর দেননি। শেষে একদিন কি মনে করে সেই মাই আমার সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু যে বিষয়ে নিজের কোনো কর্তব্য নেই সে সম্বন্ধে কথা বলা ভালো নয়, অন্যের কোনো কথা শুনতে পেলে তা আর কারো কাছে গিয়ে বলা উচিত নয়, এই সব উপদেশই তিনি আমায় দিলেন। আর আমি যখন তাঁর উপদেশ মেনে চলতে বাধ্য হলাম, তখন আবার আমার সঙ্গে আগের মত কথা কইতে লাগলেন।

কিন্তু এখন আর আমি মাঝখানের কিছুদিনের ঘটনা বলব না। দু-মাস পরের ঘটনা দিয়ে সুরু করব। এ দু-মাসের মধ্যে একমাত্র পরিবর্তন হল এই যে, বাবা এসে চারদিন বাড়িতে রইলেন আর যাবার সময় মা, সুন্দরী আর দাদাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। দাদাকেও নিয়ে যেতেন না, কিন্তু তার ইস্কুল আর পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে তাকে নিয়ে গেলেন। কেবল আমাকে রেখে গেলেন। আমি যথেষ্ট কান্নাকাটি করলাম, কিন্তু আমার কথা কে শোনে? মনে হচ্ছে, আমার জন্য মাও খুব অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু বাবা কথা শুনলেন না। আমাকে ঠাকুমার কাছে রেখে চারজনে চলে গেলেন।

এতদিনে কি কি ওলট-পালট হয়েছিল তা আমি একেবারেই জানতে পারিনি, তবু আমার মনে হচ্ছিল বাবার চাকরি বোধহয় অনিশ্চিত। কারণ বাবা গেলে পরে দু-একদিন বাদে ঠাকুরদা ঠাকুমাকে বললেন,

"যেমন কাজ তেমন সাজা! এই যদি টাকাকড়ি না দিত? কিন্তু তা নয়! বড় চাকরি চাই! নাও এখন বড় চাকরি! এইটি রইলেই যথেষ্ট।" বাস্তবিক এ কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিনি। শুধু এই জানতে পারলাম যে বাবার চাকরি খোয়াবার সম্ভাবনা আছে।

বাবা চলে যাবার পর অনেকদিন পর্যন্ত কিছু ঘটেনি। দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছিল। সব যেন বেশ সুস্থির হয়ে গিয়েছিল। বাবার কুশল সংবাদ জানিয়ে চিঠিও এল। এ-দিকে পাড়াপ্রতিবেশীরা ঠাকুমার কাছে এসে, "এ যে তোমার হুণ্ডি গো! কবে বিয়ে দেবে? ঠিক বেলায় দিয়ে ফেল। হ্যাঁ, এইটুকু কনেটি বেশ দেখাবে। নইলে আজকাল দেখি যে ঘোড়ার মতো বড় বড সব কনে! কেউ দশ বছর বয়সের, কেউ-বা এগারোর গণ্ডি পেরিয়েছে। ওমা, আমি ক'দিন হল পুণা গিয়েছিলাম, আর দেখতে পেলাম একটি কনের চোদ্দ বছর বয়স! আ মরণ! কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড গো! মেয়েদের অতবড বয়স পর্যন্ত বিয়েথা না দিয়ে অমনি পুষতে মা-বাপের লজ্জাও করে না! গায়ে আঁচল[১] না দিয়ে কাপড় পরার জো ছিল না সে মেয়েটার। তুমি ভাই মেয়েটিকে অত বড় হতে দিও না। সেই ধাম্বুরীর[২] ফড়কেদের ছেলেটি বেশ। তার তেরো বছর বয়স। তাদেরও খুব ইচ্ছে ছেলেটার শীগগির বিয়ে দেয়, তাই তারা ভাল একটি মেয়ের খোঁজে আছে। দেখ না চেষ্টা করে, সেখানে বিয়ের সম্বন্ধ হলে বেশ হবে," ইত্যাদি বলত। আমাদের ঠাকুমাও তো তাদের একজন। তিনিও অমনি ওদের কথায় সায় দিয়ে এখানে সেখানে পাত্র খুঁজতে লাগলেন। দু-তিনবার আমাকে দেখতেও এসেছিল।

এখন আশ্চর্য মনে হচ্ছে, কিন্তু তখন সে সব আমার বড় কৌতুক মনে হত। আমাকে দেখতে আসবে বলে জানতে পারলে আমার বড় আনন্দ হত। আমি আমার ঘাগরা-চোলী[৩] পরিপাটি করতাম। ভাল করে কপালে সিঁদুরের টিপ পরতাম আর চুলটুল মোটেই উস্কো-খুস্কো হতে দিতাম না। আমারও মনে হত যে আমার শীগগির বিয়ে হয়ে গেলেই ভালো।

১ সেকালে ছোট মেয়েরা যখন শাড়ি পরত তখন গায়ে আঁচল না দিয়ে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে রাখত।

২ ধাম্বুরী—একটি গ্রামের নাম। ফড়কে—মহারাষ্ট্রে প্রচলিত এক পদবী।

৩ সেকালে মহারাষ্ট্রীয় কন্যাগণ—আজকাল সাড়ির নিচে যে রকম পেটিকোট পরে—সেইরকম কিন্তু বেশ লম্বা আর রং বেরংয়ের খণের ঘাগরা আর গায়ে চোলী পরিধান করত।

আশেপাশের বাড়ির যাদের বিয়ে হয়েছে এমন সাত-আট বছর বয়েসের মেয়েরা যখন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি, আর শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসা-যাওয়া করত, তখন তাদের আর তাদের গয়নাগাঁটী দেখে আমি বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতাম। তাদের মত গয়নাগাঁটি পরে, পিঠের ওপরে "নগগোণ্ডা"[১] দিয়ে সুশোভিত বিনুনি দুলিয়ে দুলিয়ে, মাথায় বিন্দি পরে, গলায় 'পুতলির মালা'[২] আর 'হরপররেওড়ার'[৩] মালা পরে আর তার মাঝখানটায় কয়লাটাকে পেটের ওপর দোলাতে দোলাতে, আর পায়ের বালা-পৈঁজনের সুরে তালে তালে চুমুক চুমুক করে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে খুব ইচ্ছে করত। আর নতুন বউ দেখতে এসে লোকে যেন আমাকে পতির নাম শোনাতে বলে, আর লজ্জায় অবনত হয়ে, মুখ ঘুরিয়ে কিন্তু মনে মনে খুশী হয়ে, বাইরে যেন নিরুপায় হয়েই পতির নাম করছি এমন অভিনয় করে, সেই প্রিয় নামটি উচ্চারণ করবার জন্য আমার মন কেমন উতলা হয়ে উঠত। অন্য মেয়েদের মত পতির সঙ্গে একপাতে খেতে বসে তাঁর মুখে ভাতের গ্রাস তুলে দেবার সুসময় কবে আসবে ভেবে আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম।

অত ছোট বেলায় আমার মনে সে রকম চিন্তা জন্মেছিল দেখে পাঠকগণ হয়তো আশ্চর্য্য হবেন। কিন্তু বাস্তবিক তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনো কারণ নেই। আমার নিজের জীবনধারা মনে করে, আমার যে বন্ধুদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে তাদের ব্যবহার দেখে আর তাদের কথা-

১ "নগগোণ্ডা"—বিনুনির এক গহনা বিশেষ। সেকালে মেয়েদের বিনুনিতে উপর থেকে নিচে শেষ পর্য্যন্ত সারি সারি সোনার এক বিশেষ রকম ফুল পরিয়ে শেষে রেশমী গুচ্ছ—গুচ্ছটিও উপরের দিকে সোনার পাটানে—বাঁধা হত। বিনুনির উপরের সেই সারি সারি সোনার ফুল-গুলির "নগ" এবং নিচের গুচ্ছটির "গোণ্ডা" নাম ছিল। এবং বিনুনির এই গোটা অলঙ্কারের নাম ছিল নগগোণ্ডা।

২ পুতলির মালা—সোনার চ্যাপ্টা গোল মুদ্রার মালা। (পুতলি—সোনার মুদ্রা) সকালে মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ স্বর্ণ মুদ্রার একরকম মাল্য বিশেষ গলায় পরতেন।

৩ "হরপররেওড়ার মালা"—একরকম ছোটজাতীয় আমলকিকে সেকালে মারাঠীতে হর-পররেওড়া বলা হত। আজকাল সেই জাতীয় আমলকিকে 'বারওল আঁওলা' বলে। সেই ছোট ছোট আমলকির মত সোনার মণি গড়িয়ে তার মালা গেঁথে মেয়েদের পরানো হত। মালার মাঝখানে সোনার কয়লার আকারে একটি মণি গাঁথা থাকত।

বার্তা শুনে, আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছি যে মেয়েরা বিয়ে, ছেলে-পুলে আর রান্নাবান্না ছাড়া আর কিছুই জানে না। একেবারে ছেলেবেলা থেকে আমি নিজের জীবনকে মনে করছি, কিন্তু আমার অন্য কিছুই মনে পড়ছে না। আমরা মেয়েরা মানুষের কথা বুঝতে আরম্ভ করি তিন চার বছর বয়স থেকে। তখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টা অনবরত শুনতে থাকি, "মেয়ে হয়ে অত লোক-দেখানো, রুচিবাগীশপনা কেন?" "কাল শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে," "হ্যাঁ, অমন আসন-পিঁড়ি করে বসিস নে," "মেয়ে জাতের অত আব্দার ভাল নয়," "লক্ষ্মীছাড়িগুলো কেন যে জন্মায় কে জানে," ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাগুলি কেবল নমুনা হিসাবে এখানে দিলাম, এর চেয়ে মর্ম্মভেদী কথাও আমরা সময় সময় শুনতে পাই। সে বয়সে মেয়েদের বুদ্ধি অবশ্য একেবারে সরল, তাই ওরকম কথার ফলাফল ততটা হয় না। তবু একেবারে যে হয় না তা নয়। প্রধানতঃ যত দূর হওয়া সম্ভব তা অবশ্য হয়। "মেয়েজন্ম অতিশয় ভাগ্যহীন। ছোট বেলায় পিতার, যৌবনে স্বামীর আর বৃদ্ধকালে পুত্রকন্যাদের সুখের জন্যই আমাদের জীবন। মেয়েজীবন আর সুখ—এ দুয়ের মিলন কখনো হতে পারে না। আমাদের কষ্টের সঙ্গে অতিশয় বন্ধুত্ব! আমরা মোটেই স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারি না," ইত্যাদি কথা আমাদের বুকে এমন সুস্পষ্ট ভাবে আঁকা হয়ে যায় যে আমরা নিঃসন্দেহে মনে করি ভগবান আমাদের কেবল পুরুষ জাতির সুখের জন্যই জন্ম দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের দুর্গতির জন্য যদি কেউ সহানুভূতি অনুভব করে তবে আমরা নিজেরাই তার বিরুদ্ধ পক্ষে দাঁড়াই। এ কথা যদিও সত্যি তবু আমাদের দুর্দ্দশা আমাদের অসহ্য হয় না, এমন নয়। "কারো হতে নেই স্ত্রী আর কারো হতে নেই চাকর," এ-কথা আমাদের মুখ থেকে হয় তো হাজার বার শুনেছেন। এই একটি কথায় যত গভীর অর্থ রয়েছে তত বোধ হয় অন্য কোনও প্রবাদে থাকতে পারে না।

যখন অন্য কোনো উপায় নেই তখন আমরা বিয়ে-থা, গয়নাগাঁটি, মিছিল ইত্যাদি ছাড়া আর অন্য কি বিষয়ে কথা বলতে পারি। সব সময় এই এক বিষয় নিয়েই আমাদের গল্প। অমুকের বাড়ির নিন্দা, অমুক মেয়ে মাথার খোঁপায় পেঁচের ফুল[১] পরেছিল, কে আজকাল বেশ বড় সিঁদুরের টিপ পরে,

১ সেকালে মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ একরকম সোনার ফুল খোঁপায় পরতেন। সেই ফুলের পিছনের দিকে পেঁচ থাকত আর সেই পেঁচ খোঁপার চুলের ভিতরে ঘুরিয়ে ফুলটি খোঁপার উপরে

সেই কাদের যেন মেয়ে চৌদ্দ বছরে পড়েছে, অতবড় হয়েছে তবু তার বিয়ে হচ্ছে না, এই সব অকারণ অনাবশ্যক বিষয় ছাড়া আমরা গল্প করবার বিষয় খুঁজে পাই না। আর পাবই বা কোথা থেকে? তিন-চার বছর বয়স থেকে "সামনে ছিল কোনা, তাতে ছিল গম, মা বাপে দেয়নি বিয়ে কার বা নেব নাম?"[১] এই রকম তো আমাদের শিক্ষা। যদি আমি একটুও মিথ্যে বলি তবে সকলে নিজের ঘরে চোখ মেলে চেয়ে দেখলেই জানতে পারেন।

ওপরে লিখেছি যে ঠাকুমা আমার জন্য পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন। ঠাকুরদা তাঁর স্বভাব-মতো ঠাকুমাকে বারণ করতেন, কিন্তু নিজেও কার ছেলে কত বছরের, কে ভালো, কে মন্দ ইত্যাদি খোঁজ নিতে আরম্ভ করেছিলেন। দু-তিনটি পাত্র তাঁর পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু ঠাকুমার পছন্দ হচ্ছিল না। আর দু-একটি পাত্র ঠাকুমা পছন্দ করেছিলেন, ঠাকুরদার মনের মত ছিল না। তখন দুজনাতে একদিন বেশ খানিক ঝগড়া বেধে গেল। ঠাকুরদা পূজোয় বসেছিলেন, কথা বলতে বলতে তিনি ক্ষেপে উঠলেন আর সামনের বাণটি[২] তুলে শাঁই করে ঠাকুমার দিকে ছুঁড়লেন। সেটা ঠাকুমার কপালে-টপালে লাগলেই হয়েছিল আর কি! কিন্তু তাঁর কপাল গুণে সেটা অপর দিকে রাখা শিলে ঠেকে ওলট খেয়ে অন্য দিকে ভেঙে পড়ল। তবুও ঠাকুরদার বকবকি অবিরাম চলছিল। তা দেখে ঠাকুমার খুব রাগ হল, উনুনের কাঠগুলি বাইরে টেনে ফেলে ঘটির জল উনুনে ঢেলে দিয়ে, পিছনের দুয়ারে গিয়ে কাঁদতে আর বিড়বিড় করে বকতে লাগলেন। এত সব হবার কারণও তেমন কিছু নয়। ঠাকুরদা একটি পাত্রের কথা বলেছিলেন, ঠাকুমা বলছিলেন যে সেটি ভালো নয়,

বসিয়ে দেওয়া হত। সেই ফুলের নাম ছিল "ফিরকিচে" ফুল। অর্থ পেঁচের ফুল। "ফিরকি" —পেঁচ।

১ নব বিবাহিত মহারাষ্ট্রীয় বধূ বিশেষ শ্লোকার্থের সহিত পতির নামোচ্চারণ করে শোনাত। এই প্রথা এখনও মহারাষ্ট্রে আছে। যাদের বিবাহ হয় নি সেই মেয়েরা কেবল মজা বলে উপরি নির্দিষ্ট শ্লোক মুখস্থ বলে শোনাত।

২ বাণ—এক রকম লম্বা, গোলাকৃতি, সাধারণতঃ অত্যন্ত ছোট ডিমের আকারের সাদা পাথর। এই পাথর শ্রীশঙ্করের প্রতিমূর্তি বলে মহারাষ্ট্রে পুজায় রাখা হয়। এই পাথরকে মহারাষ্ট্রে চলতি কথায় 'বাণ' বলে। মহারাষ্ট্রে তিন রঙের পাথর পুজায় রাখা হয়। লাল রংয়েরটিকে বলে গণপতি, এই পাথরটি নর্মদা নদীতে পাওয়া যায়। কালো রংয়ের পাথরটিকে শালগ্রাম বলে, এই পাথর গণ্ডকি নদীতে পাওয়া যায় আর সেগুলিকে বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি বলা হয়। এই সব রকমের পাথর ঘরোয়া পুজাঘরে রাখে—মন্দিরে নয়।

সেখানে বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে দরকার নেই। ঠাকুরদা বললেন, "তোমরা মেয়ে মানুষ, কিছু বোঝো না।" ঠাকুমা বললেম, "বাড়ির ভেতরকার অনেক কথা তোমরা পুরুষ মানুষরা জানতে পার না। সে শাশুড়ীটি হচ্ছে বড় কড়া, সে মেয়েটাকে কষ্ট দেবে।" এই রকম তর্ক আরম্ভ হল আর হতে হতে বেড়ে চলল। শেষকালে যা হল তা ওপরেই বলেছি। ঠাকুরদা মাথায় পাগড়ি পরে তর্ তর্ করে বাইরে চলে গেলেন। আর ঠাকুমা রেগে বিরক্ত হয়ে, রান্না ঘরে "ধাবলী"[১] পেতে শুয়ে পড়লেন। আমি পাগলীর মত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমার অদৃষ্ট ভালো তাই সেদিন সকাল সকালই ঠাকুমা আমাকে ভাত রেঁধে খাইয়ে দিয়েছিলেন। নইলে উপোস করে মরবার পালা আর কি! ঠাকুরদা আর ঠাকুমা দুটো পর্য্যন্ত উপবাসীই রইলেন।

শেষকালে দুজনের মনের মতো এক পাত্র পাওয়া গেল, আর সেখানে বিয়ে ঠিক করতে উভয়ে রাজী হলেন। তারপর ঠাকুরদা বাবাকে চিঠি লিখে পাঠালেন, তাতে তিনি অনেক করে লিখেছিলেন, কিন্তু পনের কুড়ি দিনের ভিতর তার উত্তর পর্য্যন্ত এল না। শেষে ঠাকুরদা নিজেই যাবেন বলে ঠিক করলেন ; রওনা হবেন এমন সময়ে বাবার চিঠি এল। তিনি লিখেছিলেন, "মেয়েটি ছোট এখনো, তা ছাড়া আমরাও এখন বিপদের মধ্যে। অতএব এখন বিয়ের কথা বিবেচনা করে দরকার নেই।"

বাবার এই চিঠি পড়া মাত্র কি যে হল তা কেমন করে বলি! দু-জনের গা যেন জ্বলে উঠল। তার বর্ণনা দেবার আর দরকার নেই। আমার বিয়ে অবিলম্বে হবে না বলে আমিও মনে মনে একটু দুঃখিত হলাম।

১ "ধাবলী"—এক রকম গরম কাপড় বিশেষ।

অত কি লিখেছেন

বাবার সেই চিঠিখানি আসবার পর বাড়িতে ঠাকুরদা আর ঠাকুমার মধ্যে রোজ ঝগড়া হতে লাগল। ঠাকুরদা ভাল-মন্দ অনেক কথা বলে প্রতিজ্ঞা করলেন যে আর কখনও ছেলের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। এ কথা লিখবার সময় পুরুষ জাতির একটি বিশ্রী অভ্যাস আমার মনে পড়ছে। সে বিষয়ে এখানে লেখা যদিও অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, তবু সেই সম্বন্ধে কখনো না কখনো আমার লিখতে ইচ্ছে ছিল, তাই এখনই লিখে ফেলেছি। কি জানি আমার এই আত্মজীবনী লেখা শেষ হয় কিনা! আশা করি তার জন্য পাঠকরা আমাকে ক্ষমা করবেন। সে বিষয়ে দাদার আর ওঁর সঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছিল। তখন তাঁরা দুজনে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে পুরুষরা মেয়েদের সমক্ষে কি বলতে হয় আর কি না বলতে হয় তা মোটেই বোঝেন না। কেউ কেউ রাগের কিংবা আনন্দের আতিশয্যে যেন আত্মহারা হন। তখন তাঁদের মুখে যে-সব নোংরা খারাপ কথা বেরিয়ে আসে তা বলতে কিংবা গালিগালাজ করতে কিংবা গাধার মত রসিকতা করতে তাঁরা মোটেই পেছপা হন না। এতে তাঁরা কিছুই অন্যায় বোধ করবে না। একদিন দাদা তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি উদাহরণ দিল। ওঁকে উদ্দেশ করে সে বলল, "কি বলব আপনাকে, বেশ প্রতিষ্ঠাবান এক ভদ্রলোক, ওকালতি করছে, কিন্তু নীচ, ছোট কথা বলতে তার মোটেই আটকায় না। নিজের মা বোনেদের সামনে, তার বাড়ির ভাড়াটেদের মেয়েদের সামনে, যা-খুসি যাচ্ছেতাই কথা বলতে থাকে। একজন ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে থাকেন, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে সে উকিল ভদ্রলোকটি বসেছিলেন। 'শিমগার'[১] দিন কাছে এসেছিল, কাজেই আর কি!

[১] ফাল্গুন-পূর্ণিমা, ফাল্গুনী। এই উপলক্ষে সেকালে মহারাষ্ট্রে রাত্রে রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রকাণ্ড হুতাশন জেলে উৎসব করা হত। মদন-ভস্মের কাহিনীর সঙ্গে সে উৎসবটিকে যুক্ত করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে দু-তিন দিন পর্য্যন্ত ঘৃণ্য ব্যবহার এবং অশ্লীল ভাষা পুরুষদের মুখে যেন উথলে উঠত। এই কদর্য্য ব্যবহারে ছেলে-বুড়ো সকলেই যোগ দিতেন। আজকাল এই প্রথা অবশ্য লোপ পেয়ে এসেছে।

সেদিনগুলি যে তার বড় আনন্দের দিন। আমি যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়েছিলাম সেখানে কম বেশি লম্বায় চওড়ায় সাত আট হাত হবে এমন একখানি ঘরে দু-তিন ভাই খেতে বসেছিলেন, তাঁদের স্ত্রীরা পরিবেশন করছিলেন। তাঁদের সবচেয়ে বড় বোন—তিনি বেশ প্রৌঢ়া—উনুনের কাছে বসেছিলেন। আর আমি আর সেই "দেড়-আক্কেলে"[১] লোকটি সেই ঘরেরই পিছনের দিকে কোনো রকমে জায়গা করে নিয়ে বসে গল্প করছিলাম। সে লোকটির হঠাৎ খেয়াল হল আর অমনি একজনকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল, তিনি উলটে উত্তর দেওয়া মাত্র সে এত নীচ, প্রত্যুত্তর করল যে তা বলা যায় না। কিন্তু যা হল তার জন্য সে কি একটুও লজ্জিত হয়েছিল মনে করেন? মোটেই না। উলটে তো সেই গর্দভ হো-হো করে হাসছিল। আমি এ ব্যাপার সহ্য করতে না পেরে উঠে চলে এলাম।"

এই ঘটনাটি বলবার সময়ও দাদা যেন রাগে জ্বলে উঠেছিল। দাদার মুখ দিয়ে কখনো অভদ্র এবং অসভ্য কথা বেরোয় না। তাই বাড়ির মেয়েদের সামনে এমন অসভ্য ব্যবহার দেখে তার রাগ আর দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। এই ঘটনাটির বিবরণ শুনে উনি এত চটে গেলেন যে বললেন, "গণপৎরাও, তুমি শুধু উঠে চলে এলে, আমি হলে সেই ভদ্রলোককে"—

ওঁর কথা শেষ না হতেই আমি মধ্যে অন্য কথা তুলে এ আলোচনা সেইখানেই শেষ করে ফেললাম। কারণ তেমন অসভ্য ব্যবহারে উনি যে কত ক্রুদ্ধ হতেন তার ঠিক নেই। তাই আমি মনে করলাম যে অকারণে মনস্তাপ করার চেয়ে গল্পের বিষয় বদলে ফেলাই ভাল। দাদা তা ঠিক বুঝতে পেরেছিল, এবং আমরা গল্পের ধারা বদলে ফেললাম। এ সব কথা আমি পরে বলতাম কিন্তু এখন মনে পড়ল তাই বলে ফেলেছি।

হায়, হায়, এই ঘটনার কথা লিখবার সময় আমার মনের অবস্থা যে কি হয়েছে তা কি কেউ বুঝতে পারবে? ওঁর সেই ক্রুদ্ধ মূর্তিটি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেই মূর্তিটি কি আর কখনো চোখে দেখতে পাব? বাছা যমুনা, তোর পোড়া কপাল, তার উপায় কি!

১ মহারাষ্ট্রে 'পণ্ডিত মূর্খ' লোককে "দেড় আক্কেলে" লোক বলা হয়।

ওমা! আমি এ কি পাগলীর মত লিখছি? আমার জীবনচরিত লিখতে বসবার সময় ঠিক করেছিলাম যেমন-যেমন ঘটনা ঘটেছে বরাবর ঠিক তেমনিই লিখে যাব, কিন্তু কি করি? মাঝে মাঝে মন উথলে উঠলে আর থাকতে পারি নে!

শপথ করবার সময় ঠাকুরদার সে নোংরা কথা লিখতে গিয়ে আমি কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি। পাঠকগণ, আপনারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করে দেখুন আমি যা পুরুষদের অভ্যাস বলে লিখেছি তা সত্য কি না। আমার পাঠকদের মধ্যে যাঁরা মহিলা, আমি জানি তাঁরা তো নিশ্চয়ই বলবেন যে আমার কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। নির্মল এবং খাঁটি মনের পুরুষরাও তাই বলবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। যেদিন এই দুঃশীলতা ও অসভ্যতা আমাদের সমাজ থেকে দূরীভূত হবে সেদিন হবে সত্যই সৌভাগ্যের দিন। উনি সদাসর্বদা বলতেন যে তার একটিই উপায় আছে—পুরুষদের সমাজে মহিলাদের প্রবেশ এবং তাঁদের মেলামেশা, যাওয়া-আসা বেশী হওয়া দরকার। আর আমিও ঠিক তাই মনে করি।

বৃদ্ধদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা টিকতে পারলে চিরকাল টিকে থাকে, তা না হলে অবিলম্বে লয় পায়, একথা মিথ্যা নয়। আমার ঠাকুরদা শপথ করে প্রতিজ্ঞা করবার পর সাত-আট দিন, হয়তো পনেরো দিনও হতে পারে, আমার বিয়ের নামটি পর্য্যন্ত করেন নি। ঠাকুমা অমনি শুধুই গজর-গজর করতেন, "আমার কথা কেউ যে কানেই তোলে না। মানুষের বুড়ো বয়স হলে নিজের পথে চলে যাওয়াই ভাল, তখন তাদের কেউ মানে না। বলে কি না মেয়েটা ছোট! ছোট কেন হবে অত বড় ঘোড়ার মত মেয়ে। এ-বয়সে আমরা বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে ঘরকন্না করছিলাম। না, না না। আজকাল এই ফাজলামি আর বাড়াবাড়িই হয়েছে কাল। এখন হয়তো কি মেয়েটা ফল দেখলে পরে বিয়ে দেবে? বেশ, যা হোক। আসবি নে তো আসবি নে। আমরাই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবো, তোর অত মোড়লি করতে হবেনা।" ঠাকুমার এই রকম বক-বকানি অবিশ্রাম চলত। এর উপর আবার যে সব মেয়েরা আসত বেড়াতে সবাই জিজ্ঞেস করত, "কই নমুর বিয়ে ঠিক হল তো?" এই সব মেয়েরাই তার মাথা খেয়েছিল। সবার মুখে এক কথা—সবাই এসে বলত, "হ্যাঁ, হাতে-পাওয়া পাত্রটি এবার ফসকে

যেতে দিও না। অমন ভালো পাত্র আর পাওয়া যাবে না। যৌতুক-চৌতুক দুশো-একশো বেশী চাইলে খুঁতখুত কোরো না। ভগবান তোমাদের কিছু কম দেননি। পাত্রটীও অত যৌতুক দেবার অযোগ্য নয়। সেখানে যত যৌতুক দেবে তা কমই বলতে হবে। সব রকমের আগাগোড়া গয়নাগাঁটী, বেশ কুটুম্ব-বৎসল লোক, শুধু "চিত্রাহুতি"[১] জোগাড় করে খেলেও মেয়েটার পেট ভরবে গো। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, ননদ, কোনোটাই তাদের কিছু কম নেই। তোমাদের মেয়ে আর তাদের ছেলে দুজনেই হচ্ছে শখের ধন। তাদের গিন্নী তো কিছুতেই এতটুকু অনটন হতে দেবে না, বুঝেছ, তাদের বাড়িতে এই একটি শুভকর্ম্ম হলে পরে আর আসছে দশ বারো বছরের মধ্যেও হবে না কিনা, তাই তাদের এত অনুরোধ। তা ছাড়া তাদের সেই বুড়িটা রয়েছে, তার চোখের সামনে একবার বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পারলেই হল, তাই তাদের অত অনুনয়।"

মেয়েদের মুখে এই রকম সব কথা শুনে ঠাকুমার মন ভারী অস্থির হয়ে পড়ত। "মুখ বেঁধে ঘুষির মার" খাবার অবস্থা। আমার বিয়ের সম্বন্ধে ঠাকুমা চারিদিকে সব বলে বেড়িয়েছিলেন। তাই পাত্রটি ঠাকুরদা আর ঠাকুমা দুজনের পছন্দ হওয়ামাত্র ঠাকুমা যথোচিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে বাবার সেই চিঠি এল। তখন তাঁর মন যে কেমন আকুল হয়েছিল তা কি বলা যায়? "আমাদের ছেলের চিঠি পেয়েছি, তাই এখন আর বিয়ের সম্বন্ধ করতে পারিনে"—এ বলাও যে মানহানিকর। সেকথা বললে অখ্যাতি হবে। লোকে বলবে, "ছি, ছি! তোমাদের ছেলে হয়ে তোমাদের কথা শোনে না!" ছেলে কি বাপমায়ের কথা বজায় রাখবে না? তবে কিছু বলতে যাবেন কি, তিনি সে বিষয়ের নাম পর্যন্ত করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বেচারির সবদিকেই আপদ! শেষে যখন তাঁর মাথা খারাপ হবার জোগাড়, তখন একদিন কি মনে করে তিনি ঠাকুরদার কাছে গেলেন আর একেবারে ছলছল চোখে বললেন, "লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারছি না, জানো? আগে গিয়ে পাত্র দেখে এসে দুজনের জন্ম-পত্রিকা পর্য্যন্ত মেলানো হল, আর এখন সেদিকের নামও

১ "চিত্রাহুতি"—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ খাবার সময়ে ঠাকুরের নাম করে অন্নের নৈবেদ্য দিয়ে, ছোট ছোট কয়েক গ্রাস ভাত পাতের বাইরে ডানপাশে মেজের তুলে রাখে। তাকে "চিত্রাহুতি" বলে। শহরে আজকাল এই প্রথা বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

করছ না, কি রকম কথা? ছেলেটার তাতে কি আসে যায়? তোমারই অখ্যাতি হবে। পরে এই রকম হবে তা আগে জানতে পেলে আমি এ ব্যাপারে মুখ ফুটে একটি কথাও বলতাম না। কিন্তু এখন আর চুপ করে বসে থাকা কি চলে? সত্যি বলছি, আমার মনে হচ্ছে বড় একটা ভুল করেছি। আমার মাথা খাও, আমি যে তোমার উপর নির্ভর করে সব করে বসেছি।" এই বলে, কি জানি কেন ঠাকুমা একেবারে কেঁদে ফেললেন।

তাই দেখে ঠাকুরদারও একটু কষ্ট হল। বোধকরি, ঠাকুমার মুখে "আমি যে তোমার উপর নির্ভর করে সব করে বসেছি" শুনে খুশি হয়েই তিনি বললেন, "ওগো, তুমি একটু সবুর কর। অত তাড়াতাড়ি কোরো না। সব তোমার মনের মতোই হবে। আমি সে বেটাকে এত ভয় করি নে! হয় আজ, নইলে কালই আমি তাকে লিখে পাঠাচ্ছি যে আমরা মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলছি। বিয়ের দিন ঠিক হলে তোমাকে লিখব। ইচ্ছে হলে তুমি সপরিবারে আসতে পার, না এলেও বেশ! আমরা নিজেরাই কুল-দেবতার পূজা দিয়ে শুভকার্য সেরে ফেলব। তোমাদের জন্য কিছু ঠেকে থাকবে না। তোমাদের মেয়েটিকে এখনও ছোট মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের তা হয় না। তোমরা যদি ভেবে থাকো যে মেয়েটি শুধু তোমাদের, আমাদের কোনো অধিকার নেই, তাহলে নিশ্চয়ই জেনো যে বড় একটা ভুল বুঝেছ। আপাততঃ মেয়েটি আমাদের কাছে আছে, আমরা ইচ্ছামতো ব্যবস্থা করব। তুমি নিজের ছেলেটির ব্যবস্থা তোমাদের যেমন ইচ্ছা করতে পার। 'মেয়েটি আমাদের' বলে লিখলে ব্যাটাচ্ছেলে আর কি করবে? চট করে এসে হাজির হবে, জানো? আর এই রকম চিঠি লিখতে আমি তার বাবাকেও ভয় করিনে।" ঠাকুরদার এই শেষের কথা শুনে আমার যা হাসি পেল তা সামলানো মুস্কিল হল। আমি খালি হাসতে লাগলাম। তাতে আবার ঠাকুমা যখন বললেন, "ওমা, ও কি কথা?" তখন আমার আরও বেশি হাসি পেল। ঠাকুরদাও সেদিন বেশ খোশমেজাজে ছিলেন বলে মনে হল। তিনিও আমার সঙ্গে হাসতে লাগলেন আর বললেন, "তার বাপকেও ভয় করিনে বললাম, তাই হাসছিস্, না? আমি কি মিথ্যে কথা বলেছি? বল্‌তো, আমি কি নিজেকে ভয় করি?" এই কথা বলে তিনি আবার আমার সঙ্গে হাসতে লাগলেন। তাঁকে তেমন হাসিখুশি আর

খোশমেজাজে দেখে ঠাকুমাও খুশি হলেন আর হাসতে লাগলেন। মোটের কথা, সেদিনটা বেশ আমোদে কেটেছিল। সন্ধ্যেবেলা পর্য্যন্ত কোনরকম খিটিমিট হয়নি কিংবা ঠাকুরদা আর ঠাকুমা কেউ কারো উপর রাগ করেননি।

মনে পড়ছে যে কোথায় যেন পড়েছি, খুব ঝড় আর বাদলের কিছুক্ষণ আগে হাওয়া অতিশয় শান্ত থাকে। অত্যন্ত বড় দুঃখের আগমনের কিছু পূর্বে এমন অভূতপূর্ব আনন্দ হয়। অনেকের মুখে শুনেছি যে আমরা যখন অভূতপূর্ব্ব আনন্দলাভ করি, তখন বুঝতে হবে যে সমুখে একটা বিপদ অপেক্ষা করে রয়েছে। আমি এ কথা অনেক দেখে শিখেছি। যেদিন এই আনন্দের ঘটনা ঘটেছিল ঠিক তার পরের দিন, ঠাকুরদা বাবার একটি চিঠি পেলেন, সেটি পড়েই তাঁর মুখের ভাব একদম বদলে গেল। ঠাকুমা কাছেই ছিলেন, তক্ষুণি জিজ্ঞেস করলেন, "কি লিখেছে?" কিন্তু ঠাকুমার মনে আমার বিয়ে ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তিনি মনে করলেন যে আগেকার মত এই চিঠিটাতেও বাবা কিছু লিখে থাকবেন, তাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, আবার কিছু অপমান করেছে নাকি? ধন্যি ছেলেটা যা হোক!"

সেকথা শুনেও ঠাকুরদা কোন উত্তর দিলেন না। তখন ঠাকুমা নিশ্চয়ই মনে করলেন যে চিঠিতে অন্য কিছু নেই, তাই আবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তখন ঠাকুরদা চটে উঠে আমার দিকে তেড়ে এসে বললেন, "কি পোড়া কপাল নিয়েই না জন্মেছে ছুঁড়িটা! যা, বেরো এখান থেকে। সারাদিন বড় মানুষের কাছে কাছে থাকতে চায়। যা বেরো বলছি; বেরোবি কিনা?" মাগো! সে কথা শুনে আমি এত ভয় পেলাম যে ঠাকুমার কাছে গিয়ে তাঁর আড়ালে লুকোতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ঠাকুরদা তা বুঝতে পেরে আমার হাত ধরে, আমার গালে চড় লাগিয়ে, আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দিলেন। আমি বেচারি গালে হাত বুলোতে বুলোতে বাইরে গিয়ে ভ্যা করে কাঁদতে লাগলাম। তবু আমার মনে হল যে আমার পক্ষ নিয়ে ঠাকুমা ঠাকুরদার সঙ্গে ঝগড়া করতে আরম্ভ করেছিলেন। কেন না খুব জোরে জোরে তাঁর আওয়াজ শুনতে পেলাম। "তোমার এতটুকু দয়ামায়া নেই। বলি, ও বেচারি মেয়েটির কি দোষ? একটিবার মাথায় পাথর দিয়ে মেরে ফেললেই পার।" তখন আমার মনে হল যে

বাবার চিঠিটা দূরে রইল আর ঠাকুরদা ঠাকুমাতে এই ঝগড়া সুরু হল। কিন্তু একটু পরে সব আবার শান্ত, সুস্থির হল। তবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঠাকুমা বাইরে এলেন না। আমার ঠাকুরদার সামনে যেতে ভরসা হচ্ছিল না। আর এদিকে ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছিল। তবু আমি অমনি বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুমার ডাক শুনতে পেলাম। তবু আমি চট করে তাঁর কাছে গেলাম না। আমি ভেবেছিলাম যে ঠাকুমা আমাকে নিশ্চয় বুঝিয়ে শান্ত করতে আসবেন আর সত্যি এলেনও। তাঁকে দেখে আমার কান্না আবার যেন টগবগিয়ে উছলে উঠল। ফোঁপানির যেন আর সীমা রইল না। ঠাকুমা, "মা আমার, মাণিক আমার, লক্ষীটি মা", বলে কত আদর করে আমাকে সেখান থেকে ওঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি খালি এঁ্যা, এঁ্যা, করে চলেছিলাম। শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে, "তবে বোস এমনি। উনিই আসুন আবার" বলে যেই চলে যেতে উদ্যত হলেন ওমনি আমি আরও জোর গলায় কান্না জুড়ে, দাপাদাপি করতে করতে তাঁর আঁচল ধরে তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। আবার খোসামোদ করে সে বেচারী আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছেন এমন সময়ে ঠাকুরদার আওয়াজ শোনা গেল। অমনি আমি একেবারে শান্ত হয়ে সুতোর মত সরল হয়ে গেলাম।

ঠাকুমা আমাকে স্নান করিয়ে দিয়ে, ঘাগরা চোলী পরিয়ে, লাড্ডু খেতে দিলেন। এ সব কাজ যদিও তিনি করছিলেন তবুও তাঁর মন মোটেই নিশ্চিন্ত ছিল না বলে মনে হচ্ছিল। দুপুরে খাবার বেলায় তা আমি বিশেষ ভাবে জানতে পারলাম, কারণ সেদিন দুপুরে ঠাকুরদা আর ঠাকুমা পরস্পরের সঙ্গে একটিও কথা বলেননি। ঠাকুমা শুধু একটিবার, "তবে, দুপুরবেলা, 'ওদের পাঠিয়ে দে' বলে উত্তর পাঠাচ্ছ তো?" এই বলে থামলেন। কেননা অমনি রেগে ঠাকুরদা কট-মট করে তাঁর দিকে চাইলেন। যদিও মুখ ফুটে একটি কথাও বলিনি আমি, তবু মনে মনে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম যে বাবা সেই চিঠিতে নিশ্চয় বিশেষ ব্যাপার কিছু লিখেছিলেন।

কিন্তু এখন থাক সে কথা। রোজ খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে পর কিছু না কিছু তর্ক ঝগড়া হয়ে ধাপুস ধুপুস হত। সেদিন তেমন কিছু হল না। সেদিন ঠাকুরদা খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু

সে ক্রোধের সঙ্গে যেন কোন দুঃখও মিশে ছিল বলে মনে হচ্ছিল। তাঁর ক্রোধ সেদিন যেন মনের ভিতরে ধূমায়িত হচ্ছিল। এ সব আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম। মুখ তুলে দেখবার সেদিন সাহস হচ্ছিল না।

দিনটা একরকম কেটে গেল, সন্ধ্যে হল। প্রতিদিনকার মত ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই দেখি যে ঠাকুমা উঠে বসেছেন। অত ভোরে ঠাকুমা কখনও উঠতেন না। বিছানার ওপর শুধু জেগে শুয়ে থাকতেন। বয়স হওয়াতে তাঁর ঘুম কমে গিয়েছিল তাই সকাল সকাল জেগে উঠতেন। কিন্তু সেদিনের মতো কখনো পায়ের উপর পা ফেলে নিশ্চিন্তে বসে থাকতেন না। নতুন ভাবে তাঁকে ওরকম বসতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ঠাকুমা, আজ অমন করে কেন বসেছিস বল্। বাবা কী লিখেছেন?"

আমি ঠাকুমাকে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তিনি মুখ বুজে রইলেন। আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি যদি কিছু জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করি, তবে ঠাকুমা আমাকে নিশ্চয়ই বলবেন।

আর সকলে কি ভাবে জানি না, কিন্তু আমি অনুভব করেছি যে ছেলে-মেয়েরা তাদের ঠাকুমাকে একটি পরম দেবতা বলে মনে করে। স্বয়ং মাকেও তারা ততটা ভালবাসে না বা বিশ্বাস করে না যতটা ঠাকুমাকে করে। তাঁকে কেউ কিছু দিলে তাঁর কাছে চাওয়ামাত্র সে জিনিসটি পাওয়া যায়। কেউ মারলে ঠাকুমার কাছে নালিশ করলেই কাজ হয়, আর যে মেরেছে সে বেশ 'বকশিস' পায়। কেউ চোখ রাঙালে কিংবা ভয় দেখালে "ঠাকুমাকে বলে দেব বলছি"—এই মহামন্ত্র জপ করলেই যত সব অকেজো লোক ভয়ে জড়সড় হয়, আর দোষ বা অপরাধ করে থাকলেও ঠাকুমা যে আমাদের দিক টেনে বিচার করবেন এই আমাদের বিশ্বাস। ঠাকুমার সৎগুণের এমন অনেক কথা বলতে পারি। বাড়িতে মিষ্টান্ন কিংবা ভালো খাবার দাবার হলে তার যতটা ভাগ সবার সামনে নাতি-নাতনীরা পায়, তার চেয়ে অনেক বেশী পায় আড়ালে, ঠাকুমার হাত থেকে। তাতে আবার যদি শুধু দু-একটি নাতি-নাতনী থাকে এবং তাদের একজন যদি বিশেষ আদুরে হয় তবে তার সৌভাগ্যের আর অভাব কি? সে নাতি-নাতনীর মতো আমোদ আর বিলাস আর কেউ উপভোগ করতে পারে না! আমাদের বাড়িতে যদিও বেশি কেউ ছিল না আর আমি ঠাকুমার কাছে একলাগাড়ে বেশীদিন থাকিনি, তবু আমি ঠাকুমার বড় আদরের ধন ছিলাম। প্রায় সকলেই যখন সে কথা বলত, তখন যদিও ঠাকুমা মুখে বলতেন যে, "তা কেন হবে? গনু, মনু আমার সবাই সমান," তবু স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যে তিনি ক্রমশ আমাকেই বেশী ভালবাসতে লাগলেন। তাতে আবার এমন মজা, নারীজাতির স্বাভাবিক

বুকভরা স্নেহ আমারও ছিল, তাই আমি তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতাম। এমন অনেক কারণে ঠাকুমা আমাকে, আমি ঠাকুমাকে, ভালবাসতে লাগলাম। তাই আমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুমা আমাকে তা নিশ্চয় বলবেন বলে আমার মনে হয়েছিল তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু উত্তর মোটেই পেলাম না। বোধহয় আমার কথা ঠাকুমা শুনতে পাননি মনে করে আমি অর্ধেক উঠে তাঁর কোলে মাথা রাখলাম আর হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, তাঁর মুখ নিচে টেনে এনে আকুল ভাবে তাঁকে বললাম, "ও ঠাকুমা, বল্‌না তুই এমন করে কেন বসে আছিস্? বাবা চিঠিতে কিছু খারাপ খবর লিখেছেন বুঝি?" তবুও উত্তর নেই। তখন আমার মুখ তাঁর মুখের আরও কাছে নিয়ে বললাম, এ কি ঠাকুমা, কথা বলছিস না কেন? বল্ না কেন এমন করে বসে আছিস?" এই কথা শুনে শেষে ঠাকুমা বললেন, "যমু বাছা, তুই ছেলেমানুষ। তোকে কি বলি বল্! চুপ করে শুয়ে না থেকে এখন থেকে কেন মা জেগে রয়েছিস্? ঘুমো চুপটি করে। শুধু এই বলে চুপ করলেন, আর গরম একফোঁটা জল আমার হাতে টপ করে গড়িয়ে পড়ল। তখন আমার মনে হল যে ঠাকুমা কাঁদছেন আর ভাবলাম নিশ্চয় কোনো বিপদ ঘটেছে।

ছেলেবেলা থেকে আমি বড় কৌতূহলী। আমার সামনে কিছু ঘটলে সে সম্বন্ধে পুরোপুরি জানতে না পারলে আমি একরকম অস্বস্তি বোধ করতাম। আমার মনে হত যে-কোনো উপায়ে সেটা জানতেই হবে। শুধু তাই নয়, যতক্ষণ তা না জেনেছি ততক্ষণ মন ভারি উদ্বিগ্ন থাকত। যা হয়েছে তা জানবার জন্য হাজার জনকে হাজার বেলা হাজার প্রশ্ন করতাম। কেউ তাড়িয়ে দিলেও নির্লজ্জের মত দাঁড়িয়ে থাকতাম, মনের উৎকণ্ঠা দূর হত না। শুধু বাইরে দেখাতাম বড় যেন রাগ করেছি। এখনও আমার স্বভাবের এই দোষটি কিছু কিছু আছে। হ্যাঁ, এই রকম অভ্যাসকে দোষই বলতে হবে। কেননা, কোনো অভ্যাস যদি মর্যাদার সীমা লঙ্ঘন করে আর মানুষ সে অভ্যাস দমন করতে না পারে, উল্টে নিজেই সেই অভ্যাসের কবলে গিয়ে পড়ে, তখন সে অভ্যাসটি দোষ হয়ে দাঁড়ায়। আমার এই দোষ দূর হবার কোনো কারণ ছোটবেলা থেকে হয়নি। অপর পক্ষে এমন সব ঘটনা হয়েছে যাতে এই দোষটি আমাকে বিশেষভাবে জড়িয়ে ধরেছে।

বাস্তবিক পক্ষে যাঁর আমার সঙ্গে জন্মাবধি সম্বন্ধ ছিল না তাঁর সদুপদেশের ফলে দোষটি দূর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে, সে দোষটি অনেক বেশী দৃঢ় হয়ে রইল। উনি সারাদিনে বাইরে কলেজে-টলেজে থাকতেন আর সেখানে ছোটখাটো যা কিছু ঘটত তা এসে আমাকে সব বলতেন। যে-সব ব্যাপারে আমরা মেয়েমানুষরা কিছুই আনন্দ পাই না কিংবা যার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারি না এমন কিছু আমাকে বললে আমি, হতভাগী তখন তাঁকে বলতাম—"যা তা ও-সব আমাকে বলে দরকার কি ?" অবশ্য সেটা শুধু বাইরে দেখাতাম। মনে মনে, 'আমার কাছ থেকে কিছু গোপন রাখেন না'-ভেবে বড় গৌরব অনুভব করতাম। কিন্তু ছেলেবেলার কথা লিখতে গিয়ে এসব পরের কথা এখনই কেন আমার মনে পড়ছে ? তার জন্য মনে যন্ত্রণা পাওয়া বই তো কোনো লাভ নেই।

এই কথাটাই বলতে চাই যে আমার স্বভাব মতোই সেদিন ঠাকুরমার সঙ্গে আচরণ করেছিলাম। ঠাকুমা আমাকে কি রকম উত্তর দিলেন তাও লিখেছি। তবুও আমি নাছোড়বান্দার মতো তাঁর গালে আমার গাল লাগিয়ে আরও আদর করে বললাম, "এ কি ঠাকুমা, তুই এমনি করে বসলে আমার ভাল লাগে না। বল্‌ আমায় কি হয়েছে।" যেন যা হয়েছে তা জানতে পারলে প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমার ছিল। তখনকার আমাদের দু'জনের ছবিটি যেন আমি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আর—হে ভগবান!—তেমন সুখের দিন আর কখনো দেখতে পাব না মনে করে যা দুঃখ হচ্ছে তা বলতে পারছি না। থাক সে কথা।

আমি অত স্নেহ-ভরে জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও ঠাকুমা বললেন, "কিছু না মা, কিছু না। তুই কিন্তু ভারি যা তা জিজ্ঞেস করতে চাস। চুপ করতে বললেই ছেলেমানুষের চুপ করে থাকা ভালো। শো' ভাল করে। আর ঘুম যদি না আসে তবে আমি 'ভূপালি'[১] গাচ্ছি শোন।

১ মহারাষ্ট্রে সেকালে বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষেরা ভোর বেলা উঠে, বিশেষ এক রকম প্রশান্ত সুরে ভগবানের জাগরণ স্তুতি-গীত গাইতেন। সেই প্রাতের সময় গাওয়ার স্তুতি-গীতগুলির নাম "ভূপালি"। "ঘনশ্যাম সুন্দরা, শ্রীধরা, অরুণোদয় ঝালা। উঠি লবকরি বনমালা, উদয়াচলি মিত্র আলা," (হে ঘনশ্যাম, সুন্দর, শ্রীধর, অরুণোদয় হয়েছে। হে বনমালী, শীঘ্র ওঠো, উদয়াচলে মিত্র সূর্য্য এসেছে। হোনাজিবাল নামক কবিবরের স্তোত্রটি মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত লোকপ্রিয়।

নইলে 'বেংকটেশ'[১] স্তোত্র গাচ্ছি শোন। এই বলে তিনি অমনি "উঠি লবকরি বনমালী, উদয়াচলি মিত্র আলা" বলে তাঁর প্রায় নিত্য-গাওয়া ভূপালিটি গাইতে লাগলেন।

ঠাকুমার মুখে ভূপালি শুনতে বড় ভালো লাগত। তাঁর গলা যে খুব মিষ্টি ছিল তা নয়, কিন্তু কোনো ভূপালি কিংবা ভক্তিরসপূর্ণ গান করবার সময় তিনি যেন তাঁর সমস্ত হৃদয়খানি তাতে ঢেলে দিতেন। আর মাঝে মাঝে তিনি আমাকে অর্থ বুঝিয়ে বলতেন। ভোরবেলা তাঁর ভূপালি গান করবার সময় হলে আমি জেগে উঠতাম। কখনো কখনো তিনি বেংকটেশ স্তোত্র বলে তার মানে আমাকে বলে দিতেন। সে সব আমার বড় মিষ্টি আর ভালো লাগত। কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করছিলাম তার উত্তর না দিয়ে যখন তিনি তাঁর ভূপালি সুরু করলেন তখন তা আমার মোটেই ভালো লাগল না। তাই আমি তাঁর ওপরে রাগ করে, গায়ের চাদরখানি মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়ে সব গায়ে জড়িয়ে গোঁ হয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ কেটে গেল তবু, "যমু, ও কি! অমন করে কেন শুয়েছিস? রাগ হয়েছে?"—বলে ঠাকুমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন না, ভূপালি গান গেয়েই চললেন। তখন আমার মনে হল যে ঠাকুমা বোধহয় আমার রাগ লক্ষ্য করেননি। তাই আমি তাঁর গায়ে ঘেঁসে নড়াচড়া আরম্ভ করলাম। বরঞ্চ আমার হাত পা গুটোতে আর গুড়িসুড়ি মারতে সুরু করলাম বলাই ঠিক হবে। কিন্তু শুধু, "এ কি! তাই, ভালো করে ঘুমো দেখি"—এর চেয়ে বেশী ঠাকুমা কিছুই বললেন না। কিন্তু ওই কথাগুলিই যথেষ্ট মনে করে আমি বললাম, "আমি না যা—আমাকে—ইয়ে আমি আর কক্ষনো কিছু জিজ্ঞাসা করব না।"

এমন সময় শুনতে পেলাম বাইরে থেকে কে যেন, "দুয়োর খোলো! দুয়োর খোলো। মা, ওমা, মাগো। ঠাকুমা, ও ঠাকুমা"—বলে ডাকছে। আমি সে কণ্ঠস্বর তক্ষুনি চিনতে পারলাম আর সে আনন্দে

১ "বেংকটেশ"—এঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে মানা হয়। দক্ষিণে 'তিরুপতি' বেংকটেশের মূর্ত্তিকে বড় পবিত্র বলে মানা হয়। সেখানে পর্বতের উপরে বেংকটেশের খুব জমকালো মন্দির আছে। ইঁনি কর্ণাটকীয় লোকদের কুলদেবতা। কিছু মহারাষ্ট্রির লোকও বেংকটেশকে তাঁদের কুলদেবতা মানেন।

রাগটাগ সব একদম ভুলে গিয়ে বললাম, "ঠাকুমা, ও ঠাকুমা, দাদা আর বাবা ডাকছেন।" আবার ডাক শুনতে পেলাম। তখন আর কোনো সন্দেহ রইল না। ঠাকুমা গিয়ে দুয়োর খুললেন আর সবাই ভিতরে এল। বাবা, মা, দাদা, শিবরাম আর কোলে সেই সুন্দর ঢেঁকি। তিন বছরের কাছাকাছি বয়স হয়ে এল, তবু দুষ্টুটা কোলে চেপে থাকত। তাদের সবাইকে হঠাৎ আসতে দেখে আমার বড় আশ্চর্য লাগল। কারণ, তারা যে আসতে পারে এ কথা আগে হয়নি। শুধু, "সবাইকে পাঠিয়ে দিতে তাকে লিখছ তো"—এইটুকু যা ঠাকুমা ঠাকুরদাকে বলেছিলেন, ব্যাস্‌ সেই কথামাত্র। কিন্তু আমার কি তা মনে ছিল? দাদাকে আসতে দেখে আমার খুব আনন্দ হল। আমি চট্‌ করে উঠে আমার ছোট্ট খোঁপাটি ঠিক করে আর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে তার কাছে গেলাম, আর বড় আদর করে সুন্দরীকে "আয়" বলে তার দিকে দুহাত বাড়ালাম। কিন্তু সে বেচারি ছিল ঘুমের ঘোরে, আর আমি তাকে "আয়" বলে ডাকছিলাম! সে তক্ষুনি ঘাড় নেড়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

তাদের আসতে দেখে ঠাকুরদা আর ঠাকুমা বোধকরি কিছুই আশ্চর্য মনে করেন নি। সম্ভবতঃ তাঁরা দুজনে ঠিক জানতেন যে একদিন না একদিন তারা নিশ্চয় আসবে। দাদা এলো বলে আমার খুব আনন্দ হল। আগে যে একরকম একলা মনে হত তার আর কারণ রইল না। আমি পাশের বাড়িতে খেলতে যেতাম সত্যি, কিন্তু দাদার কথাই আলাদা! সে স্বভাবতঃ বড় নকলপ্রিয় ছিল। তাছাড়া সে নানা রকমের খেলা আর কল্পনাতে নিপুণ ছিল। একটু একটু ছবি আঁকবার শখও তার ছিল। কোথায় কুলগাছের ফেঁকৃড়ি-কাঁটার গাড়িঘোড়া তৈরি করা, কোথায় কাগজের বেলুন বানানো, সে কি দু-একটা কাজ? সবটাতেই সে ভারি দক্ষ ছিল। আমাদের মেয়েদের খেলা, গুটি খেলা ইত্যাদিতেও সে যে ভারি নিপুণ ছিল। তার যখন তখন জিত হত আর সে আমাকে ঠাট্টা করত। তখন আমি তাকে বলতাম, "মেয়েলি টিয়া পাখী",[১] নয়তো "মেয়েদের দলে পুরুষ লম্বা"[২]। তখন সেও রাগ করত

১ মহারাষ্ট্রের চলতি কথার একটি প্রবাদ।

২ মহারাষ্ট্রীয় একটি চলতি প্রবাদের প্রথম লাইন। সমস্ত প্রবাদটি এই: "দারকত

আর আমিও রাগ করতাম। আবার খানিক পরে তার কাছে গিয়ে ন্যাকামো করে কথা বলতাম। এমন মজা সব সময় চলত। তবু আমরা দুজনে পরস্পরকে বড় ভালোবাসতাম। সে বড় বিচিত্র ভালোবাসা; নিজেরা ঝগড়া করতাম ঠিকই কিন্তু আমাকে যদি কেউ এতটুকু বকত তবে তক্ষুনি তেড়েমেড়ে এসে আমার পক্ষ নিয়ে দাদা তার সঙ্গে ঝগড়া করত। আবার দাদার বেলা তেমন সময় আমিও ঠিক দাদার পক্ষ নিয়ে পরের সঙ্গে ঝগড়া করতাম। মা সব সময়েই আশ্চর্য বোধ করতেন এই ভেবে যে, এরা ভাই-বোনে যখন তখন ঝগড়াঝাঁটি করে, কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে দুজনের মিল কি করে হয়?" মা আর ঠাকুমা একটি মজার গল্প বলতেন যে আমি যখন একেবারে ছোট, দেড় বছর-দুবছরের ছিলাম তখন নাকি দাদাকে কেউ বকলে আমি ভ্যাঁ করে কাঁদতে আরম্ভ করতাম। আর নাকি সেই মজা দেখবার জন্য অনেকে ইচ্ছে করে দাদাকে মিথ্যে মিথ্যে বকত। তখন আমি নাকি এমন কান্না জুড়ে দিতাম যে দাদা নিজে আমাকে সান্ত্বনা দিলে তবে আমি চুপ করতাম। ভেতরের কারণ কি ছিল জানি না, কিন্তু সত্যি দাদাকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, আর দাদাও আমাকে ততোধিক ভালোবাসে। বোধ হয় ভাইবোনের এত ভালোবাসা খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে কিছু গোপন রাখিনি। আমি কোথাও কিছু জানতে পারলে—সে একেবারে সামান্য কিছু হলেও—দাদাকে গিয়ে বলতাম, সেও তাই করত।

আমাদের সকাল বেলার খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে আমি দাদাকে আমার খেলাঘর দেখালাম। ঠাকুমা অনেকগুলি উনুন পেতে দিয়েছিলেন, হাঁড়ি করে দিয়েছিলেন, সে সব দেখালাম। বাবা, মা, সবাই হঠাৎ কি জন্য এলেন তা জানতে আমি বড় উৎসুক হয়েছিলাম। কিন্তু মা ঠাকুমা আশেপাশে আসা যাওয়া করছিলেন, তাঁরা শুনতে পেলে, বিশেষতঃ মা শুনতে পেলে, দাদার

"পুরুষ লাঘোড়া, ভাকুন খাতো কোঘোড়া," মানে, মেয়েদের দলে পুরুষ (লম্বা) ফিরংগী ভেজে খায় মুরগী। সত্যি বলতে গেলে প্রবাদটির তেমন কিছু অর্থ হয় না—তবে যদি কোনো ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সব সময় খেলা করে, তবে মেয়েরা তাকে মজা করে উক্ত প্রবাদটি বলে ঠাট্টা করে।

কাছ থেকে কিছু জানতে পারা দূরে থাকুক, আমি যেন কিছু জানতে না পারি এমন ব্যবস্থা হয়ে যাবে; আর কি জানি, আরও কিছু 'বকশিস' পেতে পারি, এই মনে করে আমি চুপ করে রইলাম। তার ওপরে বাবাও এসেছিলেন আবার। তিনি যে একেবারে জমদগ্নির অবতার! কি করতে পারেন আর কি না পারেন! তবু আমরা একটু এদিক সেদিক যাওয়ামাত্র সুযোগ পেয়ে আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম। তখন দাদা বললে, "যমু, কখন থেকে তোকে আমার বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মা আমাকে একেবারে চুপ করে থাকতে বলেছেন। কোথাও, কারু কাছে বলতে মা আমাকে বারণ করে দিয়েছেন। আর তোকে বললে, তুই যে কাকে বলে দিবি তার ঠিক নেই। তাই তোকে না বলাই ভালো।" এই শুনে, "আচ্ছা, বেশ, বেশ! দাদা তুইও এমন করতে আরম্ভ করলি তো? ভালো? ভালো হল!"—এই বলে খুব মিনতি করে আমি তাকে সেই এক কথা ধরে বসলাম। সেও যে সত্যি বলতে চাইছিল না, তা নয়। মজা দেখছিল। শেষে বলল, "আচ্ছা, বলছি তবে। কিন্তু ভাখ, যদি কেউ জানতে পায়, তবে আর কক্ষণো তোকে কিছু বলব না। শুধু তাই নয়, তোকে আমি এতটুকুও বিশ্বাস করব না।" এই বলে তিন তিন বার আমাকে সাবধান করে দিয়ে সে আমার কাছে এল আর এদিকে ওদিকে চেয়ে তার মুখ একেবারে আমার কানের কাছে ঘেঁষে যা বলবার তা বলল। দাদার কথা শুনে এমন অবস্থা কেন হল অবশ্য বুঝতে পারিনি, তবু যা হয়েছে তা নিশ্চয় ভালো হয়নি, এইটুকু বুঝতে পারলাম। সে বয়সে আমি যদিও ভারি হাঁদা ছিলাম, তবু আমার তখনকার মতো জ্ঞান আর বুদ্ধি সে বয়সের মেয়েদের চেয়ে কম ছিল না। দাদার কথা শুনে আমার মুখ ভার হল। আর দাদাও গম্ভীর হল। এক মুহূর্ত্ত আমরা ভাইবোনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে আমি বললাম, "এই পাকা?" দাদা উত্তর দিল, "না। এখনো ঠিক বলা যান না। কিন্তু সেদিন কুঞ্জী পন্ত মাকে বলছিলেন যে কিছু ঠিক নেই।"

সেই সম্বন্ধে আমরা আরো অনেক কথা বলতাম। কিন্তু ঠাকুরদা দাদাকে ডাকলেন তাই আমরা দুজনে বাড়ির ভিতরে গেলাম। দাদা আমাকে যা বলেছিল আমিও ঠিক তাই মনে করেছিলাম। আমার বয়সের হিসাবে আমার বুদ্ধি যদিও বেশ পাকা ছিল, তবু আমি তো সত্যি ছোটই

ছিলাম। আর সেই ছোট বয়সের উচিত মতো আমার মনও বেশ ভুলো ছিল। তাই অল্পক্ষণেই আমি যেন সব ভুলে গেলাম।

বাবা, মা, এঁরা সবাই আসার দু-তিন দিন পরে, কি জানি কেন, ঠাকুরদার ঘরে খুব জোরে ঝগড়া হচ্ছে বলে আমাদের মনে হল। আমি দাদাকে তাই বলতে যাব, এমন সময়ে শুনতে পেলাম বাবা খুব চেঁচিয়ে বলছেন, "আমার উপায় আমি দেখে নেবো। করেছি আমি, নিবারণও করব আমি।" ঠাকুরদার মুখও বন্ধ ছিল না। তিনিও জোরে ঠেসে কথা বলছিলেন। ব্যাপার খুব বেড়ে উঠেছে বলে মনে হল, এমন সময়ে মা আমাদের দুজনকে পিছন দুয়োরে ডেকে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে পাশের বাড়িতে চলে গেলেন। তখন আমি তাঁর অমন আচরণের কারণ বুঝতে পারিনি। মা নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে গিয়ে কখনো বসতেন না। কিন্তু সেদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে বসে থাকলেন, আর তাও আমাদের সঙ্গে নিয়ে।

এর কারণ আমি পরে বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। মা যেন এক অদ্বিতীয় নারী ছিলেন। তাঁর স্বভাবের সম্বন্ধে আগে একবার আমি লিখেছি বটে, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি আর নিপুণতা সত্যিই ভারি বিস্ময়কর। তাঁর মতো মহিলা আমি কখনো কোথাও দেখিনি। কোনো বিপদের সময়ে তিনি কখনও ধৈর্য্য হারাননি। আগাগোড়া ভেবে দেখে তিনি সব গুছিয়ে নিতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাবা তাঁর খুব প্রশংসা করতেন—অবশ্য যখন খোশমেজাজে থাকতেন। মা সেদিন বুদ্ধিমতীর মতই কাজ করেছিলেন। বাবা আর ঠাকুরদার মধ্যে তর্ক শুরু হলেই, পরস্পরের মুখ দিয়ে কি সব যে সাংঘাতিক কথা বেরোবে, সে ঝগড়া কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তার ঠিক ছিল না। সেরকম অশ্রাব্য নোংরা কথা যাতে আমরা ছেলেমেয়েরা একেবারে শুনতে না পাই, সেইজন্য তিনি আমাদের বাইরে নিয়ে যাবার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সত্যি, মা যত বুদ্ধিমতী, শান্ত ও দক্ষ ছিলেন, বাবা যদি তেমন হতেন আর সব সময় যদি মার কথা শুনে চলতেন তবে তিনি নিজে অতিশয় সুখী হতেন, আমরাও যে শিক্ষা পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী ভালো শিক্ষা পেতায় আর আমাদের অভ্যাসও অনেক ভালো হত। যা শিক্ষা পেয়েছি তা অবশ্য খারাপ নয়, কিন্তু সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। আমাদের বিদ্যা—আমার বিদ্যাই বা কি ছাই আর ভালো!

আমি ভালো করে ক-খ-গ-ঘও লিখতে পড়তে পারতাম না। মাঝে মাঝে কখনো ইস্কুলে গিয়ে দু'চার অক্ষর পড়তে শিখেছি এইমাত্র। কিন্তু দাদার বিদ্যা শিক্ষারই বা কি হাল! খেয়াল হলে বাবা তার নম্বর-টম্বর জিজ্ঞেস করতেন, নম্বর একটু কম হলে, "কেন?" বলে হয়তো খোঁজ নিতেন। তাঁর মেজাজ ততটা ভালো না থাকলে দাদা বেচারা দু'চারটা চপেটাঘাতও খেতো। এই রকম ছিল দাদার শিক্ষার অবস্থা। মা কখনও গায়ে হাত দিতেন না। তবু তাঁকে আমরা সত্যি ভয় করতাম। বাবাকে ভয় করতাম তাঁর হাতে মার খাবার ভয়ে। কিন্তু মাকে যে কেন ভয় করতাম তা বলতে পারি না। জীবন-চরিত লিখতে বসে মা আর বাবার বর্ণনা এখন পর্য্যন্ত তিনটিবার করেছি। কিন্তু কি করি? প্রসঙ্গ উঠলেই মার স্তুতি গান না করে আমি থাকতে পারি না।

যা হোক, অনেকক্ষণ পরে পাশের বাড়ি থেকে আমরা মার সঙ্গে ফিরে এলাম। তখন ঝগড়ার নাম পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। সন্ধ্যেবেলা বাবা বাইরে গেলেন। রাত্রে খাওয়াদাওয়া হল, কিন্তু বাবা আর ঠাকুরদা পরস্পরের সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে বাবা শিবরামকে ডেকে বললেন, "ওরে, আমরা কাল ভোরে যাচ্ছি,—একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে আয় আর সেটা এখানেই খুলে রাখতে বল। আর ভাখ, ঠিক তিনটের সময় উঠবি।" এই বলে তিনি ঘুমতে গেলেন। তিনি যাবেন বলে আমার কোন চিন্তা ছিল না, কিন্তু কি জানি, হয়তো দাদাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন এই আমার ভাবনা ছিল। কিন্তু যে কারণে দাদা আর মাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল সেটি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত তারা এখানেই থাকবেন ঠিক হল।

ভোর বেলা বাবা চলে গেলেন। শিবরাম সঙ্গে গেল। কিন্তু সে বাবাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল। সুন্দরীর জন্য আর বাড়ির অন্য কাজকর্ম করার জন্য বাবা তাকে রেখে গেলেন।

দাদার সংকল্প

বাবা চলে যাবার পর একমাস কেটে গেল। আমরা বেশ আনন্দে ছিলাম। দাদার ইস্কুল-টিস্কুল কিছু ছিল না। তবু মা তাকে লেখাপড়া করতে বাধ্য করতেন। আর আমাকেও কখনো কখনো, ঠাকুমাকে লুকিয়ে, তাঁর কাছে বসে লিখতে বলতেন। মার ভারি ইচ্ছা যে, আমি অল্পকিছু লিখতে-পড়তে শিখি। তিনি নিজে বেশ মারাঠি লিখতে-পড়তে পারতেন। 'পাণ্ডব প্রতাপ' ইত্যাদি স্তোত্র তিনি খুব ভালো পড়তেন, কিন্তু আমার তা মোটেই ভালো লাগত না। ঠাকুমার পিঠের আড়ালে লুকোবার সুযোগ না পেলে আমি দাদার কাছে বসতাম; কিন্তু মোটামুটি মাকে এড়িয়ে চলতাম।

বাবা চলে যাবার পর অনেক দিনের মধ্যে কোন চিঠি দিলেন না। ঠাকুরদার সঙ্গে ঝগড়ার ফলে তিনি চলে গিয়েছিলেন। আজ আসবে, কাল আসবে করে এক্‌মাস দেড় মাস পর্য্যন্ত কেটে গেল, কিন্তু না এল তাঁর চিঠি, না এল কোনো সংবাদ নিয়ে কোনো লোক। মা আর ঠাকুমার মুখ সব সময় বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত দেখাতো। ঠাকুরদা সব সময়ে একটা গোঁ ধরে বসে থাকতেন। কিন্তু তাঁর মুখের ভাবটিও বদলে গিয়েছিল। নিজে থেকে আর চিঠি লিখব না বলে তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন। বাবা যেমন একগুঁয়ে ঠাকুরদাও তেমনি! মা আর ঠাকুমা কিন্তু তাঁদের তেমন ব্যবহারে খুব কষ্ট পেতেন। রাত্রে মার চোখে ঘুম আসত না। আমার ঘুম ভাঙলে যখন হাতড়িয়ে দেখতাম, তখন দেখতে পেতাম যে মা হয়তো বসে রয়েছেন, নয়তো "যমু, কি চাস মা", বলে আমাকেই জিজ্ঞাসা করছেন। শেষে তিনি আর থাকতে পারলেন না। একদিন দাদাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে তার হাতে বাবাকে একখানি (যদিও খুব ছোট) চিঠি লিখে পাঠালেন। মা নিশ্চয়ই জানতেন যে যাবার আগে তাঁর ঠাকুরদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল তাই তিনি চিঠি পাঠান নি। কিন্তু যদি সাধারণ অবস্থায় তাঁর চিঠি না

আসত, তবে সে-কথা ছিল আলাদা। তা হলে মা ততটা কিছু মনে করতেন না। কিন্তু তখনকার অবস্থা ছিল বড় কঠিন! কি যে হতে পারে আর কি না হতে পারে তার ঠিক ছিল না। হয়তো—কিন্তু থাক্, নিজের বাবার সম্বন্ধে সে কথা কি করে লিখি?

চিঠি যাবার পর আরেকটা দিন গেল তবুও বাবার কোনো চিঠিপত্র এলনা, কোনো সংবাদের নামও নেই। সকলের মন কেমন যেন ছটফট করতে আরম্ভ করেছিল। আমি তো ছোটই ছিলাম—মানে একেবারে ছোট নয়—কিছু কিছু বুঝতাম—তবু বাবার চিঠি না আসায় আমিও কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। দাদা আমার চেয়ে একটু বড়, তাই তার বেশী কষ্ট হচ্ছিল। মা আর ঠাকুমার ভারি মনোকষ্ট হয়েছিল। কথায় যে বলে, মুখ বেঁধে কিলিয়ে মারা, ঠিক তেমন অবস্থা আর কি! যেন চোরের মায়ের কান্না! ডাক ছেড়ে কাঁদতেও পারবে না, আর সহ্য করতেও পারবে না। ঠাকুরদার কাছে বলতে হলে হয়তো ঠাকুমাই তা পারতেন। কিন্তু তাঁর ততটা ভরসা হচ্ছিল না। কেননা. সেদিন ঝগড়ার শেষে ঠাকুরদা অত্যন্ত নোংরা এবং অভদ্র গালি পেড়ে শপথ করেছিলেন যে তিনি আর কখনো ছেলের কোনো ব্যাপারে থাকবেন না আর মনও দেবেন না। এ আমি অনেক বছর পরে শুনেছি। তাঁর সেদিনকার কথাগুলি আমি পরে জানতে পেরেছি। কিন্তু সেগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করার যোগ্য মোটেই নয়। আমি তো লিখবই না। আর কেউ যদি কোনো বইয়ে তা লেখে তবে তাও খুব খারাপ কাজ হবে। আমাদের ঠাকুরদার মতো মুখর, উগ্রস্বভাব আর কথা বলার সময় সংযম হারিয়ে ফেলেন এমন বৃদ্ধ লোক অনেক আছেন। তাঁদের মুখ দিয়ে যে রকম কথা বেরোতে থাকে তা মনে করলেই ঠাকুরদা কি বলেছিলেন তা নিয়ে আন্দাজ করা যাবে।

অমন সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞা শুনে ঠাকুমার কি বাবাকে চিঠি লেখা সম্বন্ধে ঠাকুরদাকে কিছু বলতে ভরসা হতে পারে? আর মা যদি কিছু বলতেন তবে তার জন্য ঠাকুরদা যে চিঠি লিখবেন আর তিনি লিখলে বাবা যে তার উত্তর পাঠাবেন তারই বা নিশ্চয়তা কি? এই রকম দিশাহারা হয়ে, মা দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগলেন। কি করা যায় তা বোঝা মুস্কিল হয়ে উঠল। শেষে শাশুড়ি-বৌয়ে পরামর্শ করে শিবরামকে পাঠিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। আর যাওয়া আসার খরচা দিয়ে, দাদার হাতে-লেখা চিঠি দিয়ে

তাকে রওনা করলেন। চার দিন বাদে শিবরামের ফিরে আসবার কথা। তাই পাঁচদিনের দিন আমরা তার পথ চেয়ে বসে রইলাম।

সন্ধ্যা হয় হয়, ঠাকুমা কোথায় যেন বাইরে গিয়েছিলেন, দাদাও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। আমি অমনি, শুধু শুধু এ-দিক সে-দিক করছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় আমি একলা বসতে পারতাম না। কারো না কারো পাশে পাশে থাকতাম। তাই আমি মাকে খুঁজতে লাগলাম। তাঁকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। বাড়িতে অন্ধকার বাড়তে লাগল আর অন্ধকারে মাকে খোঁজা অসম্ভব হল। একলা ঠাকুরদা আঙিনায় বসে কি যেন করছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে যাবার যো-টি ছিল না। 'মা, মা' করে আমি অনেক ডাকলাম, কিন্তু কোথাও তাঁর সাড়া না পেয়ে নিরাশ হয়ে ঠাকুর-ঘরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি যে মা ঠাকুরের সামনে উবু হয়ে, দু-হাত জোড় করে একপাশে ধরে তাতে গালঠেসান দিয়ে, চুপ করে বসে আছেন। আমি আস্তে আস্তে তাঁর পিছনে গেলাম। আর পিছন দিক থেকেই তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, "মা, মা, তুই আজ এমন করে কেন বসে আছিস?" দেখি যে, তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাই দেখে চমকে, তাঁর গলা ছেড়ে দিয়ে আমি একপাশে সরে এলাম। কিন্তু মা একটি কথাও বললেন না। কিছুক্ষণ অমনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বোধহয় দাদা আর ঠাকুরদার সাড়া পেয়েই তিনি চট্ করে উঠে পড়লেন আর চোখ মুছে বাইরে গেলেন। তাঁকে দেখেই ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বৌমা, শিবরাম আসেনি? কি যন্ত্রণা!" মা শুধু, "কালকে আসবে'খন" বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

যা কিছু হোক্ না কেন, তখন আমার বড় বিশ্বাসের স্থান ছিল দাদা, আর দাদার বিশ্বাসের স্থান ছিলাম আমি। স্বাভাবিক ভাবেই আমি যা দেখেছিলাম তা দাদাকে বললাম। তাই শুনে দাদা বলল, "কালকেও যদি শিবরাম না আসে, তবে আমি ঠিক করেছি যে আমি নিজেই বাবার ওখানে গিয়ে সব দেখে এসে মাকে সান্ত্বনা দেবো। ছাখ্ যমু, আমাদের মার মত মা কি কোথাও আছে? আর, বাবা তাঁকেও অত কষ্ট দেন! এক ঠাকুরদার সঙ্গে ওঁর ঝগড়া হয়, তাই বলে মা, ঠাকুমা, আমরা কি করেছি বল? আমি দু'খানা চিঠি লিখে পাঠালাম, কিন্তু একটারও উত্তর পাঠিয়েছেন? আর যমু, তুইও দুষ্টুমি করে মাকে ভারি জ্বালাতন করিস।

মা সেদিন সুন্দরীর জামা ধুয়ে দিতে বললেন, তখন, 'আমি ধোবনা মা, যা' বলে বড় যে পালিয়ে গেলি?"

"তুইও তো বেশ দাদা, এত ছোটো-খাটো কথা মনে রাখিস? ওই কুশীটা আমাকে কতক্ষণ ধরে ডাকছিল তাই তার বাড়িতে যাবার তাড়াতাড়িতে হয়ত আমি ধোবনা বলেছিলাম, কিন্তু ঠিক সেইটুকু মনে রেখে তুই বেশ যে আমাকে বকতে আরম্ভ করেছিস। আর তুই বুঝি কক্ষনো মা কিছু করতে বললে 'না' বলিস নে?"

"না। আমি কখনও তোর মতো মাকে প্রত্যুত্তর করিনে। আর এখনকার মতো সময়ে তো কক্ষনো নয়।"

"বেশ, বেশ, হাজার বার দেখিয়ে দেবো।"

"দে, দে, দেখিয়ে দে দেখি!"

এই ভাবে আমাদের কথা কাটাকাটি সুরু হল। শেষে আমি একটু দম নিয়ে বললাম "আচ্ছা সে যাক্ গে। আজ থেকে আমরা দুজনে সংকল্প করব যে মাকে কক্ষন, কক্ষন এতটুকুও দুঃখ দেব না। আর মা কোনো কাজ করতে বললে লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ের মতো তা শুনব, তাঁর কথা কখনো অগ্রাহ্য করব না।" আমার এই কথা দাদারও পছন্দ হল আর আমরা দুজনে সেই শপথ করলাম। তারপরে দাদা যে পরের দিন বাবার ওখানে যাবে বলে ঠিক করেছিল সে সম্বন্ধে আমাদের কথা শুরু হল। দাদা বলল, "মাকে একবার বলে দেখব। তাঁর সম্মতি পাই ভালই। নইলে আমি অমনি যাব, ঠিক করেছি।"

"মার সম্মতি না নিয়েই?"

"হ্যাঁ"।

"আর টাকাকড়ি?"

"টাকাকড়ির কি দরকার? আমার কাছে আট আনা আছে। চার দিন খাওয়া-দাওয়ার জন্য সেই যথেষ্ট। আমি পায়ে হেঁটেই যাব।"

"আমি তোকে একলা যেতে দেব না। আমিও তোর সঙ্গে যাব।"

"পাগলী কোথাকার! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

দাদা সত্যি গেল

দাদার কথা অবশ্য আমি সত্যি বলে মনে করিনি। কাছে পয়সা কড়ি নেই, তাছাড়া ওইটুকু ছেলে অতদূর গিয়ে বাবার সংবাদই বা কি করে আনবে? কিন্তু আবার মনে হল, যদি দাদা সত্যিই যায়, তবে আমিও তার সঙ্গে যাব। তাই আমি দাদাকে বললাম, "ভাই দাদা, আমি তোর সঙ্গে যাব। আমরা দুজনে মিলে যাবো'খন।" আমার কথা পাগলামি মনে করে দাদা অনেকক্ষণ ধরে হেসেই গড়াগড়ি। হাসি যেন আর থামেই না। তাকে অত জোরে হাসতে শুনে ঠাকুমা এসে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "হ্যাঁরে, গণপতি, তোর হয়েছে কি? অত হাসবার মত কি হল?" আর আমি—"ছাখ্ ঠাকুমা," এই বলে দাদার যাবার কথা বলতে যাব, অমনি চোখ কট্-মট্ করে দাদা আমার দিকে চাইল, আর ঠোঁটে কামড় দিয়ে, চুপ করে থাকতে আমাকে ইশারা করল। অমনি আমি বললাম, "কিছুই নয় ঠাকুমা, দাদা, এমনি হাসছিল।" কিন্তু তাই শুনে কি ঠাকুমা সন্তুষ্ট হবেন? তাছাড়া দাদা চোখ পাকিয়ে, ঠোঁট কামড়ে, আমার দিকে যে তাকিয়েছিল তা বোধহয় ঠাকুমা দেখতে পেয়েছিলেন। কেননা, তিনি তক্ষুণি বললেন, "হ্যাঁরে, ওকে ঠাট্টা করে আবার ওকেই চোখ রাঙাচ্ছিস? দেখছি আজকাল তোর বড় বাড় বেড়েছে। রোস্, একদিন তোকে মজা দেখাব।" ঠাকুমা অত কথা বললেন, কিন্তু দাদা একটি কথাও বলল না। হয়তো আমি কিছু বলে ফেলব তাই আমাকে চিমটি কেটে, আমার দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল। তার সেই চাহনি যেন বলছিল, "হ্যাঁ, খবরদার, কিছু বলবি না।" এ-সব ঠাকুমা জানতে পারতেন না কিন্তু আমাকে চিম্‌টি কাটা মাত্র আমি "উঃ!" করে চেঁচিয়ে উঠলাম। অমনি ঠাকুমা শুনতে পেয়ে দাদার কান ধরে জোরে মলে দিলেন কিন্তু তবুও দাদার মুখ ফুটে একটি কথাও বের হল না।

ঠাকুমা আর ঠাকুরদাতে যেন আদা-কাঁচকলার সম্বন্ধ ছিল, তা এতক্ষণে পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। তাঁদের অভিরুচি, পছন্দ-অপছন্দ একেবারে উল্টো রকমের ছিল। ঠাকুমার আমার পক্ষ নেবার অনেক কারণ ছিল। তার প্রধান কারণটি বোধহয় এই যে ঠাকুরদা আমাকে অপছন্দ করতেন, আর ঠাকুরদা যে দাদাকে ভালবাসতেন তার কারণ ঠাকুমা আমাকে ভালবাসতেন। ঠাকুরদা কিছু বললে—তাঁর কথা সত্যি হোক কি মিথ্যা হোক—ঠাকুমার মত তার বিরুদ্ধে যেত, আর ঠাকুমা যা বলবেন ঠাকুরদা ঠিক তার উল্টো কথাটি বলতেন। ঠাকুমা বেচারি মেয়েমানুষ তাঁর কথা কে মানে? তবু ঠিক সময়ে তিনি নিজের জিদ ছাড়তেন না। সে-দিন দাদাতে আমাতে কি সামান্য ছেলেমানুষি কথাবার্তা হল, কিন্তু তারপরে তার পরিণাম কি সাংঘাতিকই না হল!

ঠাকুমা দাদার কান ধরে অত জোরে মলে দিলেন তবুও যখন দাদা একেবারে চুপ করে রইল, উঃ আঃ, পর্য্যন্ত করল না, তখন বোধ হয় চটে গিয়েই ঠাকুমা ঠাস করে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন। সেই চড়টি মনে হয় খুব জোরেই লেগেছিল, কেননা, দাদা তক্ষুণি চেঁচিয়ে উঠল। বাস্তবিক ঠাকুমা দাদাকে কখনো অমন মারতেন না। আজ পর্য্যন্ত তিনি তাকে অনেকবার বকেছেন, তাকে তিনি আমার মত ভালবাসতেন না কিন্তু কখনো মারেন নি। বোধ করি মানুষ একেবারে হতাশ হয়ে গেলে তার তারতম্য জ্ঞান থাকে না। ঠাকুমার অবস্থাও হয়তো ঠিক সেই রকম হয়েছিল। বাবার চিঠি আসেনি, তাই তাঁর মন একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিল। আর সেই উদ্বেগের বশেই তিনি দাদাকে মেরেছিলেন।

দাদার চীৎকার শুনতে পেয়ে ঠাকুরদা কি হয়েছে দেখতে ছুটে এলেন। আর যখন দেখলেন যে ঠাকুমা তাকে মারছেন, অমনি তাঁর দিকে তেড়ে এলেন। তাঁর মুখে গালাগালি তো লেগেই ছিল। দাদাকে ছেড়ে ঠাকুমা সেখান থেকে চলে গেলেও হত। কিন্তু তিনিও খুব চটে ছিলেন, রাগের বশে দাদার গালে আর একটি চড় হাঁকিয়ে দিলেন। ওই হয়েছে! তাঁর হাত খপ্ করে ধরে, সেটাকে জোরে ঝাঁকি দিয়ে ছিটকে ফেলে, ঠাকুরদা ঠাকুমাকে যাচ্ছেতাই গালি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন। ঠাকুমাও অমনি বেশি করে বকতে লাগলেন। তখন ঠাকুরদার মুখ যা শুরু করল তা বলা যায় না। শেষে আত্মহারা হয়ে হাত তুলে

তিনি ঠাকুমার গালেই ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিলেন আর বললেন, "লাথি মেরে পায়ের তলায় পিষে ফেলব, ফের যদি ওর কি আর কারো গায়ে হাত দিবি।" এখানেও কিন্তু ব্যাপার শেষ হল না। চোখ ফিরিয়েই তিনি আমাকে দেখতে পেলেন। আমার আগে থেকেই ভয় করছিল। আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম। বুড়োটাকে ঠাকুমার গালে চড় বসিয়ে দিতে দেখে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। "এ কি হল!" বলে মনে মনে আশ্চর্য বোধ করছি এমন সময় দেখি ঠাকুরদা আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাই দেখে আমার মনের অবস্থা যে কি হল তা কল্পনা করাই ভালো। আমি থর্ থর্ করে কাপতে লাগলাম। নিশ্চয় বুঝলাম যে আজ আর রক্ষে নেই। এই সব আমি যতক্ষণে লিখতে পারছি কিংবা তা পড়তে পাঠকদের যতক্ষণ লাগবে তার দশাংশ সময়ের মধ্যে সব ঘটে গেল। ঠাকুরদার দৃষ্টি আমার দিকে ফেরামাত্র ঠাকুমার কথা ছেড়ে আমার মন আত্মরক্ষার কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় ঠাকুরদার মুখে শুন্তে পেলাম, "এই ছুঁড়িটাই বোধ হয় সব কেলেঙ্কারির মূল। অপয়া মেয়ে কোথাকার!" আর তক্ষুনি কে যেন আমার হাত ধরে টেনে খুব জোরে গালে এক চড় বসিয়ে দিল। অমনি আমার কপালের পাশের দিকটা ঝন্ ঝন্ করে উঠল আর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। চারদিক যেন অন্ধকার হয়ে গেল। এইটুকই আমার মনে আছে। তারপর কয়েক নিমেষে কি যে হল তা আমার মোটেই মনে নেই। বোধ হয় আমার মাথা ঘুরছিল, কিংবা প্রথম চড় খাবার পরেই আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, তাই পরে আরও চড় খেয়ে থাকলে তা আমি জানতে পারি নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখি যে ঠাকুরদা আর দাদা সেখানে নেই। ঠাকুমা একলা মেঝের উপর পড়ে আছেন। তাঁকে তেমন অবস্থায় দেখে আমার যে কি মনে হল তা এখন ভুলে গিয়েছি, শুধু এই মনে আছে যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে গেলাম। তাঁর পাশে গা এলিয়ে দেবো এমন সময় তিনি আমায় দূরে ঠেলে দিলেন। তবু আবার আমি তাঁর কাছে গেলাম। এর চেয়ে বেশী আর কিছু আমার মনে নেই।

আজ যখন এ সব লিখতে বসেছি তখন সেদিনকার ছবি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কারণ, সেদিনকার সেই ঘটনার সম্বন্ধে পরে অনেকবার আমরা আলোচনা করেছি। দাদা আর আমি ঠাকুরদাকে

সে-দিনের ব্যবহারের জন্য অনেক দোষ দিয়েছি। তিনি আমাদের ঠাকুরদা, তাই আর উপায় নেই। অন্য কোনো বৃদ্ধের সেরূপ ব্যবহারের সম্বন্ধে যদি লিখতাম তবে তাকে নিশ্চয়ই পশু বলতাম। সমবয়সী স্ত্রী, তাতে আবার নাতি-নাতনীরা পাশে দাঁড়িয়ে! আর নাতি-নাতনীরা কাছে দাঁড়িয়ে না থাক্‌লেই বা কি? আর সেই ষাট-পয়ষট্টি বছরের বুড়ো তার সাতান্ন-অষ্টান্ন বছর বয়সের স্ত্রীর গালে অমনি ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল! আমি নিশ্চয় জানি যে আমি যা লিখেছি তা অনেকে মিথ্যে মনে করবেন, আবার অনেকে মনে করবেন এ-সব লেখা ঠিক নয়। কিন্তু করি কি? আমি নিজের জীবন-চরিত লিখছি; একেবারে সত্যি ঘটনা লিখছি। যা ঘটেনি তা আমি মোটেই লিখিনি আর কখনো লিখবও না। কেউ যদি আমার কথা অবিশ্বাস করেন, তাঁকে একবারই বলে নিচ্ছি, যে আমার এই কাহিনীতে মিথ্যে, সাজানো, কিংবা যা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিনি তার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করব না। কোনো কিছুই রং চড়িয়ে লিখবার ইচ্ছে আমার নেই।

এই ঘটনার পরে, রাত্রে, খাওয়া-দাওয়ার যা দুর্দশা হল তার বর্ণনা করে আর দরকার নেই। অতসব গোলমাল যখন চলছিল তখন মা যে কোথায় ছিলেন তা জানি না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি এসে ঠাকুমাকে বললেন, "চলুন, খেয়ে নেবেন, চলুন।" কিন্তু ঠাকুমা তাঁর কথা কানে তুললেন না। মা খুব অনুরোধ করলেন, ঠাকুমা তবুও জায়গা ছেড়ে উঠলেন না। ওদিকে ঠাকুরদাও খাবার নাম করছিলেন না। শেষে মা আমাদের দুজনকে খাইয়ে দিলেন। আমার বড় খিদে পেয়েছিল। ঠাকুরদার মার খেয়ে আর তার পরের ঘটনায় আমার বেশ পরিশ্রম হয়েছিল, আর তাই খিদের জ্বালা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমি ঘুমোতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দাদার পাশে গিয়ে শুতে এখন আমার বড় ভয় করছিল। আমি ভাবছিলাম যে, আমিই যখন এত সব অনর্থের মূল, তখন দাদা নিশ্চয় আমার ওপরে রাগ করে থাকবে। কিন্তু সে যখন আগে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল, তখন আমিও তার গায়ের চাদরের ভিতর ঢুকে পড়লাম, কিন্তু অপর দিকে মুখ করে শুয়ে রইলাম। দাদা একেবারে চুপ করেছিল, একটি কথাও বলছিল না আমি তাই বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তাই আমি খালি নড়াচড়া সুরু করলাম। কিন্তু দাদা কি কম জেদী। সে তার হাতও নাড়ল না। আমাদের মায়ের অধিকাংশ গুণই দাদা পেয়েছিল।

ঠিক মার মতই সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। দাদার এই গুণটি ছোটবেলায় যত স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেতাম বড় হবার পর ততটা দেখতে পাই নি। পরে যে-সব ঘটনা ঘটল আর যার প্রভাব দাদাকে পরিচালিত করল তার ফলে দাদার সেই ছেলেবেলার গুণ কমে গেল কি না তা বুঝতে পারি না।

যা হোক, সে-রাত্রে দাদা আমার সঙ্গে একটি কথাও বলল না, আর আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝখানে ক'টা বেজেছিল আমার ঠিক মনে নেই। আমি জেগে উঠতেই দাদা যে বাবার ওখানে যাবে বলেছিল সে-কথা আমার মনে পড়ল। অমনি, দাদা চলে গেল কি না দেখবার জন্য আমার হাত আপনা থেকে দাদা যেখানে শুয়েছিল সেখানে গেল, আর হাতড়িয়ে দেখলাম দাদা সেখানে নেই। ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম, "মা, ও মা, ও ঠাকুমা," আর খালি কাঁদতে লাগলাম। মা বোধ করি প্রতিদিনের মত জেগেই ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, "যমু, যমু, কি হয়েছে রে? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলি কেন বাছা? কাঁদবার কি হল!" কিন্তু শুধু 'দাদা' এই এক শব্দ ছাড়া অন্য কিছুই আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি। তখন মা চট করে বাতি জেলে দেখেন যে দাদা সত্যি বিছানায় নেই। এ কি ব্যাপার? আমি শুধু কাঁদছিলাম, অন্য কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আর শুধু—"দাদা! দাদা কোথায় গেল," এই রকম অস্পষ্ট দু'একটা শব্দ উচ্চারণ করছিলাম। শেষে মা ঠাকুরদাকে ডাকলেন আর বললেন, "গনু কোথাও নেই যে, ব্যাপার কি?" শুনে তিনিও বড় আশ্চর্য হয়ে সব জায়গায় দাদাকে ডেকে ডেকে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোথাও তার সাড়া পেলেন না। এমন সময় আমি যেন হুঁশ পেলাম, আর আগের দিন দাদাতে-আমাতে যা-সব কথাবার্তা হয়েছিল সে-সব আগাগোড়া মাকে বললাম। অমনি মাও সে-সব ঠাকুরদাকে বলে ফেললেন। ঠাকুরদা তখনই দাদার পিছুপিছু যাবার জন্য মাথায় পাগড়ি পরে, আমাকে "গাধা মেয়ে! আমাদের আগে কেন বলিসনি?" বলে, বকতে বকতে, দুয়োরের বাইরে চলে গেলেন। মা জোরে তাঁকে ডেকে বললেন, "কাউকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না?" কিন্তু ঠাকুরদা তা শুনতে পেলেন না, চলে গেলেন।

এসব যখন ঘটছিল তখন আমি যা ভাবছিলাম তা আলাদা। কিন্তু মার মন যে কত বিব্রত হয়েছিল তা আপনারাই ভেবে দেখুন। নানা

রকমের ভাবনা তাঁর মাথায় জট পাকিয়ে গিয়ে থাকবে। ছেলেটা গেল কোথায়, পথ হারিয়ে ফেলেনি তো, হয় তো কোথাও পড়ে-টড়ে গেছে, নয় তো তার কানের ভিকুবালীর* লোভে হয় তো কেউ তাকে ধরে ফেলে কিছু করেছে! কত সব আরও কি কি আশঙ্কা তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল। নিজের ছেলে যে সত্যি অতিশয় মাতৃভক্ত, সে যে তার মাকে অত্যন্ত ভালবাসে, ইত্যাদি মনে করে সন্তোষ বোধ করার সুযোগ তিনি বোধ হয় মোটেই পাননি। তাই দাদা যে তাঁর জন্যই বাবার ওখানে গিয়েছে সে-কথা তাঁর মনেও হয়নি। তিনি দাদার উদ্দেশ্যে মন প্রাণ যেন ঢেলে দিয়ে চেয়ে রইলেন। আমার ছোট বোন সুন্দরী কাঁদতে লাগল। আমি তাকে আমার কাছে টেনে নিলাম। কিন্তু সে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিল। মা তা লক্ষ্য করতে কিম্বা সে-দিকে মনোযোগ দিতেও পারছিলেন না।

ঠাকুমার অবস্থাও ঠিক সেইরকমই হয়েছিল, তিনিও কোন কথা বলতে পারছিলেন না। অনেকক্ষণ পরে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, আর শুধু বললেন, "এ-বছর আমরা যে কোন্ কোন্ বিপদে পড়ব তার ঠিক নেই। হে ভগবান, হে নারায়ণ, তুমিই রয়েছ, তোমাতেই নির্ভর করছি।" মা নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, কি আর করবেন!

এমনি করে চারিদিক ফরসা হয়ে এল। ঠাকুরদা যাবার পর অনেকক্ষণ হল। দাদার কোনো খোঁজই নেই, সে যে কখন বেরিয়ে গিয়েছিল তাও কেউ জানতে পারেনি। আজকাল মার রাত্রে ভাল ঘুম হত না। সেই তিনিও যে কখন ঘুমিয়ে পড়লেন আর দাদা কখন যে উঠে চলে গেল, তার কিছুই হদিশ করা যাচ্ছিল না। সব থেকে আশ্চর্যের কথা, একটা ছেলে ঘর খুলে বেরিয়ে গেল, কিন্তু তার অল্প একটু সাড়া পর্যন্ত কেউ পেলে না। কিন্তু তখন এত চিন্তা করার অবসর ছিল না। তাকে কখন দেখতে পাব, এই উৎকণ্ঠিত প্রত্যাশাতেই সকলে উতলা হয়ে উঠেছিল। আমার কিন্তু মনে পড়ল যে, কিছুদিন আগে দাদা পথ হারিয়েছিল, আর মনে হল যে তখন যেমন দাদাকে দেখতে পেয়েছিলাম ঠিক তেমনই তাকে আবার নিশ্চয়ই দেখতে পাব।

এই ভাবে সকাল আটটা বাজল। দাদারও খবর নেই, ঠাকুরদারও খবর নেই। মা আর ঠাকুমা কেঁদেই সারা। আমার যে কি অবস্থা হল

* ছেলেদের কানের এক রকম গহনা

তা আর বলা যায় না। সুন্দরী কি তখন বুঝত! কিন্তু সেও কান্নাকাটি করে গোলমাল বাধিয়ে দিল। তখন মা তাকে দুধ খেতে দিলেন। পাড়া প্রতিবেশীরা আর চাকর-বাকর এসে সমবেদনা দেখিয়ে বলতে লাগল,- "ছেলেটা কিন্তু গেলই বা কি করে?" "কেউ দেখতে পায়নি কি রকম?" "এই মেয়েটাই বা তার ইচ্ছের কথা রাত্তিরেই মাকে কিম্বা অন্য কাউকে বলে দেয়নি কেন?" মেয়ে পড়শীরা শুধু শুধুই হাহুতাশ করছিলেন।

দশটা বাজল, তবুও কারু পাত্তা নেই। হঠাৎ ঠাকুমার যেন মনে পড়ল, তিনি বললেন, "হতভাগা চাকরটাও এসে জুটছে না! আজ যে তার আসবার কথা। তার বোধহয় পথে গণুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, আর তারা দুজনে মিলে আসবে এবার। আর বেশী ভেবে দরকার নেই। কিন্তু এই পাগলা ছেলেটা বোকার মত গেল কি করে? অত রাত্তিরে বাইরে যেতে ভয়-টয়ও করল না! যখন বাইরে গেল, তখন জোছনাও ছিল কি না কি জানি।" মা কিছুই বললেন না। ঠাকুমা আমার দিকে চাইলেন। ঠাকুমার কথায় মা যদিও সান্ত্বনা পাননি, তবু আমি অনেকটা শান্ত হলাম। ভাবলাম, আসবার সময় শিবরামের সঙ্গে দাদার দেখা হবে, তার সঙ্গে দাদা ফিরে আসবে, আর আবার আমরা দাদাকে দেখতে পাব।

এই রকম মনে হবার নিশ্চয়ই আরও একটি কারণ ছিল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। যদি অত বেশী খিদে না-পেত তবে হয়তো এত অল্প সময়ের মধ্যে মনে আশার উদয় হত না। কিংবা হয়তো মনে আশা জাগামাত্র আমি খিদের জ্বালা বিশেষভাবে অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু সে সময় খিদে পেয়েছে বলা কি ভালো দেখায়? সুন্দরীর কথা আলাদা। খুব জোরে কান্না জুড়ে দিলেই সে কিছু-না-কিছু খেতে পেত। আমি কি তা করতে পারি? কাঁদতে সুরু করলেও, "ভাই হারিয়েছে, তাই বেচারী কাঁদছে" মনে করে লোকজন আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু যদি বলতাম যে আমার খিদে পেয়েছে, তবে কেউ হয়তো বলত, "কি পাজী, এ-দিকে নিজের ভাই হারিয়েছে, আর মেয়েটা খাবার অন্য ছট্‌-ফট্‌ করছে।" যাই হোক্‌, আমার ভাবগতিক বুঝতে পেরে ঠাকুমা আমাকে লক্ষ্য করে মাকে বললেন, "ওঠ্‌, ওঠ্‌, বৌমা, আর ভাবনা নেই। ছেলেটার নিশ্চয়ই শিবরামের সঙ্গে দেখা হবে আর সে ফিরে আসবে। কাজেই কোথাও থাকলে এতক্ষণে দেখা হয়ে তারা অর্ধেক রাস্তা ফিরেও এসে

থাকবে। মেয়েটাকেও তো দেখতে হবে, ওকে চুপ করতে বল্। বারোটা বাজতে চলল, আহা! বাছা সেই সকাল থেকে কিছু খায়নি। বাছা যমু, বাসি ভাত আছে, চল্ তোকে খেতে দিই।"

এই বলে ঠাকুমা উঠবেন, এমন সময় যে-শিবরাম চাকরের প্রতীক্ষা সকলে আমরা করছিলাম, তাকে কিছু দূরে দেখতে পাওয়া গেল। কিন্তু তার সঙ্গে দাদা নেই!

শিবরামের আগমন

শিবরামকে একলা দেখে সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড! আমি মাকে দাদার ইচ্ছার কথা বলেছিলাম, তাই সকলে মনে করেছিল যে সে বাবার ওখানে যাবার পথেই গিয়ে থাকবে। কিন্তু ভৃত্যটি সেই পথেই ফিরে আসবার সময় যখন তাকে দেখতে পায়নি, তখন দাদা নিশ্চয়ই সে-পথে যায়নি মনে হল। আর গিয়ে থাকলে মাঝখানে রাস্তাটি যেখানে দুভাগ হয়েছে সেখান থেকে নিশ্চয় ভুল করে দাদা অন্য রাস্তা দিয়ে গিয়েছে, এ-ছাড়া অন্য কোনো অনুমানই তখন সম্ভব ছিল না। শিবরাম আসতে না আসতে সকলে তাকে ঘিরে ফেলল, আর "গুনু কই? তার সঙ্গে তোর দেখা হয়নি?" ইত্যাদি প্রশ্ন করতে লাগল। তাকে যে কাজে পাঠানো হয়েছিল তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা রইল দূরে। শিবরাম বলল, "না, আমি কাউকে দেখতে পাই নি।"

তাই শুনে আমি অমনি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কাউকে মানে? ঠাকুরদাকেও দেখতে পায় নি?"

"না।"

"মানে? গুনু হয়তো পথ ভুলেছে। কিন্তু ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে দেখা হওয়া উচিত ছিল।"—মা ধরা গলায় বললেন। মার তখনকার মুখচ্ছবি আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাঁর চোখ ছলছল করছিল। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে, তিনি চোখের জল লুকোতে চেষ্টা করছিলেন। আরও দেখতে পাচ্ছিলাম, দুঃখে তার অন্তঃকরণ যে একেবারে আকুল হয়েছিল তা যতদূর সম্ভব কেউ যেন দেখতে না পায়, সেজন্য মা উৎকণ্ঠিত ছিলেন। মাকে শিবরাম কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিল না, এদিকে-ওদিকে চাইতে লাগল। তাই দেখে ঠাকুমা আবার তাকে সেই একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমৃতা-আমৃতা করে সে সত্যি কথা বলে ফেলল, "সত্যি কথা বলতে কি, আমি কাল রাত্তিরেই এসেছি, কিন্তু

রাত বারোটার কাছাকাছি ভূতবাড়িতে—(আমাদের গ্রামের কাছেই 'ভূতবাড়ি' নামে ছোট একটি গ্রাম ছিল)—পৌঁছুলাম আর সেখানেই ঘুমোলাম। ভোরবেলা উঠে সকাল সকাল আসব মনে করেছিলাম, কিন্তু মাসীমার বাড়ীতে মিষ্টান্ন রাঁধা হয়েছিল আর একটু কাজও ছিল, তাই সেখানে রয়ে গেলাম। খেয়েদেয়ে রওনা হয়ে সটান হেঁটে এসে এই এক্ষুনি হাজির হলাম।" শিবরামের এই কথা শুনে সকলের মাথার বোঝা যেন নেমে গেল। শিবরামের দাদা কিংবা ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়াই যখন অসম্ভব বলে জানা গেল, তখন আবার আশা জেগে উঠল।

দাদার সম্বন্ধে এইটুকু জানতে পেরে যারা সব এসে ভীড় জমিয়েছিল তারা চলে গেল। ঠাকুমা শিবরামকে বাড়ির ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। "তিনি বেশ আছেন। কিছু ভাবনা করবেন না মা" বলে সে আশ্বাস দিল। কিন্তু বেশ বোঝা গেল যে সে যেন কিছু লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। ঠাকুমা তা লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু মা ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। তবুও মা তখন চুপ করে রইলেন। ঠাকুমা বললেন, "তা ভালোই হল। গণুর জন্য আর ভাবতে হবে না। উনি তাকে যে করে হোক খুঁজে নিয়ে আসবেন। এই এক মস্ত বড় চিন্তা ছিল, অত ভেবে আর দরকার নেই, বেশ ভালো বাবা, একটা চিন্তা দূর হল এই যথেষ্ট।" এই বলে ভিতরে গেলেন। আমি সেইখানেই ছিলাম, কিন্তু মা সম্ভবতঃ তা লক্ষ্য করেননি, কিংবা হয়তো গ্রাহ্য করেন নি। তিনি শিবরামকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, তুই যখন গিয়েছিলি তখন ওঁর শরীর কেমন ছিল? তোর উপর রাগটাগ করেননি তো?" মার প্রশ্ন শুনে শিবরাম মুখ নেড়ে বলল, "না, না, মোটেই রাগ করেন নি।" কিন্তু মা যেন তার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলেন যে সে সত্যি কথা বলছে না। কেন না, মা তখনি ফিরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাখ, তুই কোনো কথা গোপন করিস নে, অন্তত: আমাকে সত্যি কথা বল্। তোর তাতে কি?"

মার এই কথা শুনে, বোধ করি ভরসা পেয়ে, সেই বোকাটি বলতে আরম্ভ করল, "তবে সত্যি কথা বলব দিদিমণি? আমি বাড়িতে গিয়ে দাদাবাবুর সামনে চিঠিটা দেওয়া মাত্র, অমনি তেড়ে এসে বললেন, 'আমি পটল তুলিনি, বেশ খাসা জ্যান্ত আছি, যা বল্‌গে গিয়ে।' এই বলে সেই

খোলা চিঠিখানা তিনি আমার গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। তারপর কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে বসে রইলেন। আমিও দুয়োরের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে বামুনঠাকুরকে ডেকে আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে রওনা করে দিতে বললেন। খেয়ে-দেয়ে বেরোবার সময় আমি দাদাবাবুকে 'কিছু চিঠি-টিঠি দেবেন নাকি?' জিজ্ঞাসা করলাম, তখন উনি বললেন, 'বেশ ভালো আছি বল্‌গে যা। চিঠি-টিঠি দেবার দরকার নেই।' তখন তাঁর শরীর বেশ ভালোই ছিল। আমি বেরোব, এমন সময় কৃষ্ণজীপন্ত এলেন, আর আমাকে দেখে আগে এখানকার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে আমাকে বললেন, "এইখানেই একটু দাঁড়া। আমি ওপরে রাওসাহেবের কাছ থেকে ঘুরে আসছি তারপর তোকে সব কথা বলছি।" এই বলে তিনি চলে গেলেন। তারপর আবার দশ মিনিট বাদে নিচে নেমে এলেন আর আমাকে সঙ্গে করে তাঁর নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে খানিকক্ষণ বসতে বলে, আমার কাছে দু'খানা খাম দিলেন। একখানা 'ঠিক দিদিমণির হাতে দিবি অন্য কাউকে দিস্‌নে, খবরদার,' বলে সাবধান করে দিয়ে দিলেন। আর অন্যটাও আপনার হাতেই দিতে বলেছিলেন, কিন্তু—কিন্তু"—এই বলেই সে চলে যেতে উদ্যত হল।

মা কিছুই বুঝতে পারলেন না। "কি বলছিস্ কি? ভাল করে বল্‌বি না—" মা আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

কিন্তু ততক্ষণে শিবরাম দরজার গোড়ায় গিয়ে পৌঁছেচে। সেখান থেকেই, "সেইটি আমি হারিয়ে ফেলেছি দিদিমণি" বলে সে চট্ করে পালিয়ে গেল। মা সে-দিকে চেয়ে রইলেন, শিবরামের সে-ভাবগতিকের অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। একখানা খাম কিন্তু তাঁর সামনে পড়ে ছিল, সে-দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিলনা। এমন সময় পাছ-দুয়ার থেকে ঠাকুমা মাকে ডাক দিলেন। তবুও মা স্তব্ধ! দুধ খেতে খেতে সুন্দরী মার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ইতিমধ্যে সে জেগে উঠে কাঁদতে লাগল, তখন যেন মার হুঁশ হল। চট্ করে সেই খামখানা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেটা লুকিয়ে ফেললেন। ঠিক সেই সময়ে আমাকে দেখতে পেয়ে মা অমনি বললেন, "যমু, তোর ঠাকুমাকে বা অন্য কাউকে এই চিঠির কথা বলিসনে, বুঝলি?" এই বলে সুন্দরীকে কোলে নিয়ে তিনিও ভিতরে চলে গেলেন।

এ-সব দেখে আমি সত্যি থতমত খেয়ে গেলাম। তাতে আবার অসহ্য খিদে পেয়েছিল। কি যে করি তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। শেষে কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুমার কাছে খেতে চাইলাম। ঠাকুমা বাসি ভাতে মিষ্টি দই দিয়ে মেখে খেতে দিলেন। একেবারে ঠাণ্ডা ভাত। কিন্তু সে সময় আমার কাছে তা অমৃততুল্য মিষ্টি লাগল। কথায় বলে, "খিদের জ্বালায় ধানের তুষ, আর ঘুমের বেলায় পাথর বালিশ"* তা মিথ্যে নয়। তখন শুধু ঠাণ্ডা ভাত কেন, যা কিছু একটা পেলেই সুস্বাদু মনে হত। সেই ভাত খাবার সময়ে দাদাকে মনে পড়ল না, বাবাকে মনে পড়ল না, শিবরাম মাকে যে-খাম দিয়েছিল, তাও মনে রইল না—কিছুই না। সব যেন একেবারে ভুলে গেলাম। যেন, 'তুমি যাও, আমি আসছি'! বলতে বলতে ভাতের গরাস একের পর এক আমার মুখে ঢুকে পড়ছিল, আর তাদের ঢোকবার সাহায্য করতে মাঝে মাঝে জলের কয়েক চুমুক আমার মুখে প্রবেশ করছিল।

সবকটা ভাত যখন উদরে প্রবিষ্ট হল, তখন যেন আমি হুঁশ পেলাম; আর তখন দাদাকে মনে পড়ল। তখন মনে হল, "বেলা দুপুর হয়েছে, দাদা বেচারা না জানি কি খেয়েছে! এখন সে কোথায়?" কিন্তু ও-রকম ভাবনা ছেলেবেলায় কতক্ষণ টিকতে পারে? এখন কি করি ভাবছি, এমন সময় পাশের বাড়ির কুশী আমাকে খেলতে ডাকতে এল। তার সঙ্গে দাদার কথা বলতে বলতেই তাদের বাড়িতে খেলতে গেলাম আর খেলায় নিমগ্ন হলাম। চারটের সময় ফিরে এলাম, তবু তখনো দাদা আসেনি আর ঠাকুরদাও না। দেখতে পেলাম যে মা আর ঠাকুমা খুব কাছাকাছি বসে কি যেন কথাবার্তা বলছেন। সে সময়ে মার চেহারা ভারি ম্লান দেখাচ্ছিল। আমার মনে হল যে তাঁকে কৃষ্ণজীপন্ত যে চিঠিটি দিয়েছিলেন তাতে বোধহয় সাংঘাতিক কিছু লেখা আছে; আর তাই পড়ে মার দুশ্চিন্তা বেশী বেড়েছিল। মার কি দুশ্চিন্তা ছিল তা ভেবে দেখবার বয়স তখন আমার ছিল না। আর মনে হয়, ওই বয়সের ছেলেমেয়েরা অতদূর ভাবতেও পারে না। কিন্তু একের পর এক এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যে সেই ছোট বয়সে আমি যত বিজ্ঞ এবং সহানুভূতিশীল হলাম, ততটা তার আগে কখনো ছিলাম না, আর তার পরেও কখনো হইনি। আমার জীবনটি যেখান থেকে লিখতে

* মারাঠি প্রবাদ

আরম্ভ করেছি, সে সময় থেকে ছ'মাসের মধ্যেই এই সব ঘটনা ঘটেছিল। আমার বয়সের যে কোনো মেয়েকে বিবেচনাক্ষম করার ক্ষমতা সে ঘটনাগুলির ছিল। আর আমি তো নিঃসন্দেহে একটু বেশি কৌতূহলীই ছিলাম। একথা যদিও সত্যি, তবু আমার স্বভাব বদলানো কি সম্ভব? অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে একটু দেরিতে হলেও, সে সব ঘটনা এবং তার জন্য দুঃখ আমিও ভুলে যেতাম।

একেবারে সন্ধ্যে হয়ে এল। দাদাও এলনা, ঠাকুরদাও এলেন না। অন্ধকার হল, তবু কারু সাড়া নেই। মাঝে মাঝে পাড়াপ্রতিবেশীরা এসে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিল। রাত্রি ন'টা বাজল, তবুও যখন কেউ এল না, তখন মা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। সুন্দরী কান্নাকাটি করে গোলমাল বাধিয়ে দিল। মা সকাল থেকে কিছু খাননি, তায় ঠাকুমাও উপবাসী ছিলেন। ঠাকুরদা কখনো কখনো আশে-পাশের গ্রামে গিয়ে দু'তিন দিন থাকতেন। তাই বাড়িতে একাকী ঠাকুমার শোবার অভ্যাস ছিল। আমি যখন সেখানে ছিলাম তখনো ঠাকুরদা দু-একবার পাশের গাঁয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে-দিন আমারও বাড়িটা ভয়ানক উদাস মনে হতে লাগল। খানিকক্ষণ এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়িয়ে, যেখানে সুন্দরীকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানে গিয়ে আমি তার পাশে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু খুব আস্তে আর সাবধানে আমি পা এলিয়ে দিলাম; তা নইলে মেয়েটা জেগে উঠে আবার কান্না জুড়ে দিত!

নানা রকমের চিন্তা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন কি আর সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত ঘুম ভাঙে? জেগে উঠে দেখি, আমার আশে-পাশে কেউ নেই, মা একলা শুয়ে কাতরাচ্ছেন। মাকে পাশে শুয়ে কাতরাতে দেখে আমার মন যে কেমন করতে লাগল তা বুঝে নেওয়াই ভালো। আমি রাত্রে যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন মা বেশ ভাল ছিলেন, আর সকালে উঠে দেখি মা এমনি কাতরাচ্ছেন। "মা, মাগো, দাদা এসেছে? তুই এমন কাতরাচ্ছিস কেন?" বলে জিজ্ঞেস করতে করতে আমি মার কাছে গেলাম, আর তাঁর গায়ে হাত দিতেই আমার হাত যেন পুড়ে গেল! তাঁর গা জ্বরে ঝাঁ ঝাঁ করছিল। রাত্রেই নিশ্চয় মার জ্বর হয়েছিল। "ও মা! কত জ্বর! কখন হয়েছে মা? দাদা এসেছে?" ইত্যাদি অনেক কিছু আমি বললাম। আমি কি বোকা! সে-বেচারী নিজের জ্বালায় শুধু

গোঙাচ্ছে আর এ-পাশ ও-পাশ করছে, এ-সময় যা-তা প্রশ্ন করে কি দরকার? তাতে আবার "দাদা এসেছে?" বলে কাজ কি? যদি এসেই থাকে, তবে কি তাকে মার শিয়রে বা পায়ের কাছে দেখতে পেতাম না? জ্বরে অচেতন হয়ে মা যদি সে-কথা ভুলে থাকেন তবে তা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর দুঃখ উস্‌কে দেওয়া ছাড়া আমার প্রশ্নটির আর কিই বা ফল হত? মা যে আমাকে কিছুই উত্তর দিলেন না এ আর বলতে হবে না। তাঁর পাশে অনেকক্ষণ বসে থেকে আমি ভিতরে গেলাম আর দেখতে পেলাম যে সেখানে ঠাকুমা সুন্দরীকে ভাত খাইয়ে দিতে দিতে কাঁদছেন। আমি মাকে যে-সব প্রশ্ন করেছিলাম সেই সব আবার ঠাকুমাকেও জিজ্ঞাসা করলাম। তখনও ঠাকুমা বললেন, "কেউ আসেনি, কেউ যায়নি, কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না! খোঁজ নিতে আবার কাকেই বা পাঠাই? এ দিকে বৌমা জ্বরে বেহুঁশ হয়েছে। আর এই ছুঁড়িটা মাকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারেনা। আর তুইও সারাদিন দৌরাত্ম্য না করে পারিস না। না একটু বসবি, না মেয়েটাকে একটু দেখবি, না কোনো কাজ করবি—যার নাম তা! এই এত বেলায় তোর ঘুমের ঘোর ভাঙল! এর পরে—যা, বেরো, বসলি অমনি উপুড়পিঁড়ি পেতে!" ঠাকুমার এই কথা শুনে আমি সেখান থেকে উঠে চলে গেলাম। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা আব্দার করার সময় নয়।

"দাদা আর ঠাকুরদার হল কি?" এই ভাবতে ভাবতে আমি মাঝের ঘর থেকে পিছন-দুয়োরে যাচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ দেখি আমার পায়ের কাছে একখানা সাদা কাগজ। তখন যদি সে-কাগজটি পায়ে না মাড়াতাম তবে হয়তো সেটা আমি মোটেই লক্ষ্য করতাম না। কেন না, সে-রকম সাদা কাগজ কি ঘরে কম ছড়িয়ে পড়ে থাকে? কিন্তু কাগজটি পায়ে একটু পুরু ঠেকল, তাই আমি সেটা হাতে তুলে নিলাম। আর দেখি যে কৃষ্ণজীপন্ত যে-খামখানা মাকে দিয়েছিলেন সেটা সেই খাম। কে যেন সেটা খুলে পড়ে দেখেছিল। সেটা ঠিক সেই খাম মনে হওয়ামাত্র অতটুকু মেয়ে আমি, তবু অনেক রকম চিন্তা করতে লাগলাম। সব চেয়ে আগে, সেই খামের মধ্যে কি আছে তা দেখতে আমার স্বভাবতই ইচ্ছে হল। এ-কথা কি আর বলতে হবে? কিন্তু বিদ্যার স্থানে যে মস্ত বড় শূন্য। মা-বেচারি অতিশয় চেষ্টা করে আমাকে অল্পকিছু লেখাপড়া

শিখিয়েছিলেন। কিন্তু লেখার দিকে বর্ণাক্ষরের গণ্ডি আমি পার হইনি। আর পড়া তখন যুক্তাক্ষরের দুয়োরে ঠেকে বসেছিল। মা নিজে বেশ ভালো পড়তে পারতেন কিন্তু লিখতে ততটা ভালো পারতেন না। কেন না লেখার অভ্যাস তাঁর ততটা ছিল না। কখনো কখনো তিনি তাঁর মায়ের বাড়িতে চিঠি লিখতেন, কিন্তু পরের দিকে সেগুলি দাদাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। পড়ার অভ্যাস তাঁর খুব ছিল। 'পাণ্ডব-প্রতাপ', 'ভক্তি-বিজয়' ইত্যাদি বই তিনি রোজ দুপুরে পড়তেন। 'শিবলীলামৃত' তো তাঁর মুখস্থ ছিল। মা যে পড়তে পারতেন তা দাদা, আমি, বাবা আর কৃষ্ণজীপন্ত ছাড়া আর কেউ জানত না। কৃষ্ণজীপন্ত জানতে পেরেছিলেন, তার কারণ মা নিজেই তাঁকে বলেছিলেন। কিছু জানতে হলে তাঁকেই তিনি বলতেন। তাই তাঁদের দুজনের সম্পর্ক ছিল ভাই বোনের মতো। আর কাউকে তিনি কখনো কিছু বলতেন না। অকারণে কখনো পাশের বাড়ি যেতেন না। তাই কাজকর্ম সারা হলে, দুপুরবেলায় তিনি একলা বসে বসে পড়তেন নয় তো শেলাই করতেন।

কিন্তু এখন যাক সে কথা। এ বিষয়ে আবার বিস্তারিতভাবে লেখার দরকার হবে, তাই এখন সেই খামের দিকে ফেরা যাক। আমি ভালো করে পড়তে পারতাম না, কাজেই সে খামটি মার কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কেন না খামের কথা ঠাকুমাকে বলতে মা বারণ করে দিয়েছিলেন তা আমি ভুলিনি। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল যে চিঠিটা একবার নিজে পড়ে দেখবার চেষ্টা করা ভাল আর তা না পারলে অন্য কাউকে সেটা পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলেই হবে। তাই আমি পিছন দুয়োরে গিয়ে খামের ভিতরের কাগজখানি বার করে দেখলাম। কিন্তু সেটা ভারি হিজিবিজি করে লেখা ছিল, তাই আমি পড়তে পারলাম না। এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখলাম ; কিন্তু কি উপায় ? চার কিংবা পাঁচটি শব্দ ছাড়া আমি কিছুই পড়তে পারছিলাম না। সেই চার-পাঁচটি শব্দের তিনটি এখনও আমার মনে আছে, কিন্তু তার অর্থ সেদিন বুঝিনি। সে শব্দগুলি হয়তো ভুলেই যেতাম, কিন্তু পরে সেই শব্দগুলি বার বার শুনতে হয়েছিল, তাই সেদিন চিঠিতে সেই যে-সব কথা পড়েছিলাম তা আমার মনে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। সে তিনটি শব্দ এই—'অস্বীকার', 'জমিন', আর '৫০০০' এই সংখ্যা। এই শব্দের

গুরুত্ব সেদিন মোটেই বুঝতে পারি নি। আগের দিন মা বারণ করে দিয়েছিলেন তাই শুধু এই মনে হল যে চিঠিতে নিশ্চয় কোনো কিছু গোপন কথা লেখা হয়েছে। চিঠিটা নিয়ে যে কি করি তা ভেবে পাওয়া আমার পক্ষে মুস্কিল হয়ে উঠল। শেষে দাদা আসা পর্য্যন্ত সেটাকে নিজের কাছেই রেখে দিতে মনস্থ করলাম।

আবার অনর্থ

কাগজখানা নিজের কাছেই রাখতে মনস্থ করলাম। কিন্তু যে-কথা আগেই ভাবা উচিত ছিল, তখন তা ভাবতে বসলাম। কাল শিবরাম যে কাগজখানা মাকে দিয়েছিল এটি সেই কাগজ এ-কথা মনে হওয়ামাত্র সেটা মাকে দেওয়া উচিত ছিল। তা আমি করিনি। শুধু তাই নয়, সেটা খুলে পড়ে দেখবার চেষ্টা করেছি, তবে বেশি কিছু পড়তে কিংবা মোটেই কিছু বুঝতে পারিনি সেকথা আলাদা। তাই মনে হতে লাগল যে আমার কাজ মার মোটেই ভালো লাগবে না।

মানুষের মন মন্দের দিকে যত সহজে ঝোঁকে ভালোর দিকে তত সহজে ঝোঁকে না। অভিজ্ঞরা বলেন যে মনে দুশ্চিন্তা ও সুচিন্তার যখন ঝগড়া বাধে তখন শতকরা আশিবার দুশ্চিন্তাই জয়ী হয়। আধ্যাত্ম জ্ঞানলাভ করিনি, কাজেই এ বিষয়ে আলোচনা করতে অক্ষম, আর তেমন আলোচনা করার ইচ্ছাও আমার নেই। আমার জীবনচরিত লেখার পিছনে একটি অভিপ্রায় আছে। আমার অবর্তমানে এটি প্রকাশিত হলে তখন যদি কেউ আমাদের দীন অবস্থার জন্য সহানুভূতি বোধ করেন তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। তাই করুণাময় ভগবানকে দুহাত তুলে এই প্রার্থনা করি, হে ভগবান, আমার এই জীবনচরিতটি যেন শেষ পর্য্যন্ত লিখে সম্পূর্ণ করতে পারি। সেটি যেন মাঝখানেই থেমে না যায়। তাঁর আশীর্বাদ পেলেই হবে।

আমার মন সে সময় ভালোর দিকে ঝোঁকেনি। এক বার মনে হল যে এখন যদি এই চিঠিখানি মাকে দিই তবে তাঁর বকুনি খেতে হবে। আবার মনে হল, চিঠি দেখে মার নিশ্চয় কষ্ট হবে। যাই হোক্ চিঠি কাউকেই না দেখিয়ে সেটি আমি লুকিয়ে রাখলাম। পরে সকালের সব কাজকর্ম সেরে, সুন্দরী আর আমার জন্য যে ভাত রাঁধা হয়েছিল তা খেয়ে নিয়ে মার কাছে গেলাম। ঠাকুমা আগেই সেখানে

গিয়েছিলেন, আর সুন্দরীকে চাপড়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, "নে দেখি এটাকে, আর বাইরে গিয়ে এর সঙ্গে খেলা কর।" ন্যাকামো করার সময় নয়, তাই লক্ষ্মীমেয়েটির মত সুন্দরীকে কোলে তুলে নিয়ে আমি বাইরে চলে গেলাম। তখন দাদা, ঠাকুরদা এবং সেই কাগজটার কথা সব ভুলে গিয়ে, কোন্ খেলা যে খেলব আর কোথায় খেলব এই এক ভাবনা হল। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, "হ্যাঁরে, তোর ভাইকে পাওয়া গেছে?" তা হলে সেই সময়টুকুর জন্যই সে কথা মনে পড়ত।

আমাদের পাশে একটি ভাড়াটে পরিবার ছিল; তাঁদের ছিল একটি মেয়ে। তার নাম কুশী। আমাদের দুজনের বয়স একই। কুশীতে আর আমাতে ছিল ভারি ভাব, তার কারণ, প্রথমতঃ, আমাদের দুজনের স্বভাব ছিল এক রকমের; দ্বিতীয়তঃ খেলার নাম করতেই কুশী ঠিক আমার মতোই লাফিয়ে উঠত আর আমার মতই সে নিজের চেয়ে ছোট, মানে সুন্দরীর বয়সের, ছেলেমেয়েদের ভাল বাসত না। তৃতীয় কারণটি হল এই যে, কুশী সবতাতে আমার কথা মতো চলত। আমি যখন-তখন তাদের বাড়ি যেতাম, তাই এখনও কুশীর বাড়ির রাস্তা ধরলাম।

কুশীর বাড়ি গিয়ে দেখি, সেখানে আরও দুটি নতুন মেয়ে আর একটি আন্দাজ দশ-এগারো বছরের ছেলে এসেছে। কুশী আর তারা তিনজন খেলায় মেতে ছিল। আমি সেখানে যাওয়ামাত্র সেই নতুন ছেলেমেয়েরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আর সেই ছেলেটা প্যাট্‌পেটে চোখে আমার পানে চেয়ে রইল। আমি কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম। শুধু তাই নয়, সেই ছেলেটাকে আমার একেবারে ভাল লাগেনি। কিন্তু সে বয়সে পছন্দ-অপছন্দ কতক্ষণই বা মনে থাকে! মুহূর্তের মধ্যে আমরা সকলে একসঙ্গে খেলায় মেতে উঠলাম।

সেই ছেলেমেয়েরা হল কুশীর পিসতুতো ভাই-বোন। ছেলেটির কত বয়স হতে পারে তা আগেই বলেছি। মেয়ে দুটির মধ্যে একটির নাম বনী। তার বয়স এগারোর কাছাকাছি হবে। অন্য মেয়েটির বয়স হতে পারে সাত-আট বছর। জানতে পেলাম যে ক'দিন হল বনীর বিয়ে হয়েছে। তারা সবাই পুণায় থাকত। তাদের বিষয়ে তখন শুধু

এইটুকু ছাড়া আর কোন খবর জানা গেল না।

আমাদের ভাব হয়ে গিয়ে খেলা আরম্ভ হলে সেই ছোট মেয়েটা বলল, "ভাই কুশী, আমরা বর-কনে খেলা খেলব।" তখনই সেই প্যাঁটপেটে চোখওয়ালা ছেলেটা—তার নাম ধোন্তু—একেবারে খুসি হয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বর-কনে খেলা বেশ মজার। আমি ছেলে, কাজেই আমি বর হব। আমার বউ কে হবে? শালি (এটা সেই ছোট মেয়েটির নাম) তুই—" ইতিমধ্যে সে তারপর কি বলবে তা বুঝতে পেরে তার বড় বোন বলল—, "ধোন্তু, এ কি তোর গাধামি? শালি তোর বোন, তাকে তোর বউ করবি?"

এই কথা শোনা মাত্র, মাটির ঢিবি যেমন জলে গলে যায়, ধোন্তুর সেই রকম অবস্থা হল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে চট্ করে বলল, "তা নয় দিদি, আমি ওকে বলেছিলাম যে তুই যদি এই খেলা খেলতে চাস, তবে আমি বর রয়েছি, আমার জন্য তুই একটা কনে দেখে দে।" এই কথা বলবার সময় সে যে-রকম ভাবে আমার দিকে চাইছিল, তা দেখে তার গালে এক চড় লাগিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে করল, তার ওপর আমার এত রাগ হল! আমার মনে হল যে আমাকেই নিশ্চয় তার বউ হতে হবে, কেন না কুশী, তার মামাতো বোন, আর বনী আর শালি তার নিজের বোন! অমনি আমি কপাল কুঁচকে বললাম, "কুশী, আমি ভাই এমন ধরনের বিশ্রী খেলা খেলব না। বেশ ভালো আর সরল খেলা যদি খেল তো আমি থাকছি এখানে, নইলে ভাই চল্লাম আমার বাড়ি! ছি ছি, এ কি পাকামির খেলা, আর এই ছেলেটা হবে বর!"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই বনী আমার দিকে তেড়ে এসে বলল, "আহাহা! বড় ভালো খেলার শখ গো? যেন কক্ষনো কনে হবিই নে? আজন্ম যেন আইবুড়ো হয়ে থাকবি! আর বলে কিনা এই ছেলেটা হবে বর।' এই 'বরটাতে' কি মন্দ দেখলে শুনি? এমন দিব্যি বর খেলাঘরের বিয়েতেও পেতে হলে সাত জন্ম তপস্যা করতে হয়; জানিস্।"

এই কথা বলবার সময় তার চেহারা এমন উগ্র হয়েছিল, যে আমার মনে হল আমাকে বুঝি কামড়ে দেবে! সেই যে চ্যাপ্টা-নাক কুকুর—তাকে বুল ডগ না কি যেন বলে—অবিকল সেই কুকুরের মুখের মত বনীর মুখটা তখন দেখাচ্ছিল। আমার ওপরে এত রাগ! তার সেই আদুরে ভায়ের চোখের

চেয়েও প্যাঁটপেঁটে চোখ! আমার মনে হল, আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে চোখদুটো এক সময়ে কামানের গোলার মত ছিটকে এসে আমার গায়ে লাগবে। তার ভাইকে লক্ষ্য করে 'আর এই ছেলেটা হবে বর' বলা মাত্র বনীর কি ভয়ানক রাগ! সেই ছেলেটাকে দেখা মাত্রই আমার কিন্তু বড় খারাপ লেগেছিল। তার রাগের ঝোকে বাজে বক-বক শেষ হলে, সে তার ভায়ের মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "মাণিক আমার। না হল তোর বউ তো বয়ে গেল। অমন হাজার হাজার শূর্পনখা তোর পায়ে গড়াগড়ি যাবে, বুঝলি? মরণ আর কি! নিজেকে স্বয়ং সুভদ্রা মনে করেছেন উনি। বড় দেমাক দেখিয়ে বলে কি না, 'এই ছেলেটা হবে বর!' দেখব কোন মদন মূর্তিকে বরণ করতে যান!"

সেই এই রকম একটানা বলে চলল। ইতি মধ্যে তার বন্ধুরাজ বললেন, "ছাখ দিদি, এমন বিচ্ছিরি বউ চায় কে? এই খানিকক্ষণ খেলব, তাই ভাবলাম, বিড়ি কাটা[১] আর মুখে ভাত[২] দেওয়া হবে আর একটু মজা করতে পারব, ব্যস্। ইতিমধ্যে কুশীর মনও যেন তার পিস্তুতো ভায়ের স্নেহে গদ গদ হয়ে উঠল। সেও হঠাৎ রেগে আগুন হয়ে বলল, "ভাই বহুদি, একা ওর দাদাই হচ্ছে সুন্দর! বুঝলি?"

তার এই কথা শেষ হতে না হতেই খেলার ঘরে ধপাস করে কি যেন আওয়াজ হল। আমরা সকলে সেদিকে ফিরে দেখলাম যে সুন্দরী সেখানে গিয়ে হাঁড়িগুলো ফেলে দিয়েছে। হাঁড়িগুলো ছিল মাটির, আর রাখা হয়েছিল একের উপর আর একটি রাশি করে। মাটিতে পড়ে সব ক'টি ভেঙে গেল। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সুন্দরীকে তুলে নেবো এমন সময় বহুঠাকুরুণও তেড়ে মেড়ে সেখানে এলেন। আমি সামনের দিকে

১ সেকালে বর-কনে দুজনেই হত ছোট। তাদের একজনকে মুখে বিড়ির মত সরু পানের খিলি দাঁতে কামড়ে ধরতে দেওয়া হত, আর অপরজনকে মুখের বাইরের ভাগ দাঁত দিয়ে কাটতে বলা হত। কখনো কখনো পানের খিলিব বদলে লবঙ্গ পর্য্যন্ত দাঁতে কাটার সমারোহ করা হত। এই রকমে বিয়ের উপলক্ষ্যে বর-কনের মুখে বিড়ি কাটাকাটির সময় হাসি-তামাসা চলত। আজকাল সেই প্রথা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেছে।

২ বিয়ের নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময় বর-কনেকে একসঙ্গে পরিবেশন করা হত। কনের পিঁড়ি বরের বাঁ দিকে সমকোণ করে পাতা হত। মাঝে মাঝে দুজন পরস্পরের নাম করে মুখে মিষ্টান্নের গ্রাস তুলে দিত, তখন আর সকলে হাসাহাসি করত। শহরে এই প্রথাটি বড় দেখতে পাওয়া যায় না। পাড়াগাঁয়ে কোথাও কোথাও এখনও "মুখে ভাত" তুলে দেবার অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়।

শুয়েছিলাম এমন সময় তিনিও শুয়ে পড়লেন। আমি শুয়েছিলাম সুন্দরীকে তুলে নিতে, আর বনী শুয়েছিল তাকে চড় মারতে। দুদিক থেকে দুজনের মাথা হেঁট হবামাত্র দুজনের মাথায় মাথায় ঠক্ করে ঠুঁকে গেল। তখন সে খুব জোরে সুন্দরীর পিঠে এক চড় বসিয়ে দিল, আর অমনি সে বেচারী আর্তস্বরে কেঁদে উঠল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত না করে, সে তার মাথায় লেগেছে বলে এটা-সেটা বলতে লাগল আর অনর্গল "হতভাগী, পোড়ারমুখী, মাগী," ইত্যাদি বিভিন্ন গালি দিতে লাগল। সত্যি বলছি, সেদিন পর্য্যন্ত তেমন গালাগালি আমি আর কারো মুখে শুনিনি। তার সঙ্গে তর্ক করতে আমার সাহস হচ্ছিল না। সুন্দরী কেঁদেই হয়রাণ, আমার চোখও ছল ছল করতে লাগল। কুশীর মার কাছে গিয়ে নালিশ করতে ইচ্ছে করল। তবুও তা না করে আমি সেখান থেকে চলে এলাম। সত্যি অমনতর মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি!

বাড়ি এসে আমি সটান মার কাছে গেলাম। মার কাতরানি তখন একটু কমেছে। সুন্দরীকে যখন তার কাছে নিয়ে গেলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "খুকি অত কাঁদছে কেন?" তাঁকে কি উত্তর দিই ভেবে পেলাম না। তার প্রশ্ন এড়িয়ে যা একটা কিছু বলে আমি সময় কাটিয়ে দিলাম। মা সুন্দরীকে কোলের কাছে নিয়ে দুধ খেতে দিলেন, তখন সে চুপ করল। মার চেহারা বড্ড ম্লান, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। জ্বর একটু কমেছিল। ঠাকুমা কাছে ছিলেন না, স্নান করতে গিয়েছিলেন। ভিজে কাপড়েই ভিতরে এসে তাঁর যে ধোয়া কাপড় শুকোচ্ছিল সেটাকে টেনে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে যমু; সেদিন কি গমু সত্যি তোকে তার মতলব কি বলেছিল? না অমনি যা তা বলে দিয়েছিস? আমার মনে হচ্ছে সেদিন যে তোকে চড় মেরেছিলাম সেইজন্য চলে যায়নি তো ছেলেটা?"

ঠাকুমার কথা শুনেই হোক্, কি অন্য কোন কারণেই হোক, দেখতে পেলাম যে মার চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। প্রথমে তাঁর মুখ অন্য দিকে ছিল, তাই তিনি ঠাকুমা যখন এলেন দেখতে পান নি। কিন্তু তাঁর শব্দ শোনামাত্র মা উঠে বসলেন। বাস্তবিক উঠে বসতে পারেন এমন শক্তি তখন তাঁর ছিল না, কিন্তু শাশুড়ীর কাছে এলে কোন লজ্জাশীলা বৌমা তাঁকে যতদূর সম্ভব সম্মান না করে পারেন। তার আমাদের

মার মত বৌ আর ঠাকুমার মত শাশুড়ী! ঠাকুমা প্রথম প্রথম মাকে যন্ত্রণা দিয়ে হয়রাণ করেছিলেন। কিন্তু সে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে মা সেই শাশুড়ীর কাছে 'বাহবা' পেয়েছিলেন। অনেক সময় ঠাকুমা তাঁর নিজের ছেলেকে লক্ষ্য করে বলতেন, "অমন লক্ষ্মী স্ত্রী পেয়েছে, তবু অভাগা অমন করে কেন?" আবার কখনো কখনো বলতেন, "ছোট-বেলায় বৌমাকে আমি অকারণ জ্বালাতন করেছি।" আমি নিজে ঠাকুমার মুখে এই কথা শুনেছি। যাইহোক্, আমাদের জন্মের আগে ঠাকুমা মাকে যতই কষ্ট দিয়ে থাকুন, আমরা কিন্তু যখম বুঝতে আরম্ভ করেছি তখন থেকে দেখেছি তিনি মাকে পেটের মেয়ের মতো যত্ন করতেন। মাকে তিনি কখনো কিছু করতে বাধা দিতেন না। আমরা দেখেছি মাকে তিনি ভুলেও একটি কটু কথা বলতেন না। মা নিজে ভারী সরল ছিলেন। কেউ যেন তাঁকে কিছু না বলতে পারে এই রকমই তাঁর ব্যবহার ছিল। এক এক জনের এমন কিছু গুণ থাকে যে তাদের ভেতর কেউ কখনো দোষ দেখে না। আমাদের ঠাকুরদা অত কড়া, কিন্তু তিনিও মাকে কত ভালবাসতেন তা আমি এর আগেই বলেছি।

ঠাকুমার ওই প্রশ্ন শুনে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি, দাদা আমাকে তাই বলেছিল," এই বলে উত্তর দেব ভাবছি এমন সময়ে কাপড় টেনে নিয়ে ঠাকুমা ঠাকুর ঘরে চলে গেলেন। আমি কিন্তু তাঁর পিছন পিছন গেলাম না। মা আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন, আর আমি তাঁর কাছে বসে রইলাম।

দশটা বেজে গেল, সাড়ে দশটাও হয়তো বেজে থাকবে। আমি অলস হয়ে ভারি বিরক্ত বোধ করতে লাগলাম। 'এখন কি করি' ভাবছিলাম, এমন সময় মনে হল যেন ঠাকুরদার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। অমনি আমি চেঁচিয়ে বললাম, "ও মা, ঠাকুরদা এসেছেন, কিন্তু দাদার গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না যে?" আমার চেঁচানি শুনে আঁৎকে উঠে মা জোরে একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, "এ্যাঁ!" আর তারপর তার চোখ ঘুরতে লাগল। আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। আর চীৎকার করে ঠাকুমাকে ডাকতে লাগলাম, "ঠাকুমা, ও ঠাকুমা, মা কেমন করছে দ্যাখো।" একটু আগেই সুন্দরী ঘুমিয়েছিল। আমার চীৎকার শুনে সেও আঁৎকে উঠে কাঁদতে লাগল। সব গোলমাল হয়ে গেল। ঠিক

সেই সময় 'এ্যঁা, কি ব্যাপার' বলে চেঁচিয়ে ভিতর থেকে ঠাকুমা আর বাইরে থেকে ঠাকুরদা ছুটে এলেন। তাদের পেছনে পেছনে দাদাও অবশ্য এল। এমন অসময়ে না এসে যদি আগের দিন কিংবা সকালে আসত তা হলে আমি নিশ্চয় তার গলা জড়িয়ে ধরতাম। কিন্তু সে সময়টা কেমন যেন ভয়ঙ্কর ছিল! "ওই ছাখো, মা কেমন করছে—" বলে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম তাই তারা সবাই ছুটে এসেছিল। মার মুখ তখন কি জানি কেমন যেন দেখাচ্ছিল।

"এ আবার কি হল!" এই বলে ঠাকুমা কাছে গিয়ে দেখেন, মা একেবারে অজ্ঞান, একটুও নড়াচড়া নেই। দাঁতে খিল ধরে গিয়েছিল, চোখ একেবারে বন্ধ। হাত-পা একেবারে অসাড়, গায়ের আঁচল হয়ে গিয়েছিল এলোমেলো। মৃত্যুর সময় কি হয় তা আমি তখন জানতাম না। তবু মায়ের অবস্থা দেখে সেই রকম সব লক্ষণ দেখছি বলে মনে হয়েছিল। ঠাকুমা মার চোখে-মুখে জল দিলেন। ঠাকুরদা 'মাত্রা'র[১] জন্য হাঁকা-হাঁকি করতে লাগলেন। দাদা শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমার মনে হচ্ছে যে, সে বোধহয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তার চোখ বেয়ে খালি জল গড়াচ্ছিল। আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। কান্না ঠেকাতে পারছিলাম না। চোখ দিয়ে জল উপ্‌ছে উপ্‌ছে গড়িয়ে পড়ছিল। এতক্ষণ সুন্দরী কেঁদে একেবারে হুলুস্থূল ব্যাপার বাঁধিয়েছিল কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে সে একেবারে চুপ। এমন বিপদের সময় ভগবান বোধ হয় বাচ্চাদের সুবুদ্ধি দেন।

ছুটে গিয়ে ঠাকুমা তাঁর ঝোলা নিয়ে এলেন, আর আমি যেখানে বসেছিলাম সেখানে এসে আমাকে এক টোকা দিয়ে বললেন, "যা যা, শীগ্‌গীর চন্দনপাটা নিয়ে আয়।" আমার আগে দাদা দৌড়ে গিয়ে চন্দন-পাটা নিয়ে এল। ঠাকুমা এখন কি করবেন তা বুঝতে পারছিলাম না। চট্ করে এক টুকরো শুকনো আদা বার করে সেটা খস্‌খস্ করে তিন-চার বার পাটার ওপরে ঘসে সেই অজ্ঞান মার চোখ খুলে তাতে বুলিয়ে দিলেন। তক্ষুনি মানুষ ঘুম থেকে আঁৎকে উঠে যে রকম চীৎকার করে

[১] মাত্রা—আয়ুর্ব্বেদীয় এক রকম গুটিকা। সেটি চন্দনপাটায় ঘসে দুধ, আদার রস, মিছরি, লেবুর রস কিংবা মধু ইত্যাদির সঙ্গে রোগীকে খাইয়ে বা চাটিয়ে দিতে হয়।

মা ঠিক সেই রকম করে অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, আর, "এসেছে? না আসে নি এখনো। আমাকে ফেলে গেল!" এই কয়টি কথা যেন কেমন ভাবে উচ্চারণ করলেন।

তাঁর সে কথা শুনে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। একদম "দাদা" আর "ভাই" বলে মার পায়ে ঢুলে পড়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে আমি খুব জোরে কাঁদতে লাগলাম। দাদাও তার চোখ মুছতে মুছতে এসে মার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। তবুও মা "আসেনি? তোমরা পাও নি তাকে? ভিকবালীর লোভে কেউ তাকে খুন করে নি তো? মাগো-মা!" এই বলে খুব জোরে কাঁদতে লাগলেন। আমি অমনি চেচিয়ে বললাম, "মা, মা, এই গ্যাখ দাদা তোর গায়ে পড়ে কাঁদছে, গ্যাখ। মা, এমন কেন করছিস?" তবুও মা সেই এক কথা বলছিল। ইতি মধ্যে ঠাকুরমা 'মাত্রা' ঘসে এসে তাঁকে চাটিয়ে দিলেন। ঠাকুরদা তাঁর চোখে জল বুলিয়ে দিলেন। এত করেও কিন্তু মায়ের হুশ ফিরল না। তাঁর জ্বর বেশী হল আর তিনি আরও প্রলাপ বকতে লাগলেন।

শেষে সকালবেলার চেয়ে জ্বর আরও অনেক বাড়ল। ঠাকুরদা "সুন্দরীকে নিয়ে বাইরে যা" বলে আমাদের দুজনকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। তবু একটু পরে আমি ভিতরে উকি মেরে দেখলাম। হয়তো জ্বরের গ্লানিতে কিংবা অন্য কোনো কারণে, মার প্রলাপ-বকা খুব কমে গিয়েছিল। তিনি চোখ বুজে শুয়েছিলেন।

সমস্ত বাড়িটা যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। কেউ কারো সঙ্গে জোরে কথা কইছিল না। আগে বাড়িতে মোটামুটি তিন জন কি চার জন মানুষ ছিল। তায় আবার ঠাকুরদা ঠাকুমাতে বড় ভাব! তখন কথা বলবে এমন মানুষ ছিলই বা কজন। দাদা আর আমি। আমাদের দুজনকে ঠাকুরদা বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার কোলে অবশ্য সুন্দরী ছিল। মা যেখানে শুয়ে ছিলেন সেখান থেকে একটু দূরে যেতেই দাদা আমার কানে কানে জিজ্ঞাসা করল, "যমু, মার কখন জ্বর হয়েছে?" সেই প্রশ্ন শুনে আমি কি উত্তর দিলাম তা কি কেউ আন্দাজ করতে পারে? আমি তক্ষুনি তাকে বললাম, "মশাই আপনারই কাণ্ড, জানেন? আপনি গেলেন আর সেই রাত্রেই মার জ্বর হল। (বাস্তবিক ঠিক তা হয় নি, কিন্তু আমি একটু বাড়িয়ে বলেছিলাম।) বেশ মশাই, আর সেদিন আমাকে

বলেছিলেন, 'যমু, তুই মাকে ভারি জ্বালাতন করিস।' মশাই আমার জ্বালাতন তো ভালো, কিন্তু এ যে—"

আমি আরো কিছু বলতাম, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টি তার মুখের দিকে পড়তেই দেখতে পেলাম যে তার চোখবেয়ে যেন বন্যা উথলে উঠেছে। খপ করে আমার কাঁধে হাত রেখে দাদা বলল—"কি করি ভাই, আমি করতে গেলাম এক আর হল আর। যা কখনো ভাবিনি তাই।" দাদা যখন এই কথা বলছিল তখন আমার নজর তার কানের দিকে গেল, আর চমকে উঠে আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, "দাদা, দাদা, তোর ভিকবালীর কি হল?"

তাকে পুরোপুরি কাঁদিয়ে দিতে যেন সেই প্রশ্নটিরই দরকার ছিল। কারণ শোনামাত্র তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার মুখ ফুটে একটি কথাও বার হচ্ছিল না। সুন্দরী আমার কাছেই ছিল। মনে হল যে সে আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন, "দাঁড়া, একে ভিতরে শুইয়ে আসছি," বলে আমি তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলাম। মনে হচ্ছে আমি তখন ভিতরে গিয়ে ভালো করলাম। কেন না, দাদার অশান্ত মন একটু শান্ত হবার অবসর পেল। কিন্তু দাদার কথা শুনতে আমি ভারি উতলা হয়ে ছিলাম কিনা তাই ভিতরে যাবার সময় আমি দৌড়ে গেলাম।

ওমা, সুন্দরীর ঘুম যে একেবারে কাকের মতো, তাতে আবার একটু আগে সে ঘুমিয়ে উঠেছিল। তার ঘুম উড়ে গেল আর সে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কান্না জুড়ে দিল। ভিতরে ঠাকুরদা তখন স্নান করে আসছিলেন, সুন্দরীর স্বর শুনতে পেয়ে আর আমাকে দেখে তিনি খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে এলেন, "নচ্ছার হারামজাদী। শুধু খুকিটাকে নিয়ে উঠনে একটু খেলা করতে বললাম—তা ওটাকে কাঁদাচ্ছে। নিজের মার অসুখ-টসুখের কথা কি কিছু ভাবে! নইলে ছেলেটা! মা বেচারী ভেবে সারা রাতদুপুরে চলে গেল! যা বেরো এখান থেকে, নইলে মারবো এক—"

"মারবো" শুনে আমি কি আর সেখানে দাঁড়াই! অমনি ঘুরে উঠনের দিকে দৌড় দিলাম। এমন সময় ঠাকুরদা দাদাকে চেঁচিয়ে ডাকলেন। দাদার তখন যেতেই হল। আর আমি বসে থাকলাম হাঁ করে।

যাই হোক্, আর থাকতে পরছি না। তাই এখন যা মনে হচ্ছে তা লিখে ফেলি। ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছা মতো

কখনো কিছু হয় নি। বড় কোন কিছুর কথা এখানে বলছি না, কিন্তু অতি সামান্য কিছু একটা ব্যাপারও যে আমার ইচ্ছা মতো হয়েছে তা বলতে পারি না। কিছু না কিছু আপত্তি বা বাধা তাতে যেন হবেই হবে। একেক জনের যেন সেটা জন্মকালের গুণ। সে যা কিছু করতে আরম্ভ করুক না কেন, সে কাজ যত ছোট কিংবা সোজাই হোক না কেন, তাতে বাধা যেন হবেই! আর যদিও বা কাজটি হয় তবে প্রথম চেষ্টায় কিছুতেই হবে না। ঠাকুমা প্রায়ই বলতেন, "এই মেয়েটার হাতে গমের চিহ্ন[১] নেই, পোড়ারমুখী কখনো কিছুতে কৃতকার্য হবে না।" তাঁর সে কথা চিরকালের জন্য আমার মনে থাকবে। জন্ম-মুহূর্তের গুণ এমনি যে কেউ কেউ যদি সত্যি সত্যি কোনো একটা কাজ ভালো মন নিয়ে করতে যায় তবু তাকে কেউ কখনো ভালো বলে না। কাজটি করবার সময়ে তার মতলব ভালো ছিলো এই কথাটি গোড়ায় কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। আমার ভাগ্যও এই রকম বলা চলে। আমাকে কখনো কেউ ভাল বলেনি, বললেও মিথ্যা বলা হবে না। আমি যে কি বলতে চাই তা আমার জীবনকাহিনীটি লেখা হলে সহজে বোঝা যাবে। অনেকে হয়তো মনে করবেন যে আত্মচরিত লিখতে পারে এমন শিক্ষিতা মহিলা পাগলের মতো এ সব কি লিখছে? কিন্তু আমার যা সত্যিকারের মত বা ধারণা ঠিক তাই লিখব সংকল্প করেই যখন আমার এই আত্মচরিত লিখতে আরম্ভ করেছি তখন কে কি বলবে তার কথা না ভেবে লিখে চলাই ভাল।

যে-কারণে এই কথা লিখেছি তাই এখন বলি। সুন্দরী ঘুমিয়েছিল বলে তাকে যখন ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ আমার লুকিয়ে-রাখা চিঠিখানির কথা মনে পড়ল। আর মনে হল খুকীকে কোথায় রেখে দাদাকে সেই চিঠিটা দেখাই যাতে সে সেটা পড়ে তাতে কি লেখা আছে আমাকে বলতে পারে। কিন্তু দাদা সেই যে একবার ভিতরে গেল, তারপর অনেকক্ষণ আর বাইরে এল না। ভিতরে যেতে আমার ভারি ভয় করছিল। তবু, কিছুক্ষণ পরে, আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে আমি ভিতরে গেলাম। দাদা আর ঠাকুরদা তখন খেতে বসবার উদ্যোগ করছেন। আমাকে

১ গমের চিহ্ন=যবের চিহ্ন—মারাঠা সমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে যার হাতের আঙুলে যবের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সে জীবনে সম্পত্তি, সৌভাগ্য, সন্তান-সন্ততি লাভ করে। মহারাষ্ট্রে যবের বদলে গম মানা হয়েছে।

দেখে ঠাকুমা বললেন, "যমু, তোর মা জেগেছে কিনা দেখে আয় তো মা। যদি জেগে থাকে তো বলবি, একটু কিছু খেয়ে নিতে, নইলে—থাক্, শুধু দেখে আয়, আমিই যাচ্ছি তাকে বলতে।" মার ঘুম তখনো ভাঙেনি। আমিও ভাত খেলাম। খাবার সময় ঠাকুরদা বললেন, "যদি এখন কেউ ছেলেটাকে সে কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, কিছু হারিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করে তবে আমার ধাতে তা সইবে না।" অবশ্য একথা ঠাকুমাকে লক্ষ্য করেই তিনি বললেন। ঠাকুমাও বিড়্ বিড়্ করে বললেন, "কারো বয়ে যায় নি ওকে জিজ্ঞেস করতে। আস্ত পাওয়া গেছে এই ঢের হয়েছে!"

সন্ধ্যাবেলা মার ঘুম ভাঙল। তিনি একেবারে অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। দাদা যখন এসেছিল তখনো তিনি অজ্ঞান হয়েই ছিলেন, তাই দাদাকে দেখেননি। ঘুম ভাঙতে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "যমু, গনু এসেছে না এখনো আসেনি?" দাদা তার শিয়রেই ছিল। সুন্দরী তাঁর সামনে শুয়েছিল। ঠাকুমা কাছেই সমই[১]এর কাছে বসে ফুলবাতি[২] ভিজিয়ে রাখছিলেন। মার মুখে এই প্রশ্ন শোনামাত্র আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "হ্যাঁ মা, এসেছে। ওই ছাখ তোর মাথার দিকে বসে আছে।" আমার মুখ দিয়ে এই কথা বার হতে না হতেই মা চট্ করে উঠে বসলেন। এমন ভাবে উঠলেন যে আমি ঘাবড়ে গিয়ে একটু দূরে সরে গেলাম। মা উঠে বসে বেশ এক মিনিট ধরে দাদার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর কি মনে করে জানি না, দু'হাত বাড়িয়ে দাদাকে বুকে টেনে নিয়ে, তাকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তাই দেখে কি যেন ভেবে নিয়ে ঠাকুমা আমাদের কাছে এলেন। দাদাও খালি কাঁদছিল। মা আধ-আধ করে, "কোথায় গিয়েছিলি আমায় ফেলে, এ্যাঁ?" এই ধরণের কথা বলতে বলতে কাঁদছিলেন। দেখতে পেলাম যে, ঠাকুমা কাছে আছেন এ হুঁশ যেন তাঁর নেই।

আবার মা বায়ুর প্রকোপে প্রলাপ বকতে লাগলেন, আর আমাকেও কাছে ডেকে নিয়ে—দাদা একটু দূরে সরবার চেষ্টা করল, কিন্তু মা তাকে

১ সমই—ঠাকুরের সামনে জ্বালাবার জন্য একরকম প্রদীপ।

২ ফুলবাতি—তুলোর ছোট ছোট ফুলের মত করে সেগুলি ঘিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয়। সকালে পুজার সময় আর সন্ধ্যায় আরতির সময় নিরঞ্জন নামে এক রকম ছোট প্রদীপে সেগুলি প্রত্যেক বেলায় এক জোড়া করে জ্বালা হয়। নিরঞ্জনে অবশ্য ঘি দেওয়া হয়।

সরতে দিলেন না—আমাদের দুজনকে খুব শক্ত করে বুকে চেপে ধরলেন। ইতিমধ্যে ঠাকুমা তাঁকে ডাক দিলেন আর অমনি চোখ বড় বড় করে তিনি ঠাকুমার দিকে চেয়ে রইলেন। তাই দেখে ঠাকুমা বললেন, "বৌমা, আজ আবার এ কি ব্যাপার?" অমনি মা কাঁদতে আরম্ভ করলেন, আর বললেন, "আমার বাছাদের তোমরা ত্যাগ করবে না তো?" "বৌমা এ কি আরম্ভ করেছ? পাগল হয়েছ নাকি?"—ঠাকুমার এই কথা শেষ হতে না হতেই ধপাস করে মা বিছানায় পড়ে গেলেন। আবার ঠিক সকাল-বেলার মত তাঁর অবস্থা হল। আমাদের ছোটদের তখন যে কি দশা হল তা অবর্ণনীয়। ঠাকুমা চীৎকার করে ঠাকুরদাকে ডাকলেন। আগের মতো চোখে অঞ্জন ইত্যাদি সব ওষুধ-টষুধ দেওয়া হলে পরে মার জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু খুব জ্বর হল।

সে রাত্রে কি আর আমাদের চোখে ঘুম আসে। ঠাকুরদা সেখানেই বসে রইলেন। আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ জেগে সেখানেই মার পায়ের কাছে গুঁড়ি গুঁড়ি মেরে শুয়ে পড়লাম। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। মার কাতরানি অবিরাম চলছিল।

সেই চিঠিখানি

দু'দিন এই রকম চলল। মার জ্বর কমছিল না। বাবাকে চিঠি লিখে পাঠান হল। কবিরাজের ওষুধ সুরু করা হল। জ্বর ছাড়ল না, রোজ জ্বর হতে লাগল। কবিরাজের ওষুধে কোন ফল হল না।

দাদা আমাকে বলল যে, তিন দিনের দিন ঠাকুরদা আর ঠাকুমা বলাবলি করছিলেন, এ অসুখ কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে বলা যায় না। আমাদের সকলের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। সুন্দরীকে বেশির ভাগ আমিই দেখতাম। দাদা আর আমি দুজনে মিলে তাকে কোনো মতে মার কাছ থেকে দূরে রাখতাম। তখনও কিন্তু তার মার দুধ খাবার অভ্যাস, তাই জ্বরের মধ্যেও মা সুন্দরীকে দুধ খেতে না দিয়ে পারতেন না। সেই জন্য সুন্দরীকে তাঁর কাছে নিযে যেতে হত। তার কি পরিণাম হল তা অবশ্য পরে জানা যাবে। দু'দিন দাদা আর আমি কথা বলবার অবসর পাই নি, সেই লুকিয়ে রাখা চিঠিটাও দেখাতে পারি নি। সাধারণতঃ হয় দাদা না হয় আমি মার কাছে বসে থাকতাম, তাই দাদা সেদিন রাত্রে চলে যাবার পর কি কি হল, তার ভিকবালী কোথায় গেল এই সব সম্বন্ধে শুধু টুকরো টুকরো খবর পেলাম। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার জোটিও ছিল না, কেননা ঠাকুমা কাছেই থাকতেন আর ঠাকুরদাও কাছেই অপরদিকে থাকতেন। তিন কিংবা চার দিনের দিন ঠাকুমা আমাদের বাইরে যেতে বললেন। মার অসুখও একটু কমেছিল। তাই আমাদের সকলের মনও একটু স্থির হয়েছিল।

অনেকেই হয়ত অনুভব করছেন যে, কোনো একটি গোপন কথা কাউকে বলবার কিংবা জিজ্ঞাসা করবার সময় আসবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেকথাটি তাকে বলি কি না বলি এ বিষয়ে মনে দ্বিধা জাগে না। কখন যে সময় পাই, আর কখন একবার সে-কথাটি বলতে কিংবা জিজ্ঞাসা করতে পারি এই রকম ভেবে মন উতলা হয়ে থাকে। কিন্তু ঠিক সময়টি যখন আসে

তখন বলি কি না বলি, জিজ্ঞাসা করি কি না করি এই সব দ্বিধা উঠে মন অলোড়িত হতে আরম্ভ করে। আমার অবস্থাও সেদিন ঠিক সেই রকম হয়েছিল। যে-কথাটি জিজ্ঞাসা করবার সেটি নিশ্চয় ভালো, মোটেই খারাপ নয় এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে, অন্ততঃ যাকে বলবার সে সেটি খারাপ মনে করবে না এমন জানা থাকলেও কোনো আপত্তি ওঠে না। কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহথাকলে মন স্বাভাবিক ভাবে আশঙ্কিত হয়ে উঠে। এতক্ষণ আমার মন কখন দাদাকে একলা পাব আর তাকে সেই চিঠিটা দেখিয়ে তাতে কি লেখা আছে তা জানতে পারব এই ভেবে উতলা হয়েছিল। কিন্তু যখন ঠিক সেই সময় হল তখন দ্বিধা জাগল—"দেখাই কি না দেখাই? দেখালে দাদা কি বলবে? চিঠিটার অভিপ্রায় আমাকে বলবে কি না?" এই রকম নানা চিন্তা মনে আসতে লাগল। তাই প্রথমে তার মনের কথা জেনে নেবার জন্য বললাম, "দাদা, সত্যি, অনেকবার ভেবে ঠিক করেছিলাম যে তোকে জিজ্ঞেস করব না, কিন্তু আর থাকতে পারছিনে। সত্যি ভাই, বলনা, তোর ভিকবালীর কি হল?"

দেখতে পেলাম যে আমার এই কথা শুনে দাদার একটু ভয় হল। তবু সে তক্ষুনি আমাকে বলল, "সমু, আমার ভিকবালী চোরে নিয়েছে।" এই বলে সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার সেই চাহনি কেমন যেন অপ্রতিভের মত মনে হচ্ছিল। তার চোখ ছিল আমার দিকে, কিন্তু তার মন যেন ছিল. কোন দিকে! তার ভিকবালী হারানোর সময়কার ঘটনা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল কি না সে কথা বলতে পারি না। সে যখন আমার দিকে চেয়েই রইল, তখন আমি যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম; তাই তাড়াতাড়ি বললাম, "ও কি ভাই, দাদা, অমন পাগলের মতো আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছিস কেন!"

আমার কথা শুনে তার যেন হুঁশ এল। তারপরে আমার কাঁধে হাত রেখে আমার মুখের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে সে বলল, "যমু, তুই আর আমার কাছে ভিকবালীর নাম করিসনে। সেটার নাম করলে আমার ভারি কষ্ট হয়। পৃথিবীতে যে অত কপটও দুষ্টু লোক থাকতে পারে আমি জানতাম না।"—এই বলে সে একটু থামল, তারপর আবার বলল, "অর্ধেক পথ গিয়ে আমার মনে হতে লাগল, আমি পথ ভুলিনি তো! তাই একজন পথিককে জিজ্ঞেস করতে গেলাম। 'তুমি যে একেবারেই অন্য পথে চলেছ'—বলে সে

আমায় বলল, 'চল, এই মোড় দিয়ে ঘুরে তোমাকে স্টেশনের রাস্তায় পৌঁছে দিই।' এই বলে সে আমাকে একেবারেই অন্য পথে নিয়ে গেল। তারপর তাকে ভদ্রলোক মনে করে, তার প্রশ্নের উত্তরে আমি কোথায় যাচ্ছিলাম ইত্যাদি সব কথা বলে ফেললাম। সব শুনে সে আমাকে বলল, 'তুমি পায়ে হেঁটে না গিয়ে, সোজা স্টেশনে গিয়ে রেলে যাও।' আমি যখন বললাম যে আমার কাছে পয়সা নেই, তখন সে বলল, 'কোনো ভিকবালী-টিকাবালী সল্লা[১]-টল্লা থাকলে দাও; আমি পাশের গাঁ থেকে তোমাকে টাকা-কড়ি এনে দিচ্ছি।' এই শুনে আমার যে কি হল কি জানি! ভাবলাম, যাই হোক, মার ভাবনা যখন দূর করতে পারব, তখন ভিকবালী দিতেই বা আপত্তি কি? তাই ভিকবালী দিতে রাজি হয়ে গেলাম।"

"ততক্ষণে একেবারে ফরসা হয়ে এসেছে। আমাকে একটি গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে সে আমার ভিকবালীটি দেখল আর, 'আরে, এর আঁকড়া যে ভাল করে বসায়নি, এ যে খোলা'—এই বলে চট্ করে আমার কান থেকে ভিকবালীটি খুলে নিয়ে তার হাতে রেখে বলল, 'বাঃ, মোতির দানাগুলো কি চমৎকার! এই পাশের গাঁয়ে গোলাপ শেঠ স্যাকরা থাকে—সে আমার কাকা (আমার যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে লোকটাও স্যাকরাই ছিল মনে হল); তার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা এনে দেব।' এই বলে সে এগিয়ে চলল।"

"আমার কানের ভিকবালী তার হাতে যাওয়ামাত্র আমার বুক দুরু দুরু করতে লাগল। মা কি বলবেন, বাবা কি বলবেন, ঠাকুরদা কি বলবেন, এই ভাবনা শুরু হল। 'ভিকবালীটা ফেরত দিন তো'—এই কথা এক-এক বার ঠোঁট পর্য্যন্ত এসে ফিরে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে—'ওই দেখলে খরগোস।'—বলে চেঁচিয়ে সে লোকটা এত জোরে ছুটতে আরম্ভ করল যে তা বলা যায় না। সে ছুটছিল আর আমি বোকার মত হাঁ করে বোবার মতো দাঁড়িয়ে খরগোস কোথায় তাই দেখবার জন্য চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম, এর মধ্যে সে দৌড়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তাকে এই এখন দেখতে পাব, এই একটু পরেই সে ফিরবে, এই ভাবতে ভাবতে আমিও চলতে লাগলাম। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। পথটি একেবারে নির্জন, নিঃঝুম।"

১ সেকালের এক রকম সোনার আংটির মারাঠি নাম।

"অনেকক্ষণ হয়ে গেল তবুও যখন সে বজ্জাত লোকটা আর ফিরে এল না, তখন আমি ধপ করে একটা গাছের তলায় বসে পড়লাম। আমার মনে হল লোকটা নিশ্চয় আমাকে ফাঁকি দিয়েছে। কি যে করি তা ভেবে পেলাম না। কোন অজানা পথে এসে পড়েছি, এখন কোন দিকে কোথায় যাই কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তখন শেষ কালের যা করা, তাই করলাম। অনেকক্ষণ বসে বসে কাঁদলাম। কিন্তু উপায় কি! কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হলাম; এখন বাড়ি কি করে যাব, মাকে কখন দেখব, যমুকে কখন দেখব, ঠাকুরদা কি বলবেন—এই সব চিন্তা একটার পর একটা মনে আসতে লাগল। আর কান্না উথলে আসছিল।"

"এমন সময় দেখতে পেলাম সামনের দিক থেকে একজন ব্রাহ্মণের মতো পাগড়ী-পরা ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে আসছেন। তখন আটটা-নটা বেজে থাকবে। আমার কাছে এসে আমাকে কাঁদতে দেখে তিনি বললেন, 'খোকা তুই কার ছেলে? একলা বসে কাঁদছিস কেন?' তাঁর এই প্রশ্ন শুনে আমার আরও বেশি করে কান্না এল। ভদ্রলোককে বড় দয়ালু মনে হল। আমাকে উঠিয়ে আমার পিঠে মৃদু মৃদু চাপড় দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন তিনি, আর আস্তে আস্তে আমাকে সব কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমিও তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। সেখান থেকে অনেক দূরের এক গ্রামের কুলকর্ণী[১] তিনি। আমাদের বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূর, তাই তিনি আমাকে সঙ্গে করে তাঁদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাকে খেতে দিলেন। আমি ভারি ক্লান্ত হয়েছিলাম বলে আমাকে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে বললেন। তখন বেলা দুপুর দেড়টা। তিনি বললেন, 'বেলা পড়ে এলে তোর সঙ্গে চাকর আর ঘোড়া দিয়ে তোকে আমি তোর বাড়ি পাঠিয়ে দেব।'"

"আমি হেঁটে হেঁটে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই গা এলিয়ে দিতে না দিতেই ঘুমিয়ে পড়লাম, আর পাঁচটার কাছাকাছি জেগে উঠলাম। কুলকর্ণী মশাই সব প্রস্তুত রেখেছিলেন। আমি রওনা হব এমন সময় ঠাকুরদাকে আসতে দেখলাম। তখন আমার যে কি মনে হল তুই ভেবেই

১ কুলকর্ণী—গ্রামের হিসাব-নিকাশ রক্ষককে মারাঠিতে কুলকর্ণী বলে। সে-কাজ যাঁরা করেন, কিংবা যাঁদের বংশে পূর্বে সে কাজ ছিল, তাঁদের পদবী থাকে কুলকর্ণী।

স্তাখ। সব কথা শুনে তিনি আমাকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'সর্বেশ্বরই আজ আমাদের খোকাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন! ভিকবালীর অন্ত· হতভাগা সেই চোর যদি ছেলেটাকে মেরে ফেলত! তারই বা ঠিক কি! ওহে, অমন ঘটনাতো কম হয় না!' কুলকর্ণী মশায়ের দিকে চেয়ে ঠাকুরদা কথা-গুলি বললেন। অনেকক্ষণ গল্প-সল্প হল। তারপরে কুলকর্ণী মশাই রাত্তিরে ঠাকুরদাকে ফলাহার করে যেতে অনুরোধ করলেন। ঠাকুরদাও হ্যাঁ, না করতে করতে তাঁর কথায় সম্মত হলেন। তারপর, মানে চাঁদ উঠলে, আমাদের রওনা হওয়া ঠিক হল, আমরা তখন রওনা হয়ে চলে এলাম।"

এই হল দাদার অভিজ্ঞতা। সে যেমনটি বলেছিল আমি তেমনটি লিখেছি। এই ঘটনাটির কথা পড়ে হয়তো কেউ কেউ আশ্চর্য বোধ করতে পারেন; হয়তো অনেকে মনে করবেন যে আমাদের ভাইবোনের জীবনধারা ছেলেবেলা থেকে যেন কেমন আশ্চর্য রকমের। অবশ্য অনেকটা তা তেমন ছিলই।

এইসব ঘটনা দাদার কাছ থেকে আমি প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছিলাম। আমি প্রশ্ন করে চলেছিলাম, তারপর, আর সে বলে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নোত্তররূপে সব কথা এখানে লিখলে হয়তো তা নীরস মনে হত, তাই যেন তা দাদাই একটানা বলছে, এই ভাবে দিয়েছি। দাদার এই সব কথা শুনে অবশ্য সে বিষয়ে আমাদের আরও কথাবার্তা হল। কিছুক্ষণ আমি সেই চিঠির কথা ভুলেই ছিলাম। এমন সময় দাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "যমু, আমি যাওয়ার পর বাড়িতে কি-কি হল তা তো কই আমাকে বললিনা?" তার প্রশ্ন শুনে তক্ষুণি আমার সেই চিঠির কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ যখন আমরা দুজনে গোপনে গল্প করছিলাম, তখন তাকে সেই চিঠিখানি দেখাই কি না-দেখাই এমন দ্বিধা আমার মনে ছিল না। সেটা নিশ্চয়ই দাদাকে দেখাব ঠিক করে, সে যাওয়ার পরে যা-যা ঘটেছে সে-সব আদ্যন্ত তাকে বলে, চিঠির কথাও বিস্তৃত ভাবে বললাম।

সব শুনে দাদা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল, তারপর উৎকণ্ঠিত স্বরে তাড়াতাড়ি বলল, "নিয়ে আয় দেখি, চিঠিটা কোথায়?" কিন্তু সে কথা তার মুখ দিয়ে বার হওয়ামাত্র, 'দাদা এখন আমাকে কি বলবে' মনে করে আমার ভারি ভয় হল। কি জানি 'এমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চিঠি তুই লুকিয়ে কেন রাখলি' বলে, দাদা যদি আমার ওপরেই চটে গিয়ে মাকে কিংবা ঠাকুরদাকে গিয়ে সব বলে দেয়। কিন্তু দাদা যখন চিঠিটা চাইল, তখন

আর আমার ভয় থাকল না ; আমি ছুটে গিয়ে চিঠিটা এনে তার হাতে দিলাম। চিঠিটা তাকে দিতে আমি এতটা উতলা হয়েছিলাম, যে দৌড়ে আসতে দরজার গোড়ায় চৌকাঠে পা আটকে আছাড় খেয়ে পড়লাম। কিন্তু তখন যে তাড়াতাড়ি করার দরকার ছিল, পড়া-টড়ার দিকে কে লক্ষ্য করে ? চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে দাদার কাছে গিয়ে তার হাতে চিঠিটা দিলাম। দাদা আমার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে আমার হাত ধরে একটু দূরে গিয়ে, চিঠিটা খুব মনোযোগ দিয়ে মনে মনে পড়ে দেখল। পড়তে পড়তে তার মুখ ভার হয়ে উঠল। আর তাই দেখে আমার মুখের অবস্থাও নিশ্চয়ই তারই মতো হয়ে থাকবে। দাদা মনোযোগ দিয়ে চিঠি পড়ছিল আর কি যেন ভাবছিল। আমি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, আর তার চিন্তা কখন শেষ হবে সেই অপেক্ষা করছিলাম। এই এতটুকু চিঠি আর দাদা অত কি ভাবছে, মনে করে আমি খুব অধীর হয়ে উঠেছিলাম।

বাস্তবিক চিঠি পড়তে তার তত সময় লাগেনি। এই ঘটনাটি লিখতে আমার যত সময় লেগেছে ততটা সময়ও তার লাগেনি। কিন্তু যার মন অধীর, সে পলকে দণ্ড, আর দণ্ডকে প্রহর মনে করতে থাকে। শেষে আর থাকতে না পেরে দাদার হাত ধরে নেড়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ওরে, অতক্ষণ ধরে কি পড়ছিস ? কথা-টথা বলবি কি না ?" আমি যখন এই কথা বললাম তখন তার চোখ বেয়ে টপ করে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তাই দেখে আমার বুক থর থর করে কেঁপে উঠল, আর মনে হল যে চিঠিতে নিশ্চয় কিছু ভয়ানক সংবাদ লেখা আছে ; তা না হলে মার অমন অবস্থা, আর ছোট হয়েও দাদার অমন অবস্থা হবে কেন ! এই মনে হতেই মন আরও বেশী অধীর হয়ে উঠল।

এমন সময় দাদা আমার হাত খপ করে শক্ত করে ধরল, আর আমার দিকে কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "যমু, আমার কথা শুনবি ?"

আমি খুব আকুল ভাবে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, বল।"

দাদা বলল, "কিছু না। এই চিঠিতে কি লেখা আছে তা আমাকে জিজ্ঞেস করিস নে, ব্যস্। তুই এখনো ছোট, তুই এর কিছু বুঝতে পারবি নে।"

এই কথা বলবার সময় তার কণ্ঠস্বর আর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পেরে-ছিলাম যে, চিঠির বিষয় আমাকে একেবারে কিছু না বলবার স্থির সিদ্ধান্তই

সে করেছে। তাই তার এই কথা শোনামাত্র আমার মন যে কেমন হল, তা আমি আজ নিজে কল্পনা করতে পারছি, কিন্তু অন্য কেউ পারবে না। এতদিন যে আশা করে বসেছিলাম, তা একেবারে নিস্ফল হয়ে গেল। এই চিঠির অভিপ্রায় বুঝতে পারার কোনো আশাই নেই তা নিশ্চিত জানলাম। এতদিন দাদার জন্য চিঠিটা কত যত্ন করে রেখেছিলাম, সেটা তাকে দিলাম, সে পড়েও দেখল, আর আমি এত উতলা দেখেও চিঠিতে কি লেখা তা আমাকেই সে বলল না! এই ভেবে তার উপরে আমার যে কি রাগ হল তা আমি কি করে বোঝাব! সেই রাগে তাকে জোরে কামড়ে দিতে আমার ইচ্ছে হল, অন্ততঃ সেই কাগজটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখতে ইচ্ছে হল। তাকে আঁচড় কাটতে ইচ্ছে হল। এমন অনেক কিছু চিন্তা করলাম। দাদা কিন্তু একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বার বার চিঠিটার দিকে চেয়ে দেখছিল, যেন কোন রাজপুরুষ রাজকর্মের কথা ভাবছে!

আমি সত্যি তার ওপরে এত চটে গেলাম যে শেষে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এ চিঠিতে কি লেখা আছে তা তুই আমাকে বল্‌বি কি না, বল্‌ দেখি।" কিন্তু আমার কথা সে বোধ হয় শুনতেও পায়নি। কারণ, সে হুঁ, উঁহু পর্যন্ত করল না। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে কোন কথাই কইে না দেখে, তার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "ও কি! কি লেখা আছে বলবি না? না বললে দে আমার চিঠি।—হ্যা—বলে রাখছি—আর—"

"যমু, তোর মত বোকা মেয়ে আমি আর দেখিনি। তোকে একবার বলেছি তো যে, এই চিঠিতে যা লেখা আছে তা তুই জিজ্ঞেস করিস নে, আর আমি তা তোকে বলবও না। এই চিঠিখানাও তুই আর ফেরৎ পাবিনে।" একেবারে শান্তভাবে দাদা যখন এই উত্তর দিল তখন যেন আমার গা জ্বলে উঠল। গায়ে যেন আগুন লেগেছে এমন ভাবে আমি রাগে ছটফট করতে লাগলাম। চোখ দিয়ে গঙ্গাযমুনার প্রবাহ শুরু হল, আর শেষে রাগের তাড়ায় তাকে বললাম, "আমার চিঠি নিয়ে আমাকেই বলবিনে, আবার চিঠিও ফেরৎ দিবিনে? দাঁড়া—দুষ্ট, বজ্জাত!" তেড়ে-মেড়ে আমি চিঠিটার উপর লাফিয়ে পড়লাম, কিন্তু দাদা চট করে দূরে সরে গেল, আর চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে ফেলে ঠিক আগের মতই শান্ত

ভাবে বলল, "যমু, তুই ছেলেমানুষ, এই চিঠিতে কি লেখা আছে তা তোর না জানাই ভাল। আর জানলেও কিছু বুঝতে পারবিনে। কেন মিছিমিছি চেঁচাচ্ছিস ?" এই বলে সে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল।

অনেকে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে যখন নিজের খুব রাগ হয় আর যার উপরে রাগ করেছি সে যদি তখন একেবারে শান্তভাবে কথা বলে, তাহলে নিজের রাগ যেন দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে। এখানেও ঠিক তাই হল। শান্তভাবে উত্তর দিয়ে আমাকে ঠিক বোকা বানিয়ে, আমার সেই চিঠিখানি ভাঁজ করে, আস্তে আস্তে সেটিকে খামে পুরে দাদা শান্ত ভাবে চলে গেল। তার সেই আশ্চর্য রকম শান্ত ভাব দেখে আমি অবশ্য অবাক আর ততোধিক রেগে গেলাম। আমার এই নিষ্ঠুর ভাই আস্তে আস্তে প্রশান্ত ভাবে চলে যাচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু তেমন করে কতক্ষণ থাকা যায়! সে বাড়ির ভেতরে ঢুকবে এমন সময় নিজেকে সামলে নিয়ে আমি তার পিছনে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু তাকে কি আর ধরা যায়! সে ভিতরে ঢুকে পড়ল। আর অবশ্য সে-চিঠিখানিও আমার হাত থেকে চলে গেল। যতক্ষণ চিঠি আমার কাছে ছিল, ততক্ষণ তার মর্ম জানার কিছু আশা ছিল, এখন তো সে আশা সুদূর। তাই তখন আমি শেষ অস্ত্রটি বার করে এক নিভৃত কোণে গিয়ে সেটি শানাতে লাগলাম—মানে, কাঁদতে লাগলাম। ভেবেছিলাম যে আমাকে কাঁদতে দেখে ভয় পেয়ে দাদা আমার কাছে আসবে—আর আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চিঠির অল্প একটুখানি কথাও আমাকে শেষ অবধি বলবে।

ইতিমধ্যে আর একটি বড় ভালো উপায় আমার মনে পড়ল ; অমনি মন বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল আর বিশ্বাস হল যে সেই উপায়টি অবলম্বন করলেই দাদা নিশ্চয় হেরে যাবে, আর আমাকে খুশী করবার জন্য যত পারে চেষ্টা করবে। এবার সে উপায়টি অবলম্বন করবই ঠিক করে আমি তরতর করে দাদার কাছে গেলাম আর চোখ বড় বড় করে বললাম, "দাদা-সাহেব, চিঠিটাতে কি লেখা আছে তা আমাকে বলুন, নইলে, আমি গিয়ে সব কথা মাকে বলে দিচ্ছি।" এই বলে যেন আমার কৌশলের কি ফল হয় তাই দেখবার জন্য আমি তার কাছ থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তার মুখের ভাব বদলে গেল ; সে একটু ভ্রূকুটি করল ; তা থেকে বুঝলাম যে সে ভাবছে, 'এখন কী করি।' তার

মুখের ভাবের পরিবর্তন হওয়ামাত্র আমার মনে হল—ব্যস, আমার ঠিক জিত হয়েছে। এখন নিরুপায় হয়ে সে সব কিছু আমাকে বলবে। এ ভেবে আমার অবশ্য বেশ একটু আনন্দ হল। এমন সময় নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে চেপে ধরে আর ভ্রূকুটি করে সে বলল, "মার এত অসুখের ভেতরে তুই তাঁর কাছে বোকার মত এ-সব নালিশ করবি? যা, গিয়ে বলগে যা, কিন্তু মনে রাখিস মাকে তুই এ-কথা বলতে গেলে অমনি এ-দিকে আমি ঠাকুরদাকে গিয়ে এই চিঠিটা দেখিয়ে এটা তুই কেমন করে পেলি আর তা নিয়ে তুই কি-কি করলি, সব বলে দেব। তার পরে কি হবে তা তুই-ই ভেবে ছাখ্।"

দাদার এই কথা শুনে আমার মনের অবস্থা যা হল তা আর কি বলব! আমার শেষ অস্ত্র নিষ্ফল হয়েছে, উলটে নিজের দাঁত নিজের গলায় ঢুকবার উপক্রম হয়েছে; এখন খালি কাঁদতে বসা ছাড়া আমার আর করার অন্য কিছু নেই। আবার তাও একপাশে গিয়ে সকলের অজ্ঞাতে কাঁদতে হবে, নইলে কেউ কাঁদছিস কেন জিজ্ঞাসা করলে সত্যি কথা বলতে হবে, যদি মিথ্যে ভান করতে যাই তবে নিষ্ঠুর দাদা আমাকে হয়রান না করে ছাড়বে না। এই সব মনে করে আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম, আর রাগে আত্মহারা হয়ে বললাম, "দাদা না ছাই, দুষ্টু কোথাকার! মেরে ফেল একেবারে আমায় ঠাকুরদাকে বলে দিয়ে"—এই বলে তার হাতে জোরে কামড়ে দিয়ে, দৌড়ে পালিয়ে গেলাম।

আমি তাকে যে কত জোরে কামড়েছিলাম, তা আমার দাঁত জানে আর জানে তার হাত। আমার দাঁত তার হাতে একেবারে বসে গিয়েছিল। আমি পালিয়ে সটান গিয়ে কুশীর বাড়িতে হাজির হলাম। ক'দিন আগে তার বাড়িতে ঝগড়া হওয়ার পর থেকে আমাদের আড়ি ছিল, কিন্তু তখন অন্য কোনো উপায় ছিল না। বাড়িতে বসার জো ছিল না, কেন না প্রতিশোধ নেবার জন্য দাদা হয়ত ছুটে আসবে, অথবা ঠাকুরদাকে সব কিছু বলে আমাকে জব্দ করবে তার ঠিক কী? কুশীর দরজার গোড়ায় বনীর ভাই সেই ধোণ্ডু দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাকে দেখতে পেয়েই হাত নেড়ে ভেঙচি কেটে বলে উঠল, "আসুন, স্মারা দিদিমণি, আমার বউ হতে এসেছেন বুঝি?" একেই আমি তার উপর চটে ছিলাম, তাতে আবার দাদাকে কামড়ে এসেছিলাম, সেই রাগের ঝোঁকও তখন ছিল। সেই

ঝোঁকে, "বয়ে গেছে তোর বৌ হ'তে!" বলে আমি একেবারে তেলেবেগুনে জলে উঠে তার দিকে তেড়ে গেলাম। কিন্তু সে চট্ করে ভিতরের দিকে সরে পড়ল আর তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

সে যখন দুয়োর দিচ্ছিল ঠিক সেই সময় আমি দু'-দুয়োরের মাঝে হাত দেওয়ায়, আমার হাতের চামড়া দুয়োরের ফাঁকে এত জোরে চিপটে গেল যে আমি চীৎকার করতে লাগলাম। কিন্তু তবুও সে হতভাগা মোটেই দুয়োর খুলল না। উলটে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে মজা দেখতে লাগল। আমার হাতে এত যন্ত্রণা হতে লাগল যে তা বলে বোঝান অসম্ভব। আমি আরও জোরে চেঁচাতে লাগলাম, তখন সেই হতভাগী কুশী এসে দুয়োর খুলল। আমার হাত একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল। হাত খুবই জোরে চিপটে গিয়েছিল, হাতে বড় ব্যথা করছিল, কিন্তু সেই নির্লজ্জ ধোণ্ডু জানলায় দাঁড়িয়ে মজা দেখবে, তা আমার সহ্য হচ্ছিল না! সেই লক্ষ্মীছাড়াটাকে গালি দিতে দিতে সব কথা আমি কুশীকে বললাম। আর শেষে "তোকে যদি এখন হাতে পাই তা হলে এমন কামড়ে দেব যে ছিঁড়ে নেব চামড়া।" এই আমি বলছি এমন সময় পোড়ামুখী বহুদি তরতর করে ছুটে এসে—"কামড়া তো দেখি কেমন কামড়াবি? এই যে এখানে আছে," এই বলে জোরে টেনে সে আবার আমাকে ঠেলে দিল। তখনকার তার ভয়ংকর মূর্তি দেখে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। আমার আগেকার রাগ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম যে এখন আর আমার কোনো ক্ষমতা নেই। এমন সময় সেই দুষ্টু ছোঁড়াটা নিজের চামুণ্ডা বোনের আড়ালে লুকিয়ে বলল, "নিজের বরকে কামড়ায় এমন বউ আমি কখনো দেখিনি বাবা!"

তার এই ফাজলামী শুনে আমি সত্যি একেবারে তেলেবেগুনে জলে গেলাম। কিন্তু উপায় কি! তারা দুই রাক্ষস আর আমি যে একেবারে একা! আমি পিছনে ফিরলাম, তখন সেই লক্ষ্মীছাড়াটা আমাকে লক্ষ্য করে, "কি ভীতুরে বাবা, ভয়কাতুরে"! বলে আমাকে ক্ষ্যাপাবার চেষ্টা করেছিল।

এই রকমে সেদিন সব জায়গায় হার মেনে সমস্ত দিনটা ভারি কষ্টে কাটল। সব দুঃখের মধ্যে এই এক সুখ ছিল যে, আমি যা ভয় করেছিলাম সে রকম কিছু দাদা করেনি, কেবল আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল!

এলোমেলো

গত পরিচ্ছদে যে-সব ঘটনা বলেছি তারপর একমাস কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত সে-চিঠিখানির অভিপ্রায় আমি তো জানতে পেলামই না, তাছাড়া সেদিন থেকে দাদা সব সময় বড় উদাসীন হয়ে রইল। দুদিন পর্য্যন্ত তো আমার সঙ্গে সে একটি কথাও বলল না। তার পরে কথা বলতে লাগল; কিন্তু ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকুই। যাই হোক্, সেদিন থেকে তার ছেলেবেলা একেবারে শেষ হয়ে সে ভারি বিবেচক আর সাবালক গৃহস্থদের মত গম্ভীর হয়ে গেল। আর সে আমার সঙ্গে হাসিঠাট্টা, খেলাধুলো করতনা। যখন তখন কিছু-না-কিছু লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করে থাকত, বাকি সময়টা মার বিছানার পাশে বসে তাঁর শুশ্রূষা করত কিংবা তাঁর মন খুশি রাখবার চেষ্টা করত। তার মন আমার দিকে আবার আকৃষ্ট হয়, সে যাতে আগেকার মতো আমার সঙ্গে খেলা করে, কথা বলে, সে জন্য আমি অনেক চেষ্টা করলাম। একদিন তো একটু আড়ালে তার সঙ্গে দেখা করে, ছল ছল চোখে বুক ভরা স্নেহ নিয়ে তার পায়ে পর্য্যন্ত পড়লাম। আর তাকে বললাম, "ভাই দাদা, সেদিন তোকে আমি কামড়েছি, তখন থেকে আমার ওপরে কেন এত রাগ করে আছিস? এই ত্যাখ্ আমি তোর পায়ে পড়ছি, কিন্তু ভাই আমার সঙ্গে কথা বল! আমার সঙ্গে আড়ি করিসনে। মাইরি, তোর গা ছুঁয়ে শপথ করছি, মার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, কিন্তু তুই আগেকার মত হাসি-তামাশা করে আমার সঙ্গে কথা বলবি ভাই।" এই বলে আমি সত্যি কাঁদতে আরম্ভ করলাম। আমি দাদার সঙ্গে যতই ঝগড়া করি না কেন, সে না হলে আমার একদণ্ডও ভালো লাগত না। ভারি মন কেমন করত। পুরো একমাস হতে চলল সে আমার সঙ্গে একেবারে উদাসীন ব্যবহার করছিল। তাই খেলাতে কিংবা অপর কিছুতেই আমার মন লাগছিল না। পাশে কুশীর বাড়িতেই বা কি করে যাওয়া যায়? সেখানে যে বনীটার সঙ্গে মিল হচ্ছিল না।

সেই দুস্টু মেয়েটা তখনও কুশীদের বাড়িতেই ছিল!

শেষে সেদিন যখন আমি দাদার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম, তখন বড় মানুষের মত আমাকে বুকে টেনে নিয়ে সে বলল, "যমু ভাই, তুই আমাকে কামড়েছিস বলে আমি তোর সঙ্গে কথা-টথা কইছিনে, হাসছিনে, খেলছিনে তা মোটেই নয়, বুঝলি। আমার মন যে কি কারণে এমন উদাসীন হয়েছে তা তুই ছেলেমানুষ মোটেই বুঝতে পারবি না, বুঝলি। আমার পড়াশোনা করা দরকার, অঙ্ক কষতে হয়, তাই আমি কাজে ব্যস্ত থাকি।"

"ও কি ভাই দাদা, আমি বুঝতে পারব না মানে? আমি অত ছোট বুঝি? আমি সব বুঝতে পারি। তুই বল আমায়। আমি জানি বাবার সেদিনকার চিঠিতে সাংঘাতিক কিছু লেখা ছিল, তাই বোধ হয়—"

আমি যেই এই কথা বললাম, দেখতে দেখতে দাদার চেহারা কেমন যেন হয়ে গেল; সে সেখান থেকে চলে গেল। আমি ছেলেমানুষ, আর স্বভাবতঃ একটু কৌতুহলী ছিলাম, তাই আশ্চর্য বোধ করতে লাগলাম।

এমনি আরও কিছু দিন গেল। বাবার চিঠিপত্র আসত, সেগুলি ঠাকুরদা পড়তেন, কিন্তু তাতে কি লেখা তার এক অক্ষর পর্যন্ত বাড়িতে বলতেন না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত তবে বলতেন, "কিছু না, বেশ ভালো আছে।" এই রকম হতে-হতে একদিন একখানি পত্র এল। সেটা পড়েই ঠাকুরদা বাবার ওখানে যাবার জন্য জিনিসপত্র বাঁধতে বললেন। তিনি একাই যাচ্ছিলেন। দাদা আকুল ভাবে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করল, কিন্তু তিনি 'না' বলে একলাই চলে গেলেন। দাদা মুখ ভার করে বসল, শুধু তাই নয়, আমি তাকে আড়ালে গিয়ে কাঁদতেও দেখেছি। সে কাঁদছে দেখে আমিও তার কাছে গেলাম, তবু সে টের পেল না। আমি পিছন থেকে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম, আমি কম স্নেহশীল ছিলাম না, কিন্তু তখন আমার ইচ্ছা করে স্নেহ দেখানোর দরকার ছিল না। আপনি আপনি মন তখন উথলে উঠছিল। খুব প্রীতির সঙ্গে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে আমি বললাম, "দাদা, এমন আড়ালে বসে কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে তা আমায় কেন বলছিস নে?" আমার এই কথা শোনামাত্র সে চট্ করে ঘুরে আমার দিকে চেয়ে চোখ মুখ একেবারে পরিষ্কার মুছে ফেলে, তার সেই নতুন গম্ভীর ভাব এনে, আমাকে বলল, "তোকে কি করে বলি বল? তুই বুঝতে পারিস না সেই ভাল।" এই বলে সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে

চলে গেল। যেন তার ভয় করছিল যে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালে এই মেয়েটার প্রতি স্নেহের বশে নিজের মুখ থেকে হয়তো সত্যি কথা বেরিয়ে পড়বে।

দিনে দিনে মার শরীর খারাপ হচ্ছিল, তাঁর অসুখ বাড়ছিল, তা আমি বুঝতে পারি নি। তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছিল, তিনি দিন দিন দুর্বল হতে লাগলেন। তাঁর অন্নে রুচি ছিল না। তবু, পরে মার শরীর ভাল হল একথা সত্যি। কেন না অল্প দিনেই তিনি বিছানা ছেড়ে এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করার উপযুক্ত হলেন। কণ্ঠস্বর একেবারে স্বাভাবিক হয়ে উঠল, শুধু শক্তি পাওয়াটুকু বাকি এখন। তাঁর হাত-পাগুলো ভয়ানক সরু সরু হয়ে গিয়েছিল। তবু ঠাকুরদা ও ঠাকুমা বলাবলি করতেন যে, প্রাণ-সংকট থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাই আমরা মনে করতাম যে তাঁর আর কোনো বিপদের ভয় নেই। মার সেই অসুখের সময় আমি দাদার মতো অত বেশি তাঁর কাছে বসি নি। কেন না, সুন্দরী যখন জেগে থাকত তখন আমি তাকে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতাম। মার অসুখ যখন অনেক দিনের, তখনও সে ছুঁড়িটা মাই খেতই! শেষে, যে-কবিরাজ মাকে ঔষধ দিতেন তিনি সতর্ক করে দিলেন, বললেন যে, যদি মেয়েটাকে মাই না-ছাড়ানো যায় তবে তাঁর ঔষধে কোনো কাজ হবে না। "হয় মেয়েটাকে মাই ছাড়ান, নইলে আমার ঔষধ বন্ধ করে দিন।" সেদিন থেকে তাকে মাই ছাড়ানো ঠিক হল, অবশ্য তাকে মার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে নিয়ে যাওয়া, তার সঙ্গে খেলা করা, তার দেখাশোনা করা, কখনো তাকে দুধ খাওয়ানো—এসব কাজ আমিই করতাম। অত বড় মেয়েটা, কিন্তু মাই খাবার জন্য যেন ছট্‌ফট্ করত। তাই তাকে ভোলাতে বড্ড কষ্ট হত। কিন্তু এত করেও সে যে মাই ছাড়ল এই যথেষ্ট। কবিরাজ বলতেন সেদিন থেকে মার শারীরিক অবস্থা ভাল হতে লাগল।

এই ভাবে অনেক দিন কেটে গেল। ঠাকুরদা যাবার পরেও অনেক দিন হল। কুশলবার্তা জানিয়ে তাঁর দু-তিনখানি পত্রও এল। এদিকে সবাই যেন একটু সুস্থির বোধ করল। দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যে দাদার মনও আগেকার মতো ততটা উদাসীন ছিল না। ঠিক আগেকার মতো না হলেও, দাদা আবার অনেকটা আমার সঙ্গে হাসিখুশি আর খেলা করতে লাগল। ওদিকে সেই লক্ষীছাড়ী বনীটা, তার সেই ছোট বোনটী, আর দুষ্টু

ছেলেটা (খোণ্ডু)—তাদের বাড়ি ফিরে গিয়েছিল, তাই কুশীতে-আমাতে আবার বন্ধুত্ব হল! এখন আমাদের এত ভাব হল যে, কুশী নিজেই আমার সঙ্গে তাদের গালি দিতে লাগল আর আমার প্রশংসা করতে লাগল। সেই বনীটাকে আর খোণ্ডুটাকে তো সে ভারি দোষ দিতে লাগল। আমার অবশ্য তা খুব পছন্দ হত, কেননা সুন্দরী জেগে থাকলে তাকে নিয়ে সটান কুশীর বাড়ি এসে যত খেলা হুড়োহুড়ি করতে এখন কোনো বাধাই ছিল না। কুশীদের বাড়ি খুব বড় ছিল আর সে তার মায়ের বড় আদুরে ছিল বলে, যা-খুশি করলে কেউ তাকে বাধা দিত না।

এমনি করে কিছু দিন বেশ আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। একদিন বিকেল বেলা পাঁচটার পরে সুন্দরীকে কোলে নিয়ে আমি ঘুর্ণিপাক খেলছিলাম। এমন সময় দাদা সেখানে এল! সে অনেকক্ষণ বাইরে ছিল। সুন্দরীকে নিয়ে আমি দাদার দিকে দৌড়ে গিয়ে বললাম, "দাদা, দাদা—একে নিয়ে খেল না ভাই, আমি"—এই বলে আমি চোখ তুলে তার দিকে ভাল করে চাইতেই দেখতে পেলাম যে তার মুখের ভাব অদ্ভুত রকম কাঁদো-কাঁদো হয়েছে। তার চেহারাটা মোটেই স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল না। যাই হোক্, তখন আমি এত ঘাবড়ে গেলাম আর শুব্ধ হয়ে দাঁড়ালাম যে, দাদা যে সেখান থেকে কখন চলে গেল তা টের পর্য্যন্ত পেলাম না। আমি, সেই এক রত্তি মেয়ে, কিন্তু 'এ আবার কী ব্যাপার?'—ভেবে, ফাঁপরে পড়ে গেলাম। দাদা যখন বাইরে গিয়েছিল তখন রোজকার মতো সে আনন্দে ছিল, আর যখন ফিরে এল, এমন কেন হল?—এই মনে করে আমি দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। কিন্তু এত ছোট মেয়ে আমি, কিসের কি বুঝতে পারা কি আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? তবু তা জানবার জন্য ভারি লোলুপতা! দাদাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে বলে মনে হচ্ছিল না। কি জানি, যদি বিশেষ খবর থাকে, তবে হয়তো বাড়িতে কাউকে সে বলবে, এই মনে করে আমি তার পিছু-পিছু গেলাম। সে সটান মার কাছে গিয়ে বসল। মা বোধহয় তার কাঁদো-কাঁদো মুখ লক্ষ্য করেন নি—নইলে তাকে সে-বিষয়ে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করতেন। দুজনে একেবারে চুপ করে বসেছিলেন। আস্তে আস্তে দাদার মুখের ভাবের পরিবর্তন হল, সে আবার আগেকার মত উদাসীন হল।

তার পরের দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হল। তখন আমি তাকে

জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু, আমার কথা গ্রাহ্য না করে ঠিক আসল কথাটি বাদ দিয়ে, যা-তা একটা কিছু বলে, আমাকে ভাগিয়ে দিয়ে সে সেখান থেকে চলে গেল।

আট দিন পরে ঠাকুরদা ফিরে এলেন। তিনি যেদিন এলেন, সেদিন বাড়িময় মনমরা ভাব ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু ঠাকুরদা এসে মার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলার পর দেখতে পেলাম যে মাও একটু আনন্দিত হলেন। দাদাকেও সেদিন রোজকার চেয়ে কিন্তু আনন্দিত মনে হল।

তার পরে বেশী কিছু না-ঘটে এক মাস দেড় মাস কেটে গেল। বাবার খানদুই কুশল পত্রও এল। মা সেই যে একবার দুর্বল হয়ে পড়লেন তারপর যেন বড বেশী শক্তিলাভ করছিলেন না। শরীর ফিরে আগেকার মত হল না, শুধু তাই নয়, তিনি আরো বেশী কৃশ হতে লাগলেন। আর তাঁর গায়ের রং দিনে দিনে ফ্যাকাসে হতে লাগল। জ্বর কিন্তু একেবারে ছিল না।

বাড়ির পরিস্থিতি মোটামুটি এই রকম ছিল। এমন সময় একদিন বাবার চিঠি এল। তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে পুণায় থাকবেন মনস্থ করেছেন, সেখানে দাদার পডাশোনার ব্যবস্থা ভাল হবে, আর সবই ঠিক হবে। তাছাড়া মার ওষুধপথ্য-শুশ্রূষার দিক দিয়েও পুণা বেশ ভাল জায়গা।

এই চিঠি এলে পর আমাদের সকলের পুণা যাওয়া ঠিক হল। আট দিন পরে আমাদের নিয়ে যেতে বাবার আসার কথা ছিল। তিনি এলেন, আমরাও সকলে পুণায় চলে গেলাম।

আমাদের নতুন বাসা

পুণায় আমরা সদাশিব পেঠের[১] কার্বেদের[২] পাড়ায় বাড়ি-ভাড়া নিলাম। বাড়ির একটা অংশে ভাড়াটে ছিলেন এক ভদ্রলোক। সে-ভদ্রলোকটি কোন অফিসে চাকরি করতেন, আর তাঁর বাড়িতে তাঁর মা, স্ত্রী, আর দুটি সন্তান—এই কজন মাত্র লোক ছিল। দুটি সন্তানের মধ্যে একটি ছেলে, তার বয়স পাঁচ বছরের কাছাকাছি হবে, আর মেয়েটি বোধহয় আমারই বয়সী, কিংবা একটু ছোটও হতে পারে। তার হাতের বালায় হলুদের রং তখনও যায়নি, তাই মনে হচ্ছিল যে তার বিয়ে বোধহয় বেশীদিন হয় নি। আমার এই জীবনচরিতের সঙ্গে এই মেয়েটির সম্পর্ক আছে, কাজেই তার বিষয়ে পরে কিছু কিছু লিখতে হবে। তার বিয়ে হয়েছিল একথা বলার কারণ এই যে, আমাদের ঠাকুমাও আমাদের সঙ্গে পুণায় এসেছিলেন। সেই মেয়েটিকে দেখা অবধি আমার বিয়ের জন্য তিনি আবার অস্থির হয়ে উঠলেন। পুণায় এসে বেশ এক মাস, দু মাস পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি কিছু বললেন না। তারপর তিনি কিন্তু আর থাকতে পারলেন না, বাবার কাছে সে-কথা তুললেন। বাবা প্রথমে 'হ্যাঁ', 'না', 'এরই মধ্যে কেন'-ইত্যাদি যা বলবার বলে, শেষে তাঁকে বললেন—"আচ্ছা, বেশ, আমি পাত্রের অনুসন্ধান করছি।" তখন ঠাকুমা বড় খুশি হলেন। আর—আর—আমিই বা এখন আর কেন লুকিয়ে রাখি?—আমারও বড় ভাল লাগল। সেই দুর্গী, বয়সে সে আমারই মতো,

১ সদাশিব পেঠ—পুণা শহরের একটি পাড়া। পেঠ=পাড়া। পুণা শহরের বিভিন্ন পাড়াগুলির কয়েকটার নাম, সপ্তাহের দিনের নামে করা হয়েছে, যেমন শনিবার পেঠ, রবিবার পেঠ, সোমবার পেঠ, ইত্যাদি। শুধু বৃহস্পতিবার পেঠ নেই। অনেক পাড়ার নামকরণ ঐতিহাসিক ব্যক্তির নামে করা হয়েছে। যেমন আলোচ্যমান সদাশিব পেঠ। শেষ পাণিপথ যুদ্ধের বীর প্রধান সেনাপতি সদাশিব রাও ভাউ পেশোয়ার নামে হয়েছে সদাশিব পেঠ।

২ কার্বে—একটি মারাঠি গোত্রের পদবী।

বরঞ্চ ছোটই হবে—তার বিয়ে হয়েছে দেখে তখন 'আমার কবে বিয়ে হবে?' মনে হওয়া তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আর তা অবিলম্বে হবে জানতে পেরে আমার মন প্রফুল্ল হল তো বটেই।

এবার আমাকে দেখতে আসবে, তারপর "তোমার নাম কি মা?" বলে জিজ্ঞাসা করবে, আমি মাথা নীচু করে একেবারে আস্তে, যেন কানে কানে কথা বলছি, ঠিক সেই রকম করে "যমু" বলে উত্তর দেব। আমার ভায়ের নাম বলব, মোটের উপর যা-যা জিজ্ঞাসা করবে তার উত্তর দেব; আর উঠে যেতে বললে সেখান থেকে উঠে গিয়ে দুয়োরের আড়ালে দাঁড়িয়ে, তারপর কি-কি কথা হয় তা শুনব, এই রকম নানা ধরণের (অবশ্য আনন্দদায়ী) চিন্তা আমি করতে লাগলাম। কেন না, এ সব সুখ এবার আমি নিশ্চয় অনুভব করব। সে পর্যন্ত শুধু একবার মাত্র আমাকে একজনেরা দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু তখন যত লাজুক ভাবে আমার উত্তর দেওয়া দরকার ছিল, ততটা লাজুক আমি হতে পারিনি। সে জন্য ঠাকুমা আমাকে বেশ খানিকটা বকুনি দিয়েছিলেন। সে-কথা মনে রাখার দরকার এতদিন ছিল না তাই ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন সময় মতো সে-সব আমার মনে পড়ল।

বাবা ঠাকুমাকে আশ্বাস দেবার পর কিছু দিনের মধ্যেই ঠাকুমার চেষ্টার ফলে, দুপুর বেলায় একজন ভদ্রলোকের আমাকে দেখতে আসার কথা হল। তখন ঠাকুমা নিজে আর দুর্গীকে দিয়ে, কেমন করে আমাকে কথা বলতে হবে, কি রকম ভাবে বসতে হবে, কেমন করে মুখ তুলে চাইতে হবে, ইত্যাদি অন্ততঃ দশবার বুঝিয়ে দিলেন। দু'বার আমাকে তার মহড়াও দিতে হল। দুর্গী হল সেই ভদ্রলোক, আর সে দশ রকমের দশটি প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করল। তার অভিজ্ঞতা একদম তাজা ছিল কিনা, তাই তার শিক্ষা আমার খুব কাজে লাগল। মার ভারি ভারি গয়নাগাঁটী পরে, কপালে কুঙ্কুম আর চোখে কাজল লাগিয়ে, আমি সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে, পথ চেয়ে রইলাম। ঠাকুমাও সে-ভদ্রলোকটির পথ চেয়ে রইলেন। বাবা দুপুরবেলা একটু গা এলিয়ে দিতেন। সেদিন তিনি একটু আগে আগে উঠে পড়লেন। নিচে কারো পায়ের শব্দ হলেই সেই ভদ্রলোকটি এসেছেন মনে করে ঠাকুমা 'যমু' বলে ডাক দিলেন, আর আমি ততবার দুর্গীর সঙ্গে তাদের বাড়ি পালিয়ে যেতে চাইলাম।

এই রকমে আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকলেও সে-ভদ্রলোকটি শেষ পর্য্যন্ত মোটেই এলেন না। ঠাকুমা একেবারে নিরাশ হলেন, তাতে আবার ফোড়ন এই পড়ল যে, বাবা বললেন তাঁর ঘুম শুধু শুধুই নষ্ট হল। তখন ঠাকুমার সেই ভদ্রলোকটির উপর এত রাগ হল যে, তিনি একেবারে ঠিক করে ফেললেন সে-ভদ্রলোকটিকে আর কক্ষনো মেয়ে দেখাবেন না। আমার তো ভারি নিরাশা হল। কেন না, যাতে আমাকে ভাল দেখায় সে জন্য আমি কি কম চেষ্টা করেছিলাম! চুলে যেন খুব টান[১] পড়ে এমন ভাবে চুল টেনে বেঁধে বিনুনি বাঁধতে বলেছিলাম, তাই ঠিক তেমনি করেই আমার বিনুনি বাঁধা হয়েছিল। চুলে ভারি টান পড়ছিল, কিন্তু যতক্ষণ দেখতে আসবে আশা ছিল ততক্ষণ চুলের টানটা তত টের পাচ্ছিলাম না। যখন সন্ধ্যা হয়ে এল তখন চুলের টানে অস্বস্তি বোধ হতে লাগল, আর যখন নিশ্চিত জানা গেল যে তিনি আসছেন না, তখন আমার চুলের টান আর ঠাকুমার ধানাই-পানাই অসহ্য হল। "আসতে পারবে না তো আসবে বলল কেন? দায়ে পড়ে কেউ তো পায়ে লুটিয়ে পড়ে নি?" এই রকম সব কথা ঠাকুমা বলতে লাগলেন। অবশ্য তার প্রতিধ্বনি আমার বুকেও একটু একটু হচ্ছিল।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বাবা ঠাকুমার মুখ থেকেই সত্যি ঘটনা বার করে নিলেন। তার সারাংশ এই যে ঠাকুমা তুলসী বাগে[২] গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁকে একজন নতুন পরিচিতা স্ত্রীলোক বলেছিলেন, "আমার ভাসুরপোর বিয়ে হবে, সে বেশ ভাল পাত্র। আপনার নাতনীটির বিয়ের সম্বন্ধ সেখানে ঠিক করতে পারলে দেখুন। তার বাবা একশো পঁচিশ টাকা মাইনে পায়। কাল রবিবার তো? আমি তাঁকে বলে তিনি রাজী হলে তাঁকে মেয়ে দেখতে পাঠিয়ে দেবো'খন।" এই কথাগুলি সেই মহিলা কথায় কথায় বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে-কথা পাকা মনে করে ঠাকুমা সবার কাছে বলে বেড়ালেন যে সে-ভদ্রলোকটি নিশ্চয় আসবেন

১ সেকালে মহারাষ্ট্রে মেয়েদের চুল বেশ করে আঁচড়ে, যথাসম্ভব শক্ত করে টেনে বেঁধে বিনুনী করা হত। চুল যত টেনে বাঁধা ততই যেন পরিপাটি করে বাঁধা—এই রকম মনে করা হত।

২ তুলসী বাগ—পুণায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত শ্রীরাম মন্দির। এই মন্দিরটি ঐতিহাসিক পেশোয়াদের কালে, আঠার শতাব্দীতে, নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। এখনো এই মন্দির পুণার বিখ্যাত।

মহিলাকে দিয়ে সংবাদ দিয়েছেন, আর তিনি তিনশো পঁচিশ টাকা মাইনে পান। পাত্রটি হ'চ্ছে তার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে। তিনি দয়ালু হয়ে সেই ছেলেটিকে বিদ্যার্জনের জন্য নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন।

কিন্তু তারপর ভগবানের দয়ায় আমাকে অনেকে অনেকবার দেখতে এসেছিলেন, আর আমার লাজুক ভাবে ঘাড় ফেরাবার, দেখাবার, একেবারে কানে কানে কথা বলার মত আস্তে নাম বলবার যত শিক্ষা ও শখ ছিল, তা ষোল আনারও বেশী বোধহয় পরিপূর্ণ হয়েছিল।

তোর বয়াতে কি আছে ?

যাই হোক্, আমরা পুণায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখের দিন সমাপ্ত হ'ল। অত ছোট বেলায় দুঃখের কারণটি দূর হলেই সব সুখ মনে হত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আজ যখন বিগত দিনের ঘটনা লিখছি তখন মনে হচ্ছে, যেদিন আমরা ঠাকুরদার বাড়ি যাত্রা করি সেদিন থেকেই আমার দুঃখের শুরু হল। আর তার শেষ যে কোথায় হবে, তা দেখা এ হতভাগিনীর এখনো বাকি! এখন আর সত্যিকারের সুখ আমার কপালে কি-যে আছে তাতো দেখতেই পাচ্ছি! যাক্।

এই পরিচ্ছেদটি আরম্ভ করার সময় এই রকম চিন্তা আমার মনে ওঠবার কারণ মার শারীরিক অবস্থা। আমরা পুণায় আসবার পর দু তিন মাস আমাদের মনে হয়েছিল যে তাঁর অসুখ সেরে উঠ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। তাঁর শরীরে জীর্ণ জ্বর ছিল। সেটাকে অযত্ন উপেক্ষা করা হয়েছিল তাই, কিংবা হয়তো আরো অন্য কোন কারণে, এখন আর তাঁর শরীরে আগেকার মতো বল ছিল না। শুধু তাই নয়, দেখতে পাচ্ছিলাম যে দিনে দিনে তাঁর মরণ এগিয়ে আসছে। এ কথা আমি কি কারণে বলছি, তাই এখন বলব।

মা দিনে-দিনে দুর্বল হচ্ছিলেন। তার উপর আবার তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। বমি করে করে তিনি একেবারে হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন। অরুচি হয়েছিল, তাই তিনি কিছু খেতে পারতেন না। কিছু দিন আগে থেকেই তাঁর ঘুম কমে গিয়েছিল, তার উপর সুন্দরী ভারি খুঁতখুঁতে হয়েছিল। এত দিন সে ঠাকুরমার সঙ্গে ছিল, তবু তাঁর কাছে সে বেশীক্ষণ থাকতে চাইত না। যত দূর দেখা যাচ্ছিল, আজ কাল বাবার কোনো কাজই ছিল না। কেন না, তিনি আর আপিসে-টাপিসে কোথাও যেতেন না। তার কারণ কি তা আমি এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ জানতে পারিনি। আর

যখন আমি নিজেই ওই সময়ে কিছু জানতে পারিনি, তখন পাঠকদের তা আগেই বলে ফেলা আমার উচিত হবে না।

সুন্দরী শুধু এক আমার কাছে থাকত। কিন্তু আমার যে ভারি খেলার ঝোঁক ছিল। তাকে নিয়ে খানিকক্ষণ এদিকে-ওদিকে ঘুরে, খেলা দেখলেই আমার নিজের ইচ্ছা হত খেলতে, আর আমি তাকে মার কাছে ফেলে পাশের বাড়ি পালিয়ে যেতাম। আমার এই কর্মের জন্য পরে আমি কত অনুতাপ করেছি তা যদি আমার ভগিনীরা জানতে পারেন তবে নিশ্চিত জানি, তাঁরা কখনো তেমন কাজ করবেন না। সেই খিট্‌খিটে মেয়েটা মাকে কত জালাতন করত; একেই তো তাঁর অসুখ, তাতে তিনি ভাবনায় অভিভূত, এমন অবস্থায় মার তখন কত যে কষ্ট হত, তা যদি এখনকার মত তখন বুঝতে পারতাম, তবে কত লাভ হত! আমার ভাগ্য বড় ভালো তাই মার মত গুণবতী সতীর চেষ্টার ফলে অবিলম্বে আমার স্বভাবে পরিবর্তন হল, আর আমি তাঁর অল্প কিছু সেবা করতে পারলাম।

একদিন দুপুর বেলা, বোধহয় তখন তিনটে; বাড়িতে সব ঠাণ্ডা। বাবা একটু আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুরমাও সুন্দরীকে নিয়ে কোনো এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের বাড়ি গিয়েছিলেন। দাদা ইস্কুলে গিয়েছিল। মা কিন্তু আমাদের দোতালার যে-ঘরটা আড়াআড়ি ভাবে ছিল সেখানে একা বসেছিলেন। সাধারণতঃ এমন সময় আমি বাড়ি থাকতামই না। কিন্তু পাশের বাড়ির দুর্গা শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিল, তাই অন্য কোন উপায় না থাকাতে, আমি বাড়িতেই আমার খেলাঘরের কাছে বসে খড়ম-খড়ম খেলছিলাম। এমন সময় আমার মনে হল যে মা যে-ঘরে বসেছিলেন সেই ঘর থেকে কেমন যেন ফোঁপানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তক্ষুণি ব্যাপার কী তা দেখতে ইচ্ছে হল আর আমার পা সেদিকে ঘুরল। ঘরে গিয়ে দেখি যে মা বিছানায় শুয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তিনি বসে বসে আমার জন্য একখানা আর ঠাকুরমার জন্য একখানা চোলী সেলাই করছিলেন। সেই খণের[১] টুকরো গুলো তেমনই সেখানে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ছিল; সেগুলো মা গুছিয়েও রাখতে পারেননি। সেলায়ের ছোট বাক্সখানা তেমনই খোলা ছিল আর তাতে একটি ছুঁচ তাড়াতাড়ি রাখা ছিল। 'এ কী ব্যাপার'? মনে করে থতমত খেয়ে আমি

১ মহারাষ্ট্রের চোলীর কাপড় বিশেষ

খানিকক্ষণ দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এখন তাঁর ফোঁপানি তত আর শুনতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস শুনে মনে হচ্ছিল যে মা নিশ্চয়ই কাঁদছেন।

আমি তাঁর খুব কাছে গিয়ে 'মা' বলে ডাকলাম, এমন সময় আমার দৃষ্টি তাঁর খোঁপার দিকে পড়ল, (তাঁর অসুখ হওয়া অবধি তিনি নিয়ম করে চুল আঁচড়ে খোঁপা বাঁধতেন না), আর দেখতে পেলাম যে খোঁপায় একটি ছুঁচ গোঁজা! আমার ডাক শুনে মা পাশ ফিরতে যাবেন এমন সময় আমি সেই ছুঁচটি দেখতে পেয়েছিলাম তাই রক্ষা। নইলে ছুঁচটি নিশ্চয় তাঁর ঘাড়ে বিঁধত। জ্বরে তাঁর চুল আগেই অনেক নষ্ট হয়েছিল, আর আমার মনে হয় দুঃখের আবেগে বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সময়, তাড়াতাড়ি যে-ছুঁচটা তিনি খোঁপায় গুঁজেছিলেন, সেটা বেশ খানিকটা নিচের দিকেই নেবে গিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের কথা, আমি তা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি ছুঁচটি টেনে নিয়ে সেলাইর বাক্সয় গুঁজে রাখলাম, আর মুখে, "মা, কি হয়েছে! তুই কাঁদছিস কেন?" বলে মাকে জিজ্ঞেস করলাম। ছুঁচ রেখে ঘুরে আবার মার কাছে গেলাম, তখন খপ্‌ করে আমাকে ধরে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মা বললেন "বাছা তোর বরাতে কী আছে?"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মার চোখ বেয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল গড়িয়ে আমার গালে পড়ল, আর আমারও কান্না পেয়ে আমি একেবারেই তাঁর বুকের কাছে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। আমাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সে-সব দেখে আমার কান্না একেবারে উপচে আসছিল। ইতিমধ্যে আমার মুখে হাত বুলিয়ে মা বললেন, "বাছা যমু, আমি চলে গেলে পরে তোর না জানি কী হ'বে! গণু ছেলে মানুষ, তবে সে আজকাল ভালোমন্দ বুঝতে পারে। ত্থাখ্‌ দেখি ও আজকাল কেমন—" এই বলে মা থামলেন। আমি কেঁদেই চলেছিলাম। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে মা বললেন, "যমু: এখন আর তুই ছোট নোস্‌। এখন তোর সবকিছু বুঝতে পারা দরকার, কিন্তু কিছুই যে বুঝিসনে। কী করি? বাড়ির কাজকর্মে তুই একেবারেই মনোযোগ দিসনে। শ্বশুরবাড়িতে তোর কি হাল হবে? কিছু লেখাপড়া শেখা দরকার, তা কখনো তুই ভেবে দেখিস? বাছা, আমার যদি কিছু ভালোমন্দ হয়, (এ কথা বলবার সময় মার কি-ভাবে কণ্ঠরোধ হয়ে এল তা এক আমি জানি আর তিনিই জানেন, কাউকে বলে কিংবা

বর্ণনা দিয়ে তা বোঝাতে পারা অসম্ভব) তাহলে আমার আর কারো জন্ত ভাবনা নেই। গণু এখন তার নিজের হিত কিসে তা বুঝতে পারে, আর যদিও সে না বোঝে, তবু তাকে পরের বাড়িতে গিয়ে ঘরকন্না করতে হবে না, কিন্তু তোকে যে পরের বাড়ি সংসার করতে যেতে হবে। তোকে নিয়ে কী যে করি! তোকে কিছু বলে শিক্ষা দেব, তা তুই যে একদম আমার কাছে থাকতে চাসনে। সুন্দরীকে নিয়ে খেলতেও যে তুই রাজি হস্‌নে। কিন্তু এমন কি আর চলে মা? আমরা মেয়ের জাত, অমন করে কি রক্ষে পাই? তুই অবশ্য খেলা কর, খেলতে তোকে কে মানা করে? কিন্তু একেবারে সারাদিন হুড়োহুড়ি করে বেড়ালে বিদ্যেবুদ্ধি হবে কখন? তোকে কতবার বুঝিয়ে বলেছি যে তুই ইস্কুলে যা; কিন্তু তুই তো ঠাকুরমার কাছে গিয়ে কাঁদতে বসিস! বেশ, ইস্কুলে যাবিনে তো নয় নাই গেলি, তবে আমার কাছে বসে বসে একটু পড়াশুনো কর, শেলাই-টেলাই শেখ্। এ দিন চলে গিয়ে একবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-আসা আরম্ভ হলে, কি আর তোর বিদ্যেবুদ্ধি হবে মা? তখন,—"মা বাপের এই শিক্ষা, বলে আমাদের—"

তাঁর কথা শেষ না হ'তেই আমি তাঁর গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আজ পর্যন্ত মা আমাকে কক্ষনো বকেননি, আর আজও রাগ করে মোটেই বকছিলেন না; আমার জন্ত ভেবে ভেবে যেন ফেটে তাঁর কথা বেরুচ্ছিল। তখন তাঁর মনে কি ভাবনা চিন্তা ছিল তা ভগবানই জানেন। কিন্তু মার তখনকার কথাগুলি আমার মনে ভাবান্তর ঘটিয়ে দিল। এতদিন আমি মার কথা গ্রাহ্য করিনি, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ করেছি, মনে করে আমার ভারি দুঃখ হতে লাগল, আমি ঠিক করলাম যে এখন থেকে মার সব কথা শুনব; তাঁর পাশে বসে লেখাপড়া করব আর তাঁর সকল শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে গ্রহণ করব।

মানুষ যত সংকল্প করে তার খুব অল্পই সে কাজে করে। তাতেও ছেলে বয়সে সংকল্পের মত আচরণ করা প্রায় অসম্ভব, এ কথা বোধহয় সবাই জানেন। কেউ যদি ভৎর্সনা করে তবে তেমন ভুল আর না করবার সংকল্প আমরা ছেলেবেলায় করি, কিন্তু তার কতখানি সমাধা করি তা যখন ভেবে দেখি, অপরিপূর্ণ সংকল্পের সংখ্যা দেখে হাসি পায়।

তবু কোনো কোনো প্রসঙ্গের গুরুত্ব এমন থাকে যে তখনকার সংকল্প

আমরা যতদূর সম্ভব কাজে পরিণত করার চেষ্টা করি। আমার জীবনে আজকের প্রসঙ্গটি তেমনই ছিল। আমার তখনকার সংকল্পটি আমি কতদূর পূর্ণ করতে পেরেছি আর কতটা বিফল হয়েছি তার সাক্ষ্য আমার এর পরের জীবনধারাই দেবে।

শুধু মনে মনে সংকল্প করে আমি চুপ করে থাকিনি, তখনি সেটা মাকে বলে ফেললাম। আমি বিশেষ করে মনস্থ করলাম যে পড়তে শিখব।

আমার সব সংকল্পের কথা যখম মাকে বললাম তখন আমার মন একটু শান্ত হল। অনেকেই নিশ্চয় অনুভব করেছেন যে নিজের চেষ্টায় কোন ভাল কাজ করতে পারলে আমরা বড় সান্ত্বনা পাই। আর আমার আজকের সংকল্পগুলি খুব ভালই ছিল। তার মধ্যে একটা এত ভাল ছিল যে, সে-সংকল্প গ্রহণ করেছি ভেবেই আমার মন প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল। আর সেটি যখন অনেকটা সফল করতে পেরেছিলাম তখন যে কত আনন্দ হয়েছিল তার সীমা নেই। সে-সংকল্পটি এই যে মার প্রত্যেক কথা শুনব, একটিও অগ্রাহ্য করব না। দাদা আর আমি আগে একবার এই সংকল্প করেছিলাম, তা পাঠকদেব নিশ্চয় মনে আছে। কিন্তু দাদা সেটা মেনে চলেছিল, আমি চলিনি। তখন থেকেই দাদা বুঝদার আর বয়স্ক লোকের মত আচরণ করতে লাগল। আজকাল সে আমাদের সঙ্গে খেলতে আসা বন্ধ করেছিল। সারাদিন নিজের লেখাপড়ায় নিমগ্ন থাকত। আমি নিজে তার কাছে গিয়ে 'পুতুল করে দে,' কিংবা 'নৌকো, নইলে কৌটো করে দে,' বলে দাবি করলে, সে তখনকার মত অল্প একটু সময় খরচ করত, কিন্তু আবার তার নিজের কাজে মনোযোগ নিত। তা ছাড়া সে অনেকখানি সময় মার কাছে বসে কাটাত। আমিও তার নতো আচরণ করব স্থির করে তেমন আচরণ করতে লাগলাম।

পরের দিন দাদার কাছে বায়না ধরে আমি 'প্রথম ভাগ' আনিয়ে নিলাম। আর দুপুরবেলা মার কাছে বসে পড়তে আরম্ভ করলাম। আবার দাদা কিংবা মা কাজ করতে বললে, খুঁত খুঁত না করে সে কাজ করতে লাগলাম। সেদিন থেকে আমার স্বভাবের খুব পরিবর্তন হল। আমি যে একেবারেই খেলাধুলো ছেড়ে দিলাম তা নয়। মেয়েদের যতটুকু খেলা করা দরকার ততটা আমি নিশ্চয়ই করতাম। কিন্তু আগে যেমন খেলা ছাড়া অন্য কিছুই আমার ভালো লাগত না, তেমনটি আর রইল

না। তাই দিনে দিনে আমি বেশি সান্ত্বনা পেতে লাগলাম। যাকে আমরা অতিশয় ভালবাসি সে সন্তুষ্ট হলে আমাদের আনন্দ হয়। সে আনন্দ আমি প্রথম তখন অনুভব করেছি। তার পর সে রকম আনন্দ অনেকবার উপভোগ করতে পেরেছি, কিন্তু সে আমায় সেদিনকার সংকল্পের আর মার চেষ্টার ফলে, এ কথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই।

সকলের কথাবার্তায় জানতে পেরেছিলাম যে আমার স্বভাব পরিবর্তন হওয়ায় মা আর বাড়ির সকলে বড় খুশি হয়েছিলেন। তাতে আবার ঘরের কাজকর্মে ঠাকুরমাকে সাহায্য করলে, আর কোন কাজ তাঁর মনের মত পরিষ্কার পরিপাটি ভাবে করলে, ঠাকুমার বড় আনন্দ হত। সেদিন তিনি আমার নাম করে ঠাকুরকে ধূপচন্দন দিতেন, আর আমিও বড় তৃপ্তি বোধ করতাম। সে রকম তৃপ্তিতে যে কী সুখ তা নিজে অনুভব না করলে কেউ তা জানতে পারবে না। সে তৃপ্তি অবর্ণনীয়! সারাদিন হুড়োহুড়ি, গালাগালি, নাচানাচি করেও যে তৃপ্তি পাওয়া যায় না, ছোট-খাটো কাজ বয়োজ্যেষ্ঠদের মনের মত করলে, সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা যে তারিফ করেন, তবে সে-তৃপ্তি হয়। শুধু আমার মত ছোট বয়সের মেয়েরাই নয়, একেবারে বড় বড় মানুষও একথা পরখ করে দেখতে পারেন।

আমি যেদিন উপরোক্ত সংকল্প করেছিলাম, সেদিন থেকেই একেবারে বদলে গেলাম। ত'র মানে এ নয় যে সেদিন পর্য্যন্ত ছেলেমানুষ ছিলাম, আর তার পরের দিন থেকে একেবারে প্রৌঢ়ার মত বিদ্যাবুদ্ধির কথা বলে সংসার করতে লাগলান। শুধু এই করলাম যে মার কাছ থেকে বেশি দূরে যেতাম না। আগে যেমন আঁচানো হতে-না-হতেই দুর্গীর বাড়িতে নইলে তার পাশের বাড়িতে পালাতাম, সেই অভ্যাসটি ত্যাগ করলাম। আমার মায়ের মতো মার কাছে সব সময় বসবার, আর তাঁর দ্বারা নিজের ভুল জেনে নিয়ে কখন কেমন আচরণ করা উচিত এই সম্বন্ধে তাঁর স্নেহময় উপদেশ মনে গেঁথে নেবার ভাগ্য যারা লাভ করেছে, তাদের কত যে সৌভাগ্য আমি তখন তা বুঝতে পেরেছি। আমি ছোট বড় যাই ভুল করি না কেন, তার জন্য কখনো একটুও রাগ না করে, শান্তভাবে মা আমাকে আমার ভুল বুঝিয়ে দিতেন আর আমাকে সদুপদেশ দিতেন।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মা আমাকে যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন, সে-সব মনে করে যদি লিখতে আরম্ভ করি, তবে সে একটি মহাভারত হবে। আমার

অবশ্য মনে হচ্ছে যে সে-পুঁথিটি একেবারে ফেলে দেবার মতো হবে না। সেটি আমার ছোট ছোট বোনেদের খুব উপকারে লাগবে। কিন্তু আমার জীবনচরিতে সে-সব লিখলে তা নীরস হওয়া সম্ভব, তাই সে-সব উপদেশগুলি না লিখে মাঝে মাঝে উদাহরণ বা দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু কিছু লিখব। তাই যথেষ্ট হবে।

সে একেবারে একটি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু তা উপলক্ষ্য করে মা আমাকে কত সুন্দর উপদেশ দিলেন, তা এখানে বলছি। এখন তা বেশ মনে পড়ছে, পরে হয় তো আবার ভুলে যাব। একদিন সকালে মা আমার বিনুনি বেঁধে দিলেন, আমি মুখ হাত ধুয়ে কপালে সিঁদুর পরলাম আর ঘাঘরা চোলী নিয়ে নিচে গা ধুতে চলে গেলাম।[1] তারপর কতবার মার ঘরে এলাম গেলাম, কিন্তু তাঁর মাথার দিকে, অনেকটা ঘরের মাঝখানেই যে একটি সমই[2] ছিল, আর একেবারেই মাথার কাছে চিরুণি, সিঁদুরের কৌটো, কাজলের কৌটো, তেলের বোতল, আয়না এ-সব ইতস্ততঃ পড়েছিল—অথচ অতবার সেখান দিয়ে যাওয়া-আসা সত্ত্বেও, আর একবার তো সমইএর একেবারে পাশ দিয়েই গেলাম বোধ করি সেই জিনিসগুলো পায়ে ঠেলেও ফেলে-ছিলাম, কিন্তু সমইটি কিংবা চুল বাঁধার জিনিসপত্র তুলে রাখার খেয়াল আমার একবারও হল না।

বোধহয় তা দেখেই মা আমাকে ডেকে বললেন, "যমু, বিনুনি করার পর কতক্ষণ হয়েছে?" কিছুই না বলে আমি চুপ করে রইলাম। প্রথমে তাঁর প্রশ্নের অভিপ্রায়ই বুঝতে পারিনি। আমি চুপ করে রয়েছি দেখে মা আবার বললেন, "সকালে উঠেই সমইটা তার জায়গায় তুলে রাখা উচিত ছিল না, মা? বেশ, বিনুনি শেষ করে, সিঁদুর পরে কে গেল? তুই তো? তবে এসব জিনিসগুলো গুছিয়ে ঝুড়িতে ভরে ঝুড়িটা জায়গায় কে তুলে রাখবে? এ-সব ছোটখাট কাজ চলা-ফেরা করতে করতেই করা যেতে পারে, মা। যার কাজ তারই মনে হওয়া উচিত। কখন থেকে

১ মহারাষ্ট্রে মেয়েরা সেকালে সকাল-সকাল বিনুনি বেঁধে, মুখ ধুয়ে, আগে কপালে সিঁদুরের টিপ পরত। তারপরে গা ধুত। মেয়েরা আট দিন পর-পর মাথায় জল ঢেলে, চুল ধুয়ে স্নান করত, আর অন্য অন্য দিন শুধু গা ধুত।

২ পিতলের এক রকম প্রদীপবিশেষ। এই প্রদীপের চারিদিকে বাতি জ্বালার ব্যবস্থা থাকে।

ভাবছি দেখি কখন তোর মনে পড়ে। কাজে যে নিয়মানুবর্তিতা থাকা চাই বলে, সে এই। যাওয়া-আসা করতে করতে, কোথাও যদি কিছু পড়ে থাকে সেটা তা হলে যথাস্থানে তুলে রাখা, কিংবা সেটা যার তাকে দিয়ে দেওয়া উচিত। নইলে লোকে বোকা বলে। ওই ত্যাখ্ ওখানে সুন্দরীর জামা পড়ে রয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে গেলে ঠাকুরপো কিংবা ঠাকুরঝির কোনো জিনিস যদি কোথাও পড়ে থাকে, তা হলে তা তুলে রাখা উচিত; ধোয়া দরকার হলে তা ধুয়ে ফেলা ভালো। কাজের বেলা অলস হওয়া ভালো নয়। কেউ কোনো কাজ করতে বললে, কিংবা তা নিজের মনে হলে, চট করে করে ফেলা দরকার। 'কাজ ওর মনেই পড়ে না', 'ও কাজ করতেই চায় না', 'শুধু খেতে চায়',—এ রকম নিন্দা-অপবাদের অবসর দেওয়াই ভালো নয়। এ সব ছোটখাট কাজ কি মেয়ে জাতের পক্ষে শক্ত? কিন্তু তাতেও যদি ভুল হয়, তাহলেই হয়েছে—"

এই রকম হাজার-হাজার প্রসঙ্গে মা আমাকে ভালোমন্দ কিসে তা বুঝিয়ে বলেছেন। তা ছাড়া দুপুরবেলা তিনি যখন আমাদের পড়াতেন তখনও দরকার মতো আমাকে উচিত উপদেশ দিতেন। তাই পরে খেলা করতে যেতেও আমার ইচ্ছে করত না। দু-একবার তো দুর্গী আমাকে খেলা করতে ডাকতে এসেছিল, আর আমি 'আস্‌ব না' বলে দিয়েছি। শেষে সে মার কাছে নালিশ করে তবে আমাকে খেলতে নিয়ে গিয়েছিল।

ঠাকুমা অতশত ভাবতেন না। তিনি শুধু পৌরাণিক গল্প বলে আমাকে আমোদ দিতেন। সেই গল্প শুনে তখন যদিও শুধু আমোদই হত, তবু পরে সেই পৌরাণিক গল্পগুলিও আমার খুব কাজে লেগেছিল।

পুণায় আসা অবধি আমাদের দিন এইভাবে চলে যাচ্ছিল। দেখা গেল যে মার শারীরিক অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে। বাবা কবিরাজকে ডেকে আনলেন, কিন্তু মা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন কি না তাই, "এখন ওষুধ দিতে পারা যায় না, প্রসব হবার পরে দেখা যাবে", এই রকম কি যেন তিনি বললেন। কিছু লেহ্য ওষুধ কিন্তু তিনি দিলেন। সেগুলি মা খেতেনও। কিন্তু বিশেষ চিন্তার এই ছিল যে, এবার মা নিরাপদে প্রসূতি হয়ে বাঁচবেন তো? কেন না, দিনের পর দিন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যে গর্ভবতী অবস্থায় মার বড়.কষ্ট হচ্ছিল। তিনি অবশ্য তা কখনো কথায়

প্রকাশ করেন নি, কিংবা সে জন্য খুঁতখুঁতিও করেন নি। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যেত যে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছে। তাঁর হাত, পা আর গাল একটু ফোলা-ফোলা দেখা যেত। তাই, কিংবা হয়তো আরও অন্য কোনো চিহ্ন দেখে, একদিন ঠাকুমা বাবার সঙ্গে কথা বলবার সময় বললেন, "এ কি যে হবে তা বুঝতে পারছি না। লক্ষণ তো ভালো মনে হচ্ছে না।" তাই শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাবা বললেন, "—হুঁ! যা কপালে আছে তাই হবে!" বাবার মুখে এ রকম কথা শুনতে পাওয়া খুবই আশ্চর্য ছিল, কেন না তাঁর মন ছিল বড় কঠিন। অবশ্য মার বিষয়ে সব কথাই ছিল আলাদা! যাই হোক্, সে-দিন তাঁর মুখ থেকে ঐরকম কথা যে বেরিয়েছিল এ কথা সত্য!

ঠাকুমা আর বাবার এই কথাবার্তা যে-দিন শুনতে পেলাম, সে-দিনই আড়ালে গিয়ে দাদাকে সে-কথা বলে ফেলেছিলাম। দাদা আজকাল আরও বেশী উদাসীন হয়েছিল। অবশ্য আমার সঙ্গে বেশ খুশিভাবে কথা বলত আর তখনও বলল। আমি তাকে যে-কথা বললাম তা নিয়ে আমাদের দুজনার মধ্যে একটু আলোচনা হল। তবে আমি একলাই কথা বলছিলাম বললেই সাজে। কেন না, আমার মুখে সে-কথা শুনে দাদা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, তারপরে শুধু দুচারটি মাত্র কথা বলল। সে-কথা শুনে যেন তার মনে কী-এক ভীষণ ভাবনা উৎপন্ন হয়ে তার মুখ ম্লান করে দিল। তবে কি মার বিষয়ে আগে থেকেই তার মনে কোনো বিপদের আশঙ্কা ছিল, আগেই ভয় ছিল ছিল যে, হয়তো অবিলম্বে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারেন, আর আমি যখন ঠাকুমা আর বাবার কথোপকথন তাকে বললাম তখন তার সেই আশঙ্কা দৃঢ়তর হল? কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

মোটের উপর, মার শারীরিক অবস্থা এই রকম ছিল, আর বাড়ির নিত্যকর্মের ধারা ওই রকম চলছিল—এই বলে আমি অন্য কথায় আসব।

আমাকে দেখতে এল

বাড়িতে এত ভাবনার বিষয় ছিল, তবু আমার বিয়ের জন্য ঠাকুমার উৎকণ্ঠা কমেনি। আর কী জানি কেন, আজকাল বাবাও তাঁকে সব ব্যাপারে সায় দিতে আরম্ভ করেছিলেন। এত শীগগির আমার বিয়ে দেওয়ায় তাঁর আগেকার সেই আপত্তি, আজকাল ততটা দেখতে পাওয়া যেত না। তবু দেখা যেত যে ছোটবেলায় মেয়েদের বিয়ে দেওয়া ভালো নয়, মেয়ের বয়স অন্ততঃ বারো বছর হওয়া চাই, এই তার নিজের মত ছিল। কেন না, আমার মনে পড়ছে যে তাঁর কোনো বন্ধুবান্ধব এলে যখন তাঁদের গল্প-গুজব চলত, তখন বাবার মুখে তেমন কথা শুনেছি। তাঁর এই কথা শুনে একদিন একজন ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলেন, "আপনার যদি এই মত তবে আপনার নিজের মেয়ের বেলায় বিয়ের জন্য অত তাড়া কেন?" তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমাদের বুড়ির শখ, তাই; সেই সব চেষ্টা করছে, হওয়া এখনও ঢের দূরে।" তাঁর নিজের মত যাই হোক না কেন, বাড়িতে আমার বিয়ের জন্যে অল্প অল্প চেষ্টা শুরু হল। ঠাকুমার সঙ্গে আমি যখনই মন্দিরে-টন্দিরে গিয়েছি তখনই সেখানে আমার বিয়ের সম্বন্ধে কথা হয়েছে।

শেষ কালে এক রবিবার দুপুরবেলায় দু-তিনজন ভদ্রলোক, তাঁদের সঙ্গে পনেরো-ষোলো বছরের একটি মেয়ে আর একটি বৃদ্ধা বিধবাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এলেন। তাঁরা সবাই হঠাৎ এসে পড়ায় ঠাকুমা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, আর কাজকর্মে সব গোলমাল হয়ে গেল। এমন সময় দাদাকে বাবা ডাক দিয়ে বললেন, "যমুকে নিয়ে আয় তো।" তখন আমার মনের অবস্থা যে কী রকম হল তা আমিই জানি। দুর্গী আমায় যখন ঠাট্টা করত তখন আমি তাকে যে আমি "কক্ষনো ভয় করব না, স্পষ্ট স্পষ্ট সব উত্তর দেব", বলেছিলাম, সে-সব ভুলে গেলাম, একটু ঘাবড়েও গেলাম। তবুও যা ইচ্ছা করি তা পেয়ে গেলে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি

মনে মনে একটা আনন্দও হল।

দাদা এখন আমাকে ডাকতে আসবে বুঝে আমি, যদিও কাছেই ছিলাম, ছুটে একেবারে খিড়কি দুয়োরের দিকে পালিয়ে গেলাম। দাদা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে বলল, "তোকে দেখতে এসেছে, চল।" এমন সময় ঠাকুমাও আমাকে ডাক দিলেন। আমি অনেকক্ষণ উহুঁ-উহুঁ করে জোর করে সাহস করলাম। তারপর আমাকে দেখতে এসেছে, এই খবর পেয়ে দুর্গাও ছুটে এল আর আমাকে টেনে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। আমার চুল এলোমেলো হয়েছিল, ঠাকুমা তা চিরুণি দিয়ে আঁচড়ে ঠিক করে দিলেন। আমার উঁ উঁ চলছিলই। দুর্গা আমাকে, 'ওলো ওলো মোষ, আমায় কেন নিয়ে যাস*' বলে ঠাট্টা করছিল। শেষে নতুন ঘাঘরা, নতুন চোলী পরে আমি প্রস্তুত হলাম। অমনি আমাকে দেখে ঠাকুমা বললেন, "বাঃ কী সুন্দর দেখাচ্ছে! কে ওর খুঁত কাড়বে? দুর্গা, ওর কপালে কৌটা পরিয়ে দেতো মা। কী জানি নজরটজর লাগবে বাছার!" ঠাকুমার কথা শেষ হতে না হতেই দুর্গা আমাকে কৌটা পরিয়ে দিল। তখন দাদা আবার আমাকে ডাকতে এল। সেই বিধবা স্ত্রীলোকটি মার কাছে বসে ছিল, সেও ঠাকুমাকে ডাক দিল। তারপর সবাই বাবার বসবার ঘরে গেল। দরজা পর্য্যন্ত যেতে যেতে আমি যেন লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়ছিলাম। শেষে এগিয়ে গিয়ে দুর্গা আমার হাত ধরে টানল। তখন আমি ঘরের ভিতরে গেলাম। ভিতরে যাওয়ামাত্র বাবা আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন, আর যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি আমাকে বসতে বললেন। দুর্গা বড় নির্ভীক! সেও আমার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, আর আমাকে খুঁচিয়ে ভাল করে বসতে, মুখ তুলে চাইতে, ইশারা করতে লাগল। আমাকে "বোসো মা" বলে বসতে বলামাত্র আমি দু-একবার লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে আসনপিড়ি হয়ে বসলাম, আর মাথা নীচু করে কার্পেটের দিকে চেয়ে রইলাম। যেন, যারা দেখতে এসেছেন তারা শুধু আমার মাথাই দেখতে চাইছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের একজন আমাকে বললেন, "মুখ তুলে চাও তো মা।" তাঁর সে-কথা শুনেও আমার মুখ তুলতে একেবারেই ভরসা হচ্ছিল না। আমি মাথা নিচু করেই বসে

* একটি মারাঠি প্রবাদ যার অর্থ সহজে বোঝা যাবে।

রইলাম যেন কার্পেটের উপরে আঁকা ছকের ঘরগুলো গুণতে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। এমন সময় ঠাকুমা, সেই বিধবা স্ত্রীলোকটি আর তাঁদের সঙ্গের সেই পোনর-ষোলো বছরের মেয়েটি, সকলে মিলে এ-ঘরে এলেন। তখন, যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে যে ছোট যুবকটি, সেই মেয়েটিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, "বারুবাই, বৌদি দেখলে? পছন্দ হয়েছে তো?" তার এই কথা শুনে, যেন আমার ভাবী ননদকে দেখতে উৎসুক হয়েই, আমি সেই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এমন সময় সে বলল, "এরি মধ্যে আমার বৌদি হল!" আর সেই বৃদ্ধ গৃহস্থটি "বাহবা! হাট বসবার আগেই কোমর বাঁধছ!" বলে নিজেই হাসতে লাগলেন। তাই দেখে আর সকলকেও অবশ্য হাসতে হল।

আবার আমাকে মুখ তুলে চেয়ে দেখতে বলে, তিনি আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আম্‌তা-আম্‌তা করে আমি বললাম "যমু", কিন্তু মোটেই মুখ তুলে চাইলাম না। তখন দুর্গীটা আমাকে বলল, "ও কী? চেঁচিয়ে বল্‌ না!" এই বলে সে আমাকে আঙুল দিয়ে খোঁচাল। তখন আমার ভারি রাগ হল। শেষে ভরসা করে জোরে আমার নাম বললাম। তখন তিনি আমাকে আমরা কয় ভাই বোন-তা জিজ্ঞাসা করলেন। তাও বললাম। এমন দু-একটি উত্তর দেবার পর আমার একটু ভরসা হল, আর মনে মনে ঠিক করলাম যে এখন আর মুখ তুলে চাইবার কোনো বাধা নেই। এমন সময় সে-যুবকটি জিজ্ঞাসা করল, "পড়তে পার?"

তার সেই প্রশ্ন শুনে কি-যে উত্তর দিই তাই ভাবতে লাগলাম। "হ্যাঁ" বললেও বিপদ, কারণ ভালভাবে পড়তে পারতাম না; আর "না" বলা মানে নিজের মুখে নিজের লজ্জার বিষয় প্রকাশ করা। কিন্তু বাঁচাল দুর্গী, আমাকে উত্তর দেবার সময়ই দিল না। সে নিজেই তাড়াতাড়ি বলল, "হ্যাঁ, ও এমন গড়গড় করে পড়ে যে কী বলব! ওর কোন বই নিয়ে আসব?" এই বলে, আমি যে তার দিকে চোখ রাঙিয়ে চাইছিলাম সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করে, সে সটান দাদার পড়াশোনার জায়গার দিকে দৌড়ে গেল। আমার তখন তার উপর এত রাগ হচ্ছিল যে কি আর বলব! কিন্তু উপায় কী? তখন খাঁচার বাঘের মতোই আমার অবস্থা। তার সে রকম ব্যবহারের জন্য তাকে যা শাস্তি দেওয়া দরকার তা মনে চেপে রাখতে হল। তখন আমি তাকে শুধু এই শাস্তি দিলাম যে, চোখ রাঙিয়ে

তার সেই পলায়মান মূর্তির দিকে আড়চোখে চেয়ে রইলাম। বাবা তো দুর্গীর চেয়ে আরও এক কাঠি ওপরে গেলেন। নিজের মেয়েটি কত চতুর তা দেখাতে উৎসুক হয়েই যেন তিনি পাশ থেকে একখানা খবরের কাগজ চট করে তুলে নিয়ে আমার সামনে ধরে বললেন, "হ্যাঁ, নে, এটা শীগগির পড়ে শোনা দেখি।" খবরের কাগজ সামনে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটা হাতে নিয়ে সেই যুবকটি তাতে ছাপা একটি চিঠি পড়তে বসল। সে যে কী দুর্গতি! আমার গা ঘেমে উঠল বললেও মিথ্যে হয় না। আগেই আমি মনে করে নিয়েছিলাম যে আমি পড়তে পারিনে, তার উপর আবার ভয় করতে লাগল। সেই পরীক্ষা আমায় বড় বিষম মনে হল। এমন সময় দুর্গীবাইও নাচতে নাচতে এলেন আর বললেন, "এই নে বই।" বইখানি সেই যুবকটি নিজের হাতে নিল; তখন আমার মনে হল যে, ঐ বই থেকেও নিশ্চয় সে আমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। দুর্গাবাই আমাকে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল। বাবা আর ঠাকুমা, "মা, পড়্ শীগ্‌গির, লজ্জা কিসের?" এই বলে আমাকে জ্বালাতন করতে লাগলেন। তখন আর কী করি, ভয়ে ভয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। "ভয় করিস্ নে পড়্" বলে বাবা সাহস দিচ্ছিলেন। দশ-বারো লাইন পড়া হতে না হতেই আমাকে থামতে বলে, সে যুবকটি বলল, "এখন খবরের কাগজ ভাঁজ করে রেখে, কি পড়লে তা বলো।" তখন সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি চট্ করে বললেন, "থাক্ বাবা! ওর কি পরীক্ষা করছিস নাকি? পড়ে শোনাতে বলা হয়েছে, সেই যথেষ্ট! যা মা, তুই এখন ভিতরে যা।" তাই শুনে আমি যেন পরিত্রাণ পেলাম! কিন্তু তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, "মা, ওঠো দেখি।" তাঁর কথা শুনে আমি উঠে দাঁড়ালে, অপর দিকের কোণায় একটা কাগজ পড়েছিল সেটা আমাকে আনতে বললেন। আমি লাজুক ভাবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি গিয়ে আবার লজ্জার সঙ্গে ফিরে এসে তাঁর সামনে কাগজখানা রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। আরও কিছুক্ষণ এই রকম সব আরো কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা-বাদ করে তাঁরা উঠে পড়লেন। আর তখন মা ভিতর থেকে, সেই মেয়ের কপালে পরাবার জন্য, [১] "সিঁদুরের কৌটো নিয়ে আয় তো, মা" বলে আমাকে ডাক দিলেন। আমি গিয়ে কৌটো নিয়ে এলে ঠাকুমা আমাকেই তাকে

১ মহারাষ্ট্রে কারো বাড়িতে এসে কোনো সীমন্তিনী কিংবা কুমারী ফিরে যাবার সময় তাদের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেবার প্রথা আছে।

সিঁদুর পরিয়ে দিতে বললেন।

তখন সেই মেয়েটি আর তার সঙ্গের সেই বৃদ্ধা আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে বাইরে যেতে উদ্যত হয়েছিল। এতক্ষণ আমি সেই মেয়েটার মুখের দিকে ভাল করে চেয়েও দেখিনি। কিন্তু এখন তাকে সিঁদুর পরাতে গিয়ে আঁৎকে উঠে একটু পিছনে সরলাম। সে-মেয়েটি যদি আর একটু ছোট হত, তা হলে আমি তাকে ঠিক বনীই বলতাম, কিন্তু সে বনীর চেয়ে একটু লম্বা ছিল, যদিও তার মুখের গড়ন অবিকল বনীর মতোই ছিল। সেই চ্যাপ্টা নাক, সেই ফোলা গাল, সেই প্যাঁট্‌পেঁটে চোখ! আর তখন আমার মনে হল যে সেই কণ্ঠস্বরও হবে! কেননা, যদিও তখন সে খুব আস্তে কথা বলছিল, তবুও তার স্বর যেন বনীর মতোই বলে আমার মনে হল। অবশ্য এক মুহূর্তই আমি পিছয়ে এসেছিলাম, তার পরই চট্‌ করে তার কপালে সিঁদুর দিয়ে দিলাম। তার পরে তারা চলে গেল।

তখন আমাদের বাড়িতে আলোচনা শুরু হল। "সম্বন্ধ ঠিক হলে, পাত্রটি মন্দ নয়। ছেলে বেশ চালাক-চতুর, কাল পরীক্ষা দিতে যাবে। তার বাবা নেই, এই এক খুঁত, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।" এই রকম কিছু ঠাকুমা আর বাবা বলছিলেন। মা কিছুই না বলে চুপটি করে ভিতরে চলে গেলেন। কী জানি কেন আজকাল তিনি কিছুতেই বেশী মন দিতেন না। তাঁর যেন সবতাতেই একরকন বিরাগ জন্মেছিল। কিছুতেই তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এখনই আর সে-বিষয়ে বেশি কিছু না লিখে পরে সময়মত লিখব। মা ভিতরে চলে যাবার পর আমি কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ইচ্ছে ছিল যে বাবা আর ঠাকুমা যা বলেন তা শোনার। সেই মেয়েটা বনীর কোনো সম্পর্কের বোন-টোন ছিল না-তো! তা যেন ঠিক জানতে পারি, এই আমার বড় ইচ্ছা ছিল। কেন না, আমার মনে হল যে, সেখানে যদি আমার বিয়ের ঠিক হয়, আর সেই মেয়েটি আর বনী দু-জনে যদি সম্পর্কে আমার ননদ হয়, তাহলে আর রক্ষা নেই। বনীর সঙ্গে আমার যা ভয়ানক ঝগড়া হয়েছিল তা এখনও আমার মনে তাজা ছিল। সেই ঝগড়ার কথা ভেবে আমাদের সম্বন্ধ পরে কেমন থাকতে পারে তার অনুমান করলে, আনন্দের দিক দিয়ে বড় বেশি আশা করা যেত না। আমি ঠিক মনে করলাম যে সেই মেয়েটি নিশ্চয় বনীর একেবারে নিকট সম্পর্কের কেউ-না-কেউ হবেই হবে। ঠাকুমা আর

বাবাতে একটু কথাবার্তা হল, কিন্তু তাতে স্পষ্ট এ-কথা জানা গেল না। আর আমার মনে হল যে মাঝে পড়ে নিজেই জিজ্ঞাসা করাও উচিত হবে না। এমন সময় ঠাকুমা বাবাকে বললেন, "ওই বৃদ্ধটি কে জানো?" কিন্তু বাবা কিছুই উত্তর দিলেন না। কেন না, তাঁর ঘুম পাচ্ছিল। তখন ঠাকু-মাও একটু গা এলিয়ে দিতে চলে গেলেন। আর, কিছুই জানতে না পেরে নিরাশ হয়ে আমি দুর্গীর বাড়ি যেতে বেরোলাম।

এখন আর আমি অত ছোট ছিলাম না। একটু একটু ভালোমন্দ বুঝতে পারতাম। আমার তো ইচ্ছে ছিলই যে আমার বিয়ে হোক্। তবু, বিয়ে মানে কি, সংসার কাকে বলে, সংসারে কত রকম সংকট থাকতে পারে, এর কিছুই অবশ্য আমি কখনো ভেবে দেখিনি। বিয়ের অর্থ আমি এই বুঝতাম যে মুগুাবলী বাঁধা, কপালে বেশ করে সিঁদুর পরা, দেবীর কাছে প্রার্থনা করা, বিড়ি-কাটাকাটি করা, সুপুরি[১] লুকোনো, নেমন্তন্ন খাবার সময় বরের মুখে ভাত দেওয়া, আর তার হাতে ভাত খাওয়া। 'বিবাহ' কথাটা শুনলে এই সব ছাড়া অন্য কিছুই আমার মনে হত না। আর আমি নিশ্চয় জানি যে আজ পর্যন্ত যত মেয়েদের বিয়ে হয় তাদের শতকরা একশোটি মেয়েরই বিয়ের সম্বন্ধে আমার মতোই কল্পনা থাকে, আর বিয়ে মানে আমি যা বুঝতাম তার চেয়ে বেশি কিছু তারা বোঝে না। বুঝবেই বা কি করে? যে বয়সে আমরা কোনো বিষয়ের কিছুই বুঝিনা, সে বয়সে বিয়ের মতো, আর সংসারের মতো, বিষম দায়ের কথা আমরা কি কিছু বুঝতে পারি? 'বিয়ে হলে বেশ হবে' মনে হওয়া মানে যাদের বিয়ে হয়েছে সেই বন্ধুদের মতো গয়নাগাঁটি পরে, সেজে গুজে ঘুরে বেড়াবার শখ হওয়া বই আর বেশি কি? তাই আমারও বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছিল মানে, আর সব বিবাহিত মেয়েদের মতো গয়না-টয়না পরে, সেজেগুজে আরাম করে এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছিল, তা কি আর বলতে হবে?

কিন্তু সেদিন অবিকল বনীর মতো সেই মেয়েটিকে দেখামাত্র আমার

১ বিয়ের উপলক্ষে সেকালে বরকনের একজন নিজের কাছে একটি সুপুরি লুকিয়ে রাখত আর অন্যজন সেটি খুঁজে বার করত। আবার অন্যজন সেটা লুকিয়ে রাখত, আগের জন খুঁজে বার করত, এই রকম বরকনেতে যখন খেলা চলত, তখন আর সকলে হাসি-তামাশা করত।

মনে হল যে সেখানে আমার বিয়ের সম্বন্ধ না হলেই ভালো। তাঁরা সকলে চলে যাবার আগেই দুর্গীকে তার মা ডেকেছিলেন, তাই সে তার বাড়ি চলে গিয়েছিল। সে যদি জানে তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক—এই মনে করে আমি তার বাড়ি যেতে বেরুলাম। আমি যা ভেবেছিলাম তা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বলা অসম্ভব। বয়োজ্যেষ্ঠদের, একথা জিজ্ঞাসা করা একেবারেই উচিত হত না। আর জিজ্ঞাসা করতে হলে তো দাদাকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে। কিন্তু আজকাল তার বয়স্ক লোকের মতো ব্যবহার দেখে তাকে চট্ করে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার একটু ভয় করত। তাই মনে হল, আগে দুর্গীকে জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক, আর সে যদি নাই জানে, তাহলে পরে দাদাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে। এই মনে করে আমি দুর্গীর বাড়ি গেলাম। দুর্গী তখন তার মাকে ডাল পিষতে সাহায্য করছিল। আমি সেখানে গেলাম আর অমনি সেই দুষ্টু মেয়েটা, "ওমা! যমুবাইর যে শুনছি এবার স্বয়ংবর হবে!" —বলে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল। তার সে-কথার মানে আমি মোটেই বুঝতে পারছিলাম না। সে "বিয়ে হবে" না বলে "স্বয়ংবর হবে" বলল, তাতে আমি একটু অপ্রতিভ হলাম। আর তাকে বললাম, "ও কি ভাই দুর্গী! যখন তখন ঠাট্টা।" এমন সময় তার মাও চোখ বড় বড় করে তাকে চুপ করতে ইশারা করল। কিন্তু সেদিকে মোটেই লক্ষ্য না করে, দুর্গী "স্বয়ংবর গো, স্বয়ংবর" বলে আবার ঠাট্টা করতে লাগল। তখন তার মা বলল, "আচ্ছা, এখন ঢের ঠাট্টা হয়েছে। সব সময় ও কি? যাও, খেলা করগে যাও। ডাল অল্পই রয়েছে, আমি পিষে ফেলব'খন।" বাড়ির কাজকর্মের দিক দিয়ে দুর্গী আমার ঠিক জুড়ি ছিল, প্রায় বড় বোন বললেই হয়। কাজকর্মে তার এত বিরক্তি ছিল যে তা বলা যায় না। তাতে আবার সে তার মার বড় আদুরে ছিল। কিন্তু তার ঠাকুমা তাকে একেবারেই ভালবাসত না। দুর্গীর ভাইকে সে যেন প্রাণ ঢেলে ভালবাসত। কিন্তু দুর্গী বড় নির্ভীক ছিল কিনা, তাই সে কারো কথা ততটা শুনত না। কিন্তু যাক্। দুর্গীর বিষয়ে অনেক কথাই আমার এই জীবনকাহিনীতে লিখতে হবে, তাই তার বাবা, মা আর যাঁর সঙ্গে তার জন্মের মত সম্বন্ধ হয়েছিল তার কথা অবিলম্বেই অন্য এক পরিচ্ছেদে বলব।

দুর্গী আর আমি যখন একা হলাম, তখন আমাকে যারা দেখতে এসেছিল

তারা কে, কোথাকার, সেই মেয়েটি কে—এসব তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ; কিন্তু বুঝতে পারলাম যে সে কিছুই জানে না। সে আরও বলল, সেই যুবকটিই—যে আমাকে পড়তে বলেছিল—নাকি আমার ভাবী বর। আর সে নাকি নিজে আমাকে দেখতে এসেছিল। তাই তো দুর্গা আমাকে "স্বয়ংবর, স্বয়ংবর" করে ঠাট্টা করছিল। কিন্তু দুর্গা ভুল বুঝেছিল। এ-কথা সত্যি যে, যে-পাত্রের জন্য আমাকে তারা দেখতে এসেছিল, সেই যুবকটি তার বন্ধু ; নিজের বন্ধুর ভাবী স্ত্রী কেমন তাই দেখতে, আর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে বলেছিলেন, তাই সে এসেছিল।

সে যাই হোক্, সেদিন থেকে আমার মনে নিজের ভবিষ্যতের বিষয়ে ভাবনা জাগল। সে-ভাবনা, কি জানি কি রকম শ্বশুর বাড়ি আমার ভাগ্যে জোটে ! এই ভাবনা হবার কারণ কত অকিঞ্চিৎকর, তা পাঠকরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। অবিকল বনীর মতো সেই মেয়েটিকে দেখা অবধি আমার মনে হ'তে লাগল যে সেখানে যদি আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহলে আর রক্ষা নেই ; আমার জীবন দুঃখময় হবে। সত্যি বলতে গেলে তেমন ভাববার কোনো কারণ ছিল না ; কেন না সেই মেয়েটা যে বনীর বোনই হবে তার ঠিক কি ? সত্যি আমি তখনও কিছুই জানতাম না। আর যদিও বা বনীর বোন হত তবুও তার স্বভাব আর বাড়ির আর সকলের স্বভাব কি ঠিক বনীর মতোই হতে হবে ? কিন্তু সেদিক দিয়ে আমি একটুও ভেবে দেখিনি। আমি শুধু ভাবলাম যে সেই মেয়েটা নিশ্চয় বনীর বোন, আর তাদের বাড়ির সব্বাই বনীর মতোই দুষ্টু। যে-দিন তারা আমাকে দেখতে এসেছিল সে সমস্ত দিনটা ধরে আমার মনে এই একই চিন্তা ছিল।

আরও দেখা

গত পরিচ্ছেদে যে-ঘটনা বলেছি তার পরে দুমাস কেটে গেল। ইত্যবসরে অনেকবার অনেকে আমাকে দেখতে এসেছিলেন। কনে দেখতে আসা সম্বন্ধে আগে আমার যে একরকম কৌতূহল ছিল, তা ক্রমে কমে যেতে লাগল। এ-সব ব্যাপারে এখন আমি বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। একবারকার ঘটনা কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ছে।

একদিন দু-জন ভদ্রলোক (দু-জনেরই বয়স পঞ্চাশের বেশী হবে, একজন তো বোধ করি যাট বছরের কাছাকাছি ছিলেন) আমাকে দেখতে এলেন। নিয়ম-মতো বাবা আমাকে ডাকলেন। তখন কি হল কি জানি, হয়তো আমি হেলেদুলে হাঁটছিলাম, তাই তাঁদের একজন ভদ্রলোক বোধ হয় মনে করলেন যে আমি ভাল করে হাঁটতে পারি না। আমি কাছে গিয়ে বসা মাত্র তিনি আমার দিকে এমন তাকিয়ে দেখতে লাগলেন! রীতিমতো দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল পর আমাকে তিনি যে-শব্দের মধ্যে 'র' আর 'ড' অক্ষর আছে এ-রকম দু-চারটা শব্দ উচ্চারণ করতে বললেন। যে-শব্দ আমার মুখে উচ্চারণ হয় এরকম কোনো কোনো প্রশ্ন যদি তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে আমার কিছু মনে হতো না। কিন্তু তিনি যখন ইচ্ছে করে কয়েকটি কঠিন-কঠিন শব্দ বেছে আমাকে সে-শব্দগুলি উচ্চারণ করতে বললেন, তখন আমার যেন কেমনতরো লাগল। আমি তো আর একেবারে বোকা ছিলাম না! তাঁর অভিপ্রায় আমি বুঝতে পারলাম আর তাই আমার ভয় করতে লাগল যে, এখন নিশ্চয় এই শব্দগুলি আমার মুখে আধো-আধো আর তোতলার মত বেরুবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তেমন কিছু হল না। আমি বেশ স্পষ্ট করে সে-শব্দগুলি উচ্চারণ করলাম।

মনে আছে যে সে-ভদ্রলোকটি যেন একটু অদ্ভুতই ছিলেন, আর তাঁর সঙ্গের অন্য ভদ্রলোকটি একেবারেই বোকা ছিলেন। কেউ কিছু বললেই তিনি অমনি 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করতেন। প্রথম ভদ্রলোকটি তাঁর দিকে চেয়ে দাঁত

বার করলে তিনিও অমনি দাঁত বার করতেন। আর কিছুই করতেন না। আমি তোতলা কি না তা পরীক্ষা করা হলে পরে তিনি আমার চোখ ভালো. করে পরীক্ষা করে দেখলেন। নিজের হাত আমার মাথার উপরে খপ করে রেখে তিনি ফস্ করে আমার মুখ ওপরে তুলে ধরলেন আর, আমার মুখ বেশ করে পরীক্ষা করে চেয়ে দেখতে লাগলেন। সত্যি আমার তখন এত লজ্জা করল যে তা বলতে পারছি না। কিন্তু কী করি? এমন সময় আমাদের কি কোনো উপায় থাকে? মনে হল যে তাঁর হাত ছিটকে ফেলে চলে যাই! দেখতে পেলাম যে বাবারও তখন খারাপ লাগছিল। কেননা, সেই অবসরে আমি একটু লুকিয়ে আড়চোখে বাবার দিকে চেয়েছিলাম। তখন তাঁর মুখের ভাবটা বড় ভালো মনে হয় নি। তবু তিনি কিছু বললেন না।

আমার চেহারা পরীক্ষা করা সমাধা হলে সে-বৃদ্ধ পানসুপুরীর থালা থেকে চুণের কৌটোটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "ছুটে গিয়ে এতে চুণ ভরে নিয়ে আয় তো!" তাঁর এই কথায় 'ছুটে' শব্দেই সব কিছু ছিল। তিনি যদিও আমাকে ছুটে যেতে বললেন, তবুও তখন আমার দৌড়ানো কি উচিত? আমি আস্তে আস্তে হেঁটেই গেলাম। এমন সময় সেই ষাট বছরের কাছাকাছি হাঁদা ভদ্রলোকটি বললেন, "ও কী? তোকে নানা সাহেব ছুটে যেতে বললেন যে?" তবু আমি হেঁটে গিয়েই চুণের কৌটোয় চুণ নিয়ে এলাম। বাস্তবিক চুণের কৌটোয় চুণ ছিল, আর একটুও চুণ তাতে ধরল না। কিন্তু আসলে সেই ভদ্রলোকটির ইচ্ছে ছিল, আমি খোঁড়া-টোড়া ছিলাম কিনা তাই দেখা। তাই তিনি আমাকে যা-কিছু একটা কাজ করতে বললেন। এতেই শেষ হল না। চুণের কৌটোয় চুণ এনে সেটা পানের থালায় রেখে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন আমাকে বসতে বলে তিনি বাবাকে আমার কুষ্ঠি সম্বন্ধে কি একটা জিজ্ঞাসা করলেন। আর বাবার উত্তর শোনামাত্র খুশি হয়ে আমার পিঠে এক চাপড় বসিয়ে দিয়ে সেই হাঁদা ভদ্রলোকটির কোলে আর একচাপড় দিলেন। তারপর আমার হাতটাত তুলে দেখে তাঁর সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, "মেয়েটা একটু খাটো হবে, না?" অমনি সেই অন্য ভদ্রলোকটি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব খাটো হবে। ওর বয়সের হিসাবে খুবই খাটো।" এই শুনে নানা সাহেব আবার বললেন, "না না, বয়সের হিসাবে ততটা খাটো ও নয় ঠিকই

দেখাচ্ছে। আমি বলছি যে মোটামুটি ওর শরীরের গঠন একটু খাটো ধরণের হবে।"

অমনি সেই অপরজন বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও ঠিক তাই বলতে চাই। আমারও মোটের ওপর কথা তাই। ওর বয়সের হিসাবে ওকে ঠিকই দেখাচ্ছে। বরঞ্চ একটু লম্বা বললেই চলে।"

নানা সাহেব, "ধ্যেৎ! লম্বা কোথায়? আপনি কিচ্ছু বোঝেন না. শাস্ত্রীমশায়।"

নানা সাহেবের এই কথা শুনে শাস্ত্রীমশাই শুধু দাঁত কটা বার করে চুপ করে রইলেন। এই ঘটনা মনে পড়লে আমার থেকে থেকে হাসি পায়। পরে তাদের দুজনের ব্যবহারের সম্বন্ধে বাড়িতে বেশ খানিক আলোচনা হয়েছিল, তাই সে-ঘটনাটি আমার বিশেষভাবে মনে রয়েছে। এমনি আরও অনেকভাবে আমাকে পরীক্ষা করে তাঁরা চলে গেলেন।

এখন আমি যা লিখব, তা সে-সময়ে ততটা উৎকটভাবে আমার মনে হয়নি। কিন্তু আমার তখনকার নিজের আর পরে অন্য অনেক মেয়েদের অনুভূতি যা দেখতে আর জানতে পেরেছি তা মনে করে, একথা এখানে না লিখে পারছি নে। পশুদের হাটে কসাইরা যখন ছাগল-ভেড়া কেনে তখন তাদের কি-রকম পরীক্ষা করে তা আমি জানিনে, কিংবা শৌখীন লোক ঘোড়া কেনবার সময় কি-রকম পরীক্ষা করে তাও আমার জানা নেই। কিন্তু আমি যা শুনেছি তাতে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের মেয়েদের যারা দেখতে আসে, তারা বোধহয় গৃহপালিত জীব-হিসাবেই আমাদের পরীক্ষা করে দেখে! তফাৎ এই যে, পশুরা কিছু বুঝতে পারেনা আর আমরা বুঝতে পারি। একবার আমি এইরকম মনোভাব ওঁর কাছে প্রকাশ করেছিলাম, তখন উনি হেসে আমাকে বলেছিলেন, "একবার আমি তোমাকে পশুর হাট দেখাতে নিয়ে যাব, তার পরে তুমিই তুলনা করে দেখতে পারবে।" তারা আমাদের হাঁটিয়ে দেখে, কথা কইয়ে দেখে, আরো কত কি যে করে! নানা সাহেবের মতো বধূ-পরীক্ষা আমার অনেক বন্ধুরই বিয়ের আগে সহ্য করতে হয়েছে। আমরা কয়েকজন বন্ধু যখন কোথাও জড়ো হই, তখন কখনো কখনো ছোটবেলার কথা আলোচনা করি। আর নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা পরস্পরকে বলি। আমার এক বন্ধু আমাকে একদিন বলেছিল যে একজন ভদ্রলোক তাকে দেখতে এসে তার জিভ দেখেছিলেন।

তাঁর কি অভিপ্রায় ছিল কে জানে! এ-রকম রীতিনীতি সম্বন্ধে ভালোমন্দ মত প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই, আর তেমন মত দেবার জন্য আমি আমার জীবনচরিত লিখছিও না। আমরা মেয়েরা আমাদের জীবন-ধারার সম্বন্ধে কি ভাবি, আমাদের ভালোমন্দ অনুভব কি কি থাকে, 'তা আমার পরে যেন লোকে জানতে পায় আর সত্যি কেউ যদি কোনো পরিবর্তন হওয়া উচিত মনে করে তাহলে যেন তেমন ব্যবস্থা করে, এই আমার অভিপ্রায়। কোথাও কিছু অভাব রয়েছে জানতে পারা গেলে সে অভাব পূরণ হতে পারে; সেই অভাবে যাদের কোনো কিছু লোকসান হয়, তারা যদি সে-কথা প্রকাশ না করে, তাহলে তা লোকের জানতে পারা অসম্ভব, একথা পৃথিবী শুদ্ধ সবাই জানে। ঈশ্বরের কৃপায় লেখার কিছু ক্ষমতা আমার হয়েছে। তাই আমার অন্য কোনো ভগিনী পরে লিখবে বলে অপেক্ষা না করে—আর দাদাও আমাকে লিখতে বলেছে তাই—আমি আমার এই জীবনকাহিনী লিখতে আরম্ভ করেছি। আমার মতো দুঃখী মানুষের জীবন কখন যে শেষ হবে তার ঠিক নেই। আমার জীবনে এখন এই একই সান্ত্বনা! ভগবানের দয়ায় কাহিনীটি আজকার ঘটনা পর্যন্ত লেখা হলেই হল। তাঁর চরণে এ ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থনা নেই।

আমি লিখেছি যে আমাদের রীতিনীতি ভালো না মন্দ তা লিখবার অধিকার আমার নেই, কিন্তু আমরা মেয়ে জাতি তা ভালো মনে করি না মন্দ মনে করি, তা লিখতে আপত্তি কি? যখন লোক আমাদের দেখতে আসে তখন আমরা একেবারে অবুঝ থাকি এ-কথা সত্যি, কিন্তু আজ যদি কেউ আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে যে মেয়ে দেখার প্রথা বিষয়ে তুমি কি মনে কর, তাহলে আমি স্পষ্ট বলব যে এ-প্রথাটি একেবারে খারাপ। মেয়েদের পশুর মতই ক্রয় করার প্রথা কি কেউ উচিত মনে করে? কিন্তু আপাততঃ যে-প্রথা দেখতে পাই তাতে আর পশুর হাটে কোনো পার্থক্য নেই! যাক, এর চেয়ে বেশী কঠোর ভাবে আমি লিখতেই পারছিনে আর লিখবও না।

নানা সাহেব আর শাস্ত্রী মশাই চলে গেলে বাবা আর ঠাকুমাতে কথাবার্তা হল; তাঁরাও তাদের নিন্দা করলেন। তখন তো আমার আরও বেশী রাগ হল। তাব বেশ পনের-কুড়ি দিন পরে যখন জানতে পেলাম যে নানা সাহেব তাঁর সঙ্গের সেই শাস্ত্রী মশায়ের জন্যই আমাকে দেখতে

এসেছিলেন, সেই শাস্ত্রী মশায়ই পাত্র, আমি তখন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম! সেই দুষ্টু দুর্গীটা তো আমাকে "পুরুত ঠাকরুণ," "পুরুত ঠাকরুণ" বলে ডাকতে লাগল, আর সে সুন্দরীকেও (সুন্দরী তখন আধো আধো কথা বলত) সেই নাম শিখিয়েছিল, আর সেই মেয়েটাও আমাকে আধো আধো করে "পুউত থাওন, পুউত থাওন", বলে ডাকতে লাগল। বাচ্চাদের যা শিক্ষা দেওয়া যায় তাই তারা বলে আর শেখে। দুর্গীই শিখিয়েছিল বলে তার ভাইও কখনো কখনো, "রালের[১] ভাত নেমন্তন্নে, বুড়ো বর মজার জন্যে"[২] বলে আমায় ঠাট্টা করত। আমরা জানতে পেলাম যে নানাসাহেব সত্যিই শাস্ত্রী মশায়ের জন্য আমাকে দেখতে এসেছিলেন আর তার আট-ন' দিন পরে বাবাকে নানা সাহেব সে-রকম স্পষ্ট সংবাদ পাঠালেন। সে-খবর আমি পুরোপুরি জানতে পারিনি, কিন্তু সার কথা এই যে "শাস্ত্রী মশায়ের বয়স বেশি নয়, তাঁকে আপনার মেয়েটি দিতে পারলে দেখুন।"

এই সংবাদ যেদিন এল, সেদিন খাবার সময় বাবাও ঠাট্টা করে ঠাকুমাকে বললেন, "পাত্রটি মন্দ নয়, না মা? গয়না গাঁটি প্রচুর পরাবে। পৌরোহিত্য করে দক্ষিণাও প্রচুর পাবে, তা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত পাওয়া শালও বোধ হয় তার কাছে অনেকগুলো আছে। এর ওপর আর কিছু কম বেশি দরকার হলে তা দেখে নিতে তো কর্তাঠাকুর নানা সাহেব আছেনই। আমার মত যে সেখানেই যমুকে দিই।" কেবল ঠাট্টা করেই বাবা একথা বলেছিলেন, কিন্তু আমি পাগলী সেকথা বুঝতে পারিনি। তাঁর কথা সত্যি মনে করে আমার ভাতের থালা ঠেলে আমি চট্ করে উঠে পড়লাম আর কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে গেলাম। আগেই দুর্গী অনেকদিন জ্বালাতন করে করে হয়রান করেছিল, তার ওপরে বাবার সেই কথা! তখন আর কি তা সহ্য হয়! মার কাছে গিয়ে, তাঁর শিয়রে বসে অবিরল কাঁদতে বসলাম। তখন আমার নিশ্চয় মনে হল যে আমাকে সেই বুড়োটার

১ রালে—কোংকন প্রদেশীয় ধানবিশেষ।

২ একটি মারাঠি প্রবাদ। সেকালে যখন বালিকা ও বৃদ্ধে বিবাহ হত, তখন মেয়ের বন্ধুরা তাকে এই প্রবাদটি বলে ঠাট্টা করত। কিংবা যখন কোনো বৃদ্ধ ছোট বালিকাকে খুব খুশি হয়ে বিয়ে করত, তখন এই প্রবাদ বলে লোকে তাঁর নিন্দা করত।

হাতেই দিয়ে ফেলবেন। আমরা যে বেচারী গরু! কসায়ের হাতে তুলে দিলেই বা কি করতে পারি? তখন আমার কত রকমের চিন্তা হল তা বলা অসম্ভব। মাগো! ছি ছি ছি! কী নোংরা সেই হতভাগা পুরুষ! মনে পড়লে এখনও আমার গা শিউরে উঠে! আমাকে কাঁদতে দেখে মা কতবার 'কী হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তাঁকে কিছুই উত্তর না দিয়ে আমি শুধু অনবরত কাঁদছিলাম। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হল যে, আমার সেই বুড়োটার সঙ্গেই বিয়ে হবে। ঠাকুমা আর বাবা আমাকে কত করে বুঝিয়ে বললেন, কিন্তু তবুও আমার কান্না থামে না। দাদাও আমাকে অনেক করে বুঝিয়ে বলল। শেষে ঠাকুমা তাঁর খাওয়া হবার আগেই আমাকে ধরে রান্না ঘরে নিয়ে গেলেন, আর আমাকে খাইয়ে দিলেন। তারপর বাবা খুব বকলেন। আর পাঁচ মিনিট যদি আমার কান্নাকাটি চলত তা হলে তিনি নিশ্চয় লাঠিসোঁটা একটা কিছু দিয়ে আমার মাথা ভেঙে ফেলতেন. আর আমিও ব্যাপার ততদূর গড়াতে দিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে ঠাকুমা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন তাই রক্ষে!

এই রকমে যারা-যারা আমাকে দেখতে এসেছিল তাদের এক-এক মজা মনে পড়ে আর থেকে থেকে কষ্ট হয় আর আশ্চর্যও মনে হয়। তাতেও সে বয়সে আমরা কি বুঝতাম আর কি মনে করতাম, তা ভেবে দেখলে একেবারে অবাক হই। আমার নিজের আর আমার বন্ধুদের অভিজ্ঞতার কত কথা মনে করে লিখতে পারি, কিন্তু সে-সব একই ধরনের। তাতে তফাত খুবই কম। তাই সে-সব না বলে এর পরের ঘটনা যদি বলি সেই ভালো।

যে-বছরের কথা বলছি, সে-বছরটা আমার বিয়ে না হয়েই কেটে গেল। সেই অবসরে দাদার জন্যও অনেক মেয়ের প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু বাবা বলেছিলেন আমার বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত দাদার বিয়ে দেবেন না। তাই কেউ ততটা আগ্রহের সঙ্গে দাদার জন্য মেয়ে দেখেন নি। ঠাকুমার অবশ্য বড় ইচ্ছে ছিল যে ছোট্ট একটি নাত-বউ বাড়িতে আসে। আর সত্যি কথা বলতে গেলে আমারও ইচ্ছে ছিল যে 'ঠাকুরঝি' বলে ডাকবে, এমন একটি বৌদি আসে। আর 'ঠাকুরঝি'র মুখেও 'বৌদি' শব্দটি ভারি মানায়। তার উপর, ননদ-ভাজের দুজনের স্বভাব বেশ ভালো হলে তাদের বড়ই ভাব হয়। কিন্তু আমার বিয়ের আগে বাড়িতে বৌদি আসা একেবারেই

অসম্ভব ছিল। কারণ বাবার শর্তই ছিল তাই, আর বাবার শর্ত মানে যে কী তা আগেই লিখেছি। সে বছরের সব ক'টা বিয়ের দিন যখন কেটে গেল, তখন চার মাস সব কাজেই শিথিলতা এসে গেল।

মার শরীর দিন দিন বেশী খারাপ হতে লাগল। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত যে তাঁর কী অসুখ তা হলে তা বলা মুস্কিল ছিল। কেউ বলত জীর্ণজ্বর, কেউ বা বলত যে অন্তঃসত্ত্বা কিনা, তাই তাঁর শরীর ভালো নয়—ছেলে হলেই সব খুঁটিনাটি অসুখ সেরে যাবে। কিন্তু আমি একদিন বাবা আর ঠাকুমার কথাবার্তা শুনতে পেলাম। তখন বাবা ঠাকুমাকে স্পষ্ট বললেন, "প্রসব হবার পর ওর যক্ষ্মা হবার সম্ভাবনা। তা থেকে কি করে বাঁচবে তাই ভাবছি। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে যে আর রক্ষে নেই। তবে যা হবার তা হবে।" ঠাকুমাও তখন বললেন, "যা ভগবানের ইচ্ছে তাই হবে। আমরা তো যথাসাধ্য যত্ন করছি।"

এ-কথা যেদিন শুনলাম, সে-দিন থেকে আমার মন কেমন করতে লাগল। 'মা' মানে কি, আমাদের মা যে কত ভালো, তা আমি তো এই কদিন হল বুঝতে আরম্ভ করেছিলাম। বাড়ির কাজকর্ম করতে তাঁর শক্তি ছিল না, তাই তিনি বসে বসেই তরকারি বাছা, চাল ডাল বাছা, ইত্যাদি ছোট ছোট কাজ করতেন, আর আমাকে তাঁর পাশে বসতে বলে সবরকম কাজের শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষাতেই আমার কল্যাণ হবে, এ-কথা বুঝতে পারার কয়েকদিনের মধ্যেই আমি ঐ কথা শুনতে পেলাম, তখন আমার মনের অবস্থা যে কী হল! আহা! 'মা' এই শব্দটি উচ্চারণ করামাত্র আমার মনে যে কী দুঃখের তরঙ্গ উছলে উঠেছিল তা যদি কথায় বর্ণনা করতে পারতাম, তা হলে পাঠকের মন একেবারে শোকময় হয়ে যেত। যাক।

ঐরকম অবস্থাতেই মা প্রসূতি হলেন। আমার একটি ভাই হল। ভাই হওয়ামাত্র আমার যা আনন্দ হল। সে-আনন্দে আমি লাফাতে আর নাচতে লাগলাম, আর সে-খবর দেবার জন্য দুর্গীর বাড়ি ছুটলাম। কিন্তু দুর্গী শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। তার মা আর ঠাকুমা আঁতুড় ঘরেই

ছিলেন। তখন খবর দিতে পারি এমন কেউ নেই দেখে, দুর্গীর ভাইকেই সে-সংবাদ দিয়ে আমি ফিরে এলাম।

এসে দেখি, আঁতুড় ঘরের কাছে খুব ভিড়! আর ভয়ে ভয়ে বাবা দাদাকে বলছেন, "ওরে গন্থ, ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন,—না হলে আমিই যাচ্ছি।" তাই শুনে আমার সব আনন্দ যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। কি ব্যাপার তা বুঝতে না পেরে আমি তাড়াতাড়ি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা, দাদা, ডাক্তারবাবু কেন? কী হয়েছে?" কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই মাথায় টুপি পরে দাদা চলে গেল। পাঁচ-সাত মিনিট হতে না হতেই বাবা আবার ছুটে গেলেন। আমার মনে হল যে নিশ্চয় কোনো বিপদ ঘটেছে, কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করি? সবাই মার ঘরে জড়ো হয়েছিল। শেষে আমি থাকতে পারলাম না। আমিও গিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিলাম, আমাকে দেখেই ঠাকুমা, "যমু, তোর ভাই হয়েছে, কিন্তু তোর মাকে যে নিয়ে চলল মা", এই বলে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন আর আমাকে তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে চেপে ধরলেন। তিনি বারবার করে সেই এক কথাই বলে কাঁদছিলেন। দুর্গীর মা আর ঠাকুমা বারবার তাঁকে এই কথা বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, "এ কি? আপনিই যদি এমন করেন তা হলে বাচ্চারা কি করবে? উনি শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, ডাক্তারবাবু এলে এখুনি ওঁর জ্ঞান ফিরে আসবে।" কিন্তু তিনি, "না গো না। আর কি ও জেগে উঠবে? এ যে ওর শেষ নিদ্রা। আমার কোলে ছেলেপুলে ফেলে দিয়ে ও নিজে চলল"—এই বলে কাঁদতে লাগলেন।

এমন সময় দাদা ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এল আর তার পেছনে পেছনে বাবাও এলেন। ডাক্তারবাবু এসেই "ভয় নেই, ভয় নেই," বলতে বলতে মার কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরলেন, তারপরে পকেট থেকে সেই বুকে ঠেকাবার টিউবখানা বার করে সেটা মার বুকে ঠেকিয়ে ধরে হাসি-মুখে বললেন, "আগে ইনি কখনো অজ্ঞান হয়েছিলেন? ফিট্ টিট্ হয়েছিল?"

অমনি কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুমা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ। একি সত্যি ওই রকম?"

"হুঁ" এই বলে ডাক্তারবাবু শুধু জোরে কাশলেন, কিছুই উত্তর দিলেন

না। তারপর তিনি কি সব ওষুধ দিলেন তাতে দু-তিন মিনিটের মধ্যেই মার জ্ঞান ফিরে এল। আর সবাইকে ভিড় দূর করতে বলে তিনি বাবাকে কি যেন ইংরেজীতে বললেন। বাবা অমনি দোয়াত-কলম নিয়ে এলেন আর ডাক্তারবাবু যে-কাগজ লিখে দিলেন সেটা দাদার হাতে দিয়ে তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। মার জ্ঞান ফিরে আসামাত্র আমাদের মনে হল যে উনি ডাক্তারবাবু নন, নিশ্চয়ই কোনো দেবতা। ঠাকুমা আর সবাই একেবারে হতাশ হয়েছিলেন। সকলে মনে ঠিক করেছিলেন যে মা আর জাগবেন না। কিন্তু ভগবানের দয়ায় আর আমাদের ভাগ্যে আরো কিছুদিন মাতৃসুখ ছিল তাই মা সেই প্রাণসংকট থেকে বেঁচে উঠলেন।

আমার নতুন ভাই হল, কিন্তু পাঁচ ছ'দিন তাকে দেখতেই আমার ইচ্ছে করছিল না। আর ঠাকুমা স্পষ্টই বলতেন, "আমি ওটাকে দেখতে চাইনে। বাছা মার মরণ টেনে এনেছিল!" কিন্তু যাই হোক্, মার আঁতুড়ের দশ দিন ভালয় ভালয় কেটে গেল। সকলে বলতে লাগল যে ওঁর শরীর এখন বেশ ভাল হবে। কিন্তু তা ততটা সত্যি হল না। জ্বর তাঁকে ছাড়তে চাইছিল না। ডাক্তারমশাই নতুন খোকাকে মার দুধ খাওয়াতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে-কথা কেউ গ্রাহ্য করে নি। "এই ডাক্তাররা যেন কি! বললেন কিনা আঁতুড় ঘরের কচি ছেলেকে মাই খেতে দিওনা! মার দুধ খাবে না তো কার দুধ খাবে?" এই বলে খোকাকে মাই খাওয়ানো শুরু হল। খোকার কিন্তু দুধ-টুধের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কেন না পেট ভরে দুধ সে পেত না। তবু সে বেশ টুকটুকে ছিল। সবাই বলত যে সে 'দেখতে অবিকল যমুর মতো,' আর তাই শুনে আমি বড় খুশি হতাম। আমার আর তার উপর রাগ রইলনা। যখন-তখন তাকে কোলে করে বসা ছাড়া এখন আর আমার অন্য কোনো কাজই ছিল না। দুর্গীর ওখানে খেলতে যাওয়াও একেবারে বন্ধ, বাড়ির কাজকর্ম বন্ধ, শুধু মার ঘরে গিয়ে ওই বগাকে[১] নিয়ে বসা।

এতে আমার আরো দু'টি লাভ ছিল। একটি এই যে মার মোহনভোগ থেকে ভাগ পেতাম, সে জন্য দাদা আমাকে ঠাট্টাও করত। সে বলত যে আমি যে মার ঘরে গিয়ে বসি তা বগার জন্য নয় বা টগার জন্যও নয়, মোহনভোগের লোভে! কিন্তু দ্বিতীয়, আর আমার সত্যি সত্যি লাভ

১ বগা—সেই নতুন খোকার নাম।

যা ছিল তা এই—মা নিজে পড়তে পারতেন না, কেননা তাঁর তত শক্তি ছিল না। এখন তো বেশ সময় হাতে ছিল, তাই তিনি আমাকে 'ভক্তি-বিজয়' পড়ে শোনাতে বলতেন। সেই প্রেমময় কথা পড়ে আমার কান্না পেত। যেখানটা বুঝতে পারতাম না, সেখানটা মা বুঝিয়ে দিতেন। এমনি করে একমাস দেড়মাসে আমি কত পড়লাম! তাছাড়া তিনি আমাকে সময়মত আলাদা উপদেশও দিতেন। বগাকে স্নান করাতেও তখন আমি শিখলাম, দাই আমাকে দু-একবারে তা ভাল করে শিখিয়ে দিল। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুমা আমাকে রান্না করতে ডাকতেন। দু-একবার তো ঠাকুমা আমাকে দিয়ে ভাত, তরকারি আর ডাল রাঁধিয়ে দিলেন আর সবাইকে পরিবেশন করতে বললেন। সেদিন মা আমার মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, "যমু, তুই যে এমন লক্ষ্মী মেয়ে হবি তা কখনো ভাবিনি। বাছা, শ্বশুর বাড়িতে সকলকে এমনিই সুখ দিস, তা হলেই ভালো।" এই বলে তিনি কিছুক্ষণ থামলেন। সেই সময়ে আমার কত আনন্দ হল! আমার মনে হল আমি যে নিশ্চয় লক্ষ্মী, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। মা যদি 'সাবাস' বলে উৎসাহ দেন, তার চেয়ে ছেলেমেয়েরা আর বেশি কি চায়! মার মুখে সাবাস্ শুনে মনে হয় যেন সবকিছু পেয়েছি! অন্ততঃ আমার তেমন মনে হল।

কিন্তু তখনকার অত আনন্দ, গর্ব্ব, এক মুহূর্ত্তও টিকল না। আনন্দিত হয়ে মুখ তুলে মার মুখের দিকে চাইতেই দেখতে পেলাম যে মার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে! আমি তাঁর দিকে চাইতেই মা হঠাৎ বললেন, "যমু আমি থাকতে থাকতে তোর বিয়ে হয়ে জামাইয়ের মুখ দেখতে পাব কি মা!" এ পর্যন্ত মার মুখে আমার বিয়ের সম্বন্ধে এমন কথা আমি কখনো শুনিনি। ঠিক এই সময়ে তাঁর এই কথা শুনে আমি অবাক হলাম আর লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলাম। এ সব লিখতে আমার যতক্ষণ সময় লেগেছে তার দশমাংশ সময়ের মধ্যেই এসব ঘটনা ঘটল বললেও চলে।

মার মুখে সে-কথা শুনে যেই আমি মাথা নিচু করলাম, অমনি শুনতে পেলাম যে বাবা বলছেন, "হবে গো হবে। তুমি অধীর হয়ো না। সেরে ওঠো। বিয়ের মরশুম আসতে না আসতেই, প্রথম নয়তো দ্বিতীয় দিনেই যমুর বিয়ে দিয়ে ফেলছি।" শুনতে পেলাম যে বাবার স্বর একেবারে গদগদ। মার খাটের কাছে পিঁড়ি পাতা ছিল, তার উপরে মা মাথা হেঁট

করে বসেছিলেন, বাবার কথা শোনামাত্র চট্ করে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "আড়াল থেকে শুনলে বুঝি ?" তাঁর মুখে একটু হাসিও ফুটে উঠল। আমার তখন বড় লজ্জা করতে লাগল। এখান থেকে পালাই কি করে তাই ভাবতে লাগলাম, আর বাবা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে মার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তাঁর সেই দরজার ওপরের দিকে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা গম্ভীর: উদাত্ত মূর্তি—কিছু প্রেম কিছু গৌরবের ভাব, কিছু দুঃখ, কিছু চিন্তা, সমস্ত ভাব মেলানো দৃষ্টিতে মার প্রেমময়, লজ্জাবনত হাসিমুখের দিকে চেয়ে থাকা,—এ-ছবি যেন এখনো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমি যদি ছবি তুলতে পারতাম তবে সব কাজ ফেলে আমি তখন বাবার ছবি তুলে নিতাম।

উপরে যা লিখেছি তার চেয়ে বেশি একটি অক্ষরও বাবা বললেন না। সেই ভাবে তিনি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেখান থেকে চলে গেলেন। বাবার মন যে এত স্নেহময় তা এর আগে কখনো আমার মনে হয়নি। তাঁর বিষয়ে আজ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা একেবারেই অন্য রকম ছিল। তাঁর আমাদের সঙ্গে ব্যবহার কেমন ছিল, ঠাকুমার সঙ্গে তিনি কি রকম ব্যবহার করতেন, ঠাকুরদা আর তাঁর মধ্যে কি রকম প্রীতি (!) ছিল কিংবা মার সঙ্গেও তিনি আগে যে রকম ব্যবহার করতেন সে সব মনে করে, বাবার স্বভাব কেমন ছিল তা আমি এর আগে লিখেছি। রাগের সময়ে ছাড়া অন্য সময়ে তিনি মার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহারই করতেন বটে, কিন্তু আমরা ছেলেমেয়েরা তাঁর এ রকম স্নেহময় স্বভাবের প্রকাশ কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আমরা পুণায় আসার পর থেকে বাবার স্বভাবের অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল। ঠাকুমার সঙ্গে তিনি আজকাল কোমল ভাবে কথাটথা কইতেন, তার কারণ ঠাকুমাই সময় বুঝে কথা বলতেন তবুও কখনো কখনো তিনি তেড়ে উঠতেন। কিন্তু ঠাকুমা একেবারে লক্ষ্মীটির মতো চুপ করে থাকতেন, তাই ব্যাপারটা সেইখানেই মিটে যেত। মার সঙ্গে কিন্তু তিনি আজকাল কক্ষণো রাগ করে কথা বলতেন না। শুধু তাই নয়, তাঁর ওষুধ-পথ্য, সেবা-শুশ্রূষা তিনি নিজেই করতেন বললেও হয়। আর আজ একেবারে চরম উৎকর্ষ হয়েছিল। তিনি শুধু মার কথাই শুনছিলেন, না আগে থেকে সব কথা শুনে কি কি হয়েছিল তাও দেখেছিলেন, তা জানতে পারিনি।

আমার মনে হচ্ছে যে বাবার তামসিক স্বভাবের পরিবর্তন হবার কারণ ছিল মার অসুখ। এখন আমার ধারণা হয়েছে বোধহয় তখন তাঁর মনে হত যে এমন গুণবতী স্ত্রী বেশি দিন তাঁর ভাগ্যে থাকবে না, তাই যতদূর সম্ভব তাকে সুখে রাখা চাই, তার কথামত চলা উচিত, তার সব ইচ্ছা পূর্ণ করা দরকার! অবশ্য তিনি আগে কখনো তাঁর কথা অগ্রাহ্য করেছিলেন তা নয়; তার কারণ ছিল মার বুদ্ধি, বাবার মমতা নয়। কিন্তু দেখতে পেতাম যে এখন তিনি স্নেহশীল হয়েই তাঁর কথা মেনে চলতেন। সেদিনটি আমি কখনও ভুলতে পারব না। আমার জীবনের শুষ্ক অরণ্যে যে কয়টি অত্যন্ত সুন্দর ফুল ফুটেছে, এটি তার একটি। তা কি আমি এ জীবনে ভুলতে পারি?

সুখের পিছু পিছু দুঃখ, তা নয়—এক রত্তি সুখ আর এক গাড়ী-ভরা দুঃখ—এই হচ্ছে জগতের রীতি! মা ছেলে প্রসব করে এক জীবনসংকট থেকে বেঁচে উঠলেন, তারপরে একমাস দুমাস একটু সুখে দিন কাটল। সুখই বা কিসের? মার অসুখ তো ছিলই, তবুও তার মধ্যেই এক রকম সুখেই দিন কেটে যাচ্ছিল বলে ধরতে হবে—এমন সময় আর এক বিপত্তি উপস্থিত হয়ে আমাদের বগাকে নিয়ে গেল। সকলে ভাবত যে খোকা ভারি সুন্দর হবে, দেখতে সে বড় চটপটে আর চালাক ছিল। আমাকে তো সে যেন একেবারে পাগল করেছিল। এক রাত্রে সে হঠাৎ জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল, তারপর পেট দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল। অত রাত্রে ঠাকুমা ছুটোছুটি করে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। বেশ দূরে, কোথায় যেন তাঁর পরিচিত কোনো এক মহিলা থাকতেন। তাঁর খরগোশের রক্তে ভেজানো একটি ন্যাকড়া ছিল। নিজে না গেলে তিনি সেটা কাউকে দেবেন না, অত রাত্রে দাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঠাকুমা সেটা নিয়ে এলেন। ডাক্তার হল, কবিরাজ হল, কিন্তু কোনো উপায়ই কাজে লাগল না। শেষ কালে পরের দিন শিশুটি শেষ নিশ্বাস ফেলল!

মার দুঃখের সীমা রইল না। তবুও তাঁর বিবেক-বুদ্ধি খুব বেশি ছিল বলে তিনি কান্নাকাটি করে বাড়াবাড়ি করলেন না। তাঁর দুঃখ আর কান্না তিনি বুকের মধ্যে চেপে রাখলেন। তবু "কোথায় নিয়ে চললে?" বলে চীৎকার করে কেঁদেছিলেন। কিন্তু তারপর একেবারে মুখ বুজে রইলেন। কিন্তু আজ যে তিনি সব দুঃখ চুপ করে সহ্য করছেন, তার পরিণাম কি হবে তা কি তখন কেউ ভেবে দেখেছিল?

দুর্গার কপাল

সেদিন দুর্গার প্রাণ কী আকুল! তার বরের সেদিন তাদের বাড়িতে খেতে আসার কথা। দুর্গার বর কেমন তা দেখতে আমারও ভারী ইচ্ছে ছিল; কেননা সে তার বরের আর শ্বশুরবাড়ির বিষয়ে আমাকে অনেক কথা বলত। সে বলেছিল যে তার বর অনেক বার তাদের বাড়ি এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে শুধু একটি বার অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলাম। সে আজ খেতে আসবে বলে দুর্গার বাড়িতে কত আয়োজন করা হচ্ছিল। দুর্গা যে কতবার তাদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা করছিল তা গুণে বলা যায় না। সেদিন সে তার বরের সম্বন্ধে কত কথা যে আমাকে বলল তার ঠিক নেই। তাদের চেনাশোনা নাকি দশবারো বছর ধরে। সত্যি কথা বলতে কি দশ-বারো মাসই হয়নি, পাঁচ-ছয় মাস পর্য্যন্ত হয়নি! দুর্গা যত কথা বলেছিল, সে সমস্ত এখানে বললে ভালো দেখাবে না, তাছাড়া পরের অনেক ঘটনার সঙ্গে দুর্গার সম্পর্ক আছে, যথাস্থানে তার নির্দেশ করা দরকার হবে, তাই দুর্গা যা বলেছিল সে সমস্ত এখানে বলব না। তবু মেয়েদের মন ছেলেবেলা থেকে কি ধরনের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে তার একটু নিশানা দেবার জন্য দু-এক কথা বলি। সেগুলি কেবল নমুনাস্বরূপ।

সে বলল, "যমু, কি মজা জানিস? পায়খানা থেকে এলে পরে হাত-পা ধোবার জল দেবার জন্য আমি আশেপাশে কোথায় আছি কিনা চেয়ে দেখেন। পরশুদিন আমি পিছন ফিরে কলতলায় জলের ঘটি ভরছিলাম। কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তা জানতাম না। আর ওমা! ছোট্ট একটা পাটকেল তুলে আমার গলায় ছুঁড়ে মারলেন। আর আমি অমনি বলে উঠলাম, 'কে ইট ছুঁড়ছে? উপরে কেউ আছে না-কি?' এই বলে ঘুরে দেখি, ওমা! উনি দাঁড়িয়ে। আর তাই আমার হাত থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। কলের নিচের ঘটিটা ভরে এসেছিল, কিন্তু সেটা কি

আর হাতে থাকতে পারে ? ধপ করে পড়ে গেল আর আমার গায়ে সব জল ছিটিয়ে পড়ল। শাড়িখানা একেবারে ভিজে গেল, আর আমি যে কেমন করে পালিয়ে গেলাম তা ভাই বলতে পারছি না।" তারপর তার দিকে আড়চোখে কেমন করে তাকিয়ে দেখে, আর সে লক্ষ্য করছে না দেখে দুর্গীও লুকিয়ে লুকিয়ে তার দিকে কেমন করে চায়, আর দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেলে কেমন লজ্জা করে ইত্যাদি কত কথা দুর্গী সে সময়ে আমাকে বলেছিল। তার বিয়ে হয়ে তখনো পাঁচ-ছয় মাসও হয়নি, এই অল্প সময়েই এসব চিন্তা তার মনে ঘোরাফেরা করত। আর এ-ধরণের গল্প দুর্গী যখন আমাকে বলত, তখন আমার যদিও বিয়ে হয়নি তবু সে রকম বিচ্ছিরি মনোরাজ্যে কিছু কাল কাটিয়ে আমি আনন্দ উপভোগ করতাম। থাকগে সে কথা।

দুর্গী যে-বরের সম্বন্ধে এ রকম সব গল্প বলত আর সেই বরের সেদিন তার বাড়িতে খেতে আসার কথা, তাই তার বর কেমন তা দেখতে আমি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম। দশটা সাড়ে দশটার সময় সামনের দুয়োরে যাবার জন্য দুর্গী প্রত্যেকবার কিছু না কিছু অছিলা খুঁজতে লাগল। দু-একবার সে আমাকেই দরজায় যেতে বলল, আর আমি যেতে না যেতেই নিজেও আমার পিছনে ছুটে এল। এমনি কতবার চলল। এমন সময় তার মা তাকে ভিতরে ক *করতে ডাকল, তাই সে ভিতরে গেল, কিন্তু আবার আহ্লাদে আটখানা হয়ে ফিরে এসে আমাকে বলল, "আজ ভাই আমি পরিবেশন করব; তোর সঙ্গে খেতে পারব না।" সকাল থেকে সে তাই ভাবছিল। একবার লজ্জার মাথা খেয়ে সে তার মাকে জিজ্ঞাসাও করেছিল, "মা, আজকে আমি পরিবেশন করব?" কিন্তু তখন তাকে কেউ কিছু উত্তর দেয়নি। কিন্তু শেষকালে তার মনের মত ব্যবস্থা হল। তাই তার যা আনন্দ হয়েছিল! পরিবেশন করবার সময় কতবার তার বরের সামনে যেতে পাবে মনে করেই অবশ্য তার এত আনন্দ হয়েছিল! শেষ কালে তার বর এসে পৌঁছুল। তখন আমি সেখানে ছিলাম না তাই ছুটে এসে দুর্গা আমাকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে গেল। তাঁরা তিন-চার জন এসেছিলেন। একজন দুর্গীর মামাশ্বশুর—তিনি একেবারে বৃদ্ধ, দ্বিতীয়জন তার বর, তৃতীয়জন কে-যেন তাদের পরিচিত ভদ্রলোক, আর চতুর্থজন তার ছোট দেওর। দুর্গীর বরের বয়স ছিল চোদ্দ কিংবা পনেরো বছরের

কাছাকাছি। রং বেশ কালো আর শরীর একেবারে রোগা। প্রথমে আমার মনেই হয়নি যে সে দুর্গীর বর। তার সঙ্গের লোকটিকেই আমি তার বর মনে করেছিলাম। কিন্তু দুর্গীই 'অমুক আমার বর' বলে আমাকে দেখিয়ে দিল। তখন আমার মনে হল, 'ওমা! ছিছি! এই প্যান্‌পেনে ছেলেটা দুর্গীর বর! কি বিচ্ছির তার বর! আর দুর্গীই বা কী!' কিন্তু থাক সে কথা। দাদাকে, সুন্দরীকে আর আমাকে সেদিন দুর্গীর বাড়িতে খেতে বলেছিল। কিন্তু স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাবে বলে দাদা ভাবছিল খেতে যাবে কিনা, শেষ পর্যন্ত গেলও না। শুধু সুন্দরী আর আমি গেলাম।"

এই বেলা দুর্গীর বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ির বিষয়ে অল্প কিছু লিখলে মন্দ হবে না। তাই সে কথা সংক্ষেপে বলে নিই। দুর্গীর বাবা সত্যি ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি বড় বেশি মাইনে পেতেন না, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকাই হবে। কিন্তু তাতেই তিনি ছিম্‌ছাম্‌ভাবে সংসার চালাতেন। তাঁর মাই তাঁদের বাড়ির বড় গিন্নি ছিলেন, আর তিনিও ঘরকন্নার কাজে বেশ চটপটে ছিলেন। সময় মত বাজার-হাটও করতেন ধান-টানও কিনে আনতেন। তাঁর ছেলেও—দুর্গীর বাবা—তাঁর কথার অবাধ্য ছিলেন না। তিনি তাঁর মাকে কখনো কষ্ট দিতেন না। একবার বহিনা-কাকীমা—আমরা সবাই তাঁকে এই নামেই ডাকতাম—ঠাকুমাকে নিজের কাহিনী বলেছিলেন, তখন আমিও তা শুনেছি। 'তাঁর ছেলের যখন দশ-বারো বছরের কাছাকাছি বয়স, তখন তার বাবা মারা যান। তখন থেকে বহিনা-কাকীমা দেওরের বাড়িতে থেকে, দেওরের বাড়ির কাজকর্ম করে কষ্টে-সৃষ্টে ছেলের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। ছেলেও বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করত, মাকে কখনো কষ্ট দিতনা। তার কাকীমা বড় খারাপ ছিলেন, তবু তাঁর কাছেও সে কখনো বকুনি খায়নি। তিনি যে-কোনো কাজ করতে বলতেন তা সে লক্ষীছেলের মত করত। কেউ ভর্ৎসনা করলে মুখ বুঁজে সহ্য করত। নিজের পড়াশোনা নিয়েই সে থাকত। কিন্তু তার কপালের ততটা জোর না থাকায় প্রথম পরীক্ষা সে শীগগির পাশ করতে পারেনি, অনেকবার ফেল করেছিল। শেষকালে চতুর্থবার না পঞ্চমবারে সে পাশ করল। তার পরে আর বেশী পড়াশোনার জিদ না করে সে চাকরি করতে লাগল, প্রথমে বারোটাকা মাইনে। কাকা তার বিয়ে

দিলেন। মার অল্প গয়নাগাঁটি ছিল, সেগুলো বৌমাকে পরানো হল। হতে হতে বারো-চোদ্দ বছরে তার মাইনে পঁয়ত্রিশ টাকা হল। তার সংসার মোটামুটি বেশ সুখেই চলছিল। মেয়ের যখন বিয়ের বয়স হল তখন যথাসাধ্য খরচপত্র করে দুর্গীর বিয়ে দিল, একশো না দেড়শো টাকা যৌতুক দিয়েছিল। মোট কথা বেশ সুখে তার সংসার চলছিল।

দুর্গীর বাবার বয়স বেশী ছিল না। কিন্তু তাঁর আপিস আর ঘর নিয়েই তিনি থাকতেন। আমার মনে পড়ছে না যে তিনি কখনো বাইরে কারো বাড়িতে গিয়ে গল্প-গুজব করতেন বলে। আমরা যদিও এক পাড়াতেই থাকতাম তবুও তিনি কখনো আমাদের বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে গল্প-গুজব করেছেন বলে আমার মনে পড়ছে না। স্বভাবতই তিনি কম কথা বলতে ভালবাসতেন। বইটই পড়ার কিংবা অন্য কোনো শখও তাঁর ছিল না। অবসরের সময় হয় তিনি আরামে বসে থাকতন, নইলে তাঁর মার সঙ্গে গল্প করতেন। তাঁর স্ত্রীর কিন্তু একটু দেমাক ছিল। তার অনেক গুণই দুর্গী পেয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। সে তার শাশুড়ীকে স্পষ্ট কথায় যদিও চুপ করে বসে থাকতে বলত না, তবু বকবক করে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিত। সেজেগুজে বেড়াতেও সে ভালবাসত। তার এ-গুণটাও দুর্গী পেয়েছিল। তা ছাড়া দুগার মা বেয়াদবও একটু ছিল। মর্যাদা কাকে বলে তা সে জানতই না বললেও ভুল হয় না। কখন কার সঙ্গে কথা বলা উচিত, কার সঙ্গে বলা উচিত নয়, তা একেবারে না ভেবে, সে যার-তার সঙ্গে কথা বলত।

আমাদের বাবার সঙ্গে কথা বলতে বাড়ির লোকও সহজে সাহস করত না, কিন্তু একদিন বাবা আর ঠাকুমা আমার বিয়ের সম্বন্ধে কথা কইছিলেন, এমন সময় কি কাজ নিয়ে দুর্গীর মা আমাদের বাড়ি এসেছিল, তখন বাবার মুখে কয়েকটা কথা শুনে, অমনি এগিয়ে এসে সে বলল, "দেখুন, যমুর জন্য বর বেশ সুন্দর দেখবেন। মেয়েটি বড় চালাক। অমনি কোনো ভিখিরী-টিখিরীর গলায় বেঁধে দেবেন না। দু-চারশো দিতেও তো আপনাদের কোনো অসুবিধা নেই। ভালো পাত্রই খোঁজ করুন।" তাই শুনে বাবা বেচারীর মতো চুপ করে রইলেন। কিন্তু দুর্গীর মা কিছুই মনে করল না। যে কাজের জন্য এসেছিল সেটা সেরে চলে গেল। সে চলে গেলে বাবা তার

অতি সাহসের আর বাচালতার নিন্দে করলেন। আর সকলেরও তার বাচালতা ভাল লাগল না।

বাস্তবিক ভেবে দেখলে দুর্গীর মা এমন কি মন্দ ব্যবহার করেছিল? আমি তো তা বুঝতে পারছি না। মেয়ে জাতির সামাজিক আচরণের পরম্পরাগত একটা বিশেষ ধরন মানা হয়েছে, সেই ধরনটার প্রশংসা করা হয়। আমার মনে হয় যে সেই পরম্পরাগত ধরনের মাত্রা ছাড়িয়ে দুর্গীর মা একটু কথা বলেছিল, এর চেয়ে বেশি কিছু তো আর করেনি। তাই বা কেন, আমার তো মনে হয় যে দুর্গীর মা মোটেই মন্দ আচরণ করেনি। মেয়েরা যা মনে করে তা অন্যকে স্পষ্ট ভাবে বলে প্রকাশ করায় কোনো আপত্তি না থাকাই উচিত। মেয়ে জাতি যে সবদিক দিয়ে কোণঠাসা হয়ে রয়েছে, সে ভালো পরিস্থিতি নয়। অবশ্য আমি নিজে আর চারজনের সামনে কথা বলতে লজ্জা বোধ করব আর করিও। দাদার সঙ্গে দেখা করতে যদি কোনো ভদ্রলোক আসেন আর তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার হয়, তা হলে আমি নিজে জিজ্ঞাসা না করে, অন্য কাউকে তা জিজ্ঞাসা করতে বলি, নিজে কখনো তাদের সামনেও যাইনা। যদি নিতান্তই তার কোনো বন্ধু আসে তবেই আমি তার সামনে যাই। এর কারণ আর কিছু নয়, ছেলেবেলা থেকে মনে আঁকা সংস্কার। যেন সকলেই পাপে পা ধুয়ে এসেছে। আর দুর্গীর মা! বয়সে বোধহয় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হবে। অন্য মেয়েদের চেয়ে নির্ভীক আর বাচাল। কিন্তু তাই বলে কার সাধ্য যে তার অন্য আচরণ সম্বন্ধে নিন্দা করে। তার আচরণ এমন স্বচ্ছ আর শুদ্ধ ছিল যে ধন্যি! মনে হত যে দুর্গী পরে ঠিক তার মার মতো হবে।

এর আগে একবার আমি বলেছি যে, কাজ-কর্মের বিষয়ে আলস্য ছাড়া দুর্গীর অন্য তেমন কোনো দোষই ছিল না। তার মার অনেক গুণই সে পেয়েছিল, বাড়ির কাজকর্মের বিষয়ে কিন্তু দুর্গী ভারি অলস ছিল। আর তার মা ছিল একেবারে তার বিপরীত। কাজের বেলা যেন একেবারে বাঘ! বাড়ির সব কাজকর্ম এমন চটপট্ আর সুন্দরভাবে সেরে ফেলত যে, তার শাশুড়ীর কোনো কাজই করতে হত না। সে স্পষ্টই বলত, "আমি বাজার-হাট সব করতে পারব। শাওড়িঠাকরুণ শুধু পিঁড়ি পেতে বসে বসে আমাকে ভুলটুল বুঝিয়ে দিলেই চলবে। আর উনি শুধু চাকরি করে মাসকাবারে মাইনে বাড়িতে এনে দিলেই হল। আমি আর সব দেখে

নেবো। সংসার মানে এমন আর কি?" দুর্গীর মার কর্মক্ষমতা যে কত ছিল, তা দুর্গীর কথা পড়লে পরে জানতে পারা যাবে। আপাততঃ দুর্গীর শ্বশুরবাড়ির কথা বলি।

দুর্গীর শ্বশুরবাড়ির পরিবার বেশী বড় ছিল না আর বিশেষ ছোটও ছিল না। তার শ্বশুর, একজন খুড়শ্বশুর, দশ-বারো বছরের একটি দেওর, চার-পাঁচ বছরের এক ননদ আর সাত-আট বছরের এক খুড়তুতো ননদ। বাড়িতে বয়স্কা স্ত্রীলোক ছিলেন তিনজন। শাশুড়ী, (শাশুড়ীর শাশুড়ীও ছিলেন, কিন্তু দুর্গীর বিয়ের পনেরো দিন পরে তিনি বৈতরণী পার হয়েছিলেন), এক খুড়শাশুড়ী, আর এক পিসশাশুড়ী। এত বড় পরিবার থাকা সত্ত্বেও আমি বললাম যে তাদের পরিবার বেশী বড় ছিল না, তাই শুনে হয়তো কেউ কেউ আশ্চর্য হবেন। কিন্তু তেমন ভাববার মতো কিছু নেই। কেননা, তাদের পরিবারের সকলে একেবারে নিকট সম্পর্কের ছিল। দূর সম্পর্কের বড় কেউ ছিল না। আমি সে-রকম বড় পরিবারের মজাও দেখেছি। তাই দুর্গীর বাড়ির পরিবারের লোকসংখ্যা দেখে আমার ততটা কিছুই মনে হচ্ছে না। দুর্গীর দাদাশ্বশুর ষাটবছর বয়স পেরিয়েছিলেন, কিন্তু বেশ চটপটে আর সবল ছিলেন। এত বয়স হয়েছিল তবু এখনও ওকালতি করে পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। বাড়ির আর সকলে ছিল আস্ত গাধা। দুর্গীর শ্বশুর তো কোনো কাজেরই লোক ছিল না। আক্কেল বলে পদার্থ তার একেবারেই ছিল না। বাবা টাকা উপার্জন করতেন আর সে বসে বসে খেত, কিন্তু তাতে তার একটুও লজ্জা করত না। তার বয়স চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এক পয়সার তরকারি আনতে হলেও তার হিসাব বুঝতে পারা মুশকিল হত। এই তো তার বুদ্ধি! তবু তার বাবার কাছে কোনো মক্কেল এলে আজকাল সে তাদের চিঠিপত্র, দরখাস্ত ইত্যাদি লিখে দিয়ে দু'এক পয়সা রোজগার করতে আরম্ভ করেছিল। তার ভায়ের, মানে দুর্গীর খুড়শ্বশুরের, নাটকের বড় শখ ছিল। বাড়িতে খাওয়া আর নাটক করা ছাড়া তার অন্য কোনো কাজই ছিল না। নাটক করে যে তার কিছু প্রাপ্তি হত, তাও নয়—সেদিক দিয়ে একেবারেই হরগোবিন্দ! দুর্গীর নিজের শ্বশুর তবু দু'এক পয়সা কামাই করত, কিন্তু এই ভদ্রলোকটি ট্যাকের পয়সাও খরচ করে বসত। দুর্গীর বর দেখতে কেমন ছিল, আর তার স্বাস্থ্য কেমন ছিল, তা আগেই বলেছি। বিদ্যাবুদ্ধির কথা বলতে

গেলে, সে ইংরাজী চতুর্থ ক্লাশে পড়ত। তার ঠাকুরদা বেচারি তার উপরই সব নির্ভর করে বসে ছিলেন, সেই তাঁর একমাত্র আশার স্থল ছিল। আর লোকেও বলত যে দুর্গীর বর সত্যি তেমনি বুদ্ধিমান ছিল। এই হল তাদের বাড়ির পুরুষদের কথা।

মেয়েদের ভিতরে দুর্গীর শাশুড়ী একেবারে সতীসাধ্বী ছিলেন। এত বুদ্ধিমতী অথচ সরল মহিলা আমি কখনো দেখিনি। এত বড়, আর যে-রকম সংসারের এইমাত্র বর্ণনা করেছি, সে রকম সংসার সে যে কী করে চালাতো তা সেই জানে। তার বাপের বাড়ির লোকেরা বেশ বড়লোক ছিল, কিন্তু সেদিকে তার কোনো টান ছিল না। তার ভাইরা তার নামে পৈতৃক সম্পত্তির আংশিক আয় লিখে দিয়েছিল, তাই নিজের ভাগের আয় নিয়ে আসবার জন্য সে প্রতি বছরে সাত-আট দিন বাপের বাড়ি যেত আর অমনি ফিরে আসতো। তার শ্বশুরমশাই তাকে বড় ভালোবাসতেন। সহজে ভালোবাসা যায় তেমন পুত্রবধূই সে ছিল। অনেকদিন পরে দুর্গীর মুখে একবার আমি তার কথা শুনেছি। তখন সে ঠাট্টা করে বলেছিল, "আমার শ্বশুরের শাশুড়ী হওয়া, আর শাশুড়ীর শ্বশুর হওয়া উচিত ছিল, তাহলে একেবারে পুরুষ না হলেও অনেকটা ভালো হত।" দুর্গীর শাশুড়ী বেটাছেলের মত রুক্ষ ছিল, তা ছাড়া তার সব গুণই ছিল। তাকে দেখে কেউ মনে করত না যে তার অত কর্মক্ষমতা থাকতে পারে। দুর্গার খুড়-শাশুড়ী আর পিস্‌শাশুড়ীর রকমই আলাদা।

দু'মাস পরে

যেদিন দুর্গীর বাড়ি তার বর খেতে এসেছিল, তার পর দু'মাস কেটে গেল। এই অবসরে বাবা আমার জন্য অনেক পাত্রের অনুসন্ধান করেছিলেন। মনে হত, আজকাল রাতদিন বুঝি তাঁর অন্য কোনো চিন্তাই ছিল না। বললে হয়তো অনেকে অবিশ্বাস করবে, কিন্তু বাবা এ দু'মাসে শুকিয়ে গিয়েছিলেন। আমার বিয়ের চিন্তাতেই তিনি কৃশ হয়েছিলেন তা বলতে পারিনে। আমার ধারণা, তাঁর মনে হত মা বেশী দিন বাঁচবেন না, দিনে দিনে দুর্বল হচ্ছেন, তাকে আমার বিয়ের সম্বন্ধে তিনি যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সে আশ্বাস পূর্ণ করতে পারবেন কি না এই ভাবনা তাঁর ছিল। সে যাই হোক্, তিনি একের পর এক পাত্র দেখতে লাগলেন, কিন্তু একটিও তাঁর পছন্দ হল না। তিনি রোজ কী কী করলেন, কোন কোন পাত্র দেখা হল, সেসব ঠাকুমার পাশে বসে বলতেন। তখন আমি সে-সব কথা শুনতে পেতাম। কোথাও নিজের শাশুড়ী নেই, সৎশাশুড়ী, কোথাও শ্বশুর নেই, কোথাও শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে আছেন, কিন্তু মস্ত বড় পরিবার, আর ছেলের বিদ্যে একেবারে কম। কোথাও সব কিছুতে মিল হত, কিন্তু কুষ্ঠির মিল হত না, কোথাও কুষ্ঠিরও মিল হত, কিন্তু তাঁরা ভয়ানক যৌতুক দাবি করতেন। এরকম একশো বাধা! অন্ততঃ সত্তর-পঁচাত্তরটি পাত্র তিনি দেখলেন, কিন্তু একটিও তাঁর মনের মত হল না, কেন না সব তাতে মিল হচ্ছিল না। "মেয়েটারই কপাল দোষ। কারো কারো বরাতই এই রকম্ যে, তাদের কিছুই চট্ করে লেগে যায় না। একশো বাধা আর অসুবিধা হবেই হবে! ওর মা থাকতে বিয়ে হওয়া যদি কপালে থাকে, তাহলে হবে'খন।" এ রকম কথা আজকাল ঠাকুমার মুখে শুনতে পেতাম। তবু সে কথা ঠাকুমা চুপি চুপি আর মা যাতে শুনতে না পান এইভাবে বলতেন তাই রক্ষে!

আজকাল মা একেবারেই তাঁর ঘরের বাইরে আসতেন না। বাচ্চাটার মরণদুঃখে তিনি একেবারে বিছানা নিয়েছিলেন। যক্ষ্মারোগীর শরীরের

অবস্থা যেন কী রকম! আমি তো তখন কিছুই বিশেষ বুঝতাম না, কিন্তু এটুকু সহজে বুঝতাম যে তাঁর শরীর মাঝে মাঝে কেমন যেন ঠিক থাকত না। একদিন দুপুর বেলা যদি ভাবতাম যে আর আট-দশ দিনে তিনি সেরে উঠবেন, অমনি সেই রাত্তিরেই মা এমন অস্বস্তি বোধ করতেন যে মনে হত বোধ হয় আর দুচার দিনও বাঁচবেন না। তাই সকলের বড় ভয় করত। আমার ঠিক মনে পড়ছে, একদিন মা নিজে হেঁটে দুর্গার বাড়ি গিয়ে বেশ দু'ঘণ্টা বসে গল্পটল্প করেছিলেন, আর ঠিক সেদিন রাত্তিরেই প্রায় বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন নি। তাঁর খুব বেশী জ্বর হয়েছিল। তাই ঠাকুমা আজকাল স্পষ্টই বলতেন, কোন সময়ে কী হবে তার ঠিক নেই। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতাম যে মা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে তিনি বেশীদিন বাঁচবেন না। এর আগে একদিন দুপুরবেলা আমাকে কাছে ডেকে মা যে উপদেশ দিয়েছিলেন আর তার মুখ থেকে যে-সব কথা বেরিয়েছিল, তা শোনার পরও যদি কারো মনে মার মনের অবস্থার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকত, তা হলে সে সন্দেহও এখন একেবারে দূর হল। তার কারণ আমি এখন বলছি। বাড়িতে কারো মনেই তিনি সেরে উঠবেন এমন আশা ছিল না। আমি ছোট ছিলাম কিনা, তাই আমি একা মনে করতাম যে মা এত শীগগির্ মারা যেতেই পারেন না। সুন্দরী একেবারেই ছোট ছিল, সে কিছুই বুঝত না। কিন্তু আজকাল বাড়ির সকলে যা বলত তা শুনে আমারও ঠিক মনে হতে লাগল যে মা বেশীদিন বাঁচবেন না। মা নিজে কি ভাবতেন কী জানি! কিন্তু, কোনো বোঝদার মেয়েকে যে রকমে বুঝিয়ে বলা হয়, ঠিক সেই রকম ভাবে মা আমাকে অনেক কথা বলতেন আর আমাকে শিক্ষা দিতেন।

আমি মা-র কাছেই ঘুমোতাম। সেদিনও খাওয়া-দাওয়ার পর আমি মার চাদর গায়ে ঢেকে বিছানার উপরে শুয়ে পড়লাম। ঠাকুমা আমাদের ওখানেই একটু দূরে শুতেন। কিন্তু সেদিন যেন কোন মন্দিরে কোন এক শাস্ত্রীমশায়ের বড় ভালো হরিনাম কীর্তন ছিল, তাই ঠাকুমার সেখানে যাবার কথা ছিল। আমারও অবশ্য তাঁর সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু মা আমাকে চুপি চুপি ডেকে বললেন, "আজ মন্দিরে যাস্‌নে। চুপ করে এসে ঘুমো। মা একাই যান।" মা যেতে বারণ করে দিলে আমি কি করে যাই? আজকাল আমার বেশ খানিক জ্ঞান হয়েছিল বলা চলে।

আমি যদি ঠাকুমার সঙ্গে যাই তবে তা ভালো হবে না, মার কাছে কারো থাকা উচিত। আর আমি যদিও যাই, তবু সেখানে গিয়ে আমার ঘুম পাবে মনে করে ঠাকুমাও আমাকে তাঁর সঙ্গে নিতে আগ্রহ করেন নি। আজকাল ঠাকুমারও তত পরিশ্রম সহ্য হত না। তাই আমি ঠাকুমার সঙ্গে যাব না ঠিক করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সুন্দরী আগেই ঘুমিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। দাদা বাবার ঘরে বসে পড়াশোনা করত আর দশটা সওয়া দশটার সময় মার ঘরে এসে শুতো। দাদা যে কখন এসে তার বিছানায় শুয়েছিল, তা আমি জানতে পারিনি।

সেদিন রাতদুপুরে মা হঠাৎ আমাকে ডাক দিয়ে জাগিয়ে তুললেন, আর বললেন, "যমু ওঠ্! ঘুমোচ্ছিস যে! আর তো আমি বেশীদিন বাঁচব না মা!" মার মুখের এই কথা শুনে তখন আমার প্রাণ কেমন যে কেঁপে উঠল তা আমিই জানি! আমি চট্ করে উঠে মার গলা জড়িয়ে ধরলাম। আমার বড্ড কান্না পেল, আর আমি চেঁচিয়ে কাঁদতে যাব এমন সময় তাড়াতাড়ি আমার মুখের উপর হাত রেখে মা বললেন, "তোকে কি কাঁদবার জন্য জাগিয়েছি? চুপ কর, মা, চুপ কর। আজ আমি তোদের দু'জনকে কিছু বলব। গণু বিচক্ষণ, ও এমন কান্নাকাটি করবে না। তুই কিন্তু এখন কেঁদে ওনাকে জাগাসনে।" মার এসব কথা আমার কানে কেমন যেন আশ্চর্য ঠেকল। তার পরিণামও আমার মনের উপর এমন আশ্চর্যরকম হল যে আমার ফোঁপানী কোথায় যেন থিতিয়ে পড়ল, আর আমি ছবির মত তটস্থ হয়ে মার দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইলাম। কী ব্যাপার? এর পরে কী হবে, এখন মা আমাদের কী বলবেন কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। কোনো মন্ত্র-পাঠ করা মাত্র যেমন হয়, মার তখনকার কথা শুনে আমার মনে ঠিক সেইরকম ভাব এল আর কান্না একেবারে থেমে গেল। আমি চুপ করেছি দেখে মাও নিজের চোখ মুছলেন, আর এক মুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আমাকে বললেন, "যমু, তোকে শুধু এই বলছি যে, শ্বশুরবাড়িতে লক্ষ্মী মেয়েটির মত আচরণ করিস। আমার পরে, মা, তোর বাপের বাড়ি আর থাকবে না। আমি বেঁচে থাকতে তোর বিয়ে হলে, তোর শ্বশুরবাড়ির সকলে কেমন তা আমি দেখতে পাব, জানতে পারব, আর, তা যদি না হয়, তা হলে কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিস নে মা। কাউকে তুচ্ছ কথা

বলিসনে। কেউ কোনো কাজ করতে বললে তা শুনিস। ছোট দেওরও যদি কোনো কাজ করতে বলে তবু তা চট্ করে করে ফেলিস। যদি কেউ রাগ করে কিছু বলে তবু কক্ষণো প্রত্যুত্তর করা ভালো নয়, বুঝলি? মেয়ে হয়ে জন্মে কাউকে না কাউকে অনুনয়-বিনয় না-করে জীবনযাপন করা যায় না। ভাগ্যগুণে যদি ভালো বর পাস, শ্বশুরবাড়ির সকলে ভালো হয়, তাহলে তো ভালোই! আর যদি তেমন নাও হয়, তবু নিজের আচরণ ভালো হলে কারো ভয় থাকে না। একজনের কথা অন্যকে গিয়ে বলা উচিত নয়। কুৎসা কিংবা গুজব রটনা করলে তাতে নিজেরই অমঙ্গল হয়। নিজের সামনে কেউ কিছু বললে, কিংবা নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কারো কোনো কথা শুনতে পেলে, তা উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে নেই। কাজে লক্ষ্য রাখা চাই। কোথাও কিছু কিছু পড়ল, গড়ালো—'কেউ যদি করতে বলে তবেই কাজ করব' এমন করে কক্ষণো চলে না। সামনে কাজ দেখতে পেলে, কারো অপেক্ষা না রেখে সেটা চট করে পরিপাটিভাবে সেরে ফেলাই উচিত। কাজের বেলা যে আলস্য করে, তার মত লজ্জা আর কেউ পায় না, জানিস? আমি যদি বাঁচতাম তবে সময়ে সবকিছু শিখিয়ে দিতাম—
—কিন্তু—!"

এই শেষের কথাগুলি মার মুখে বেরোতে না বেরোতেই দাদা চট্ করে বিছানা ছেড়ে উঠে মার কাছে এসে ধরা গলায়, "মা, মা, এ কী বলছ? তুমি গেলে আমাদের কে—" এই ক'টি কথা বলতে বলতে মার কোলের উপরে মাথা রাখল। তা দেখে আমাদের দু'জনের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা কি কেউ বুঝতে পারবে? আমি একেবারে দাদার গলা জড়িয়ে ধরলাম, আর দু'জনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। মা চুপ করে আমাদের দু'জনকে বুকে টেনে নিলেন। তাঁর মনে কী আলোড়ন চলছিল তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু চার-পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত আমাদের গায়ে মার চোখের জল অবিরাম টপ টপ করে পড়ছিল! মার সেই অশ্রু গায়ে পড়ামাত্র আমার কী অবস্থা হয়েছিল তা মনে পড়লে, তখনকার সবকিছু চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর প্রাণ যে কেমন করে তার বর্ণনা করাই অসম্ভব। সে উষ্ণ অশ্রু এই মুহূর্তেই আমার গায়ে গড়িয়ে পড়ছে মনে হয়ে আমার দেহ শিউরে উঠছে। এক মুহূর্তের জন্য এখন কলমটা দূরে সরিয়ে রাখি, কেননা আমার মন ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করছে। হায়, হায়! মা,

মা, আর কি এ জীবনে তোমার দর্শনলাভ হবে? আর কি কখনো তোমাকে আমি কিংবা আমাকে তুমি দেখতে পাবে? কিন্তু না, আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না সেই ভালো। আমার এমন দশা দেখে তোমার যে কী অবস্থা হত!

দু-এক মিনিট পরেই মা আমাদের দুজনকে দূরে সরিয়ে, চোখ মুছে ফেললেন, আর হঠাৎ একটু জোরে হেসে দাদার দিকে চেয়ে বললেন, "গণু, তুই এমন পাগলা ছেলে তাতো মনে করিনি? বাছা আমার, তুই কি বুঝতে পারিস না যে আর দু-এক মাসের মধ্যেই আমি তোদের ফেলে যাব? আমি যে তোর উপরেই সব ভার দিয়ে যাচ্ছিরে! ঠিক করেছিলাম যে যমুকে যা বলার তা বলা শেষ হলে, তোকে জাগিয়ে বলব, 'এই বাছাদের এরপর তুই যত্ন করিস! বাছা, আমার পরে কী হবে আর কী নাহবে তার কি ঠিক আছে? তুই যদি ধৈর্য্যশীল না হোস, তুই যদি না ভাবিস যে 'সুন্দরী আর যমুর দেখাশোনা এখন আমাকেই করতে হবে', তবে সেকথা কে ভাববে।"

মা এই রকম অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন, দাদা শুধু মাথা হেঁট করে শুনছিল। শেষে তার মুখ তুলে ধরে মা বললেন, "এখন আমি যা বলেছি তা সব মনে রেখে চলবি তো বাবা?" দাদা কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল "হ্যাঁ।" তখন মা আবার কেমন যেন অপ্রতিভের মত হেসে দাদাকে কাছে টেনে নিলেন, আর আমাকে একেবারে দূরে সরে যেতে বলে, দাদার কানে অনেকক্ষণ ধরে চুপিচুপি কী যেন বললেন। আমার মনে হল, আমাকে না বলে, অত কী কথা মা দাদাকে বলছেন? কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে আমার সাহস হচ্ছিল না। মার কথা যখন শেষ হল, তখন দাদার মুখ এত ম্লান দেখাচ্ছিল! কথা শেষ হওয়া মাত্র দাদাকে বললেন, "যা, এখন চুপ করে ঘুমোগে যা।" দাদাও গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মা আবার আমাকে কাছে টেনে নিলেন আর বিছানায় শুয়ে পড়ে আমাকে আরো কাছে নিয়ে আবার অনেক রকম উপদেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু এখন আর আমার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। মা দাদাকে কী জানি কী বলেছেন তাই ভাবছিলাম।

এই পর্য্যন্ত আমার জীবনচরিত যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে পরের দিন সকালবেলাতেই আমি দাদাকে 'মা তোকে কাল রাত্তিরে কী বলেছে? আমায় বলবি নে?' বলে' নানারকম অনুনয় করে

জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু দাদা কি কম দুষ্টু! সে কিছুতেই আমাকে কিছু জানতে দিল না। দিনে দিনে তার স্বভাবের কেমন পরিবর্তন হচ্ছিল তা অনেকবার বলেছি। আগে সে বেশ মনপ্রাণ খুলে কথা বলত, তা আজকাল দিনে দিনে কমে যাচ্ছিল। আজকাল সে একা মা ছাড়া আর কারো সঙ্গে বেশী কথা বলত না, নিজের কাজ আর পড়াশোনা নিয়েই সে থাকত। তবু মনে মনে সে যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল। আমার সঙ্গে তো সে আজকাল ভারি সতর্কভাবে কথা বলত। কিন্তু যখন লেখাপড়া সম্বন্ধে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতাম তখন সেই দুর্বোধ বিষয়টা বেশ স্পষ্ট করে আমাকে বুঝিয়ে না দিয়ে ছাড়ত না। তা ছাড়া আজকাল সে তার বন্ধুদের কাছ থেকে বইপত্তর নিয়ে এসে মার কাছে বসে পড়তে বলত। কিন্তু আগের মত সে কখনো খেলতে কিংবা গল্প করতে আসত না।

আজকাল যেন তার একেবারেই ছুটি ছিল না, সব সময়েই সে ব্যস্ত থাকত। যখন তার কোনো কাজ থাকত না তখন সে এসে মার কাছে বসত। কিন্তু দেখতে পেতাম যে সে সুন্দরীকে আর আমাকে আগের চেয়ে বেশী ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিল। তখন তার বয়সই বা কী, আর আমারই বা কী? দু'জনের বয়সে বড় বেশী তফাৎ ছিল না। তাই হয়তো কেউ স্বাভাবিকভাবে মনে করবে, আমার উপর তার মায়া ছিল কি না, কিংবা দিনে দিনে তা বেশি হচ্ছিল কি না, তা কী করে বুঝতে পারা যায়? কিন্তু ভাইবোন যতই ছোট হোক না কেন তারা পরস্পরকে ভালবাসে কিনা, তাদের পরস্পরের উপরে মায়া কত, তা জানতে পারা মোটেই কঠিন নয়। অনেক ছোটখাটো খুঁটিনাটি ব্যাপারেই তা সহজে বোঝা যায়। ভাইবোন যদিও পরস্পরের উপরে রাগ করে, ঝগড়াঝাঁটি করে, কামড়াকামড়ি মারামারি করে, তবুও তারা পরস্পরকে ভালোবাসে না এমন কখনো হয় না। তাদের ভালোবাসা কত গভীর তাও তক্ষুনি বোঝা যায়। সে হাজার কথা। তারা পরস্পরকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারে না। একজনের হাতে কিছু খাবার জিনিস দিলে, তার ভাগ অন্যজনকে না দিয়ে সে খেতে পারে না। খাওয়াদাওয়ার সময় তারা পরস্পরের খবর না নিয়ে থাকতে পারে না। এরকম একশো ব্যাপারে ভাইবোনের প্রেমের পরীক্ষা হয়। সে সব এখানে লিখে দরকার নেই। যারা নিজেরা ভাইবোন, কিংবা যারা ভাইবোনের সঙ্গে থেকে তাঁদের প্রেম-চোখে দেখেছে, তারা তা ঠিক বুঝতে পারবে।

নিজের সন্তানদের ভালোবাসা দেখে মা-বাবা কত আনন্দ লাভ করতে পারেন, তার বর্ণনা করা অসম্ভব। নিজে অনুভব না করলে তা বুঝতে পারা যাবে না। একটি সন্তানকে মারলে কিংবা বকলে অন্যটি যখন তার জন্য কাঁদতে আরম্ভ করে তখন তার মা কত খুশি হয়, 'তা নিশ্চয় অনেকেই জানেন।

এত বিস্তৃত ভাবে এ কথা লেখার কারণ এই যে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে দাদা সুন্দরীকে আর আমাকে দিনেদিনে বেশি ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিল তা আমি কি কারণে লিখেছি, তাহলে আমি স্পষ্ট কারণ বলতে পারব না। আমি যে তা ভাবতাম তার অনেক খুঁটিনাটি কারণ ছিল। সকলের সাধারণ অনুভূতির উপরে নির্ভর করেই আমি সে কথা খুলে বলবার চেষ্টা করছি। আজকাল দাদা আমাদের খাওয়াপরার ব্যাপারে দেখা-শোনা করত। কিছুক্ষণ আমাকে কোথাও দেখতে না পেলে অমনি আমার খোঁজ নিত, ইত্যাদি অনেক কথা। তা ছাড়া, বাবা যখন আমার বিয়ের সম্বন্ধে ঠাকুমার সঙ্গে কথাবার্তা করতেন আর কোনো পাত্রের কথা বলতেন, তখন সে নিজের কাজ ফেলে চুপি চুপি এসে তাঁদের কথা শুনত। অবশ্য, ঠাকুমা আর বাবা যখন অন্য কথা বলতেন তখন দাদা কক্ষনো সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা শুনত না, কিন্তু আমার বিয়ের কথা উঠলেই সে ঠিক কান পেতে শুনত: দাদা কেন অমন করত তা আমি অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম। তাই তার সেই স্নেহময় স্বভাব আর মাতৃভক্তি দেখে আমার মন বিস্ময় আর আনন্দে ভরে গেছে।

একবার তো দাদা একটি পাত্রের সম্বন্ধে কিছু খারাপ কথা জেনে ঠাকু-মাকে এসে বলেছিল। সে পাত্রটি বাবার ভারি পছন্দ হয়েছিল। তাদের বাড়ির সকলে আমাকে দেখতে এসেছিল, তারাও পছন্দ করেছিল। তখন দাদা বিশেষভাবে খোঁজ নিয়ে ঠাকুমাকে স্পষ্ট বলেছিল, "সেখানে বিয়ের সম্বন্ধ করা ভালো হবে না।" দাদা আর সেই ছেলেটি একই ইস্কুলে পড়ত। তার বয়স আন্দাজ আঠারো বছর হবে। সে দাদার উপরের ক্লাশে পড়ত। কিন্তু সে একেবারেই 'হাবারাম' ছিল, আর চরিত্রও ভালো ছিল না। এই বয়সেই ধূমপান করত, তাছাড়া ক্লাশেও অসভ্যের মত ব্যবহার করত। তাই দাদা ঠাকুমাকে তার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে বারণ করে দিল। পরে বাবাও ভালো করে খোঁজ করলেন, আর তখন তাঁরও মন টলল।

আর জিদ শেষ হল। আর দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রের সঙ্গে যাতে আমার বিয়ে না হয়, সেদিকে দাদার ভারি আগ্রহ ছিল। কিন্তু এসব কথা সে ঠাকুমাকে নাহলে মাকে বলত। বাবার কাছে মুখ ফুটে কথা বলবার জো-ই ছিল না। আগেই বলেছি, বাবা আজকাল কারো সঙ্গে তত কঠোর ব্যবহার করতেন না। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে আমাদের যে অভ্যাস হয়ে গেছে তার বদল হওয়া কি সম্ভব? আমরা তাঁকে খুব ভয় করতাম। যদিও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম যে তাঁর কঠোরতা খুব কমে গিয়েছে, তবু আমাদের হৃদয়ে তাঁর যে কঠোর মূর্তি অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল সে কি সহজে বদলায়? সুন্দরী অবশ্য তাঁকে আমাদের চেয়ে অনেক কম ভয় করত। একে তো সে ছোট ছিল, তায় বাবা তার সঙ্গে ততটা কঠোর ব্যবহার করতেন না।

এদিকে পাত্র দেখার হাঙ্গামা চলছিলই। তখন পর্য্যন্ত কত পাত্র যে দেখা হল! কিন্তু একটিও মনের মত হল না। শেষ কালে ঠাকুমা আবার এক পুরনো পাত্রের কথা তুললেন। এক বৃদ্ধা মহিলা, সঙ্গে একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে আর তিনজন ভদ্রলোক নিয়ে একবার আমাকে দেখতে এসেছিল। তাঁরা আবার খোঁজ নিচ্ছিলেন। তাতে আবার ঠাকুমার সঙ্গে তাঁদের পুরোনো আলাপ না কী যেন বেরুল। সেই বৃদ্ধাটি ঠাকুমার মাসতুতো ননদের খুড়তুতো জা না কী যেন নিকটসম্পর্কীয় ছিলেন। দুই বুড়ীর দেখা-সাক্ষাৎ হলে তাদের পুরনো পরিচয়ের কথা, নয়তো কোনো আত্মীয়সম্পর্ক মনে পড়েনি, এমন কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না। কোনো না কোনো বাদরায়ণ সম্পর্কের মিল হলেই আর কী! তাতে আবার আমাদের ঠাকুমা পুরোনো আলাপ আর আত্মীয়সম্পর্ক খুঁজে বার করতে ভারি ওস্তাদ! একবার তাঁর কোনো সমবয়সীর দেখা— নিদেন পক্ষে দ্বিতীয়বার দেখা—হলেই তাঁদের পুরোনো সম্পর্ক জমে গেল আর কী! আমার বেশ মনে আছে আমরা দু-একবার তাঁকে ঠাট্টাও করেছিলাম।

স্বভাবমত ঠাকুমার সেই বৃদ্ধার সঙ্গে সম্পর্কটি মনে পড়ল, আর তখন থেকে তাঁর মনে হতে লাগল যে তাঁর নাতির সঙ্গে নিজের নাতনীর বিয়ের সম্বন্ধ হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়। তাতে খুঁতখুঁত করবার মতো কিছুই নেই। এই মনে করে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন।

সেই মহিলাটির নাতিই (মেয়ের ছেলে) ছিল পাত্র। তাই তার জন্য

তিনি আমায় দেখতে এসেছিলেন। আর সেই অন্য মেয়েটি সত্যি সত্যিই বনীর বড় বোন ছিল, মানে সে আমাকে তার পিসতুতো ভায়ের জন্য দেখতে এসেছিল। সেই বৃদ্ধা, সেই মেয়েটার মানে অবশ্য বনীরও, নিজের ঠাকুমা ছিলেন। পাত্রটির বাবা তার ছেলেবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন, তাই তার মামা, মানে বনীর বাবাই, তাকে মানুষ করেছিলেন। বনীর পিসিমা, পাত্রটির মা, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে নিজের যা কিছু সম্বল ছিল সঙ্গে করে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছিলেন। তাঁর একটি নিজের দেওর ছিল, কিন্তু সে দেওরের কাছে থাকতে তাঁর ভালো লাগছিল না। তাই যখন তাঁর সব জিনিসপত্র টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি যা কিছু ছিল সব নিয়ে চলে আসতে তাঁর ভাই আর মা খুব অনুরোধ করলেন, তখন তাই ভালো মনে করে তিনি বাপের বাড়ি চলে এলেন। তখন ছেলের বয়স ছিল পাঁচ কি ছয় বছর। ছেলের মার গয়নাগাঁটি বেশ ভারী, দামী আর পর্য্যাপ্ত ছিল। সে সব—কিন্তু এসব ঘটনা আমি পরে যখন জানতে পেলাম, তখনকার ঘটনার সঙ্গে বলাই ঠিক হবে। তাই এখন সে বিষয়ে এখানেই ক্ষান্ত দিয়ে অন্য কথায় আসি।

এই সব ঘটনা বাবা যখন জানতে পারলেন, তখন নাক মুখ বাঁকিয়ে বলতে লাগলেন, "না বাবা, অমন অভাবের বাড়িতে মেয়ে দেওয়া উচিত হবে না। যদি ছেলের বাবা বেঁচে থাকত, নিদেন পক্ষে ছেলেটা যদি তার কাকার কাছে মানুষ হত, তা হলেও আপত্তি ছিল না। ঠাকুমা আর মাও ঠিক তাই মনে করতেন, কিন্তু ঠাকুমা আমার বিয়ের জন্য বড্ড উতলা হয়েছিলেন কিনা, তাই আমৃতা আমৃতা করতেন। মাতো দু-একবার স্পষ্টই বললেন, "অত বড় ঝামেলার মধ্যে মেয়েটাকে মোটেই দিয়ে দরকার নেই।" কিন্তু কী আশ্চর্য! সেখানেই আমার কুষ্টির ষোলো আনা মিল হয়ে গেল। ছেলের বুদ্ধির প্রশংসা সকলেই করত। উনি দাদার চেয়ে তিন ক্লাশ উপরে পড়তেন, আর সেই বছরে এক ক্লাশ পার হয়ে ডবল প্রমোশন নিয়ে প্রথম পরীক্ষা দেবার কথা ছিল! ক্লাশের মাষ্টার মশাইরা ওঁর বিদ্যাবুদ্ধির ভারি তারিফ করতেন। সে সব দেখেশুনে বাবা কখনো কখনো বলতেন, "কোনো আপত্তি নেই। যমুকে ওখানেই দেওয়া যাক। বাপ বেঁচে নেই তো কী হল? মামার বাড়ি কি চিরকাল থাকবে? এই দু-চার বছরের মধ্যেই ছেলে তো চারটে পরীক্ষায় পাশ করবে, আর

তারপরে নিজের ব্যবসা করতে আরম্ভ করে আলাদা বাড়ি করবে।" বাবার এই কথা শুনে ঠাকুমা একেবারে খুশি হয়ে বলতেন, "নয় তো কী? ঝামেলা, ঝামেলা, সে আর কত দিনের? এই ধর চার নইলে পাঁচ বছর। ততদিন যমুই বা কী বুঝবে? যখন বোঝদার হয়ে ঘরকন্না করবার মত বয়েস ওর হবে, তখন তো ঝামেলা থেকে বাইরে বেরুবেই।"

এই রকম কথাবার্তা বাড়িতে চলতে লাগল। আর দাদাও অনুকূল মত প্রকাশ করতে লাগল। সে ঠাকুমা ও মার সামনে ওঁর চৌকস বুদ্ধির ভারি প্রশংসা করত। সে বলত, "তোমরা আর কোনো বাধা দিও না। যমুর বিয়ের সম্বন্ধ ওইখানে ঠিক করে ফেল। এমন পাত্র খুঁজে পাওয়াও মুশকিল।"

নিয়তির গতি বড়ই আশ্চর্যজনক। পুণায় আসবার পর যারা আমাকে প্রথমে দেখতে এসেছিল, তাদের বাড়িই আমার ঠাঁই মাপা ছিল। কিন্তু তার পরে পঞ্চাশ পাত্রের অনুসন্ধান করে তবে সেই ঠিক হওয়া বরাতে ছিল। সে পাত্রটি প্রথমে সকলে অপছন্দ করেছিল। তাদের বিষয়ে কেউ ভেবেও দেখেনি। বাবাতো সে বাড়ি কিংবা সে পাত্রটির খবর পর্যন্ত রাখেন নি। যদি কেউ কিছু ভেবেই থাকে, তবে সে আমিই ভেবেছিলাম, তাও শুধু বনীর ভায়ের কথা! কিন্তু এখন সকলে সেই পাত্রের সবই ভালো দেখতে পেতে লাগলেন। আমার ও বনীর ভয় দূর হল, আর সকলের মত আমিও মনে করতে লাগলাম যে, আমাকে যেন ওখানেই দেওয়া হয়।

জিনিস থাকে আশে পাশেই, আর আমরা খুঁজে বেড়াই সারা গ্রাম। আর যখন সে জিনিষটা হঠাৎ পাওয়া যায় তখন আমরা মনে মনে আশ্চর্য বোধ করি যে এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আমরা অকারণ গাঁ-ময় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমার বিয়ের সম্বন্ধে খানিকটা সেই রকমই আমাদের সকলের মনের অবস্থা হয়েছিল। উপরে লিখেছি যে বাবা আমার জন্য একটা ছুটি নয়, পঞ্চাশটি একশোটি পাত্রের অনুসন্ধান করেছিলেন; কিন্তু যেখানে নিয়তি ছিল সেখানেই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হল। 'এবার মেয়ের বিয়ে দিতে হ'বে' মনে হওয়ামাত্র পুনায় প্রথমে যারা আমাকে দেখতে এসেছিল সেখানেই শেষে বিয়ে ঠিক হল। আমরা যদিও অন্য পাত্রের সন্ধান করেছিলাম, তবু তাদের বাড়ি থেকে কেউ না কেউ প্রায়ই এসে আমাকে দেখে যেত, আর দূর থেকে তারা যথাশক্তি চেষ্টা করছিল। শেষ-

কালে তাই ঠিক হল, তার মানে মধ্যের দিনগুলোর অতো সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। কিন্তু সে বাড়িতেই আমার ঠাঁই ছিল এ যেমন নিয়তি বলতে হবে, সেই রকমই মধ্যের দিনগুলোর আর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াও বিধির লিখন ছিল বলে মনে করে নিশ্চিন্ত থাকাই ভালো।

দেখা গেল যে কুষ্ঠির মিল হচ্ছে আর বাবা সেখানেই আমাকে দেবেন নিশ্চয় করেছেন দেখে পাত্রপক্ষ যৌতুকের জন্য দর কষাকষি করবে মনস্থ করেছে। প্রথমে আমাদের দিক দিয়ে যখন নিশ্চিত ঠিক হয় নি তখন তারা বলত, "যা খুশি দেবেন, আত্মীয়সম্পর্কের দেওয়া সম্পত্তি কি জীবনভোর কুলোয়? দিলেও ভালো, না দিলেও আমাদের বলার কিছু নেই। যদি কিছু দেন, তা দিয়ে আপনার মেয়েটিকেই গয়নাগাঁটি পরাব। তা না দিলেও আপত্তি কি? রীতিমাফিক বালা; চুড়ি অবশ্যই পরাব।" কিন্তু এখন তারা বেশ খানিকটা টেনে ধরতে আরম্ভ করল। প্রথমবার যে-ভদ্রলোকটি আমায় দেখতে এসেছিল, সে স্পষ্টই বলল, "ছেলে তো আর যেমন-তেমন নয়? হাজার, বারো শো' টাকা নিয়ে মেয়ে আসছে, কিন্তু তাদের ছেড়ে আপনাদের মেয়েই চাইছি কেন? এই জন্য যে, সমানে সমানে মিল হয়! কিন্তু আপনারা যদি একেবারেই ইয়ে করেন, তবে কি চলে? কিছু আপনাদের মতমতো হোক, কিছু আমাদের কথা শুনুন। আপনাদের বেশি কিছু করতে হবে না। যৌতুক দেবেন তিনশো টাকা, সে তো বর-দক্ষিণাই। এতে আপনার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না, আর থাকবেও না· তা আমি নিশ্চয় জানি। এই ধরুন একশো টাকা মান-সম্মানের জন্য। ছেলের বড় মাসিমা হচ্ছেন তার মায়ের মতো। সেই তাকে স্নেহ-যত্ন করেছে। তখন বেয়ানের প্রাপ্য যত সব মানসম্মান এই বড় মাসিমারই প্রাপ্য। দ্বিতীয় জন হচ্ছে তার ছোট মাসিমা। তার স্বামীর উপরে নির্ভর করেই তো সব কিছু করা হচ্ছে। তখন উচিত মতো তারও মানসম্মান রাখতে আপনাকে আর বলতে হবে না। আর সকলকে আপনি নিজেই দেখে নিতে পারেন! সে ভার আপনার উপরেই দিচ্ছি। কিন্তু আর একটি কথা আছে। সে হচ্ছে এই যে স্নাসস্নান[1] আর হাতমুখ

১ সেকালে বিয়ের সময় বর কনেকে বাড়ির সীমন্তিনীরা আর অন্য মেয়েরা গায়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে বাড়ির উঠোনে পিঁড়ি পেতে বসিয়ে একসঙ্গে দু'জনকে স্নান করাত। সকলে মিলে তাদের গায়ে-মাথায় জল ঢেলে দিত। একেই বলত 'স্নাসম্নান'। স্নান—সহান—স্নাম।

ধোবার জিনিষপত্র[১] আলাদা দিতে হবে।" এই রকমে সেই ভদ্রলোকটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা বলে আসল কথায় আসছিলেন। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাদের বাড়ির কর্তা ছিলেন। তিনি আমার শাশুড়ির কাকা, কিন্তু তাঁর ভাই ভাইপো তাঁকে নিজেদের কাছে রেখে একেবারে বাবার মত মেনে চলত। কাকা যা করেন তাই হবে।

উপরে বলেছি এ রকম আলোচনা চলছিলই। বাবার মত ছিল যে একটা কিছু পাকাপাকিভাবে করতেই হবে। আর তারা তো একেবারে শুনতে চাইছিল না। তারা সেই তিনশো টাকা যৌতুক, বেয়ানদের মান-সম্মান, আর অন্য সব খুঁটিনাটির দাবি ধরে বসল। বাবা খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। আর এ-দিকে এমন মজা, বাবা ঠাকুরদাকে পত্র লেখার কিংবা তাঁর মত নেবার নামও করলেন না। শেষে একদিন মা বাবাকে ডেকে নিশ্চিতরূপে বললেন, "ওগো, বাবাকে খবর দাও, উনি আসুন, ওঁর দ্বারাই সব করানো হোক। ওঁর কাছে চিঠি পর্যন্ত যায় নি, উনি বলবেন কি? আর লোকেও তো হাসবে।"

এ কথা মা যত দৃঢ়ভাবে আর অকুতোভয়ে বললেন, তেমন বোধহয় আগে কেউ কক্ষণো বলেননি। আজকাল কখনো কখনো মা স্পষ্ট কথা বলতেন, আর বাবাও তাতে আশ্চর্য বোধ করতেন না। কিন্তু আজকার ধরন যেন একেবারেই আলাদা মনে হল। নিজের কথামত কাজ করতে অন্যকে বাধ্য করবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেই মানুষ যেমন কথা বলে, মার সেই রকম ভাব ছিল। দিনে দিনে মার স্বভাব আর চালচলন যত নির্ভীক হতে লাগল, অমনি বাবার স্বভাব পরিবর্তিত হতে লাগল। তার কারণ যে মার অসুখের অনিশ্চিত ধরন, তা আর বলতে হবে না। মার সামনে বাবাকে আজকাল একেবারে দয়ার যোগ্য মনে হত।

এই এখানকার ঘটনাই ধরুন না কেন! মা ঠাকুরদাকে আসতে লিখবার নাম করা মাত্র বাবা অমনি বললেন, "আচ্ছা, বেশ তাই করছি।" এই বলে সত্যিই তিনি ঠাকুরদাকে বেশ একখানি লম্বা-চওড়া চিঠি লিখলেন। এর তিন দিন আগেই ঠাকুমা ঠাকুরদার মত নেবার কথা বাবার কাছে

এই স্নানের সময়কার জিনিসপত্র মেয়ের বাড়ি থেকে বরকে উপহার দেবার প্রথা ছিল।

১ সকালে কনেবাড়ির মেয়েরা মুখ ধোবার জিনিষপত্র নিয়ে বরের বাড়ি এসে তার মুখ ধুইয়ে দিত। এই জিনিষপত্রগুলিও উপহারস্বরূপ দিয়ে দেওয়া হত।

তুলেছিলেন, তখন বাবা তাকে স্পষ্ট বলেছিলেন, "আজ তিনমাস হল তিনি আমাকে চিঠি লেখেন নি। তিদি যদি আমাকে অত ইয়ে করেন, তা হলে আমিই বা লিখি কেন? তিনি যদি আমার ধার না ধারেন, তাহলে আমিও ওঁর অত ধার ধারিনে!" ঠাকুমা বেচারি ছিলেন সরল, তাঁর কথা কে মানে? তিনি মুখ বুজে চুপ করে রইলেন। কিন্তু সত্যি তিনি মনে কত ব্যথা পেয়ে থাকবেন। ঠাকুমার অত দুঃখ হয়েছে জেনে— সেকথা ঠাকুমা মাকে স্পষ্টই বলেছিলেন—মা নিজেই বাবাকে বললেন ঠাকুরদাকে খবর দেবার জন্য। মার মুখে সেকথা শুনে বাবা একটি অক্ষরও পালটা জবাব দিলেন না। যেন তিনি যা বলবেন তা করবার তিনি সংকল্পই করে ছিলেন। ঠাকুরদার আর বাবার দা-কুমড়ো সম্বন্ধ ছিল। এ যে কেমন-তরো আশ্চর্য্য! বাবার মোটেই ঠাকুরদাকে চিঠি লিখবার ইচ্ছে ছিল না। শুধু তাই নয়, বিয়ে হয়ে যাওয়ার আগে তাঁকে জানাবারও ইচ্ছে ছিল না। প্রত্যক্ষ বাপ, কিন্তু এত শত্রুতা! কিন্তু শেষে মার অনুরোধ শুনেই তিনি ঠাকুরদাকে আসতে চিঠি লিখেছিলেন।

তাছাড়া মা দাদার হাতে নিজের নামেও একটি চিঠি লিখিয়ে পাঠালেন। ঠাকুরদার স্বভাব বেশ চিনতেন কিনা! বাবার চিঠি পেয়েও তিনি যদি না আসেন, তাই নিজে তাঁকে স্তুতিপূর্ণ একখানা চিঠি লেখা উচিত মনে করে মা অনাবশ্যক চিন্তা না করে অমনি দাদাকে দিয়ে বেশ লম্বা সুন্দর চিঠি লিখিয়ে নিলেন। দু'খানি চিঠি পেয়ে কোন্‌টির টানে ঠাকুরদার আসতে ইচ্ছে হল, তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। কিন্তু পরে একদিন বাবার সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার সময়ে তিনি স্পষ্টই বললেন, "এই জন্য তোমার চিঠি পেয়ে আসতে ইচ্ছেই ছিল না। কিন্তু বৌমা অত করে লিখল তাই না এসে থাকতে পারিনি!" কী আশ্চর্য! তিনি এই কথা বলামাত্র সব ঝগড়া মিটে গেল! কিন্তু এ কী? আমি যে এগিয়ে চললাম।

চিঠি পেয়ে ঠাকুরদা অমনি চলে এলেন। তিনি আর বাড়ির সেই কাকা দু'জনে মিলে গবেষণা করে সব কিছু ঠিক করে ফেললেন। তাতে এই ঠিক হল যে, আড়াইশো টাকা যৌতুক দিতে হবে, বেয়ানদের মানসম্মানের জন্য পঁচাত্তর টাকা ধরতে হবে, মুখ-ধোওয়াবার, মানভাঙাবার জন্য আলাদা, আর তা ছাড়া ঢোলীর খণ, মেয়েদের কাপড়, পুরুষদের পাগড়ি ইত্যাদি দিতে হ'বে। কিন্তু সেসব খুঁটিনাটি এখন আর আমার মনে নেই।

আর মনে থাকলেও সেসব লিখে দরকার কি? শুধু এই কৌতুকের কথা লিখতে হবে যে, ঠাকুরদার এই সব ব্যবস্থা বাবা মোটেই পছন্দ করলেন না। তিনি বললেন, "এত খরচপত্র করবার আমাদের সম্বল নেই। আর আপনি আগে আমাকে জিজ্ঞাসা না করে সব ঠিকই বা করে ফেললেন কেন?"

ওই হয়েছে! অমনি মারামারি শুরু হল। ঠাকুরদা গালিগালাজ শুরু করে চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন। বাবাও ওসব ব্যাপারে হার মানবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর'ও আসল স্বভাব খড়বড়িয়ে জেগে উঠল। ঠাকুরমা বেচারি রান্নাঘরে উনুনের পাশে ছিলেন। তিনি থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলেন। মা কেঁদে ভুঁয়ে গড়িয়ে পড়লেন। কেন না, তিনিই বাবাকে চিঠি লিখতে বলেছিলেন, আর নিজেও লিখেছিলেন। তাই তিনি ভাবলেন যে, এ সব ঝগড়ার মূল তিনি নিজে। আমরা ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুন্দরী তো ঠাকুরমার পিছনে গিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। এদিকে তর্ক খুব জোরে চলছিল। হঠাৎ ঠাকুরদা চীৎকার করে বললেন, "যা, তোর অত মোড়লি চাইনে। আমি সব ঠিক করেছি, এখন তোর বাবাকেও তাতে বাধা দিতে দেবে না। আমি এলাম বৌমার জন্য। দরকার হলে নিজের প্রাণ বন্ধক রাখব, কিন্তু এখন পেছ্পাও হব না।" বাবারও যে পেছপাও হবার বা খরচপত্র কম করবার ইচ্ছে ছিল, তা নয়, কিন্তু বাপ-ছেলের সম্বন্ধই ছিল ওই রকম! একজন যা করবে, দ্বিতীয় জন তা অপছন্দ করবে নিশ্চয়! আমি নির্ঘাত জানি যে ঠাকুরদা যদি না আসতেন তবে বাবা ওই রকমই সব মীমাংসা করে ফেলতেন। এতে সন্দেহ নেই।

ওদিকে ঠাকুরদা চীৎকার করলেন আর অমনি এদিকে মা অজ্ঞান হ'য়ে ধড়াস করে পড়ে গেলেন। দিনে দিনে মা বড্ড দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছিলেন, তাই মন অস্থির হবার মতো কিছু ঘটলে, তা একেবারে সহ্য করতে পারতেন না, আর তার পরিণাম এমন হত যে, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। মাকে অজ্ঞান হতে আমিই প্রথম দেখলাম, আর অমনি চেঁচিয়ে উঠলাম। তক্ষুনি ঝগড়াঝাঁটি সব থেমে গেল, আর সবাই সেদিকে ছুটল। ঠাকুরদা মাকে সামলে ধরলেন, সুন্দরী চেঁচাতে লাগল, বাবা চোখেমুখে জল দিলেন। "এসব তোমারই মুরোদের ফলে, বুঝেছ?"—ঠাকুরদা বাবাকে বলছিলেন, এখন সময় সেই কাকা, (আমার শাশুড়ির) ঠাকুরদার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা বলতে, কিংবা বিয়ের দিন ঠিক করতে

দু'একজন ভদ্রলোক আর পুরুত, ঘটক সঙ্গে নিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে বনী এসেছিল। তারা সকলে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, আর বনী ভিতরে ঢুকল, তখন বাড়ির মধ্যে এসব ব্যাপার চলছে। দাদা তাদের সকলকে ভিতরে এসে বসতে বলল, আর ঠাকুরদাকে খবর দিতে গেল। ততক্ষণে মারও জ্ঞান ফিরে এল। তাঁকে শুইয়ে রেখে সবাই বাইরের ঘরে গেল।

বেচারী বনীর দিকে কেউ চেয়েও দেখল না। সে এসেছিল কনের 'চোলী'[১] নিয়ে যেতে। এদিকে এইসব গোলমাল চলছিল, তখন তার খবর কে রাখে? সে হন হন করে চলেই যেত, কেন না আমি মার কাছে বসে তাঁর কপাল টিপে দিচ্ছিলাম। আমি বনীকে ডেকে দেখাশোনা করতাম, কিন্তু এখন তাকে কী বলে ডাকি তাই বুঝতে পারছিলাম না। এ পর্য্যন্ত তাকে আমি 'বনী বনী' বলেই ডেকেছি, কিন্তু এখন যে সে আমার ননদ হবে! তাই বনীকে 'বনু ঠাকুরঝি' বলতে হবে। কিন্তু তাই বা বলি কি করে? এখনও আমার বিয়ে হয়নি তো! তা ছাড়া আমার অহংকারও কি কম ছিল? যে মেয়েটাকে যাচ্ছেতাই বলেছি, যার সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তাকেই এখন 'আসুন, বসুন' বলতে গলায় কেমন আটকাচ্ছিল, তাতেই বা আশ্চর্য্য কী! কথায় বলে, "দড়া গাছটা আগুনে পুড়লেও তার পাক পোড়ে না",[২] তা মিথ্যে নয়। মার উপদেশের ফলে আর তাঁর নিজের উদাহরণ দেখে আমি যতই বিনয় শিখিনা কেন, তবু আমার ভিতরের অহংকার কখনো কখনো জেগে উঠত।

বেশ, অত অহংকার ছিল তো, "কী লো বনী, কেন এসেছিস্" বলে জিজ্ঞাসা করলেই হত! কিন্তু তাই বা কই জিজ্ঞাসা করলাম? কেন করিনি? বনী রাগ করবে, আর সেই রাগ মনে পুষে রেখে সে পরে কখনো না কখনো আমাকে জব্দ করবে, এই রকম নানা নানাবিধ চিন্তা করে তার ফল শেষে হল এই যে, বনীর মোটেই দেখাশোনা না করে আমি চুপ করে রইলাম। শেষে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হন্ত দন্ত হয়ে সে ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বলল, "আমি যমুর চোলী নিয়ে যেতে এসেছি, দেবেন কি না?" বনীর রকম দেখে ঠাকুরমা বললেন, "তুই এসেছিস

১ বরের বাড়িতে কনের জন্য যে সব চোলী সেলাই করা হত তার নমুনা ও মাপের জন্য, কনের একটি চোলী নিয়ে যাবার দরকার হত।
২ একটি মারাঠি প্রবাদ। এর অর্থ সহজেই বোধগম্য।

কখন তা জানতেও পারিনি। আমরা আমাদের ভাবনাতেই অস্থির। বোস্ একটু, আমি—"

"আমি বসতে আসিনি, আমি সেই কখন এসেছি, কিন্তু খবর কে রাখে? তোমাদের বাড়ি ভিক্ষে চাইতে আসিনি তো? দেবেন তো চোলী দিন, নইলে দিয়ে দরকার নেই। অত ইয়ে চাইনে।"

বনীর কথার এই রকম দেখে ঠাকুরমা বেচারী কি বলবেন? যথাসাধ্য তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তা নিষ্ফল হল। শেষে ঠাকুরমা আমাকে ডেকে বললেন, "একে তোর একটা চোলী এনে দে তো।" তাঁর কথামত চোলী এনে আমি বনীর সামনে ফেলে দিলাম। দোষ এই যে সেটা তার হাতে তুলে দিই নি। অমনি সে রেগে উঠে চট্ করে বলল, "ভিখিরি-টিখিরিকে যেমন দেয় তেমনি ক'রে ফেলে দিলি যে! একেবারে ইয়ে হ'য়ে গেছিস যে! তা বেশ—" এই বলে সে থামল আর ঠাকুরমার দিকে চেয়ে বলল, "আচ্ছা, তবে চল্লাম। উপকার করলেন চোলীটা দিয়ে!" ঠাকুরমা আমাকে সিঁদূরের কৌটো আনতে বলতে বলতেই সে বিড় বিড়্ করতে করতে বাইরে চলে গেল। বাইরের ঘরে সকলে বসেছিল, সেখানে গিয়ে সে "কাকা, আমি চললাম" বলল, তা আমি শুনতে পেলাম, সিঁদূরের কৌটো হাতে করে আমি তার পিছনে পিছনে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাবার সময় সে দরজাটা ধড়াস করে বন্ধ করে দিল! সেই আওয়াজ থেকে বনী কি রকম চটে গিয়েছে তা বেশ বোঝা গেল!

বনীর এই আচরণে আমার মনের কি রকম অবস্থা হল তা কল্পনা করাই ভালো!

যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা এসেছিলেন তাঁরা বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললেন। আট দিনের মধ্যেই বিয়ে।

যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পেলাম যে এবার নিশ্চয় আমার বিয়ে হবে, তখন আমার যে কত আনন্দ হল, বলতে পারি না। আমার সমবয়সী মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে দেখে আর তাদের সেজেগুজে বেড়াতে দেখে, আমারও তেমন করে বেড়াতে ইচ্ছে করত। তাতে আবার শ্রাবণ মাসে যখন দুর্গার "মঙ্গলাগৌরীর"[১] আনন্দোৎসব শুরু হল আর সে আনন্দে

১ মহারাষ্ট্রে মেয়েরা বিয়ের পরে প্রথম পাঁচ বছর প্রতি শ্রাবণ মাসের প্রত্যেক মঙ্গলবারে

লাফাতে লাগল, তখন আমার বড্ড মন কেমন করতে লাগল। সে যখন "বট পূর্ণিমার"[১] দিন বটের পূজা দিতে যেত, কিংবা সোমবারে "শিব মুঠ"[২] নিয়ে শিবের মন্দিরে যেত, তখন আমারও তেমনি করে সেজেগুজে, ফুলের ডালা হাতে, বাগানে বাগানে বেড়াতে আর কাজের তাড়া করতে ভারি সাধ হত, আর বড় কষ্টবোধ হত। সে দুঃখ এখন দূর হবে, বাঞ্ছিত সুখ পাব, মনে করে যদি আমার আনন্দ হয়ে থাকে তবে তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে?

যেদিন বিয়ের দিন ঠিক হল, সেদিন আমার কপাল দোষে দুর্গী শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিল। আমার আনন্দ একেবারে ঢেউ খেলিয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে ছিল না, তাই কারো কাছে তা প্রকাশ করতে পারছিলাম না। শেষে কাউকে না পেয়ে, বিকেল বেলা যখন আমাদের ঝি এল তখন তাকে গিয়ে আমি খবর দিলাম। সে বুড়িটাও আবার সেকথা বাড়িতে বলে ফেল্‌ল। তখন দাদা আর ঠাকুরমা ঠাট্টা করে হয়রান করল। খুকী সুন্দরীও আমাকে ঠাট্টা করে হাসতে লাগল। শেষে, সন্ধ্যাবেলা যখন ঠাকুর্দা আর বাবা খেতে বসেছিলেন, তখন ঠাকুমা বললেন, "আজ একটা মানুষের কত যে আনন্দ হয়েছে? সে আনন্দ একেবারে রুখমাই ঝি পর্যন্ত গড়িয়েছে।" তাই শুনে আমার যা লজ্জা করল তা বলতে পারছি না। কেন যে সেকথা আমি রুখমাইকে বলতে গেলাম মনে করে আমার চোখ ছলছল করতে লাগল, আর আমি খেতে খেতেই উঠে গিয়ে মার মাথার পাশে গিয়ে বসলাম। লোকে বলে যে, ছেলেবেলায় কেউ নিজের ছাড়া আর আরু কথা ভাবতে পারে না,

বাড়িতে দেবীর পূজা করে। এই দেবীর নাম "মঙ্গলাগৌরী"। যে বধূর পূজা, তার নাম করে বলে—'অমুকের মঙ্গলাগৌরী', যেমন, 'দুর্গীর মঙ্গলাগৌরী'। সমবয়সী বিবাহিত মেয়েরা অনেকে মিলে, এক একজনের বাড়িতে এক এক মঙ্গলবারে পূজা করে। সেজেগুজে গয়না গাঁটি পরে' ফুলের ডালা সাজিয়ে সবাই পূজা বাড়িতে জড়ো হয়। দেবীর ছোট্ট মূর্তি চৌকীর উপর রাখা হয়, চৌকীর চারিদিকে ছোট ছোট কলাগাছ বাঁধা হয়। পূজার সময় মেয়েরা নানারকম ফুল দিয়ে দেবীর মূর্তিকে ঢেকে ফেলে সকলে মিলে পূজা করে, আরতি গায়। এই উপলক্ষে বাড়িতে উৎসব করা হয়।

১ মহারাষ্ট্রে সীমন্তিনীরা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন ব্রত পালন করে; সেদিন উপবাস করে, বটবৃক্ষের পূজা করে।

২ বিবাহিত মেয়েরা বিয়ের পর প্রথম পাঁচ বছর প্রত্যেক শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারে শিবমন্দিরে গিয়ে পূজা দেয়। এই পূজায় মুষ্টি মুষ্টি তিল চাল ডাল ইত্যাদি নিয়ে যায়—তাই একে বলে শিবমুঠ, মুঠ মানে মুষ্টি।

তা মিথ্যে নয়। মা সেদিন কত ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু আমি গিয়ে তাঁর মাথার পাশে জড়সড় হয়ে বসে 'উ-উ', করতে লাগলাম! শেষে ঠাকুরদা যখন ধমক দিয়ে ডাকলেন, তখন উঠে খাওয়া শেষ করে আঁচিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়লাম।

উতলা আনন্দ বড় আশ্চর্য জিনিস! রাত পোয়াতে না পোয়াতেই আমি দুর্গীর খবর নিতে ছুটে গেলাম। অত সকালে দুর্গী কি আর আসতে পারে? কিন্তু তার মার কাছে আর ঠাকুরমার কাছে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমি দুর্গীকে ডাকিয়ে পাঠালাম। ডাকতে যেতেও কেউ ছিল না, তাই ঠাকুরমাকে দিয়ে আমাদের রুখমাইকে ডেকে পাঠালাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্গীর শাশুড়ী, "দুর্গীকে আর তিনদিন পাঠাচ্ছিনে, যখন তখন ডেকে পাঠানো, এ কী?" এই বলে রুখমাইকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। তখন কিন্তু আমার বড্ড দুঃখ হল। কারণ, দুর্গী এমন সময় নেই মানে আমার কেউ নেই! কিন্তু কী উপায়? "পরাধীন জীবন আর পুঁথিগত বিদ্যা"[১] একই রকম অবস্থা তো? দুর্গী ছিল শ্বশুরবাড়িতে, সে নিজে থেকে আসতে পারত না। আর আমি তার যত পথ চেয়েছিলাম ততটা কি আর কেউ চেয়েছিল? "আচ্ছা বেশ, আসবে'খন দু'দিন পরে," এই বলে সকলে চুপ করে রইল। তখন মন বড়ই উদাস হল। তাই দেখে দুর্গীর মার দয়া হল, তাই সন্ধ্যাবেলা সে নিজে দুর্গীর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে, দশ পনেরো দিন থাকবে, এই বলেই দুর্গীকে নিয়ে এল। সত্যি বলতে গেলে, বিয়ে ছিল আমাদের বাড়িতে। দুর্গীর মার নিজে গিয়ে দুর্গীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার তেমন দরকার কি ছিল? কিন্তু দুর্গীর মা অত অভিমানিনী ছিল না। আমাদের প্রতি তাদের স্নেহ বেশী ছিল, তাই বোধহয় তার আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ মনে হল। সে যাই হোক্—দুর্গী এসে গেলে আমার আনন্দের সীমা রইল না। আমরা সারাদিন চুপি চুপি আর ফিস্ ফিস্ করে গল্প করেই সারা হলাম। কত কী যে কথা বলেছিলাম তা আমরাই জানি।

সেদিন রাত্তিরে ও আমার পাশে আমার বিছানাতেই শুলো। শুয়ে শুয়ে আমরা নানা রকম গল্প করছিলাম। সে কি রকম তা ছোটমেয়েরাই

১ একটি মারাঠি প্রবাদ। এর অর্থ সহজেই বোঝা যাবে।

কল্পনা করতে পারবে। বহু সাজিয়ে গুছিয়ে বললেও আর সকলে তা বুঝতে পারবে না। আহা! সে আনন্দ কি আর কখনও আমরা এ জীবনে অনুভব করতে পারব? এই বিয়ে ব্যাপারটা সুখের, মজার, চারদিনের আমোদ প্রমোদের মনে হয়, কিন্তু এই বিয়ে মানে কত বড় দায়ের বোঝা আমরা মাথায় তুলে নিচ্ছি তার কল্পনাও কি আমরা তখন করি? আমরা যেমন পুতুলের বিয়ে দিই, ঠিক তেমনি আমাদের বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠারা আমাদের বিয়ে দেন! আমরা পুতুলগুলো এখানে-সেখানে তুলে নিয়ে যাই, আর আমাদের কথা বলবার, হাঁটবার ক্ষমতা থাকে তাই আমাদের তুলে রাখবার দরকার হয় না, শুধু হুকুম করলেই, ব্যস। সুতোয় বাঁধা ছোট ছোট কাঠপুতলীর মতো আমরা যে যা বলে তাই করি। আমরা কী করছি আর তার গুরুত্ব কত তা আমরা আমাদের পুতুলের মতোই বুঝতে পারি! তাদের আর আমাদের একেবারে একই অবস্থা! বরঞ্চ, পুতুলের চেয়েও আমাদের অবস্থা বেশী খারাপ, কেন না আমরা যা করি তার সুখ দুঃখ পুতুলদের কিছুই থাকে না। আমাদের কার্যকলাপের পরিণাম তাদের ভুগতে হয় না; কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠদের কার্যকলাপের পরিণাম আমাদের পাকা বয়সে ভুগতে হয়! তখন, আমাদের মতো চলা-ফেরা কথা-কওয়া পুতুলদের অবস্থা কত খারাপ! আমরা চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকতে বধির, জিভ থাকতে বোবা আর হাতপা থাকতেও খোঁড়া!

বরের অবস্থাও যে কনের চেয়ে ভিন্ন, তা নয়। একে তো আমরা অজ্ঞান শিশু! আমরা ভালোমন্দ কী বুঝি? 'বিয়ে' বললেই আমরা দু'চার দিনের 'মজা' দেখতে পাই, কিন্তু পরে সংসার-যাত্রায় যে 'সাজা' পাওয়া যাবে, তা কি জানতে পারি? আজ পরস্পরের সামনে বসে মুখে তুলে দেবার মিষ্টান্নের গরাস দেখতে পাই, কিন্তু পরে একগ্রাস ভাতের জন্য কত কষ্ট পেতে হবে তার চিন্তা কি মনকে ছোঁয়? আজ বেশ ফরসা, সুন্দর, মদন মূর্তি বর দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু পরে সে স্ত্রীকে নিয়ে কী রকম সংসার করবে, তার চরিত্র কেমন হবে, তা কি কখনো ভেবে দেখি? আজ বিয়ের সময়ের সকলরকম মঙ্গলময় রীতিরেওয়াজ দেখে মন কেমন আনন্দে থৈথৈ করে, গায়ে কেমন যেন সুড়সুড়ি পাই, কিন্তু ঐ সব আনন্দ কোন সংকটের সূচনা, সে কি কল্পনায় থাকে? আগামী সংসারের কিংবা সুখ দুঃখের কল্পনা দূরে থাক, বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া মাত্র নিজের কী

রকম অবস্থা হবে, শ্বশুরবাড়ির সবাই কেমন, তাদের বাড়ি গেলে পরে সুখে থাকব না দুঃখ পেতে হবে, তার চিন্তাই কি কখনো করি? সবই যেন অন্ধকার! বর্তমান, অব্যবহিত আনন্দ ছাড়া আমরা কিছুই দেখতে পাই না। আমি এখন যা এত স্পষ্ট লিখছি, এ সবকিছু আমার প্রত্যেক ভগিনী ভোগ করেছে, আর তারা যদি অল্প একটুও ভেবে দেখে, তবে তারা নিশ্চয় বুঝবে যে আমি যা বলছি তাতে একরত্তিও ভুল নেই। কারো হয়তো আমার নির্ভীক স্পষ্ট কথা ভালো লাগবে না, কিন্তু আমি যা মনে করি, তা নির্ভীকভাবে লিখে, আসল অবস্থাটা সকলের সামনে দাঁড় করাবার জন্যই তো এই আত্মচরিত লিখতে আরম্ভ করেছি। জগদম্বার কৃপায় আমার এই বৃত্তান্তটি সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি, তা হলে আমাদের সংসারে প্রত্যেকদিন যেসব ঘটনা হয় সেগুলি, আর সেসম্পর্কে নিজের ও আমার বান্ধবীদের অনুভব মনে করে যা ভাবব তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট আর নির্ভীক ভাবে লিখব। ঈশ্বরের দয়ায় আমার এই চরিতটি সম্পূর্ণ লিখে ফেলতে পারলেই হয়, এই একমাত্র ভয়!

কিন্তু এখন আমার মনে আরও যত সব চিন্তা জটলা করছে সেগুলি না বলে, এর পরের ঘটনা বলাই ভালো। কেননা আমার বিষয়ে যেসব সাধারণ চিন্তা আমার মনে আসছে, সেগুলি এতবেশি যে এখানে লিখলে হয়তো অকারণে সুদীর্ঘ হতে পারে। তবু একটি কথা সকলে—বিশেষতঃ আমার ভগিনীরা—মনে রাখবেন, আমার ভাবনার অনুধাবন করে তাঁরা নিজে সে বিষয়ে ভেবে দেখবেন। আমি নিশ্চয়ই জানি যে সকলে আমার মতোই মনে করবে, আর আমি নিজের ছেলেবেলার কথা লিখতে লিখতে প্রৌঢ় বয়সের চিন্তাধারা তাতে মিশিয়ে দিয়েছি বলে আমাকে দোষ না দিয়ে ভাববে, আমি যা দিয়েছি তা একেবারেই অল্প, এর চেয়েও কত বেশি লিখবার আছে! যে মেয়ের বিয়েতে চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল, আর যে সোনার গয়নাগাঁটির ভারে নুয়ে পড়েছিল, এমন এক আমার বান্ধবী আজ পরের ঘরে বাসন মেজে, চাকি পিষে নিজের পেট চালাচ্ছে! বিয়ের সময় তার বর ছিল বারো কি তেরো বছরের ছেলে। দেখতে বড় সুন্দর, কিন্তু পরে তার আচরণ এমন বাঁদরের মতো হল যে, পাঁচ বছরের মধ্যে লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিষয় সব উড়িয়ে দিয়ে, অন্নের জন্য দুয়োরে দুয়োরে ঘুরতে লাগল। আর তার স্ত্রী এতই গোবেচারী যে যাঁতা ঘুরিয়ে, বাসন মেজে

স্বামীকে খাওয়াচ্ছে। মা বাবার ইচ্ছামত ছোটবেলায় বিয়ে দেবার ফল মনে করতে গিয়ে আমার এই বান্ধবীর কথা মনে পড়ল, তাই লিখলাম। এমন আরও কত কথা আমার মনে পড়ছে, কিন্তু এখন থাক্।

বিয়ে যেদিন পাকাপাকি ঠিক হল, তার পরের দিন মা ঠাকুরদাকে ডেকে তাঁর দুবোনকে বিয়ের নিমন্ত্রণ পাঠাতে অনুরোধ করলেন। রীতি-মাফিক ঠাকুরদা চিঠি লিখলেন। শুধু তাই নয়, বুড়োর মার উপরে এত স্নেহ ছিল যে আমাদের এক মাসিমাকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিলেন, আর পরে সে কথা মাকে বললেন। দ্বিতীয় মাসিমা মিরজ সাঙ্গলীর দিকে একটু দূরেই থাকতেন। তাঁকে এত অনুরোধ ক'রে নিমন্ত্রণ করা হল, কিন্তু তিনি ঠিক বিয়ের আগের দিন এলেন। অন্য মাসিমাকে আনতে তো লোকই গিয়েছিল, তাই তিনিও এলেন। আমার দু' মাসিমার সব মিলে ছ'টি সন্তান ছিল। মিরজ সাঙ্গলীর মাসিমার তিনটিই মেয়ে, আর অন্য মাসিমার ছিল দুই ছেলে আর এক মেয়ে। ঠাকুরমার জ্ঞাতিগুষ্ঠি বেশি কেউ ছিল না। তাঁর এক খুড়তুতো ভাই ছিল, কিন্তু তার আসার মতো অবস্থা ছিল না। আওরঙ্গাবাদ না কোথায় যেন ছিল।

যাঁর সব ক'টিই মেয়ে তিনি ছিলেন আমার বড় মাসিমা। মা সব্বার চেয়ে বড়, তারপর গোদু মাসিমা, তারপরে সখু মাসিমা। গোদু মাসিমার একটি মেয়ে আমার চেয়ে দু'তিন বছরের বড় ছিল। আর সখু মাসিমার মেয়ে একেবারে আমার সমবয়সী ছিল। তাঁর দুই ছেলের একটি ছিল সুন্দরীর বয়সের, অন্যটি ছয় কি আট মাসের। গোদু মাসিমার আর দুই মেয়ের একটি ছিল পাঁচ বছরের, অন্যটি ছিল ছিল আট বছরের। বাইরের অন্য বড় কেউ আর আসে নি। আমাদের এক মামা—নিজের নয়—বোধহয় খুড়তুতো—মা তাকে চিঠিই পাঠান নি, কেন তা তিনিই জানতেন। এ ছাড়া তাঁর বাপের বাড়ি থেকে আর কেউ আসে নি। মোট কথা, বিয়ে বাড়ি জমতে লাগল আর হুলুস্থূল বেধে গেল। আমরা মেয়েই হলাম সাত আট জন। তাছাড়া বাবার পরিচিত দুতিন জন ভদ্রলোক সব সময় আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। প্রচুর পরিমাণ খাবার দাবার তৈরি করার পাট সুরু হল। ঠাকুরমা সতরোজন মেয়ে জড়ো করে রুখবতের আঁয়োজন করতে লাগলেন। সে প্রসঙ্গ মনে

পড়ে আজ যদিও আমার নিজের মন কেমন যেন উদাসীন হচ্ছে, তবু সে সব একপাশে সরিয়ে রেখে, আমার বিয়ের মোটামুটি কথা লিখে, আমার বোনদের তাদের বিয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে দুদণ্ড আনন্দ দিতে পারলেই ভালো।

আমার বিয়ে

এর আগেই বলেছি যে বাড়িতে একেবারে হৈ চৈ সুরু হয়ে গেল। একে তো আমরা যে বাড়িতে থাকতাম সেটা তেমন বড় ছিল না, তায় আবার আমরা দুই পরিবার ভাড়াটে। কিন্তু আমরা পরস্পরের সুবিধা অসুবিধা বুঝে চলতাম, তাই বিশেষ উপলক্ষ্যে নিজেদের ঘর পরস্পরকে ব্যবহার করতে দিতাম। তাতে আবার মজা এই যে, জায়গার জন্য ঝগড়াঝাঁটি মেয়েদের মধ্যে হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ঠাকুরমা বড্ড সরল ছিলেন, আর বহিনাকাকিও তেমনি ছিলেন বললে ভুল হয় না। সেই বুড়ীর কর্মক্ষমতা বেশ ছিল, কিন্তু ঝগড়া-টগড়া কখনো করতেন না। তাঁর পুত্রবধূ অবশ্য একটু কড়া মেজাজের ছিল কিন্তু সে আমাদের বাড়ির কারো সঙ্গে কক্ষনো মুখ করেনি। করবেই বা কী করে? ঠাকুরমা তো ওই রকম, মা বেচারীর অসুখ, আর অসুখ না হলেও, তাঁর এমনি স্বভাব যে কেউ ঝগড়া বাধাতেই পারত না। তাঁর জীবন ছিল ঝগড়াঝাঁটি মিটমাট করে দেবার জন্য! তাই তারা সকলে আমাদের সঙ্গে বাড়ির লোকের মতোই আচরণ করত।

আমার মার বুদ্ধিমত্তার আর একটি কথা আমার মনে পড়ছে সেটা বলে রাখি। আমার মাসিমারা যেদিন এলেন তার দ্বিতীয় না তৃতীয় দিন আমরা সবাই বিনুনি করতে বসেছিলাম। মার ঘরখানা যেন আমাদের সকলের ওঠাবসা করবার ঠাঁই হয়েছিল। যে আসত সেই তাঁর কাছে বসত। যার কোনো জিনিস রাখবার দরকার, অমনি সেটা মার ঘরে ফেলে দিয়ে, চেঁচিয়ে, "এইখানে এইটে রেখে দিলাম" বললেই হল। তাই তাঁর ঘর রূপোর বাসন, পদ্মকাটা পূজার থালা, মেয়েদের ভালো জামাকাপড়, পুরুষদের 'শেলা',[১] পাগড়ী ইত্যাদির ভাঁড়ারঘরই হয়েছিল। আবার আমাদের খেলাধুলোও সেখানেই চলত। যার ইচ্ছে, সে ঘরে মাথা গুঁজলেই হ'ল।

১ সেকালের মহারাষ্ট্রীয় পুরুষদের ভাল গায়ের চাদর বিশেষ।

আমি, আমার মাসতুতো বোনেরা, মাসিমা, সকলেই বিনুনি করতে বসেছিলাম, এমন সময় দুর্গীর মাও সেখানে এল। ওর বিনুনি তখনো হয়নি। তাই মা তাকে বললেন, "বসুন, এখানেই বিনুনি করুন না কেন। রোজ নিজের হাতে তো হচ্ছেই, আজ আমি খোঁপা বেঁধে দিই ; দেখি কেমন মানায়!" আমাদের মা কাউকে কিছু বলেছেন আর সে অবাধ্য হয়েছে এমন কখনো হয়নি। দুর্গীর মা চট্ করে বসে পড়ল, "দেখুন যশোদাকাকি, আমার কারো হাতের বিনুনি ভালো লাগে না, তাই আমি নিজে খোঁপা বাঁধি, শুধু আপনার বিনুনি আর খোঁপা আমার পছন্দ হয় ; কিন্তু তাই বলে রোজ রোজ কি আর আপনাকে জ্বালাতন করা ভালো?" তাই শুনে মা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু, আমার বড় মাসতুতো বোন ফ্যাচ করে কী একটা কথা বলে ফেলল, আর মার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। মা যখন দুর্গীর মার বিনুনি খোঁপা বাঁধা শেষ করলেন তখন আর সকলের হয়ে গিয়েছিল, আর তারা নিচে গা ধুতে চলে গিয়েছিল। কেবল আমার মা আর দুর্গীর মা দুজনে সেখানে ছিলেন। আমিও নিচেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ঘাগরা নিয়ে যেতে উপরে এসে তাঁদের কথোপকথন শুনতে পেলাম।

"আমি একা, আর আমার এমন অসুখ, তাই এই শুভ কাজে আপনি আমার স্থান নিন। যেন আমি বাড়িতে নেই, আর আপনার উপরেই সব ভার রয়েছে।"

"ওমা। এ কি কথা? আপনার বোনেরা আছেন, শাশুড়ি আছেন, আমার শাশুড়িও আছেন, তখন আর ভাবনা কি? আর কাউকে চাই কেন?"

"তাতো সত্যি। কিন্তু বেয়ানদের ওখানে যাওয়া আসা, কথাবার্তা কওয়া, এ সব কাজ আমার শাশুড়িকে দিয়ে হবে না। বোনেরা হচ্ছে এখানে নতুন, তারা পুনার রীতি-রেওয়াজ মোটেই জানে না। তাই এ সব আপনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। আমি নিজে যদি ভালো থাকতাম তাহ'লে..." এই কথা বলতে বলতে মার চোখ ছলছল করতে লাগল, কিন্তু চট করে চোখ মুছে ফেলে, তিনি করুণ দৃষ্টিতে দুর্গীর মার মুখের দিকে চাইলেন, অমনি তার চোখেও জল এল, আর সে তাড়াতাড়ি বলল, "আপনার কোন চিন্তা করতে হবে না। কোনো দুঃখ করবেন না। কিছুতেই আমি অভাব হতে দেবো না। এই দেখুন, আমি চার-

দিন আপনার বোনের মতো আপনার বাড়ি এসে থাকবো'খন, তাহলে হবে তো?"

তার কথা শুনে মা বললেন, "তাই বেশ, কিন্তু যে এগিয়ে মাথায় ভার নিয়ে কাজ করে তাকে কি করতে হয় জানেন তো? কেউ কিছু বললে তা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। যেটুকু আপনি করলেই—কেন না, আমাদের গোদী হচ্ছে ভারী ইয়ে, তাই—কিন্তু তা আর আপনাকে বলতে হবে না। আমি নিশ্চয়ই জানি যে আমার খুঁত, নিজের খুঁত মনে করে আপনি সব সহ্য করবেন।"

এই পর্যন্ত কথা শুনে আমি নিচে চলে গেলাম। কিন্তু তাজ্জব এই যে, তখন থেকে দুর্গীর মা আমার মার মতো সব দেখাশোনা করতে লাগল। আর সমস্তটা বিয়ের দিন যে বাঘের মতো কাজকর্ম করল। কত ঝগড়াঝাঁটি হল। এমনভাবে সে সব মিটমাট করে দিল, যেন মনে কিছু দাগ না থাকে। বেয়ানের কাজই সে করল বলা যায়।

এমন বিয়ের কথা কি বলি আর কি না বলি তা ভেবে পাচ্ছি না। যদি ঠিক করি যে সব সব ঘটনাগুলি লিখব, তবে তা অনেকগুলো ঝগড়ার বর্ণনা একসঙ্গে দেবার মতই হবে, কেননা আমার বিয়েতে এত ঝগড়া হয়েছিল যে, সে সব যদি আদালতে যেত তবে এক বছরের চেয়েও বেশিদিন মামলা চ'ত। ততদিন আদালতে অন্য কোনো কাজ করার জো থাকত না। ঝগড়াতে এত অনর্থ হ'ল যে সকলে একেবারে হয়রান হয়ে গেল। আমাদের ঠাকুরদা ঝগড়া করতে অত ওস্তাদ! কিন্তু তিনি পর্যন্ত শেষে হাত জোড় করে বললেন, "এমন ঝগড়াটে মেয়ে সব যে পৃথিবীতে থাকতে পারে তা জানতাম না।"

না, না, সে যে কী সাংঘাতিক ঝগড়া! আমার আজ সেসব কথা মনে পড়লেও গা কেমন করে ওঠে! আমার সেই মামী-শাশুড়িরা, আর সেই বারী, তার বোনেরা, আর অন্য যেসব আত্মীয় সম্পর্কের মেয়েরা জড়ো হয়েছিল, তারা ঝগড়া করে যেন একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিয়েছিল। এমন একটিও ঘটনা ছিল না যা নিয়ে তারা ইচ্ছে করে ঝগড়া করেনি। এই যেমন বেয়ানের আঁচলে তুলে দেবার নারকোল[১] নেই, অমনি ঝগড়ার

[১] বিয়ে উপলক্ষে বেয়ানদের, অন্য সীমন্তিনীদের শ্রীফল—নারকোল দেবার প্রথা মহারাষ্ট্রে আছে। নারকোল হাতে করে তুলে দেওয়া হয়, আর সীমন্তিনীরা সেটা আঁচল পেতে নেয়।

শুরু! বিয়ের সময় ছোট ছোট মেয়েদের যে শুকনো নারকোলের বাটি দেয়, সেগুলো সাধারণতঃ কত বড়? আর মরণ! সেগুলো যে মুদির দোকান থেকেই টুকরো করে আনা হয়। তবু, বলে কিনা "ইচ্ছে করে ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করেছে।" "ভিখিরি, পাড়াগেঁয়ে লোক, এরা শহরের কি জানে?" এ কথা সে বাড়ির সকলের মুখে কতোবার যে শুনেছি তার অন্ত নেই। "ভিখিরি কোথাকার, ভিখিরি কোথাকার," এই শব্দ যেন তারা অনবরত জপ করছিল! আমাদের বাড়ির কিছুই যেন তারা ভালো দেখতে পাচ্ছিল না। বারী, তার সেই দুইবোন, সেই ধোণ্ডু—কিন্তু এ কি আমি লিখছি? এখন তিনি যে আমার 'ধোণ্ডু ঠাকুপো' হয়েছেন!—আর কুশী, আর আর সব মেয়েদের জটলা, সকলের যেন মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল! যে আসত সে যেন সাপের মতো ফোঁস্ করে তেড়েই আসত।

এইভাবে আমার বিয়েতে ঝগড়ার একেবারে পরাকাষ্ঠা হয়েছিল! সেই ঝগড়ার জ্বালায় অন্ততঃ আমাদের বাড়ির কারো আমার বিয়েতে সুখ হয়নি। আমরা চারটি মেয়ে যা হেসে নেচে বেড়েয়েছিলাম তাই। বাকি—ঠাকুরমা, মাসিমারা, বেচারী দুর্গীর মা আর ঠাকুরমা, সবাই একেবারে বিরক্ত হয়েছিলেন। আমার বিয়ে হবে, এই আনন্দে মার অসুখ যেন অর্ধেক সেরে গিয়েছিল, ঝগড়ার চোটে তা চারগুণ বেড়ে গেল! তিনি বিয়ের সময়ে ঘরের বাইরে পর্যন্ত যাননি। কিন্তু সেই ঝগড়াটে মেয়েরা আমাদের বাড়ি এসে তাঁর সঙ্গেও দু'বার খুব জোরে ঝগড়া করেছিল। কিন্তু সে ঝগড়া শুধু একতরফা হয়েছিল, কেননা, মার মুখ ফুটে একটি কথাও বেরোয়নি। দ্বিতীয়বার যখন তারা ঝগড়া করতে এল, তখন এত চেঁচামিচি সুরু করল যে, শেষে দুর্গীর মা চটে গিয়ে তাদের বলল, "উনি নিজের অসুখে হয়রান, আর ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে তোমাদের কিছু ইয়ে করছে না!" এই কথা বলতেই আমার মামীশাশুড়ীর যেন গা জ্বলে উঠল! সে নারকোল না নিয়েই হন্ হন্ করে চলে গেল, আর ধানাই পানাই করে সে যে কাণ্ড বাধিয়ে দিল, তা বলবার জো নেই। "আমাদের যেন কোনো মানসম্মানই নেই। যার খুশি অমনি এসে আমাদের ভর্ৎসনা করলেই হল! আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের লজ্জা দেয়নি। এখন এদের মেয়ে কোলে করে নিয়েছি তো, তাই বেশ উদ্ধার করলেন! আমাদের লজ্জা নেই, আমাদের

আক্কেল নেই, যে-কেউ আমাদের গালে চড় বসিয়ে দিতে পারে। এসে জুতো মারে না কেন আমাদের! মেয়েগুলো অত বড়ো গাধার মতো বেড়েছে, ওদের লজ্জাও করেনা আমাদের নির্লজ্জ বলতে?" সেকি দু'এক কথা? অবিরাম তার মুখ চলছিল।

গৃহপ্রবেশের পরের দিনও আমি শ্বশুর বাড়িতে থাকতে থাকতে, আমার সামনেই তার মুখ চলছিল। সেদিন আমার সঙ্গে কেউ কথা বলছিল না। বারু ঠাকুরঝি, বনু ঠাকুরঝি, কুশী ঠাকুরঝি, ধোণ্ডু ঠাকুরপো, এরা সবাই ব্যঙ্গ আর বক্রোক্তিতে আমার মাথা খাচ্ছিল! তাই, "এখন থেকে আমি যে ঘরছাড়া হয়েছি!" মনে করে আমার বড্ড কান্না পেতে লাগল। তখন আমি আড়ালে গিয়ে কাঁদতে লাগলাম। ইতিমধ্যে কুশী ঠাকুরঝি তা দেখতে পেয়ে, অমনি গিয়ে বারু ঠাকুরঝির কাছে 'রিপোর্ট' করলেন! বারু ঠাকুরঝি এসে দেখলেন আর বনী ঠাকুরঝিকে বললেন। তিনিও আমায় দেখতে এলেন, আর সেই চ্যাপ্টা নাক কুঁচ্‌কে বললেন, "ওমা! বৌদি! কাঁদতে বসলে যে? কীসের অভাব হল? আমাদের বাড়ি কি বিষের মতো ঠেকছে? কিন্তু এ বাড়িতেই তো এখন জন্ম কাটাতে হবে গো!" এই শুনে বারুবাই অমনি এগিয়ে এলেন আর বললেন, "হ্যাঁ, দেখ্ বনুদি, আমাদের বৌদির ভারি নরম মন। ওর এতটুকু বকুনিও সহ্য হয় না। তুই অমনি ওঁকে বকিস্‌নি."

বনু—"আমার ব'য়ে গেছে বকতে।—আর বকলেও আমি হ'চ্ছি বাপের বাড়ি-বাসিনী—বরের বোন!"

বারু—"তুই বুঝি একলা এত সম্মাননীয়া বরের বোন? আর আমি কে লো? আমি বুঝি বরের বোন নই?"

অমনি আমার কান্নাটান্না রইল দূরে, আর তাদের দু'জনেতে কোঁদল শুরু হল। কলহ বাড়তে বাড়তে এত বেড়ে গেল যে শেষে বনী তার বড় বোনকে একেবারে এমন নোংরা কথা বলল, যা এখানে লেখাও উচিত হবে না। তা শোনা মাত্র বারু ঠাকুরঝি ঠাস করে বনুর গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন। সে চড়ের চোটে বনু ঠাকুরঝির 'বুগড়ি'[১] কাণে এঁটে বসল, আর

[১] বুগড়ি—সেকালের মহারাষ্ট্রীয় মহিলাদের কানের গহনা বিশেষ। এটি কানের উপরের দিকে পরা হত। আজকাল বড় কেউ এ গহনা পরে না।

কাণ গলা এত লাল হল যে কী বলব! আর দু জনে মিলে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

এই আমার শ্বশুরবাড়ির প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা! এই মনে রেখে আমার জীবনধারার সুখের কল্পনা করতে হবে! সে যে কত সুখ তা ভেবে দেখবার ভার পাঠকদের উপরেই দিচ্ছি।

এই ঘটনাটি আমি যেমন ভুলতে পারব না, তেমনই বিয়ের দিনে আমি যে কত আনন্দে সময় কাটিয়েছি. তাও ভুলতে পারব না। বাস্তবিক তার বর্ণনা এর আগেই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যে বিশেষ ঘটনাটি আমার আগে মনে পড়ল, সেটা আগে লিখে ফেললাম। তা ছাড়া, "আগে তেতো, পরে মিষ্টি", এ ন্যায় তো সবাই জানে।

আমার বিয়েতে আমার বাপের বাড়ির সকলের কত কষ্ট হয়েছিল তা বলেছি। সেই ঝগড়াঝাঁটির ফলে আমার যে একেবারেই কষ্ট হয়নি, তা নয়। কিন্তু সেরকম কষ্ট ছেলেবেলায় আমরা যতটা মনে করি ততটাই আমি মনে করেছিলাম, তার চেয়ে বেশি কিছু মনে করিনি। বারু ঠাকুরঝি, বনু ঠাকুরঝি, কোণ্ডু ঠাকুরঝি, ইত্যাদি যত সব ঠাকুরঝি, আর শাশুড়ীরা জড়ো হয়েছিল, তারা যখন পরস্পরকে সময়ে সময়ে বক্রোক্তিপূর্ণ কথা বলত, তখন তা শুনে এ বাড়িতে আমি কেমন করে জীবনযাপন করব মনে হয়ে, আমার মন কখনো কখনো উদ্বিগ্ন হত এই মাত্র। তাছাড়া, তাদের ঝগড়া শুনে ঠাকুমা আর বাড়ির অন্য সবাই যখন আমাকে বলত, "মা যমু, এ বাড়িতে তুই কেমন করে দিন কাটাবি?" তখন হয় তো আমার একটু মন কেমন করত। কিন্তু মোটামুটি, বিয়েতে মেয়েদের যেমন আনন্দ হয়, তা আমার নিশ্চয় হয়েছিল।

বিয়ের প্রথম মঙ্গল আচার থেকে আরম্ভ করে, একেবারে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক আচার-অনুষ্ঠানের সময় মেয়েদের যা আনন্দ হয় তা আমি লাভ করেছিলাম। কিন্তু প্রত্যেকটি আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে দরকার নেই। তবু কোন কোন বিশেষ প্রসঙ্গে আমি যা মনে করেছিলাম তা সংক্ষেপে লিখলে অবান্তর কিংবা অনুপযোগী হবে না। গায়ে-হলুদের সময় থেকে আমি বিয়ের চিন্তা করতে লাগলাম। বিয়ে, মানে যাঁর সঙ্গে বিয়ে হবে, তাঁর চিন্তা করতে লাগলাম, বলাই উচিত হবে। এখন এই গায়ে হলুদ, এঁটো হলুদ নিয়ে গিয়ে ওঁর গায়ে মাখা হবে? তার পরে, চান

হয়ে গেলে কনেকে সে যে কি রকম বেশ পরায়!—সেই শাড়ির রকমই বা কি, আর সেই চোলীই বা কি করে পরা যেতে পারে? আবার সেই গৌরী হরার[১] সামনেই কি না বসতে হয়? সে একেকটি কথা মনে হলে চিত্ত উতলা হয়ে ওঠে!

যখন আমি গৌরীহরার সামনে বসেছিলাম, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছি যে পরে আমার উপরে কঠিন সংকট আসবে আর আমার সারা জীবন মরুভূমির মতো হয়ে যাবে? মোটেই না, তখন আমি শুধু বিয়ের সময়কার আচার-অনুষ্ঠান—সেই চোলী, সেই কপালভরা সিঁদুর, সেই সবুজ রংয়ের চুড়ি ক'গাছি, সেই এলোমেলো খোঁপা, নাকের সেই আংটি (পরে নথ পরতে হবে বলে, বিয়ের সময়, বাঁ নাক ফুঁড়ে সোনার আংটি বিশেষ পরিয়ে দিত), পায়ের আঙুলের সেই রূপোর আংটি, এইরকম ঢংএর মঙ্গল সাজ—তখন সেই বেশ কেমন যেন ঐশ্বর্য মনে হচ্ছিল, আর সত্যি কথা বলতে কি, যাদের বিয়ে হয় সে-মেয়েদের ওইটুকুই তো ঐশ্বর্য! বাকি যতই ঐশ্বর্য থাকুক, কিংবা মা-বাপ যতই বিষয়-সম্পত্তি দিক, তবু তার শেষ পর্যন্ত ঐশ্বর্য ঐটুকুই।—সেই বেশে কস্ কস্ করে এদিকে-ওদিকে যাওয়া-আসা করার সময় যা মজা বোধ হচ্ছিল, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া বুঝতে পারা যাবে না।

লোকে ঠাট্টা করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে, "যা গৌরীহরের সামনে বসে, ভালো করে দেবীর পূজা করগে যা, বল, 'মাগো, আমায় ভালো বর দাও'। গৌরীহরের ভালো করে পুজো না করলে ভালো বর পাওয়া যায় না।" আমরাও সেই অষ্টপুত্রীর জঞ্জাল ভালো করে সামলে ধরে, আর চোলী সামলাতে সামলাতে মুখে বলি, "আমরণ! থাক ভাই তোমাদের ঠাট্টা!" মনে মনে কিন্তু সে ঠাট্টা বড় ভালো লাগে। তার পরে তেল-ফলের মজা! তার পরে ঠিক বিয়ের সময়কার রঙ্গের তো সীমাই থাকে না। উনি ঘোড়ায় চড়ে এলেন। আর নেমে ভিতরে এলেন, পরে কন্যা দানের সময় পীতাম্বর পরে এসে বসবেন ইত্যাদি কথা মনে করে ওঁকে দেখতে মন কেমন ব্যাকুল হয়েছিল। অন্ততঃ আমার সতেরোবার উঠে আস্তে বাইরে গিয়ে দরজা থেকে উঁকি মেরে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু

[১] ঠিক বিয়ের সময়ের কিছুক্ষণ আগে, কনেকে দেবীর সামনে বসে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। বিয়ের আগে যে দেবীর পূজা করতে হয়, তাঁকে "গৌরীহরা" বলা হয়।

তা কি তখন করতে পারি? চুপ করে সেই একই জায়গায়, কেউ এসে বাইরে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বসে থাকতে হল। আর শেষে যখন নিয়ে গেল তখন অন্তরপাট ধরে ব্রাহ্মণরা উচ্চৈঃস্বরে মঙ্গলাষ্টক গান করতে লাগল। যার মন কোন কিছুর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে সে অতি অল্প সময়কেও যুগের মতো লম্বা মনে করে। আমার ঠিক সেইরকমই হয়েছিল। এই ব্রাহ্মণদের মঙ্গলাষ্টক শেষ হবে কখন, আর ওঁর মুখ দেখতে পাব কখন এই ভেবে আমার মন বড উতলা হয়েছিল। এ-সব আমি স্পষ্ট লিখছি দেখে হয়তো আমার কোনো ভগিনীরা আমাকে নির্লজ্জ মনে করবে, কিন্তু আমি ঠিক জানি, তারা যদি নিজের বিয়ের সময়ের কথা মনে করে দেখে, তাহলে তাদের নিশ্চয় মনে পড়বে যে তারাও এই যমুনার মতোই নিজের বরের দর্শনের জন্য উতলা হয়েছিল।

মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে মাঝের অন্তরপাটটা সরিয়ে নিলেই আমি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখব। কিন্তু কী আশ্চর্য! যতক্ষণ মাঝখানে অন্তরপাট ছিল ততক্ষণ আমি চোখ ফাটিয়ে তার ভিতর দিয়ে অপর দিকের কিছু দেখতে পাই কিনা চেষ্টা করেছিলাম, আর সকলে যখন মঙ্গলাক্ষতা[১] নিয়ে আমাদের মাথায় ছুঁড়ছিল, তখন আমি একাগ্রতার সঙ্গে ওঁর মুখ দেখতে উতলা হয়েছিলাম। সেই এক কথাই আমি ভাবছিলাম। কিন্তু যেই অন্তরপাটটা দূরে সরিযে নেওয়া হল অমনি আমার সংকল্প যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, আর আমি চট্ করে মাথা হেঁট করে পায়ের আঙুলের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। তারপর যখন মুখোমুখি হয়ে পিঁড়ির উপরে বসেছিলাম, তখন কিন্তু আমি যে আড়চোখে ওঁর দিকে চেয়েছিলাম, সে কথা আলাদা।

বিয়ের পরের আচার-অনুষ্ঠানগুলি কিন্তু আমি এখন একেবারে ভুলে গেছি। যে-সব আচার-অনুষ্ঠানের বেলায় আমার ভারি মজা মনে হয়েছিল, শুধু সেগুলি আমার মনে আছে। সেই নিজের হাতে দুধমাখা খই পরস্পরের অঞ্জলিতে ঢেলে দেওয়া; তিনতিনটিবার করে পুরুতঠাকুর মন্ত্র বলেন, সেগুলি শুনে মনে মনে তা বলা! আমার সবচেয়ে বেশী মজা

১ বিয়ের সময় পুরোহিতগণ 'মঙ্গলাষ্টক বলে', "শুভমঙ্গল সাবধান" এই সুর ধরলেই সকলে বর-কণের মাথার মঙ্গলাক্ষতা (সিঁদুর মাখা চাল) ছোড়ে। এই মঙ্গলাক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে যেন বর-কনের মাথায় সকলের মঙ্গলাশীর্বাদ পড়তে থাকে, এইরকম কল্পনা।

লেগেছিল, সেই যখন কঙ্কণের সুতো দুজনের চারিদিকে বাঁধে। ওমা, সে যে কী মজা! যেন সেই সুতো দিয়ে দুজনের মনপ্রাণ এক করে বেঁধে দেয়! আমার ঠিক মনে আছে আমি একটু পিছনে বসেছিলাম। তখন আমাদের পুরুতঠাকুর হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, "হ্যাঁ, যমু, একটু এগিয়ে আয়; এখন এই সুতো দিয়ে তোকে এঁর সঙ্গে একেবারে এঁটে বেঁধে ফেলবে, জানিস?" তাই শুনে আমি তো ফিক্ করে হাসলামই, কিন্তু উনিও মুচকি হেসে, আড় চোখে আমার দিকে চেয়েছিলেন। পরে মঙ্গলসূত্র[১] গলায় বাঁধবার সময় উনি যখন আমার গলায় হাত দিলেন, তখন দুষ্টু দুর্গী কী কাণ্ডই করল! তর্ তর্ করে আমার কাছে এসে বেশ জোরে, নির্ভীকভাবে বলল, "ওমা, যমু, ছি ছি। এ কার হাত তোর গলায় লো?—আর এত লোকের সামনে? তুই ভাই একেবারেই যে ইয়ে ছেড়ে দিয়েছিস।" একে তো দুর্গী কথা কইতে ওস্তাদ, তার এই কথা শুনে সবাই হেসেই লুটোপুটি। সকলে মিলে হাস্য-কলরবের বান ডাকিয়ে দিল। আমার ভারি রাগ হচ্ছিল আর দুষ্টু দুর্গীটাকে এক চড় মারতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তার ঠাট্টা যে আমার পছন্দ হয়নি তা নয়। বরঞ্চ আমার খুব ভালো লেগেছিল। তবে এ দু'রকম ভাবের এ কী আশ্চর্য সমন্বয়! তার ঠাট্টা আমার পছন্দও হল, আবার তার উপর আমার রাগও হল! তাতে আবার তার সেই কথা শোনামাত্র 'এত নির্ভীক মেয়েটা কে?' মনে করে উনি যখন ঘুরে আড়চোখে দেখে মুচকি হাসলেন, তখন তো আমার খুব আনন্দ হল। পরে দুর্গীর সেদিনের সেই কথা কতবার আমাদের মনে পড়ত, আর উনি আমাকে বলতেন, "বড় চালাক আর সাহসী বাবা এই মেয়েটা! ওর কপালে যদি ভালো স্বামী জুটতো তা হলে ও বড় সুন্দর সংসার করত!"

লাজাহোমের বেলা চন্দনপাটার উপর দিয়ে হাঁটতে হয়—তাকে সপ্তপদী না কী একটা বলে, তখন উনি আমার হাত ধরলেন, আর অমনি আমার সব বন্ধুরা এত ঠাট্টা করতে লাগল সে বলবার জো নেই। ওঁর বন্ধুরাও যে ওঁকে কম ঠাট্টা করলেন তা নয়। কেউ বলল, "মশাই,

১ মঙ্গলসূত্র—কালো পুঁতির মালা। মহারাষ্ট্রীয় সাধ্বীরা গলায় কালো পুঁতির মালা পরে, বাংলাদেশে যেমন হাতে লোহা পরে। আর বিয়ের সময়ে বর সেই মালা বধূর গলায় পরিয়ে বেঁধে দেয়।

আস্তে, নইলে পরের মেয়েকে ঠেলে ফেলে দেবেন।” অন্যজন বলল, “বা রে! বেশ তো। বিয়ে হয়ে দু' দণ্ডও হয়নি, আর এরি মধ্যে বৌয়ের হাতে হাত দিয়ে বেড়াতে বেরুলি? সকলে দেখছে যে!” তাই শুনে আর একজন বলে, “ওহে, উনি হচ্ছেন বড় সংস্কারক—রিফর্মার!” এই রকমের মস্করা চলছিল। এই শেষের কথা শুনে সকলে হো হো করে হেসে উঠল। আর উনি তো হেসেই গড়াগড়ি! আমি তখন সে কথার মর্ম বুঝিনি। কেননা তখন আমি সংস্কারক টংস্কারক ওসব কথা বুঝতাম না। তার পরে নক্ষত্র দর্শনাদি আচার-অনুষ্ঠান হয়ে গিয়ে মুখে গরাস দেওয়ার সমারোহ খুব ভালো হল।

পরের দিন স্নানের আগে বিড়ি কাটাকাটি ইত্যাদি সাঙ্গ হল। কোনোটাতেই ওঁর কোনো আপত্তি ছিল না। কারো যেন মনে কষ্ট না হয়, তাই, “এই পানের খিলিটা কার?” “ওটা কার?” ইত্যাদি শিশুর মতো প্রশ্ন করে খেলাও তিনি খেললেন। উনি সুপুরি লুকোলেন, সেটা আমি তক্ষুনি খুঁজে বার করলাম। আর যখন হাতের মুঠোয় সুপুরি লুকিয়ে ছিলেন তখন সেটা কেড়ে নেবার জন্য হাত ছুঁতে না ছুঁতেই উনি মুঠো খুলে ফেললেন। তারপরে আবার একসঙ্গে চান করার মজা! এক জনকে অন্য জনের উপরে নুয়ে পড়তে হয়, আর বাড়ির মেয়েরা গায়ে জল ঢেলে দেয়। তেমনি করে নুয়ে পড়বার সময় আমার ভারি হাসি পাচ্ছিল! এমন সময় দুষ্টু দুর্গীটা আমাকে আগ্রহ করে বলতে লাগল, “বমুঠাকুরঝির গায়ে কুলকুচো ফেল।” আমার তবু বুদ্ধি দেখানো উচিত ছিল! আমার বুদ্ধিতে না কুলোলেও কেউ ইশারা করে 'না' বললে তা বুঝে নিতেও পারতাম। কিন্তু আমার মাথায় তখন কী খেয়াল চাপল কী জানি, আমি নিজে ভালো করে তা ভেবে দেখলামই না, আর উনি আড়চোখে ইঙ্গিতে যে বারণ করলেন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সেই কুলকুচো ছেড়ে দিলাম খেঁদি বমুঠাকুরঝির গায়ে, আর তা গিয়ে পড়ল ঠিক তার চোখের উপরে! অমনি সে যা হৈ চৈ, আর থৈ থৈ করে নাচতে লাগল তার সীমা নেই! গালিগালাজের তো অন্ত রইল না। “করিসনে” বলে উনি আমাকে ইশারা করেছিলেন, সে উল্টে ওঁর কপালেই এসে ঠেকল! কেননা, বমু ঠাকুরঝি স্পষ্টই বলতে লাগল যে “বর বৌকে ইশারা করে আমার গায়ে ইচ্ছে করে কুলকুচো করতে বললো!” অবশ্য তার সেকথা কেউ লক্ষ্য করল না। কিন্তু মোট

কথা এই যে, তার সাংঘাতিক রাগের ফলে আর অন্য কোনো কারণে, সেদিন খেতে খেতে চারটে বেজে গেল।

তার পরে 'মুখ দেখার' মজা, যার তার কোলে বসে চিনি খাওয়া! কতজন মহিলার যে সে মান ছিল জানিনে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, আমরা তখন নিশ্চয় বেশ একসের চিনি খেয়েছি!

আমাকে তারা বড় বেশী গয়না পরায় নি। পরাবেই বা কোথেকে? রীতিমাফিক চুড়িবালা পরিয়েছিল। গয়না বেশি হয়নি, তাই আমার বড্ড দুঃখ হয়েছিল ঠিকই। আর যখন মেয়েরা, "ওমা, অত টাকা যৌতুক দিয়ে এই কটি গয়না?" বলতে লাগল, তখন তো খুব দুঃখ হল। আমাদের ঠাকুমার যে কত দুঃখ হল তার ঠিক নেই। তিনি সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন। শেষে সকলে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে লাগল, "তুমি দুঃখ কর কেন? আমরা কি গয়না দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি? ছেলেটা দেখো তো কেমন। আর পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে মেয়েটাকে ঝুড়ি ভরে গয়না পরাবে, তুমি দুঃখ করো না গো।" কিন্তু তিনি ছিলেন মেয়ে মানুষ। তেমন কথায় কি তাঁর মন সান্ত্বনা পায়? ঝুড়ি ভরে গয়নাই যদি পরাতো, তবে বিয়ের সময়ে পরালেই তো হতো! অন্য কারো গয়না এনে দুদণ্ড নিজের বলে পরালেই বা কে জানতে পেতো? —তাহলে ঠাকুমার মন খুশি হত। "পরে ছেলে কামাই করবে, আর হেন করবে, তেন করবে!—কে জানে পরে কি হবে আর কি না হবে।" ঠাকুমার চিন্তার এই ধারা।

প্রায় সব মেয়েরাই তো ভাবে যে, তাদের মেয়েকে প্রচুর গয়না পরাবে। গয়না ছাড়া তারা অন্য আর কিছু দেখতে পায় না, ভাবতে পারে না, আর তাদেরই বা কি দোষ? তাদের শিক্ষা ও তাদের কোণঠাসা অবস্থারই অনুরূপ তাদের চিন্তা আর ভাবনা! যেমন বাক্সয়, আলমারিতে ভালো ভালো জিনিস, জামা-কাপড় তুলে রাখে, তেমনি মেয়েজাতি চায় নিজেদের ঐশ্বর্য দেখাবার উপযুক্ত অবসর! নিজের স্ত্রীকে ভালো ভালো গয়না পরিয়ে পাঁচজনের বাড়িতে বিয়েটিয়ে উপলক্ষ্যে পাঠালে, সেখানে যদি লোকে বলে, "ওহে, ইনি অমুকের স্ত্রী, বাহবা! গয়না-গাঁটি তো আছে বেশ দেখা যাচ্ছে।" তাহলে মনে হয় যেন কৃতকার্য হও্‌য়া গেল। সে গয়না-গাঁটির উপরে তার নিজের একরত্তি অধিকার না।

থাকলেও তাতে কিছু আসে যায় না। নাই বা হল সে সে-গয়নাগুলির মালিক! তার কি সাধ্য তা থেকে একরত্তি সোনা এদিক-সেদিক করে। আমি যা বলছি তাই সত্যি। সকলে ভাবে যে, মেয়েজাতি বাড়িতে কাজকর্ম করার চাকরাণী, আর বাইরে নিজের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করার উপযুক্ত আলমারি! আমার এই কথা সম্পূর্ণ সত্য, তাই কেউ কেউ তা একেবারে বিষের মতো তেতো মনে করবে, তা আমি জানি। আমরা শুধু লোক দেখাতে গয়নাগাঁটির মালিক। এ কথা আমাদের মনের উপর স্পষ্ট অঙ্কিত হয়ে গেছে, তাই আমাকে গয়না পরায়নি দেখে ঠাকুমার অত দুঃখ হল। এতে আশ্চর্য হবার মতো কিছু নেই।

বধূমুখ-দর্শন ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান হল। পরের দিন আবার আমাদের বাড়িতেই সবার নিমন্ত্রণ হল, আর সেই রাত্তিরেই শুভক্ষণে বরবধূ যাত্রা করল। তখন সত্যি আমার এত কান্না পেল যে তার আজ বর্ণনা করা অসম্ভব। পালকিতে মাথা হেঁট করে বসে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম। শুধু মনে হতে লাগল যে, আর কখনও কি আমাকে মার বাড়ি যেতে দেবে? পালকিতে মুখোমুখি হয়ে উনি বসেছিলেন, তবু আমার চোখের জল কোনোই বাধা মানতে চাইছিল না। পালকিতে বসবার আনন্দ রইল দূরে। দাদা বোধহয় আমার অবস্থা ঠিক লক্ষ্য করছিল, কেন-না সে আমার কাছে এসে বলল, "যমু, পাগল টাগল হয়েছিস নাকি? পালকিতে কার সামনে বসেছিস মনে নেই?" দাদার সে কথা শোনামাত্র উনি দাদাকে আস্তে আস্তে বললেন, "বা! গণপত রাও, এমন সময় কি কেউ বকে? পালকিতে পর কেউ নেই।" সেই কথা শুনে আমার তখন কি মনে হল তা প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু আমার কান্না থামল।

বরবধূযাত্রা শ্বশুরবাড়ি পৌঁছলে যে-সব আচার-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সে সব হল। নাম রাখা হল। তারা আমার নতুন নাম রাখল সীতা।[১] আমার এই নতুন নাম থেকে ওঁর নামটা নিশ্চয়ই সকলে জানতে পারবে। তাই আমাদের পুরোনো রীতি-রেওয়াজ ছেড়ে নির্ভীকভাবে সেটা লিখবার দরকার নেই। দরজার গোড়ায় বেশ বড় একটা শস্তভরা পাত্র রাখে,

১ মহারাষ্ট্রে মেয়েদের বিয়ের পরে, শ্বশুরবাড়িতে অন্য নাম রাখে। আজকাল কেউ কেউ সেই বাপের বাড়ির নামই আবার রাখে, ছেলেবেলার নাম পরিবর্তন করে না।

আর সেটা পা দিয়ে ঠেলে ঘরময় শস্য ছড়িয়ে বধূ ঘরে প্রবেশ করে, তারপর আবার বধূ দু'হাতে সেই পাত্র থেকে শস্য বার করে পাত্র খালি করে, আর শাশুড়ী সেটা আবার ভরে। এ কাজে কে ক্লান্ত হয় তাই সকলে দেখতে চায়। তখন আমি আমার যত সাহস সব দেখিয়েছি, মোটেই ছাড়িনি। তারপরে বধূর এঁটো দুধ বর খায়, তখন তো খুব মজা হল। উনি যখন আমার এঁটো দুধ খাচ্ছিলেন, তখন ওঁর বন্ধুরা তাড়াতাড়ি বলল, "ওহে মশাই, কার মেয়ের এঁটো দুধ অত আনন্দে চেটে চেটে খাচ্ছেন?" অমনি উনিও পাশের বন্ধুকে আস্তে উত্তর দিলেন, "যার সঙ্গে আমার জন্মের মতো বন্ধন হয়েছে, তার এঁটো খাচ্ছি ভাই।" বণুঠাকুরঝি তা শুনতে পেয়ে অমনি ধানাই পানাই আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু উনি মিষ্টি কথায় তাকে চুপ করতে বলাতে, সে শান্ত হয়ে চুপ করে রইল।

এই রকম সব আচার-অনুষ্ঠান শেষ হলে উনি উঠে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বারু ঠাকুরঝি আঁচলে বাঁধা গাঁট ধরে নাম বলাবার আগ্রহ করতে লাগল। অমনি ওঁর বন্ধুরাও তাই ধরে বসল। ইতস্ততঃ করতে করতে উনি সকলকে আমার নাম শোনালেন। তারপর আমিও ওঁর নাম বললাম। তারপরে আমাদের বাড়ির সবাই বাড়ি ফিরে যেতে রওনা হল। ততক্ষণে আর সকলে চলে গিয়েছিল, শুধু মেয়েরা যায়নি। তাদেরও কয়েকজন চলে গিয়েছিল; কেবল আমার এক মাসিমা আর মা (মা আজ এ বাড়ি এসেছিলেন) এখনো যাননি। তাঁরা যখন বেরোলেন, তখন আমার কান্না একেবারে উপ্‌ছে উপ্‌ছে আসতে লাগল। সে কান্না যেন আর থামতেই চাইছিল না। মা অনেক করে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, বারবার বললেন, "আজ এখন তোকে নিয়ে যেতে পারব না, কালকে নিয়ে যাব।" আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমি পাগলি শুধু ভাবছিলাম যে এখন আমি জন্মের মতো বাপ-মার বাড়িছাড়া হয়ে পড়লাম। শেষে মামীশাশুড়ি যখন বকলেন, "যাবি তো যা, বেরো", তখন আমি চুপ করলাম। মা আমার মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, "দুর্গীকে রেখে যাচ্ছি মা, তোর সহচরী বলে।" এই বলে মা সব ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। তখন মার চোখেও জল এসেছিল, কিন্তু তিনি যে কেমন করে তা রোধ করেছিলেন, তা তিনিই জানেন।

শেষে নিরাশ হয়ে, এতক্ষণ কান্নাকাটি করার জন্য সকলের নিন্দা শুনে আর বকুনি খেয়ে (অতবড় গাধা মেয়ে, আদর করে মাথায় চাপিয়ে রেখেছে। বাড়িতে থাকলেই হত, বিয়ে কেন দিল? ইত্যাদি কথা তারা বলছিল) তারা যেখানে শুতে বলল, সেখানে গিয়ে দুর্গীর গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। তবুও মন আমার কাঁদছিল! সেদিনকার সেই ঘুম! যেন এক স্বপ্ন শেষ হয়ে অন্য স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করবার আগে-কার ঘুম! ছেলেবেলা থেকে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত আমার জীবনকাল যেন এক স্বপ্নই হয়ে গেল! আর আজ আমি ভাবছি যে সেদিন থেকে অন্য এক স্বপ্নের আরম্ভ হল।

মোট কথা, আমার জীবনের এক ভাগ এই খানে শেষ হয়ে দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হল, এটাই সত্যি!

মেয়ের বিয়ের পরে তার মা-বাবার মুখে আর তার বাপের বাড়ির সকলের মুখে যে-ধরনের কথা ফুটে ওঠে তা কি কেউ আজ পর্যন্ত শোনে নি! আমাদের ধারণা যে "পাপের ফলেই কোলে মেয়ে জন্মায়!" একথা সত্যি কিনা এই প্রশ্ন করে কেউ যদি তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করে, অনেকেই "কক্ষণো না, কন্যাদানের মতো মহৎ পুণ্য নেই বলে" নাছোড়-বান্দার মতো যাচ্ছেতাই বিবাদ করবে। কিন্তু মেয়ের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকলের মুখে সময়ে সময়ে যে মতামত বার হয়, সেসবগুলির সংকলন করে পড়ে দেখলে মেয়েকে পাপের ফল বলে মানা হয়েছে কিনা তার মীমাংসা হতে পারে। আমার জন্মের সময়ে কার কার মুখে কোন কোন ভাষা বেরিয়েছিল তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি যখন আন্দাজ আট বছর বয়সের, তখন থেকে শুনছি "ওহে, এরা মেয়ে নয়, ছোরা, কাটারী!" "ভালোয় ভালোয় একবার বাড়ি থেকে গেলে হয়!" "এরা যে দেনা গো!" "এরা কর্জদারণী!" "একেবারে শ' দুশো চার শো টাকা বাড়ি থেকে বার করে তবে বেরুবে।" "এরা ঘর ধুয়ে নিয়ে যাবে।" এরকম বিভিন্ন কথা কখনো রাগের মুখে, কখনো বা হাসিখুশির সময় সকলের মুখে শুনতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে সবগুলির অর্থ একই যে, "কোনো মেয়ে থাকা মানে মহৎ পাপকেই কোলে করে বসা জেনো।" পরিবারে দুই-একটি মেয়ে বেশি হলেই—"ছুঁড়ি" এই সুন্দর ও সম্মানজনক (?) নামে তাদের ভূষিত না করে কেউ ছাড়ে না। বিয়ের চেষ্টা শুরু হলে, সম্বন্ধ ঠিক হতে যদি কোনো

বাধা হয়, তাহলে অমনি পদে পদে শুনতে হয়, "ছুঁড়িটার কপালদোষ"। বিয়ে হয়ে সে শ্বশুরবাড়ি গেলে, বাপের বাড়ির সকলের মুখ থেকে ওরকমের স্বস্তিবাচন অবশ্য কম হয়, কিন্তু আমরা মেয়েরা বিয়ের পর যে সব কথা শুনতে পাই, তার বর্ণনা করার জো নেই। কিন্তু আমি এ কী করছি? আমার সত্যি যা অভ্যেস! মনে চিন্তা আসতে না আসতেই—অবশ্য তেমন কারণ থাকে তাই সে-চিন্তা আসে—মুখ খুলে তা বলে না ফেলে থাকতে পারি না। আমার মতন আর সব মেয়েদের বিষয় না ভেবে, নিজেরটা দেখি, সেই ভালো। আমার অবস্থা থেকেই আর সকলের হাল বোঝা যাবে।

আমার বিয়ে তো হল। বাবা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা আর মা পর্যন্ত বলতে লাগলেন যে তাঁদের একটি বোঝা নামল। আমার বিয়ে হল বলে সকলের বড আনন্দ হল। অবশ্য প্রত্যেকের আনন্দের কারণ আলাদা আলাদা ছিল। ঠাকুরদা আর ঠাকুমা তাঁদের নাতনীর বিয়ে তাঁদের চোখের সামনে, যথাসমারোহে তাঁদের মনোমতভাবে আর অবিলম্বে হল তাই আনন্দবোধ করেছিলেন। ঠাকুমার আবার বিশেষ আনন্দ হচ্ছিল, কেন না, তিনি ভাবছিলেন যে মন্দিরের মহিলাবন্ধুদের কাছে রক্ষে পেয়েছেন। তারা আর তাঁকে জ্বালাতন করবে না। "নাতনীর বিয়ে দিচ্ছেন কবে? বেশ বড় দেখাচ্ছে যে!" ইত্যাদি প্রশ্ন আর তাঁকে শুনতে হবে না। বিয়ের দু-চারদিন পরেই তিনি আমাকে গয়নাগাঁটি পরিয়ে তুলসীবাগে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রত্যেক মহিলার পায়ে পড়তে পডতে আমার কোমরে ব্যথা করতে লাগল! "যমুর বিয়ে তো হল, আমরা নিস্তার পেলাম। বোঝা খালাস হল। গয়নাগাঁটি বেশি নেই, কিন্তু একেবারে পরায়নি তা নয়; তা ছাড়া—সকলের কপালে কি আর গয়নাগাঁটি জোটে?" ইত্যাদি কথা শুনে শুনে কান বধির হল। যেই কোনো নতুন মহিলা আসছিলেন, অমনি ঠাকুমা আমাকে উঠে তাকে নমস্কার করতে বলছিলেন। আর ততবার বিয়ের কথা নামতার মতো মুখস্ত বলছিলেন। আর শেষে, গয়নাগাঁটি বেশি নেই, আর তাদের বাড়ির লোক বেশ একটু কর্কশ ধরনের বলে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। তাতেও আবার সে-বাড়ির সকলের কড়া স্বভাবের চেয়ে গয়নার অভাবের উল্লেখ বেশি থাকছিল। তারপর মহিলারা যে-যার স্বভাব মতো সমালোচনা করছিলেন।

কেউ বলছিলেন, "ওমা! অত টাকা যৌতুক নিয়ে আর অত আদর আতিথ্য করেও মেয়েকে গয়না পরায় নি? তবে কী দেখে মেয়ে দিলেন?" সে কথা শুনে ঠাকুমার ভারি দুঃখ হচ্ছিল, আর তিনি মুখ ভার করে আমার দিকে চেয়ে বলছিলেন, "সব দেখে-শুনে দিতে পারি এমন ক্ষমতা কি আমাদের আছে! যখন যা হবার তা কি আমরা এড়াতে পারি? আমাদের পক্ষে আমরা তো কিছু মন্দ দেখিনি!" অন্য কোনো সন্তুষ্ট স্বভাবের মহিলা বলছিলেন—"বেশ হয়েছে ঠাকুমা, আপনার বোঝা হাল্‌কা হল, ভালোই হল। গয়না, গয়নাই বা এমন কী? কাল পরশু ছেলেটার বিত্তেবুদ্ধি হবে, আর টাকাকড়ি কামাই করতে আরম্ভ করলে পরে, ধন সম্পত্তির লুট লেগে যাবে, আর তখন যত ইচ্ছে গয়না পরাবে। অংশীদারও তো কেউ নেই। আপনি মিছিমিছি কেন দুঃখ করছেন?" আর কেউ অন্য কিছু বলছিলেন।

যাই হোক, আমার বিয়ে হয়ে যাওয়াতে ঠাকুমা একরকম শান্তি পেলেন। দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যে মাও শান্তিলাভ করেছিলেন। তিনি ভাবতেন নিজের চোখের সামনে মেয়েটার বিয়ে হলেই ভালো। আর সেদিন রাত্তিরে বাবা যেমনটি আশ্বাস দিয়েছিলেন সেই মতো সব ভালোয় ভালোয় চুকে গেল, তাই সত্যি তাঁর অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল। মার মন বড় গভীর ছিল, তাই সত্যি তিনি কী মনে করেছিলেন, তা বাইরে ততটা দেখতে পাওয়া গেল না; কিন্তু তাঁর যদি খুবই আনন্দ হয়ে থাকে তবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! স্বাভাবিকভাবেই তিনি ঠিক মনে করতেন যে, তিনি আর শুধু তিন-চার মাস থাকবেন। তাই, নিদেন অত বড় মেয়েটির বিয়ে নিজের চোখের সামনে হয়ে গেল, এবং পাত্রটি মনের মতো হওয়ায় তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্পষ্টই বললেন, "এখন আমি মরলেও খেদ নেই।"

মার অত সন্তোষ দেখে বাবাও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কেন না, আমি আগেই বলেছি, বাবা আগে যদিও গরম মেজাজের লোক ছিলেন, ইদানীং তিনি মার সঙ্গে সত্যি ভালো ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর কোনো ইচ্ছা জানতে পারলেই অমনি সেটা পূরণ করে ফেলতেন। আর এমন আশ্চর্য যে, আজকাল তিনি দাদার আর আমার সঙ্গেও আগের চেয়ে খুব কম নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। বোধ হয় আমরা একটু বড় হয়ে উঠেছিলাম তাই, কিম্বা হয়তো বাবা বেশ খানিকটা বদলে গিয়েছিলেন

তাই, আমরা আর তাঁকে আগের মতো ভয় করতাম না। আগে আগে তিনি যেখানে বসতেন, সেখান দিয়ে অন্য দিকে গেলেই সাক্ষাৎ মরণ আর কি! তাঁর কাছ থেকে কোনো জিনিস আনতে হলে যা মারামারির ব্যাপার হত! বুকের ওপর মস্ত বড় পাথর রাখলে যেমন দশা হয়, বাবার কাছে যাবার সময় আমাদের তেমনি দশা হত। কিন্তু সে সব এখন বদলে গেল। আমরা বাবাকে খুব কম ভয় করতে লাগলাম। সুন্দরী তো তাঁর গায়ে, কোলে গড়াগড়ি পর্যন্ত দিতে লাগল। হঠাৎ কোনোদিন জমদগ্নির অবতার আবির্ভূত হলে সকলে ভয়ে জড়সড় হতাম, কিন্তু সে অবস্থা বেশিক্ষণ টিকত না। তাতেও মা কিছু বললে বেশ শীগগির বাবার মাথা ঠাণ্ডা হত। আমার মনে হচ্ছে, বাবার মূল স্বভাবই খুব প্রেমময় আর কোমল ছিল, কিম্বা মার বুদ্ধিমত্তার ফলে তা পরে তেমন হয়েছিল। কেন না, দিনে দিনে বাবার স্বভাব খুবই বদলে যাচ্ছিল। তবে কি তার মনে হত যে, তিনি একদিন এমন সতীসাধ্বীকে মিছিমিছি জ্বালাতন করেছিলন? নিশ্চয় তাই। না হলে ওঁর স্বভাবের অত পরিবর্তন হতে পারে না। আর পরে যে-সব ঘটনা আমি চোখের উপর দেখতে পেলাম, বাবার মুখে যে-সব কথা শুনতে পেলাম, তা শুনে আমার মনে কোনো সন্দেহই রইল না।

বিয়ের পরে সাত-আট দিনের মধ্যে বিয়েবাড়ির লোকজন যে-যার ঘরে চলে গেল। আমার মাসিমাদের একজনকে আরও কিছুদিন থাকার জন্য মা খুব অনুরোধ করলেন, শেষে একেবারে ধরা গলায় মা বললেন, "গোদু, আর তোতে-আমাতে দেখা হবার কোন আশাই যে নেই বোন!" কথা বলতে বলতে মার চোখ ছলছল করতে লাগল। কিন্তু এমন আশ্চর্য, আমার মাসিমা থাকতে রাজি হলেন না। সত্যি বলতে গেলে, থাকতে তাঁর কোনো বাধা ছিল না, বাড়িতে তিনি অনেকটা স্বাধীন ছিলেন। তিনি যদি লিখে পাঠাতেন যে, "অমুক কারণে আমি অনেকদিন থাকছি," তা হলে তাঁর স্বামী কিছুতেই কোনো আপত্তি তুলতেন না। কিন্তু তিনি, "আমি এখানে পেরে উঠছিনে" বলে, মার অত অনুরোধ অগ্রাহ্য করে চলে গেলেন। পরে জানতে পেরেছিলাম যে অতবড় বিয়েতে কেউ নাকি তাকে বিশেষ ভাবে দেখাশোনা করে নি, তাঁর মান বজায় রাখে নি, তাই তিনি রাগ করে চলে গিয়েছিলেন। একথা যখন জানতে পেলাম, তখন

তাঁর "এখানে আমি পেরে উঠছিনে" এই উত্তরের মর্ম আমরা বুঝতে পারলাম।

কেউ কেউ যেন কেমনতরো মানুষ! মাসিমার মানসম্মান কি কম হয়েছিল? সবকিছু করবার সময় ঠাকুমা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, তাঁর মত নিয়েই করতেন। দুর্গীর মা পর হলেও তাকে সকলে মানতো আর মাসিমাকে অত মানতো না মনে করে মাসিমার অত দুঃখ হয়েছিল। এ একটা আশ্চর্য নয় কি? যাবার সময় তিনি একেবারে অসন্তুষ্ট মনে গেলেন। মা আর দুর্গীর মার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠাকুমা মাসিমাকে ভালো শাড়ি, আর মেয়েদের বড় বড় আর দামি খণ, তা ছাড়া যাওয়া-আসার খরচ সব দিয়েছিলেন, তবু তিনি মুখ বাঁকা করে রুষ্ট হয়েই গিয়েছিলেন। দাদা তাঁকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল, তার কাছে মাসিমা নিজের যত রাগ সব প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সব রাগ ছিল দুর্গীর মা-র উপর। "তোমাদের বাড়িতে ওর যা মান, তা যখন আমার নেই, তখন এখানে থাকারই বা কি দরকার? দূরে আছি এই বেশ!" এই রকম অনেক খোঁচাওলা কথা তিনি বলেছিলেন। মনে মনে যদি বা তিনি কিছু ভেবেছিলেন, তবু তা প্রকাশ না করে, যাবার সময় চুপ করে গেলে মন্দ কি হত? কিন্তু তিনি দাদাকে সব নামতা শোনালেন! দাদা অবশ্য সেসব মাকে বলল। কিন্তু এমন আশ্চর্য যে, বিয়েতে গোছু মাসিমার আচরণ এত শান্ত আর হাসিখুশি ছিল যে সকলে মনে করত তার মতো লক্ষ্মী মেয়ে আর কেউ থাকতে পারে না। 'গোছু মাসিমা, এটা করব?" অমনি গোছুমাসিমা বলতেন, "হ্যাঁ"। "ওটা করে দরকার নেই তো?" তবু "হ্যাঁ"। আর শেষে যাবার বেলা এই রকম! মানে মানুষের স্বভাব বুঝতে পারা দুঃসাধ্য।

আর সেই দ্বিতীয় মাসিমা—সখুমাসিমা—তাঁর স্বভাব বাইরে একটু কর্কশ মনে হত, বিয়েতে ঝগড়া-টগড়ার সময় তিনি এগিয়ে আসতেন, কিন্তু যাবার সময়ে শান্তভাবে হাসিমুখে গেলেন। শুধু তাই নয়। "আর কবে যে তোকে দেখতে পাব" বলে, মার গলা জড়িয়ে তাঁর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। কোনো মতে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে, মা তাঁকে রওনা করে দিলেন। মার কাছে কিছুদিন থাকতে তাঁর ভারি ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন পরাধীন, শাশুড়ী আর স্বামীর অধীন—তাই তাঁকে অনুরোধ করা

অসম্ভব ছিল। তবু সখুমাসি মাকে বার বার বলেছিলেন, "তুই একটা চিঠি লিখে দেখ।" কিন্তু মা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, "তুই বোন এখনকার মতো ফিরে যা, সেই ভালো। তোকে অবিলম্বে ফিরে যাবার শর্তেই তো তারা এখানে পাঠিয়েছে। কিছু দিন যাক্, তারপরে তাদের আবার লিখে পাঠাবো, আর যদি পাঠায়, তাহলে আবার তোকে নিয়ে আসব'খন।" একথা এত বিস্তৃতভাবে লেখার কারণ মনুষ্য স্বভাবের একটি নমুনা বর্ণনা করা। গোদুমাসি মার নিজের বোন, কিন্তু তিনি অমন নিষ্ঠুরের মতো কথা বলে চলে গেলেন। আর দুর্গীর মা বাইরে অত কর্কশ হলে কি হবে, আমার মার সঙ্গে বোনের সম্পর্ক পাতিয়ে, সব বিষয়ে তাঁর কথা মতো চলত। একেবারে যেন তাঁর সেবায় রত ছিল। আমার বিয়ের পরে—না, আগের একটি পরিচ্ছদে যেদিন আমরা বিনুনি করতে বসে-ছিলাম তখনকার সে ঘটনাটি বলেছি—তখন দুর্গীর মা আর আমার মার মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, সেই থেকে দুর্গীর মা আমার মাকে গভীর ভাবে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিল। যেই খবর পেত যে, মার একটু মাথা ধরেছে, বাড়িতে যে-কোনো কাজ থাকুক না কেন, তা ফেলে অমনি সে ছুটে এসে মার দেখাশোনা করে যেত। পাড়া-প্রতিবেশীরা ঠাট্টা করে বলত, "যশোদা কাকীমা, কী ভাগ্যেই না ও তোমার কাছে পোষ মেনেছে।"

কিন্তু আমার মার অমন মিষ্টিস্বভাবে মুগ্ধ না হয়ে কি কেউ থাকতে পারত? গোদুমাসিমার মতো কঠোরস্বভাবের মানুষের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। কিন্তু যার হৃদয় আছে সে আমার মাকে শ্রদ্ধা না করে কক্ষণো পারত না। মোট কথা, বিয়েবাড়ির সকলে কেউ হাসিমুখে, কেউ রাগ করে নিজের নিজের বাড়ি ফিরে গেল।

মার মৃত্যু

সকলে বাড়ি ফিরে যাবার পর মার শরীর বেশ ভালো ছিল। মানে এত ভালো ছিল যে আমরা আশা করতে লাগলাম যে তিনি সেরে উঠবেন। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর শরীর কিছু দিন ভালো থাকলেও অল্পদিনেই আবার বেশি খারাপ হয়ে যায়। বর্ষাকালে কোনো দিন উজ্জ্বল সূর্যরশ্মি দেখলে 'এখন বেশ রোদ পড়বে' মনে করা, আর যক্ষ্মারোগীর শরীর একদিন ভালো দেখে তার অসুখ সেরে যাবে আশা করা, দুই-ই সমান নিষ্ফল। সে রোগীর শরীর একটু ভালো দেখতে পেলে, লক্ষণ ভালো নয় মনে করে বেশি সতর্ক থাকাই উচিত। কিন্তু আমার মার বেলা একেবারে আলাদা হল। নিজে বেঁচে থাকতে মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে দেখে তিনি যেন এক রকম নবজীবন পেয়েছিলেন। আমরা তা ভালোই মনে করলাম। তাঁর যে অসুখ তা যেন আমরা একেবারে ভুলেই গেলাম। কিন্তু ঠিক পোনর দিনের মধ্যেই—হাঁ ঠিক পোনর দিনের দিনই—কেননা, তার পরের পরের দিন বিয়ের 'ষোল-দিন-উৎসব' ছিল—মার এত জ্বর হল যে, তাঁর গায়ে হাত দিলে হাত যেন পুড়ে যাচ্ছিল।

আজ কত কাল ধরে মার অসুখ। কত বার তাঁর জ্বর হয়েছিল। কিন্তু এ জ্বর যেন কেমনতরো আলাদা ধরনের। কখনো মনে হত যে জ্বর একেবারে নেই, অমনি আবার এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টার মধ্যে ভয়ানক জ্বর হত। সে যে কী ভয়ানক জ্বর তা বলতেও পারছি নে। বাবার একজন বন্ধু ডাক্তার ছিলেন, তিনি দিনের মধ্যে চার-পাঁচ বার এসে মাকে দেখে যেতেন। তিনি নানা রকমের ওষুধ দিলেন। এ দিয়ে জ্বর কম হচ্ছে না, সেটা দাও, সেটাতে কম হচ্ছে না, অন্য একটা দেওয়া যাক্। দাদা কেবল ওষুধ আনছিল, আর—ঠাকুমার আর মার বারণ অগ্রাহ্য করে মাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছিল। সাত দিন এমন অবস্থায় কেটে গেল। ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে উনি বলতেন, "এতো দুষ্ট জ্বর নয়, এ সাধারণ জ্বর।" আর এদিকে ওষুধে কোনো ফল হচ্ছিল না। এই রকম চলছিল। সাত দিনের দিন আমরা সবাই তাঁর চার পাশে শুয়ে আছি। বাবা সেদিন একটু ঘরের

বাইরে শুয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল যে মাও একটু ঘুমিয়েছেন। এমন সময় হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে, চীৎকার করে মা বললেন, "ওগো, ওগো, একটি বার শেষের মতো আমার কাছে আসবে? দেখ, পরশু দিন আমি নিশ্চয় চললাম।" সে ডাক শুনে বাবা ধড়ফড় করে উঠলেন। আমিও জেগে উঠলাম। দাদা বোধ হয় জেগেই ছিল। বাবা তাড়াতাড়ি মার কাছে গেলেন—আর তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কেন ডাকলে?" কিন্তু তারপরে মা একটি কথাও বললেন না। একদম বাবার হাত দূরে ঠেলে দিয়ে ধপাস করে বিছানায় পড়ে গেলেন।

মা নিশ্চয় অজ্ঞান হয়েই পড়েছিলেন, কেননা বাবা তাঁকে কতোবার নাড়লেন কিন্তু তিনি অসাড় হয়ে পড়ে রইলেন। গোলমাল শুনতে পেয়ে দুর্গীর মা আর ঠাকুমা দু'জনে ছুটে এলেন। তাঁরাও মাকে কতবার ডাকলেন, কিন্তু মা মোটেই সাড়া দিলেন না। ঠাকুমা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমিও কাঁদতে লাগলাম। সুন্দরী আমার কাছেই শুয়েছিল, সে আঁৎকে উঠে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। সে কী ব্যাপার আর কিসের গোলমাল তা সে কিছুই বুঝতে পারেনি। দাদা বেচারা মার কাছে বসে 'মা মা' করছিল। তার গলা এত ভারী শোনাচ্ছিল যে তা আমি কখনো ভুলতে পারব না! বাবা একেবারে পাগলের মতো হয়েছিলেন। শেষে দুর্গীর মা ঠাকুমা সকলকে সাহস দিলেন, আর দুর্গীর মা শুকনো আদা ঘসে সেই অঞ্জন ওর আঙুল দিয়ে মার চোখে বুলিয়ে দিলেন, অমনি মা জেগে উঠে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। আর পাশ ফিরেই চারিদিকে আমাদের সকলকে দেখতে পেলেন। বাবা একেবারে তাঁর পাশে ছিলেন। ঠাকুমা ও ঠাকুরদাও সেখানেই ছিলেন। যেই মার জ্ঞান ফিরে এল, অমনি তিনি এদিকে সেদিকে চেয়ে দেখলেন, আর বাবার দিকে নজর পড়ামাত্র তাড়াতাড়ি বললেন, "ও কী, ছি ছি! এত সব বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে আমার এত কাছে, একেবারে ঘেঁষে বসেছো?" মার মুখে একথা বেরুতেই অমনি বাবার চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। আর তিনি ধরা গলায় বললেন, "আমায় ডেকেছিলে তো তুমি!"

"কে, আমি?"

"হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ, আমি কেন কাউকে ডাকতে যাব? বেশ তো! অমনি বলে

দিলেই হল! বাবা কী বলবেন? মা কী বলবেন? ওঁরা কি মনে করবেন না যে, আমরা একেবারে লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছি?"

সে কথা শুনে ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি বললেন, "না, না, মা, আমি তোমায় কিছু বলব না, কেউ তোমাকে কিচ্ছু বলবে না।"

"সে যাই হোক। কিন্তু এমন করে বসলে ভালো দেখায় না। বহিনা কাকিমা, বলুন তো আমার কথা সত্যি কি না? ওগো, ওঠো তবে এখান থেকে, আর বাইরে গিয়ে বসো গে।"

তাই শুনে বাবা চুপ করে উঠলেন, আর চোখ মুছতে মুছতে, অপর দিকে আমার বিছানা পাতা ছিল তার উপরে গিয়ে বসলেন। কিন্তু দেখা গেল যে তবুও মার মনের মতো হল না। কেন না তিনি আবার তাড়াতাড়ি বললেন, "এখানে কেন বসলে, অত কাছে? একেবারে বাইরে গিয়ে বসোগে, যাও।"

মা যখন এই কথা বললেন, তখন কিন্তু ঠাকুরদা মনে করলেন যে মার অবস্থা সাধারণ নয়, তিনি নিশ্চয় প্রলাপ বকছেন। যিনি কখনো লোকের সামনে উঁচু স্বরে কথাটি বলেন না, তিনি যখন বাবাকে সকলের সামনে মুখোমুখি অত কথা বলছেন, তখন তাঁর অসুখের নিশ্চয় বাড়াবাড়ি হয়েছে। তিনি সে কথা বাবাকে প্রকাশ করে বললেন। বাবা দাদার দিকে চাইলেন, অমনি দাদা তাড়াতাড়ি বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, "ডাক্তার বাবুকে—মাধবরাও ডাক্তার বাবুর ওখানে যাব? ওঁকে নিয়ে আসব?" আর বাবা যেই "হ্যাঁ" বললেন, অমনি সে তীরের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এদিকে মার প্রলাপ আর আমাদের কান্না চলছিলই। ততক্ষণে আবার ক্লান্ত হয়ে মা অজ্ঞান, অসাড় হয়ে পড়লেন। তাঁর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। আবার সকলে তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁকে ডাকতে লাগল। এবার আমি সুন্দরীকে ফেলে রেখে, একেবারে তাঁর পাশে গেলাম, আর দেখতে পেলাম যে তিনি একেবারে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছেন। আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে 'মা মা' করে কত ডাকলাম। কিন্তু কী করি? বার বার ডেকেও তাঁর সাড়া পাচ্ছিলাম না। তিনি একেবারে কাঠ হয়ে পড়ে ছিলেন। শেষকালে ডাক্তারবাবু এসে আমাদের সকলকে, "ভয় করো না, ভয় করো না" বলতে বলতে মার নাড়ী দেখলেন। আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর সেই রোগী পরীক্ষা দেখছিলাম আর তাঁর কথা

শুনছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সেই পরীক্ষা চলল, যেন তার শেষ নেই। তিনি নাড়ী দেখলেন, বুক দেখলেন, মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন আর শেষে বললেন, "কোনো ভয় নেই, এক্ষুনি জাগবেন উনি। তোমরা সবাই একটু বাইরে যাও তো।"

তাঁর এই কথা শুনে আমার বুকের মধ্য কেমন যেন ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। বাইরে যেতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না, মন বলছিল "মোটেই বাইরে যাব না।" কিন্তু উপায় কী? ঠাকুমাকেও তিনি বাইরে যেতে বললেন।

"ওর কাছ থেকে এখন আর আমাকে দূরে থাকতে বলবেন না ডাক্তার-বাবু! কী হবে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমাকে শুধু ওর পাশে বসতে দিন।" এই বলে ঠাকুমা দীনের মতো অনুরোধ করতে লাগলেন। তাই দেখে জোর পেয়ে আমিও চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

তখন ডাক্তার ঠাকুমার দিকে ঘুরে বললেন, "দেখলেন, এইজন্য আমি আপনাকে বাইরে যেতে বলেছিলাম। আপনি একেবারে ভয় করবেন না, আমার কথা শুনুন।"

তখন ঠাকুমা বেচারী আর কি করবেন? দুর্গার মা তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। আমাকেও তাঁর সঙ্গে বাইরে যেতে হল। সুন্দরী কাঁদতে কাঁদতে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘরে দাদা, বাবা, ঠাকুরদা, দুর্গার ঠাকুমা, ডাক্তারবাবু ছাড়া আর কেউ রইল না। মা সেই তেমনি পড়ে রয়েছিলেন, একটু শব্দও করছিলেন না। তাই, এবার তিনি জেগে উঠেছেন কিনা, সকলে উতলা হয়ে চেয়ে দেখছিল। আমি ভাবছিলাম যে তিনি নিশ্চয় জাগবেন, তাঁর জ্ঞান ফিরে আসবে, কিন্তু আর সকলে কি ভাবছিল কী জানি! তাদের চেহারাতে নিরাশা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আমার কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছিল যে তিনি জাগবেন, তাই আমি কি থাকতে পারি? বাইরে আসা অবধি আমি চারবার দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে আর কান পেতে রইলাম। শুনতে পেলাম যে, ডাক্তারবাবু বলছেন, "আর কোনো আশা নেই তা তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একটা উপায় আছে, সেটা চেষ্টা করে দেখা যাক। আপনি অধীর হবেন না।" কিন্তু তাঁর কথার কোনো অর্থ ছিল, মনে হল না। তিনি কী উপায় করলেন আমি জানতে পারিনি; কিন্তু

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন মানে শুধু এই যে মা আবার কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু আবার তিনি সেই আগেকার মতোই কেমন যেন জোরে কথা বলতে লাগলেন। আর মাঝে মাঝে কোনো কোনো শব্দ কেমন যেন অদ্ভুত রকমে উচ্চারণ করতে লাগলেন। আবার যে প্রলাপ বকছিলেন সে বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ রইল না। মার কথার সবটাই ছিল বেশ স্পষ্ট, শুধু কোনো কোনো শব্দ মুখের ভিতর আটকে যাচ্ছিল। ডাক্তার যখন ওষুধ দিলেন, তখন "আর আমি ডাক্তারের ওষুধ খাব না" বলে জোর করে ওষুধটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তখন দুর্গার মা তাঁকে বললেন, "ও কী! যশোদাবাই, ওষুধ না খেলে সেরে উঠবেন কী করে?"

মা বললেন, "ওগো, আমার কী হয়েছে যে আমি ওষুধ খাব?"

"ও কী? এখুনি অজ্ঞান হয়েছিলেন যে!"

"না গো না, আমার প্রাণই উড়ে গিয়েছিল, বাপের বাড়ির প্রাণটা আমার গিয়েছিল, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির প্রাণটা যে যাচ্ছে না, তাই আবার জ্যান্ত হয়েছি। এই বাচ্চাদের জন্যে—আর—আর—" এই বলে তিনি আবার প্রলাপ বকতে লাগলেন। তখন সবাই ঠিক বুঝতে পারল যে, এখনও তাঁর বায়ুর বিকার যায়নি। কখনো তিনি উঠে বসলেন, কখনো ধপাস করে পড়ে গেলেন, আবার উঠে বসলেন। রাত বারোটা পর্যন্ত এই রকম চলল। আমিও তিন-চারটে পর্য্যন্ত জেগেছিলাম—তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল ছ'টার সময় মা জেগে উঠলেন। তখন আগের দিনের বায়ুর প্রকোপ, প্রলাপ সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বেশ ভালো করে কথা বলতে লাগলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে, বেশ বুঝে-সুঝে উত্তর দিতে লাগলেন। তাঁর গায়ে আর একটুও জ্বর ছিল না। সমস্ত দিনটা তাঁর শরীর এমন ছিল যে, সকলে ভাবল, যে আজ তাঁর শরীর বেশ ভালো আছে, কাজেই কোনো ভয় নেই আর।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন আবার জ্বর তেড়ে এল আর সে জ্বর ক্রমেই বেশি হতে লাগল, তখন সবকিছু একেবারে বদলে গেল। সকলে ভাবতে লাগল যে তিনি আর বেশীক্ষণ বাঁচবেন না। সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। ছ'টার সময় তাঁর জ্বর হল, আর বাড়তে বাড়তে দশটার সময় তা একেবারে সাংঘাতিক হল। সে-জ্বরে তাঁর এত গ্লানি হল যে কথা বলতে কিম্বা

এদিককার হাত ওদিকে নাড়াবার মতনও তাঁর আর শক্তি রইল না। বাবা ঘরে যাওয়া-আসা করছিলেন। ঠাকুমা আর ঠাকুরদা তাঁর শিয়রে বসে ছিলেন, দাদা শুধু-শুধুই তাঁর পায়ের কাছে বসেছিল। সুন্দরী ঘুমিয়েছিল, আমি মার পিঠের দিকে বসেছিলাম। আমরা কে কী করছিলাম, কোথায় কোথায় বসেছিলাম, মা তার কিছুই জানতেন না। চোখ খুলে দেখবার শক্তিও ছিল না তাঁর। এমন সময় মাকে কিছু ওষুধ দেবেন মনে করে ঠাকুমা ঘরের ভিতরে গিয়ে একটু মধু আর চন্দনপাটা আনতে বললেন। আমি মার ঘরের বাইরে গেলাম, আর দেখি যে বাবা দেওয়ালের দিকে মুখ করে আস্তে, কিন্তু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বাবার তখনকার সেই চেহারা আমার চিরদিন মনে থাকবে। অত বড় পুরুষ মানুষের চোখ বেয়ে গালের উপর জল গড়িয়ে পড়ছে দেখে কার মন না ব্যথিত হবে? আমি তো ছেলে মানুষই ছিলাম। বাবাকে কাঁদতে দেখে থত-মত খেয়ে আমি পাগলীর মতো সেইখানে থেমে গেলাম, আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা আর কান্না —এ'দুটি যে একেবারে বেখাপ্পা, অসংগত মনে হচ্ছিল। যে কাজ করতে যাচ্ছিলাম, সেটা একেবারে ভুলে গিয়ে, আমি হতবুদ্ধি হয়ে স্থিরভাব তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। অমন করে তাকিয়ে রইলে তিনি রাগ করবেন, তা বোধহয় আমার তখন মনেই আসেনি। আমি অমনি দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় বাবা আমাকে দেখতে পেলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই তিনি চোখ মুছে ফেললেন, আর তাড়াতাড়ি আমাকে বললেন, "যমু, কী মা? অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে?"

"কিছু না, এমনি। আমি মধু আর চন্দনপাটা নিয়ে যেতে এসেছিলাম।" আমি চট্ করে উত্তর দিলাম।

"মধু আর চন্দনপাটা? কেন? কিসের জন্য?"

"ঠাকুমা মাকে ওষুধ দেবেন, তাই।"

আমার এই উত্তর শুনে বাবা চুপ করে রইলেন। আর আমি সেখান থেকে যখন যাচ্ছি তখন তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। যেতে যেতে আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, "আমি অভাগা আর কি ওকে পাব?" সে বিলাপ কত দুঃখে যে তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল, তার কল্পনা তখন যদিও আমি করতে পারিনি, তবু পরে তা ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম।

ঠাকুমাকে চন্দনপাটা দিয়ে আবার আমি মার পিছনে গিয়ে বসলাম।

মা তেমনি শুয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে দুর্গার মা আর তার ঠাকুমাও এলেন। ঠাকুমা কী একটা ঘসে মাকে চাটিয়ে দিলেন। রাত দুপুরে আমি সেইখানে ঢুলে পড়লাম। তারপর আধঘণ্টা খানেক কী হল, তা আমি জানি না। একেবারে ঘুমের ঘোর থেকে দাদা আমাকে ডেকে জাগালো, "যমু, যমু, ওঠ্, মা ডাকছে।"

জ্বর কমে গিয়ে মার গ্লানি কম হয়েছিল, তাই সত্যি মা আমাকে আর দাদাকে ডাকছিলেন। আমি জেগে উঠতেই মা আবার আমাকে ডাকলেন। এখন তো ডাকতেও তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল সে শক্তিও ছিল না। আমি উঠে একেবারে তাঁর কাছে গেলাম। দু'হাত দিয়ে শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরে মা বললেন, "বাছা আমার, তুই যে মাতৃহারা হলি মা। আমি এখন চললাম। গণু, একে আর সুন্দরীকে তোর হাতে সঁপে দিলাম। এদের দেখিস। তুই ভালো ছেলে হস্। এই আমার তোর কাছে শেষ অনুরোধ।" তাঁর একথা শেষ হল আর তিনি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ তিনি অবশ হয়ে রইলেন। তাঁর চোখ বেয়ে অবিরাম জল গড়িয়ে পড়ছিল। আমি আর দাদা কেঁদে সারা হলাম। ঠাকুমা পাগলের মত হয়ে গেলেন। হঠাৎ মা উঠে বসবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "মা, এই বাছাদের এখন যত্ন করুন "—এই বলে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন ঠাকুমা চীৎকার করে কেঁদে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন। ঠাকুরদা সকলকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নিজের চোখ মুছছিলেন। বাবা তো ভিতরে এলেনই না। রাত্তির থেকে তিনি মোটেই ভিতরে আসেননি। তাঁর মন দুঃখে কত আকুল হয়েছিল, তা তিনিই জানেন। শেষে বহিনা কাকী ঠাকুমার হাত ধরে তাঁকে বাইরে নিয়ে গেলেন।

এমন সময় মা দাদাকে কাছে ডেকে বললেন, "ওঁকে ডেকে আন্‌তো।" বাবাকে দাদা ডাকল। তিনি অতি কষ্টে ভিতরে এলেন। ঠাকুরদা চুপ করে উঠে বাইরে চলে গেলেন। বাবা মার কাছে এসেই মাকে ডাকলেন। অমনি মা চোখ খুলে দেখলেন, আর তাড়াতাড়ি বললেন, "আমি চললাম। পরে যা হবার তা হবে, কিন্তু মা আর বাবাকে ত্যাগ করো না, ওঁদের দু'জনকে তুমি বকলে বড় কষ্ট হয়। এই বাছারা এখনো কচি। যমুটার বিয়ে হল, কিন্তু—কী জানি, মেয়েটার বরাত ভালো মনে হচ্ছে না!

ওকে একটু—গণু, এখন বাছা তুই ওকে—বুঝলি? ওমা, মাগো! আর, আর, ওগো, আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, তবে—তবে—তা ভুলে যেও—আর আমার মাথা কোলে তুলে—আমি সুখে মরি—আর আমার কোনো ইচ্ছে"—এর পর তাঁর মুখ ফুটে কথা বেরুনো মুস্কিল হল। বাবা আর সইতে পারছিলেন না, তিনি তাই আর কিছু না ভেবে মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন, আর অমন গম্ভীর পুরুষ, "না, না, আর কিছু বোলো না। আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। এখন তোমায় কী বলি!" এই বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। আর মার কথামতো তাঁর মাথা কোলে তুলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেম—"আর তো তোমাকে পাব না! পাবই বা কী করে!" এমন সময় মা অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বললেন, "মা যমু, একটু জল—" আমি চট করে ঘটির জল ঢেলে নিয়ে তার কাছে গেলাম, অমনি বাবা তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে জলের গেলাশ নিয়ে সেটা মার মুখের কাছে ধরলেন। এক চুমুক জল খেতে না খেতেই, মার ঘাড় বাঁকা হয়ে মাথা ঢুলে পড়ল—আমার প্রেমময়ী মা আমাদের সকলকে ছেড়ে জন্মের মতো বিদায় নিলেন। বাবা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি "মা, মা" করে চীৎকার করতে লাগলাম। আর বাইরে থেকে ঠাকুমা "মা আমার। আমাকে ফেলে রেখে গেল? আমি অভাগিনী, আমার কেন মরণ হল না।" বলে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। এখন আমার চোখে এত জল এসেছে আর তখনকার স্মৃতি মনে পড়ে মন এত ব্যাকুল হয়েছে যে আর এক অক্ষরও লিখতে পারছি না।

স্বপ্ন

সত্যি! আমার মা! যাকে আমরা কত শ্রদ্ধা করতাম, কত ভালো-বাসতাম। আমি যখন থেকে ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছি, তখন থেকে আমি তাঁর আদেশ কেবল আচরণে নয়, মনে মনেও কক্ষনো অগ্রাহ্য করিনি। যিনি নিজের আচরণ আর উপদেশে আমাকে জীবনে সৎপথ দেখিয়ে দিয়ে মায়ের কর্তব্য পালন করেছিলেন, যিনি কক্ষনো কাউকে তাঁর উদ্দেশে কঠোর কথা বলবার সুযোগ দেননি, যাঁকে সর্বদা সকলে ভালোবেসেছিল, সেই মা আমার, আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে, ফেলে রেখে চলে গেলেন! আর কি আমরা এ জীবনে তাঁকে পাব! তাঁর উপদেশ শোনার সৌভাগ্য কোথায়! তাঁর প্রেমময় শিক্ষা আর কি লাভ করতে পারি! মানুষ অন্য কোথাও গেলে, তার ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু একবার যে 'পথের শেষে' চলে গেল তাকে কি আর কখনো দেখতে পাওয়ার আশা করা যায়?

সেদিন আমরা সবাই কত কান্নাই না কাঁদলাম। কত চীৎকার করলাম, কত শোক করলাম, কিন্তু কী ফল তাতে? অবিলম্বে শোক দমন করে বাধ্য হয়ে আমরা তার পরের আয়োজন করতে লাগলাম। যে যায় তাকে আমরা যতই ভালোবাসিনা কেন, একবার তার শরীর থেকে প্রাণ চলে গেলে, মৃতদেহ বাসি হবার আগেই তার মাটির খাঁচা চোখের সামনে থেকে দূরে সরাতে হয়। তখন তার উপরে সব লোভ ছেড়ে দিতে হয়। আর সে সব লোভ-প্রীতি স্বাভাবিক ভাবে নষ্টও হয়।

আমরা তো পৃথিবী-ছাড়া-মানুষ ছিলাম না। তাই, মা শেষ নিঃশ্বাস ফেলতেই যে দুঃখের আবেগ উথলে উঠেছিল, তা আস্তে আস্তে কমে গিয়ে, সকলে লোকরীতি অনুসারে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন করতে লাগল। বাবার অবস্থা কিন্তু খুবই কঠিন হয়েছিল। পুরুষমানুষ হয়েও তাঁর চোখের জল থামতে চাইছিল না। কিন্তু কী করেন! তিনি যে জায়গায় বসে-

ছিলেন, সেইখানেই বসে রইলেন। একটু নড়াচড়াও করলেন না। ঠাকুরদা ধৈর্যশীল হয়ে যারা সবাই জড়ো হয়েছিল তাদের সাহায্য করতে লাগলেন। ঠাকুমার কান্নার কোনো সীমা রইল না। "ওরে হতভাগা, চণ্ডাল কালপুরুষ। আমায় কেন নিয়ে যাস্‌নি? তুই কি ওকেই পছন্দ করলি?" ঠাকুমার এই সব বিলাপ অনবরত শুনে শুনে সকলের হৃদয় আকুল হচ্ছিল। দেহ তুলে নিয়ে যাবার সময় তো তাঁর বায়ুর প্রকোপ হল। তাঁর হাতপা বেঁকে গেল, আর মনে হল যে তাঁর মূর্ছা হবে। তাই দুর্গীর মা আর ঠাকুমা তাড়াতাড়ি তাঁকে সেখান থেকে টেনে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। তবুও তিনি হাত ছাড়িয়ে ছুটে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

বলবার মোট কথা এই যে, ছোট বেলাতেই মাতৃহারা হয়ে আমার যতটা ক্ষতি হয়েছে আর কারো ততটা হয়নি। আমরা ভাই বোনেরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়লাম। দাদা এখন একটু বোঝদার হয়েছিল, আমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সুন্দরীর সবচেয়ে বেশী লোকসান হয়েছিল। সে বেচারীর ভারী দুর্দশা হল। কেন না, সে সর্বক্ষণ মার কাছে কাছে থাকত। মাকে ছেড়ে সে থাকতে পারত না। রাতদিন মার মাথার কাছে, নয়তো মার পায়ের কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকত। এখন কার কাছে কোথায় যাবে? ঠিক সময়ে তাকে ভুলিয়ে দুর্গী কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছিল, তাই সে মা কোথায় গেল-ইত্যাদি বুঝতে পারে নি। কিন্তু সে যে একেবারে অবুঝ ছিল তা নয়। কেন না, যদিও সে মরণ মানে যে কী তা বুঝত না, তবুও সে জিজ্ঞাসা করত, "মা আমাদের সকলকে ছেড়ে একলা কোথায় গেল?" আর কেউ যদি বলত, "অন্য দেশে গেছে", তা হলে সে নিশ্চয় মিথ্যে মনে করে, মুখভার করে কাঁদতে আরম্ভ করত। ততটা সে বুঝতে পারত। তাই বাড়ির আর কেউ সঙ্গে যায়নি, আর একলা মা অদৃশ্য হয়েছে, তখন সে গেছে কোথায়? এই মনে করে সে যখন জিজ্ঞাসা করত, "মা কোথায় গেল?" তখন তাকে যে-কোনো একটা উত্তর দিয়ে শান্ত করা অসাধ্য হত।

মাকে নিয়ে গেলে পরে দুর্গী যখন সুন্দরীকে বাড়িতে নিয়ে এল, তখন সবাই এখানে-ওখানে বসে কাঁদছে দেখে সে সটান মার ঘরে গেল; আর সেখানে মার বিছানা নেই, কিছু নিশানা নেই, সেই জায়গাটা নিকিয়ে সেখানে একটা প্রদীপ রাখা হয়েছে দেখে, আর মাকে কোথাও

দেখতে না পেয়ে, সে সব দিকে 'মা, মা' করে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তাকে ঐ রকম ঘুরে বেড়াতে দেখে আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। ঠাকুমা পাথর হয়ে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন। আমি সেইখানেই একটু দূরে বসে কাঁদছিলাম। বাবা তাঁর ঘরে দু'হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেছিলেন। তিনি একেবারে নড়তে পারছিলেন না। তাই তিনি শ্মশানে যাননি। ঠাকুরদা দাদার সঙ্গে গিয়েছিলেন। দুর্গীর মা আর ঠাকুমা, ঠাকুমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। এমন সময় 'মা মা' বলে ডেকেও মার সাড়া না পেয়ে, আর তাঁকে কোথাও দেখতে না পেয়ে, কাঁদতে কাঁদতে সুন্দরী আমার কাছে এল, আর আমার গলা জড়িয়ে ধরে, "দিদি, মা কোথায়?" বলে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করা আমার পক্ষে বড় কঠিন হল। আমার কান্না যেন ভুলে যেতে হল। কিন্তু সুন্দরী কি ও-ভাবে শান্ত হয়? সে কিছুতেই চুপ করতে চাইছিল না। এমন সময়, বাবা তার কান্না শুনে, আর বোধহয় বিশেষ ব্যাকুল হয়ে, হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। সেই শব্দ শুনতে পেয়ে সুন্দরী তাঁর কাছে গেল, আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "বাবা, মা কোথায়?" তার সে প্রশ্ন শুনে বাবার যে কী দশা হল তা বলতে পারছি না। কেউ কি কখনো ভেবেছিল যে মার মৃত্যুতে বাবার অত দুঃখ হবে? কিন্তু সত্যি তাঁর যে ভারি দুর্দশা হয়েছিল! তিনি চট করে সুন্দরীকে বুকে টেনে নিলেন আর—"সুন্দরী, আয় মা আয়, আর কি তুই এ জীবনে মাকে পাবি?" বলে মেয়েমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। তারপরে কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে, "ওকে আমি একবার শেষের মতো দেখে নিই" বলে বিড় বিড় করতে করতে তিনি ঘরের বাইরে চলে গেলেন। এ দিকে সুন্দরীর কান্না অবিরাম চলছিল। আমি তাকে শান্ত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম। এই রকম ব্যাপার চলছিল।

শেষে দুর্গীর মা আমাদের দুজনকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে গা ধুইয়ে দিলেন। আর অন্য সব কাজ হয়ে প্রথম দিনটা কেটে গেল। আমার মার মৃত্যুতে দুর্গীর মার কত দুঃখ হয়েছিল তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু নিশ্চয় বলতে পারি যে আমাদের বাড়িতে দাদা আর আমি ছাড়া সকলে মাকে ভুলতে পারল, কিন্তু দুর্গীর মা যশোদাবাইকে মনে

করেন নি, এমন একটা দিনও যায়নি। এখনও আমার সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয়, তখনি আমার মার মনে পড়ে তাঁর চোখ ছলছল করে।

মায়ের মৃত্যুর পর তিনদিনের দিন রাত দুপুরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দাদা আমার পাশেই একটু দূরে শুয়েছিল। শুয়েছিল মানে জেগেই ছিল, কেন না, আমার ঘুম ভেঙে আমি নড়াচড়া করতেই, আমি জেগে আছি জানতে পেরে দাদা আমাকে বললে, "যমু, কী, তোর ঘুম আসছে না?" দাদার সে কথা শুনে তেমন সময়েও আমার হাসি পেল। কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ আর বৃদ্ধ পুরুষ মানুষ যেমন করে ছোট ছেলেমেয়েকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, দাদার সেই প্রশ্নটি ঠিক তেমনি আমার মনে হল। আর সত্যি সেদিন থেকে সে বেশ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের মতো [illegible] করতে লাগল। যাক্।

আমার হাসি পেল, কিন্তু দাদাকে তা জানতে দিই নি। "কিছু না, এই এক্ষুণি আমার ঘুম ভেঙেছে", এই বলে আমি চুপ করে রইলাম। তারপরে সেও কিছু বলল না। কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও আমার ঘুম আসছিল না, শুধু এপাশ-ওপাশ করছিলাম। এমনি করে অনেকক্ষণ কাটল। আস্তে আস্তে আমার চোখে ঘুম আসতে লাগল, এমন সময় আমার মনে হল কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ভালো করে কান পেতে শুনে বুঝলাম যে দাদাই কাঁদছে। তাড়াতাড়ি আমি বললাম, "দাদা, দাদা, ও কী?" দাদাকে এই প্রশ্ন করতে অমনি দাদা বলল, "যমু, এখন আমাদের কি দশাই না হবে? এখন বাড়িতে আমাদের কে দেখাশোনা করবে? বেচারী সুন্দরীর কি হবে?" তার সেই আশ্চর্য রকম প্রশ্ন শুনে, আর তাকে কাঁদতে দেখে আমারও হঠাৎ কান্না উপছে এল; আর আমি চেঁচিয়ে কাঁদব, এমন সময় দাদা নিজের কান্না থামিয়ে আমাকে "চুপ কর, চুপ কর" বলে শান্ত করল। আর আস্তে বলল, "কালকে তোকে একটা কথা বলব, জানিস? এখন চুপ কর। তা হলে বলব, নইলে"—

দাদার কথা শেষ হবার আগেই ঠাকুমার ঘুম ভেঙে গেল। কেননা, তিনি একটু দূরেই শুয়েছিলেন। "ও কী! তোদের চোখে কি ঘুম নেই? চুপ করে ঘুমো," ঠাকুমা আমাদের বললেন। বেচারী ঠাকুমা দুদিন ধরে ঘুমোন নি। ঘুম ভাঙার অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর ভোরবেলার গান করতে লাগলেন। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এই ঘুমের

ভিতর, ভোরবেলা পাঁচটা-ছটার সময়, আবার আমার ঘুম ভাঙবার আগে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। সেটা এই—

আমি যেন মার শিয়রের দিকে বসে আছি, মা কী একটা কথা বলছেন আর আমি তা উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনছি। হঠাৎ যা মার কথা বলে মনে হচ্ছিল তা বন্ধ হল, আর দেখতে পেলাম যে, মা হঠাৎ উঠে বসে আমাকে কোলে টেনে নিয়ে, বুকে শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, "যমু, তোর বিয়ে তো হল মা। কিন্তু তোর বরাত যে মোটেই ভালো বলে মনে হচ্ছে না, জানিস। আমি গণুকে বলে রেখেছি, বোধহয তোকে দূরে ঠেলবে না। তাকে জিজ্ঞাসা কর।" এই কথা তাঁর মুখে স্পষ্ট শুনতে পেলাম। এই কথা উচ্চারণ করার সময় তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত মার সে কথা যেন সর্বক্ষণ আমার কানে ঝংকার করছে। একটি দিনের জন্যও মার সে কথা আমি ভুলিনি। সে কথার সত্যি-মিথ্যে আমি যা অনুভব করেছি কিংবা করিনি, তা আমার জীবনীতে স্পষ্টই দেখা যাবে। আপাততঃ আমি এই বলতে চাই যে, সে কথা শুনে আমি চমকে জেগে উঠেছিলাম। তখন থেকে সে কথাগুলি যেন আমার বুকে সব সময় দপ দপ করছে। আমি তখন বড় ছিলাম না। তাই সে কথায় কোনো বুদ্ধিমান মেয়ের মনে যে চিন্তা উৎপন্ন হত, তেমন চিন্তা আমার মনে হয়তো জাগে নি; কিন্তু সত্যি কেমন যেন একটা ভাবনা উৎপন্ন হল।

মনে করেছিলাম যে, স্বপ্নের কথাটা ঠাকুমাকে বলি। আর আমি তা তাঁকে বলতামও নিশ্চয়, কিন্তু ঠাকুমা বিছানা ছেড়ে উঠে সুন্দরীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, তাই ঠাকুমাকে আর তা বলা হল না। কিন্তু দুপুরবেলা কখন যে দাদার সঙ্গে দেখা হবে, আর কখন তাকে সেই স্বপ্ন বলব, এই ভেবে আমি বড় উতলা হয়েছিলাম। ভাগ্যিস, শীগগিরই তেমন সময় হল। একলা দাদার সঙ্গে আড়ালে দেখা করে আমি বললাম, "দাদা, দাদা, কাল রাত্তিরে কি বললি? কী যেন বলবি বলেছিলি? এখন বল না ভাই তা কী?"

দাদা—কিছু না। যমু, মনে করেছিলাম যে বলব, কিন্তু এখন আর কিছু বলব না। এখনো তুই ছোট—

আমি—ও কী ভাই দাদা! তুই নিজেই তো রাত্তিরে বললি যে বলব

আর এখন বলতে চাসনে? কাল রাত্তিরে আমি বড় ছিলাম বুঝি! বলনা দাদা। তা হলে আমিও আমার স্বপ্ন বলব। জানিস্, আজ ভোর বেলা আমি মাকে স্বপ্ন দেখেছি! আর—

দাদা—মাকে দেখেছিস? তোর স্বপ্নে আজ মা এসেছিল? আশ্চর্য!

আমি—কেন, আশ্চর্য কিসের? কিন্তু দাদা বল্না ভাই, বলনা,— কি বলবি বলেছিলি তা!

যখন আমি একথা বলছিলাম তখন দাদার সেদিকে মন ছিল না। সে পাগলের মতো কার দিকে চেয়েছিল। তার চোখে জল দেখতে পাচ্ছিলাম। এমনি করে কিছুক্ষণ কেটে গেলে পর, সে হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে চট করে বলল, "যমু, সত্যি মা আজ তোর স্বপ্নে এসেছিল? না, অমনি যা-তা একটা কিছু আমায় বলছিস? যমু, আর আমি তোর সেই আগেকার দাদা নেই, জানিস? সত্যি যা, তাই আমায় বল। আমি—"

আমি—ও কী দাদা! আমি কি তোকে মিথ্যে কথা বলছি? বেশ তো! নিজেরটা না বলে আমার কথা বার করে নেবার এই যুক্তি বুঝি!

পরে আবার দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আর আগেকার মতো এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ আমাকে বলল, "যমু কী বললি? আজ ভোর বেলা তুই স্বপ্ন দেখলি? মাকে দেখতে পেলি? ভোর বেলা?"

"হ্যাঁ, আজকেই ভোর বেলা। তোতে-আমাতে কথা হয়ে আমি যখন ঘুমোলাম—তখন।"

আমার কথা শুনে দাদা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল শুধু। আর বলল, "হবে, হবে। তাই হতে পারে।" তারপরে আবার চুপ করে রইল। তখন আমিই তাকে বললাম, "দাদা, আমার কথা তোর অত আশ্চর্য কেন মনে হচ্ছে?"

"কিছু না। আমিও সেই ঘুমেই স্বপ্ন দেখেছি, আর মাকে দেখেছি।" তার সে কথা শোনামাত্র আমিও ঠিক তারই মতো এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলাম। আর তাকে মা কী বললেম, তা জানবার জন্য অধীর হয়ে তাড়াতাড়ি বললাম,—

"তোর সঙ্গে মা কথা বলল?"

"কী বলল ?"

"তোকে কী বলল ?"

"তোর কথা আগে বল্, পরে আমি নিশ্চয় বলব।"

"না যমু, তুই আগে বল্! আমি যখন 'বল্‌ব' বলেছি, তখন নিশ্চয় বলব।"

"কালও তো এই বলেছিলি। ঠিক তেমনি বলবি তো ?"

"না, সত্যি, নিশ্চয় বলব।"

"তবে বলছি", এই বলে আমি তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। মাকে দেখতে পেলাম, তাঁকে কেমন দেখাচ্ছিল, কোথায় দেখতে পেলাম, তিনি কী বললেন, ইত্যাদি সব বললাম। আমি বলছিলাম, আর সে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে সে কথা শুন্‌ছিল। বিশেষতঃ আমি যখন বললাম, মা কথা বললেন, তখন তো একেবারে একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার কথা শুনছিল। আমার প্রত্যেকটি কথা যেন সে বার বার করে উচ্চারণ করল। আমার কথা শেষ হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে দাদা সেই কথা বিড় বিড় করে বলছিল। তারপরে তাড়াতাড়ি আমার দিকে ঘুরে বলল, "যমু আজ আমিও মাকে স্বপ্নে দেখেছি। আর ঠিক এই কথাই মা আমাকে বলেছে। মা তোকে বলেছে, 'আমি গণুকে বলে রেখেছি', ঠিক সেই কথাই মা আমাকে বলেছে, জানিস ?"

দাদার ও কথায় কি আমি সন্তুষ্ট হই ? আমি অমনি আবার বললাম, "আমি গণুকে বলব, মানে মা তোকে ঠিক কী বলল, তাই বল না। 'বলব' বলেছিল।"

আবার সে স্থির হয়ে চুপ করে রইল। আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে বলল, "যমু, অন্য কিছুই না। আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি যেন শান্তভাবে ঘুমচ্ছি। এমন সময় মা বাইরে কোথা থেকে এসে আমাকে বলল, "গণু, আমার কথা মনে আছে তো ? তোর ওপরেই আমি নির্ভর করছি। যমু বাছার বরাত মোটেই ভালো নয়। ওকেও তুই—" মার কথা শেষ না হতেই আমি 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা' বলতে বলতে জেগে উঠলাম। আর তখন থেকে ভাবছি এ কী ব্যাপার ? তখন তুইও স্বপ্ন দেখেছিস জানতে পেরে আমার আশ্চর্য মনে হল, আর তোর স্বপ্নটা জানতে পেরে তো আমার ভয়ানক আশ্চর্য মনে হচ্ছে ! যমু, তুই আর আমি যখন একই

সময়ে, ঠিক একই রকম স্বপ্ন দেখেছি, তখন নিশ্চয়—কিন্তু তুই ছেলেমানুষ, তা কি বুঝবি?

দাদার এই শেষের কথা শুনে আমার বড় দুঃখ হল। আমি তক্ষুনি তাকে বললাম, "দাদা, তুই বুঝি মনে করিস যে আমি কিছু বুঝিনে? আমি সব কিছু—"

এই বলছি, এমন সময় সেদিনের কথা আমার মনে পড়ল, আর আমি দাদাকে বললাম, "দাদা, তোর স্বপ্ন শুনে আমার মনে পড়ছে, সেদিন রাত্তিরে হঠাৎ তোকে ডেকে তোর কানে কানে মা কী যেন বলল রে?"

আমার এই প্রশ্ন শোনামাত্র দাদা ইতস্ততঃ করতে লাগল; কিন্তু আমি যখন একেবারে নাছোড়বান্দার মতো ধরে বসলাম, তখন সে যেন ঠিক নিরুপায় হয়ে বলতে যাচ্ছিল, "আর—যমু, কিছু নয়, বা বলল—"

কিন্তু আমার যা কপাল দোষ! ঠিক সেই সময় বাবা সেখানে এলেন।

কী জানি, বাবা আমাদের কথাবার্তা শুনেছিলেন কিনা। তিনি কখন আমাদের কাছে এসেছিলেন, তা অন্ততঃ আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু তিনি কাছে এসেছেন জানতে পেরে আমাদের মনের অবস্থা যে কি হল তা আমরাই জানি! আর কাউকে বললে সে তা বুঝতে পারবে না। এক মুহূর্তে নানা রকম ভাবনা মনে উৎপন্ন হল। নিশ্চয় মনে হল যে বাবা আমাদের কথা শুনেছেন, আর তিনি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন তা হলে কি বলব? আমার কথা নয় রইল। আমাকে যদি তিনি জিজ্ঞাসাই করতেন, তা হলে আমি তক্ষুনি আমার স্বপ্নের কথা বলে ফেলতাম। কেন না, তাতে লুকোবার মতো কিছুই ছিল না। কিন্তু যা বলতে দাদা ইতস্ততঃ করছিল সে কথা সে বাবাকে বলবেই বা কী করে? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে তাতে নিশ্চয় কিছু লুকোবার মতো ছিল, কেননা, মা অত রাত্তিরে হঠাৎ উঠে সে কথা দাদাকে বলেছিলেন। তা বলা সম্ভব হবে, আর বাবা যদি আমাদের কথা শুনে থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চয় সে বিষয়ে সব কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, এই মনে করে, দাদা এক-পা দু-পা করে পিছিয়ে পিছিয়ে, সেখান থেকে একেবারে সরে পড়ল! আর আমি বা পাগলী! বাবাকে দেখামাত্র থতমত খেয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। কিন্তু বাবার সেই উদাসীন চেহারা দেখে, তিনি

কিছু জিজ্ঞাসা করবেন মনে হল না। তাই একটু সাহস পেলাম, আমার ভয় কমে গেল। আর আমি আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে যাব মনে করতে লাগলাম।

এমন সময় দেখতে পেলাম যে, বাবার চোখ বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে তাঁর গালে পড়ল; কিন্তু তিনি চট্ করে নিজের চাদর দিয়ে সেটা মুছে ফেলে, যেন সহজ ভাবে বললেন, "ভাই বোনেতে কী গল্প-গুজব চলছিল?" এ কথা বাবা এত কোমল আর স্নেহের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার আগে বাবাকে তেমন করে কথা বলতে আমি কক্ষনো শুনিনি। লোকে বলে যে মানুষের হৃদয় দুঃখের আঘাতে অত্যন্ত কোমল হয়, সে-কথা সে-দিন আমি বেশ ভালো করে প্রত্যক্ষ করলাম। সত্যি, সে-দিন পর্য্যন্ত বাবা কক্ষনো এত কোমলভাবে আর স্নেহের সঙ্গে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। কখনো না। আগেই আমি একবার বলেছি যে আজকাল বাবার স্বভাবে কঠোরতা যেন কম হতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু কঠোরতা কম হওয়া আর সত্যি সত্যি মৃদুস্বভাব হওয়া, এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত! কারো সঙ্গে রাগ করে কথা বলা, আর তার সঙ্গে বেশী কথা না বলা—এ দুটোতে কঠোরতার কম-বেশী ভাগ থাকে। কিন্তু স্নেহপূর্ণ আর কোমলভাবে কথা বলার মানে, কঠোরতা মোটেই না থেকে শুধু মৃদুতা থাকা। বাবার অবস্থা সেই রকম হয়েছিল। প্রথমে তিনি কঠোর ছিলেন, তারপর মার যখন অসুখ হল, তখন তার কঠোরতা কম হতে লাগল, আর শেষে যেন মার প্রাণের সঙ্গে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। থাক্।

বাবার কথা শোনামাত্র থতমত খেয়ে আমি, "কিছু না, অমনি কথা কইছিলাম" বলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু এমন সময়," মা, পালাচ্ছিস কেন? আমি তো তোকে বকব না। আয় মা, আয়," এই বলে বাবা সত্যি খপ্ করে আমার হাত ধরে ফেললেন, আর আমার চিবুক ধরে আদর করে বললেন, "যমু, তোকে ও প্রাণ ঢেলে ভালোবাসত, না মা? এই দু-একদিনে কখনো কি ওকে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছিস?" হে পাঠকগণ, এ ঘটনাটি এখন আমার এত স্পষ্ট মনে পড়ছে যে তখনকার সব বর্ণনা যদি দিই তা হলে দশ-কুড়ি পাতায়ও শেষ হবে কি না জানি না। ঘটনাটি এতো স্পষ্ট মনে থাকার কারণ, এ আমার জীবনের প্রথম—আর শেষ—ঘটনা। এর পর আমার ভাগ্যে তেমন ঘটনা—মানে, বাবার অত

ভালোবাসার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলা আর আদর করা—কখনো ঘটেনি। তাই তেমন অদ্বিতীয় ঘটনা বেশ সুস্পষ্ট ভাবে মনে থাকলে তাতে আশ্চর্য কিসের?

বাবার সে প্রশ্ন শুনে কী উত্তর দেব তাই ভাবতে লাগলাম। যদি বলি, 'না', আর বাবা আমার কথা শুনে থাকেন, তা হলেই হয়েছে! আর যদি বলি 'হ্যাঁ', তাহলে সত্যি কথাটা বলি কী করে? এই ভেবে আমার মাথায় সব গোলমাল হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল যে মা মিথ্যা কথা বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন, তাই আমি চট করে বললাম, "হ্যাঁ, আমি আজকেই তাঁকে দেখেছি।"

"সত্যি? তবে ও কি বলল?"

"কিছু না, মা বলল, যমু, তোর যে কী হবে, এই আমার বড় ভাবনা।"

"আর কি বলল?"

"আর কিছু না, এই রকমই বলল।"

কিন্তু মনে হচ্ছে যে তাঁর সেই দ্বিতীয় প্রশ্নটা তিনি অমনি যা একটা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কি জিজ্ঞাসা করছি, আর কি উত্তর দেবে, এ দিকে তাঁর মনই ছিল না। আমি যা বলছিলাম তা শুনে তিনি শুধু "হ্যাঁ, হ্যাঁ," করছিলেন। কী ভাবছিলেন কে জানে! কিন্তু হঠাৎ, "আচ্ছা, তা হলে যা এখান থেকে," বলে তিনি আমাকে দূরে ঠেলে দিলেন। তখন কি আর আমি সেখানে দাঁড়াই? তক্ষুণি পালিয়ে গেলাম। আমি দাদার কাছে গেলাম, আর সব কথা তাকে বললাম। তা শুনে সে আমাকে কিছুই বলল না। শুধু আমার কথা চুপ করে শুনে গেল।

তখন দাদা আমাকে যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিল, আর হঠাৎ বাবা এসে পড়ায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে কথা আমার মনে পড়ল, আর আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা, কী বলছিলি তখন? বল্ না।" এখন কিন্তু সে আর বলতে চাইছিল না। উল্টে বলল, "যমু, দেখছি যে সে-কথা আমি তোকে না বলি এই ভগবানের ইচ্ছা! তাই, আমি তোকে বলতে আরম্ভ করতেই বাবা সেখানে এলেন।" দাদা যখন এই বলল, তখন আমি আর কী বলব? শুধু তাকে ধরে বসলাম। আর শেষে তাকে, "ঠগ? স্বার্থপর! আমার কথা শুনে নিজেরটা বলছিস না, দাঁড়া। আর কখনো তোকে কিছু বলব না, আর আমি তোর সঙ্গে কথাই বলব না। তুই যদি

এত ফাঁকি দিস্, তবে আমারই বা তোর সঙ্গে মন খুলে কথা বলে দরকার কি?" এই রকম অনেক কিছু ব'লে ফেললাম। কিন্তু সে একটি কথাও বলল না। শেষে শুধু এই বলল, "যমু, তুই একটু বড় হলে আমি তোকে বলব, হ্যাঁ। তখন তুই নিজেই বলবি, বেশ হয়েছিল বাবা, দাদা তখন আমায় বলেনি!" কিন্তু সে কথায় আমার সন্তোষ হতে পারে কি? সে-দিন তা আমি জানতে পারলামই না।

মার মৃত্যুর পরে দশ দিন কেটে গেল। ঐ ঘটনা ছাড়া আর বেশী কিছু সে দশ দিনের মধ্যে হয়নি। দশ দিনের দিন কাক পিণ্ড ছোঁবে কিনা এই নিয়ে আলোচনা হল। ঠাকুমা, দুর্গীর মা এঁরা সকলে বলছিলেন, "কাকে চট্ করে পিণ্ড ছোঁয় না।" কিন্তু পিণ্ডদান করে পিণ্ড বাইরে রাখতে না রাখতেই কাক এসে ছোঁ মেরে ছুঁয়ে দিল। একটুও দেরি হল না। তখন সবাই বলতে লাগল, "নাঃ! ওর যখন কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষাই ছিল না, তখন কাক যে ছোঁবে তাতে আর আশ্চর্য কী? ওর জিতই হয়েছে। বেচারী বেশ মাথায় সিঁদুর নিয়ে যেতে পারল?"

এই কাকে পিণ্ড ছোঁয়ার ব্যাপারটা যে কী, তা বুঝতেই পারা যায় না। আমি তো তাতে কোনো তাৎপর্য দেখতে পাচ্ছি না। কেন না, দাদার, আমার আর সুন্দরীর জন্য মার অতিশয় ভাবনা ছিল। বিশেষতঃ আমার জন্য তাঁর মন খুব যে আকুল হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন অবস্থায় কাক এসে চট্ করে পিণ্ড ছুঁলো, একেবারে দেরি করল না! আমার তো এসব একেবারে বাজে কথা, অযৌক্তিক মনে হল। কাক অনেকক্ষণ পিণ্ড না ছুঁলে যদি মৃত-মানুষের মনোভাব বুঝতে পারা যেত, তবে আর কী ছাই? তেমনি মড়া তুলে নিয়ে যাবার পর সে জায়গাটা নিকিয়ে, সেখানে চাল বিছিয়ে তার উপরে প্রদীপ রাখে, আর দ্বিতীয় দিন তার উপরে কার পায়ের ছাপ উঠেছে তাই দেখে। কেন? যে নতুন জন্ম সে গ্রহণ করবে, সেই প্রাণীর পায়ের ছাপ নাকি সেই চালের উপর দেখতে পাওয়া যায়! কী যে পাগলামি! হ্যাঁ, এ কথা সত্যি যে এখন মনে হচ্ছে এ-সব পাগলামি, তখন তা মনে হয়নি। আমার ঠিক মনে পড়েছে যে মার মৃত্যুর পরের দিন আমরা পায়ের ছাপ দেখেছিলাম। সকলে বলল যে, পায়ের ছাপ গরুর মতো মনে হচ্ছে। তাই আমারও তেমনি মনে হল। আর আমরা বলতে লাগলাম যে, মা গরুর জন্ম পেয়েছে। সেই জন্যই মার

পাওয়া উচিত।' কিন্তু এখন এসব ছেড়ে দিয়ে আর চোদ্দদিনের দিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যেসব আচার-অনুষ্ঠান হবার তা হল বলে, এবার আমি তার পরের ঘটনা বলব।

জগতের রীতি

এখন আমি যে-কথা বলব, তা হয়তো পাঠকেরা আশ্চর্য মনে করবেন। কিন্তু কেউ তা আশ্চর্য মনে করুন বা না করুন, যা-যা ঘটেছে তা আমি একেবারে স্পষ্ট বলব। আমি যা বলব, সে রকম যে শুধু আমাদের বাড়িতেই হল তা নয়, জগতে অনেকবার কেন প্রত্যেকদিনই হচ্ছে।

মা মারা যাবার পর পুরো পোনর দিনও হয়নি, বারোদিনের দিন ব্রাহ্মণরা খেয়ে গেলেন, তার এঁটোও শুকোয় নি, এরি মধ্যে আমার বাবাকে লোকে, বিশেষতঃ ঠাকুমা, আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে আস্তে আস্তে ঠাকুরদাও, দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে অনুরোধ করতে লাগলেন। আমার মনে হচ্ছে যে, মার অশৌচের দিনেই এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। কিন্তু আমার ঠিক মনে নেই। সে যাই হোক, কিন্তু চোদ্দটা দিন কেটে যেতেই লোকে তাঁকে দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে করবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল! প্রথমে যখন ওঁর কাছে একথা তোলা হয়েছিল, তখন তিনি অবশ্য তা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু আমি শুনতে পেলাম ঠাকুমা নিজে বাবাকে বলছেন, "বাবা, যা গেছে তা তো আর ফিরে আসবে না! সে বেঁচে থাক তা আমরা কি চাই নি? কিন্তু ওর ভাগ্যে আর উপভোগ ছিলনা তার কী উপায়? তাই এখন চুপ করে তুমি বিয়ে কর।" তারপরে তিনি আর কিছু বললেন না, কেন না বাবা ওঁর উপরে রাগ করে হন্-হন্ করে চলে গেলেন।

প্রথম প্রথম আট-দশ দিন বাবা ওরকম করলেন। কিন্তু তারপর কেউ যখন বিয়ের কথা তুলত, তখন রাগ করা ছেড়ে দিয়ে বাবা সে বিষয়ের ভালো-মন্দের আলোচনা করতে লাগলেন। আর 'হ্যাঁ' 'না' করতে করতে তাদের কথা শান্তভাবে শুনতে লাগলেন। তাঁর মনের এই অবস্থা আসতে দশ-বারোটা দিন লাগল। তার পরে কী হল তা আমি বুঝতে পারিনি, কেন না, আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ডেকে পাঠাল, তাই আমি

আট দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি যেতে হল। বিয়ে হওয়ামাত্র নতুন বধূকে শ্বশুর-বাড়িতে একেবারে আট দিন থাকতে হয়েছে, একি কেউ কখনো দেখেছে, না শুনেছে! এক গ্রামে কিংবা শহরে শ্বশুরবাড়ি থাকলে, কিছু দিন পর্যন্ত নতুন বৌ সকালে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে, সন্ধ্যাবেলা বাপের বাড়ি ফিরে আসে, কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ি আর শ্বশুরবাড়ির সকলে যেন পৃথিবী-ছাড়া লোক ছিল!

সে যাই হোক, মাঝের আট দিনে কি কি হল তা আমি কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু ন'দিনের দিন যখন আমি বাড়ি ফিরলাম, তখন দাদা আমাকে বলল, "যমু, আমাদের নতুন মা আসবে, জানিস্।" এ কথা উচ্চারণ করার সময় দাদার যা চেহারা হয়েছিল তা মনে পড়লে এখনো আমি অশান্তি বোধ করি। দাদা যা বলছে তা আনন্দিত হয়ে বলছে না দুঃখ করে বলছে, তার সুরে উপহাস ছিল না সহজভাব ছিল, তা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শুধু তাই নয়, সে সংবাদ শুনে তখন আমার আনন্দ হল না দুঃখ হল, সন্তোষ হল না অত্যন্ত ব্যথা হল, কিছুই বলতে পারছি না। আমার ঠিক মনে আছে যে, সে সংবাদ শুনে মাকে মনে পড়ে আমার বড্ড কান্না পেল। আর সে কান্না থামতেই চাইছিল না। তাই বলতে পারি না যে আনন্দ হয়েছিল। বেশ, যদি বলি যে দুঃখ হল, তাহলে এরকম দ্বিতীয় বিবাহের সম্বন্ধে আজ আমি যা ভাবি, সে রকম ভাবনা তখন আমার মনে উৎপন্ন হয় নি; আর তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। পরে দাদাতে-আমাতে যখন কথা হল, তখন দাদা কী মনে করেছিল তা বুঝতে পারলাম। দাদা নিশ্চয়ই সেটা মোটেই পছন্দ করেনি। আমাকে সে সংবাদটা দিয়েছিল,—আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে আসতে না আসতেই,—তা কেবল উপহাসরূপেই দিয়েছিল। যাই হোক্, এ কথা সত্যি যে, ওই আট দিনের মধ্যেই স্থির হয়েছিল যে আমাদের নতুন মা আসবে। আমাদের নতুন মায়ের কনে-দেখা হয়ে, বিয়ের শুভক্ষণও ঠিক হয়েছিল।

মা মারা যাওয়ামাত্র বাবার যে দুঃখ হয়েছিল তা মনে হলে, বাবা বিয়ে করতে রাজি হলেন কী করে, এই ভেবে বড় আশ্চর্য মনে হয়। কিন্তু আজকাল আমাদের এই অ-শাশ্বত জগতে যে সব ঘটনা হচ্ছে, সে সবের তুলনায় তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে, এই ভেবেই আমার

আশ্চর্য লাগছে! দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া মানেই অদৃশ্য হওয়া, নষ্ট হওয়া। 'শাশ্বত' এই শব্দটাই যেন আমাদের এই বিশ্বজগতে নেই। আর তা তো সত্যিই! প্রেমে শাশ্বতের সন্ধানই বা কোথায়! আমার মা কত দূরদর্শিনী ছিলেন, তা আমি সে সময়ে বেশ ভালো রকম অনুভব করেছি।

আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে আসামাত্র দাদা আমাকে নতুন মার সংবাদটা দিল, আর সেদিন তার কী মনে হল কি জানি, আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে, মুখ ভার করে, গদগদ স্বরে বলল, "যমু, এ রকম যে হবে তা সেদিন রাত্তিরেই মা আমাকে বলেছিল, জানিস? সে সেদিন আমাকে যা বলেছিল, তা এই,—'গণু অল্প দিনেই আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। তোমরা এখনো ছোট। আমার চোখের সামনে যদি যমুর বিয়ে হয়ে যায়, তবে তো ভালোই, কিন্তু যদি নাই হয়, তাহলে অবিলম্বে সেটা নিশ্চয় হবে। কিন্তু ভাখ্, আমি মারা গেলে পরে কি হবে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ওঁর স্বভাব যা তা তুই এখন জানিস। আমার জায়গায় তোদের নতুন'—যমু, এই বলে মা ইতস্ততঃ করতে লাগল। তার পরের কথা সে বলছিল না। কিছুক্ষণ থেমে আর চোখ মুছে, সে আবার বলল,—'তাই তুই বাচ্চাদের যত্ন করিস, তুই বড় হলে ওদের উপেক্ষা করিস না। ভগবানের দয়ায় ওদের বরাত যদি ভালো হয়, যদি ভালো শ্বশুরবাড়ি জোটে তাহলে তো ভালোই। কিন্তু যমুর কপাল ভালো মনে হচ্ছে না। শাশুড়ীর কথা কেউ কক্ষণো গ্রাহ্য করবে না। উনি—', এই বলে আবার সে থামল আর আবার তাড়াতাড়ি বলল, 'আর কিছু না, যা ঘুমোগে যা। যা বললাম তা কিন্তু মনে রাখিস।' এই বলে মা চুপ করল। যমু, মার কথার অর্থ কী ছিল তা বুঝলি তো? সেটা এখন প্রত্যক্ষই অনুভব করছি।"

দাদার এ-কথা শোনামাত্র আমি সব কিছু সুস্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কেননা, দাদাকে যেদিন রাত্তিরে মা ওকথা বললেন, ঠিক সেইদিন সেই সময়ে মা আমাকেও উপদেশ দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, "যমু, আমি মারা গেলে তোর কপালে বাপের বাড়ির সুখ শেষ হল, জানিস।" আর দাদাকে বলেছিলেন, "ওরে পাগল ছেলে, আমার মরণ হলে কী হবে আর কী না হবে তার কি ঠিক আছে!" আর মারা যাবার সময় বাবাকে বলেছিলেন, "আমি চললাম, পরে যা হবার তা তো হবেই।" আর আগেও

দু-একবার বলেছিল, "পরে কী হবে, তা নিজেরটা নিজে দেখতেই পাচ্ছি।" মার সে সব কথার মানে কী তা আমি এখন বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ, তার মানে এই যে, মা ঠিক জানতেন তিনি মারা গেলে বাবা আবার বিয়ে করবেন, তাঁর শাশুড়ীকে কেউ মানবে না, আর তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো ব্যবস্থা থাকবে না। তাছাড়া তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর শাশুড়ীর দশাও একেবারে খারাপ হবে। এও তাঁর মুখের কথা শুনেই বুঝতে পারা যেত। সব চেয়ে আমার জন্য তাঁর বড় মন কেমন করত। আমার জন্য মা কেন এত ভাবতেন তা কিন্তু কিছু বুঝতে পারা যায় না।

সেদিন বড় কষ্টে, কাঁদতে কাঁদতে দাদা আমাকে মার কথা বলল। তখন আমার বড় দুঃখ হল। কিন্তু সত্যি যদি কেউ আমার মনের কথা জানতে চায়, তাহলে বলতে হবে যে, বাবা বিয়ে করবেন তাতে অত দুঃখ করবার মতো কী, তা আমি একেবারে বুঝতে পারিনি। দাদা 'ভালো নয়' বলছিল, তাই আমিও তাই বলছিলাম। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়সের গৃহস্থ যদি বারো-তেরো বছরের মেয়েকে—আর তাও বুঝতে-পারার বয়সী প্রথম পক্ষের দুটি ছেলেপুলে থাকতে—বিয়ে করে, তবে আজ আমি তা অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করি। কিন্তু সে-সময়ে আমি সেটা মোটেই তেমন মনে করিনি। কেননা, তখনকার বুদ্ধিই কতটুকু!—আর আজ?—কিন্তু থাক সে কথা।

সার কথা, দাদা আমাকে সেকথা বলবার সাতদিন পরেই আমাদের তেরো বছরের নতুন মা আমাদের বাড়ি এল। বিয়ে কী রকম হল, কোথায় হল, সে বিষয়ে আর কিছু লিখে দরকার নেই। বাবার বিয়ে হল এইটুকু বললেই যথেষ্ট। সেই আমাদের তেরো বছর বয়সের 'মা' একেবারে গরীব পরিবার থেকে এসেছিল। তার বাবা ছিল না, মা কাজকর্ম করে পেট চালাত। মেয়ে বয়সে বড় ছিল, তাই দেখামাত্র পছন্দ হল, বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হল, বিয়ে হল, আর আমাদের নতুন মা আমাদের সঙ্গে খেলা করতে এল।

যদি বলি যে, দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ের সময় মেয়ের বেশী বয়স ছাড়া আর কিছু কেউ দেখে না, তাহলে তাতে কোনো আপত্তি হতে পারে না। অন্ততঃ, আমি দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে এমন যত লোককে জানি, তারা সকলে তাই দেখে করেছে। মেয়ের কুলশীল, চালচলন না দেখে, আর

প্রথম থেকে তাকে 'দ্বিতীয় পক্ষের', 'দ্বিতীয় পক্ষের' বলে বলে, তার মনে কী রকম যেন আলাদা ভাব উৎপন্ন করা হল, আর তেমন করলে যা পরিণাম হয়, সে সব আমাদের বাড়িতে অনিবার্য ভাবেই হল। কেননা,—কিন্তু থাক। সেসব কথা পরের ঘটনা তাই আগেই বলে না ফেলে যেমন যেমন আর যখন যখন ঘটেছিল, তখন বললেই হবে।

নতুন মা আসার অল্পদিনের মধ্যেই ঠাকুরদা বাড়ি চলে গেলেন। ঠাকুমা কিন্তু বৌমাকে বাড়ির রীতিনীতি আর কাজকর্মের শিক্ষা দেবার জন্য পুনায় রয়ে গেলেন। এই রকমে সব স্থির হবার পর, আমি অনেক দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি গেলাম।

আমার শ্বশুরবাড়ির পরিবার

আমার শ্বশুরমশায়ের, মানে আমার বড় মামাশ্বশুরের, ধরনধারন যেন সাংঘাতিক ছিল। তাই ভাবছি যে আজ তার বর্ণনা করি। আমার মামাশ্বশুরের পরিবার বেশ বড় ছিল। আর সংসারও বেশ জাঁকজমকে চলছিল। আমার দুই মামাশ্বশুর, দু'জনেরই বেশ ভালো চাকরি ছিল। ছোট মামাশ্বশুরের মাইনে ছিল দেড়শো টাকা, আর বড় মামাশ্বশুর পেতেন ষাট না পঁচাত্তর টাকা। দাদাশ্বশুর অনেক দিন আগে মারা গিয়েছিলেন, তাই বাজার হাট ও অন্য সব ব্যবস্থা ছোট দাদাশ্বশুরই করতেন।—ইনি সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক যিনি আমাকে দেখতে এসেছিলেন—খুড়তুতো দাদাশ্বশুর। এঁর স্বভাব ছিল ভারি খিটখিটে। একটুতেই এত রাগ করতেন আর বিরক্ত হতেন যে তা বলার জো নেই। বুড়ো খেতে বসে ক্ষেপে ওঠেনি এমন কোনোদিন হয়নি। যতো রাগ-জ্বালা সব সেই খাবার সময়। আর খাবার নিয়ে ভারি খুঁতখুঁতি। আজ অমুক চাটনি বাটা হয়নি কেন, অমুক তরকারিতে নুন বেশি হয়েছে, অমুক ঝোল পাৎলা কেন, এটা হেন হয়েছে, সেটা তেন হয়েছে, এই রকম তাঁর অবিরাম খিটু খিটু চলত! আমার তো একটি দিনও এমন মনে পড়ছে না, যেদিন ছোট দাদাশ্বশুর বকেন নি। কিছু না কিছুর জন্য তিনি ঘ্যান ঘ্যান করতেনই।

তাঁর ভাজের, মানে আমার নিজের দিদিশাশুড়ীর, স্বভাব ছিল তাঁর একেবারে উলটো। তিনি কখনো কাউকে জ্বালাতন করতেন না। কিন্তু যে কোনও কাজের সময় তিনি নিজের জিদ ছাড়তে চাইতেন না, যা বলতেন ঠিক তাই করতেন। একবার কারো নাম করবেন না বলে ঠিক করলে, সে সংকল্প বজ্রের মতো শক্ত হত। তাছাড়া তাঁর আর এক সাংঘাতিক দোষ ছিল। তিনি ছোট-বড় সকলের কথা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতেন। আর সেটা মনে পুষে রেখে কখনো না কখনো সে-ব্যক্তিকে এমন খোঁটা দিতেন যে, সে-ব্যক্তি যেন ঠিক গিয়ে আত্মহত্যা করে। ওঁর

এই নোংরা কথা শুনে মানুষের যত কষ্ট হত, তত কষ্ট ছোট দাদাশ্বশুরের খুঁতখুঁতেপনা আর ভ্যাচর-ভ্যাচর শুনে হত না। শুধু এই এক দোষ ছাড়া দিদিশাশুড়ী ঠাকরুণের আর কোনো দোষ ছিল না। তাঁর মন বড কোমল ছিল। কারো অসুখ-টসুখ করলে তিনি একেবারে ছটফট করতেন। আর কক্ষণো পক্ষপাত করতেন না।

আমার বড় মামাশ্বশুর—যাঁর মাইনে কম ছিল—কী রকমের মানুষ ছিলেন তা আমি এখনো বুঝতে পারিনি। ওঁর মতো গূঢ়, চাপা স্বভাবের, বেয়াড়া, খামখেয়ালী মানুষ আমি সমস্ত জীবনে দেখিনি। তেমনি এক-নম্বরের স্বার্থপর ছিলেন। তাঁর মনে যে কী গুপ্ত আছে তা জানতে পারা খুব মুশকিল ছিল। তিনি এতো খামখেয়ালী ছিলেন যে যা এক্ষুণি মনে করবেন, তা পর মুহূর্তেই ছেড়ে দিয়ে, আবার অন্য কিছুর খেয়াল হত, আর তাঁর এই মুহূর্তের কথার সঙ্গে পরের কথার মিল থাকত না। তিনি অসম্ভব লোভী আর কৃপণ ছিলেন। নিজের মাইনে, আর অন্য সামান্য, অল্প-স্বল্প উপার্জন—তিনি এ রকম অনেক কিছু উপায় করতেন,—সমস্ত ব্যাঙ্কে জমা করে ফেলতেন, নইলে অন্য কোথাও খাটাতেন, কিন্তু সংসার খরচের জন্য কানাকড়িও ছাড়তেন না। নিজের আর নিজের স্ত্রীর সব খরচ যতদূর সম্ভব বাড়ি থেকে আদায় করে নিতেন। স্ত্রীর গয়নাপত্র, ছেলে-পিলেদের গয়না সব বাক্সে পুরে নিজের ঘরে তুলে রেখে দিতেন। সত্যি, তিনি কাউকে কক্ষণো বিশ্বাস করতেন না। আর ওঁর স্ত্রী?—ঠিক উলটো ছিলেন। সেই ভদ্রলোকটির যত দোষ ছিল, তাঁর স্ত্রীর তত গুণ ছিল। তার মতো লক্ষ্মী, সরল বৌ আর কোথাও থাকতে পারে মনে হয় না। না না, ওঁর মতো লক্ষ্মী সত্যি কেউ থাকতে পারে না। সে মা লক্ষ্মী মুখ ফুটে কাউকে কখনো তেড়া বাঁকা কথা বলেননি। তিনিও তো মানুষই ছিলেন, কক্ষণো কি ওঁর রাগ হতে পারে না? কিন্তু সেটা মনে চেপে রেখে, মুখ বুজে থাকতে তিনি বড় নিপুণ ছিলেন। তাঁকে আমি কক্ষণো কাউকে বকতে দেখিনি। বাড়ির সব মেয়েরা, এমন কি আমার শাশুড়ীও বলতেন, তাঁর বড় চাপা স্বভাব, কিন্তু আমি কখনো তা ভাবিনি। তিনি অত সরল, আর তাঁর স্বামী অমন সাংঘাতিক, তাই ওঁদের দুজনের স্বভাবের কেমন করে যে মিল হত, তা কেউ কেউ হয়তো আশ্চর্য মনে করবেন। কিন্তু সে-মিল কেমন হত সেটা এর পরের ঘটনাবলী

থেকে বোঝা যাবে। তিনি অত সরল, আর একটু শ্রীহীনাও ছিলেন, তাই তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতেও হয়েছিল।

ছোট মামাশ্বশুর, যাঁর মাইনে মোটা ছিল, আমার বড় মামীশাশুড়ীর অবিকল প্রতিমা ছিলেন। বেচারীরা ভাইবোন হলেই যেন মানাত। দু'জনেরই স্বভাব এক রকমের। বেচারা অত টাকা মাইনে পেতেন, কিন্তু এটা কেন করলে, তেমন কেন করনি, একটি কথাও তিনি বলতেন না। বাড়িতে যা ইচ্ছে কর, কিংবা নাই কর, মাস কাবারে একশো টাকা তাঁর কাকামশায়ের হাতে, আর পাঁচ টাকা তাঁর মার হাতে—তাঁর ধর্মকর্মের জন্য দিতেন। বাকি টাকা তাঁর অন্য কোনো কাজে দরকার হত, তাই সে কথা স্পষ্ট বলে, শুধু তত টাকাই নিজের কাছে রাখতেন। তিনি নিজের বৌদিকে আর বোনকে—মানে আমার শাশুড়ীকে—বড় শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের দু জনকে প্রতি মাসে তিনি দু' টাকা করে দিতেন। অল্পস্বল্পের মধ্যে যা নিজে করতে পারা সম্ভব তা করে, সকলে যেন সন্তোষে আর আনন্দে থাকে এই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করতেন। মা, স্ত্রী, বড় ভাই, এরা কেউ যদি কখনো কাউকে বকতে কিংবা ঝগড়া করতে আরম্ভ করত, তাহলে তাদের বুঝিয়ে বলে, যাতে সুখে দিন কাটে, সেইজন্য তিনি ব্যস্ত হতেন। কিন্তু সে বাড়ির রকমই এমন ছিল যে, সত্যিকারের সুখ তিনি কখনো পেলেন না। তবু তিনি কখনো মুখ ভার করে থাকতেন না। আর তাঁর স্ত্রী, আমার ছোট মামীশাশুড়ী—বাবা গো! তাঁর মতো কর্কশা মহিলা সমস্ত পৃথিবীতে আর আছে কিনা জানি না। স্বামীর অত মোটা মাইনে, তাই তার অসীম অহংকার ছিল। সম্পত্তির ঔদ্ধত্য যাকে বলে, তিনি যেন মূর্তিমতী তাই ছিলেন। সেজেগুজে বেড়াতেন, ফটর ফটর করে যাকে তাকে বকতেন। নিজের স্বামীর বিষয়ে পাগলের মতো যাচ্ছেতাই বলতেন, আর কখনো তাঁকে মুখের উপরে বলতেন, "তোমার কিছু আক্কেল নেই।" স্বামীর মাইনের জোরে তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন। যাকে ইচ্ছে ধমকাতেন —কখনো কখনো শাশুড়ীকেই। বড় ভাশুরের বিষয়ে তো যা গজর গজর করতেন তার ঠিক নেই। ওঁর স্বভাব যদিও ওই রকম ছিল, তবু শ্বশুর মশায়ের স্বভাব এমন ছিল যে তিনি সব কিছু হেসে উড়িয়ে দিতেন, কখনো তাঁকে বকতেন না। আবার কিন্তু তাঁর কথায় নিজের মতও ছাড়তেন না।

আমার বিয়ে হবার আগে, আলাদা হবার জন্য ছোট শাশুড়ী স্বামীকে বলে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শ্বশুরমশাই তা মোটেই গ্রাহ্য করেন নি। আমার শাশুড়ীকে তুচ্ছ করে, যাচ্ছেতাই বলে তিনি অপমান করতেন। কিন্তু শ্বশুর এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন, বলতেন, "আমি তোকে এখানে নিয়ে এসেছি, আমার মুখ চেয়ে তুই দিন কাটাবি। আর কেউ যদি কিছু বলে, তা হলে সে কথা মনে নিসনা।"

ভগবানের যোগাযোগ, নিয়তি যে কেমন! গোপালঠাকুরের (ছোট শ্বশুরমশাই) স্বভাব অত ভালো, আর তাঁর কপালে রাধাশাশুড়ীর মতো অমন কর্কশা স্ত্রী জুটেছিল, আর শংকরঠাকুর অমন সাংঘাতিক লোক ছিলেন, তবু তাঁর কপালগুণে উমাশাশুড়ীর মতো সতী লক্ষ্মী স্ত্রী। লোকে বলে ঈশ্বর কখনো যোগ্য জোড়া জুটিয়ে দেন না, তা একেবারে অবিকল সত্যি। আমরা সব সময় বলতাম যে, গোপালঠাকুরের স্ত্রী যদি হতেন উমাশাশুড়ী, এবং শংকর ঠাকুরের স্ত্রী হতেন রাধাশাশুড়ী, তাহলে বেশ হত। কিন্তু তেমন কী হয়? তেমন হলে যে সব ভালো হত! আর জগতে যে সব ভালো ভাবে চলে না! যাক্।

এবার আমার নিজের শাশুড়ীর স্বভাবের বর্ণনা করতে হবে। তিনি একেবারে ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি আর উমাশাশুড়ী যেন বাড়ির সব কাজকর্ম সেরে ফেলবার প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন। কোনো কাজেই তাঁরা পিছ্‌পাও হতেন না। অমুক বড়লোক, তার কাজ আগে, যত্ন করে করতে হবে; অমুক গরীব, তার কাজ তত ভালো করে করে দরকার নেই—এ রকম তাঁদের কাজকর্মের ধরন ছিল না। তাঁদের চোখে সবাই সমান ছিল। যে যা খুশি বলুক, সময়টা ভালোভাবে কেটে গেলেই হল, এই তাঁরা ভাবতেন। আমার শাশুড়ী ভোর চারটের সময় উঠে তখন থেকে বাড়ির কাজকর্ম আরম্ভ করতেন আর সন্ধ্যা আটটার সময় মেঝেয় গা এলিয়ে দিতেন। উমাশাশুড়ী তাঁকে সব কাজে সাহায্য করতেন। তাঁদের দু'জনাতে ভারি ভাব ছিল। দু'জনেরই মন-খোলা স্বভাব ছিল। পেটে এক, বাইরে আলাদা, এরকম ছিল না। কারো কিছু দোষ দেখতে পেলেই কিছু না ভেবে-চিন্তে তাঁরা সেটা স্পষ্ট বলে ফেলতেন। ওরকম মন-খোলা স্বভাবের জন্য তাঁদের খুব কষ্ট পেতে হত। এই হল বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা।

ছোটদের মধ্যে বারু ঠাকুরঝি, বনু ঠাকুরঝি, ধোণ্ডু ঠাকুরপো-ইত্যাদি সকলের স্বভাব কেমন ছিল তার বর্ণনা আমি আগেই করেছি। তাই সে বিষয়ে আর বেশি লিখে দরকার নেই।

উপরে সকলেরই স্বভাবের বর্ণনা করা হল। অবশ্য, বিস্তৃতভাবে করিনি, প্রত্যেকের স্বভাবের একটু একটু পরিচয় মাত্র দিয়েছি। এর চেয়ে বেশি যা বলবার তা আমার জীবনকাহিনীর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ওঁদের আচরণ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যাবে। বাকি শুধু রইল ওঁর স্বভাব। কিন্তু সে বিষয়ে লিখতে হলে এ-জায়গা আর সময়ও উপযুক্ত নয়। সে সব আমি এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তাই এখন এইখানে বিরাম দেওয়াই ভালো।

সুশিক্ষা !

মেয়ে সমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "যার নেই শাশুড়ী, তার বারো শাশুড়ী।" এই প্রবাদটি আমার সম্বন্ধে বেশ খেটেছিল। কেন না, যদিও আমার নিজের শাশুড়ী ছিলেন, তবুও তাঁর থাকা আর না-থাকা সমান ছিল। কারণ, তিনি নিজে যদিও অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন, তবু বাড়িতে কেউ তাঁকে মানতো না। আমাকে কেউ বকলে যদিও তাঁর মন কেমন করত, তবু তিনি মুখ ফুটে তা ব্যক্ত করতে সাহস পেতেন না। কাকে মনের কথা বলবেন ? আর কেমন করেই বা বলবেন ? ছোট মামীশাশুড়ী আর দিদিশাশুড়ীর যা ধরন-ধারন ! ভালোমানুষ শুধু আমার নিজের শাশুড়ী আর উমাশাশুড়ী। কিন্তু তাঁদের দু'জনকেই বাড়িতে কেউ মানতো না। রক্ষে এই যে, তাঁরা দু'জনেও কিছুতেই নিজেদের মত দিতেন না। যে যা-ইচ্ছা করুক, তাঁরা নিজেদের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। আমার শাশুড়ী যে কিছু বলতেন না, তাতে আশ্চর্যের কিছুই ছিল না। কেন না, তিনি পরের ঘরেই ছিলেন। তাই, তিনি কোন অধিকারে কোনো কথা বলবেন ? তাতেও বাড়ির সকলে যদি গোপালঠাকুর কি উমা শাশুড়ীর মতো ভালো মানুষ হত, তাহলে কোনো বিপত্তি ছিল না। কিন্তু এ পরিবারের ধরনই ছিল আলাদা ! তাই আমার শাশুড়ী কিছুতেই মন দিতেন না, সেই ভালো ছিল।

উমাশাশুড়ীর অবস্থা কিন্তু বিশেষ কঠিন ছিল। কেন না, তাঁর অধিকার থাকা সত্ত্বেও, তিনি কাউকে কিছু বলতে পারতেন না। তাঁর পেটের ছেলেপুলে—বারু ঠাকুরঝি, বসু ঠাকুরঝি, ধোণ্ডু ঠাকুরপো—একজনও তাঁর মনের মতো আচরণ করত না। সবাই ঠিক বাপের মতো ছিল। শংকরঠাকুর কখনো আদর করে, কখনো তেমন খেয়াল হলে, নিজের স্ত্রীকে আদরের নাম ধরে ডাকতেন। তাঁর সেই আদরের নাম ছিল "পাগলী।" সব ছেলেপুলেদের সামনে তিনি স্ত্রীকে "ও পাগলী" করে ডাকতেন। ধোণ্ডু-

ঠাকুরপো যখন ছোট ছিল, তখন তিনি তাকে নিজের মাকে "পাগলী" বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন, আর সে ছেলেটা এখনও মাকে 'পাগলী' বলে ডাকত, কিন্তু সে-মালক্ষীর তাকে বকতেও সাহস ছিল না। একদিন তাকে তিনি (উমা শাশুড়ী) কী একটা কাজ করতে বললেন, তখন সে বলল, "আমার বয়ে গেছে পাগলীর কাজ করতে।" এই বলে সে পালিয়ে গেল। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ধরে এনে জোরে তার কান মলে দিয়ে, গালে দু'চড় বসিয়ে দিলেন। অমনি 'ভ্যাঁ' করে কান্না জুড়ে দিয়ে, 'পাগলী শুধু শুধু মারে, দুষ্টু কোথাকার', এই রকম গালিবর্ষণ করতে করতে সে জোরে হাত-পা ছুড়ে, মাথা ঠুকতে লাগল। এমন সময় পিতামশাই সেখানে উপস্থিত হলেন আর আদুরে খোকাবাবুর আবেদন শুনে তার সামনেই স্ত্রীকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করতে লাগলেন। সে গালি শুনতে না চেয়ে হয়তো সে মহিলা কোথাও দূরে যেতে পারেন, এই ভেবে তাঁকে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। আমরা নারীজাতি যদিও সর্বংসহা, আর উমাশাশুড়ী যদিও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি কিংবা মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, তবুও সব কিছুর একটা সীমা আছেই। একেবারে যখন অসহ্য হল তখন তিনি কেঁদে ফেললেন আর বললেন, "ছেলেটাও কি আমায় অমন কথা বলবে?"

"আলবৎ! উচিত কথা বলবে না? ছেলেটা বলবে না তো কি ছাড়বে? একবার নয়, হাজারবার বলুক।" শংকরঠাকুর এই উত্তর দিলেন। এই উত্তর দিয়েই কি তিনি থামলেন? অমনি আদুরে খোকাবাবুর দিকে ঘুরে বললেন, "খোণ্ডু বেশ করেছিস। এমনি করবি। ওর এত দেমাক চাইনে।"

পাঠকগণ, কী বলতে চান? বলা যেতে পারে কিছু কি বাকি আছে? এমন 'সুশিক্ষা' ছেলেমেয়েদের দিলে তাদের আচরণ দেখে দুঃখ করে লাভ কী? মার বিষয় তাদের মনে যদি অনাদর উৎপন্ন হয় তবে তাঁকে তারা পদে পদে অপমান করবে না তো কী করবে? ওই ঘটনার পরে ঠিক চতুর্থ দিনের দিন কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন। সেদিন সকালে ঐ সব গণ্ডগোল হয়ে যাবার পর উমাশাশুড়ী কারো সঙ্গে কথা কইলেন না। সে চারদিনে তিনি স্বামীর সঙ্গে বোধহয় একটি কথাও বলেন নি। বড়মা আমাকে ভাঁড়ার ঘরে বসে চালুনি দিয়ে আটা ছাঁকতে বলেছিলেন, তাই

আমি সেখানে বসে আটা ছাঁকছিলাম। ওঁর পড়াশোনা করার জায়গা অপর দিকের ঘরে ছিল, তাই যাবার-আসবার সময় ওঁকে দেখতে পাবার আশাও ছিল। এমন সময়, কী জানি কখন, উমাশাশুড়ী এসে বাইরের ঘরে শুয়ে পড়লেন। সকাল থেকে তাঁর মাথা ধরেছিল। মনে পড়ছে অল্পক্ষণ পরেই শংকরঠাকুর সেখানে এলেন। আমি একমনে আটা ছাঁকছিলাম। দরজার আড়াল ছিল, তাই বোধ হয়, আমি সেখানে ছিলাম তা তিনি জানতে পারেননি। ইতিমধ্যে আমি শুনতে পেলাম, "কীগো আজ চারদিন একেবারে কথা বন্ধ করেছ যে? বলো, বলো, আমার সঙ্গে কথা বলো।"

উমাশাশুড়ী একটি কথাও বললেন না। তখন শংকরঠাকুর আবার বললেন, "কী অপরাধ করেছি আমি? সেদিন বকলাম তাইতো? তাতে কী হল? রাগের মাথায় মানুষ অমন বকেই; সেটা এত মনে পুষে রেখে কথা বন্ধ করে ফেলা যে অন্যায় বাপু! বলো, কথা বলো।" এই বলে তিনি একেবারে তাঁর কাছে গেলেন। দরজাটা পুরো বন্ধ ছিল না তাই আমি দেখতে পেলাম। এই সব কথা আমি যতক্ষণ শুনতে পাইনি, ততক্ষণ মোটেই ভাবিনি যে আমার এখানে বসে থাকা উচিত নয়। কিন্তু যখন তাঁর কাছে গেলেন, তখন আমি বড্ড অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কী যে করি বুঝতে পারছিলাম না। বাইরে যেতে হলে তাদের পাশ দিয়েই যেতে হয়, যদি দরজাটা শক্ত করে বন্ধ করি তবু তিনি টের পাবেন। আর যদি জানতে পারেন যে আমি—বাবা গো! তাঁর সেই মুখ! কী যে বলবেন তার ঠিক কি? যদি ছোট ঠাকুর থাকতেন তা হলে আমি তক্ষুণি সেখান থেকে চলে যেতাম। কিন্তু যদি বাইরে যাবার চেষ্টা করি, তা হলে—"এতক্ষণ ওখানে ছিলে তো?" এই বলে তিনি যত খুশি বকবেন ভেবে ভয় পেয়ে আমি সেইখানেই বসে রইলাম। আমার মাথায় সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। একেবারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বাধ্য হয়ে আমাকে তাঁদের কথা শুনতে হল। পরে সেজন্য আমি বড় অনুতপ্ত হয়েছিলাম। ঠাকুরের বকুনির জ্বালা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি সেখানে বসলাম। কিন্তু, আমার তখন মনে হয়েছিল, আর এখনও ভাবছি যে, সেটা করা উচিত হয় নি।

ওদিকে ঠাকুর উমাশাশুড়ীর মাথার কাছে বসে, "তোমার কি অসুখ

করেছে? মাথা ব্যথা করছে? টিপে দেব? গোপাদের কাছ থেকে মেন্থল চেয়ে আনব?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে সত্যি মাথা টিপতে লাগলেন। আমার আশ্চর্য মনে হতে লাগল—ইনিই কি চারদিন আগে ধোণ্ডু ঠাকুরপোর পক্ষ নিয়ে স্ত্রীকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করেছিলেন? সেদিনকার তাঁর চেহারাই-বা কেমন ছিল, আর আজকার এই অনুরোধ করবার ধরনই বা কী রকম। কিছুতেই কোনো মিল নেই। তিনি অত অনুনয় করছিলেন কিন্তু শাশুড়ী একটি কথাও বলছিলেন না। মশাই যখন তাঁর মাথা টিপতে লাগলেন তখন কিন্তু তাঁর হাত ঠেলে দিলেন। কিন্তু তিনি কি কম নাছোড়বান্দা! জোর করে কপাল টিপতে টিপতে বললেন, "বেশ তোমার পায়ে পড়ছি, ক্ষমা চাইছি, তা হলে তো হল? আর কক্ষণো তোমাকে বকব না। হতভাগা ধোণ্ডুকে শাস্তি দেব? তবে হল? দেখো কচি বাচ্চা, দু'কথা বলল, তাতে কি কেউ এমন রাগ করে? আমি একটু বিরক্ত হয়েছিলাম, ছেলেটার কান্না শুনে মাথা বিগড়ে গেল তাই তাকে না বকে তোমাকে বকলাম। কিন্তু, সে রাগ কি সত্যি? ওঠো, ওঠো এখন, আর আমি তোমাকে কখনো বকব না।" অত করে তিনি অনুনয় করতে লাগলেন কিন্তু তবুও শাশুড়ী একটি কথাও বললেন না। উলটে পাশ ফিরে শুলেন। মশাইয়ের কথা বলি—বয়োজ্যেষ্ঠ—নইলে বলতাম ন্যাকামো আর খোশামোদ তাঁর একনাগাড়ে চলছিল। আমার সত্যি তাঁর উপরে দয়া হল। ভাবলাম, উমাশাশুড়ী তখন অত নিষ্ঠুর না হলে বেশ হত। শেষে মশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, "এতক্ষণ ধরে তোমাকে অনুনয় করছি, তবু তুমি কথা কইছ না? লোকে তোমায় মিছিমিছি 'লক্ষ্মী লক্ষ্মী' বলে গুণগান করে। এই দেখো, আমি সত্যি তোমার পায়ে পড়ছি তা হলে তো দয়া করবে।" এই বলে তিনি সত্যি উঠলেন, আর স্ত্রীর পায়ের কাছে গেলেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি 'ও কী!' বলে উঠে দাঁড়ালেন।

"তবে কথা কইছ না কেন? হাজারবার ক্ষমা চাইলেও কথা বলছ না, তাই ভাবলাম পায়ে ধরে দেখা যাক।"

"তাইতো, আগে জুতো মেরে, পরে পা ধরলেই হল! তার চেয়ে দু'টোই না করলে চলে না?"

"সময়মত দুইই করতে হয়। আচ্ছা বেশ, জুতো আমিই মারি, আর

পাও তো আমিই ধরছি!"

তিনি চুপ করে রইলেন। তখন ঠাকুর আবার বললেন, "বেশ, কিন্তু এখন তো প্রায়শ্চিত্ত করেছি? তোমার সামনে লক্ষ্মীছাড়াটাকে এনে বেদম মারব? তা হলে তুমি সন্তুষ্ট হবে?"

উমাশাশুড়ী তবুও চুপ করে রইলেন। এমন সময় কে যেন বাইরে থেকে দুয়োর খুলল। অমনি মশাই চট করে একটু দূরে সরলেন, কিন্তু আবার কেউ নেই দেখে বললেন, "ওগো, সেদিন তোমার ভাই কতকগুলো টাকা পাঠিয়েছিল, তা কই আমার হাতে তো দিলে না? আমার সঙ্গে আজকাল অমন প্রতারণা করতে আরম্ভ করেছ কেন? কীসের টাকা? কোথায় রেখেছ? আমি তো জানতেই পারিনি। কাল বসু বলল, কোথায় সে টাকা?" এই প্রশ্ন শুনে তাঁর এতক্ষণের আচরণের মর্ম বুঝতে পারা সম্ভব হল; আর তার পরের কথোপকথন শুনে সেটা স্পষ্ট হল। মশায়ের সে প্রশ্ন শুনে উমাশাশুড়ী শুধু বললেন, "সে টাকা বড়মার হাতে দেওয়া হয়েছে, তাঁর কাছেই আছে।"

"কেন? তাঁর কাছে কেন? আমি কি পটোল তুলেছিলাম? বেশ, বল তো কোন্ মূর্খ সে টাকা তাঁকে দিল? বেশ, দিল তো দিল, তুমি চেয়ে নিয়ে আমাকে দাওনি কেন? তুমি আজকাল বড়ো—সে যাই হোক—এখন সে টাকা ওঁর কাছ থেকে চেয়ে আমার হাতে এনে দিতে হবে।"

"সে কী কথা? ওঁর কাছে এখন কি করে চাইব? কী বলব ওঁকে?"

"সে তুমি যা খুশি বলো, আমার টাকা আমার হাতে আসতেই হবে। ওসব গণ্ডগোল আমি জানি না।"

"কিন্তু আমি এখন চাইব কী করে? উনি আমাকে কী বলবেন? কিছু ভেবে দেখেছ?"

"সে তোমারটা তুমি যা ইচ্ছে ভেবে দেখ। টাকাগুলো হাতে পেলে আমার কিছু বলার নেই।"

"আমি সে-টাকা মোটেই চাইতে যাব না। তুমি যা খুশি বলতে পার।"

"আমি তোমাকে দিয়ে সে-টাকা ঠিক চেয়ে নেব। দরকার হলে আমি তোমার পা ধরব, যা ইচ্ছে তা করব। কিন্তু—"

"কিন্তু কী? যত ইচ্ছে বকতে পারো। এক জন্মে—" এই বলতে

বলতে সে মা-লক্ষ্মীর চোখ বেয়ে টপটপ করে অশ্রু গড়াতে লাগল। আর তিনি মাথা নিচু করে বসলেন।

"আমি ওসব অযথা কান্নাকাটির ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারি! সে-টাকা আমাকে কালকে দিতেই হবে। নইলে দেখবে আমি কেমন আগুন ধরিয়ে দেব।" এই বলে মশাই সেখান থেকে হন্ হন্ করে চলে গেলেন। আমার বোঝা যেন হালকা হল। কিন্তু আবার বাইরে যাই কী করে তাই ভাবতে লাগলাম। কেননা, উমাশাশুড়ী বাইরে না গিয়ে সেখানেই শুয়ে রইলেন। কী করি? বাইরে গেলে নিজের আর স্বামীর কথোপকথন এ-মেয়েটা শুনেছে ভেবে তিনি নিশ্চয় রাগ করবেন। যদি না যাই, তাহলে ওদিকে মেয়েটা কোথায় গেল বলে হৈচৈ পড়ে যাবে। আর তখন আমি ভাঁড়ার ঘরে বসে আটা ছাঁকছিলাম তা জানতে পারবেন। এই ভেবে আমি এক মিনিটও আর বিলম্ব না করে উমাশাশুড়ীর কাছে গেলাম, আর কাঁদতে কাঁদতে শুধু এই বললাম, "আমি ঘরের ভিতরে ছিলাম।" সে-কথা শুনে তাঁর চেহারা কেমন অদ্ভুত দেখাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিতরে ছিলে? কোথায়? কখন?" আমি কিছুই না লুকিয়ে কোথায় বসেছিলাম, কেন বসেছিলাম, কী করছিলাম সব বললাম, আর কাঁদতে লাগলাম।

এক মুহূর্ত তিনি কিছুই বলেন না। তারপর তাড়াতাড়ি বললেন, "তুমি সেই সময়েই ওখান থেকে চলে গেলে পারতে। আচ্ছা বেশ, এখন আর কাউকে কিছু বোলো না; তা হলেই হবে।"

তিনি যেই একথা আমাকে বললেন, "আচ্ছা যাও," ঠিক সেই সময় রাধাশাশুড়ী সেখানে এলেন। "আটা কি নতুন তৈরি হচ্ছে নাকি?" বলে তিনি গর্জন করলেন।

কিন্তু উমাশাশুড়ী তাড়াতাড়ি বললেন, "না, না, আটা ছাঁকা ওর কখন হয়ে গেছে, কিন্তু আমিই ওকে একটু পা টিপে দিতে বললাম, তাই একটু দেরি হল।" এই বলে তিনি আমার দিকটা সামলে নিলেন। কিন্তু তাঁর কথা কে শোনে? বাড়িতে তাঁর কোনো মান থাকলে তো? তিনি আমার পক্ষ নিয়ে দু'কথা বললেন কিনা, তাই বোধহয় রাধাশাশুড়ী বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে আরও বেশি বকতে লাগলেন। সে যাই হোক, সেদিন উমা-শাশুড়ী আমার দিকটা সামলে নিলেন এ কথা সত্যি। নাহলে রক্ষা

ছিল না। ঠাকুর জানতে পেতেন যে আমি যে-ঘরে বসে আটা ছাঁকছিলাম, আর তাঁদের কথা বোধহয় আমি শুনেছি ভেবে আমার উপর তাঁর প্রতিকূল ধারণা হত। তিনি নিশ্চয় আমাকে শাস্তি দিতেন। আমি সে আপদ থেকে রক্ষা পেলাম, না হলে তাঁর কুৎসিৎ মন্তব্য শুনে শুনে হয়রান হতে হত।

উপরে যে-টাকার বিষয়ে শংকরঠাকুর আর উমাশাশুড়ীর কথোপকথন লিখেছি, তা পড়ে তারপরে সে টাকার কী হল তা জানতে অনেকে কুতূহলী হয়ে থাকবেন। তাঁদের সে কৌতূহল অতৃপ্ত রাখা উচিত হবে না। তা ছাড়া সে-টাকার যা হল, সে কথা কেমন যেন অদ্ভুত, তাই তা পড়ে মজাও পাবেন। তিনদিন হয়ে গেল। উমা শাশুড়ী অবশ্য সে টাকা বড়মার কাছ থেকে চেয়ে নেননি। টাকাগুলি উমাশাশুড়ীর ভাই কোনো এক উপলক্ষে শাড়ি কিনবার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ভায়ের পৈতে হয়েছিল, তখন শংকরঠাকুর উমাশাশুড়ীকে বাপের বাড়ি যেতে দেননি। ছোট ঠাকুর, আমার শাশুড়ী, সকলে খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁকে যেতে অনুমতি দেননি। এতে তাঁর কী উদ্দেশ্য ছিল কে জানে! উমাশাশুড়ীর ভাই পাড়াগাঁয়ে থাকতেন, সেখান থেকে শাড়ি কিনে পাঠানো তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। তাই একজনের হাতে টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, "তোমার পছন্দমতো শাড়ি কিনো।" তাঁর খবর স্পষ্ট এই ছিল যে, যে "যে রকম শাড়ি তোমার চাই তা এই ভদ্রলোককে বোলো, ইনি তোমাকে শাড়ি এনে দেবেন।" কিন্তু উমাশাশুড়ী সে ভদ্রলোককে বললেন, "আপনি টাকাগুলো বড়মাকে দিন, শাড়ি আনতে হবে না।" আসল খবর কী ছিল সেটা ঠাকুরঝির কথা লাগাবার অভ্যাসের ফলে বেরিয়ে পড়ল। উমাশাশুড়ী আর তাঁর ভায়ের মিছিমিছি ভৎর্সনা হল। "আমরা টাকা ক'টা খেয়ে বসতাম না কি? শাড়ি এনে দিতে বলবার কী দরকার? বোনের উপর অত মায়া ছিল আমাদের উপর বিশ্বাস ছিল না, তবে শাড়ি কিনে পাঠালেই হত, আর অতো করার পরও শাড়িটা যদি আমরা তাকে পরতে না দিতাম, তা হলেই বা কী করত?" মাগো মা! সে কী এক কথা? বড় মা আর রাধাশাশুড়ীর মুখ অবিরাম চলছিল এইভাবে!

এই ছিল সে-টাকার আগেকার ইতিহাস। এই অবস্থায় শংকরঠাকুর

স্ত্রীকে সেটাকা চেয়ে দিতে বললেন। একে তো উমাশাশুড়ীর মতো মানিনী স্ত্রী, তার উপর যে টাকার জন্য এতো গোলমাল হয়েছিল, তখন তিনি কী করে সে-টাকা আবার চাইতে যাবেন? কিন্তু পরে এইজন্য তাঁকে কত অবমানিত হতে হল!

উপরে লিখেছি যে সে টাকার নাম না করে তিন দিন কেটে গেল। তবুও সে টাকা নিজের হাতে পাচ্ছেন না দেখে, বোধকরি বিরক্ত হয়েই, চতুর্থ দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শংকরঠাকুর তামাক চিবুতে চিবুতে নিজের মার কাছে উপস্থিত হলেন। ভ্রূকুটি করে তিনি বললেন, "মা, একী জ্বালা তুমি আমার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছ! আজ চার-পাঁচ দিন ধরে আমার মাথার কাছে খিট্ খিট্ চলছে। 'টাকা কটা চেয়ে নাও' করে আমার মাথা খাচ্ছে। অমন উতলা মানুষের টাকা তোমার কাছে রেখেই বা কী দরকার? তুমি সত্যি কি কিছু টাকা চাও? আমি দেব তোমায়। কিন্তু তুমি সে কোথাকার কী টাকা দিয়ে ফেল। আমার জ্বালা শান্ত হোক। অত কীসের টাকা?"

শংকরঠাকুরের মুখে এই রকম অসত্য কথা শুনে আমি অবাক হলাম! বড়মা রেগে আগুন হলেন। তিনি গা ধুয়ে গরদের কাপড় পরে সবেমাত্র জপ করতে বসেছিলেন। কিন্তু উঠে পড়লেন আর তর্ তর্ করে গিয়ে আলমারি খুলে টাকা ক'টা এনে শংকরঠাকুরের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর তার যা মুখ চলতে লাগল, তার না আদি না অন্ত। তাঁকে আরও উত্তেজনা দেবার জন্য মাঝে মাঝে ঠাকুর নিজের বুদ্ধি খাটাচ্ছিলেন। মা, যার টাকা সে চাইল, তাতে তোমার অতো রাগ কেন? তোমার কি সত্যি টাকার দরকার? আমাকে বলো, আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। তাতে কী? আমি ও-টাকার নাম পর্য্যন্ত করতাম না, কিন্তু তিন-চার দিন ধরে যখন খিট-খিট অনবরত চলতে লাগল—তখন ভাবলাম যথেষ্ট হয়েছে এই জ্বালা। একবার আমি এও বললাম, 'তোমার টাকা তুমি চেয়ে নাও না কেন? আমাকে কেন মিছিমিছি জ্বালাতন করো? কিন্তু শুনছি যে, তোমার কাছে দু'তিনবার চাইলেও নাকি তুমি সে কথা অগ্রাহ্য করেছ?" এইরকম অনেক কথা বলে শংকরঠাকুর বেশ আগুন ধরিয়ে দিলেন। আসল ব্যাপার কে কী করে জানবে? উমাশাশুড়ীর কী সাধ্য যে মুখ ফুটে সত্যি কথা ব্যক্ত করেন? আমি কারো কাছে বললে, সে যে ভয়ানক কাণ্ড হত! টাকা হাতে

পাবার জন্ত ঠাকুর যে কত নীচ উপায় অবলম্বন করলেন, তা দেখে উমা-শাশুড়ীর প্রাণ কেমন কাতর হয়েছিল তা কি কেউ বলতে পারে। লোকে যে বলে স্ত্রী-জন্ম মানেই মুখ বুঁজে সব জালা সহ্য করা, তা যে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য!

বাপের বাড়ির খবর

এর আগের পরিচ্ছেদে যে ঘটনাটি বলেছি তার পরে বাড়ির সবাই উমাশাশুড়ীর উপর কেমন ক্রুদ্ধ হয়েছিল তা আর বলে দরকার নেই। বড়মা যা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন তার বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। "আমি কি ভিক্ষুক? ওর টাকাতে আমার কী দরকার ছিল? আমি কি টাকা খেয়ে বসতাম? ওর টাকায় ওর জন্যই তো শাড়ি আনাতাম।" —সে কি এক কথা—একেবারে অনর্থ বাধিয়ে দিলেন! ছোটশাশুড়ী মাঝে মাঝে ফোড়ন দিচ্ছিলেন! উমাশাশুড়ী বেচারী একটি কথাও বললেন না। কী সাধ্য কিছু বলেন তেমন কামানের সামনে। তাতেও আবার শংকরঠাকুর আগুনে তেল ঢেলে দিচ্ছিলেন। আমার বয়স অত অল্প ছিল, কিন্তু ব্যাপার দেখে আমারও ভয়ানক রাগ হল। কিন্তু কী উপায়? "দুর্বলের রাগে তারই গা জ্বলে," সেই দশা! আমার যদিও অত রাগ হল, সত্যি কথা বলে ফেলতে অত ইচ্ছে হল, তবু কী করি? আমার কী সাধ্য কাউকে বলি? আর যদিও বলি, কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? 'অকালপক্ব', 'লাগানি' বলে আমারই নাক কাটা যাবে। কিন্তু সেদিন আর তারপরে দু-তিন দিন উমাশাশুড়ীকে অবিরাম কাঁদতে দেখে আমার কী দুঃখ হচ্ছিল তা আমি প্রকাশ করতে পারছি না। শংকরঠাকুর কি মানুষ, না রাক্ষস, তাই আমি বুঝতে পারছিলাম না, এখনো তা বুঝতে পারিনি।

এই ঘটনার দু-তিন দিন পরে আমাকে বাপের বাড়ি থেকে নিতে এল। তখন বড় কষ্টে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমার বাপের বাড়ি যাওয়া মানে সে আর এক কাণ্ড! বাপের বাড়ি থেকে নিতে এলে আগে বড়মার কাছে খবর যেত। তিনি খোশমেজাজে থাকলে ভালো। নইলে তিনি বলতেন, "দেখ বাবা, আগে তার শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করগে যাও, ও বৌমাকে পাঠাতে চায় কি না? এখন তো

আমি। বুড়ী হয়েছি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। কিছুতেই নেই আমি।" তিনি এই উত্তর দিলে, যে নিতে আসত সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত। কেন না, তিনি হ্যাঁ-ও বলেন নি, আবার না-ও বলেন নি। সে কী বুঝবে? শেষে হয়তো আমার শাশুড়ীর কাছে যেত, তিনি বলতেন, "এখন তুমি যাও, পরে আমি দেখব। যদি পাঠান তবে পাঠাব, না হলে পাঠাতে পারব না।" এই বলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেন। বড়মার অমন রকম দেখে আমার শাশুড়ীর ইচ্ছে থাকলেও তিনি পাঠাতে পারতেন না। একবার নয়, দু'বার নয়, হাজারবার ওরকম হয়েছে!

মা থাকতে বাড়িতে আমার যত আনন্দ হত, সে-আনন্দ এখন আর হত না, এ কথা কি বলতে হবে? তাছাড়া আজকাল বাড়িতে ঠাকুমার বড় দুঃখ ছিল, আর তিনি সব সময় মুখ ভার করে থাকতেন। আমাদের দ্বিতীয় মার স্বভাব ভারি একগুঁয়ে আর জেদী ছিল, তাই বাড়ি এসে আমার বিশেষ দুঃখ হত। ঠাকুমার সঙ্গে তার মোটেই বনত না। দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যে, ঠাকুমাকে শীগগিরই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার সৎমার মা এমন অদ্ভুত ব্যবহার করত যে ঠাকুমা তা মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। গোড়ার দিকে ঠাকুমা, ঠাকুরদা আর বাবাতে কত সদ্ভাব ছিল তাতো পাঠকেরা জানেন। দেখতে পেতাম যে ঠাকুমা ঠিক জানতে পেরেছিলেন যে এই নতুন বৌয়ের বিষয়ে কোনো তর্ক হলে নিজেকেই গাঁটরি গুছিয়ে চলে যেতে হবে। আজকাল ঠাকুমা সব কিছু সহ্য করতেন। যাই ঘটুক না কেন তিনি চুপ করে থাকতেন। নিজের মত খাটাবার চেষ্টা করতেন না। তেমন গণ্ডগোল দেখতে পেলে সুন্দরীকে নিয়ে দূরে সরে পড়তেন। খিটিমিটিও চাইনে, ঝগড়াঝাঁটিও চাইনে। বাপের বাড়ির দশা ওরকম হয়েছিল বলে আমি যে সেখানে যাবার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হতাম, তা নয়। কিন্তু হাজার হলেও সে আমার বাড়িই তো! সেখানে যেতে মন টানবে না! তাছাড়া, অমন অবস্থাতেও আমার সেখানে আর একটি বিশেষ টান ছিল। সে কারণটি ছিল আমার দাদা। আমরা দুজন পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসতাম। আমরা দুজন যতই ঝগড়া-বকাবকি করি না কেন, আমাদের ভালোবাসা অটুট ছিল, অণুমাত্রও কম হয় নি। মা মারা গিয়ে আমাদের সে-ভালোবাসা দশগুণ বেড়েই গিয়েছিল। এখন আমার বাপের বাড়ি মানে আমার দাদা,

আর দাদার আমি! এ কথা আমরা দুজনে ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, পরে তো সেকথা অক্ষরে অক্ষরে অনুভব করতে হল।

আমি বাপের বাড়ি গেলে দাদার সঙ্গে রোজ চার-পাঁচ ঘণ্টা গল্প করতাম। আমার অনুপস্থিতিতে যা যা হত সে সব দাদা আমাকে বলত। কখনো কখনো তো দাদার কথা শুনে আমার হাসি পেত। কেন না. যে সব ব্যাপার মেয়েদের পক্ষেও লক্ষ্য করা দুঃসাধ্য, সে সব ঘরের কথা, বিশেষতঃ আমাদের সৎদিদিমার চালচলন দাদা যা বলত, সে সব সে কখন আর কেমন করে যে লক্ষ্য করত তা আমি বুঝতেই পারতাম না। একদিন দাদা আমাকে বলল :

"যমু, মা আমাদের কখনো চুপিচুপি ঘি আর খেজুর খেতে দিত?"

"সে কী? আমি জানি না বাবা—" আমি হেসে বললাম।

"বেশ, মা কখনো তোর কি সুন্দরীর ভাত সেদ্ধ করার সময়, সে-ভাতে টাটকা ননীর তাজা ঘি ঢেলে দিত? তোদের পরটার ভিতর চুপি চুপি ঘি দিত?"

আমি হাসতে লাগলাম আর বললাম, "চলতে দাও, তোমার যত প্রশ্ন থাকে সব জিজ্ঞাসা করো।"

দাদা আবার গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, তোকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে স্বামীকে খোশামোদ করার শিক্ষা দিত?"

তার এই প্রশ্নটা শুনে আমার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। দাদা আর কিছু বলবার আগেই আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "যথেষ্ট হয়েছে, আর কিছু জিজ্ঞাসা করে দরকার নেই। আমি চললাম বাবা এখান থেকে। ও কী যা তা জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করেছিস!"

অবশ্য একথা আমি একটু দুষ্টুমি করেই বলেছিলাম। দাদার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম।

তখন কিন্তু ফিক্ করে হেসে দাদা বলল, "নয় তো কী? আমার মনে হচ্ছে, আমরা যে ভাবতাম যে মা আমাদের কত ভালোবাসে, তার অর্থ নেই যমু! আজকাল আমাদের নতুন মাকে তার মা কেমন ভালোবাসে, সে-ভালোবাসার রকম যা দেখতে পাচ্ছি! একেবারে আলাদা সে রকম! বেচারী সুন্দরীর পক্ষে খেতে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। বেচারী টাটকা ঘি আর খেজুর পাবে কোথা থেকে?"

আমি কখনো ভাবিনি যে দাদা অমন কুৎসিত কথা বলবে কিংবা ঘরের খুঁটিনাটি ব্যাপারে মন দেবে। কিন্তু পরিবেশ যখন বিপরীত হয়, তখন অবস্থার প্রভেদে মানুষের চালচলন, আচার-ব্যবহারও ভিন্ন হয়। কেমন যেন একটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল। মার মৃত্যুর পরে আমাদের বাড়ির রূপই যেন বদলে গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে দাদার মনের গঠনও পরিবর্তিত হল, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমি যদিও স্পষ্ট দেখতে পাই নি যে দাদার স্বাভাবিক মনখোলা ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়েছে, তবু তার স্বভাবে এক রকম কুৎসিতভাব প্রবিষ্ট হয়েছিল, এ-কথা সত্যি। তেমন হবার অনেক কারণও ছিল। দাদা যে সব ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা আমাকে বলল, সে রকম ঘটনা সত্যি সত্যি তার সামনে ঘটত। আমার দাদা আর সুন্দরীর পক্ষে খেতে পাওয়া মুশকিল হয়েছিল। আর আমাদের নতুন মা দুধ ঘিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। তা ছাড়া, আমি যদিও দাদার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, তবু আমাদের নতুন মাকে বাবার সামনে সামনে ভালো আচরণ করতে উপদেশ দেওয়া হত, এ কথা মিথ্যা নয়।

আর এক আশ্চর্য এই—বিয়ের পরে নতুন মা প্রথমবার আমার সঙ্গে যেমন মিলেমিশে খেলা করত, কথা বলত, তেমন মেলামেশা কিংবা কথাবার্তা দ্বিতীয়বার, আমি যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে এলাম, তখন আমার ভাগ্যে জোটেনি। এ রকম হতে হতে ছ'মাসের মধ্যে সবকিছু বদলে গেল, আর মার অহংকারের আর অভিমানের সীমা রইল না। আমরা তাকে 'নতুন মা' বলে ডাকতাম, তা তার পছন্দ হতনা। সে যেন তা পছন্দ না করে, এরকম শিক্ষা তার মা তাকে দিয়েছিল। একদিন সুন্দরী তাকে 'নতুন মা' বলে ডেকেছিল, তাই নতুন দিদিমা ঠাকুমার সঙ্গে ঝগড়া করল। ঝগড়ার আসল কারণ একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ছিল। সুন্দরী 'নতুন মা' বলে ডেকেছিল, তাই মাঈ সাহেব রাগ করেছিলেন। তিনি সুন্দরীকে বললেন, "খবরদার, আমাকে 'মাঈ'[1] বলে ডাকবিনে, মা বলিস বলে রাখছি।" সে মেয়েটাও একটু জেদীই ছিল, সে বলল, "কক্ষনো বলব না।" অমনি চটে গিয়ে মাঈ সাহেব তাকে এক চড়

১ মাঈ—মারাঠিতে মাকে চলতি ভাষায় ছেলেমেয়েরা 'আঈ' বলে ডাকে। সৎমাকে 'মাঈ' বলে ডাকার প্রথা আছে।

মারলেন। তখন সুন্দরী কাঁদতে লাগল, কান্না শুনে ঠাকুমা ছুটে এলেন; ঘটনা শুনে ঠাকুমাও রাগ করলেন; আর "মেয়েটাকে মারবার দরকার কি" ইত্যাদি বলে নতুন মাকে বকলেন। একবার বকাবকি আরম্ভ হলে কী কাণ্ড হয় তা সকলের জানা আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে নতুন মাকে খেতে দেওয়া, যা নয় তা শিক্ষা দেওয়া, ছেলেমেয়ের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে অযত্ন করা, সব কিছু তখন বেরিয়ে এল। হাজার হলেও বাড়ির গিন্নী তিনি! তিনি কি আর মুখ বুঁজে থাকতে পারেন? দু'-জনের ঝগড়া বেধে গেল। সে ঝগড়া বাবার আদালতে পৌঁছুল, আর তিনি দু'জনকে, "আরে বাপু, থামো থামো, হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ বেশ," করে শান্ত করলেন। বাবা বেচারী কাউকেই বকতে পারছিলেন না। স্ত্রীকে বকবেন কী করে? সে যে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আর তার মাকেই বা বকেন কেমন করে? সেও যে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মা। ঠাকুর-মাকেও বকবার জো ছিলনা। তাই, "মেয়েটাকে না মারলেও চলত, মুখের কথায় কাজ হত।"—এই রকম একটা কিছু আমতা-আমতা করে বলে তিনি ব্যাপারটা ধামাচাপা দিলেন।

সম্ভবতঃ এই ঝগড়ার দিনটা আমার বাপের বাড়ির সুখের শেষ দিন! দাদাও এ-বিষয়ে তার মতামতের কথা আমায় স্পষ্ট করেই বলল। সেও ঠিক ভাবত যে বাড়ির সুখ যাকে বলে সেটা নিশ্চয় এ জন্মের মতো আমাদের কপালে শেষ হয়েছে, আর পরে সত্যি তাই হল।

এই ঝগড়ার পর দু মাস কেটে গেল। নতুন মা পূর্ণবয়স্কা হল, আর ধর্মরীতি-মাফিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি হল। তারপরে চার ছ'মাসের মধ্যেই বাড়িতে তার আর তার মার প্রভুত্ব বাড়তে বাড়তে ঠাকুমার অবহেলা আরম্ভ হল। দু'-একবার ঠাকুমা বাড়ি চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বোধহয় বাবার তা ভালো লাগেনি, তাই তিনি অনুরোধ করে তাঁকে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু ঘরের দুর্দশা তিনি চুপ করে দেখতেও পারতেন না, আর একটি কথা বলতে গেলেই অমনি ঝগড়া বেধে যেত। রোজ যখন তেমন ব্যাপার হতে লাগল, তখন দাদা একদিন ঠাকুমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, "ঠাকুমা, রোজ রোজ এমন অপমান সহ্য করার চেয়ে সুন্দরীকে নিয়ে তুমি বাড়ি চলে

যাও, সেই ভালো।" ঠাকুমারও সেই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে-বেচারী আমাদের দু'জনের জন্য সব অপমান সহ্য করে থাকত। শেষে দাদা তাকে বলল, "ঠাকুমা, এত অপমান কি সহ্য করা যায়? তুমি যাও, আমাদের জন্য তুমি ভেবোনা। আমি তো আর ছোটো নই। যমুও ছোটো নয়। তা ছাডা ও আজকাল এখানে বেশি আসেই বা কখন?" দাদার সে স্নেহময় কথা শুনে ঠাকুমার মন কেমন করতে লাগল, তিনি কেঁদে ফেললেন। কী আপদ! এসব ব্যাপার সেই লক্ষ্মীছাড়ী, কর্কশা, সৎদিদিমা-রূপিনী ডাইনী বুড়ী, কোথা থেকে যেন দেখেছিল। তাই নতুন মার মারফত বোধহয় বাবার কাছে 'রিপোর্ট' গিয়েছিল, কেননা, দ্বিতীয় দিন বাবা একেবারে রুষ্ট ছিলেন। আর ঠাকুমা যখন যাবার কথা তুললেন তখন বললেন, "বেশ, যাও, এখানে যদি তুমি সুখ না পাও, তা হলে যেখানে তুমি সুখে থাকতে পাবে সেখানে যেতে পারো; আমার কোনো আপত্তি নেই। আর ও মেয়েটারও যদি এখানে না বনে, তাহলে ওকেও ইস্কুল-টিস্কুল ছাড়িয়ে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে বলো।" বাবাগো! ব্যাপারটা যখন অতদূর পৌঁছুল, তখন ঠাকুমা কী করে থাকতে পারেন? দাদাকে সঙ্গে করে সুন্দরীকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন। এইরকমে মা চলে যাবার আট-দশ মাসের মধ্যেই আমার কপালে বাপের বাড়ীর নামটা মুছে গেল!

এক মা মারা গিয়ে কী অনর্থ ঘটল! তিনি যখন ছিলেন, তখন বাড়িতে বেশ নিয়মশৃঙ্খলা ছিল। আর এখন! আমার সে গুণবতী মা গিয়ে, এই নতুন, একেবারে দরিদ্র, আর হঠাৎ সিংহাসন পেয়ে উদ্ধত, আর তার দরিদ্র মার কুশিক্ষায় দুষ্ট, বজ্জাত মা এসে আমাদের শাসন করতে লাগল। আমাকে আর দাদাকে সে বড় বড় উপদেশ দিতে লাগল। হাসব না কাঁদব! দাদা বেচারা তার পাশেও যেত না। সে কিছু বললে শুনেও শুনতো না। নতুন মা দাদাকে "দাদা" এই ডাক নাম ধরে ডাকত না। "ওরে গণপতি, ইস্কুল যাবিনে? বসে রইলি যে? এগারোটা বেজে গেছে," দাদার সঙ্গে এই রকম করে সে কথা বলত। বাবা আশে-পাশে থাকলে, বাবার সামনে দাদাকে যত্ন করবার ঢং করত। তখন দাদাকে জিজ্ঞাসা করত, "গণপতি, আজ ভালো করে পেট ভরে খেলিনে যে? মাথা ধরেছে নাকি? ওষুধের লেপ দেব?"

তাই শুনে বাবা কী ভাবতেন জানি না! কিন্তু ওই অতটুকু মেয়ে, সে যখন অকালপক্কের মতো ফ্যাশন করে খোঁপা বেঁধে, কোমরের এক পাশে হাতরুমাল গুঁজে, অপর পাশে চাবির গুচ্ছটা ঝুলিয়ে ঝন্ ঝন্ করে বাজাতে বাজাতে, এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াত, তখন সত্যি আমাদের হাসি পেত। আমাদের নিজের মা কক্ষনো ও রকম করেন নি, তাই আমাদের বিশেষ আশ্চর্য মনে হত। এ হল তার রোজকার বেশ। আর সে যখন "হলুদ কুঙ্কুমের"* জন্য অন্য কোনো বাড়িতে যেত, তখনকার বেশ আর সাজসজ্জা যা থাকত, তা বলে দরকার নেই। তার বর্ণনা না করাই ভালো। কেননা, শত হলেও সে যে আমাদের মা! তার বিষয়ে যে এত লিখেছি তাই অনুচিত হয়েছে। কিন্তু কী করি? আমার নিজের মা আর নতুন মা দু'জনের চালচলন আর আচরণে যে ভয়ানক তফাত, তা দেখে আশ্চর্য না হয়ে থাকা অসম্ভব। আর সে বিষম তফাত দেখে মন যখন আকুল হয়ে ওঠে তখন কিছু না লিখে যে থাকতেই পারি না! মনের এ-অবস্থা যারা অনুভব করেছে, তারাই তা বুঝতে পারবে।

সার কথা, আমার বিয়ের পর বছর দু-একের মধ্যে আমার বাপের বাড়ির দশা এই রকম হল। আর শ্বশুরবাড়ির দশার কথা তো আগেই লিখেছি।

ঠিক দু'বছর হয়ে গেল। আমার বাপের বাড়ির অবস্থা দিনে দিনে বিষম হতে লাগল। তারা আর বড় বেশি আমাকে নিতে আসত না। আর নিতে এলে যখন সেখানে যেতাম, মাঈ সাহেব সর্বক্ষণ ভ্রূকুটি করেই আমার দিকে চেয়ে দেখতেন। বাবার সামনে কিন্তু আমাদের যা ভালোবাসতেন, যত্ন করতেন, তার কি বর্ণনা করা যায়! এদিকে দুর্গীর মার সঙ্গে মাঈ সাহেবের রোজ ঝগড়া হতে লাগল। আর সৎ দিদিমাতো

* মহারাষ্ট্রীয় সীমন্তিনীদের এক উৎসব। এই উপলক্ষে সীমন্তিনীরা সেজে-গুজে যে-বাড়িতে 'হলুদ কুঙ্কুম' থাকে সে-বাড়ি যায়। তাদের কপালে বাড়ির সীমন্তিনীরা হলুদ আর কুঙ্কুমের ফোঁটা পরিয়ে দেয়। তাদের হাতে আতর দিয়ে, গায়ে মাথায় গোলাপ জল সিঞ্চন করে, ফুল দেয়। আর যার যেমন সম্বল তেমনরূপে সে দিনটা আনন্দোৎসব করে কাটায়। চৈত্রমাস হলুদ কুঙ্কুমের মাস। এইমাসে সুবিধামতো দিনে বাড়িতে হলুদ কুঙ্কুমের সমারোহ করা হয়। চৈত্রমাস ছাড়া আরও অনেক উপলক্ষে সীমন্তিনীরা 'হলুদ কুঙ্কুম' করে থাকে।

"আঁচলে আগুন নিয়েই"[১] ঝগড়া করত। বহিনাকাকীমার সঙ্গে সে শুধু শুধুই ঝগড়া করতে আরম্ভ করল। সৎমা আর সৎ-দিদিমার ঝগড়ার জ্বালায় বিরক্ত হয়ে দুর্গীর বাবা সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় বাসা ভাড়া নিলেন। ইত্যবসরে বাবা কোথায় যেন চাকরি পেলেন। তখন দুর্গীদের ঘরে ভাড়াটে না রেখে তিনি সমস্ত বাড়িটা নিজে নিয়ে নিলেন। এখন পর্য্যন্ত বাপের বাড়ি এলে পরে দুর্গীর কাছে তবু সুখদুঃখের কথা বলতে পারতাম। এখন সেও চলে গেল। সত্যি, এখন আর তার সঙ্গে দেখা হওয়া কি সম্ভব? আমাদের মেয়েদের একবার বিয়ে হয়ে গেলে বোনে বোনে দেখা হওয়াও মুস্কিল। সব ব্যাপারেই অন্যের মনের মতো চলতে হয়। পরস্পরের কুশল সংবাদ পাঠানোও মুশকিল হয়ে ওঠে। একে তো লেখাপড়ার নামে মস্ত বড় শূন্য; আর যদিও বা কেউ কেউ একটু আধটু লিখতে পারি, তবু চিঠি লেখা মানে যে ভয়ানক পাপ! তুলনায় ব্রহ্ম-হত্যার পাপও নাকি অত বড় নয়! সত্যি, আমরা এক জায়গায় মানুষ হই, খেলাধুলো করি, এক মায়ের সন্তান, কিন্তু পরে একের অন্যের মুখ দেখতে পাওয়াও মুশকিল হয়ে ওঠে! পরস্পরকে কিছু দিতে-নিতে ইচ্ছে করলেও সে ইচ্ছা মনে চেপে রাখতে হয়। মেয়েজাতির জন্মই এমন কপালদোষে!

দুর্গীর সঙ্গে আমার দেখা হবার পর ছমাস হয়ে এল। একেবারে হঠাৎ একদিন চৈত্রমাসে হলুদ কুঙ্কুমের জন্য যাবার সময় তাকে পথে দেখতে পেলাম। তার শাশুড়ী তার সঙ্গে ছিলেন, তাই বেশী কথা বলতে পারিনি। তবু সে চট করে আমার কাছে এল। ওমা! দুর্গীর কী দশাই না হয়েছিল! চোখ দুটো যেন একেবারে গর্ত্তে ঢুকে গিয়েছে, গাল শুকিয়ে একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, আর সে একেবারে ভয়ানক রোগা হয়ে গিয়েছে! আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব, "এ কী! তোর এমন দশা কেন?" কিন্তু দুর্গীই তাড়াতাড়ি আমাকে বলল, "যমু, তোকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করে। কী করে ভাই তোর সঙ্গে দেখা হবে? অনেক কথা তোকে বলব।" এমন সময় তার শাশুড়ী তাকে ডাকলেন, তাই সে চট করে চলে গেল। কিন্তু যেতে যেতে সে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। তার চোখ ছল ছল করছিল আর মনে হচ্ছিল যে বুঝি এখুনি চোখ বেয়ে জল

১ একটি মারাঠি প্রবাদ।

গড়িয়ে পড়বে। তার সে কাতর দৃষ্টি দেখে আমারও বড্ড দুঃখ হল। আমার চোখেও জল এল, কিন্তু কাঁদতে কি পারি? আমার সঙ্গেও ছোটো মামীশাশুড়ী ছিলেন। দুর্গীর সঙ্গে দু'কথা বলবার জন্ম আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তাও তাঁর ভালো লাগেনি। তিনি আমাকে ডাকলেন, "অত কী গল্পগুজব চলছে? চলো এগিয়ে চলো। মাগো মা! এইটুকু মেয়েরাও আবার চুপিচুপি কী কথাই না কয়!"

দুর্গীর শাশুড়ী তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন, আর আমিও আমার মামীশাশুড়ীর সঙ্গে পথ চলতে লাগলাম। কিন্তু আমার মন ছিল দুর্গীর সঙ্গে, তার দিকে। তার অমন দশা কী করে হল? ও আমাকে কী বলতে চায়? ওর শ্বশুর বাড়িতে তারা ওকে ভয়ানক জ্বালাতন করে? ওর নিশ্চয় ভয়ানক কষ্ট! এই সব ভাবতে ভাবতে আমি বড় কষ্টে পথ চলছিলাম। দুর্গীর সেই দশা, তার সেই শেষের চাহনি কেমন যেন আমার বুকে বিঁধে গিয়েছিল। তার সত্যি কী অবস্থা তাই জানার জন্ম আমি অত্যন্ত উতলা হলাম।

কিন্তু এখন তার সঙ্গে দেখা করব কী করে? তার বাড়ি গিয়ে বসে তার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলতে হলে কত ব্যাঘাত! আগে আমাকে নিজের বাপের বাড়ি যেতে হবে, সেখানে মাঈ সাহেবের অনুমতি গ্রহণ করে তবে দুর্গীর বাড়ি যেতে হবে। তা না হয় হল, তবু দুর্গীর শাশুড়ী তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে তো! এত সব হওয়া কি সহজ কথা? দুর্গীর সঙ্গে দেখা করবার জন্ম কী যুক্তি করি তাই ভাবছিলাম, আর একের পর এক যুক্তি মনে উকি মেরে যাচ্ছিল। কিন্তু সে সব উপায় যে ঠিক উপযোগী হবে তা মনে হচ্ছিল না। শেষে রাত্রে একটা উপায় মনে মনে ঠিক করলাম, সেটা এই—আমার বাপের বাড়িতে (এ বছরের) হলুদ কুঙ্কুম এখনো হয় নি। যাই হোক, হলুদ কুঙ্কুমের দিন আমাকে সেখান থেকে নিশ্চয় নিতে আসবে আর সেদিন আমি সেখানে থাকতে পাব। তখন কোনো রকমে মাঈ সাহেবের অনুমতি নিয়ে, দুর্গীকেও একদিনের জন্ম আমাদের বাড়িতে ডেকে আনলেই হবে। আশা ছিল, দুর্গীকে ডেকে পাঠালে দুর্গীর মা তাকে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবেন। তা হলে সব কিছু স্পষ্ট জানতে পারব।

এই মৎলব যেই মাথায় এল, অমনি আমার বড়ো আনন্দ হল, আর

সে আনন্দে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি যে আমাকে নিতে এসেছে! তখন আমার যা আনন্দ হল, তা কি কথায় প্রকাশ করা যায়! আমি উপায় ভেবে পেলাম, আর ঠিক তার দ্বিতীয় দিনেই হলুদ কুঙ্কুমের জন্য আমার বাপের বাড়ি থেকে নিতে এল; তখন আমি ভাবলাম যে আমি নিশ্চয় দুর্গাকে দেখতে পাব। তাকে আমাদের বাড়ি থাকতে বলব আর সব কিছু জানতে পারব। আমার তো আনন্দ হলই, কিন্তু আগের দিন যমুর সঙ্গে দেখা হয়ে কথা বলা-মাত্র, পরের দিন আবার তার সঙ্গে দেখা হবার আর তার কাছে এত দিনের বুকে-চাপা যত দুঃখ প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে, দুর্গীরও কত আনন্দ হবে ভেবে, আমি কত যে খুশি হলাম।

হলুদ কুঙ্কুম ছিল, তাই আমাকে পাঠাতে কেউ কোনো আপত্তি করল না। দরকার মতো গয়নাগাঁটি আর ভালো কাপড় পরিয়ে যে-ঝি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল তার সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

ভাবলাম সোজা বাবার ওখানে না গিয়ে আগে দুর্গীর বাপের বাড়ি যাওয়া যাক; দুর্গার মাকে দুর্গীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসতে বলা যাক, আর দুর্গী যদি সেখানেই থাকে, তা হলে তাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গেলেই হবে। আমি ঝিকে সে কথা বললাম, কিন্তু সে আমার কথা শুনল না। সে আমাদের পুরোনো ঝি ছিল না। নতুন রাজত্বে সবাই নতুন। এখনকার নতুন ঝির রকমও নতুন ছিল। সে নির্দিষ্ট ক'টা কাজের চেয়ে বেশি কাজ করত না আর দাদার আর আমার কাজ একেবারেই করত না। আমি তাকে দুর্গীর বাড়ি যাবার কথা বলামাত্র সে স্পষ্ট বলল, "তা বাপু হবে না। তুমি সোজা বাড়ি চল, তারপর গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করে যেখানে খুশি যাও।" কী করব? চুপ করে সোজা বাড়ি গেলাম। ঠিক করলাম, আর তাকে ডাকতে যাব না। কিন্তু তেমন প্রতিজ্ঞা কতক্ষণ টিকতে পারে! বাড়ি গিয়ে দু'দণ্ড হতে না হতেই ভাবতে লাগলাম মাঈ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি আজকাল কোনো কিছুই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম না। কেননা, ঠিক জানতাম যে, অনুমতি চাইতে গেলে নিশ্চয় পাব না। তত বেশি দরকার হলে, বাবা আশে-পাশে কোথাও আছেন দেখে নিয়ে উঁচু সুরে জিজ্ঞাসা করতাম, কেননা, এ

রকম ক্ষেত্রে "না" উত্তরের সম্ভাবনা কম থাকত। তাই দুর্গীকে ডেকে পাঠাবার জন্য কী উপায় করব ভাবতে ভাবতে মাঈ সাহেবের কাছে যাচ্ছিলাম, এমন সময়, কী আশ্চর্য মাঈ সাহেব নিজেই অকালপক্কের মতো চেহারা করে, গম্ভীরভাবে বলল, "যমু, দুর্গীকে তুই কি ডাকতে চাস? জানকী বলছিল যে তুই নাকি তাকে সোজা তাদের বাড়ি যেতে বলেছিলি? বেশ তো, দুর্গীকে ডেকে নিয়ে আয় গিয়ে।" অমনি তার মা বলল, "হ্যাঁ, দেখ, কী যে রকম! ওমা! ওকে ডেকে কী কাজ? বাড়িতে ধর্ম্ম-কর্ম্ম হচ্ছে। সত্যি, তোর যা রকম চিনু!"[১] অমনি মাঈ সাহেব জোরে ঘাড় নেড়ে বললেন, "বেশ, বেশ, তোমার তাতে কী? মেয়ের জাত, বান্ধবী এলে আনন্দ হয়, আর ও এলে কি খরচপত্র বেশি হবে, না কী হবে? যা মা, যমু তুই যা। জানকী, ওর সঙ্গে গিয়ে দুর্গীকে নিয়ে এস।"

মাঈ সাহেবের তেমন ভালো মানুষের মতো আচরণ দেখে আমি একেবারে অবাক। আর দুর্গীকে ডাকতে অনুমতি পেয়েছি তাতে আনন্দ যত না পেলাম, তার চেয়ে আশ্চর্য হলাম ঢের বেশি। ভাবলাম "কী ব্যাপার! আজ মাঈ সাহেব এমন উদারপ্রকৃতি হলেন কী করে?" তার কারণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কেননা, বাবাও ধারে-কাছে কোথাও ছিলেন না। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে বসে থাকবার সময় ছিল না। "গাছের ফল ঝরে পড়ন্ত দেওয়া কোনো কাজের কথা, নয়"—সেই প্রবাদ মেনে নিয়ে আমি তক্ষুনি জানকীকে সঙ্গে করে দুর্গীর বাড়ি গেলাম।

দুর্গী সেখানেই ছিল। তাই দেখে আমার অসীম আনন্দ হল। দুর্গীর মা আর ঠাকুমাকে দুর্গীকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে বললাম। তখন তাঁরা বললেন, "তোর মা কী বলবে? কেন বাছা ওকে নিয়ে যাচ্ছিস? তোর যে কষ্ট সহ্য করতে হবে?" এই বলে তাঁরা প্রথমে অনুমতি দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু আমি যখন খুব পীড়াপীড়ি করলাম, তখন তাঁরা ওকে নিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন। আমি নিতে এসেছি দেখে দুর্গীর খুব আনন্দ হল! তক্ষুনি তার মুখ প্রফুল্ল হল। তার গা-ধোওয়া হয়নি, তাই তাকে তাড়াতাড়ি গা ধুতে বললাম। সে গা ধুতে নিচে গেল, আমি ততক্ষণ বহিনাকাকীর কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলাম। তিনি আমার কুশল খবর জিজ্ঞাসা করলেন। আমি অল্প কথায় সব কিছু

১ মাঈ সাহেবের বাপের বাড়ির ডাক নাম—চিনু।

বললাম। তারপর "দুর্গী অমন শুকিয়ে গিয়েছে কেন?" বলে আমিও জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে তার অসুখ করেছিল। দুর্গী গা ধুয়ে উপরে এল। তাড়াতাড়ি কাপড় পরল, আর আমরা বেরোব এমন সময় বহিনাকাকীমা বললেন, "দুজনে কিছু খেয়ে নাও মা, বাইরে যাবার সময় খাবার নাম করলে, না খেয়ে বাইরে যেতে নেই"—এই বলে তিনি আমাদের হাতে মিষ্টি দিলেন।

চট করে খেয়ে আমরা বেরোব, এমন সময়—নসিবের কাণ্ড একেই বলে—দুর্গীর শ্বশুরবাড়ি থেকে তার দেওর তাকে নিতে এল, তাও আবার তাড়াতাড়ি, তক্ষুনি নিয়ে যাবার জন্য। কেন? দুর্গীর শাশুড়ীর মামাতো ননদের ভাগিনেয়বৌয়ের সৎ-মেয়ের 'সাধ' হবে, আর দুর্গীকে নাকি যেতেই হবে। বেশ, যে-দেওর নিতে এসেছিল, তাকে অনেক করে বুঝিয়ে বললেও সে শুনতে চাইছিল না, আর ফিরেও যাচ্ছিল না। সে বলল, "মা বলেছে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়, আমি ওকে নিয়েই যাব।" আমার বড় দুঃখ হল, আর দুর্গী কাঁদতে লাগল। বহিনাকাকীমারও বড় কষ্ট হল, তিনি বুঝিয়ে বললেন, "তুমি যাও বাপু, যা একটা কিছু কারণ বলে দাওগে।" কিন্তু সে নাছোড়বান্দা দেওর শুনতেই চাইছিল না। দুর্গীর মার ছিল একটু উগ্র স্বভাব। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "তবে চলে যাও। দুর্গী যাবে না। কী বলতে চাও?" তাই শুনে দুর্গীর দেওর তেড়েমেড়ে গালি দিতে দিতে সটান চলে গেল। দুর্গী তাড়াতাড়ি কান্না বন্ধ করে তাকে থামতে বলল, আর নিজের মার উপরেই রাগ করে বলল, "থাক। আমি যাচ্ছি। যমুর সঙ্গে পরে কখনো দেখা হবে।" সে আর সইতে পারছিল না, কেঁদে ফেলল। আর তার সেই দেওর এত নিষ্ঠুর ছিল যে সে বলল, "বৌদি, যাবে তো চল, না হলে আমি চললাম। তুমি কাঁদতে বোস।" বেচারী দুর্গী আর কী করবে? অমনি উঠল। আমাকে ইশারা করে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে বলল, "যমু, আজ বড় আশা করেছিলাম যে প্রাণ খুলে তোর সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু আমার তেমন কপাল কই ভাই! বেশ থাক। আর কখনো দেখা হলে তোকে বলব, না হলে মনের কথা মনেই থাকবে। কিন্তু যমু"—এইটুকু বলে আর সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না, তার কণ্ঠরোধ হয়ে এল। আমার কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদতে লাগল। এমন সময় তার কঠোর-হৃদয় দেওর আবার ধমক দিয়ে ডাকল, "বৌদি!" তার গজর গজর থামেই না। শেষে দুর্গা জামা-কাপড় বগলে তুলে নিল, আর আমরা দু'জন মুখ ভার করে দুর্গার ঘরের বাইরে বেরুলাম।

ঘরের বাইরে এসে রাস্তার মোড় ঘুরতেই দেখলাম যে দুর্গার বর সেখানে দাঁড়িয়ে! তাকে দেখে আমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি দুর্গাকে বললাম, "দুর্গা! ও কী?" তখন ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে আমাকে চুপ করতে ইশারা করে সে আস্তে বলল, "এ যে এই রকম ভাই! এখন কী করব?" তার পরে আমাদের দু'জনের রাস্তা আলাদা হল। আমি আমার পথ চলতে লাগলাম, আর সে তার পথে চলে গেল। তবু, আমি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, দুর্গার চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম, দুর্গা আগে চলেছে, তার বর আর ছোট দেওর পিছনে পিছনে চলেছে। সত্যি, কী ব্যাপার? দুর্গা অত শুকিয়েছে কেন? তার বর তাকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে আসে, এর মানে কী? বাড়ির কেউ কি এ কথা জানে না? যদি না জানে, তবে সে ব্যাপার গোপন থাকে কেমন করে? আর যদি জানে, তবে তা সহ্য করে কী করে? এই সব কথা, আর দুর্গার নিশ্চয় ভয়ানক কষ্ট—এই ভাবতে ভাবতে আমি যেমন এসেছিলাম, তেমনি বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে গেলাম।

এ যে এই রকম ভাই !

আশা আর নিরাশায় জগৎ কেমন ভরে রয়েছে তা মানুষ পদে পদে অনুভব করে। আজ পর্যন্ত আমার জীবনে আমি কত অনুভব করেছি। অমুক একটি ঘটনা হবে, আর সেটি হলে সব কিছুই নিজের মনের মতো হয়ে যাবে, এমন আশা জন্মায়। কখনো কখনো প্রত্যাশামতো ঘটনা হবার সব আয়োজন জমে আসে। এবার মনের মতো ঘটনা ঘটবে ভেবে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। এখন কোনো বিঘ্ন আসতে পারে এমন ভয় মোটেই থাকে না। তাই আমরা সতর্ক থাকি না, আর হঠাৎ কোনো এক অজানা বিঘ্ন এসে সমস্ত আয়োজন একেবারে ধূলিসাৎ করে ফেলে।

এরকম পরিস্থিতি আমার জীবনে অনেকবার এসেছে। তাই আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভাবতাম, আর এখনো কখনো কখনো ভাবি, আমার জন্মলগ্নের গুণই এমনি যে সব কাজের শেষে আমাকে নিরাশ হতে হবে। শুধু নিরাশাময় ঘটনাগুলিই আমার মনে আছে, অন্যগুলি মনে নেই, তাই বোধহয় আমি ওরকম ভাবি। কিন্তু ওই রকম ভাবি, এ কথা সত্যি। দুর্গীকে দেখতে আমি বড় উতলা হয়েছিলাম। যে সব ব্যাঘাত হবে বলে আমার ভয় হয়েছিল, তার একটাও হল না। যে-দুর্গী আগের দিন শাশুড়ীর সঙ্গে হলুদ কুঙ্কুমের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে যে বাপের বাড়ি এসে থাকবে তা আমি স্বপ্নেও মনে করিনি। কিন্তু বোধহয় আমার আশা সফল হবার একেবারে মুখে এসে নিষ্ফল হবার যোগাযোগ ছিল, তাই দুর্গীর মার আর শাশুড়ীর পথে দেখা হতে দুর্গীর শাশুড়ী তক্ষুনি তাকে মার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের নতুন মা আমার উপরে প্রসন্ন হয়ে নিজে থেকে "দুর্গীকে ডেকে নিয়ে আয়" বললেন, এমন কখনো ভাবিনি; তাও হল। অত সব হয়ে দুর্গী যে থাকতে আসবে, তার পথে আর কী ব্যাঘাত রইল ? কিন্তু, না। আমার আশা কি পূর্ণ হতে পারে ?

একটা অভিজ্ঞতার কথা বললাম। উনি একদিন আমাকে একখানা বই পড়ে শোনাচ্ছিলেন, সেই বই থেকে একটি বাক্য আমাকে বলেছিলেন, সেটা এখনও আমার মনে আছে। কী বই, তার নাম কী, তা আমার এখন মনে নেই—সে-বাক্যটি কিন্তু বেশ স্পষ্ট মনে আছে। "মনুষ্য জন্ম মানে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব" বাক্যের এই অর্থ ছিল। এটা এত ভালো মনে থাকার কারণ, যখনই কোনো-না-কোনো কারণে আমার মুখে নিরাশাময় কথা ফুটে উঠত, তখনই আমাকে বড় আদর করে বলতেন, "মনুষ্য জন্ম মানে আশা আর নিরাশার দ্বন্দ্ব—তা তো তুমি জানো!" এই কথাটি অগণিত বার কানে শুনেছি। আমার জীবনে যে অল্প কয়েকটি দিন সুখে যাপন করেছি, সে এই বাক্যেরই ফলে; আর আজও যে, যে-কোনো অবস্থায় শান্ত থাকতে পারছি, তার কারণও সেই!

আগে লিখেছি যে আমি নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি এসে দুর্গী আসছে না-ইত্যাদি বললাম। তার পর আমরা হলুদ কুঙ্কুমের জন্য দেবীর[1] জায়গাটা সাজাতে গেলাম। যতক্ষণ কাজের তাড়ায় ছিলাম, ততক্ষণ দুর্গীর অবস্থা ভুলে ছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা, মেয়েরা হলুদ কুঙ্কুম নিতে আসতে লাগল, তখন আবার দুর্গীকে মনে পড়ল। ভাবতে লাগলাম, দুর্গীদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে কী? সে কি তার শাশুড়ীর সঙ্গে আসবে? যদি আসে, তাহলে ও যাতে এখানে থেকে যায় তার জন্য কী উপায় করব? নিজে ওর শাশুড়ীকে বললেই হবে, না মাঈ সাহেবকে দিয়ে বলাতে হবে? এই রকম অনেক চিন্তা আমি করেছিলাম। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলাম, এসব বৃথা চিন্তা! ওর শাশুড়ী ওকে থাকতে দেবেন না, আর সকাল বেলার মতোই আবার আমার নিরাশা হবে।

দুর্গীর শ্বশুরবাড়ি নিমন্ত্রণ গিয়েছিল। তার বাড়ির আর সকলের সঙ্গে দুর্গীও এল। আমাকে দেখামাত্র ওর চেহারা যে কী রকম হল! সে চেহারাটা এখনো আমি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! আহা! মানুষ যখন কোনো প্রাণসংকটে আটকে থাকে, তখন তার

১ চৈত্র মাসের হলুদ কুঙ্কুমের দিন ঘরের একপাশে উচ্চস্থানে দেবীর মূর্তি অধিষ্ঠিত করা হয়, বিশেষ রকমে সাজসজ্জা করে দেবীর স্থান সাজানো হয়।

চেহারা যে রকম দেখায়, দুর্গীর চেহারা তখন ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছিল। আমি তার শাশুড়ীকে আর তাদের বাড়ির সকলকে হলুদ কুম্কুম পরিয়ে দিলাম। আর দুর্গীকে তরমুজের ফালি[1] দেবার জন্য একটু ভিতরে নিয়ে গেলাম আর তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, "দুর্গী, আজ রাত্তিরের জন্য তোর শাশুড়ীকে বলব তোকে রেখে যেতে?" তাই শুনে দুর্গী এমন ভয় পেল যে তা বলতে পারিনে। সে তাড়াতাড়ি বলল, "না, ভাই না, তোর যদি সত্যি ইচ্ছে থাকে যে বেঁচে থাকি তা হলে আমার এখানে থাকার নাম পর্যন্ত করিস নে।—যমু, কী বলব ভাই"—এই বলে সে চট করে সেখান থেকে পালিয়েই গেল। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম যে, তার কোটরগত চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা জল তার ফ্যাকাসে গালের উপর গড়িয়ে পড়ল। তার সে-রকম দেখে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। সত্যি, এ কী ব্যাপার! শাশুড়ীর জ্বালা বলতে পারা যায় না, কেন না, তার শাশুড়ীর বড় ভালো মানুষ বলে খ্যাতি ছিল। যা হবার তা হোক, ওর শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক, ওকে রেখে যেতে রাজি আছে কিনা,—এই ভেবে আমিও তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। তখন দুর্গীর শাশুড়ী আর তাদের বাড়ির সকলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছিল। তাই দেখে, আর কিছু না ভেবে, আমি একদম জিজ্ঞাসা করলাম, "দুর্গীকে আজকের দিন রাত্তিরে এখানে রেখে যান না কেন? ফলাহার-টলাহার করবে, আর সকালে যাবে।"

অমনি তিনি বললেন, "ওকেই জিজ্ঞেস করো, ও নিজেই মালিক। ওর থাকতে ইচ্ছে থাকলে থাকবে।" দুর্গীর শাশুড়ী সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন, কিন্তু বোধ করি থাকতে না পেরেই, ঘুরে মাঈ সাহেবকে (মাঈ সাহেব সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিলেন) বললেন, "যশোদাবাই, বলি আজকালকার মেয়েদের ঢংই বেশি দেখছি! তারা তাদের ইচ্ছেমতো নাচতে চায়। কাল ওর মা বলল, তাই মেয়েটাকে অমনি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। আর সকালে উঠে মেয়ে নিজেই বাড়ি চলে এল।

১ হলুদ-কুম্কুমের সময় সীমন্তিনীদের হলুদ কুম্কুম পরিয়ে, হাতে আতর দিয়ে, গোলাপ জল সিঞ্চন করা হলে, বাতাসা, কলা, পেয়ারা, শশা, তরমুজের ফালি ইত্যাদি দেওয়া হয়, ভিজানো ছোলা প্রত্যেককে অঞ্জলি ভরে দেওয়া হয়, কাঁচা আমের সরবৎ বা আখের রস পান করতে দেওয়া হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ফিরে এলি কেন?' বলল, 'অমনি এলাম!' দেখ কী যে রকম। আপনিই দেখুন তো, আমরা ওসব মেজাজ জানতাম না।" এইরকম অনেক কথা তিনি বললেন, আর দুর্গী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল। কি করবে বেচারী! মুখ বুজে সহ্য না করে উপায় কি? চুপি চুপি তার স্বামী তাকে নিয়ে যেতে এসেছিল সেকথা শাশুড়ীকে বলবে কি করে? তা যখন বলতে পারা যায়না, তখন শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ নিতে না আসতেই ফিরে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তখন চট করে "অমনি এলাম" ছাড়া আর কী বলবে?

দুর্গীর শাশুড়ীর সেকথা শুনে, সত্যি আমি ভাবলাম, কেন যে দুর্গীকে রেখে যেতে বললাম! দুর্গী আমাকে স্পষ্ট বলেছিল যে, তুই কিছু বলতে যাসনে। দুর্গীর সঙ্গে কথাটথা বলে, তার কী দুঃখ তাই জানতে আমি বড় উতলা হয়েছিলাম তাই আমার সব বিবেচনা যেন গোল্লায় গিয়েছিল! দুর্গীর শাশুড়ী ওরকম কথা বলছিলেন, আমাদের মাঈসাহেব পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়া স্ত্রীর মতো আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে নিজের মত দিচ্ছিলেন, আর মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি করে আড়নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। এত সব চলছিল তবু আমি পাগলী আবার বললাম, "কিন্তু থাকুক না দুর্গী আজকের দিন এখানে। সকালে মাঈ পাঠিয়ে দেবেন ওকে।" তাই শুনে মাঈসাহেব বিশেষ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "রেখে যান না কেন? ফলাহার হলে পাঠিয়ে দেব। তা হলে তো কোনো আপত্তি নেই?" হ্যাঁ-না, করতে করতে শেষ পর্যন্ত দুর্গী আমাদের বাড়ি রয়ে গেল। কিন্তু সেজন্য আমার মোটেই আনন্দ হল না। রাত্তিরে ফলাহার হওয়ামাত্র তার ফিরে যাবার কথা ছিল, তবু ভাবলাম, 'নেই মামার চেয়ে কাণামামা ভালো।' দুদণ্ড দুর্গী আর আমি, আড়ালে যদিও নয়, তবু এক জায়গায় বসে গল্প করতে পারব, এই ভেবে আমি একরকম সান্ত্বনা অনুভব করলাম। আরও কত মেয়েরা এসে হলুদকুঙ্কুম নিয়ে গেল। যখন একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তখন মেয়েদের ভিড় কম হতে লাগল। আস্তে আস্তে বেশ অন্ধকার হয়ে এল। মেয়েদের আসা বন্ধ হল। এমন সময় কী যেন কাজ করতে মাঈ ভিতরে গেলেন। বাইরে কেউ ছিল না, কেউ নেই দেখে আমি দুর্গাকে কিছু বলতে যাব এমন সময় দুর্গীই আমাকে বলল, "যমু, আমি তোকে বারণ করলাম,

কিন্তু তুই আমার কথা শুনলিনে। তোর পায়ে পড়ছি ভাই, রাত্তিরে থাকার জন্ম আমাকে আর অনুরোধ করিসনে। আমাকে মার খেতে হবে। এতেই বুঝে নিস। এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে কী আর বলব ভাই?"

তাই শুনে আমি অবাক আর দুঃখিত হয়ে তার দিকে চেয়ে বললাম, "কী বললি? মার খেতে হবে?"

"হ্যাঁ!" এই শব্দটা উচ্চারণ হবার সময় তার কণ্ঠরোধ হয়ে এল।

"কার হাতের মার?"

দুর্গা কিছুই বললনা। তখন আমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "সত্যি বলনা ভাই!" তবু সে কিছু বলল না। আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তখন বড় কষ্টে সে বলল, "আবার কার?"

তাই শুনে আমি একেবারে চমকে উঠলাম। 'সত্যি, একী ব্যাপার!' মনে করে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করব, এমন সময় মাঈসাহেব সেখানে এলেন, আর আমাদের কথা বন্ধ হল।

যমু, কি বলব ভাই তোকে

দুর্গীর সেই উত্তর শুনে সমস্ত ঘটনা জানবার জন্য আমি কতটা উৎকণ্ঠিত হলাম, কেউ তা কল্পনা করতে পারবে না। একরত্তি বর, একরত্তি বউ, বাড়িতে ঘরময় বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ, আর সে নাকি ওকে ধরে মারে? ব্যাপার কী! এই ভেবে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়, 'হে ভগবান, আমারও কি ওই রকম হবে?' ভেবে আমি ভীত হলাম। আর আসল ব্যাপারটা জানার জন্য আমার মন আরও উৎকণ্ঠিত হল। কিন্তু আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে কী করে? শেষে আর কোনো চিন্তা না করে, উপায় নেই ভেবে, আমি দুর্গীকে সঙ্গে করে দাদার ঘরে গেলাম। দাদা তখনো বাইরে থেকে আসেনি। আজ হলুদ কুঙ্কুম উৎসব সারা হতে একটু দেরি হবে, এই ভেবে বোধহয় দাদা ততক্ষণ বাইরে থেকে আসেনি। মাঈসাহেবকে জানতে না দিয়ে, এসময়ে আমি দুর্গীকে নিয়ে উপরের ঘরে আড়ালে গিয়ে বসলাম। এ আমার একেবারে পাগলামি হল। কিন্তু আসল ব্যাপার জানবার অসীম উৎকণ্ঠায় অন্য কিছুই আমার মনে রইল না।

দু'জনে উপরে আসামাত্র আমি অন্ধকারেই দুর্গীকে বললাম, "দুর্গী, এখন মন খুলে সব কথা বল। কিছু লুকিয়ে রাখিসনে ভাই। আজ সকাল থেকে দু'জনে কত চেষ্টা করছি, মনের মতো কথা বলতেও যে অবসর পাচ্ছিলাম না। এখন নিচের ঘরে ফলাহারের গোলমাল চলছে, আর আমরা উপরে চলে এসেছি, তা উচিত করিনি, কিন্তু আমি ভাই আর থাকতেই পারছিনা। বল ভাই, বল, কী তোর দুঃখ? আজ তুই যা কষ্ট পাচ্ছিস কাল আমাকেও তাই ভুগতে হবে!"

"যমু, কী বলব তোকে! আজ দু-তিনমাস হল উনি শুধু শুধু আমাকে ভয়ানক জ্বালাতন করেন। আমাকে একলা পেলেই—" এর পর তার মুখ দিয়ে শব্দই বার হচ্ছিল না। তার কণ্ঠরোধ হল, আর সে হাউ হাউ করে

কাঁদতে লাগল। "চুপ কর। নিচে কেউ শুনতে পাবে। একী কাণ্ড বাধাচ্ছিস!" ইত্যাদি বলে আমি তাকে অনেক রকমে বুঝিয়ে বললাম, কিন্তু তার কান্না থামতে চাইছিল না। শেষে, কী যে করি তা ভেবে মুশকিল হল। ভাবলাম, এই সময় ওকে কিছু জিজ্ঞেস না করলেই বেশ ভালো হত। কোথা থেকে আমার তেমন দুর্বুদ্ধি হল?

এমন সময় নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কান্না থামিয়ে দুর্গাই আমাকে বলল, "যমু, আজকাল ইস্কুল-টিস্কুল যাওয়া সব ছেড়ে দিয়েছেন। জানিস, সেদিন বাবা ইস্কুলে খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন, তখন জানতে পেলেন যে গত দেড় মাসের মধ্যে শুধু চার-পাঁচ দিন নাকি উনি ইস্কুল গিয়েছিলেন। আর বাড়ি থেকে কিন্তু ঠিক এগারোটায় খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যান। বাবা যখন জানলেন উনি ইস্কুল পালান তখন বাবার বড় দুঃখ হল। কিন্তু কী করবেন? শ্বশুরমশাইকে সে বিষয়ে খবর দেওয়া উচিত মনে করে বাবা বোধহয় তাঁকে অল্প কিছু বলেছিলেন। তিনি বাড়ি এসে খোঁজ নিলেন, তখন উনি যা তা মিথ্যে ভান করলেন, শেষে মার খেলেন। তার পরে উনি যখন জানতে পারলেন যে বাবাই কর্তাঠাকুরকে ও কথা বলেছিলেন তখন থেকে ভাই আমাকে দেখতে পেলেই চড় বসিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন।" আবার দুর্গার কণ্ঠরোধ হয়ে এল, আর কান্না যেন উপচে আসতে লাগল। কিন্তু আমি তাকে তাড়াতাড়ি চুপ করতে বললাম, তাই চুপ করে সে বলল, "কী করি ভাই? কান্না যে আপনিই আসে! কত জ্বালা সহ্য করব? তাতে আবার দিদিশাশুড়ীর কাণ্ড! একদিন তিনি ঠাকুরঝিকে দিয়ে জোর করে আমাকে রাত্তিরে ওঁর ঘরে—তখন থেকে ভাই—"

তার কথা শেষ না হতেই শুনতে পেলাম, "যমু, এখানে অন্ধকারে বসে কী করছিস? নিচে তোকে নিয়ে মা হুলুস্থুল কাণ্ড! মেয়ে-দুটো গেল কোথায় বলে হৈ চৈ চলছে। যা, যা শীগগির। এখানে বসিসনে। পালা তাড়াতাড়ি।" তাই শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। দুর্গার সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমি স্থান কাল একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কত সময় কেটে গিয়েছে সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। দুর্গা যা বলছিল, তাই শুধু আমি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। দাদা এসে গেল, তবু আমার বড় দুঃখ হল। এক মুহূর্ত ভাবলাম, নিচে যা কিছু হোক না কেন, দুর্গার কথা সম্পূর্ণ না-শুনে আমি উঠবই না। কিন্তু কী উপায়? দাদা উপস্থিত থাকতে

আর কী কথা বলা যায়? আমি বড় কষ্টে মনের ইচ্ছে মনে চেপে রেখে দুর্গাকে নিয়ে নিচে চলে গেলাম। যাবা-মাত্র অমনি মাঈ সাহেব বকাবকি করে আমাকে টিট্ করে দিলেন। "বলি ছিলেন কোথা, যমু ঠাকরুণ? ডেকে ডেকে যে আমার গলা শুকিয়ে গেল লক্ষ্মীছাড়ি? ছিলি কোথায় লো? এই এত রাত্তিরে উপরে অন্ধকারে গিয়ে বসবার কী দরকার হয়েছিল? নিচে এখানে এত কাজ, গোলমাল চলছে আর তোমরা.দু'জনে .বেশ নিশ্চিন্তে উপরে গিয়ে বসলে? কী চলছিল ফুস্‌ফুস্? এই জন্যই বুঝি সকাল থেকে ডেকে আনবার ষড়যন্ত্র চলছিল? এঁ্যা? রোসো তোমরা। ফলাহার হওয়ামাত্র ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর কখনো ওকে ডাকবি কি দেখবি। নিচে এখানে ফলাহারের পাতাটাতা কে করবে? আমরা কি ঝি-চাকর? রোসো, উনি বাইরে থেকে এলে সব বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আবার বলবে ও যে সৎ-মা! অমন নালিশ করবে তাতে আর আশ্চর্য কী! ও যে ছেলেমেয়েকে চোখে দেখতেই পারে না!" এই রকম অবিরাম তাঁর মুখ চলছিল। আর মাঝে মাঝে তার মাও চেঁচামেচি করে বকছিলেন।

হঠাৎ বাবার সাড়া পাওয়া গেল। অমনি কী আশ্চর্য্য! একটা মুখ একেবারে চুপ হল, আর একটা যদিও একেবারে থামল না, তবু হঠাৎ স্বর কোমল হয়ে সে মুখে মিষ্টি কথা ফুটে উঠল। "মা যমু অন্ধকারে বসেছিলি, তাই বললাম। আর কিছু না, কাঁকড়া-বিছেটিছে থাকা সম্ভব, বাতি জেলে নিয়ে বসতে কি কেউ তোকে মানা করে? আর সময় বুঝে বসলেই হল।" মাঈ সাহেবের কথার সুরে এই রকম পরিবর্তন হল। এমন সময় বাবা জামার বোতাম খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার, কী হয়েছে?" "কিছু না। ঘরের কথা! সে কি কেউ জিজ্ঞাসা করে? মেয়ের জাত অল্প বয়সে অমন ভুল করেই।" এই বলে মাঈ সাহেব আমাকে বললেন, "চলো, খেতে চলো, ক্ষিদে পায় নি? পাতা করো, ওঁর সন্ধ্যে-আহ্নিকের পিঁড়িটিড়ি পেতে দাও। শুধু শুধু দেরি করে দরকার কি মা? দুর্গাকে পৌঁছে দিতে হবে তো। মা, তোমার হয়েছে?" এই বলে তিনি ভিতরে গেলেন। দাদা সেখানেই ছিল। আমি দাদার দিকে চেয়ে দেখলাম, তখন সে এমন মুচকি হাসি হাসল যে তা আর বলে দরকার নেই!

তারপর ফলহার হল আর দুর্গাকে সঙ্গে চাকর দিয়ে তার বাড়ি পাঠিয়ে

দেওয়া হল। আমি তাকে থাকবার জন্য খুব অনুরোধ করতাম, কিন্তু সে যে কথা বলেছিল তা শুনে আমি চুপ করে রইলাম। একেবারে যাবার সময় সে আমাকে বলল, "চললাম ভাই!" কিন্তু সে শব্দ যেন তার মুখ দিয়ে সম্পূর্ণ বার হচ্ছিল না; গলায় আটকাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে 'দিদিমা' আমাকে খোঁচা দিয়ে বলল, "আজকের রাতটা কি থাকলে চলত না? সকালে উঠে গেলেই হত। কিন্তু না।" তাই শুনে মাষ্টার সাহেব একেবারে দেমাক করে বললেন, "আজকালকার মেয়েরা যা দুষ্টু! এখন থেকে বর—" কিন্তু থাক। তাঁর পরের কথা না লেখাই উচিত।

দুর্গা চলে গেল কিন্তু তার মুখ থেকে যা একটু-আধটু কথা আমি জানতে পেরেছিলাম, তা শুনে আমার মন বড়ো খারাপ হয়েছিল। দুর্গার সেই আগেকার চটপটে ধরণ, আর সেই হাসি-খুশী, ঠাট্টাতামাশা করার শখ!—সব নষ্ট হয়েছিল! অতটুকু মেয়ে, আমারই বয়সী, তার গালের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, আর শরীর ভয়ানক রোগা হয়ে গিয়েছিল। কী করবে বেচারী? এক দিকে স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধি আর শিক্ষার সেই দশা, আর অন্যদিকে ভয়ানক জ্বালা! হাসি মুখে ঘুরে বেড়িয়ে, মুখ বুজে সব সহ্য না করে, অন্য উপায় কী ছিল? মানুষ পরের অবস্থা যতই চিন্তা করুক, তার নিজের অবস্থার বিষয়ে না ভেবে সে থাকতে পারে না। তাতে আবার যাদের সমান অবস্থা, তাদের তো কথাই আলাদা!

সেদিন রাত্তিরে দুর্গার অবস্থার বিষয়ে ভাবতে ভাবতেই সহজ ভাবে আমি আমার নিজের অবস্থার চিন্তা করতে লাগলাম। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, আমার নিজের অবস্থাও কি ওই রকম হবে? কিন্তু আপাততঃ সে রকম দুর্গতি হবার কোনো চিহ্ন নেই ভেবে মন শান্ত হল। কেন না, উনি আমার দিকে কখনো ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছেন বলে আমার মনে পড়ল না। দেখতে পেতাম যে আমি কাজকর্ম বেশি করে যেন ক্লান্ত না হয়ে পড়ি সেই জন্য উনি সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতেন। এ আমি কী করে বুঝতে পারি আর কোন কারণে বলতে পারছি, তা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তা হলে কিন্তু আমি তা বলতে পারব না। আমরা নিজের স্বামীকে যখন চিনিও না, এমন সময় তিনি আমাদের ভালোবাসেন কি না, কখন তাঁর মেজাজ সুপ্রসন্ন থাকে, কখন থাকে না, ইত্যাদি আমরা বুঝতে পারি এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কেমন করে তা বুঝতে

পারি, তা হলে কক্ষনো তা বলতে পারব না। তা বুঝতে হলে মেয়ে জন্ম নিয়ে, আমাদের অবস্থার মধ্যে যেতে হবে। পোষা জন্তু তার প্রভুর মনের বিভিন্ন ভাব যেমন সহজাত সংস্কারের জোরে বুঝতে পারে, আমাদের অবস্থা তো ঠিক তেমনি বললেই হয়।

গৃহপালিত পশু আর আমাদের সমান অবস্থার ইঙ্গিত করেছি দেখে বোধহয় আমার অনেক ভগিনীদের দুঃখ হবে। নিজের মুখে নিজের জাতিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্য আমাকে দোষ দিয়ে হয়তো তাঁরা আমাকে নিন্দা করবেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে, তাঁরা যদি মনে মনে ভালো করে ভেবে দেখেন, তা হলে তাঁরা আমার কথা সত্যি মনে করবেন। গোঁয়ারতুমি ছেড়ে পরিষ্কার ভাবে চিন্তা করার ধীশক্তি কিন্তু চাই। আপাতত আমাদের অবস্থা গৃহপালিত জানোয়ারের মতো নয়, কে বলবে? যে কুকুর পুষতে চায় সে যেমন ছোট্ট কুকুরছানা ঘরে এনে তাকে দুধভাত খাওয়ায়, আমাদের অবিকল সেই অবস্থা! মা-বাবার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে, যাকে শ্বশুরবাড়ি বলে, সে-বাড়িতে আমাদের রাখে। কুকুরছানাকে অন্তত আদর করা হয়, আমাদের কপালে তা ছাড়া আর সব জোটে! আর অমুকজন নিজের মালিক, প্রভু বলে তাঁর খোশামোদ করে তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার শিক্ষা আমরা পাই। কিন্তু থাক। এই উপমা যদি আমি শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যাই তবুও মানাবে, এ কথা নিশ্চয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান পাঠক বুঝতে পারবে। যারা তার মর্ম বুঝতে পারবে না তারা কিন্তু বৃথা রাগ করবে। তাই সে উপমাটি এখানেই ছেড়ে দিয়ে তার পরের ঘটনা লেখাই ভালো।

উপরে বলেছি যে সেদিন রাত্রে আমি দুর্গীর অবস্থার সম্বন্ধে ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে হল যে দুর্গীর স্বামীর সম্বন্ধে দাদাকে জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক—তাই আমি দাদাকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা, দুর্গীর বরকে চিনিস তো? কোন ক্লাশে পড়ছে?"

"কেন, এত রাত্তিরে ওকে মনে পড়ল কেন? একেবারে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করছিস? তুইও বেশ বাবা"—

"না ভাই দাদা, দুর্গী আর আমি আজ কথাবার্তা বলছিলাম, তাই ভাবলাম তোকে জিজ্ঞাসা করে দেখি, তোদের ইস্কুলেই তো পড়ে?"

"দূর ছাই। ওর কি আর বিদ্যেবুদ্ধি হবে? ও ধূমপান করে ঘুরে বেড়ায়। আর আমার মনে হচ্ছে যে, ও ব্যাটা তামাকও খেতে শিখেছে,

খায়! দুর্গাকে কিন্তু বলিসনে। ওর দুঃখ হবে!"

দাদার সে কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে বসলাম। আমি আর কিছু বলতেই পারছিলাম না।' সেই অতটুকু ছেলে, ধূমপান করে, তামাক খাচ্ছে, তার পড়াশোনার কী যে হবে, তা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে আমি দাদাকে আবার বললাম, "দাদা, মোটের উপর দুগার বরাত ভালো মনে হচ্ছে না। দুর্গাকে ওর বর বড্ড জ্বালাতন করে।" .

"এই রীতি ভাই! কিন্তু যমু, শশুরবাড়িতে তোর কোনো কষ্ট নেই তো?"

"আমার একেবারে কষ্ট নেই। মামী শাশুড়ি আর দিদিশাশুড়ী একটু বকেন। কিন্তু—"

"তারা বকুক। কাল তোর স্বামী পরীক্ষা পাশ করলে তোকে বোম্বাই নিয়ে যাবেন, সেখানে তো তারা আসবে না? উনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তুই কিন্তু আরও ভালো করে লেখা-পড়ার অভ্যাস করিস। তোর স্বামী তাই ভালোবাসে। একদিন আমাদের এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। তিনি নিজেই একদিন তোকে এ বিষয়ে বলবেন।"

সে কথা শুনে যে আমার আনন্দ হল, তা কি বলতে হবে? তবু আমি দাদাকে বললাম, "ও কী ভাই দাদা, আমি বেচারী ভালো মানুষের মতো তোকে সব কথা বলি, আর তুই বেশ ঠাট্টা করিস।"

আমার কথা বলার সুরই এমন ছিল যে, স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল, আমার সে ঠাট্টা ভালো লেগেছে। তাই দাদা আবার বলল, "আমি মিথ্যে কথা বলছিনে। তিনি সত্যি আমাকে বলতে বলেছেন, আর তিনিও নিজে তোকে বলবেন। যমু, তুই নিজেই ভেবে দেখ, তিনি কেমন চালাক, বুদ্ধিমান; আর তুই ভালো করে পড়তেও পারিসনে। এ কি তাঁর পছন্দ হবে? তিনি তোকে ইংরাজিও শেখাবেন, জানিস! তাঁর সেই ইচ্ছা।" এই বলে দাদা তাঁর বুদ্ধির আর মতলবের কত কথা যে বলল, তা আর বলে দরকার নেই। সে সব শুনতে শুনতে আমি যদিও "ঢের হ'য়েছে," "ওকী," "ওকী ঠাট্টা" এইরকম কিছু বলছিলাম, তবু মনে মনে একরকম আনন্দের সুড়সুড়ি অনুভব করেছিলাম। আর সেই আনন্দে দুর্গার দুঃখ ভুলে গিয়ে আমি নিজের ভাবী সুখের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

একটি বিশেষ দিনের কথা

আগের পরিচ্ছেদে যে ঘটনাগুলি বলেছি, তারপরে বছর-সওয়াবছরের মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটেনি। খুঁটিনাটি অনেক কিছু হয়েছিল, কিন্তু সে সব বিস্তৃত বর্ণনার যোগ্য নয়। যা কিছু হয়েছিল তা সব একটা পরিচ্ছেদে বলে ফেলছি, তা হলে তার পরের ঘটনা বিস্তৃতভাবে লিখতে পারব। ছোট-খাটো যে দু'একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, তার বর্ণনা অবশ্য বিস্তৃত-ভাবে দেব।

প্রথমতঃ আমার নিজের সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলি। কেন না, সে ঘটনার সাহায্যে, যেমন দু আঙুল দিয়ে একটি দানা ভাত চেপে দেখলে সমস্ত ভাতটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা বোঝা যায়, সেই রকম আমার ভাবী সুখের পরীক্ষা হয়ে আমার অতিশয় আনন্দ হল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাল যে আমার ভাগ্যে অসীম সুখ আছে। তাই সেই ঘটনা থেকেই আরম্ভ করছি।

আমার ছোটো মামীশাশুড়ী, আর বড়ো মামীশাশুড়ীর মেয়েরা—মামাতো ননদেরা—যে কেমন সুতোর মতন সরল ছিল আর তাদের মনে আমার সম্বন্ধে কত ভালোবাসা ছিল, তা আজ পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা বিবৃত করেছি, সেগুলি পড়ে সকলে নিশ্চয় বেশ বুঝতে পেরেছেন।

মেয়ে জাতি, তায় অল্পবয়সী, ভুল করা কত স্বাভাবিক। কিন্তু আমি একটু কিছু ভুল করলেই হয়েছে! সকলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাথা খেয়ে ফেলবে। তাতেও অনেক খুঁটিনাটি ভুল এমন থাকে যে সেসব বাড়ির বড়ো মানুষের কানে না পৌছলেও চলে! কিন্তু আমার ঠাকুরঝিরা এমন ছিল যে, এদিকে হাই তুললেই ও দিকে খই ফুটিয়ে দিত। সে বড়ো বিষম জালা। বড়ো ঠাকুরঝি তবু সর্বদা ঘরে থাকত না। কিন্তু সেই ছোটো ঠাকুরঝিরা আর খোড়ু ঠাকুরপো, এদের জালা সব সময় ছিল। সে-চারটি ছেলেমেয়ে তাদের বাবাকে বেশ মানত। তাঁরা মাকেও ত্রাহি ভগবান করে বিরক্ত

করত। ছোট শাশুড়ীর কাছে কিন্তু তারা বেশি পাত্তা পেত না। কোনো আবদার খাটত না। তিনি ধোণ্ডু ঠাকুরপোকে সারাদিন ঠ্যাঙাতেন, কিন্তু সে, মানে ঠাকুরপো, এমন নাছোড়বান্দা নির্লজ্জ ছিল যে তা বলতে পারা যায় না।

একদিন সকালবেলা—সেদিন রবিবার ছিল—আমি স্নানের জল গরম করার চুলোর সামনে বসে বসে জল গরম করছিলাম। সকলে স্নান করবে, তাই জল গরম করা দরকার ছিল; তাই আমি একটু তাড়াতাড়ি করছিলাম। চুলোর আগুন জলতে লাগল আর জলও গরম হতে লাগল। হঠাৎ ধোণ্ডুঠাকুরপো হাতে চারটে পেঁয়াজ নিয়ে তাড়াতাড়ি এল, আর কিছু না বলে-কয়ে উনুনের আগুন ফস্ করে বাইরে টেনে, পেঁয়াজগুলো পুরে ফেলল। কতক্ষণ কত চেষ্টা করে আমি আগুন ধরিয়েছিলাম, নিবে গেল। মরণ আর কী! ঘুঁটেগুলো এমন ভিজে ছিল যে, শত চেষ্টাতেও ধরতে চাইত না। তাই আমার সত্যি একটু রাগ হ'ল। রাগের চোটে আমি শুধু এই বললাম, "এ কী দৌরাত্ম্য! সমস্ত আগুন নিবে গেল যে! জল কে গরম করবে শুনি? ঠিক এই মুহূর্তে পেঁয়াজ না পোড়ালে কি চলত না? আমি পেঁয়াজগুলো বার করে ফেলছি।"—আমার মুখ দিয়ে এই কথা সম্পূর্ণ বার না হতেই "ম্যা"!—করে সে সুর ধরল। আমি ভাবিনি যে আমার কথা শুনতে সেখানে আর কেউ ছিল। কিন্তু সেই সময় বণু ঠাকুরঝি কোথা থেকে যেন এল। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। আমার মুখ দিয়ে যেই সে কথা বেরুল, অমনি সে তা শুনতে পেল, ওই হয়েছে! একেই তো মেয়েটার মাথা গরম তাতে আবার একটা কারণ পেল! সে আর ধোণ্ডুঠাকুরপো দু'জনে মিলে তুলকালাম বাধিয়ে দিল। আমার সেই কথার উপরে কতো বড়ো অট্টালিকা রচনা হল। 'এ কী দৌরাত্ম্য' হয়ে গেল 'এ কী গাধামি?' 'সব আগুন নিবে গেল, এখন জল কি তোমার কাকা গরম করতে আসবেন' হল, 'পেঁয়াজ-পোড়া না খেলে কি ছটফট করে মরণ হয়,'-এ রকম কথাও আমার মুখে গুঁজে দেওয়া হল! আর শেষে পেঁয়াজ উনুন থেকে বার করে পাতকুয়োয় ফেলে দেবার জন্য আমাকে অপরাধী করা হল! স্বয়ং দেওরের কাকার নাম করার চেয়ে বড়ো পাপ কি এ-জগতে কোনো মেয়ের থাকতে পারে? সে যে দেওরের কাকার শ্রাদ্ধ! কিন্ত, সত্যি আমি তেমন কিছু বলেছিলাম কিনা, তার খোঁজখবর

নেয় কে? কার দরকার? আমি যদি বলি, "আমি ও কথা বলিনি, অমন কথা বলতে যাব কেন?" তাহলে তা কেউ বিশ্বাস করবে না। উলটে সবাই বলবে, "হ্যাঁ, আজকাল বেশ পালটা জবাব দিতে শিখেছে, লক্ষ্মী বৌ, বেশ মাথায় চড়ে বসেছে।" আরও বৃথা কষ্ট হবে। একেই বলে 'মুখ বেঁধে ঘুষি মারা।' কোনো খারাপ কথা না বলা সত্ত্বেও, তেমন কথা বলার অপরাধের জন্য বকুনি খেয়ে মুখ বুজে চুপ করে থাকতে হল। কী করব!

কিন্তু সে-দিনের বকাবকি ভীষণ ভয়ানক হল। আমার দিদিশাশুড়ীর যা মুখ! একবার সে তোপ দাগলে সহজে কি শান্ত হয়! তখন তিনি কী বলবেন আর কী না বলবেন তার ঠিক থাকত না। "ওর কাকার নাম ধরে কথা বলতে লজ্জা করে না গাধা মেয়ের! হ্যাঁ লো হ্যাঁ, আসবে, ওর কাকা আসবে জল গরম করে নিতে। আর তুমি এসে বসো এখানে পিঁড়ি পেতে। নইলে আপিসে যাও! মা গো মা! আজকালকার এই ছুঁড়ীরা কী বজ্জাত! সত্যি এদের কথা শুনে অবাক হতে হয়! কারো বাবার, কারো কাকার, ছেরাদ্দ করতে এদের একটু লজ্জাও করে না। এরা ছোটো, বড়ো, ভাশুর, দেওর, কাউকে শ্রদ্ধা করতে চায় না। যা মুখে আসবে তাই বলবে? খবরদার, যদি আমার বাড়ির কোনো কাজকর্ম করতে যাবি। তোর বাপের বাড়ি বেরিয়ে যা! যে-দিন তোর বর চাকরি পাবে, সে-দিন নিয়ে আসবে। আমাদের বাড়িতে ওসব কথা বলার জন্য তোমার থেকে দরকার নেই। আমাদের বাড়ির বেটাছেলেরা জল গরম করতে আসবে কেন? আরে তোর বাবা তো জেলে গিয়ে রুটী সেঁকে! লজ্জা করে না?"

বড়মার মুখে এই শেষের ভাগটা বার হওয়া মাত্র ছোটঠাকুর সেখানে এলেন, আর বললেন, "মা, মা, এ কী? একটু মুখ সামলে"—

কিন্তু তাঁর কথা কে শোনে? তাঁর উপরেই রাগ করে, তেড়েমেড়ে বললেন, "আমাদের খোকার কাকার নাম করবে এই ছুঁড়ীটা! আর বলি, ওর বাবা যে জেলে গিয়েছিল, তার ছেরাদ্দ কে করবে? আমরা বিয়ের সম্বন্ধ করলাম তাই! নাহলে অমন জেলখাটা ভদ্রলোকের ছুঁড়ীকে বিয়ে কে করত।"

সব কিছুরই একটা সীমা আছে। সীমা ছাড়া হলে কী যে হয় তার ঠিক থাকে না। আমার বাবার নাম করে যখন গালাগালি শুরু হল, তখন

আমি কেঁদে ফেললাম। আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। তাতেও আবার যখন শুনতে পেলাম যে, বাবার নাম করে যাচ্ছেতাই বলা চরম সীমায় উঠল। চুপ করে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। আমরা মেয়ে মানুষ। আমাদের কাছে কি অন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র আছে? নিজের কোনো অপরাধ নেই, তবুও এত বকুনি খেতে হল, তার দুঃখ কি চেপে রাখা যায়? কোনো-না-কোনো রূপ নিয়ে সে-দুঃখের আবেগ বার হবেই হবে! স্পষ্ট খুলে বলতেও পারছি না, তাই আড়ালে গিয়ে কাঁদতে বসাই ভালো মনে হল। প্রথমে আমি ঠিক করেছিলাম যে যার যা খুশি বলুক, চুপ করে নিজের কাজ করে যাব, কিন্তু বকুনি যখন গণ্ডী পেরিয়ে গেল. আর তাও অকারণে, তখন অন্য গতি নেই জানতে পেরে সটান ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসলাম।

আমি ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে বসবার দশ-পনরো মিনিট পরে আমার মনে হল কে যেন বাইরে থেকে দরজাটা ঠেলল। যার খুশি আসুক মনে করে, ঘুরে না দেখে, আমি আরো কোণে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলাম। এমন সময় কে যেন আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। আর আমি ঘুরে দেখি— উনি! তাঁকে দেখে আমি যে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম তা বলতে পারি না। ভাবলাম, এবার আমি নিশ্চয় মার খাব, আর রক্ষা নেই। দুর্গীর মতোই নিশ্চয় আমার দুর্গতি হবে ভেবে, মাথা হেঁট করে আমি অবিরল কাঁদতে লাগলাম। কিন্তু সে যে চোরের মায়ের কান্না! আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল। হঠাৎ শুনলাম, "হয়েছে। এত কাঁদছ কেন?" সে-শব্দগুলি শোনামাত্র সে-কথা রাগ করে উচ্চারণ করা হয়েছিল না আদর করে করা হয়েছিল কিছুই না বুঝে, আর আমার কথা বাইরে কেউ শুনতে পাবে কি না তাও না ভেবে, আমি কাতর স্বরে বললাম, "না না, আমি সত্যি কিছু বলিনি। আমার কোনো দোষ না থাকতে আমায় অপরাধী করেছে। আমাকে মেরো না।" এই বলে আমি ধুপুস্ করে নিচে বসে পড়লাম। আমার মাথা নিচু করাই ছিল। প্রতি মুহূর্তে আমি ভাবছিলাম, শত আকুল ভাবে মিনতি করলেও আমার কথা বিশ্বাস হবে না। কপালে মার এড়ানো অসম্ভব। এই বসল বুঝি চড়টা! আর ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলাম?

এমন সময়, "পাগলি কোথাকার! তুমি কি ভাবছ আমি তোমাকে

মারতে এসেছি? তোমার কোনো অপরাধ নেই, তুমি কিছু বলনি, তা কি আমায় বলতে হবে? আমি উপরে পিছনকার ঘরে দাঁড়িয়ে নিজে সব গণ্ডগোল দেখছিলাম। আর যদিও আমি সেখানে দাঁড়িয়ে না থাকতাম তবুও আমি ওসব কক্ষণো বিশ্বাস করতাম না—বুঝলে? তোমাকে আমি মারব বলে এখানে এসেছি ভেবেছ? আমাকে তুমি এই পরীক্ষা করলে? চুপ করো, কেঁদোনা। চুপ, চুপ, একেবারে কেঁদো না। আর শুধু সাত-আটটা মাস রয়েছে, তারপরে বোম্বাইয়ে তোমাকে কেউ বকতে আসবে না। চুপ করো, একেবারে কেঁদো না। একী পাগলের মতো!"—এই অমৃতসমান কথা আমি শুনতে পেলাম।

আজ কতদিন হল আমার সঙ্গে কেউ অমন ভালোবাসাভরা কথা বলেনি। তখন ঠিক তেমন কথার দরকার ছিল। স্বপ্নেও ভাবিনি যে ওঁর মুখে তেমন প্রেমময় কথা শুনতে পাব। এমন অবস্থায় ওঁর মুখে সেই মধুময় কথা শুনে আমি যে-সান্ত্বনা পেলাম, তা কথায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন। আমার কান্না একেবারে থামল। আমার আশ্চর্যের সীমা রইল না। আর বড়মার অকারণে বকুনির দুঃখ এই আকস্মিক সুখলাভে কেমন যেন ভুলে গেলাম। আমি একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী বলব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময়, দরজার বাইরে কেউ এসেছে কি না তাই উঁকি মেরে দেখে, উনি আ·ার পাশে এসে আমার মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, "আর মার খাবার ভয় নেই তো? মেয়েরা যে কেমন বোকা! আমাদের কি মারপিট করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই?" এই বলে নিচু হয়ে আমার দিকে হাসিমুখে চাইলেন। আমি চট্ করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। হাসি পাচ্ছিল, সেটা চেপে রাখতে কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু শেষে ফিক্ করে হেসে ফেললাম। তখন, "কেন? মুখ ওদিকে ঘোরালে যে? আমার সঙ্গে কথা বলবে না বুঝি?" এই বলে আবার আমার চিবুক ধরলেন। হঠাৎ দরজায় আওয়াজ হল, অমনি চমকে উনি তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গেলেন, আর দেখতে পেলেন যে, বহু ঠাকুরঝি ওঁর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে উপরে যাচ্ছে। যাবার সময় শুধু শুধু দরজায় উঁকি মেরে গেল। উনি সাড়া দিলেন না, কিন্তু বহু ঠাকুরঝির পা সিঁড়ির উপর ওঠামাত্র, তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে, "আবার কিন্তু এই রকম দেখা হওয়া চাই"—বলে মুচকি হেসে আমার দিকে চেয়ে, দরজা দিয়ে চট করে চলে গেলেন। এক মুহূর্ত পিছন ফিরে

দেখবারও জো ছিল না। ওঁর মুখে "কেন? আমার সঙ্গে কথা বলবে না বুঝি?"—এ-কথা শোনার আগেই আমার কত কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু মুখ ফুটে যে একটি কথাও বার হচ্ছিল না। যত কথা বলতে ইচ্ছে করছিল সে-সব যদি বলতে পারতাম, তাহলে বোধ হয় তিন-চার দিনেও সে-কথা শেষ হত না।

কিন্তু আমি এ কী লিখছি? কেউ কেউ বলবে, "এক ফোঁটা তো মেয়ে! স্বামীর সঙ্গে আগে কখনো কথা বলার অভ্যাস নেই, আর তিন-চার দিনে ফুরোবে না, অত কথা ছিল!" কিন্তু কত কি কথা বলার ইচ্ছে ছিল, তা বলতে পারব না, তবু অনেক কিছু মনের কথা বলবার ইচ্ছে ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সত্যি কথা বলতে গেলে, সে-দিনকার সে-ঘটনা আমার পক্ষে ভালোই হল। দুর্গী যে-দিন তার কথা বলেছিল, সে-দিন থেকে কেবলই আমি ভাবতাম, আমারও কি ওই রকম দুর্গতি হবে? আর ওঁর মুখ দেখতে পেলেই বুক দুরু দুরু করত। একদিন আমি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ উনি এলেন, বনু ঠাকুরঝি কোথায় ছিল, সে চট করে আমাদের দুজনকে ছুঁয়ে "কাশী-যাত্রা"[১] করে ঠাট্টা করতে লাগল। বাবা গো! তখন যা বড় বড় চোখ করে বনু ঠাকুরঝির দিকে তাকিয়ে দেখলেন! ওঁর সেই চোখ-রাঙানি আমি এখনো ভুলিনি। ওরকম কিছু হলে দুর্গীকে আমার মনে পড়ত, আর আমি ভাবতাম যে নিশ্চয় আমারও সেই দশা হবে। বনু ঠাকুরঝি ঠাট্টা করায় সে-দিনকার ওঁর ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে আমি ঠিক মনে করেছিলাম যে আমার আর রক্ষে নেই।

বাস্তবিক অমন ভয়ের কোনো কারণই ছিল না। কেন না, উনি কখনো রেগে কিংবা ভ্রূকুটি করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন বলে আমার মনে পড়ে না। কিন্তু শত হলেও আমার সঙ্গে ওঁর যে স্বামী-সম্বন্ধ! 'স্বামী' এই শব্দটি উচ্চারণ হওয়া মাত্র, অন্ততঃ ছোট বেলায়, ভয় ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। আমাদের স্থির ধারণা এই যে, 'মার' আর 'বকুনি' এই দুটি শব্দ যেন ওই একটি শব্দে মিশে আছে। পরে না চেনা-শোনা হয়ে,

১ সেকালে কাশী-যাত্রা করা অতিশয় কঠিন ছিল, ঠিক তেমনি স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া মুশকিল ছিল। তাই স্বামী স্ত্রীকে একসঙ্গে দেখলে, কাশী-যাত্রার পুণ্য সঞ্চয় হল মনে করে তাদের দেখতে পেলেই 'কাশী-যাত্রা' বলে, বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করত।

অনুভবমতো নিজের নিজের স্বামী সম্বন্ধে মত বদলাতে পারে। কিন্তু বড় হয়েও স্বামী সম্বন্ধে 'কারো হতে নেই স্ত্রী আর কারো হতে নেই চাকর', 'সাপ নয় বেচারী কভু, আর স্বামী বিষম প্রভু'—এইরকম প্রবাদ মেয়েদের মুখে শুনে তাদের সঙ্গে স্বামীর সম্পর্কের ধারণা স্পষ্ট বুঝতে পারা যেতে পারে।

কিন্তু যে-দিন সান্ত্বনাপূর্ণ শব্দের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল সে-দিন, যে-স্থান থেকে তেমন মমতাময় কথা সারা জীবনে শুনতে পাবার আশা আগে করিনি—সে-স্থান থেকে অমন মধুময় সান্ত্বনা পেয়ে, আমার অসীম আনন্দ হল। আমি আমার সব দুঃখ ভুলে গেলাম। আর কেউ যত ইচ্ছে বকলেও কাউকে ভয় নেই ভেবে, আমি যেন দ্বিগুণ বল পেলাম। একটি গল্প আছে, এক মহিলার সঙ্গে তার স্বামী জীবনে কক্ষণো কথা বলেনি। একদিন সে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার স্বামী তাকে সহজভাবে জিজ্ঞাসা করল, "ও কে?" অমনি সে বলল, "আমি।" আর তক্ষুণি হৃষ্ট হয়ে, "উনি বললেন 'ও কে'? আমি বললাম, 'আমি",—এই মন্ত্র সে জপ করতে লাগল আর আত্মহারা হয়ে গেল! গল্পের সেই স্ত্রীর মতোই আমার অবস্থা হল।

আমি কিন্তু একেবারে তার মতো আত্মহারা হইনি। দিদিশাশুড়ীর মুখে খই ফুটতে আরম্ভ হয়ে তিনি বাবার সম্বন্ধে যা বিচ্ছিরি কথা বলছিলেন, তা আমার বুকে শেলের মতো বিঁধে গিয়েছিল! এ আবার কী ব্যাপার? বড়মার সে কথার মানে কী? আমার বাবা জেলে গিয়েছিলেন? সে আবার কখন? আমি কেন আগে জানতে পারিনি? আমার জন্ম হবার আগে নাকি? আর কেনই বা জেলে গিয়েছিলেন? তিনি এমন কি অপরাধ করেছিলেন? সে কি এক ভাবনা! এ রকম লক্ষ দু'লক্ষ প্রশ্ন মাথায় জটলা করতে থাকল, আর আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ-সব রহস্য স্পষ্ট জানব কী করে? কাকে জিজ্ঞাসা করব? আজ পর্যন্ত এ-কথা আমি শুনিনি কী করে? আমি এত কৌতূহলী, সব তাতে "এটা এমন কেন? ওটা ওরকম কেন?"—ইত্যাদি জানতে আমার কত আগ্রহ! কখনো কখনো তো আমার সেই শখের একটু বাড়াবাড়ি হত। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! বাবার জেলের কথা আমি কিচ্ছু জানতে পারিনি। তাতে আবার দুপুর-বেলা বনু ঠাকুরঝি এসে বলল, সে তো

যেন ছোঁ মেরে আমার দোষ ধরবার জন্য সর্বক্ষণ সতর্ক থাকত—"বৌদি, তোমার বাবা জেলে ছিলেন? ওমা, আমি তো কিছুই জানতাম না।"

সে-কথা শুনে আমার কত দুঃখ হল তা কল্পনা করাই ভালো। আমি চুপ করে রইলাম। দাদার সঙ্গে যখন দেখা হবে, তখন দাদার কাছেই 'সত্যি কথা জানতে পারব, তা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই ভেবে, সয়ে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

কিন্তু সে-দিন অসীম আনন্দ লাভ করা সত্ত্বেও, বড় ঠাকুরঝি এসে ঘাঁকে ঘা দিলেন বলে আমার মন আবার খারাপ হয়ে গেল, আর চোখ বেয়ে অবিরল ঝরনা বইতে লাগল।

সংশয় দূর হল

"তোকে কে বলল? পাগলী কোথাকার! যাচ্ছেতাই কী যে জিজ্ঞেস করিস?"

"বা রে! স্বয়ং দিদিশাশুড়ী বললেন, তাই তো জিজ্ঞেস করছি। ও কী ভাই দাদা?"

"হ্যাঃ! যাচ্ছেতাই খোঁচা মেরে একটা কিছু বলবার ছিল, তাই বলেছে বোধহয়। তুই কিন্তু যমু, এত বড় হয়েছিস তবু কিছু বুঝতে পারিস নে। এ রকম কথা? সে বুড়ীটা যাচ্ছেতাই বকেছে দেখছি। বুড়ো বয়েসে ওর বুদ্ধি নষ্ট হয়েছে—আর তুইও অমনি এসে সে-কথা আমায় জিজ্ঞেস করলি। কী যে বলি তোকে!"

দাদা এ-কথা বলছিল, কিন্তু তার মোটামুটি ভাব এমন ছিল যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, সে মুখে ও কথা বলছিল আর সত্যি কথা গোপন করছিল। মানুষ যদি ভীষণ পাকা হয় তবে আলাদা কথা, কিন্তু দাদার মতো সরল মানুষ যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা গোপন রাখবার চেষ্টা করে, তাহলে কথা দিয়ে সে-কথা যতই সে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করুক না কেন, তার চেহারা সে-কথা প্রকাশ না করে পারে না যে সেটা সত্যি কথা নয়। তাতেও আমরা আবার নারীজাতি, সহজাত বুদ্ধিবলে "সুতো বেয়ে স্বর্গে উঠতে পারি!"[১] সরলবুদ্ধি ভালো মানুষ আমাদের কাছে চালাকী করতে পারবে না। উপরের কথাগুলি বলবার সময় দাদার চেহারায় যে-পরিবর্তন হচ্ছিল, তার বিভিন্ন কথা উচ্চারণ করবার সময়কার প্রয়াস, আমি তাকে আকস্মিক ভাবে প্রশ্ন করলাম তখন থেকে তার মনের বিচলিত ভাব, ইত্যাদি আমার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তাই আমি নিশ্চিত ঠাওরালাম যে, এখানে "মাটিটা একটু স্যাঁৎসেঁতে।"[২] আমি ঠিক বুঝলাম, বড়মা রাগের ঝোঁকে যা বলে-

১ "সুতো বেয়ে স্বর্গে ওঠা"—একটি মারাঠি প্রবাদ। এর অর্থ এত স্পষ্ট যে, বেশি করে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

২ "মাটি একটু স্যাঁৎসেঁতে"—মারাঠি প্রবাদ, এর অর্থও স্পষ্ট।

ছিল তা সত্যি কথা। কেননা, কোনো মানুষ কারো বিষয়ে অমন যাচ্ছে-তাই কথা অত স্পষ্ট করে বলতে পারে না। তিলকে তাল করতে পারে, কিন্তু গোড়ায় তিল থাকা চাই। তবে সে তিলটা কী ছিল? জেলে যাওয়ার মতো বাবা কী করেছিলেন? আগাগোড়া ইতিহাস জানবার আমার বড্ড ইচ্ছে ছিল! বাড়িতে কাকে এ-সব কথা জিজ্ঞাসা করব? সৎমাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। বাকী রইল দাদা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন এই ফ্যাসাদ। এ-সময় পর্যন্ত তার ব্যবহার দেখে সে যে কিছু টের পেতে দেবে তা আমি অবশ্য ভাবিনি। তবু ভাবলাম—ঢিল ছুঁড়ে দেখা যাক। আর ঢিল ছুঁড়তেই আমার সংশয় দূর হল। নিজের বাবা সে-রকম বিপদে আটকে পডা কত নিন্দার ব্যাপার! কিন্তু কী জানি, তাঁর কোনো দোষ না থাকতে যদি তিনি বিপদে পড়ে থাকেন, তাহলে তা জানতে পেলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারব, এই ভেবে আমি দাদাকে সব কথা বলবার জন্য চাপ দিতে লাগলাম।

মানুষের মন কেমন আত্মবিরুদ্ধ! নিজের লোকের বিষয়ে যদি কোনো খারাপ কথা শুনতে পাওয়া যায়, তবে তা প্রথমে বিশ্বাস হয় না। পরে যখন নিশ্চিতভাবে জানতে পারা যায় যে, যা শুনেছি তা সত্যি, তখন সে-অপরাধ হওয়ার নিশ্চয় তেমন কোনো কারণ ঘটে থাকবে মনে করে মানুষ সেই কারণ খুঁজতে থাকে। আর যদি সে-কারণগুলি সত্যি হয়, তাহলেই যথেষ্ট! সে-কারণগুলিকে সামনে ধরে যেখানে সেখানে সেই প্রিয়জনের পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা মানুষ করে। আর কারণগুলি সত্য না হলেও, 'সে কারণ সত্যি, লোকে ভিতরের খবর জানে না, শুধু শুধু নিন্দা করাই তাদের অভ্যেস', এই বলে আমরা নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তার দোষ ঢাকবার চেষ্টা করি। এত সব কেন? "আমি" আর "আমার" এই জন্যে। দাদার এই আচরণ মানব-স্বভাবের অনুকূলই ছিল! যত দূর সম্ভব সে-ঘটনা যাতে আমি জানতে না পারি তার জন্য সে চেষ্টা করছিল। শেষে আমি কেঁদে ফেললাম, আর চোখের জলে ভেসে তাকে বললাম, "দাদা, যে-ঘটনা পৃথিবী শুদ্ধ লোক জানে, আমাদের সামনে না হলেও পিছনে নিশ্চয় যে-বিষয়ে লোকে আলোচনা করে, সে-ঘটনা কি সত্যি? আর তাতে সত্যের ভাগটা কত, তা আমি জানতে পারব না এটা আমার কত বড় দুর্ভাগ্য! দাদা, আমি এত বড় হয়েছি বলিস, আর এমন কথা লোকে আমাদের সম্বন্ধে কেন

বলে তা আমার অজানা? দাদা, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই যে! আমার তুই আর তোর আমি। তাই আমি তোকে সব কিছু বলতে আসি। একটু কিছু হলেই দাদাকে বলা, কিছু করতে হলেই দাদাকে জিজ্ঞাসা করা, তা কেন ভাই? আর তুই এ-রকম করিস? মা যদি থাকতেন—"

আমার মুখে এই শব্দ বেরোতে না বেরোতেই দাদার চোখ জলে ভরে এল, আর আমার হাত ধরে সে বলল, "থাক থাক। যমু, আমার তুই, আর তোর আমি এই সত্যি। আর তুই কী মনে করিস তা আমি জানি না। সুন্দরী তোর চেয়ে কতো ছোট, কিন্তু ওর জন্য আমার অত মন কেমন করে না। ওকে আমার এত বেশি মনে পড়ে না। সেও তো আমার বোন। কিন্তু যমু, তোকে যে আমি কত ভালোবাসি তার সীমা নেই। আর তুই যখন এমন আকুল ভাবে কিছু বলিস, মাকে মনে করিস, তখন আমার ভারি মন কেমন করে। আমি তোকে এ সব কথা বলিনে, তুই বার বার জিজ্ঞাসা করলেও আমি বলিনে, তার মানে কি এই যে আমি সে-সব তোকে লুকোতে চাই? দূর পাগলি! আমার মনে হয় যে আমি জানি সেই যথেষ্ট। যমুকে আবার বলে ওকে দুঃখ দিয়ে দরকার কী? তাছাড়া, এখনো তুই সব জানবার মতো বড় হসনি। আর তোর তা জেনেই বা দরকার কী? যদি নাই জানলি তাতে কী ক্ষতি? আমার কথা যদি শুনতে চাস্, তাহলে আর এক বছর কি দু' বছর তুই আমাকে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করিস না।" এই বলে সে খানিক স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর কী যেন ভেবে, আবার চট করে আমার দিকে চেয়ে বলল, "যমু, রাগ করিসনে ভাই। তুই বোম্বাই গেলে পরে আমি নিজে থেকে তোকে সব বলব। সত্যি, যমু, তোরা নাকি বোম্বে যাবি? কবে যাচ্ছিস?"

"সে কী কথা! তুই কিন্তু ভারি ঠাট্টা করতে চাস! কে তোকে বলল যে আমরা অল্প দিনের মধ্যে বোম্বাই যাব?"

"কে বলল? বাঃ! যিনি তোকে নিয়ে যাবেন, তিনিই বললেন। শুধু এই নয়, তোর দিদিশাশুড়ী যখন তোকে বকল, তখন তুই কোথায় গিয়ে যেন কাঁদতে বসলি, আর তার পরে কে যেন তোর পিছন থেকে এসে তোকে—"

"মরণ আর কী! দাদা, সে-কথাও তোকে বললেন নাকি? আমি বাবা ওরকম জানি না। কী বলা উচিত আর কী বলা উচিত নয়, পুরুষ মানুষ বাবা তার মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারে না।"

"যমু", দাদা আমাকে খুঁচিয়ে বলল, "'এতটুকু হলে তোকে বলি' বলিস, তবে একথা কই বললিনে যে? বেশ তুই না বললি, নাই বললি, আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু আমাকে যখন বললেন, তখন আমি কী বললাম জানিস? বললাম, 'আহা, অতোটুকু তো বউ, নাকের পোঁটাও মুছতে জানে না, আর তাকে আপনি সান্ত্বনা দিতে গেলেন? ওই এক রত্তি বউকে বললেন কী? আপনি যে একেবারে বৌ-পাগলা দেখছি।' দেখ যমু, আমি এ-কথা যখন বললাম তখন তিনি চোখ প্যাঁট-প্যাঁট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি ভাবলাম এবার আমাদের ঝগড়া হবে, কিন্তু তিনি হঠাৎ বললেন, 'গণপতরাও, আপনি ওর যোগ্যতা জানেন না। বৃথা আপনার বোন হয়েছে বেচারী।'"

ওঁর ওসব কথা দাদার মুখে শুনে সত্যি আমার কত আনন্দ হল! আমি দাদাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার সব কিছু একেবারে ভুলে গেলাম। আর ওঁর কথা দাদা যাতে বেশি করে আরও বলে, তাই আমি বললাম, "সত্যি এই বললেন? আর কী বললেন? আরও অনেক কথা বললেন বুঝি? গল্প বানিয়ে বল বাবা, বল।"

তারপরে দাদা আরও কিছু বলতে যাবে, এমন সময়, "ভাই-বোনে কী গুজ-গুজ চলছে? আমি আসতে পারি কী দু'জনের মধ্যে?"—এই বলে মাঈ-সাহেব হাসতে হাসতে উপরে এলেন। তাঁর পায়ের শব্দ আমি একেবারে শুনতে পাইনি, দাদাও শুনতে পায়নি। নইলে সে তক্ষুনি কথা ঘুরিয়ে ফেলত, কিংবা চুপ করে যেত। হঠাৎ আমাদের মাঈসাহেব এলেন, তাই আমাদের কথা বন্ধ হল। আর তাছাড়া আমাদের মনে একরকম ভয় হল। সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের সব কথা শুনেছিলেন নাকি? আমি ভাবলাম যে তিনি শুনেছিলেন নিশ্চয়। কেননা, আগে দু-একবার ওঁর ওরকম আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শুনবার অভ্যাস ধরতে পেরেছিলাম। তাছাড়া, যাদের মন কুৎসিত, তারা সব সময় ভাবে যে বোধহয় সবাই তাদের বিষয়েই কোনো মন্দ কথা বলছে। তাই অন্যদের কথোপকথন শোনবার জন্যে তারা বড় উৎকণ্ঠিত থাকে। কোথাও কেউ কথা বললে তাদের কথা আড়াল থেকে শোনা, কখনো কখনো আড়ালে চর দাঁড় করিয়ে খোঁজ নেওয়া, এ-সব তাদের উৎকণ্ঠা তৃপ্ত করার উপায়।

মাঈসাহেব যদিও কিছু শুনে থাকেন, তবু তিনি তা আমাদের মোটেই

জানতে দিলেন না। আমরা কিন্তু মনে মনে ভীত হলাম। হঠাৎ মাঈ-সাহেব হাজির হলেন, কাজেই আমাদের কথা সেইখানে থামল। বেশ শান্ত দুপুর বেলা, দাদার শনিবারের ছুটি, বাবা বাড়িতে নেই, মাঈ সাহেব নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছেন, ঐসব দেখে-শুনে আমরা দু'জনে, গল্পগুজব করতে বসেছিলাম। আগে দশ-বারো দিন শ্বশুরবাড়ী থেকে ওরা আমায় বাপের বাড়ি পাঠাযনি। তারপরে যখন পাঠিয়েছিল, তখন আমার শাশুড়ী বলেছিলেন, "সন্ধ্যাবেলা কিন্তু ফিরে আসবি।" কেননা, তিনি নিজের অধিকারে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে আমি দাদাকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করলাম, আর তখন ঐরকম অবস্থা হল। তাতে আবার দাদা আমার মনোমতন গল্প করে আমাকে ফাঁকি দিল। সে-সব কথা ফুরোলে দাদাকে আবার জিজ্ঞাসা করতে যাব, তার আর সময় রইল না। শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে তাই সে-কথা মুলতুবি রাখতে হল। আর মুলতুবি রাখতে রাখতে শেষে সেটা ভুলে যাওয়ার সীমায় পৌঁছে তবে তার ইতি হল। আমার নিজের সম্বন্ধে যে-বিশেষ ঘটনা হল বলেছি, সেটা এই। দাদার সম্বন্ধেও একটি বিশেষ ঘটনা হল, সেটা তার বিয়ে।

দাদার বিয়ে

হ্যাঁ, এই অবকাশে দু'-তিন মাস হতে না হতেই দাদার বিয়ে হল।. তার বিয়ের কথা উল্লেখ করার মতো। বিয়ের পাঁচ-ছ মাস আগে বাবা একদিন খেতে বসেছিলেন। দাদা তাঁর পাশে বসেছিল, সামনের দিকে তাঁদের মুখোমুখি হয়ে মাঈসাহেব আর তাঁর পাশে আমি—এই ভাবে আমরা সবাই খেতে বসেছিলাম। খেতে খেতে সহজ ভাবে মাঈসাহেব বললেন, "গণপতরাওয়ের বিয়ে দেবার সময় হয়ে এসেছে। ওর জন্য আজ একটি মেয়ে এসেছিল।"

সত্যি, মাঈসাহেব অত ছোট, দাদার চেয়েও ছোট, আর তিনি বয়স্কা স্ত্রীর মতো এই কথা বললেন দেখে নিশ্চয় কারো হাসি পেত। তিনি কিন্তু আমাদের সামনে বাবার সঙ্গে বেশ অবাধে কথা বলতেন। আর বাবাও ওঁর সঙ্গে কথা বলতেন। ওরকম আজ অনেকদিন হল আরম্ভ হয়েছিল। নতুন মা হাসত, কথা বলত, আর বাবাকে ঠাট্টা পর্যন্ত করত। সে-সব দেখে আমরা একেবারে অবাক হতাম। আগের দিনগুলো মনে পড়ত, আর মা কেমন আচরণ করতেন তাও মনে পড়ত। আর এখনকার এই নতুন ধরণ দেখে আমরা যা ভাবতাম তা আমরাই জানি। ভাবতাম, বাবা এ সব সহ্য করেন কী করে? আমাদের মা বাবার সামনে বসা দূরে থাক, দাঁড়িয়ে ওঁর দিকে মুখ তুলে চোখাচোখি চেয়েও দেখতেন না। দাঁড়াবার সময় মুখ একটু আড়াল করে দাঁড়াতেন। আর মাঈসাহেব কোমরের চাবি ঝুম্-ঝুম্ করে বাজাতে বাজাতে, বাবার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসে থাকলেও তাঁদের ঘরে সটান যেতেন। সে অনেক কথা। মা আর মাঈসাহেব এদের দুজনের আচরণের তুলনা করতে বসলে লেখায় অনেক কিছু আছে। সে আবার এক রামায়ণ হবে। দুজনাতে কিছুমাত্র মিল ছিল না। আমাদের মার কথাই আলাদা! তাঁর নাম করাও পুণ্য। বাবার সঙ্গে দেখা করতে কত বন্ধুবান্ধব আসতেন, কিন্তু মা

তাঁদের শুধু দু-একজনের সঙ্গেই অল্পমাত্র কথা বলতেন। অন্য সকলের সামনেও তিনি আসেননি। মাঈসাহেবের রকমই আলাদা। তিনি কারো সঙ্গে কথা বাদ দিতেন না। চার-পাঁচ বার কোনো ভদ্রলোক বাড়িতে এলে অমনি মাঈসাহেব তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করতেন, কোনো কুণ্ঠাই থাকত না। আর কাকে কোন কাজটা করতে বলবেন, তারও ঠিক ছিল না। মোটের কথা, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মহিলার উপযুক্ত ব্যবহার তিনি ষোল বছর বয়সেই করতে শিখেছিলেন। আর এমন আশ্চর্য যে, বাবা তাঁকে একটি কথাও বলতেন না। যারা আমাদের মার সঙ্গে বাবার আগেকার ব্যবহার দেখেছে, তারা তাঁর এই নতুন আচরণ দেখে আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারবে না।

উপরে লিখেছি, আমরা সবাই খেতে বসেছিলাম। আমাদের দিদিমা—মাঈসাহেবের মা—কাশীযাত্রায় গিয়েছিলেন। নতুন রাঁধুনী পরিবেশন করছিল। খেতে খেতে ওই প্রশ্ন মাঈসাহেব বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন। বাবা কিছুই বললেন না। আবার—

"কেন? কথা বলবে না বুঝি? গণপতরাওর এখন বিয়ে দেবে না?" মাঈসাহেব জিজ্ঞাসা করল।

"দেখা যাবে। এরি মধ্যে কী?"—বাবা উত্তর দিলেন।

এই হল দাদার বিয়ের কথা শুরু। আর আমাকে দাদা বলল যে সে-দিন থেকে মাঈসাহেব বাবার পিছনে সর্বক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান আরম্ভ করেছিলেন। রোজ উঠতে বসতে দাদার বিয়ের কথা তিনি বাবার কাছে তুলতেন। "এখন লোক আসে, রোজ পাত্রের খোঁজ-খবর নিতে লোক আসে, ওদের কী বলব? এ ভালো নয়, এখন ও বড় হয়েছে।" আমাদের ঠাকুমার আর বাবার মধ্যে সম্পর্ক যদি ভালো থাকত, তাহলে তিনি যে-রকম বাহানা ধরতেন, মাঈসাহেব সেই রকম বাহানা ধরলেন।

তারপর রোজ মেয়েদের কথা বলতে লাগলেন—সেই অমুকদের মেয়ে একটু ভালো, কিন্তু তারা যৌতুক তত বেশি দেবে না। তাছাড়া বাড়ির লোকজনও সাধারণ। তমুকদের মেয়ে বেশ ভালো, যৌতুকও দেবে অনেক। একবার কিন্তু যৌতুকটা দিয়ে ফেললে, পরে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়াও পাওয়া যাবে না। অমুকের মেয়ের বয়স কম, আর মেয়েটা একটু ঢ্যাঙা, কিন্তু দেখতে

বেশ সুন্দর। মেয়ের বাবা মুন্সেফ, যৌতুক ঢের দেবে, মেয়ের ঠাকুমা কাজকর্মে নিপুণ বলে সুখ্যাতি আছে। সে-মেয়েটি একবার দেখলে হয় না।—এইরকম অবিরাম ঘ্যানর ঘ্যানর চলত। একদিন তো তিনি আমাকেই বললেন, "যমু, দাদার সত্যি এখন বিয়ে দিতে হবে কিনা বল? তোর সমান ছেলেদের বিয়ে হয়ে তাদের বৌরা ফল দেখেছে। তুইও কি এখন ছোট? এতদিনে বাচ্চা হত। কিন্তু এখনও মাসিক—" তারপর তিনি কী বলবেন তা বুঝতে পেরে, লজ্জিত হয়ে আমি বললাম, "সত্যি মাঈ, এ-বছরে দাদার বিয়ে দিতে হবেই। বাবা কিছুই বলেন না। ঠাকুরদা একবার ওর বিয়ের নাম করেছিলেন, তখন দাদাই তাঁকে বাধা দিল"—আমার মুখ দিয়ে এ-কথা বেরোবামাত্র অমনি অধীর হয়ে তিনি বললেন, "কী? কী বললি? দাদা ওঁকে বাধা দিল? সে কী রকম?"

তাঁর সেই প্রশ্নটা শোনামাত্র আমি তাড়াতাড়ি নিজের জিভ কামড়ালাম। একবার ঠাকুরদা দাদার বিয়ের সম্বন্ধে বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন, তখন বাবা উত্তর পাঠিয়েছিলেন, "এরি মধ্যে আমি ওর বিয়ে দেব না।" কিন্তু ঠাকুরদা সে-চিঠি অগ্রাহ্য করে আর একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বাবা সেটা পড়ে দেখে জঞ্জালের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেললেন। তখন দাদা চুপিচুপি ঠাকুরদাকে নিজে একটা চিঠি লিখে পাঠাল। তাতে সে লিখল—"আর অপনি এ-বিষয়ে চিঠি লিখিবেন না। এখানে শুধু তার নিন্দা হয়, আর বাবা রাগ করেন" ইত্যাদি। তারপরে একবার ছুটির সময়ে দাদা আর আমি আবার ঠাকুরদার বাড়ি গিয়েছিলাম, তখন ঠাকুমা আর ঠাকুরদা বললেন, "ওর অত কর্তাতি চাই না। তুই এখানে আছিস এর মধ্যে আমরা এইখানেই তোর বিয়ে দিয়ে ফেলব। ঠিক সময়ে ওকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেব, এল তো ভালই, নইলে আমরা নিজেই ঠাকুর পূজো করে বিয়ের বাজনা বাজিয়ে ফেলব, ব্যাস্।" শুধু কথা বলে তাঁরা থামলেন না, দাদার জন্য মেয়ে দেখতেও শুরু করলেন। তখন একদিন দাদা ঠাকুরদাকে স্পষ্ট বলল, "আমি পরীক্ষা উত্তীর্ণ না হলে বিয়ে করব না। আপনি এ-ঝঞ্ঝাট বাড়াবেন না।" ঠাকুরদা রাগ করলেন। দাদা সেখান থেকে চলে গেল। ঠাকুমা যা বকাবকি আরম্ভ করলেন তা বলা যায় না। "নাও এখন। গণপু তোমার লক্ষী খোকা তো? 'আমার গণপু বড় ভালো,' রাখ এখন গণপুকে মাথায় চড়িয়ে। বেশ এখন মাথায় ঘোল ঢেলে দিচ্ছে। ওগো, ও

কার ছেলে জানো না? আর নাতি কার?" এই শেষের কথাটা ঠাকুমা একটু কুৎসিত ভাবেই বললেন। অমনি ঠাকুরদা তেড়-মেড়ে এলেন, আর কাঁপতে কাঁপতে তাঁর মুখের চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন, "আপনার গো আপনার!" ওই হয়েছে! একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল। দাদার এমন অবস্থা হল যে সে কি করবে তাই ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু অল্পদিনেই দাদার ছুটি শেষ হয়ে-আমরা ফিরে এলাম। ফিরে আসবার দিন ঠাকুমা আমাকে বুকে চেপে ধরে এত কাঁদলেন যে তা বলা যায় না। দাদাকে তিনি অনেক বকলেন। "ওছেলেটা বড় নিষ্ঠুর, ওর মন কক্ষণো গলবে না। ঠাকুমার জন্য ও ভাববে কেন? ওর বোধহয় মাকেও মনে পড়ে না। বেটা বাঁদর আমাদের বিদ্যে শেখাতে চায়। বলে কিনা, পরীক্ষা পাশ না করে বিয়ে আমি করব না। যা, করবিনে তো করবিনে। আমরাই বা তোর ব্যাপারে পা বাড়াতে যাব কেন? বেশ হল, একেবারে বুঝতে পারলাম, আর কোনো মায়াপাশ রইল না।"

এসব ব্যাপার বাবার বাসায় কেউ জানত না। তাই আমি "দাদাই তাঁকে বাধা দিল" বলামাত্র মাঈসাহেব অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী বললি? কী?" একবার মুখের বাইরে কথা বেরিয়ে গেলে "কিছু না, কিছু না" বলে কি আর সত্যি কথা গোপন রাখা যায়? আগাগোড়া সব কথা না হলেও অনেকটাই বলতে তিনি আমাকে বাধ্য করলেন। আর তার পরে দাদার কাছে গিয়ে বললেন, "কী গণপতরাও, পরীক্ষা পাশ না করে বিয়ে করবে না বুঝি? পরে কি নিজে তেজী, চটপটে মেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করবে? ও মা! তা আমি জানতাম না। আমি পাগলী শুধু শুধুই যে ওঁর পিছনে ঘ্যান ঘ্যান করছিলাম।" এই রকম একবার দু'বার বলার পর, দাদা একবার বিরক্ত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, মাঈ আমার তাই সংকল্প। আমি বি. এ. পাশ না করে বিয়ে করব না।" দাদার এই উত্তর শোনামাত্র হাসতে হাসতে মাঈসাহেব, "বেশ, বেশ, সংকল্পটা মন্দ নয়। কিন্তু তা টিকবে কেমন করে তাই দেখা যাবে।" এই বলে কেমন-যেন বাঁকা দৃষ্টিতে দাদার দিকে চেয়ে দেখে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

এর পরে পাঁচ-ছ' দিন যেতে না যেতেই দাদা দেখতে পেল যে বাবা তার বিয়ের বিষয়ে মন দিয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করে

দিয়েছেন। কোনো বন্ধুবান্ধব এলে মেয়ের বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দু-একটি মেয়েও বাড়িতে আসতে লাগল। দু-একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মেয়ে দেখতে যেতেও আরম্ভ করলেন। দাদা রাগে জলতে লাগল। তার বিয়ে, আর তার মত না নিয়ে, তাকে না বলে বাবা বেশ মেয়ে দেখতে আরম্ভ করলেন, তখন নিজের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃথা হবে, আর ওঁরা তার সঙ্গে পুতুলের মতো ব্যবহার করবেন ভেবে, দাদা বিষম অস্বস্তি ভোগ করতে লাগল। শেষে একদিন সে আমার কাছে কেঁদে ফেলল। তখন তার দুঃখ বুঝে তার সঙ্গে সমদুঃখিনী হওয়ার মতো আমার বুদ্ধি বিকশিত হয়নি। তাই আমি তাকে বললাম, "ওকী? দাদা, সময়ে-অসময়ে কাঁদা কি ভালো? এবার তোর বিয়ে হবে। আমার বৌদি—" কিন্তু সে-বেচারা আমার কথা শুনে সেখান থেকে উঠে চলে গেল। তারপরে, বোধহয় কাউকে দিয়ে সে বাবাকে জানিয়েছিল, "আমি এরি মধ্যে বিয়ে করব না। আমি পরীক্ষা পাশ করলে পরে বিয়ের চেষ্টা করুন।" বাবা তক্ষুণি সেই লোক মারফৎ তাকে জানালেন, "তোমার ইচ্ছে কী তা জিজ্ঞেস করলে তবে তোমার মত দিও।" বাবার এই উত্তরের পরে বিয়ের আয়োজন সুরু হল। শেষে বোধ করি দাদা একটা চিঠি লিখে বাবার টেবিলের উপরে রেখে দিল। চিঠিতে সেই এক কথাই সে লিখেছিল। তখন বাবা তাকে ডেকে বেশ বকে ঢিট করে দিলেন। আর শেষে বললেন, "আপনার এখন কান লম্বা হয়েছে, আপনি যদি নিজের ইচ্ছে-মতো ব্যবহার চান, তাহলে বাপু সে-সব এ-বাড়িতে খাটবে না। আপনি নিজের ব্যবস্থা বাইরে কোথাও করতে পারেন। এ-বাড়িতে আমার মনের মতো চলতে হবে।" তখন আর দাদা-বেচারা কী করবে? মনে মনে ছটফট করল আর চুপ করে রইল। মেয়ে পছন্দ করলেন মাঈসাহেব, যৌতুক নেওয়া হল সাড়ে-সাতশো টাকা, তাছাড়া বেয়ানের মান-সম্মান আলাদা, তার জন্য একশো-পঁচিশ টাকা না কত যেন ঠিক করা হয়েছিল, মুখ ধোওয়া, স্নানস্নান, মাথা মুণ্ডু! মাঈসাহেব নিজের মান-সম্মান বেশ করে আদায় করে নিলেন।

এখন আর সে-বিয়ের উৎসবের কথা আগাগোড়া সব লিখে দরকার নেই। কিন্তু একটি বিশেষ কথা বলতে হবে। সব ঠিক হলে ঠাকুরদাকে

আর ঠাকুমাকে নিয়ে আসতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। ঠাকুরদা মোটেই এলেন না। ঠাকুমা বেচারী একাই এলেন। তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হল যে সে-বেচারী ভাবলেন, "এ কোথায় এলাম!" তাঁকে কেউ মানছিল না। যতো সব জাঁকজমক মান মাঈসাহেবের, আর তিনি যে-সব তাঁর মামী পিসীদের ডেকেছিলেন তাঁদের। আমাকেও যেমন-তেমন মনে করলেন। সুন্দরী বেচারী যেন জঞ্জাল। আমি তাকে ছাড়তাম না তাই রক্ষে! দাদার মনের অবস্থা কী রকম হয়েছিল, সেটা 'মুখ দেখার' সময়ের একটি কথা বললে বেশ বোঝা যাবে। 'মুখ দেখার' সময় বর-কনেকে কোলে বসিয়ে তাদের মুখে চিনি দেওয়া হয়। ঠাকুমা যখন তাদের মুখে চিনি দিলেন, তখন মাকে মনে করে তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তার পর বর-কনে মাঈসাহেবের কাছে গেল, তখন দাদার মুখে চিনি দেবার সময় তিনি বললেন, "পরীক্ষা পাশ করার জন্য এই চিনি, বুঝলে? বাছার মুখ মিষ্টি হোক।" তখন বেচারা দাদার মুখ কত যে তেতো হয়েছিল, তা শুধু তার দিকে চেয়ে দেখছিলাম বলে আমি, সে নিজে, আর ঠিক সময়ে খোঁচা মেরে আনন্দ লাভ করে, হাসতে হাসতে দাদার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিলেন বলে মাঈ সাহেব,—আমরা তিনজনে মাত্র বুঝতে পেরেছিলাম।

যাক্, এই রকম স' হয়ে দাদার বিয়ে হল, আর আমার বৌদি ঘরে এল।

আগের পরের কথা

এই সময়ের তৃতীয় ঘটনাটি হচ্ছে দুর্গার ঋতু-দর্শন আর অবিলম্বে তার গর্ভধারণ। যে-দিন দুর্গা হলুদ-কুঙ্কুমের জন্য এসেছিল তখন সে যে-সব কথা বলেছিল সেগুলি, আর তখনকার তার শারীরিক আর মানসিক অবস্থার বর্ণনা আমি করেছি। তার পরে অল্পদিনের মধ্যেই দুর্গার ঋতু-প্রাপ্তি হল। আর তার পরের আচার-অনুষ্ঠান হল। তখন থেকে তার সঙ্গে আমার ভালো করে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখন দেখতে পেতাম যে দিনে দিনে সে শুকিয়ে যাচ্ছে। দুর্গার জন্য আমার বড্ড মন কেমন করত। তার দাদাঠাকুর এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তাঁর আর অর্থ উপার্জন করার ততটা শক্তি ছিল না। আগে যা অল্প সল্প জমিয়ে রেখেছিলেন তাই দিয়ে কোন রকমে ভরণ-পোষণ চলছিল। তবু তিনি যতদিন ছিলেন ততদিন কোনোরূপে সংসার চালিয়েছিলেন। "তিনি যতদিন ছিলেন" বলার কারণ এই যে, দুর্গার ঋতু-দর্শন হবার সময়ে তাঁর পক্ষাঘাত হল আর অল্পদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হল। তাই দুর্গার উপরে সকলে অসন্তুষ্ট হল, আর এই জন্য সকলে তাকে দোষ দিতে লাগল।

আর একটি কারণ এই যে, দুর্গার দাদাঠাকুরের স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়ায় তাদের বাড়ি টাকাকড়ি আসার সেই একমাত্র পথটিও বন্ধ হয়ে গেল। বুড়োর মৃত্যু হয়ে সে-বাড়ির ভয়ানক হানি হল, আর সময়ে ভাত জোটাও মুশকিল হয়ে উঠল। দুর্গার শ্বশুর কেমন ধরণের লোক ছিলেন তা তো আগেই বলেছি। তাঁর বাবার মৃত্যু হওয়ামাত্র তাঁর ব্যবসায়ে বড্ড ধাক্কা লাগল। তাঁর বাবা বেশ নাম কিনেছিলেন, তাই এঁর ব্যবসাটা চলছিল। বাবা আদালতে ওকালতি করতেন; আর ইনি সেইখানেই কারো চিঠি, কারো দরখাস্ত লিখে দিয়ে দুচার আনা রোজগার করতেন। বাবা মারা যেতে ওঁর রোজগার একেবারে বন্ধ না হলেও অনেক কমে গেল। দুর্গার খুড়শ্বশুর কী রকম গৃহস্থ ছিলেন তাও পাঠকেরা জানেন। অল্পদিনের মধ্যেই

ঝগড়াঝাঁটি করে, যা গয়নাগাঁটী, বাসনকোসন ছিল, তা ভাগ করে, বড় ভাগটি নিজে নিতে গিয়ে কিছু যশোলাভ করে, তিনি আলাদা হবার ভাণ করলেন। তারপর কোথায় যেন চাকরি নিয়ে নিজের পরিবার সঙ্গে করে সেখানে চলে গেলেন। দুর্গীর বর ছিল একটা আস্ত গাধা! সে কিচ্ছু কাজ করত না, শুধু বাড়িতে মাকে জ্বালাতন করত আর বসে বসে খেত। সে এখন স্পষ্টই ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিল, তাই তার আর কোনো কাজকর্ম ছিল না। বাড়িতে মা কিংবা আর কেউ তাকে বকলে সে তাকে যা খুশি বলে অপমান করত, কাউকে গ্রাহ্য করত না। দুর্গীকে বিষম পীড়ন করত।

এমন অবস্থায় দুর্গী পোয়াতী হল। মেয়ের বয়সই বা কত, তার শারীরিক অবস্থাই বা কেমন, আর সে হল পোয়াতী। কী যে দুর্গতি! তাতেও আবার শ্বশুরবাড়িতে ভয়ানক অভাব! বাড়ির কাজকর্মের বোঝায় বেচারী ক্লান্ত হয়ে পড়ত। এত কাজকর্ম করেও কি বেচারীর ভাগ্যে একটা মুখের কথাও জুটত! তার শাশুড়ী তত বেশি বকতেন না। বাস্তবিক, বকাবকি তিনি মোটেই ভালোবাসতেন না। তাঁর স্বভাব ছিল খুব ভালো। কিন্তু একের পর এক সংকট এসেছিল বলে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর শ্বশুর মারা গেলেন, স্বামী অমন মূর্খ; দেওর ঝগড়াঝাঁটি করে, সঞ্চয়ের বেশীর ভাগটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল, ছেলেটা অমন নিষ্কর্মা বদমাস, তার বিষয়ে কোনো আশা করারই কিছু ছিল না। কী করবেন বেচারী? ঘরের খুঁটিনাটি, অভাব-অনটন, সব তাঁকেই দেখত হত; তিনিই সে-সব জানতেন। 'দুপুর বেলায় কী করব?' এই প্রশ্নটা রোজ তাঁকে ভীত করত। বেচারী সব দিক থেকে একেবারে নিরাশ হয়েছিলেন। রাগ প্রকাশ করবার ঠাঁইও ছিল না। তাই বিরক্ত হয়ে তিনি কখনো কখনো নিজের বৌকে বকতেন। তাতে আবার দুর্গীর অমঙ্গলসূচক ঋতু দর্শন হল। তিনি ভাবতেন যে, সেই অশুভ ঘটনার ফলেই তাঁকে এত সব বিপদে পড়তে হয়েছে। মেয়েজাতির ধারণা আর কী! তাই তাঁর দুর্গীর উপরে একটু রোষ ছিল।

আপাততঃ দুর্গীর ওরকম দুর্গতি হয়েছিল। এখন ওর ছ'মাস বা সাত-মাস হয়েছিল। প্রথম প্রসবের জন্য তার বাপের বাড়ি আসার কথা ছিল। ওর বাপের বাড়ির অবস্থা আগের মতনই ছিল, শুধু তফাত এই যে তার

বাবার উপার্জন একটু বেড়েছিল।

আমাদের শংকরঠাকুর তার দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলেছিলেন, একথা আগেই বলেছি। বড় মেয়ে বারু ঠাকুরঝির বিয়ে নানাসাহেব দিওটে নামে একজন গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে দিয়েছিলেন, আর ছোট মেয়ে বনু ঠাকুরঝির স্বামীর বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে। তিনি খুব দূরে কোথায় যেন মোটা মাইনের চাকরি করতেন। কিন্তু বাড়িতে বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ ছিল না, তাই তিনি ঠিক করেছিলেন যে স্ত্রীকে কিছুদিন বাপের বাড়িতেই রাখবেন। শংকরঠাকুরের স্বভাব কেমন ছিল তার পরিচয় আগে একবার একটু দিয়েছি, সেটা পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে। সকলে নিশ্চয় জানত যে শংকরঠাকুর তাঁর স্বভাব-মতো তাঁর দুটি মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ বড়লোকের সঙ্গে ঠিক করবেন। তাদের দু' জনের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন অবশ্য আমার বিয়ে হয়নি। তাই সে-বিষয়ে আমি বাস্তবিক কিছুই জানতাম না। যা কিছু জানতাম তা লোকের মুখে শুনে। শংকরঠাকুর কত কৃপণ ছিলেন তা তাঁর দু' মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে দেখতে পাওয়া যেত। বড় মেয়ে যখন দশ বছরের কাছাকাছি হল, তখন থেকে তার কাকা, মানে গোপালঠাকুর, আর আমার দিদিশাশুড়ী তার বিয়ের কথা আরম্ভ করলেন। অনেক চেষ্টা সত্বেও শংকরঠাকুর সেদিকে মন দিলেন না। তাঁর মৎলব এই যে নিজে এক কড়িও খরচ না করে মেয়ের বিয়ে হওয়া চাই। গোপালঠাকুর ভাবলেন যে ভালো পাত্র দেখে, দু' জনে মিলে দরকার মতো হাজার টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। নিজের মেয়ে আর ভায়ের মেয়ে একই কথা।

শংকরঠাকুরের ইচ্ছে ছিল যে, সব খরচ-পত্র যেন ভাই করে, আর নিজের উপর কাণা-কড়ির বোঝাও যেন না পড়ে। কিন্তু স্পষ্ট ভাবে সে-কথা বলতেও পারছিলেন না। নিজের ট্যাঁকটা এঁটে রেখে, কিছু খরচ না করে যতদূর সম্ভব যে-কোনো কাজ হাসিল করা, এটা ছিল তাঁর সব কাজের রহস্য। নিজের মেয়ের বিয়েতেও সেটা করতে তিনি চেষ্টা করলেন। প্রথম থেকেই তিনি, "আমাদের অত সম্বল নেই, ভালো পাত্র কী করে পাওয়া যাবে? কোনো গরীব, না হলে দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র খুঁজে বিয়ে দিলেই হবে।" এই রকম বিড়বিড় আরম্ভ করলেন।

সরলস্বভাব গোপালঠাকুর তাঁর ভায়ের বিড়বিড়ামির অন্তর্নিহিত অর্থ কী করে বুঝবেন? তিনি সাহস দিয়ে বললেন, "তার ব্যবস্থা আমরা করে ফেলব। ভালো পাত্র দেখেই মেয়ের বিয়ে দেব। হাজার-বারোশো টাকা খরচ করতে হবে এই তো বাপু? কোনো আপত্তি নেই। কিছু টাকা আছে, দরকার হলে চার-পাঁচশো টাকা আনা যাবে।" এই বলে তিনি সৎপাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেললেন। বিয়েতে বেশ বারো-তেরোশো টাকা খরচ হল। বেচারা গোপালঠাকুর নিজের অল্প যা সঞ্চিত অর্থ ছিল তা দিয়ে, তার উপরে আবার চার-পাঁচশো টাকা ধার করে আনলেন। বিয়ে হয়ে গেলে পরে শংকরঠাকুর সর্বক্ষণ প্যান্ প্যান্ করতে লাগলেন, "এ ঋণ শোধ হবে কী করে? মিছে দেমাক করে বিয়েতে অত খরচ করা হল। আমাদের দাঁতে মাসও নেই, এদিকে সংসার অচল। পরিবারটা এত বড।" এইরকম প্যান্ প্যান করে শেষে ভাইকে এক পয়সাও সাহায্য করলেন না এবং ঋণ করার জন্য ভাইকে দোষ দিয়ে আরও বিড়বিড় করতে লাগলেন। শেষে গোপালঠাকুর ঋণ শোধ করে ফেললেন।

কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল যে ইত্যবসরে, বোধ করি তাঁর স্ত্রীর উপদেশ শুনে কিংবা হয়তো শংকরঠাকুরের ফন্দি বুঝতে পেরে, গোপালঠাকুর ঠিক করলেন যে, দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের ঝঞ্ঝাট ঘাডে নেবেন না। মানুষ যতই সরল হোক, বাড়িতে কে যদি ওরকম স্পষ্টাপষ্টি চালাকি করে, তবে তা কি বাড়ির লোক বুঝতে পাবে না? আর সে-গৃহস্থটি তো বাড়িতে একটি কডিও দিতেন না, নিজে কক্ষনো কোনো খরচ চালাতেন না, যত টাকা উপার্জন করতেন সব ব্যাঙ্কে জমা কবতেন। কোনো বিশেষ উপলক্ষে ভাই নিশ্চয় খরচ করবে তা তিনি জানতেন। তিনি যখন দেখলেন যে দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের বেলা ভাই চুপ করে আছে, তখন তিনি নিজের কৌশল বদলে ফেললেন। তিনি স্পষ্ট এইরকম নিজের মত প্রকাশ করতে লাগলেন যে মেয়ে বেশ বড় না হওয়া পর্যন্ত তার বিয়ে দেওয়া ভালো নয়, আর তাঁর দৃঢ় সংকল্প এই যে নিজের মেয়ের বারো বছর না হওয়া পর্যন্ত তার বিয়ে দেবেন না। বাড়ির সকলে যখন অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন তিনি তা অগ্রাহ্য করলেন।

যখন বড় ঠাকুরঝির বারো বছর বয়স হল, তখন "প্রথম পক্ষের চেয়ে

১ 'দাঁতে মাসও না থাকা' একটি মারাঠি প্রবাদ। এর অর্থ—সংসারে ভয়ানক অভাব।

দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রই ভালো, সে স্ত্রীকে বেশি আদর করে", এই বলে বাড়ির সকলের বারণ সত্ত্বেও, তাদের কথা অগ্রাহ্য করে ভায়ের কাছ থেকে অল্প কয়েক দিনের জন্য দু-তিনশো টাকা ধার করে, নিজের স্ত্রীকে শুধু সঙ্গে নিয়ে গিয়ে, কোন এক পাড়াগাঁয়ে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে এলেন। বাড়ির সকলের আর তাঁর স্ত্রীর অতিশয় দুঃখ হল। গোপালঠাকুর ভাবতে লাগলেন যে, তিনি নিজে চুপ করে রইলেন তাই মেয়েটির এই ক্ষতি হল। বরের বয়স আগেই লিখেছি। বিয়ের সময় আর তার পরে কিছুদিন বসুঠাকুরঝির স্বামী পুণাতেই ছিলেন। তার পরে যখন তাঁর অন্য কোথায় যেন বদলি হল, তখন তিনি বসুঠাকুরঝিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না, কারণ বললেন যে, বাড়িতে বড় মানুষ কেউ নেই, মেয়ে বড় হওয়া পর্যন্ত বাপের বাড়িতেই থাক। তারপরে মেয়ে বড় হল, তবু সে-গৃহস্থের কোনো চিঠিপত্র নেই। এদের বাড়ি থেকে যখন দশটা চিঠি যেত, তখন তিনি একটার উত্তর দিতেন, "দেখা যাবে, সময় হলে নিয়ে আসব। অত তাড়াতাড়ি কেন?" পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, তিনি বাইরে কোথাও মোহিত হয়েছিলেন আর সেইজন্য তাঁর কিছুই ভালো লাগত না। এ-সংবাদটা যেদিন পাওয়া গেল সেদিন থেকে বসুঠাকুরঝির স্বভাব একেবারে পরিবর্তিত হল। তিনি, ভাবতে লাগলেন যে তাঁর স্বামীর আর তাঁকে প্রয়োজন নেই। তাঁর যখন এই ভাবনা হল, তখন থেকে তাঁর আগেকার দেমাক কম হতে লাগল। বেচারী আড়ালে গিয়ে বসতে লাগলেন। কারো সঙ্গে কথা কইতেন না। তাতে আবার নিজের বড় বোনের অবস্থা ওঁর চেয়ে অনেক ভালো দেখে তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হত।

একবার-দু'বার বসুঠাকুরঝি আর বড়ঠাকুরঝি মিলে ঠিক করল যে আমাকে যাচ্ছেতাই ঠাট্টা করবে। তাই দু'জনে মিলে একদিন রাত্তিরে আমাকে ওঁর ঘরে জোর করে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। উনি ওসব ব্যাপার খুবই ঘেন্না করতেন। তাই দুই বোনকে যখন বেশ ধমক দিয়ে চড় বসিয়ে দিলেন, তার পর থেকে তারা আর কখনো ওরকম ঠাট্টা করবার চেষ্টা করত না।

মোটমাট এই ছিল আমার আর অন্য সকলের অবস্থা। কিছুদিনের মধ্যেই আমার অবস্থার পরিবর্তন হল। সে কী রকম তা এর পরের পরিচ্ছেদে জানাব।

আশা আর নিরাশা

এখন আমি পুণা ছেড়ে যাবার জন্য বড় উতলা হয়েছিলাম। ওঁর পুণার কলেজের শেষ পরীক্ষা কাছে আসছিল কিনা, তাই আজকাল আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হওয়াও মুশকিল হয়েছিল। (সেই যে আমাদের প্রথম দেখার কথা বলেছি, তারপর আমার ভয় একটু কমে গিয়েছিল, আর আমরা কখনো কখনো লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতাম। সে-সব আবার লুকোচুরির ব্যাপার!) তার ওপর আবার উনি বাড়িতে কম আসতে লাগলেন। তাই আর কী করা যায়? একেই বড়ো পরিবারে অনেক ব্যাঘাত তাতে আরও অনেক প্রতিকূল অবস্থা ছিল! বহুঠাকুরঝি সর্বদাই আমাদের বাড়িতে থাকতেন। প্রথমে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, তাছাড়া একদিন শনিবারে আমাকে ওঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করার জন্য, "অমন অনুচিত সাহস আমার ভালো লাগে না বলছি" বলে উনি সত্যি সত্যি বহুঠাকুরঝির গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। একে তো পাগল, তায় ভূতে ধরল", সেই অবস্থা আর কি। তিনি রাগ করে আমাদের সঙ্গে আড়ি করলেন। ওঁকে তো কিছু শাস্তি দিতে পারছিলেন না, তাই আমাকে হিংসার চোখে দেখতে লাগলেন। আমার কোনো দোষ দেখতে পাবার জন্য, আর দেখতে পেলেই লাগিয়ে দিয়ে আমি যেন বকুনি খেয়ে জব্দ হই, সেইজন্য তিনি সব সময় অধীর হয়ে থাকতেন। ওঁর চড় খেয়ে চেঁচামিচি করে তিনি হুলস্থূল ব্যাপার লাগিয়ে দিলেন। আর তখন দিদিশাশুড়ী আমাদের দু'জনকে যা গালিবর্ষণ করতে লাগলেন, তা বলে দরকার নেই। তাতে আবার হল কী, সে ঘটনার পরের রবিবারে আমরা দু'জনে যখন সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, তখন বহুঠাকুরঝি দেখতে পেলেন। বাড়ির সকলে নিচের ঘরে ছিলেন, খাওয়াদাওয়ার গোলমাল চলছিল, আর আমাকে ঝোলাগুড় নিয়ে আসবার জন্য উপরের ঘরে যেতে বলেছিলেন। আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, ঠিক সেই সময় উনি নিচে নেমে আসছিলেন। আমি অমনি পালিয়ে

যেতাম, কিন্তু উনি আমাকে থামিয়ে ধরে কথা বললেন, তখন কী উপায়? "তুমি কিছু পড়ছ না, তা ভালো নয়। তোমার জন্য আজ আমি দুটো সুন্দর বই এনেছি, পড়ে দেখো—" উনি বললেন। আমি বললাম, "এখন দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নয়।" ঠিক সেই সময় সিঁড়ির তলায় এসে বড়ঠাকুরঝি বললেন, "বৌদি, গল্প শেষ হলে ঝোলাগুড় আনবে নাকি?" তাঁর সেই কথা শোনামাত্র আমার যে কি অবস্থা হল তা যে ভগিনীরা আমার অবস্থায় আছে তারাই বুঝতে পারবে। বড়ঠাকুরঝির কথা নিশ্চয় ঘরের ভিতরে সবাই শুনে থাকবে, আর কেউ যদি না শুনেও থাকে তবু তিনি গিয়ে নিশ্চয় শাঁখ বাজাবেন, তা আমি ঠিক জানতাম। তাই আমার মনে হল যে নিচে না যাওয়াই ভালো। নিচে বাড়ির সব পুরুষ মানুষরা খেতে বসেছিলেন। বেশ, অন্ততঃ পুরুষদের সামনে তেমন কথা বলা উচিত নয়, তা ভেবে দেখার তাঁর দরকার কী? আমার বড়ো লজ্জা করতে লাগল, কিন্তু উপায় কী? নিচে যাওয়াই দরকার ছিল, তাই বাধ্য হয়ে নিচে গেলাম। কিন্তু মনটা যা হয়েছিল! যখন নিচে গেলাম তখন বড়ঠাকুরঝির ভটর ভটর চলছিল। শেষে ছোট ঠাকুরের বকুনি খেয়ে তবে তিনি চুপ করলেন। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আবার ভটর ভটর শুরু হল। মা গো মা! তার'পরে তিনি যে রকম ফাজলামি করলেন তা লেখাই অসম্ভব। ফাজলামির একেবারে চূড়ান্ত হল!

এ রকম অবস্থায় ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়া বিষম দায় হল। সেই অল্প একটু সন্তোষের আশা, তাও নষ্ট হল। গোপনে যখন দেখা হত, তখন কি আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলার অবসর পেতাম? পাঁচ-ছ মিনিট, ব্যস্! তবু ওইটুকু সময়েও ওঁর মুখের কটা মিষ্টি, সান্ত্বনাপূর্ণ, সাহসপূর্ণ কথা শুনতে পেলে, অন্ততঃ আট-দশ দিন মন উল্লসিত থাকত। আমরা প্রত্যক্ষ আমাদের মামাশ্বশুরের উপর নির্ভর করে থাকতাম, তাই মনে মনে একটু লজ্জা বোধ হত। তা ছাড়া আমার আরও কষ্ট ছিল, সে-কষ্ট চার-পাঁচ রকমের। এক, বড়ঠাকুরঝির জ্বালা, সে কী রকম তা আগেই বলেছি: মানে কাজকর্মে কোনো ভুল করলে কিংবা সব ভুল আমিই করেছি সেটা ভেবে আমাকে বকাবকি করা। দ্বিতীয় ছিল, ধোণ্ডুঠাকুরপোর জ্বালা— তিনি লাগিয়ে দিয়ে জ্বালাতন করতেন। আর শেষেরটা আজকাল নতুন আরম্ভ হয়েছিল। অতবড় ঘোড়ার মতো বেড়েছে, এখনো ঋতু নেই। আর

সকলের মেয়েদের ছেলেপুলেও হয়েছে। এই কথা দিনের মধ্যে বার বার শুনে শুনে অসহ্য কষ্ট হত। তা ছাড়া কোনো চেনাশোনা স্ত্রীলোক বাড়িতে এলে, তাঁর কাছে আমার ঋতু-দর্শন হয়নি বলে অভিযোগ করা হত। এ-সব জ্বালায় আমি অতিশয় বিরক্ত হয়েছিলাম বলে বোম্বাই যাবার জন্য আমি উতলা হয়েছিলাম। কেননা, বোম্বাই গেলে এ-সব জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার আশা ছিল।

এ সব আশার খেলা। আমার মনে যদি কোনো আশাই না থাকত, তাহলে ভাবী সুখের স্বপ্নও আমি দেখতাম না। আর সেই আশাই আমাকে বর্তমান দুঃখ ভুলে থাকতে সাহায্য করত। হে আশা, জগতকে তুমি অসীম ঋণী করে রেখেছ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে যা খুশি বলুক।

বেচারী দুর্গীর আর আমার কত ভিন্ন অবস্থা! কখনো না কখনো নিজের দুঃখ দূর হবে, আর আমরা স্বামী-স্ত্রী সুখে সংসার করতে পারব এমন আশা কি সে-বেচারী করতে পারে? তেমন আশা ছিল না, তাই তার জীবন অত অসহ্য হয়েছিল। একবার দুর্গী আমাকে স্পষ্টই বলল, "আঁতুড় ঘরেই যদি আমি মরি তবে বড় ভালো হয় ভাই, তাহলে আমি নিজে মুক্তি পাব, আর বাবা, মা, ঠাকুমার প্রাণের জ্বালা জুড়োবে, তাদের দুশ্চিন্তার বিষয় শেষ হয়ে যাবে।" বেচারীর ভাবী সুখের আশা তো ছিলই না, কিন্তু কাল কি করবে, এই ভাবনা তার ছিল। সম্প্রতি তার স্বামী তো নিষ্কর্মা ছিলই, কিন্তু শুধু তাই নয়, দু'বেলা খাবার সময় এসে 'ডাল নেই, তরকারি নেই', ইত্যাদি বলে, হাত-পা ছুঁড়ে, চেঁচামিচি করে, নানা রকমের বকাবকি শুরু করত। সন্ধ্যাবেলা তার মা দেবতার মন্দিরে যেতেন, তখন বৌ-এর কাছে এসে, "এটা দাও, সেটা দাও, পেঁয়াজি করে দাও, বেগুনি করে দাও, আলু ভাজা চাই, নাহলে বাড়িতে আমলকীর মোরব্বা আছে, তাই দাও," এইভাবে তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করত। আর সে দিতে না চাইলে তাকে গালাগালি করত, কখনো কখনো মারধোর পর্যন্ত করত। একদিন দুর্গীকে সে বলল, "আমার পাঁচ টাকা ঋণ হয়েছে, শোধ করতে হবে। তুমি যা হয় একটা কিছু করে তোমার বাপের বাড়ি থেকে দু-চারটে টাকা নিয়ে এসো।" কিন্তু সে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনবে কী করে? সেখানে গিয়ে কী বলবে? কীসের জন্য টাকা চাইবে? টাকা আনতে বলার পর দু'দিন হওয়ামাত্র আবার তাকে ধরে সে বলল, "টাকা এনেছ?"

আর দুর্গা যখন বলল, "না, আনিনি," তখন সে নিষ্ঠুর হতভাগা ঠাস্ করে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে, "পরশু দিন টাকা আনলে ভালো, না হলে দেখাচ্ছি" এই ধমক দিয়ে হন হন করে চলে গেল। কী বিষম আপদ! বেচারি দুর্গা করে কী? পরের দিন বাড়ি গিয়ে, মাকে সব কথা বলে অবিরল কাঁদতে লাগল। তার মা-ই বা কী করবেন? একবার পাঁচ টাকা দেওয়া তত কঠিন নয়, কিন্তু একবার দিলে তার সেই অভ্যেস হয়ে যাবে, আর সে যখন-তখন টাকা চাইবে। প্রত্যেকবার তিনিই বা কোথা থেকে টাকা আনবেন? তাঁরাও তো গরীবই ছিলেন। কিন্তু পেটের মেয়ে যে! তার জন্য যত কষ্টই হোক্, সহ্য না করে উপায় কী? চুপ করে তার হাতে পাঁচ টাকা তুলে দিয়ে দুর্গার মা তাকে পাঠিয়ে দিলেন।

তিনি সত্যি বড় বুদ্ধিমতা আর চতুরা ছিলেন। এই একবারের ঝঞ্ঝাট নিত্য পিছনে লাগবে জেনে তিনি উপায় ঠিক করলেন। তার পরের দিন দুর্গার শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বললেন, "পরশুদিনটা বেশ ভালো, সেদিন আমরা দুর্গাকে নিয়ে যাব। প্রথমবার তাই—তাছাড়া, পরে অগ্রহায়ণ মাসে দিন ভালো নেই, 'অস্ত' না কী যেন আছে। আর ওর ছ'মাস শেষ হয়েও এসেছে।" এইরকম নানা অজুহাত দেখিয়ে তিনি ঠিক দিনে দুর্গাকে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন। তার মনের সংকল্প এই ছিল যে, আর সাত-আট মাস পর্য্যন্ত মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবেন না। তার স্বামী যা খুশি করুক।

আমাদের দু'জনের অবস্থার কত তফাত। দুর্গার চেয়ে আমি কত সুখী ছিলাম। দুর্গার শাশুড়ী ওকে একেবারে কষ্ট দিতেন না বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাকে দিদিশাশুড়ী আর ঠাকুরঝি জ্বালাতন করতেন। কিন্তু সে-কষ্ট আমি ততটা মাখতাম না। কেন না, আমি ঠিক জানতাম যে যিনি আমাকে সুখে রাখবেন, সে প্রধান ব্যক্তিকে ভাগ্যে আমি হাতে পেয়েছি আর আশা ছিল যে অল্পদিনেই আমি সুখের কোলে গড়াগড়ি যাব। সুখের হরির-লুট হয়ে যাবে। ভাবী সুখের কল্পনায় আমি নিমগ্ন হয়েছিলাম। কিন্তু বোম্বাই যাওয়া মানে কী? আর সেখানে যাব কী করে? কিংবা সেখানে যাওয়ামাত্র সুখ হাতে পাব, সে কী রকম, এসব আমি কিছুই ভেবে দেখিনি। 'বোম্বাই হচ্ছে একটা মস্ত বড় শহর, তা পুণার দ্বিগুণ হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবামাত্র উনি সেখানে চাকরি পাবেন, মানে

মোটা মাইনে পাবেন। কিছুরই অনটন হবে না। এইজন্য, আর বোম্বাই থেকে যারা আসত তাদের মুখে সেখানকার সুখ সজ্জার কথা শুনে, বোম্বাই সম্বন্ধে আমি মনে মনে যে-কল্পনা করেছিলাম, তা তো আমার মনে ছিল। কিন্তু সুখের প্রধান কারণ আমি যা মনে করতাম সেটা এই যে বোম্বাইয়ে আমাকে জ্বালাতন করতে দিদিশাশুড়ী বয়ঠাকুরঝি কেউ আসবে না। সেখানে আমি নিজেই প্রধান! আমার শাশুড়ী আসবেন, কিন্তু তিনি আমাকে নিশ্চয় কোনো কষ্ট দেবেন না। আর উনি যে আমাকে কত সুখে রাখবেন তার ঠিক কী? আমার এইসব সুখের কল্পনা কতদূর সত্য হল, আর আমি কতদিন সুখে থাকতে পেলাম, তা পাঠকরা অবশ্য জানতে পারবেন।

মাঈসাহেবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে আমি আমার স্বাধীনতার আর সুখের কল্পনা ঠিক করেছিলাম। তিনি যে-সুখ অনুভব করেছেন, সেইটাই হচ্ছে সংসারের সুখ! সে-সুখ যারা পেয়েছে তাদের মতো সুখী কেউ থাকতে পারে না। আমি সব সময় বলতাম যে মাঈসাহেবের মতো পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর মা-র মতো লক্ষ্মী মেয়ে একত্র হলে সে নিজের ঘরে স্বর্গ গড়ে তুলবে। সত্যি, আমাদের মা যখন ছিলেন, তখন বাবা যদি তাঁর সঙ্গে অমন মনখোলা ব্যবহার করতেন, তা হলে দুঃখের বাতাস তাঁকে ছুঁতেও পারত না। আমি সব সময় ভাবতাম যে আমি যদি সে রকম অনুকূল অবস্থা লাভ করি, তাহলে মা-র মতো আচরণ করে সব্বাইকে সুখে রাখব। কাউকে কক্ষনো দুঃখ দেবো না। শুধু তাই নয়, সকলের মুখে 'বাহবা' পাবার উপযুক্ত হব। ওঁকে এমন সন্তুষ্ট রাখব যে উনি আমাকে ছেড়ে কিছু করবেন না। ওঁর ওপরে এমন প্রভাব বিস্তার করব যে, ছোট খাট কাজ পর্যন্ত উনি আমাকে না বলে' করবেন না। লেখাপড়ার ওপরে ওঁর বড় শখ। সে-বিষয়ে ওঁকে সন্তুষ্ট করা সম্প্রতি একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বোম্বাই গেলে পরে নিশ্চয় ওঁর মনের মতো পড়াশোনা করে ওঁকে খুশি করব।

এই রকম ছবি আমি রোজ মনে মনে আঁকতাম। আমার এ-সব কল্পনা আর প্লট শুনতেই যা লোকের অভাব! দুর্গীই আমার একমাত্র বন্ধু, তার সঙ্গেই আমার সব মনের কথা হত। সে আমাকে, আর আমি তাকে নিজের মনের কথা বলতাম। কিন্তু তার কথা কখনো আনন্দের থাকত না, তাই

আমি তাকে আমার দুঃখগুলিই শুধু বলতাম। আমার সুখের কথা তাকে বললে, তার আনন্দ না হয়ে দুঃখই হওয়া সম্ভব, এই মনে করে সুখের কথা বলতাম না। আমাদের দু-জনের সমান বয়স, আর আমার অবস্থা ভালো। আর সে যদি জানতে পারে যে পরে আমি রাশি রাশি সুখ লাভ করব, তবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে মনে মনে আমাদের দু-জনের অবস্থার তুলনা করে দেখবে। কেন না, দুই সমবয়সী বন্ধুর একজনের অবস্থা যদি ভালো হয়, মানে সে যদি সুখের অসীম আশা করতে পারে, আর অন্য জনের দুঃখের, নিরাশার সীমা না থাকে, তা হলে সে রকম ভিন্ন অবস্থা দেখে মনে মনে তুলনা না করে থাকা অসম্ভব। সে রকম তুলনা করে সে যেন দুঃখ না পায়, তাই আমি আমার ভাবী সুখের কথা তাকে বলতাম না। এতে আমার কোনো স্বার্থবুদ্ধি ছিল না। আমি সে-কথা একবার অনুভব পর্যন্ত করিনি।

আমি একবার দুর্গাকে আমার বোম্বাই যাবার কথা, সেখানকার সুখময় কল্পনা তাকে বর্ণনা করে বলেছিলাম। ওঁর বিদ্যাবুদ্ধির বর্ণনা করে আমি বললাম যে উনি মোটা মাইনে পাবেন। মোট কথা, আমার কষ্ট আর বেশি দিন নেই। আমার কথা শুনে দুর্গার চোখে জল এল। সে আমাকে বলল, "বেশ, যমু, অন্ততঃ তুই সুখে থাকিস ভাই। আমার ভাই সবই তো হয়েছে! আমার কপালে এ-জীবনে আর সুখ নেই! গা ঢাকবার মতো কাপড়, আর পেট ভরবার মতো মোটা চালের ভাত পর্যন্ত কপাল দোষে জোটা মুস্কিল হয়েছে।"

আমার সেই একনিষ্ঠ বন্ধুর মুখে ওরকম নিরাশাময় উক্তি শোনামাত্র আমার মনের কী অবস্থা হল, তা কি আমি বলতে পারি? আমার বুক কেঁপে উঠল, আমি তাকে বুকে শক্ত করে ধরে বললাম, "নিরাশ হোস নে ভাই। ভগবান তোকেও ভালো দিন দেবেন।" আমার সে-কথা শুনে সে ফিক করে হঠাৎ হাসল। সে-হাসি এত করুণ মনে হল যে তা বলতে পারি না। সে নিশ্চয় ভয়ানক কিছু একটা ভেবে হেসেছিল। কেন না, সে তাড়াতাড়ি বলল, "সত্যি যমু, ভগবানই যেন আমাকে দয়া করে ভালো দিন দেন। আর কারু সাধ্য নেই তাতে! নিশ্চয় ভগবানই আমাকে দয়া করবেন—না ভাই?" দুর্গার মুখের ঐ কথা পড়লে তেমন কিছু মনে হয় না, কিন্তু আমি নিজে সে-কথা শুনেছি, তাই তার হাবভাব দেখে স্পষ্ট বুঝতে

পারলাম যে বাইরে তার সে-কথার অর্থ দেখতে পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি আর গূঢ় অর্থ তার হতে পারে! আমি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সে খুলে স্পষ্ট কিছু বলল না।

সেদিন থেকে আমি তাকে আমার ভাবী সুখের কথা বলা ছেড়েছিলাম।

উপরে লিখেছি সে রকম কল্পনা-রচিত মনোরাজ্যে আমি সুখে ছিলাম। এই রকমে দিনগুলো কোনোরকমে কেটে গেল। আর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস এল, উনি পরীক্ষা দেবার জন্য বোম্বাই[১] গেলেন। সেই সময় যে-ঘটনার বিলম্বের জন্য আমি দায়ী না-হলেও, অকারণে আমাকে সকলের বকুনি খেতে হত, সেই ঘটনা হল। সেটাতে এতদিন বিলম্ব হয়ে ভালো হয়েছিল। তবু, তখন বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা খুশি হলেন, আর আমারও আনন্দ হল। দিদিশাশুড়ী মেয়ের দিক দিয়ে বোবা 'প্রপৌত্র'[২] হল বলে মিষ্টি (পেঁড়া) বিতরণ করলেন।

১ তখন পুণার কলেজে পড়লেও, পরীক্ষা দিতে ছাত্রদের বোম্বাই যেতে হত। তখন শুধু বোম্বাইয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল।

২ সেকালে মেয়েদের ঋতু হলে চলতি কথায় মারাঠিতে "বোবা খোকা হয়েছে" বলা প্রথা ছিল।

আমার পরীক্ষা

এর পরের ঘটনাটি আমি নিজের হাতে ভালো করে বিস্তৃতভাবে লিখতে পারব না। আর যদিও আমার লিখতে ইচ্ছে করে, তবু তা লেখা উচিত হবে না। তাই শুধু এই কথা বললে যথেষ্ট হবে যে, রীতিনীতি অনুসারে সব আচার-অনুষ্ঠান করা হল। উনি পরীক্ষা দিতে বোম্বাই গিয়েছিলেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ামাত্র বাড়ি ফিরে এলেন। পরীক্ষায় মনের মতো ভালো পাশ হবার আশা ছিল না। অন্ততঃ গোপালঠাকুর যখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন উনি বললেন, "পাশ নিশ্চয় করব, কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার আশা নেই, ইংরেজী কাগজটা একটু শক্ত ছিল।" এ-কথা যখন আমি দরজার আড়াল থেকে শুনলাম, তখন আমার বুক কাঁপতে লাগল। কেন না, আমি ঠিক মনে করেছিলাম যে পরীক্ষা পাশ করামাত্র উনি চাকরি পাবেন, আর আমি বোম্বাই যেতে পারব। চাকরি মানে কী আর সেটা পেতে হলে আজকাল কত কষ্ট করতে হয় তার কিছুমাত্র ধারণা আমার ছিল না। পরীক্ষায় ভালো ভাবে পাশ করবেন না শুনে আমার মনে হল যে, এবার ওঁর চাকরি পাওয়া দূরের কথা, বোম্বাই যাওয়াও দূরের কথা—মানে আমার স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া। এই রকম ভেবে ভেবে আমার দুঃখ হল। মানুষ কত স্বার্থপর এটা তার একটা নমুনা। আমি সব ব্যাপারেই উতলা, আমি কি চুপ করে থাকতে পারি? লজ্জা আর নম্রতা ত্যাগ করে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে না, তবে কোথায় বোম্বাই আর কোথায়ই বা চাকরি?"

কিন্তু এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করবার আগে, আমার প্রাণ কেমন আকুল আর অস্থির হয়েছিল তা আমিই জানি! ওঁর সঙ্গে অনেকদিন আলাপ হবার আগে ভাবতাম যে, ওঁর সঙ্গে কতো কথাই না বলব। এটা জিজ্ঞাসা করব, সেটা জিজ্ঞাসা করব, অনেক কথা বলব। কিন্তু ঠিক সময়ে সব যেন কোথায় গুলিয়ে গেল! চেষ্টা করেও কিছু গুছিয়ে বলা মুশকিল হল।

দেখা হলেই আমার মুখ বন্ধ হত। উনি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর দেওয়া পর্য্যন্ত মুশকিল হত। আমতা-আমতা করতে আরম্ভ করতাম। আমি নিজেকে বড় নির্ভীক মনে করতাম, আর কথাবার্তায় খানিকটা সে-রকম ছিলামও। তাই আমার একটু সাহস হল। তা ছাড়া, দু-চার বার, "তুমি অত ভয় কর কেন? আমি কি তোমাকে খেয়ে ফেলব? পাগলি কোথাকার? বেশ অবাধে কথা বলাই ভালো, জানো?" এই বলে উনি আমাকে সাহস দিয়েছিলেন। তাই প্রভুর আদুরে বেড়ালটির মতো আমিও বেশ সাহসী হয়েছিলাম। তার মানে এই যে, প্রশ্নের উত্তর বেশ স্পষ্ট ভাবে দিতে আরম্ভ করেছিলাম। ক্রমশ তো আমার সাহসের পরাকাষ্ঠা হল। কোনো কোনো বিষয়ে আমি নিজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম।

উপরের প্রশ্নটা যেদিন জিজ্ঞাসা করলাম, সেদিন উনি হেসে বললেন, "বাঃ! ঈশপনীতির[১] সেই ভীতু শেয়ালের অবস্থা আর কী!" এই কথা শুনে আমারও খুব হাসি পেল। কেননা, সর্ব্বসম্মতভাবে আচার-অনুষ্ঠানপূর্বক আমাদের পরিচয় হবার তৃতীয় বা চতুর্থ রাত্রে, আমি কী রকম পড়তে পারি তার পরীক্ষা করছিলেন। সেদিন পর্যন্ত উনি শুধু শুনেছিলেন যে আমি পড়তে পারি। কিন্তু প্রত্যক্ষ আমার পড়া শোনার কোনো সুযোগ আসেনি। তাই উনি ধরে বসলেন যে আমাকে পড়ে শোনাতেই হবে। "বেশ, এতদিন অমনি কেটে গেছে তা যাক্, এখন তুমি কী কী লিখতে-পড়তে পার তা আমাকে দেখাও। তাই দেখে দরকার-মতো সে-রকম শিক্ষা দেওয়া সহজ হবে। এখন কিন্তু আর ও-রকম চালাকি খাটবে না। বেশ মন দিয়ে পড়াশুনো করতে হবে। বোম্বাই গেলে পর সব সুস্থির হলে আমি তোমার জন্য একজন শিক্ষিকা নিযুক্ত করব।—আনো তো দেখি, তোমার কাছে কী বই আছে!" এই বলে একেবারে নাছোড়-বান্দার মতো জেদ ধরে বসলেন। আমার অবশ্য মোটেই পড়তে ইচ্ছা করছিল না। একে তো পড়তে লজ্জা করছিল, আর দ্বিতীয়ত, উনি যদি জানতে পারেন যে আমি মোটেই পড়তে পারিনা, তবে সেটা আবার লজ্জাকর হবে, এই ভয় ছিল। প্রথমে আমি বারবার বললাম যে আমি পড়তে পারিনে, আর আমার কাছে বই নেইই। "আমি তোমার দাদার

১ ঈশপ, গ্রীক হিতোপদেশমূলক গল্পের রচয়িতা। এ-সব গল্পে জন্তুজানোয়ারকে নায়ক করে চিত্রিত করা হয়েছে

কাছে যে-বইগুলো দিয়েছিলাম, সেগুলো কোথায়?" উনি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন বলেছিলাম, "ও বাড়িতে (বাপের বাড়ি)।" কিন্তু উনি কি হার মানবার লোক! বেশ, ধোণ্ডুর বই আছে ওই আলমারিতে (আমরা যে ঘরে শুতাম সেই ঘরে ধোণ্ডু ঠাকুরপোর আলমারি ছিল)। ও থেকে একখানা নিয়ে এসো।" "আমি সত্যি পড়তে পারিনা" ইত্যাদি বলে একেবারে নড়লাম না। তখন উনি নিজে গিয়ে আলমারি থেকে একখানা বই নিয়ে এলেন, আর বইখানা আমার সামনে রেখে বললেন, "হ্যাঁ, পড়ো দেখি; দয়া হোক একটিবার। দুটি কথা কানে শুনে ধন্য হই।" এই বলে হাসতে হাসতে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। আর উনি যখন আরও অনুরোধ করতে লাগলেন, তখন আমি আরও লজ্জা বোধ করতে লাগলাম। "আমি সত্যি পড়তে পারি না" এই ধুয়োটা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। শেষে বাতিটা আমার সামনে সরিয়ে, আমার চিবুক ধরে মুখ তুলে, আমার হাতে বই দিয়ে বললেন, "পাথরের কাছে যদি এতো অনুনয় করতাম, তবে তারও কথা ফুটতো! পড়গো, একটি বার পড়ে শোনাও, ও অমৃতবাণী একবার শুনতে দাও।" তখন আর কী বলব? শেষে বললাম, "সত্যি আমি ভালো করে পড়তে পারিনা, যেমন-তেমন পড়লে শুধু ভাববে—"

এই কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুতে না বেরুতেই উনি তাড়াতাড়ি বললেন, "থাক্ থাক্, যেমন পারো তেমন পড়ো। কিচ্ছু বলব না, কিচ্ছু ভাবব না।" তখন আমি ভয়ে ভয়ে পড়তে লাগলাম। পরীক্ষা কাকে বলে সেটা আমি সেদিন জানতে পারলাম। আমার গা, ঠোঁট থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল, মনে হল যে হাত থেকে বইখানা বুঝি পড়ে যায়! আমার সেই আগেকার সাহস গেল কোথায় কী জানি? শেষে যখন আমি একটা গল্প পড়ে শোনালাম, অমনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে, আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "বাঃ, কী সুন্দর! তুমি এত পণ্ডিত, এত ভালো পড়তে পারো তা আমি জানতাম না।" সে-কথা শুনে আমার একটু সাহস হল, আর আবার যখন উনি পড়তে বললেন, তখন আরও দু-তিনটা গল্প পড়ে শোনালাম। সেদিন সেই যে সিংহ আর শেয়ালের গল্পটা বলেছিলেন সেটা উনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন। সেই ভীতু শেয়ালের সঙ্গে আমার তুলনা করা হয়েছে দেখে আমার হাসি পেল।

সত্যি, সেই শেয়ালের মতোই আমার অবস্থা হয়েছিল। প্রথমে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখতেও ভরসা হত না, কথা বলা দূরের কথা—আর আমি এখন উপরের প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করলাম, কাজেই আমার আর সেই ভীতু শেয়ালের আচরণে তফাৎ কী? সেদিন থেকে রোজ রাত্রে আমাকে বই পড়ে শোনাতে বলতেন, আর আমি দশ-পনরোটা গল্প পড়ে শোনাতান। এমনি করে সমস্ত ঈশপনীতি শেষ হল। আমি সত্যি অত ভালো পড়তে পারি, আর অন্ততঃ সে গল্পগুলোর অর্থও স্পষ্ট করে বলতে পারলাম দেখে উনি বড় খুশি হলেন, পাঁচ-সাতটা কঠিন গল্পের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করলেন। আর হেসে বললেন যে সে-পরীক্ষাতেও নাকি আমি একেবারে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। তখন আমি মুখে বললাম বটে, "একটা ছোলাগাছ পুঁতে দাওনা বাপু, আমি সিঁড়ি বেয়ে চড়ি",[১] কিন্তু মনে মনে বড় খুশি হলাম আর আমার একরকম অভিমান হল। তখন ওঁর হাতে ক'দিন সময় ছিল, তাই নিজে আমাকে শিক্ষা দিলেন; মাস-দেড়েকের মধ্যে আমি দু-তিনখানা বই পড়ে শেষ করলাম। একখানা ঈশপনীতি, একখানা স্ত্রীধর্মনীতি—কিন্তু এ কী? আমি বইগুলোর নাম কেন লিখছি? আমার শিক্ষা আরম্ভ হল ওই বললেই

আমি অধীর ভাবে বোম্বাই যাবার কথা যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তখন হেসে ভীতু শেয়ালের গল্পের উদাহরণ দিয়ে আমাকে ঠাট্টা করে বললেন, "এখন বাপু তোমার বোম্বাই রইল দূরে, এখন আমি একলা যাব, তার পরে কিছু টাকা-কড়ি উপার্জন করে, এল. এল. বি.[২] পড়ব। দু-তিন বছর পরে পরীক্ষা; তার পরে সংসার। মাঝে মাঝে ছুটির সময় আসব, তখন যা দু'জনে দেখা হবে, তাই। এই পরীক্ষাটা যদি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করতাম, তবে বোম্বাই যাওয়া ঘটত। এখন তোমার কপালদোষে বাপু এখানেই থাকতে হচ্ছে।"

এই নিরাশাময় কথা শুনে প্রথমে আমার যা অবস্থা হল তা আমিই জানি! আমার সব মনোরথগুলি বালির বাঁধের মতো হঠাৎ ভেঙে গেল।

১ ছোলা গাছে চড়া বা পোঁতা—একটি মারাঠি প্রবাদ, এর অর্থ কাউকে স্তুতি করে খুশি করা। যেন সেই স্তুতি শুনে তার বুক ফুলে যায়।

২ এল্. এল্. বি. আইনের পরীক্ষা।

আরও দু-তিন বছর আমাকে এইখানে, এই অবস্থায় কাটাতে হবে, তারপর কী হবে, কে দেখেছে? এই ভেবে আমার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কী জানি হয়তো আমার চোখ আরও কিছু ব্যক্ত করেছিল, কেন না, উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখেই, আমাকে আদর করে অমনি বললেন, "ওরে বাপরে? আমার কথা কি সত্যি ভাবলে? সত্যি মনে করলে যে পরীক্ষা পাশ করে, বোম্বাই গিয়ে অল্প কিছু উপার্জন করতে পারলেও আমি তোমাকে এখানে রাখব? পাগলি কোথাকার! একেবারে পাগল। এসো, কাছে এসো, চোখ মুছে দিই।" ওঁর মুখ দিয়ে এ-কথা বেরোবামাত্র আমার চোখের জল উপচে এসে গালের উপর গড়িয়ে পড়তে লাগল। আর আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এল। অমনি উনি আবার বললেন, "আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমি তোমাকে আর আমার কাছ থেকে দূরে রাখব না কখনো, বুঝলে? বড় চাকরি পাই কিংবা না পাই, যা পাব, তাতেই সংসার চালাব। মাকে আর কতদিন কষ্ট দেওয়া চলে? আর অন্যের উপর নির্ভর করেই বা কতদিন থাকবো? আমার সত্যি ইচ্ছে যে, বড়মামীকেও সঙ্গে নিয়ে গেলে বেশ হয়। বেচারী কী করবেন? ওঁর দিকে চেয়ে দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েরা এরকম, শংকরমামা ওরকম! মোটের উপর বেচারীর কপালে সুখ নেই, না! এমন স্বামী আমি কোথাও দেখিনি। আর উনি পেয়েছেন অমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী!"

"হ্যাঁ, সত্যি! ওঁকে দিন কতক সঙ্গে নিয়ে গেলেই বেশ হবে। বেচারী বাপের বাড়ি কিংবা আর কোথাও কক্ষনো যেতে পান না। সব যেন কী রকম আলাদাই। সত্যি, আমার একটা কথা মনে পড়েছে।—সেই যে ওঁর ভাই ওঁকে পনরোটা টাকা পাঠিয়েছিলেন, আর তাই নিয়ে কী ব্যাপার হয়েছিল, মনে আছে? শংকরঠাকুর বললেন, 'মা, কার বাপের বাড়ির কোথাকার কী টাকা নিজের কাছে রেখেছ?'—আর তার পরে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-কথা শুনেছি বটে। মা বলছিল সেটা সব শংকর-মামারই ষড়যন্ত্র। আমার মনে হচ্ছে যে মামীমা মাকে সব কিছু বলেছেন।"

উনি যেই এ-কথা বললেন, অমনি আমার এক রকম অহংকার জন্মাল। যখন কোনো একটা বিশেষ কথা আমরা জানি আর সে-কথা অন্য কাউকে

বলা কিংবা না-বলা আমাদের ইচ্ছাধীন থাকে, তখন যেরকম অহংকার হয়, ঠিক সেই রকম অহংকার আমার হল। আর আমি হেসে বললাম, "সত্যি ব্যাপার কী তা আমি সব জানি, কিন্তু কী করব? কাকে বলব? সে-দিন থেকে আজ এই প্রথম বার আমি সে-বিষয়ে মুখ ফুটে কথা বলছি। বলবার মতো ছিল কে?" এই রকমের প্রাথমিক ভূমিকা করে আমি ভাঁড়ার ঘরে কেন গিয়েছিলাম সেই থেকে আরম্ভ করে, একেবারে সব পুরাণপাঠ করে, শেষে বিস্তৃত টীকাও জুড়ে দিলাম। পড়বার সময় আমাদের জিহ্বা যদিও পড়তে চায় না, তখন যদিও 'না, না' করে একেবারে লজ্জাবনত হই, তবু বাড়ির লাগানির কথা, গোলমাল, গণ্ডগোল,—সগুণ বাঈ-এর খোঁপার কাঁটা বড়, বারুবাঈ-এর সিঁথি চওড়া হয়েছে তাই সেটা ঢাকবার জন্য তিনি সিঁথিতে কাজল দেন, গোপিকাবাঈকে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে ফলশোভনের সময় কী কী দিয়েছিল, কর্কশাবাঈ নিজে সেজেগুজে বেড়ান, আর বৌদের নাকে নথ[১] পরতে না দিয়ে, খালি নাকে, আর গা ঢাকতে ভালো কাপড়[১] না-দিয়েই বাইরে পাঠান। অমুক বৌ চুপি চুপি লুকিয়ে পেঁয়াজী বানিয়ে খায়। তমুকের শাশুড়ী নিজে চুরি করে খায়, আর বউদের অপরাধী করে।—এই সব গোলমালের পাঁচালী বলতে আমরা ভারি নিপুণ! সে-সব কথা কইতে কারো অনুরোধ-উপরোধের দরকার হয় না। একবার 'প্রথমপাঠ' আরম্ভ হলে অবাধে কথা শুরু হয়। তখন কী বলছি আর কার সামনে বলছি, সে-হুঁশ পর্যন্ত আমাদের থাকে না। আমাদের এ-সব গল্প ভালো লাগে, তাই বলে কী পুরুষদেরও ভালো লাগবে? কিন্তু তার হুঁশই বা থাকে কোথায়? অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারি না আর কথা বলবার বড় শখ তাই আমাদের ঘরের কথা নিয়েই আমরা গল্পগুজব করি। অন্যজনে সে-গল্প পছন্দ করে কিনা সেটা ভেবে দেখবার দরকার হয় না।

প্রথম প্রথম আমি ভাবতাম যে ওঁর ওরকম কথা পছন্দ হতেই হবে। কথা বলতে গেলে তাতে মেয়েদের দোষই বা কী? নানা বিষয়ে কথাবার্তা আর আমি ঘরের, বাপের বাড়ির ওই রকম সব কথা বলতাম। আর সত্যি

১ সেকালের মহারাষ্ট্রীয় সীমন্তিনীরা নাকে নথ পরে আর ভালো কাপড়ে গা ঢেকে বাইরে যেতেন। শাল যেভাবে গায়ে জড়ায়, সেই ভাবে জরী-পাড় রেশমী কাপড় বিশেষ গায়ে জড়িয়ে তাঁরা বাইরে যেতেন।

বলতে হলে, নানাবিধ ঘটনা দেখা দরকার, শোনা দরকার, পড়া দরকার, তা ছাড়া অমনি কি অনেক রকমের কথা বলতে পারা যায়? কাগজ মানে ঠোঙা-বানাবার কাগজ না হলে অন্য কোনো কাজের কাগজ—এই যখন আমাদের বুদ্ধি, তখন সে-কাগজে কী লেখা আছে, সম্প্রতি কিসের চর্চা চলছে, তা আমরা বুঝব কী করে? মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে লোকেদের কী মত তা আমরা জানব কী করে? আমাদের ভালোমন্দর বিষয়ে এ-রকম যা চর্চা চলে তা পর্যন্ত যখন আমরা জানতে পারি না. তখন আইন-কানুন ইত্যাদির আমরা কী বুঝব? আর যখন এ-সব বিষয় কানে শুনতেও পাওয়া যায় না, তখন নিজে কিংবা অন্য কেউ কিছু বললে সে-সব বিষয়ে চর্চা করব কী করে? যতদিন আমরা ভালো করে পড়তে পারব না, খবরের কাগজ পড়ার মতো বিদ্যে আমাদের হবে না, ততদিন বাধ্য হয়ে আমাদের, এ এই করেছে, ও ওই অমন করে, এরকম প্যান্‌প্যানানি পুরুষদের শুনতে হবেই। শুধু অভিযোগ করে কিছু হবে না। যাক্‌। এ-বিষয়ে আবার লেখা দরকার হবে, তাই আপাততঃ এইখানে বিরাম দিই।

বোম্বাই যাওয়া সম্বন্ধে কথা হবার দু-তিন দিন পরে বাপের বাড়ি গেলাম। তখন দাদাতে আমাতে কথাবার্তা হল, "কেমন মুমবাঈ, পরীক্ষার কী হল? প্রথম শ্রেণী বুঝি?"—দাদা জিজ্ঞাসা করল। তখন আমার ভারি লজ্জা করল, আর উনি বোধহয় আমার পড়ার কথা দাদাকে বলেছেন ভেবে আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণী। অমনি ঠাট্টা করলেই হল! চার লাইন পড়ে শুনিয়েছি, আর তাকে বলে পরীক্ষা! আবার প্রথম শ্রেণী! বৌদির পরীক্ষা করে দেখেছ? প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছে?"

আমার এ-কথা শুনে দাদা হো হো করে হেসে উঠল। "সে কী? তুমি তোমার স্বামীকে পড়ে শোনালে তাতে আমার কী? আমি সে-বিষয়ে তোমাকে কী বললাম? আমি বাপু তোমার স্বামীর পরীক্ষার কথা বলেছি। আচ্ছা বেশ, একটা নতুন কথা জানতে পেলাম। সার কথা, বোম্বাইতে নিজে পরীক্ষা দিয়ে এসে, বাড়িতে তোমায় পরীক্ষা করা হয়েছে দেখছি।"

দাদার এ-কথা শুনে আমার এত লজ্জা করল যে তা বলা যায় না।

'চোরের মনে চাঁদনি রাত',[১] সেই রকম আমার অবস্থা হয়েছিল। তার সেই ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন আর 'প্রথম শ্রেণী বুঝি?' এই শব্দ দু'টো মিলে আমাকে ভুলিয়েছিল। একেই সে আমার দাদা, তায় এই নতুন মজা হাতে পেল। সে আরও বেশি ঠাট্টা করতে লাগল। কিন্তু শেষে যখন আবার ওঁর পরীক্ষার বিষয়ে কথা আরম্ভ হল, আর আমি বললাম যে উনি বলছিলেন যে সর্বপ্রথম হওয়া অসম্ভব, তখন দাদা হাসতে হাসতে বলল, "মশাই বড় দুষ্টু। ওঁর ওই অভ্যাস। কলেজে সবাই বলছে যে উনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবেন আর উনি তোমাকে ওরকম বললেন? ওটা ওঁর চালাকি।" তাই শুনে আমি একটু রাগের ভাণ করে বললাম, "সে কী ভাই? ও কী কথা? আমি ওঁকে বলব যে দাদা বলছিল—"

দাদা আবার হেসে বলল, "আচ্ছা যাও, বলোগে যাও। আমি ওঁর মুখের উপরেও স্পষ্ট বলতে পারি। যমু, সত্যি বলছি, ওঁর অমন কাঁদা অভ্যাস। ওঁর ক্লাশের বন্ধুরা আমাকে বলেছে। প্রত্যেক পরীক্ষার সময় উনি ঐ রকম করেন।—আর ওঁর নম্বর পয়লা হয়। ঢের মার্ক পান উনি। কিন্তু পরীক্ষার ফল বেরুবার আগে পর্য্যন্ত ঘ্যানর-ঘ্যানর করে বলেন, "এ পরীক্ষার গতিক ভালো দেখছি না।"

১ একটি মারাঠি প্রবাদ—অর্থ স্পষ্ট।

বৌদির পরীক্ষা

দাদা আমার পরীক্ষার বিষয়ে যেমন লক্ষ্য রাখত, বৌদির বিষয়ে সেরকম কেন রাখত না? আমাকে বই এনে দিত, দেখা হলে কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা করত; আর সময় থাকলে সে যে-বই পড়েছে তার গল্প আমাকে বলত। যে-বিদুষীদের কথা সে শুনেছে, তাদের কথা সে বর্ণনা করে আমাকে বলত। "যমু, তোমাকে ওদের মতো বড় হতে হবে," দাদা প্রাণ ঢেলে বলত। আমার জন্য দাদা অত করত, কিন্তু নিজের বউ লিখতে-পড়তে পারে কি না তা সে একদিনও কখনো জিজ্ঞাসা করেনি। সে-কথা জিজ্ঞাসা করবে কাকে দিয়ে? আমাকে দিয়েই তো? সে নিজে বৌ-এর সঙ্গে এখনো কথা বলত না। আমার সঙ্গে সে এ-বিষয়ে কখনো কথা বলেনি। একবার দু'বার আমি নিজে থেকে সে-বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলাম, তখন সে-কথা শুনেও না-শোনার ভাণ করে, অন্য কথা তুলে, আসল ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল। প্রথমে যখন দু-একবার ও রকম হল, তখন আমি ভাবিনি যে দাদা ইচ্ছে করে সে-বিষয়টা এড়াচ্ছে। কিন্তু একদিন রাত্তিরে আমরা সহজভাবে গল্প করছিলাম, তখন উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওগো, তুমি নিজে বেশ বিদ্বান, কিন্তু তোমার বৌদি কী রকম? তিনি কি লিখতে-পড়তে জানেন? গণপতরাওকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হেসেই উড়িয়ে দেন। তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।" এই শুনে আমার হঠাৎ মনে পড়ল যে, আমি জিজ্ঞেস করলেও সে এমনি করে হেসে উড়িয়ে দেয়। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "সত্যি, দাদা কী জানি কেন অমন করে? আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখনও অমনি হেসে উড়িয়ে দিল। বৌদির নাম করলেই ও মুখ ভার করে চুপ করে বসে থাকে।"

"আহা! তবে সে-কথা শুধু আমাকে বলে কী হবে? নিজে জিজ্ঞেস করলে হয় না? কেমন যে তুমি বোন!"

"সে কী? আমি ওঁকে কী করে জিজ্ঞেস করব? আমার চেয়ে বড় যে! ওঁকে আমি কী করে জিজ্ঞেস করতে পারি যে সে তার বৌ-এর নাম করলে অমন করে কেন?"

"তাতে কী? তোমার দাদা তোমাকে আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে না? আচ্ছা, সে-কথা এখন থাক্। তুমি সত্যি ওঁকে জিজ্ঞেস কোরো।"

"আমি বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু ও মুখ খুলে কিছু বললে তো? ও আমাকে বলল, 'ঠাকুরঝি, আমার আবার কীসের লেখা-পড়া?' আর ও ভালো করে কথাও বলতে চায় না, ওঁর যখন এইরকম দেখলাম—"

"দূর, পাগলী কোথাকার! মেয়ের বয়সই বা কত? ওর আবার স্বভাব-টভাব কী? একদিন ওবাড়ি যেও, আর গণপতরাওকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস কোরো। অল্প একটু লেখাপড়া জানা থাকলে কোনো ব্যাঘাত বিপদ হবে না, জানো তো? গণপতরাওর স্ত্রীর কেমন চটপটে হওয়া চাই, এরকম জবুথবু হলে কি চলে?"

এই বিষয়ে আরও খানিকক্ষণ আমাদের কথাবার্তা হল। তার দু-তিন দিন পরে আমার অছুত ছিল তাই আমি ওবাড়িতে থাকতে গেলাম। আজকাল আমি এ-রকম জরুরী অবস্থায় বাপের বাড়ি যেতাম। তাছাড়া সেটা আমার দ্বিতীয়বারই ছিল।

ওঁর কথা মনে রেখে, সময় বুঝে আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা, অনেকদিন ধরে ভাবছি যে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তুমি যদি ভাই রাগ না কর আর মন খুলে সত্যি কথা বলো, তাহলে জিজ্ঞেস করি! জিজ্ঞেস করব? বলো।"

আমার এই প্রশ্ন শুনে দাদা একটু হাসল। কিন্তু কী ভেবে সে হেসেছিল সেটা বুঝতে পারা কঠিন ছিল। নিরাশা, অল্প তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাব, কিছুটা কৌতুক, এই রকমের ভাব মনে থাকতে বাইরে-বাইরে যদি কেউ হাসে, তা হলে তার হাসি যে রকম খিন্ন মনে হয়, দাদার হাসি সেই ধরণের ছিল। আমি কী জিজ্ঞাসা করব তা বোধহয় সে বুঝতে পেরেছিল, আর—'এ আবার পাগলের মতো কী জিজ্ঞেস করবে' ভেবে তার সেই হাসিতে এ-রকম অদ্ভুত ভাবের যোগ হয়েছিল। সে-রকম অদ্ভুত হেসে সে অনেকক্ষণ ভ্রূকুটি করে আর খিন্ন হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। যেন সে ভাবছিল যে আমাকে সেই

প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করতে অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না অনুচিত হবে আর অনুমতি দিলে তার উত্তর দেওয়া কি ভালো হবে ? তারপর সে আবার হেসে বলল, "করো, করো ভাই, যা খুশী জিজ্ঞেস করো। তুমি কী জানতে চাও তোমার কাছে তা গোপন করে লাভ কী ?"

"দেখ, জিজ্ঞেস করব তো ? আচ্ছা, তবে সত্যি জিজ্ঞেস করি। দাদা, তুমি আমার লেখাপড়ায় এত যত্ন কর, কিন্তু বৌদি কিছু লিখতে-পড়তে পারে কি না, তার খবর কই কখনো নিলে না তো ? আমাকে অতগুলো বই এনে দিলে, কিন্তু কোনো দিন, 'এই বইটা ওকে দাও আর পড়তে বল'।—বললে না তো ?—বেশ, দু-তিন বার আমি নিজে কথা তুললাম, উনিও নাকি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু তখন তুমি হেসেই উড়িয়ে দিলে, অমন কেন কর ভাই ?"

আমি যখন এ-কথা বলছিলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল না যে দাদা মন দিয়ে সে-কথা শুনছে। কোথায় যেন সে উদাস ভাবে চেয়েছিল। আমার কথা শেষ হলে সে ইতস্তত: করতে করতে বলল, "এমন বেশি কী বললে ?" আবার কোথায় যেন কোন্ অজানা উদ্দেশের দিকে সে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে, মানুষ যেমন ঘুম ভেঙে ওঠে সেই রকম ভাবে জেগে উঠে, সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হেসে বলল, "কী জানতে চাও তুমি ? বলো, আমি এখন সব কিছু তোমাকে বলছি।"

"তবে এতক্ষণ যে-সব কথা বললাম, তার কী হল ?" এই বলে আমি আবার তাকে আগেকার সব প্রশ্ন করলাম। তখন দাদা বলল, "যমু, তুমি যা বলছ তা সত্যি। তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একটা পাথরকে শুধু একটা কেন, এক লক্ষ বইও যদি অর্পণ করা হয়, তবে সে-পাথর কি বইগুলো পড়তে পারবে ? বলো ?"

"সে কী কথা ? বৌদি কি পাথর ? ওকে শিক্ষা দিলে নিশ্চয় পড়তে পারবে। অমনি কি কেউ পারে ? শিক্ষা দেবে না, কিছু না, আর অমনি পাথর-টাথর বললেই হল ?"

"হুঁ। তুমি কি ভাবো আমি চেষ্টা করে দেখিনি ? শুধু পাথর নয়, ও হচ্ছে একটা মস্ত বড় পাথর। আমি বলি বুদ্ধি নাই বা থাকুক, পরিশ্রম করলেও শিখতে পারা যায়। কিন্তু ইচ্ছা থাকা চাই তো ? আজ আমি তোমায় স্পষ্ট বলে রাখছি, এই স্ত্রী-হতে আমার কোনো সুখের আশা

নেই। ও অত্যন্ত জেদী আর নির্বোধ। নিজের একটুও আক্কেল নেই, আর কিছু বললে শুনতে চায় না। আমি এটা বেশ ভালো করে জানতে পেরেছি। গত একমাস কি দেড়মাসের মধ্যে আমি ওকে আড়ালে দু-তিন বার জিজ্ঞাসা করেছি, 'তুমি কিছু লিখতে-পড়তে পার?' একে তো ও আমার সামনে দাঁড়াতেই চায় না, আমাকে এড়িয়ে চলে। নিরুপায় হয়ে যখন দাঁড়ায় আমার সামনে, তখন মুখ ফুটে একটা শব্দও বলতে চায় না। পরন্তু ও আমাকে স্পষ্ট উত্তর দিয়েছে, 'আমি কিছু জানি না, আর শিখবও না।' হয়েছে? ঘরের কাজ-কর্মে কত নিপুণ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আর জানবার কী বাকি রইল?" এই বলে আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে চুপ করে রইল।

এই কথা বলার সময় তার চেহারা আর স্বর বড় অদ্ভুত হয়েছিল। দুঃখ, ক্রোধ আর নিরাশা তাতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। আর কথাগুলি যেন একেবারে বুক ফেটে বেরুচ্ছিল। সে-কথা আর তার মুখের ভাব আমার মনকে এত অভিভূত করে'ছিল যে তাকে কী বলি তাই বুঝতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ সে নিস্তব্ধ হয়ে রইল। পরে অত্যন্ত দুঃখের সুরে সে বলল, "যমু, আমার জীবনের সব উদ্দেশ্য, কল্পনা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে! অন্ততঃ তুমি ভালো হও বোন। ভাগ্যের গুণে তুমি বড় ভালো স্বামী পেয়েছ। তোমার সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। তাছাড়া, আমিও আমার শক্তি মতো তোমাকে অবশ্য সাহায্য করব। আমি তোমার ওপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছি।"

দাদার এ-কথা আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার কী উদ্দেশ্য, কী কল্পনা? সব নষ্ট হল মানে কী? কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। দাদার অত নিরাশার কারণ কী? সব যেন কী রকম একটা হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা, তুমি কী বলছ? তোমার কী অভিপ্রায় ছিল? কী নিস্ফল হয়েছে? তুমি এত নিরাশ হয়েছ কেন?" তখন সে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তার সে-চাহনি দেখে আমি যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ সে বলল, "আমার অভিপ্রায়? আমার প্ল্যান? সে এখন আর তোমাকে বলে কাজ কী? আর এখন সে-সবের বৃথা উচ্চারণ করেই বা কী লাভ? যদি তেমন সময় আসে, তবে তোমাকে আর

তোমার স্বামীকে সব বলব। বোধ করি ওঁরও সেই ইচ্ছা। কিন্তু থাক্। এ মাথাব্যথার দরকার কী? আচ্ছা, আমাকে বলো, তুমি নিজে আজকাল কিছু কিছু পড়ছ তো?"

এই বলে দাদা আবার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা আরম্ভ করল। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম যে ওর ও-রকম লুকোচুরি চলতে দেবোই না। তাই আমি তাকে তক্ষুণি বললাম, "আমার কিন্তু তোমার কথা সত্যি মনে হচ্ছে না। আমি বৌদিকে একবার ও অমন কেন করে জিজ্ঞেস করব।" এ-কথা আমি মুখে বলছিলাম, কিন্তু আমার অন্তর আমাকে বলছিল যে দাদা যা বলেছে তা একেবারে মিথ্যে হতে পারে না। তবু, যত নিরাশ হয়েছিল, তত নিরাশ হবার কারণ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার কথা শুনে দাদা আমাকে বলল, "আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি যা উত্তর পেয়েছি, ঠিক সেই উত্তর পাবার ইচ্ছে থাকলে তুমি নিশ্চয় জিজ্ঞেস করতে পারো। কে বারণ করেছে? আমি যা বুঝেছি তা ভুল বুঝে থাকলে ভালোই। কিন্তু তুমিও আমার মতোই জানতে পারবে, আর তোমারও সেই বিশ্বাস হবে। যমু, আমি তোমায় সত্যি বলছি, সে-চেষ্টা বৃথা ভাই! আমি আর সে-ঝঞ্ঝাটে পড়তে যাব না ভাই।"

এই শেষের কথাটা সে বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছিল। তখন আমি চুপ করে রইলাম, কিন্তু মনে মনে ঠিক করলাম যে একবার বৌদিকে ধরে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করব। আগে একবার আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার উত্তরও পেয়েছিলাম। তবু আবার একবার চেষ্টা করে দেখব মনস্থ করে, দ্বিতীয় দিন বৌদির সঙ্গে আড়ালে দেখা করে আমি তাকে বললাম, "বৌদি, তুমি অমন কর কেন? দাদার বড় ইচ্ছে যে তুমি লেখাপড়া শেখো। সে-দিন দাদা তোমাকে জিজ্ঞেস করল, তখন যে-উত্তর দিলে, তেমন উত্তর দেওয়া কি ঠিক? ভাই, যদি আমরা পড়তে না পারি, শিখলেই তা পারব? কিন্তু দাদার মনের মতো তোমাকে কিছু করতে হবে তো? আচ্ছা, কাল আমি তোমায় একটা বই এনে দেবো। তুমি একটু-আধটু পড়তে পারো তো?" আমার এই কথা শোনামাত্র ভ্রূকুটি করে বৌদি বলল, "আ মরণ! এই বলতে আমাকে আড়ালে নিয়ে এলে নাকি? আমার বই-টই কিছু চাইনে। আমার কী বিজ্ঞতা আছে

বই-টই পড়বার ?"

"সে কী কথা বৌদি ? বই পড়তে বিজ্ঞতার দরকার কি ? আর দাদার যখন এত ইচ্ছে যে তুমি লিখতে-পড়তে পারো, তুমিই বা পড়বে না বলে জিদ কর কেন ? এখন থেকে পড়ো, কেমন ? সেই বইটা এনে দেব ?"

বৌদি কিছু বলল না, চুপ করে রইল। তারপরে, "তুমিও সেই ধরে বসলে ? তোমার কথা শেষ হয়েছে ? আমি যেতে পারি ? শাশুড়ী আবার ডাকতে আরম্ভ করবেন," এই বলে সে চলে যেতে লাগল। কিন্তু শপথ করে আমি তাকে থামালাম, বললাম—"বৌদি, অমন পাগলের মতো কোরো না। আমার কথা শোনো। তুমি সত্যি যদি ভালো করে পড়তে না পারো, তাহলে আমি যখন আসব সাত-আট দিন পরে, তখন তোমাকে শেখাব, কেমন ? তুমি শিখতে রাজি হলেই যথেষ্ট। তোমার এতে কী লোকসান ? বোসো। এখন বেশ দুপুর বেলা মাঈর কোন কাজই নেই। বোসো এখানে, এই বইখানা তুলে নাও আর পড় দেখি। দেখি তুমি কেমন পড়তে পারো ?"

"আমি কিছু পারিনে গো। ঠাকুরঝি, কেন শুধু শুধু—আমার মাথা খাও ?"

"ওকী বৌদি, এতো অনুরোধ করছি, তবু শুনতে চাও না ? নাও, হাতে নাও বইখানা, আর পড়ো দেখি যেমন পারো, বর্ণপরিচয় হয়েছে কিনা সেটা তো জানা যাবে।"

"আমি কিচ্ছু জানিনা, কিচ্ছু জানিনা, কিচ্ছু জানিনা। আর আমি এখন পড়তে বসবও না।"

এতক্ষত্রে কিন্তু আমার সত্যি রাগ হল। কিন্তু রাগ মনে চেপে রেখে আমি বললাম, "বেশ, বইটা খুলতে আপত্তি কী ? আমি পড়ে তোমাকে গল্প বলব ; আর পরে তুমি পড়ে শুনিও। এমন পাগলের মতো কোরো না, আমার কথা শোনো, বৌদি। বৌদি, দাদার কত শখ যে মেয়েরা লেখাপড়া শেখে, আর তুমি কেন এমন করো বলতো ? হ্যাঁ, এই নাও, বইখানা হাতে তুলে ধর, আর খুলে পড়ো।"

ঠিক সেই সময় শুনতে পেলাম, "আপনি নিজের বাড়িতে যা ইচ্ছে করুন। কিন্তু আমার ঘরে ও-সব ঢং চলবে না বলছি। আপনি নিজের বাড়িতে

নিজেই মুখ্য, যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু ওকে অমন ঢং শিখিয়ে দরকার নেই। আপনি পারেন তো পড়তে? তাই ঢের হল। সকলে শিখে কাজ কী? গণপতরাও এখন নিজের বৌকে লেখাপড়া শেখাতে চান না কী? মা গো মা! ওঁর নিজের শিক্ষা শেষ হয়েছে? সব পরীক্ষা শেষ হয়েছে? আঃ মরণ! সত্যি, আজকালকার রকমই আলাদা!"

এ-কথা কার তা আর বলতে হবে না। আমাদের সব কথা—নিদেন শেষের ভাগটা—শুনে মাঈসাহের উপরে এসে এই সব খোঁচা মেরেছিলেন। তখন তাঁর চেহারাখানা যা দেখাচ্ছিল! তাঁর চোখে তাচ্ছিল্য ভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সেই চোখ দু'টি দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, তিনি ভাবছেন, কেমন ধরেছি? বেশ এখন নাক কাটা গেছে। বিদ্রূপ আর কিঞ্চিৎ রাগে তাঁর চোখ দু'টো যেন হাসছিল। কথা বলবার সময়কার তাঁর হাবভাব দেখে আমি সত্যি চমকে উঠলাম। আর ভয় করতে লাগল। একে তো [illegible]ম মোটেই মনে করিনি যে মাঈসাহেব সিঁড়ির উপরে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনবেন। মনে হচ্ছে যে মানুষ যখন একাগ্রচিত্তে কোনো কাজ করে, তখন তার অন্য কিছুই মনে থাকে না। আমারও সেই রকম অবস্থা হয়েছিল। এতদিন মাঈসাহেবের স্বভাব জেনেশুনেও, কী অশ্চর্য! আমার মনে কোনো আশঙ্কা হয়নি! কিন্তু যা হবার তা হয়ই! অদৃষ্টের সামনে মানুষের কোনো কৌশলই কাজের হয় না। মাঈসাহেবের কথা আমার বুকে বাজল। বিশেষ দুঃখ হবার কারণ, সব কথা তিনি বৌদির সামনে স্পষ্ট বলেছিলেন। পাগলের হাতে মশাল দেবার অবস্থা আর কী! তারপরে আমি কিছুই বলতে পারছিলান না, জিভ যেন অটাকে গিয়েছিল। মাঈসাহেবের মুখ অবিরল চলছিল।

"ওমা! বৌদিকে এখন লেখাপড়া শিখিয়ে পণ্ডিত করা হবে নাকি? আর কী কী করা হবে শুনি? ফ্রক পরিয়ে মেমসাহেব করবে না? বেশ, বেশ। নিজে সাহেব আর বৌ মেমসাহেব হবেন। আর রাস্তায় হাতে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াবেন! তারপরে দু'জনে ইংরাজীতে কথা বলবেন, কেমন? আমাদের যা খুশী গালি দিলেও অপত্তি নেই। বুঝতে-সুঝতে পারব না, তাই বেশ! ভালো, ভালো! বলি হাই স্কুলে কবে থেকে যাবে? আজ সন্ধ্যে বেলা উঁনি বাড়ি এলে ওঁকে এক জোড়া জুতো আর ছাতা আনতে বলব, কেমন? আর আমি আসব সঙ্গে, বই খাতাপত্তর পৌঁছে

দিতে ঝি হয়ে! ঐ যে দপ্তরদারের মেয়ে যায় আমাদের দোরের সামনে দিয়ে তেমনি তুমিও যেও। বসো ঐখানে এখন, টেবিলের পাশে, নিচে এসে দরকার কী! পাতায় করে দুজনের খাবার নিয়ে উপরে আসব 'খন।

সে কি এক কথা? যা খুশী ভটর ভটর চলছিল। আমার সেখান থেকে উঠে চলে যেতে ইচ্ছে করল। তাঁর বকাবকি আর শুনতে পারছিলাম না। আমাদের মাঈসাহেবের চেহারায় আর বয়সে সে-রকম কথা সাজছিল না। তাঁর সেই ফ্যাশান করা খোঁপা, খোঁপার উপরে গোঁজা সেই গোলাপ ফুল, সেই ছিটের চোলী,[১] কোমরে গোঁজা হাত-রুমাল আর চাবি, এত সব হালফ্যাসানের সঙ্গে তাঁর বিদ্যাশিক্ষার উপরে ঘৃণা আর উপহাস কেমন যেন অসংলগ্ন আর বেখাপ্পা মনে হচ্ছিল। কিন্তু কী উপায়? প্রত্যুত্তর করবার জো ছিল না। তবু শেষে কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলাম, এমন সময় মাঈসাহেব সেখান থেকে চলে গেলেন, অবশ্য বৌদিও তাঁর পিছনে গেল। আর আমি স্তব্ধ হয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। অন্য আর কী করা সম্ভব ছিল? কখন যে সন্ধ্যা হবে আর আমি দাদাকে সব কথা বলতে পারব, এই ভেবে আমি অধীর হয়েছিলাম।

শেষকালে বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় দাদা এল। সে উপরে তার ঘরে আসামাত্র আমি তাকে কিছু বলতে যাব, এমন সময় সে নিজেই হাসতে হাসতে বলল, "কেমন, যমু দিদি, দেখাশোনা হয়েছে?"

দাদার প্রশ্ন শুনে আমি বিষম অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। যা ঘটেছিল তা বলব কী করে তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। শেষে কোনোরকমে তাকে সব কথা আগাগোড়া বলে ফেললাম। তখন তার মনের অবস্থা কী রকম হয়েছিল তা সে নিজেই জানে। এক মুহূর্ত সে চুপ করে রইল। তারপর, বোধহয় তার মনের অবস্থা আমি যেন বুঝতে না পারি সে উদ্দেশ্যে, নিজের চিন্তা সে চেপে রাখবার চেষ্টা করে হেসে যা বলল, তার সারাংশ এই, 'যমু দিদি, আমি তো আগেই ও-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে মানা করেছিলাম। কিন্তু তুমি কি আমার কথা শোনো?' এ-কথা সে আস্তে বলল, আর তার পরের

১ সেকালে মহারাষ্ট্রীয় মহিলারা খাণের চোলী পরতেন। যাঁরা আধুনিক-ভাবাপন্ন ছিলেন তাঁরা ছিট ব্যবহার করতেন। আজকাল আবার খাণের ব্লাউস বা চোলী পরা ফ্যাসান হয়েছে।

কথাগুলি সে এত চুপি চুপি বলল যে যেন একলা আমি শুনতে পাই, কেউ আড়াল থেকে শুনতে না পায়। "যমু, আমি আগেই পরীক্ষা করে দেখেছি। তাই তোমাকে কিছু বলিনি। মানুষ 'তা' বললেই 'তাক ভাত'[১] বুঝতে হয়, জানো? তুমি ভাই বড় উতলা হয়ে একটু বেশি তাড়াতাড়ি গেলে মনে হচ্ছে, না? আচ্ছা থাক্, এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছি কী সুখ আমার ভাগ্যে আছে।"

দাদার কথা শেষ না হতেই নিচে থেকে মাঈসাহেব ডাক দিলেন, "ওগো যমুদিদি, আজ আপনার তৃতীয় দিন, তা মনে আছে? দিনের আলো নিববার আগে সকাল সকাল খেয়ে নিলে হয় না?" আমার সে-বয়সে সে-সব রীতিনীতির কী বুঝতাম? কিন্তু যে বকবেই তাকে থামায় কার সাধ্য? বকতে কোনও কারণের দরকার হয় না। আমি চুপ করে উঠে নিচে গেলাম। আমাদের মাঈসাহেব মর্মভেদী আর খোঁচানো কথা বলতে বড় নিপুণ ছিলেন। আর বাবার সামনে এত যত্ন করতেন যে, তা বলবার নয়। কোনোদিন খাবার সময়—সারাদিনের মধ্যে দাদাতে আর বাবাতে শুধু খাবার সময়ই একবার দেখ হত। তাছাড়া দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হাত না, কথাবার্তা দূরে থাক। কী জানি কেন, দাদা যতদূর সম্ভব বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করত। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা বড় বিষম ব্যাপার। তাঁর সঙ্গে খেতে বসলে সে ভালো করে খেতেও পারত না। আমার অবস্থাও সেই রকম হত। কিন্তু দাদার সে রকম অবস্থা দেখে আমার বড় আশ্চর্য মনে হত। কেননা, দাদা আমার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভীক ছিল। কিন্তু পিতাপুত্র পরস্পরের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে হলে নির্ভীকতা ছাড়া আরও কিছুর দরকার তা আমি তখন জানতাম না। থাক্ সে-কথা।

কখনো কখনো খাবার সময় মাঈসাহেব বলতেন, "আজকাল গণপতরাও একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? একবার দেখাশোনা করে দেখ, নাহলে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাও।" কখনো কখনো বলতেন, "গণপতরাও, বিকেল বেলা এসে একটু জলখাবার খাসনে যে? রাত্তিরে ওঁর সঙ্গে খাবার

১ 'তা' বললেই 'তাক ভাত' বোঝা—মারাঠি প্রবাদ। তাক=ঘোল। তাক ভাত=ঘোল ভাত। মহারাষ্ট্রে খাবার শেষে ঘোল ভাত বা দই ভাত খাবার প্রথা আছে। এ প্রবাদের অর্থ এই যে, অল্প একটু সূচনা পাওয়ামাত্র যা বুঝবার তা বুঝতে পারা।

জন্য কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হয়। না হলে, তুমি তবু একটু সকাল-সকাল বাড়ি এলে হয় না?" কখনো বলতেন, "আজকাল গণপতরাও খালি পরীক্ষার চিন্তা করছে। সমস্ত দিন নিজের বই নিয়েই ব্যস্ত থাকে। দোতলা থেকে নিচে নেমেও আসে না।" এ রকম তাঁর কত কথা বলব? সব বলতে গেলে একটা রামায়ণ হবে। বয়সে অত ছোট হয়েও অমন কথা তিনি বলতে পারতেন কী করে তাই আশ্চর্য মনে হচ্ছে। যে-কথা তিনি দাদার আর আমার সামনে আমাদের মতো বলতেন, বলা বাহুল্য সে-কথা তিনি বাবার কাছে ঠিক তেমন করে নিশ্চয়ই বলতেন না, কখনো কখনো তিনি বাবার কাছে আমার আর দাদার নামে লাগিয়ে দিতেন। আমার ঠিক মনে আছে যে হলুদ-কুঙ্কুমের দিন দুর্গা আর আমি উপরের ঘরে গিয়ে বসেছিলাম, সে-কথা তিনি বাবাকে বলেছিলেন। কেন না, পরে দুর্গার সাধ হয়েছিল, আর তাকে আমরা যেদিন নেমন্তন্ন করেছিলাম, সেদিন আমরা যখন দু'জনে কথা বলছিলাম, তখন বাবার সামনে মাঈসাহেব বললেন, "দাদার ঘরখানি আছে, ভিতরে খিল বন্ধ করে দু'জনে বেশ গল্প-গুজব করগে যাও। ইচ্ছে থাকলে, আর দরকার হলে, বৌদিকে সাহায্য করতে নিয়ে যেতে পার।"

তখন বাবা হাসতে-হাসতে বললেন, "ওগো, যথেষ্ট হয়েছে! তুমিও বাপু কারু পিছনে কম লাগতে পার না। বসেছিল একটু উপরে গিয়ে, তাতে অত কী হয়েছে?"

একে বাবা কিছু বলতেন না, তায় আজ ওইরকম কথা বললেন, ব্যস্, সেই যথেষ্ট হল। মাঈসাহেবের মেজাজ যা গরম হল! "তবে আমি আর কী বলেছি! ওদের অন্য কিছু বলছিনে তো? তাতে তোমার অত নাক গলাবার দরকার কী? তাই তো! কথায় বলে যে অপরে শত করলেও রক্তের টান মানুষকে টেনে নিয়ে যায়! ঝরণার প্রবাহ নদীতে গিয়েই মেশে তো! মিশুক না কেন? আমার তাতে কী? আবার যদি কখনো মুখ ফুটে একটা কথা বলি তো কান কেটে নিও। আমি প্রাণ ঢেলে অত যত্ন করলেও, একটু ভুল করলেই সব যত্ন গোল্লায় যায়!—আমি যে সৎমা।"

মাঈসাহেব যখন এ-সব বলছিলেন, তখন বাবার চেহারা কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছে তিনি ভাবছিলেন, 'আমার সর্বক্ষণের গম্ভীর

ভাব ছেড়ে অমন কথা কেন বলতে গেলাম!' আমার তখন মাকে মনে পড়ল। ভাবলাম, তিনি থাকতে বাবার চেহারা কি কখনো ও-রকম হয়েছে? না! তখনকার বাবার সেই তেজ, গরম মেজাজ আর এখনকার এই শান্ত ভাব—শান্ত ভাবই বলি, বেশি আর কী বলব?—ছুটিতে কী অদ্ভুত বিরোধ! আজ সেই দুই ছবিই চোখের সামনে এনে আমি লিখছি তাই সে-বিরোধ আমার অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হচ্ছে। সত্যি, কী জানি কেন, অনেক পুরুষরা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে একেবারে সাধুর মতো ব্যবহার করেন, কিন্তু প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক ততোই কঠোর ব্যবহার করেন। সাধারণত সকলেরই এই অভিজ্ঞতা। যে-কাজটা প্রথম পক্ষের স্ত্রী করলে একটুও সহ্য করতে পারেন না, সেই কাজই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী করলে অমনি সহ্য করতে পারেন; শুধু তাই নয়, যে-সব কাজ অবাধে করার ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য দ্বিতীয় স্ত্রীর থাকে। এমন কেন যে হয়, তা আমার একটা হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। কিন্তু সে-হেঁয়ালি সমাধান করার ঝঞ্ঝাটে পড়ে বৃথা সময় নষ্ট না করে এর পরের কাহিনী বলি, তাই ভালো।

আমি ভেবেছিলাম যাবার সময় মাঈসাহেব দুপুরবেলার ঘটনার সম্বন্ধে বাবার কাছে অভিযোগ করে চেঁচামেচি করবেন। কিন্তু আমার সে-আশঙ্কা দেখা গেল ঠিক নয়। বাবার সামনে তেমন স্পষ্ট কথা বলা মাঈসাহেবের অভ্যাস ছিল না। যদি কখনো ভুল করে তিনি বাবার সামনে তেমন স্পষ্ট নিজেকে বকতেন, তাহলে, উপরের ঘটনার মতো, গোলমাল আর চেঁচামিচি করে, গালিগালাজ করে আকাশপাতাল এক করতেন। আর বাবার চুপ করে বসে থাকা ছাড়া অন্য উপায় থাকত না। তবু অবশ্য মাঈসাহেব সে-দিন আস্তে আস্তে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বলছিলেন। হঠাৎ বললেন, "গণপতরাও, আমাকেও একটা বই এনে দিও বাবা। বাড়ির কাজকর্ম থাকলেও আমি পড়ব। যমু, তুমি মাঝে মাঝে যখন এখানে আসবে তখন আমায় পড়তে শিখিও, কেমন?" এই আর এই মর্মের কিছু কিছু তিনি সেদিন রাত্তিরে দু-তিন বার বললেন। কিন্তু দাদা মুখ তুলে চেয়েও দেখল না। আমার মনে হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা ছিল যে বাবা যেন জিজ্ঞাসা করেন, "এ আজ কী নতুন ব্যাপার?" আর তারপর তিনি কিছু না বলে বাবার কৌতূহল বাড়াতে পারবেন। কিন্তু বাবা মোটেই কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। পরে সে-সব কথা বাবার কানে যে পৌঁছেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সার কথা, বৌদির লেখাপড়ার ইতিহাস এইভাবে শেষ হল। সে-দিন রাত্তিরে দাদা আমাকে স্পষ্ট বলল যে, সে ঠিক করেছে আর কক্ষনো ও ঝঞ্ঝাটে পড়তে যাবে না। তার নিজের যখন ইচ্ছে নেই, আমাদের তখন মিছেমিছি মাথাব্যথা কেন? এ-কথা বলবার সময় তার মন কত আকুল হয়েছিল তা সে নিজেই জানে। কিন্তু দেখতে পেলাম যে তার অত্যন্ত দুঃখ হয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "যমু, ওর বাপের বাড়িতে ইংরাজীর কিংবা নতুন কোনো-কিছুর নাম-গন্ধ নেই। মেয়েদের শিক্ষার নাম করলে তাদের পিত্ত কুপিত হয়। এই রকম সব যত বুড়ো, পুরানো জঞ্জাল ওদের বাড়িতে। ওর বিদ্যে শিখতে ইচ্ছে হবে কোথা থেকে? আর এ-বাড়িতেও উৎসাহ কত, তা আজ দেখতে পেয়েছ। ভাগ্যিস্ তোমার পথে কোনো বাধা নেই। তুমি এমন একটা কিছু করো যা লোকে ধন্য মনে করে।"

দাদার এ-কথা শুনে আমি শুধু হাসলাম। কারণ, লোকে যা ধন্য মনে করে এমন কিছু করা কি আমার সাধ্য ছিল? আমি মেয়েমানুষ, আমার কোনো ক্ষমতা নেই, আর লোকে আশ্চর্য হবে এমন আমি কী করতে পারি? আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তাই, দাদা শুধু শুধু একটা কিছু বকেছে মনে করে, তাকে পাগল ভেবে আমি হাসলাম।

তারপরে ওঁর কথা উঠল। আমি বললাম যে পরশু দিন ওঁর পরীক্ষার ফল বেরুবে, সেটা কী রকম হবে তাই আমার ভাবনা। তখন দাদা বলল, "যমু, তোমায় ভাবতে হবে না। তিনি নিশ্চয় প্রথম হবেন। বোম্বায়ে তিনি চাকরি পাবেন, তুমি সেখানে যাবে। আর সত্যি যমু, আমিও যদি আসছে বছর প্রথম বারেই পাশ করি, তাহলে কোনো একটা ব্যবস্থা করে বোম্বায়ে থাকতে যাব ভাবছি। বাবার মত হলে তিনি আমাকে পাঠাবেন, মাঈসাহেব কোনো আপত্তি না তুললেই হল।" দাদাকে আমি অনুরোধ করতে লাগলাম যে সে বোম্বাই এলে পরে যেন আমাদের বাড়িতেই থাকে। সে বলছিল যে কলেজে থাকাই ভালো, তাতে পড়াশোনার অনেক সুবিধা হয়। আমি বললাম, "কক্ষনো না। আমার ঘর থাকতে আমি তোমাকে অন্য কোথাও থাকতে দেব না।" এইরকম আমরা "ডাল রইল বাজারে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে মারে,"[১]—সেই প্রবাদের মতো অমনি তর্ক করছিলাম।

[১] একটি মারাঠি প্রবাদ। এর অর্থও বেশ স্পষ্ট।

দুর্গীর স্বামীর পরীক্ষা

পরদিন সকালবেলায় আমি চান করবার জন্য দরজার বাইরে[১] বসেছিলাম, গরম জল আনতে বৌদি ঘরের ভিতরে গিয়েছিল। এমন সময়, দুর্গী, দুর্গীর মা আর বাবা ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা কেউ আমাকে দেখতে পাননি, কিন্তু আমি তাঁদের দেখেছিলাম। তাঁরা সকলে অমন তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। কী ব্যাপার তা জানতে ইচ্ছে হল, আর চট করে উঠে আমি তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে দুর্গীকে ডাকলাম। তার মা আর বাবা এগিয়ে গিয়েছিলেন। দুর্গী বেচারী ভালো করে হাঁটতেও পারছিল না। তার প্রসবের কাল একেবারে কাছে এসেছিল, তবু তেমন অবস্থায় সে যাচ্ছিল কেন? তাকে ডাকতেই সে থমকে দাঁড়াল, আর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মা-বাবাকে নিয়ে অত তাড়াতাড়ি চললি কোথায়?" এ-কথা শোনামাত্র দুর্গী বলল, "ভাই, আমার কপাল ভেঙেছে সেখানে," এই বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল। তখন তার মুখভাব এত করুণ হয়েছিল যে তা বলা যায় না। আর সেই ভয়ংকর কথা বলবার সময় তার চেহারা যে কেমন দেখাচ্ছিল তা মনে পড়লে এখনও আমার চোখে জল আসছে। সে ভয়াবহ কথার অর্থ কী? ওর স্বামীর কোনো বিপদ হয় নি তো? এ রকম দুশ্চিন্তা মনে আসায় আমি একেবারে ভীত হয়ে পড়লাম। তাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাব, এমন সময় সে চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ভাবতে ভাবতে ফিরে আসছি এমন সময়ে হঠাৎ, "ওমা, ঠাকুরঝি, অমনি কোথায় ছুটে

১ সেকালে মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ মাসিক অশুচি বিশেষভাবে পালন করতেন। চতুর্থ দিন একেবারে ভোরবেলায় উঠে ঘরের বাইরে স্নান সেরে তবে ঘরে আসতেন। ঘরের অন্য কোনো মহিলা তাঁর গায়ে আগে জল ঢেলে দিতেন, পরে তিনি নিজে জল নিয়ে স্নান করতেন। এসব ব্যাপার বাড়ির আর সকলে ঘুম থেকে উঠবার আগে সকাল সকাল সেরে নেওয়া হত।

গিয়েছিলে? আমি কখন থেকে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।" বৌদির এই বিরক্তিভরা কর্কশ সুরের কথা শুনে কেমন যেন ধাক্কা খেয়ে আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। কিন্তু মনের মধ্যে যে কেমন তোলাপাড়া চলছিল তা আমিই জানি। এখন জিজ্ঞাসা করি কাকে, আর জানেই বা কে, এই শুধু ভাবছিলাম। বাড়িতে মুখ ফুটে একটি শব্দও বলবার জো ছিল না। নিজে দুর্গীর বাড়ি গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ঘরের বাইরে যাব কি করে? মাঈসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি যেতে অনুমতি দেবেন এমন বিশ্বাস ছিল না।

চুপ করে পা ধুয়ে বাড়ির ভিতরে গেলাম। কিন্তু প্রাণের ছটফটানি কম হচ্ছিল না। থেকে থেকে নারী-জীবনের ভয়ংকর বিপদের ভয় হচ্ছিল। দুর্গীর বরের প্রাণের কোনো বিপদ ঘটেনি তো? কিন্তু তেমন কিছু হয়ে থাকলে তাঁরা দুর্গীকে কী করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন? না দুর্গী তাঁদের কথা না শুনে নিজেই সঙ্গে যাচ্ছে? ওমা! সত্যি যদি সে-রকম কিছু বিপদ হয়ে থাকে, তাহলে—হে নারায়ণ! দুর্গীর কপালে এ কী বিপদ! ও এমন কী অপরাধ করেছে যে তাকে সমস্ত জীবনটা দুঃখেই যাপন করতে হবে? তার অবস্থা এখন কী রকম হবে? তাতে আবার সে পোয়াতী! মা গো মা! এমন ভয়ানক বিপদ দুর্গীর মতো সরলা মেয়ের বরাতে? এরকম বিভিন্ন চিন্তা মনে এসে মন ক্রমশ বেশী উদ্বিগ্ন হতে লাগল। কিন্তু কী হয়েছে তা জানবার কোনো উপায়ই দেখতে পাচ্ছিলাম না। শেষে চুল-টুল শুকিয়ে, কপালে কুঙ্কুম পরে, ভাবলাম তারা হয়তো আবার এই দিক দিয়েই ফিরে যাবে, তাহলে ব্যাপার কী তা জানতে পারব। এই আশা করে আমি দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু কই, কাউকে তো আসতে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার দুশ্চিন্তা প্রত্যেক নিমেষে বাড়ছিল। ঘটিকা প্রহরের মতো মনে হচ্ছিল। তবু, কেউ আসবে এই আশায় আমি তেমনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরে মাঈসাহেব কী বলবেন, কী বকবেন সে ভাবনা এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনে ছিল না। শেষে একেবারে নিরাশ হলাম। ঠিক সেই সময়ে মাঈসাহেব চেঁচিয়ে ডাকলেন, তখন নিরুপায় হয়ে আমাকে ভিতরে যেতে হল। আমি ঘরে গেলাম, কিন্তু আমার মন দুর্গীর কাছে ছিল। কোনো রকমে খেয়ে-দেয়ে আমি দুপুর পর্যন্ত কাটালাম, কিন্তু তারপর একেবারে থাকতেই পারলাম না। তখন যা হবার তা হোক, মাঈ-

সাহেব বকলে বকুন ভেবে, আমি তাঁর কাছে দুর্গীর বাড়ি যাবার অনুমতি চাইলাম। তিনিও, কেন, কী কাজ, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন, এবং যখন সকালের সব ঘটনা বললাম তখন কপাল কুঁচকে, "হ্যাঁ যাও, তোমার কর্তা তো তুমি নিজেই!" এই বলে অনুমতি দিলেন। সে-সময়টা অন্য কিছু ভাববার মতো ছিল না। মুখের কথাটা ধরে নিয়ে—সে-কথা যে ভাবেই বেরিয়ে থাকুক না কেন—আমি মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি তো খুব ছোট ছিলাম না, বয়সে মাঈসাহেবের প্রায় সমানই ছিলাম। কিন্তু তিনি বয়োজ্যেষ্ঠার ভান করতেন, সেইটাই ছিল বাড়াবাড়ির ব্যাপার। তা ছাড়া, "রোজ মরে, তার জন্য কাঁদে কে?"[১] সেই অবস্থা ছিল। তিনি সব সময়েই খোঁচা দিয়ে কথা বলতেন, তাই "এক কানে শুনে অন্য কানে ছেড়ে দেওয়াই"[২] ভালো মনে হত। এই রকম অনেক কিছু ভেবে, আর দুর্গীর জন্য মন কেমন করছিল তাই আমি সটান বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় অনেক দুশ্চিন্তা মাথায় আসছিল। "মন যত দুশ্চিন্তা করে, শত্রুও তত করে না"[৩] এই প্রবাদের অর্থ তখন আমি ঠিক যেন বুঝতে পেরেছিলাম।

যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পা ফেলতে ফেলতে আমি দুর্গীর বাড়ি পৌঁছে দেখি যে তাদের দরজা বন্ধ। সব দিক কেমন যেন স্তব্ধ মনে হচ্ছিল। আমার বুক কেমন বিষম কেঁপে উঠল। এ কী ব্যাপার? তাঁরা সেই যে গেলেন, এখনো ফিরে আসেননি! নিশ্চয় তবে তাঁরা দুর্গীর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছেন। নিশ্চয় তার স্বামীর কিছু ভালোমন্দ হয়েছে এই আমার বিশ্বাস হল। আর মনের অবস্থা এমন সাংঘাতিক হল যে, দরজার উপর হাত রেখে আমি অনেকক্ষণ অমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। শহরে বেশ রোদ ছিল, আমার সেই বেশ। আঁচল খসে পড়েছে, এলোমেলো চুল, কোনোরকমে খোঁপা বাঁধা, কেউ যদি তখন আমায় দেখে থাকে, তবে সত্যি, আমাকে পাগলী ভেবে থাকবে। কিন্তু আমি কী করব? আমার যে সত্যি পাগলের মতো অবস্থা হয়েছিল। আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। ডাকব কী করে? বাড়ীতে যদি গণ্ডগোল হয়ে থাকে তবে সাড়া দেবে কে? আর ডাকব কাকে? শেষে দরজার খিল ধরে জোরে বাজিয়ে আমি "বহিনা-

১ একটি মারাঠি প্রবাদ—অর্থ বেশ স্পষ্ট।
২ এটিও একটি মারাঠি প্রবাদ—এর মানেও স্পষ্ট।
৩ একটি মারাঠি প্রবাদ—এর মানে বেশ স্পষ্ট।

কাকীমা ও বহিনা কাকীমা" বলে চেঁচিয়ে ডাকলাম। তখন দুর্গীর ছোট ভাই এসে দুয়ার খুলল। তাকে দেখেই আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোর বাবা কোথায়?" তখন অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে চেয়ে সে বলল, "কেন? এই এক্ষুনি বাইরে গেছেন।" "এক্ষুনি" এই শব্দটা শোনামাত্র আবার আমার বুক কাঁপতে লাগল, আর আমি ছুটে ভিতরে গেলাম। ভিতরে যাওয়ামাত্র যে ছবি দেখতে পেলাম তা দেখে আবার আমার বুক কেঁপে উঠল। দুর্গী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছিল। তার চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়েছিল, আর সে হাউ হাউ করে কাঁদছিল। তার ঠাকুমা পাশে বসে, "ওঠো মা, ওঠো। যা হবার তা হয়েছে।" বলে নিজে কাঁদো-কাঁদো মুখ করে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তার মাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। তখন আমি ঠিক ভাবলাম যে, যত সব ভয়ংকর দুশ্চিন্তা আমার মনে হয়েছিল সে-সব নিশ্চয় সত্যি। অমনি আমার বুক ধড় ফড় করতে লাগল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে কিছু বলতে যাব, এমন সময় দুর্গীর ছোট ভাই চেঁচিয়ে বলল, "ঠাকুমা, ও ঠাকুমা, দেখো, যমুদিদি এসেছে।" অমনি বেচারী বুড়ী মুখ তুলে দেখলেন, আর কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "মা যমু, আজ ভগবানই দয়া করেছেন! দুর্গীর সিঁদুর—" তার পরের কথা তিনি বলতেই পারছিলেন না। কিন্তু, কী বলব? তাঁর সেই অর্ধেক কথা শুনেও আমার মন কেমন শান্ত হল, মনে হল যেন মাথার উপরের মস্ত বড় বোঝা নেবে গেল। আমি দুর্গীর কাছে গেলাম, তাকে উঠিয়ে, জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "দুর্গী, কি হয়েছে? কী হয়েছে ভাই? আমায় বলবিনে? দেখ, সকাল থেকে আমার গলা কেমন শুকিয়ে গেছে। বল না কী হয়েছে।" তখন কাঁদতে কাঁদতেই দুর্গী বলল, "যমু, আজ তুই আমাকে এরকম দেখতে পাচ্ছিস, এটা বড় ভাগ্যের কথা ভাই। আমার কপাল আজ ভাঙতে বসেছিল, কিন্তু বেঁচে গেছি!"—এই কথা তার মুখ দিয়ে এমন করুণভাবে বেরোচ্ছিল যে, তা শুনে যমের পর্যন্ত দয়া হত। এমন অবস্থায় আমার মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর প্রাণ যদি আকুল হয়ে থাকে তবে তাতে আশ্চর্য কী!

আমি দুর্গীকে সান্ত্বনা দিয়ে তার কাছ থেকে কিছু জানবার চেষ্টা করছিলাম, এমন সময় দুর্গীর মা, হাতে পূজার সম্ভার নিয়ে বাইরে থেকে

এলেন। এত বেলায়—বোধ হয় ছুটো বেজে গিয়েছিল—তিনি কোথায় দেবমন্দিরে গিয়েছিলেন দেখে আমার আশ্চর্য মনে হল। কিন্তু যখন জানতে পেলাম যে, সকালের সঙ্কটনিবারণ হওয়ার জন্য তিনি মানত করেছিলেন, আর সেই পুজো দিতে যোগেশ্বরীর[১] মন্দিরে গিয়েছিলেন—তখন তা আমার ঠিক উচিত মনে হল। তখনো পর্যন্ত তাঁদের খাওয়াদাওয়া হয়নি। দুর্গীর বাবা নাকি না খেয়েই আপিসে গিয়েছিলেন। দুর্গীর মা এলে, তিনি, আমি, আর ঠাকুমা তিনজনে মিলে 'বাছা, মাণিক' করে সান্ত্বনা দিয়ে, গা ধুইয়ে দিয়ে দুর্গীকে খাইয়ে দিলাম। সকলের খাওয়াদাওয়ার অবসরে সকালের ব্যাপারটা অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম। আর সকলের মতো আমিও বলতে পারলাম যে দুর্গীর হাতের বালা-চুড়ির জোর ছিল তাই আজ তার আপদ আসান হল!

সত্যি, যদি সে বেটাছেলে আত্মহত্যা করে বসত, তা হলে কী উপায় ছিল? মেয়েটা জন্মের মতো কোণঠাসা হয়ে থাকত। তার জীবন তো আগেই উজাড় হয়ে গিয়েছিল, তাতে সিঁথির সিঁদুরটুকুও গেলে কী থাকত! কিন্তু ব্যাপারটা অতদূর গড়াতে দিতে ভগবানের ইচ্ছে ছিল না, এই যথেষ্ট!

দুর্গীর বরের মতো মানুষ অন্য আর কী করবে? হতভাগা কোথায় কার বাড়ি থেকে নাকি চল্লিশ না পঞ্চাশ টাকা চুরি করেছিল, সে কীর্তিটা বেরিয়ে পড়ল! যার টাকা চুরি করেছিল সে তাকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে চলল, তখন সেই টাকা ফেরৎ দেবার জন্য লক্ষ্মীছাড়া মাকে জালাতন করতে লাগল। প্রথমে তিনি তার কথা বিশ্বাস না করে বকতে লাগলেন, চেঁচামেচি গালাগালি করতে লাগলেন। হতভাগা তখন হন্ হন্ করে গিয়ে পাতকুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন সকাল সাতটা। এমন সংবাদ কি চাপা থাকে? অমনি কে যেন গিয়ে দুর্গীদের বাড়ি খবর দিল। তাও আবার সকলের সামনে। তখন তার বাবা, মা, আর কারো মানা না শুনে দুর্গী নিজে, তিনজনে মিলে সে-বাড়ি গেলেন। কিন্তু ভাগ্যে দুর্গীর বর বেশ ভালো সাঁতার কাটতে পারত, তাই সে জলে ডুবে না গিয়ে, জলের উপরেই সাঁতার কাটছিল। তার মা, বাবা আর পাড়া-প্রতিবেশীদের মুখ কিন্তু শুকিয়ে গেল। সকলে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করল। শাশুড়ী

১ পুণার একটি বিখ্যাত মন্দির।

আর স্ত্রী ছুটে এল, তারা ভয়ানক কাণ্ড বাধিয়ে দিল। তাকে কুয়োর বাইরে টেনে তুলে বার করবার জন্য দড়া নাবানো হল, কিন্তু সে দড়া ধরে উপরে আসতেই চাইছিল না। শেষে ধমক-টমক দিয়ে, একটু আদর করে, তবে তাকে কুয়োর বাইরে টেনে তুলে আনা সম্ভব হল। "চুরির ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলছি বাবা," বলে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে দুর্গীর বাড়ির সকলে ফিরে এলেন।

সেই সময়ে বাড়ীতে বেচারী বুড়ি, আর পথ চলতে চলতে দুর্গীর মা না-জানি কত মানত করেছিলেন! কী করবেন! পেটের মেয়ে দিয়ে তাঁরা যে তার আর নিজেদের গলায় জন্মের মতো দড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদেরই বা কী দোষ! কসাই ছাগল হাতে পেয়ে তার গলার উপরে সর্বক্ষণ ছোরা ধরে বসলে, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? বেচারী দুর্গীর অবস্থা সত্যি সেই নিষ্ঠুরের হাতে বন্দিনী হরিণীর মতো হয়েছিল! লক্ষ্মীছাড়া—কী করি? কলম দিয়ে এরকম গালি আপনি বেরিয়ে পড়ছে—আটকাতে পারছিনে, আর সত্যি বলতে গেলে সেগুলি না লিখে মন শান্তও হতে পারেনা, তাই যাক সে গালিগুলি এখানে অমনি!—সে লক্ষ্মীছাড়া, ছুঁচোর ব্যাটা, দুর্গীর সারা জীবনটা যে একেবারে কালি করে ফেলেছিল!

সেদিন আমি একেবারে নিরুপায় হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু আমার মন দুর্গীর ওখানে পড়ে ছিল। সমবয়সী, একনিষ্ঠ প্রাণের বন্ধুর সারাজীবন কালি হয়েছে দেখে কার হৃদয় না কাঁদবে? আমি তাকে ছেড়ে যখন বাড়ি আসছিলাম, তখন সেখানে থাকবার জন্য কত অনুরোধ সে আমাকে করল। সে বলল, "যমু, তুই ভাই আর বেশী দিন আমাকে দেখতে পাবিনে। তুই তো আর ক'দিন পরে বোম্বাই চললি, তারপরে এখানে আমার ভালোমন্দ কিছু হলে তোর সঙ্গে দেখা কি আর হবে? থাক না ভাই আজ একটা দিন এখানে। রাত্তিরে দু'জনে কথাবার্তা বলব। যমু ভাই, সত্যি তোকে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে—" এ'রকম কত কথা সে বলল। তার সে-সব করুণ কথা শুনে আমারও কতবার ইচ্ছে করল যে আজকের মতো রাত্তিরে থাকি এইখানেই। কিন্তু উপায় কী? 'পরাধীন জীবন, আর পুস্তকী বিদ্যা' সেই অবস্থা! একটি রাতও থাকার কি আমার স্বাধীনতা ছিল? শুধু তাই কেন? কোনো কাজ করতেই আমি স্বাধীন

ছিলাম না। আমার ভয় করছিল যে, দুপুর বেলা থেকে আমি এসে রয়েছি বলে মাঈ সাহেব না জানি কত চেঁচামিচি করবেন! সেদিন দুর্গীকে বুঝিয়ে বলা বড় কঠিন ছিল। আমি কতবার তাকে বললাম যে, আমাকে আজ ফিরে যেতেই হবে, কিন্তু সে বুঝতেই চাইছিল না। সে বলছিল, "যমু, তোর আবার কীসের ভয়? তুই এখন স্বাধীন হয়েছিস। জানিস, তুই এখন যা খুশি করলেও তোকে কেউ কিছু বলবে না। যমু, যাই কর ভাই, কিন্তু আজকের মতো থেকে যা এখানে। কী জানি কেন, আমার মনে হচ্ছে যে তোতে-আমাতে আর দেখা হবে না।"

সে যখন একবার দুবার, তিনবার সে-কথা বলল, তখন আমার মনের অবস্থা কী হল তা আমিই জানি! কিন্তু সে-সব চিন্তা চেপে রেখে, মন শক্ত করে আমি সেখান থেকে চলে এলাম। তবু, আমার মন দুর্গীর অবস্থার চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, — এই মেয়েটার সমস্ত জীবন কাটবে কী করে? ভবিষ্যৎ কালে ওর দশা কী হবে? বাপের বাড়ি কিংবা শ্বশুর বাড়িতে ও কি কারো ওপরে নির্ভর করতে পারবে? আমরা মেয়েরা বলি যে, এক স্বামী ঠিক না থাকলে সারাজীবন অনর্থক হয়, সে-কথা কি অল্প একটুও মিথ্যে? এই রকম অনেক প্রশ্ন আমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েছিল। সে ভাবনায় আমি ভালো করে রাস্তায় দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি যেমন তেমন করে বাড়ি পৌঁছলাম। আমার সেই দিনই শ্বশুরবাড়ি যাবার ইচ্ছা ছিল। কেননা গত দু'তিন দিনে আমার বড় কষ্ট হয়েছিল। বৌদির সঙ্গে আমার ভাব হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। মাঈসাহেবের কথা তো বলারই জো নেই। এক দাদার সঙ্গেই যা কথা বলা। কিন্তু সেও নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। তাছাড়া, আমি চতুর্থ দিন নিশ্চয় আসব বলে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেরি হয়ে গিয়েছিল, এরপর মাঈসাহেবের অনুমতি পেয়ে যাওয়া কঠিন ছিল।

শ্বশুরবাড়িতে সবাই কী বলবে সে-ভাবনাও ছিল। এই রকম অনেক চিন্তা মাথায় জটলা করছিল, শেষ পর্যন্ত সে-দিন আমি ও বাড়িতে গেলামই না। দুর্গীর চিন্তায় মনও ব্যাকুল ছিল, তাই যাবার ততটা উৎকণ্ঠাও মনে ছিল না।

মনের ধর্ম এই যে, তার চিন্তা, তা সে দুঃখের হোক বা সুখের হোক, খুব বেশি হলে কারো কাছে তা খুলে বললে মন শান্ত হয়। এ অভিজ্ঞতা

সকলেরই আছে যে যার সঙ্গে বেশী ভাব, তাকে সুখের চিন্তা বললে সুখ বেড়ে দ্বিগুণ হয়, আর দুঃখের কথা বললে দুঃখ হালকা হয়। কারো না কারো কাছে নিজের চিন্তা প্রকাশ না করে থাকাই যায় না। নিজের মন খুলে কথা বলবার মতো যদি তেমন প্রেমের মানুষ কেউ কাছে না থাকে তাহলে কোনো অল্প-পরিচিত সঙ্গীর কাছেও মনের কথা বলে দুঃখ হালকা করতে ইচ্ছে করে। তবে দাদার মতো আপন মানুষ কাছে থাকতে আমি আমার সব চিন্তা তাকে না বলে কি থাকতে পারি? সকাল থেকে যা-যা হয়েছিল সে সব আমি দাদাকে ঘুমোবার আগে বললাম। আমার কথা শুনতে শুনতে কতবার দাদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল! শেষে আমি তাকে সহজ ভাবে বললাম, "দাদা, আমরা যখন প্রথম তাদের বাড়ি থাকতে এলাম এই দুর্গীই তখন কেমন দেখতে ছিল, মনে আছে? এখন আর তার কিছু বাকি রয়েছে?" আমার কথা শুনে দাদা চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'যমু, মোরগের গলায় মুক্তোর মালা, এই হচ্ছে জগতের রীতি, জানো? এই দুর্গীই যদি আর কারো—"এই বলে সে থামল, আর হঠাৎ বলল, "যমু, তিন-তিনবার সে তোমাকে বলল, 'আর তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে মনে হচ্ছে না', তার মানে কী? তার মানে, দুর্গীর মনে কোনো ভয়ংকর সংকল্প—"

"ভয়ংকর সংকল্প? মানে?" আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম।

"ভয়ংকর সংকল্প মানে আত্মহত্যা! এরকম যন্ত্রণায় যারা ভয়ানক বিরক্ত হয়, সে মেয়েরা কখন কি করবে তার ঠিক থাকে না, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"দূর ছাই! দাদা, সে কি কথা? আমার মোটেই মনে হচ্ছে না যে দুর্গী কখনো আত্মহত্যা করবে।"

"না, ভাবছি যে তুমি বললে, তিন-তিনটিবার সে তোমাকে বলেছিল, 'তোতে আমাতে আর কি দেখা হবে? তোর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবার কোনো আশা নেই—' "

তখন আমি দাদাকে বুঝিয়ে বললাম যে, তার সে আশঙ্কা অমূলক। দুর্গীর কথায় সে রকম ভাব ছিল না। তার প্রসবকালের ভয়ে সে ঐ কথা বলেছিল। প্রসবকাল হচ্ছে একটা প্রাণের সংকট, তাতে দুর্গীর যে রকম স্বাস্থ্য, ছোট বয়স, এত সব দুঃখ নিরাশা, তাই তার ভয় করছিল,

এই। এত কথা আমি দাদাকে বললাম, কিন্তু আমার মন আমাকে দৃঢ়ভাবে বলছিল না যে অঘটন কিছু নিশ্চয় ঘটবেনা। প্রথমে আমার মনে তেমন আশঙ্কা ছিল না, দাদা যখন সে-ভয় প্রকাশ করল আমার মনেও ভয় ঢুকল। তার পরে সে-ভয় আমাকে যেন পেয়ে বসল। সেই নিরাশার কথা বলতে গিয়ে তার চেহারা কি রকম হয়েছিল, আমার চোখের সামনে তা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর মনে হতে লাগল যে সেই চেহারাতে ও-রকম চিন্তার আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! যত বেশী ভাবতে লাগলাম, তত সে ভয়ের কারণটা সম্ভব মনে হতে লাগল। সকালে স্বামী পাতকুয়োতে ঝাঁপ দিয়েছিল, তখন যদি সে মারা যেত, তাহলে নিজের মুখ কালি করে অন্ধকারে বসতে হোত তো? তেমন অবস্থায় দুর্গতির সীমা থাকত না? কী রকম অবস্থা হোত? কারো সামনে যাবারও কি মুখ থাকত? শ্বশুরবাড়ির লোকে কি তখন এক মুহূর্তও আশ্রয় দিত? সারাজীবন অন্ধকারেই মুখ গুঁজে কাটাতে হত। আজ স্বামী যেমন-তেমন হলেও, উজ্জ্বল মুখ নিয়ে যেখানে খুশি যেতে পারা যায়। এয়োপনা তো বজায় থাকে? আজ স্বামীর ভালোমন্দ যদি কিছু হত, তাহলে কোথায় উজ্জ্বল মুখ আর কোথায় কী? তার চেয়ে নিজেই আগে আত্মহত্যা করলে মন্দ কি! সাম্প্রতিক দুঃখ থেকে হয়তো মুক্তি পাওয়া যাবে। আবার সে-রকম বিপদ হবেনা তারই বা ঠিক কি? যা একবার হয়েছে, তা যে দশবার হবে না কে বলতে পারে? আবার জেলে যাবার পালা কি সত্যি আসবে না? অমন একটা বদ অভ্যাস হলে কি সহজে যায়? এর পরে আর সুখের আশা কোথায়? এর চেয়ে বেশী কিছু খারাপ না হলেই যথেষ্ট! এই সব ভেবেচিন্তে দুর্গী সত্যি কোনো ভয়ানক সংকল্প করেনি তো? এই সব মনে হওয়ামাত্র দাদার কথা আমার বিশেষ সম্ভব মনে হতে লাগল। ভাবলাম যে নিশ্চয় তাই সত্যি। 'তোতে আমাতে আর কি কখনো দেখা হবে?' এই কথা সে দুতিন বার বলল, আর প্রত্যেকবার সে-কথা বলবার সময়ে—এখন আমার মনে হতে লাগল—দুর্গী ভয়ে ভয়ে এ-দিকে-ও-দিকে চেয়ে দেখছিল, কেউ লক্ষ্য করছে কি না। দুর্গী সত্যি সে-ভাবে দেখছিল কি না আমি নিশ্চয় জানিনা। কিন্তু দাদা যখন ও-কথা বলল তখন আমার সে রকম সন্দেহ হতে লাগল।

একের পরে এক চিন্তা মানুষের মনে এই ভাবে জন্মাতে থাকে। দুর্গীর অবস্থার সম্বন্ধে, তার আত্মহত্যার সংকল্প সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে, আমাদের অবস্থার সম্বন্ধেও কতো চিন্তা আমার মনে এল। ছেলেবেলার পরে বিয়ে হবে, বিয়ের পর ঘরকন্না, এই থেকে শুরু করে মারা যাওয়া পর্যন্ত নারীজীবন কত পরাধীন, কত কষ্টময়!

শুধু এই চিন্তা সে-দিন রাত্রে আমার মনে ছিল। মেয়েদের এ-অবস্থায়ও সব কিছু ভালো মিললে সুখ থাকে, একেবারেই যে সুখ থাকে না তা নয়। কিন্তু মোটামুটি সবদিক ভেবে দেখলে, সুখদুঃখের দাঁড়িপাল্লায় সুখের চেয়ে দুঃখ কষ্টের পাল্লাটাই বেশী নিচে ঝোঁকে, এই আমার সংস্কার আর অভিজ্ঞতা। আমাদের অজ্ঞতার ফলে, আর ছেলেবেলা থেকে মা, বাবা, পাড়া-প্রতিবেশী, শ্বশুর-শাশুড়ী আর স্বয়ং স্বামী পর্যন্ত আমাদের মনের উপরে যে পূর্ব-সংস্কারের স্তরের উপর স্তর স্থাপন করেন, তাতে আমরা ভাবি যে আমাদের এই অবস্থাই সুখের অবস্থা! পরাধীনতা, কষ্ট আর অজ্ঞতা এই হচ্ছে সত্যিকার সুখ, এই ধারণা যখন আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়, তখন অন্য কোনো শ্রেয়তর কল্পনা মনে উদয় হয় না। স্বাধীনতার আসল সুখ, জ্ঞানের সত্য মূল্য আমরা বুঝব কী করে? সার কথা, সে-দিন রাত্রে আমি ভাবলাম যে মোটামুটি আমাদের অবস্থা মন্দ নয়। মনের অবস্থা যখন যেমন থাকে, তখন তেমন ভাবনা হয়। সেই কারণে হয়তো আমি এরকম ভেবেছিলাম, কিন্তু ভেবেছিলাম এ কথা সত্য।

সেই ভাবনার পরে, আমার নিজের, দাদার, বৌদির, সকলের ভবিষ্যতের চিন্তা আমি করতে লাগলাম। দাদার আর বৌদির স্বভাবের মিল হবে কি করে? আর যদি মিল না হয়, তাহলে দাদার অবস্থা কি রকম হবে? তার এক রকম স্বভাব, আর বৌদির আর এক রকম! আবার মনে হল, হয়তো বৌদি এখন ওরকম করে, পরে করবে না। তার পরে আমার একটা ইংরিজি গল্পের একজন মহিলার কথা মনে পড়ল। কদিন আগে উনি সে গল্পটা বলেছিলেন। সেই মহিলার নাকি ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হয়েছিল। তারপরে আবার ভাবলাম যে "যেখানেই যাও পলাশ গাছে তিনটিই পাতা!"[১]

[১] একটি মারাঠি প্রবাদ—মানে সব জায়গায় সকলের একই সাধারণ অভিজ্ঞতা।

এ রকম বিভিন্ন চিন্তা করতে করতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

দ্বিতীয় দিন চানটান করে আমি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলাম। তবু আগের দিনের দুঃখময় চিন্তা আমাকে ছাড়তে চাইছিল না। দুর্গীর আত্মহত্যার আশঙ্কা বহু চেষ্টা করেও আমাকে ছাড়তে চাইছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল যে এই বুঝি কেউ খবর দিতে আসবে যে দুর্গী মারা গেছে। সে আফিং খেয়েছে, নইলে পাতকুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আমাকে বোধহয় এই জন্য সে থাকতে অনুরোধ করেছিল যে একবার শেষের মতো আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলবে! আমার মনের অবস্থা কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে গিয়েছিল।

ওঁর পরীক্ষা

আজ বোম্বায়ে পরীক্ষার ফল বেরুবার কথা ছিল, তাই বুক দুরু দুরু করছিল। আমার শ্বশুরবাড়ি ফেরা অবধি সে-বাড়ির সকলে সেই বিষয়েই কথা বলছিল, তাই আমার আগেকার ভাবনা অদৃশ্য হয়ে পরীক্ষার ফলের জন্য মন অধীর হয়ে উঠল। দাদা আমাকে নিশ্চিতরূপে বলেছিল যে উনি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করবেন, কিন্তু কি জানি কি হবে! সুখের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকলে, কোনো সন্দেহ না থাকলেও মন মানতে চায় না। নানারকম আশঙ্কা এসে মন জুড়ে বসে। তার উপর আবার ওঁর সেই ফলের উপর আমাদের বোম্বাই যাওয়া নির্ভর করছিল। সুতরাং সেই ফলের অপেক্ষা করে বুক দুরু দুরু করবে আর মন অস্বস্তি বোধ করবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

সুখ আর দুঃখ কেমন যেন পালা করে একের পর এক আসতে থাকে। দুর্গার সেরকম অবস্থা দেখে আমার মন একেবারে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মানুষের মন বড় স্বার্থপর। তাই, আমি আমার নিজের অবস্থার বিষয়ে, ওঁর পরীক্ষার ফলের জন্য, উতলা হয়েছিলাম, একথা আমি বলছি। সে-দিন সন্ধ্যাবেলা ফল বেরোবার কথা ছিল, তাই কখন সন্ধ্যা হবে, আর কখন প্রথম শ্রেণীতে পাশ এই কথাগুলি শুনতে পাব, এই ভেবে আমি উতলা হয়েছিলাম। বাস্তবিক কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করত যে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা মানে কী, আর শুধু পাশ করা মানে কী, তাহলে আমি শুধু বলতে পারতাম যে, প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা মানে আমাদের বোম্বাই যাওয়া, আর শুধু পাশ করা মানে আমাদের বোম্বাই না যাওয়া; এর চেয়ে বেশী আমি কিছু বলতে পারতাম না। পরীক্ষা মানে চাকরির ভালো একটা পথ, এই ছিল আমার কল্পনা। পরীক্ষার সঙ্গে পাণ্ডিত্য বা জ্ঞানের সম্বন্ধ থাকতে পারে সে কথা বুঝব কী করে? কেবল আমারই সে রকম অবস্থা ছিল না; আজকাল বহু লোক তাই মনে করে, বলতে কোনো দোষ

নেই। পরীক্ষা পাশ করা, পড়াশোনা করা মানে চাকরি পাওয়া; এই অর্থ যার-তার কথায় থাকে। এই অর্থ সত্য না ভালো তার চর্চা করা আমার অধিকারের বাইরে, তাই আমি চুপ করে থাকছি।

দিদিশাশুড়ী আর ছোট মামীশাশুড়ী দু'জনে ওঁকে আর আমার শাশুড়ীকে ঠাট্টা করছিলেন। একজন বললেন, "এবার বোম্বাই যাবে বুঝি? আমাদের ডাকবে সেখানে? আসছে গ্রহণের সময় সমুদ্রস্নান করতে যাবার আমার ভারি ইচ্ছে।" আর অমনি দ্বিতীয় জন বললেন, "ওখানে গিয়ে আপনার কাজ কী? শুধু শুধু মেয়ের বাড়ি যেতে নেই।" গোপাল ঠাকুর হঠাৎ বললেন, "আমি বাপু তেমন মনে করি না। ওরা বোম্বাই গেলে আমি দু'চারবার যাব, আর ওর বাড়িতেই উঠব।" শংকর ঠাকুর বললেন, "আমরা কি ওর বাবাকে ভয় করি সেখানে যেতে! আমি যখন-তখন ওখানে যাব।" এই রকমে সবাই ইচ্ছামতো আমাদের ঠাট্টা করছিলেন। শুধু উমা শাশুড়ী কিছু বলেননি। কোনো কথায় কিছু বলা তাঁর স্বভাবে ছিল না। কী করে কিছু বলবেন বেচারী? কাজকর্ম করেই তাঁর হাড় গুঁড়ো হত। তা ছাড়া, গোপাল ঠাকুর আর আমরা দু'জন ছাড়া তাঁকে কেউ দেখতেও পারত না। এমনকি, তাঁর ছেলেমেয়ে পর্যন্ত তাঁকে যা খুশি বকত এইরকম অবস্থা ছিল। ঠাট্টা-তামাশা, কৌতুক, রসিকতা, এ সমস্ত মনের সুখের অবস্থায় সয়। মন ঠিক না থাকলে ঠাট্টা-তামাশা কিংবা কৌতুক কিছুই ভালো লাগে না। বনু ঠাকুরঝি আর বাড়ির অন্য সব ছোটদের ঠাট্টা ছিল শংকর ঠাকুরের ঠাট্টা-জাতীয়। একটা বিচ্ছিরি কথা বলে, আর ঠ্যাং তুলে দেখিয়ে কেউ বলত, "আমাদের পায়ের জুতো আটকাচ্ছে[১] তোমাদের ওখানে যেতে। তোমাদের অত দেখনাই চাই না।" কেউ বলল, "বৌদি, তোমার অত দেমাক চাইনে। আমরা আসব না গো তোমাদের বাড়ি! এখন থেকে তোমার অত ভয় করতে হবে না।" এই রকম যা মুখে আসে তাই তাঁরা বকছিলেন। কী বলা উচিত, তার মর্যাদাবোধ তাঁদের মোটেই ছিল না।

এই ভাবে যে-যার স্বভাবমতো হাসি-তামাশা, কৌতুক, রসিকতা করতে করতে সন্ধ্যা হল। আমার উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল। অবিলম্বে

১ একটি মারাঠি প্রবাদ, এর মানে 'ক্ষয়ে গেছে'।

ফল জানতে পারব, সেটা যেন মনের মতো হয়, তাই আমি মানত করলাম যে বোম্বাই গিয়ে সব স্থির স্থায়ী হল পরে, সত্যনারায়ণকে পূজা দেব! এই মানতে আমার মনের সব ভাব ব্যক্ত হয়েছে। আমি কোনো কাজই করতে পারছিলাম না। থেকে থেকে আড়নয়নে ওঁর দিকে চেয়ে দেখছিলাম ওঁর মুখেও উৎকণ্ঠা ফুটছে। আমিই যখন অত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম, তখন উনি হয়ে থাকলে তাতে আশ্চর্য কিসের? বোম্বাই থেকে একজন বন্ধুর 'তার' আসার কথা ছিল। উনি যদিও কিছু ভাবছিলেন না, তবু আমি শুধু ভাবছিলাম যে "ঐ বুঝি তার এল!" আমি শুধু দোরের দিকে চেয়ে বসেছিলাম। কারো হয়তো আমার লেখা পড়ে হাসি পাবে, কিন্তু সত্যি আমার দু-তিনবার মনে হল যে কে যেন ওঁর পুরো নাম ধরে ডাকছে। তারওয়ালা কী রকম করে ডাকে তা আমি দু-একবার প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম, তাই আমার মনে হল তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই! ন'টা বাজল, তবুও তারওয়ালার কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম না। তখন আমি একেবারে হতাশ হলাম। দশটা বাজল, [illegible] কিছু এল না। শেষে ওঁর মনও বিচলিত হতে লাগল। সকলেই কেমন যেন অদ্ভুত মনে করতে লাগল। এখন আর বোধ হয় 'তার' আসছে না ভেবে সবাই নিরাশ হয়ে বসল। ওঁর ঘরে গিয়ে "এ কী!" জিজ্ঞাসা করতে আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল। শেষে সাড়ে দশটা বাজল। এমন সময় ওঁর নামের একজন ছাত্র 'তার' এসেছে কি না দেখতে এল। সেও পরীক্ষা দিতে বোম্বাই গিয়েছিল। তারও ওই রকম 'তার' আসার কথা ছিল। কিন্তু সে নাকি মাঝারি ধরনের ছাত্র ছিল। ইনি নিশ্চয় পাশ করবেন তাই এঁর 'তার' এসেছে কিনা তাই দেখতে সে এসেছিল। ওঁরা দু'জনে কথা বলছিলেন, এমন সময় আরও একজন ছাত্র এল, আর "চল অমুক জায়গায় যাই, সেখানে নিশ্চয় জানতে পাব," এই বলে তাঁদের কোথায় যেন যেতে অনুরোধ করতে লাগল। আমি একাগ্রচিত্ত হয়ে তাদের কথা শুনছিলাম। "আমি জামা পরে আসছি" বলে উনি ঘরের ভিতরে এলেন। তখন কি আর আমি থাকতে পারি? "এখনো খবর আসেনি?" আমি পাগলের মত জিজ্ঞাসা করলাম; কিন্তু ওঁর আমার দিকে ততটা লক্ষ্য ছিল না, তাই, "তুমি ঘুমোও, আমি একটু বাইরে গিয়ে দেখে আসছি," এই বলে, আমি কিছু বলার আগেই বেরিয়ে গেলেন।

সে সময় আমার মনের অবস্থা কী রকম হয়েছিল তা যে-কেউ নিজে কল্পনা করে দেখতে পারে। একেই আমার মন বড় সংশয়বাদী, তাতে সংশয়ের কোনো কারণ ঘটলেই হয়েছে! আমার প্রাণ কেমন যেন ছটফট করতে লাগল। আমি বিছানায় পড়ে ছিলাম, কিন্তু আমার চিত্ত ওঁর আর দাদার উদ্দেশ্যে ছিল। হঠাৎ একবার মনে হল যে তারওলা বুঝি ডাকছে। সে কী রকম ডাকে তা আমি বেশ জানতাম। তাই সে-রকম ডাক যেন আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। দু-একবার সত্যি আমি দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে শুনলাম, তারপর আমার নিজেরই হাসি পেল। ভাবলাম এ কী পাগলামী? 'তার' যদি সত্যি আসে, তাহলে রাস্তার দিকের উপরের ঘরে ঠাকুর আছেনই তো। আর যদি নাই থাকেন, তাহলে আমি গিয়ে 'তারটা' নিতে তো পারব না। এ-সব সত্যি, কিন্তু মনের যা ধর্ম, তেমন আচরণ না করে কি থাকতে পারে? যত দেরি হতে লাগল তত আমার মন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেতে আরম্ভ করল। আমার মনে হচ্ছে যে দুখী মানুষের কপালে এই রকমই হয়ে থাকে। কোনো কিছুর ভালো দিকটা যেন সে দেখতে পায়না। আমার তখন ঠিক মনে হল যে প্রথম শ্রেণীও নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীও নয়, উনি বোধহয় পরীক্ষাটা পাশও করেননি। ঘড়িতে ঠন্ ঠন্ করে বারোটা বাজল, তবুও যখন তারওয়ালা এল না, তখন ভাবলাম যে উনি বোধহয় 'পরীক্ষা পাশ যখন করিনি, তখন আর শীগগির বাড়ি গিয়ে কী দরকার' মনে করে বাইরেই কোথাও বসে আছেন। এই কথা আমার কানে গুণ গুণ করতে লাগল। আর অমনি, বোম্বাই গেলে পরে যা-যা করব ঠিক করেছিলাম, সে-সব মনোরথগুলি বিরাট অট্টালিকার মতো ধুপ-ধাপ করে যেন ভুঁয়ে ভেঙে পড়তে লাগল। মনোরচিত সে-অট্টালিকার প্রত্যেক তলা ধ্বংস হবার সময় মনে বিষম ধাক্কা খেতে লাগলাম।

আমি শুধু নানা রকমের দুর্ভাবনা করে মনকে কষ্ট দিচ্ছিলাম।—এখন আর বরাতে বোম্বাই নেই তো! আর এক বছর এমনি করেই অপরদের উপর নির্ভর করে তাদের খোঁচা-মারা, পচা, বিচ্ছিরি, কথা সহ্য করে কাটাতে হবে তো? উনি ফেল করেছেন, তখন সকলে আরও বেশী মর্মান্তিক কথা বলে জ্বালাতন করবে। 'বোম্বাই যাবার জন্য কেমন লাফিয়ে উঠেছিল, নাও এখন বোম্বাই! ও ভাবছিল যে ও এখন লায়েক!' এইরকম,

এর চেয়েও বেশী খোঁচানো কথা যেন আমি কানে শুনতে লাগলাম। উনি কী ভাববেন? আরও এক বছর অন্যের উপরে নির্ভর করে, পরের খরচে কলেজে পড়তে হবে!—ইত্যাদি ভেবে ওঁর কত কষ্ট হবে? আমার এই সব মনে হল! আমি শুধু নিজের ভাবনাই ভাবছিলাম। শুধু তাই নয়, অল্পক্ষণেই আমার চোখ বেয়ে ঝরনা বইতে লাগল। আমি শুয়ে শুয়ে উঁ উঁ করতে লাগলাম।

তারপর আন্দাজ আধ ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আমার চোখে ঘুম এল। চোখ বুজব এমন সময় মনে হল কে যেন এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বলছে, "বাঃ! একেবারে যে নিঝুম ঘুম দেখছি! পরীক্ষার চিন্তা-টিন্তা কিছু আছে?" অমনি আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে এদিকে-সেদিকে চেয়ে দেখতেই দেখতে পেলাম—অন্য আর কে? অমনি উৎকণ্ঠিতভাবে তাড়াতাড়ি বললাম, "কী হল? কিছু জানলে?" তখন হাসতে হাসতে উনি বললেন, "কী আর হবে? 'তার' যখন আসেনি তখন কী হয়েছে তা বুঝতে পারলে না?" কিন্তু আমি এমন পাগল যে অন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওঁর সে-হাসি আমি মোটেই লক্ষ্য করিনি। শুধু কথাই শুনেছিলাম, আর অমনি "হুঁ!" করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

তাই দেখে উনি বললেন, "বাঃ! একেবারে এত নিরাশ হলে? আহা! পাগলি কোথাকার! ওঠো, আগে আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও দেখি। আমার সঙ্গে বোম্বাই যাবে তো তুমি? ওঠ, ওঠ, কাল সকালে আমরা যাব, চল।" সে-কথা শুনে আমার মনের অবস্থা কী রকম হল, তা কি কেউ বুঝবে? আমি কিছুই ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন মনে করে আমি কিছুই বললাম না। তখন, "বেশ বাবা, তুমি যদি যেতে না-ই চাও তা হলে—আমি একলাই যাব, কাউকে কি জোর করা চলে?" এই বলে উনি উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন। তখন আমার একটু সাহস হল আর সত্যি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। মন বড় উতলা হয়ে উঠল। কিন্তু যেমন কর্ম তেমন ফল ভেবে আমি আরও গুম্ হয়ে বসে রইলাম। কিন্তু সাজানো ভাব আর কতক্ষণ টেঁকে? দু'চার মিনিট যেতে-না-যেতেই আমি ভালো করে উঠে বসে বললাম, "ঠাট্টা কোর না, সত্যি তার এসেছে? বলো না।"

"ওগো, তার যদি আসত, তাহলে এতক্ষণ তোমাকে না বলে কি

থাকতাম? তার যখন আসেনি, তখন যা হয়েছে তা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। এখন যেমন-তেমন একটা বন্দোবস্ত করে বোম্বাই যেতে হবে। তোমাকে বলেছিলাম যাই হোক না কেন তোমাকে বোম্বাই নিয়ে যাব, তাই ভাবছি পাঁচ-দশ টাকার একটা টিউশনি ধরে নিয়ে—কিন্তু সত্যি বলতে কি, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সুবিধা নেই জানো?"

"যাও, সব মিথ্যে। এরকম কথার মানেই আলাদা। আমি বুঝেছি। তার এসেছে।"

"তাই নাকি? তাহলে তো বেশ হয়েছে বাপু। দেখি কোথায় সেটা! তারটা আপনার নামেই এসেছে বুঝি? না আমার নামে এসেছিল, আর সেটা নিজের অধিকার-বলে খুললে? দাও, দাও দেখি তারখানা কোথায়?

"ও কী? আবার ঠাট্টা করছ? এত ঠাট্টা করে মানুষকে? অসময়ে ঠাট্টা সাজে না, জানো?"

"সত্যি নাকি? তবে কখন কখন ঠাট্টা করা সাজে তার একটা লিস্টি করে দাও দেখি আমায়।"

"দেব, বোম্বাই গেলে বেশ পণ্ডিত হয়ে, তবে দেব, হ্যাঁ! এখন তারটা কী এসেছে তাই আমায় বলো।"

"আমি বাপু পড়ব না, যদি চাও তো এটা নিয়ে পড়ে দেখতে পারো।" এই বলে আমার গায়ে একটা লালচে রংঙের 'তারের' খাম ছুঁড়ে দিলেন। অমনি আমার কত আনন্দ হল! এখন কি আবার সেই তারে কী লেখা ছিল তা স্পষ্ট জানবার দরকার ছিল? মোটেই না। কেন না, তাতে আর কী লেখা থাকবে? কিন্তু, নাঃ! মনটা কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? ভাবলাম সেটাতে কী লেখা আছে তা ওঁর মুখে শুনে তার অর্থ যখন বুঝে নেব তখনই মন শান্ত হবে। নইলে হবেই না। না, না! মন বড় অদ্ভুত! তারটা আমার গায়ে ছুড়ে দিলেন, সব হল; সেটা আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। তবু লাল খাম থেকে সেই সাদা কাগজখানা বার করে, খুলে ওঁর মুখের সামনে ধরলাম, আর "একটিবার আমায় পড়ে শোনাও" বলে তাঁর পিছনে গেলাম। তখন উনি "যার দরকার সে পড়ে দেখবে" বলে আমার হাতটা দূরে সরিয়ে দিলেন, আর আমি একটু গোঁ হয়ে বললাম, "আচ্ছা বেশ, অত ইয়ে করতে হবে না! বোম্বাই গিয়ে এত

পড়ব যে সব বইগুলো ওলটপালট করে ফেলব।"

"আহা! তার জন্য বোম্বাই যাওয়ার দরকার কী? এখনও তো তা করতে পারো। আর রোজ বিছানা পাতবার সময় কতকগুলো খোলা বই বোধহয় ওলটপালট তো করছই।"

"সত্যি, তুমি যা ঠাট্টা করো! এই কাগজের লেখা তুমি নিজের মুখে পড়ে না শোনালে আমি সন্তুষ্ট হব না। পড়ো না একটিবার।" এই বলে আমি বারবার কাগজটা ওঁর মুখের সামনে ধরলাম। শেষে কাগজটা আমার হাত থেকে নিয়ে আমাকে পড়ে শোনালেন। ইংরিজিতে 'ফার্স্ট ক্লাশ' এই শব্দটা উচ্চারণ-করামাত্র আমার গা শিউরে উঠল। একমুহূর্ত ভাবলাম, "আমি কি স্বপ্ন দেখছি!"

কিন্তু, এমন সময় আমার চিবুক ধরে বললেন, "হয়েছ খুশি?" তখন নিশ্চিতভাবে আমি বুঝলাম যে সে তারটা সত্যি; আমি জেগেই আছি, আমার সামনে উনি সত্যি বসে আছেন। আর এবার আমরা বোম্বাই যাব, তাও সত্যি। আর সেই সুখে আমি যেন ভেসে গেলাম!

বনুঠাকুরঝির ছটফটানি

এত আনন্দ যখন হল, তখন সে রাতটা কেমন কাটিয়েছি তার বর্ণনা কি দিতে হবে? আমি জানি যে অমনি যা-একটা উপমা দেওয়ার জন্য লোকে আমাকে দোষ দেবে, কিন্তু সত্যি উত্তররামচরিতের সেই কবিতাটি আমার মনে পড়ল। দু জনে কথাবার্তা বলতে বলতে রাতটা কখন যে পোহাল তা জানতেই পারিনি।

আহা! 'প্রহর কখন শেষ হল তা জানবার আগেই রাত পোহাল', এই বর্ণনাটি কী সুন্দর, আর কত সত্যি! সে রাত্রি আমাদের সুখের আরম্ভের প্রথম রাত্রি। সে রাত্তিরে কত কথা উনি আমায় বললেন। আমরা কত ধ্যান করলাম। বোম্বাই গিয়ে অমুক করব, অমুক পুস্তক পড়ব, ওঁর মনের যত ইচ্ছা ছিল সে-সব আমার কাছে আবার ঢেলে বললেন। আর সত্যি বলছি এতগুলি উদ্দেশ্য ওঁর মনে ছিল তা আমি কখনো ভাবিনি। আমার বিয়ে হওয়া অবধি আজ পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার কিংবা সংস্কারের বিষয়ে ওঁর মুখে একটি কথা পর্যন্ত আমি শুনিনি। ওঁর পছন্দ-অপছন্দ দাদাই আমাকে বলত। আর পরে আমার সঙ্গে যে-কথাবার্তা বলতেন তার তাৎপর্য বুঝে আমি ওঁর মতামত জানতে পেরেছিলাম। উনি এমন অনেক কাজের কথা বললেন, সে-কাজ আমাকে পরে করতে হবে বললেন, যে-সব কাজের কথা উনি এর আগে কখনো বলেন নি। আমাকে বললেন, "তুমিও এই পরীক্ষাটা পাশ করো।" সে-কথা শুনে আমার এত হাসি পেল যে তা বলতে পারছি না। আমি নম্রতা ছেড়ে প্রাণ খুলে হো হো করে হেসে উঠে বললাম, "আচ্ছা বেশ, তবে কাল থেকে কলেজ যাব?" আমি সত্যি সেটা ঠাট্টা ভেবেছিলাম। কিন্তু তার পরে যখন উনি আমায় বুঝিয়ে বললেন, তখনও আমার অদ্ভুত মনে হতে লাগল। কিন্তু আমি না হেসে চুপ করে ওঁর কথা শুনলাম। শুধু তাই নয়, কিছুক্ষণ পরে যখন আমাকে দু'একজন মহান বুদ্ধিমতী আর বিদুষী মহিলার গল্প বললেন তখন আমারও মনে হতে

লাগল যে আমি যদি ইংরিজী শিখতে পারি তবে কত ভালো হবে! আমাকে যখন গল্পের বই পড়তে দেখতেন, তখন উনি বলতেন, "ভালো বই কি পাওয়া যায়? তুমি শীগগির ইংরেজী শিখে ফেল, তাহলে রাতদিন পড়েও ফুলোবে না এত বই তোমায় এনে দেব।" ঠিক সেই কথা যখন আবার বললেন তখন আমারও স্ফূর্তি হল, আর মনে ইংরেজী শিখতে ইচ্ছা হতে লাগল। এমনি করে নানা রকম গল্প করতে করতে আর মনোরাজ্যে অনেক ঘুরতে ঘুরতে, রাত ফুরিয়ে ভোর হয়ে এল—পোহাল বললেও চলে। তখন, "এখন দুদণ্ড শান্ত হয়ে ঘুমোও" বলে আমি যেতে উদ্যত হলাম, কিন্তু আমাকে যেতে দেবে কে? শেষে একেবারে ফরসা হল। তখন অতিশয় অনুনয় করে বাইরে এলাম। আসবার সময় আমাকে কত আত্মসংবরণ করতে হল, তা কি কাউকে বলতে হবে?

আমি যে নিজের আনন্দেই যেতে ছিলাম তা নয়, রাত্রি জেগেছিলাম তাই চোখের অবস্থাও ভালো ছিল না। তাই যাবার সময়, একেবারে না জেনে, আমার একটা অপরাধ হয়ে গেল। যেখানে বধূঠাকুরঝি শুয়েছিলেন, সেই বিছানায় আমার পা পড়ল। অমনি উঠে তিনি একেবারে তেড়ে এসে বললেন, "তোর বর পরীক্ষায় পাশ করল না তুই নিজে বড় বাহাদুরি করলি! তাই বলে লোকের বিছানায় পা দিয়ে মানুষকে মাড়িয়ে যাবি নাকি? অমনি এলেন তিনি বরের পরীক্ষা পাশের ঢাক বাজাতে। হ্যাঁলো, বলি আমরা ছিলাম, তাই তো তোর বরের পরীক্ষা-পাশ হল?" তাঁর তখনকার কথাগুলি আমার বুকে কত বাজল সে আর কি বলব। ওঁর পরীক্ষা আর আমার পা ঠাকুরঝির বিছানায় পড়া, এ দুটোতে কি কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকতে পারে? কিন্তু তিনি তাতে আরও দু'চারটি দোষ যোগ দিয়ে বকাবকি করতে লাগলেন। সে কথা দিদিশাশুড়ীর কানে যাওয়া পর্যন্ত এই যোগ হল যে আমি শুধু বিছানা মাড়াইনি, ধোন্ত-ঠাকুরপোর হাতও মাড়িয়েছিলাম। আর তিনি যখন চেঁচিয়ে উঠলেন তখন নাকি আমি বলেছি, "বেশ মাড়িয়েছি, তাতে কী হল? মানুষ ভুলে মাড়ায়!" ওই হয়েছে! সে যা দিদিশাশুড়ীর মুখ! তাঁর বকাবকি আরম্ভ হল। ঠিক সেই সময় ছোট মামীশাশুড়ী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছোটো গেলাশটা কোথায়? তুমি ওঘরে নিয়ে গিয়েছিলে সেটা?" সকালে তাড়াতাড়ি আসবার সময় আমি সেটা

আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। ব্যস্! যেন আগুনে তেল পড়ল! "বলি, তোমাদের পিছনে কি ঝি-চাকর আছে যে তোমাদের ঘটিবাটি তুলে আনবে? তবু ভালো যে ওই পরীক্ষাটুকু পাশ করেছে। এখনো তো চাকরি পায়নি। এর মধ্যে অত বেড়ে গেছ? একেবারে উন্মত্ত হলে? তুমি কি ভাবছ যে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছ? হ্যাঁলো, একটু সবুর করবিনে? অত দেমাক দেখিয়ে কী দরকার?"—সে কি রকম কথা! যা মুখে আসে তাই বলে বকতে আরম্ভ করলেন। একটু ভেবেচিন্তেও দেখলেন না। আমি সত্যি ভাবলাম যে আমাদের কিছু ভালো হলে ওরা দেখতে পারে না।

যখন পরাকাষ্ঠা হল, তখন আমার দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। একে তো মেয়েদের মন কোমল, আর তাতে নিজের কোনো অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও, কেউ যদি যাচ্ছেতাই বকতে আরম্ভ করে, তাহলে কাঁদা ছাড়া আর অন্য কী উপায় থাকে? যে-সব দোষের জন্য আমাকে তারা অপরাধী করেছিল সে-সব মিথ্যে বলে যদিও নিশ্চয় জানতাম, তবু সত্যি ব্যাপারটা মুখ ফুটে যে বলব তার সাধ্য কি? যা বকবেন তা মুখ বুজে কাঁদতে কাঁদতে শোনা বই অন্য উপায় ছিল না। আমি তবু ছোট, কিন্তু উমাশাশুড়ীর কথা আগে একবার বলেছি তো? তাঁর অবস্থা কী ছিল? তাঁর স্বামী তাঁকে পষ্টাপষ্টি মিথ্যে অপরাধী করলেন, তবু কি সত্য কথা বলবার সাধ্য তাঁর ছিল? পৃথিবীশুদ্ধ সব মেয়েদেরই এই অবস্থা। আমরণ বোকার মতো বিনয় আর ভয়ে ভয়ে গোলামগিরি করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। আগেকার রাত্রের—এমন কি ঘণ্টা দু'ঘণ্টাখানেক আগেকার—সেই স্বাধীনতার, শিক্ষার, বড় বড় কল্পনা-সৃষ্টির মহিলাদের গল্প কোথায় গেল? আর এই নিষ্ঠুর বাস্তবের কঠোর গা-জ্বালানো কথা কী বিষম! সে কল্পিত সুখ কোন দিকে আর এই প্রত্যক্ষ দুঃখ কোন দিকে? দুটোতে কি কিছু মিল আছে? কিন্তু দু'মণ দুধে একফোঁটা তেঁতুল পড়া-মাত্র সে দুধের যে রকম অবস্থা হয়, ঠিক সেই রকম আমার সব আনন্দ মিলিয়ে গেল! আর ভাবলাম, কী জানি কখন তাঁদের কবল থেকে মুক্তি পাব!

বাস্তবিক আমার কোনো অপরাধ ছিল না, তা উমাশাশুড়ী জানতেন। তিনি তখন সেখানে ছিলেন, তাই আমাকে তারা শুধু শুধু বকছিলেন দেখে

তাঁর বড় কষ্ট হল। তিনি সে কথা আমার শাশুড়ীকে বললেন। কিন্তু তিনিই বা কী করতে পারেন? তিনি কিছু বলতে পারতেন? ভাগ্নীকে মিথ্যেবাদী করে বৌমার পক্ষ নিলেন বলে তাঁর উপরেই ফুল ঝরতে আরম্ভ করত! তাই তিনি চুপ করে রইলেন। কিন্তু আমাকে আড়ালে কাঁদতে দেখে উমাশাশুড়ী বললেন, "চুপ করো, শান্ত হও। এইটুকুতে কি পাগলের মতো কাঁদতে আছে? ওরকম তো সব সময়েই চলছে। ওদের অত ধার ধারতে হবে না। শান্ত হও বৌ। বকুক ওরা অমনি।" কিন্তু কথায় বলে, 'যে ভয় পায় ভয় তাকেই খায়!' তিনি বেচারী সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতেন, কক্ষণো বেশী কিছু বলতেন না। কিন্তু আজ কী মনে করে যে বলতে গেলেন!—আর কপাল-দোষে ঠিক সে-কথা তাঁর মেয়েটা শুনল। অমনি সে-কথা সে গিয়ে নির্ঘাৎ দিদিশাশুড়ীর কাছে লাগিয়ে দিল। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনে লাগানি করা বঠাকুরঝির ভয়ানক বদ অভ্যাস ছিল। তার অন্য কোনো কাজই ছিল না। শুধু এদিকের কথা সেদিকে, আর সেদিকের কথা এদিকে লাগিয়ে দেওয়ার কাজ! নিজের মার জন্য তার এতটুকুও মায়া ছিল না। সব সময় মার কথাও লাগিয়ে দিত। এরকম মেয়ে বোধহয় ত্রিভুবনে নেই। উমাশাশুড়ীর সে কথাগুলি ওদিকে হুজুর-সরকারে পৌঁছে গেল, মানে আগুন ধরানোর আর কি বাকী রইল! সে আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। আমার অপরাধটা কোথায় চাপা পড়ে গেল! উমাশাশুড়ীকেই বকুনী আরম্ভ হল। "ও ওই রকম! অভাগী সমস্ত বাড়িটার সর্বনাশ করে ফেলেছে। সীতাকে ওই সাহায্য করে! সারাদিন সীতার সঙ্গে ওর গল্পগুজব চলছে। কী বলল? 'রোজ মরলে কাঁদবে কে?' কেন লো? এখন আমার মরণ কামনা করছ বুঝি? তবু ভালো যে এমন স্বামী পেয়েছ, বেশ পদে পদে নাক ঘষতে হচ্ছে, দায়ে পড়েও কেউ মানছেনা। ওই স্বামী যদি ওর হাতের পুতুল হত, তাহলে না জানি কত নাচুনি নাচত! ঠাকুর যেমন লোক তাকে তেমন উপযুক্ত ঠাঁই দেয়! ওতো পাগল নয়? 'রোজ মরলে কাঁদবে কে?' কাঁদিস নে লো, কাঁদিস নে! নাই বা কাঁদলি—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই রকম খই ফুটতে দেখে নিজের দুঃখ কোথায় উড়ে গেল, উমাশাশুড়ীর জন্যই দুঃখ হতে লাগল। বেচারি আমাদের দু'জনকে বড় ভালোবাসতেন,

তাই আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্ম সহজভাবে বললেন, "বৌমা, ও রকম চলছে, তাতে অত দুঃখ করা কি চলে?" কিন্তু তাঁর সে কথা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো, 'রোজ মরলে কাঁদবে কে?' সারাদিন সেই গজর-গজর চলল। দিদিশাশুড়ী অভিমান করলেন, কারো সঙ্গে কথা বলছিলেন না। শংকর ঠাকুর ক্ষেপে উঠলেন, আর "মাকে ও-কথা বলল? ওঁর পায়ে পড়", এই বলে উমাশাশুড়ীর গালে দু' তিনটে চড় বসিয়ে দিয়ে—অত বয়স্কা স্ত্রী, তার গালে চড়, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সামনে!—তাঁকে পায়ে পড়তে বাধ্য করলেন, আর অবিরাম, "আমি আর সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু মাকে অপমান আর মিথ্যা কথা বলা সহ্য করতে পারি না। বলে কয়ে আবার অস্বীকার করছ? একবার নয়, সাতবার পায়ে পডতেই হবে। পড়ো, পড়ো, পায়ে পড়ো।" এই চলছিল। এই ঘটনাটা শুধু স্মৃতি থেকে লিখছি, তবু আমার গা শিউরে উঠছে। আর মেয়ে জন্মে কী দুর্গতি, এই ভেবে কলম দূরে রেখে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। অমন সতীসাধ্বীকে ওরকম বিষম যন্ত্রণা অকারণে সহ্য করতে হয়, তা মনে পড়ে দুঃখ না হয়ে কি থাকতে পারে?

সারাদিনটা এই রকম গোলমালে কেটে গেল তারপরে রাত্তিরে যখন আমাদের দেখা হল, আর কথাবার্তা হল তখন উনি আমাকে স্পষ্ট বললেন, "বেচারী উমামাসীর অবস্থা দেখে আমার এত রাগ হয়েছিল যে শংকরমামার গালে ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিল। সত্যি, ও মানুষটার স্বভাব যে কেমন, তাই বুঝতে পারা যায় না। কখনো কখনো স্ত্রীর উপর প্রেম এত উপচে আসে যে তাব লবার জো নেই! আজ আমি অন্ততঃ পনরো-কুড়ি বছর এখানে এসেছি, কিন্তু ওর স্বভাব বুঝতে পারি না। এত নির্দয়, এত প্রতিহিংসা-পরায়ণ মানুষ আমি কক্ষণো দেখিনি। আর—যেমন শংকর ঠাকুরের বর্ণনা এগিয়ে চলল, তেমনি উত্তেজিত হয়ে ওঁর গলার স্বর বাড়ছে দেখে আমি বাধা দিলাম। সত্যি, আমি ভাবলাম যে রাত্তিরে আমরা কী কথাবার্তা বলছি তা পর্যন্ত বড়ঠাকুরঝি এসে দরজায় কান পেতে শুনতে পারে। আমি যখন বাধা দিয়ে বড়ঠাকুরঝির বিষয়ে আমার সন্দেহ প্রকাশ করলাম, তখন আমাদের আগেকার কথা তেমনি রইল আর বড়ঠাকুরঝির বিষয়েই কথা শুরু হল। বড়ঠাকুরঝির সঙ্গে আমার প্রথম কোথায় দেখা হয়েছিল, সেদিন কেমন মজা হয়েছিল, এসব কথা আমি বললাম। তখন

উনি বললেন, "ও প্রথম থেকেই ওরকম হিংসুটে কুৎসিত, আর এখন বোধ হয় বেশি হয়েছে। আর আমাদের এই সুখ দেখে ওর হিংসে হয়ে থাকলে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কী করবে বেচারি, ওর কপালে কি এমন সুখ আছে?" আমারও তা সত্যি মনে হল। ওর স্বামী ওকে এক রকম ত্যাগই করেছিলেন। কিন্তু বইটই পড়ে কিছু আনন্দ পাবেন সে সাধনাও তাঁর ছিল না। আর ছেলেবেলা থেকে সে রকম অভ্যাস না থাকায় পড়তে ইচ্ছাও হত না। বহুঠাকুরঝির কথা বলতে বলতে আমরা দুর্গীর কথায় এসে পড়লাম। আগের সব কথা এখনো আমার বলা হয়নি। পরীক্ষার ফলের গণ্ডগোলে সে-সব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। দুর্গীর সব কথা যখন বললাম তখন উনি অতিশয় দুঃখিত হয়ে বললেন, "আহা, বেচারী এখন কী করবে? হুঁঃ! না জানি এমন কত গাভী কসাই-এর হাতে পড়েছে!" এই বলে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর অবশ্য মেয়েদের সাধারণ অবস্থার সম্বন্ধে, ছেলেবেলাতেই বিয়ে দেওয়ার মূর্খ রীতিনীতি সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনা করলাম। তখন আমি সহজভাবে বললাম, "কাল আমরা কী সব কথা বলছিলাম, আর আজ কী হল? আজ কথা বলছি? আমি সত্যি ভাবছি যে কাল রাত্তিরে আমরা কত আনন্দে ছিলাম, আর আজ সকালে শুধু বিছানায় পা পড়ামাত্র সমস্ত দিনটা বাড়ির প্রত্যেক লোক, বিশেষতঃ উমাশাশুড়ী, কী রকম কাটালেন? বাস্তবিক ঘরময় আনন্দ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু নাঃ।"

এ কথা বলতে উনি আমাকে হঠাৎ বললেন, "ওই বইটা আনো তো এদিকে। তাতে একটা মজার কথা আছে। সেটা পড়ে আমি তোমাকে তার অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছি।" আমি তক্ষুণি সেই বইখানা আনলাম। আমি আজকাল পড়তে খুবই ভালোবাসতাম, তাতে আবার উনি পড়ে অর্থ বলবেন জানলে আমার বড় আনন্দ হত! আমি তক্ষুণি সে বইখানা এনে ওঁর হাতে দিলাম! উনি অমনি একটা পাতা খুলে মনে মনে পড়লেন তারপর অর্থ করে আমাকে বললেন। এখন সে বইটার নাম আমার মনে নেই, কিন্তু সে বাক্যের অর্থ এই ছিল—"মানুষ হচ্ছে ভবিতব্য দেবীর হাতের একটি খেলনা। তার ইচ্ছামতো সে তাকে সুখ কিংবা দুঃখ দেয়! এই সুখসাগরে ভেসে আছো, আর আধ মুহূর্তের মধ্যে ফুটন্ত তেলের কড়াই-এর মধ্যে ঠেলে দেওয়ার মতো যন্ত্রণায় জলতে হবে।" সে-দিন দুপুরবেলা পড়বার সময়েই

নাকি সে-বাক্যটা চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। তারপরে সেই বাক্যটা আমাকে অনেক বার শুনিয়েছিলেন, তাই সেটা আমার মনে আছে! সে-সময় তো সে-বাক্যের অর্থ আমার মনে বিশেষ ভাবে অংকিত হল। কেননা সত্যি, সে-দিন, তার আগের দিন আর দুর্গীর দুর্ভোগ্যের দিন, এই তিন দিনের ঘটনা ভেবে দেখে বড় অদ্ভুত মনে হল।

সে-রাতটাও কেটে গেল, আরও পনরো দিন গেল। একদিন নাকি উনি কলেজের সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাই সে সাহেবের একটা চিঠি এল, আর উনি সেখানে গেলেন। এখন আর কলেজে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে দিতে পরের পরীক্ষার পড়াশোনা করবার জন্য 'ফেলো' না কী হয় সে-পদটা পাওয়ার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কথায় বলে যে 'মুখে মিষ্টান্ন, মাঝে শত বিঘ্ন,' সেই রকম অবস্থা ছিল। কোন জায়গা পাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। এখন পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে মনে হচ্ছিল যে বোম্বাইয়ে পাবেন। কিন্তু মধ্যেই অনেক গণ্ডগোল হওয়ার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। বোম্বাইয়ের সেই পদের উপরে দু-তিন জনের চোখ ছিল। তাদের তদ্বির-তদারক চলছিল। সে রকম চেষ্টা করা উনি একেবারে পছন্দ করতেন না। তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যে হয়তো অন্য কোথাও যেতে হবে। কিংবা হয়তো পুণাতেই থাকতে হবে। এখানকার সাহেবের নাকি ইচ্ছা ছিল যে উনি এখানেই থাকেন, আর ওঁর ইচ্ছা ছিল বোম্বাই যাবার। তাই উনি বললেন, "পেয়ালাটা ভরা আছে, কিন্তু মুখে তুলে চুমুক দেবার আগে কত ব্যাঘাত হবে তার ঠিক নেই।" আর পরে বললেন, "শেষ কালে পুণাতেই থাকতে হবে দেখতে পাচ্ছি।" সে কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল। "যাই হোক না কেন, বোম্বাই না হলে আর কোথাও যাওয়া যাক্, কিন্তু আর এই পুণায় থেকে দরকার নেই,—"আমি এ কথা দৃঢ়ভাবে বললাম।

"তা সত্যি। কিন্তু তা হলে তো? সে কি নিজের হাতের কথা?" এই নিরাশাপূর্ণ কথা শোনামাত্র আমার মনের অবস্থা এমন হল যেন, দুধে ভরা পেয়ালা এনে মুখে তুলে ঠোঁট দিয়ে চুমুক দিতে যাব, এমন সময় হঠাৎ কেউ যেন চড় মেরে পেয়ালাটা উড়িয়ে দিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে 'মুখে মিষ্টান্ন, মাঝে শত বিঘ্ন,' এই প্রবাদটি মনে পড়ে আমার মন কেমন করছিল।

মোটামুটি এই রকম সব দিকের অবস্থা ছিল। চার-পাঁচ দিন বড়

ভাবনায় কেটে গেল। কী জানি, হয়তো পুণায় থাকতে হবে! পুণায় থাকা মানে এই অবস্থায় থাকা, আলাদা হতে পারব না। তার মানে আমার সম্বন্ধে আমাদের যে-সব কল্পনা ছিল তার রূপায়ণ দূরেই থাকবে। এমন অবস্থায় এক মুহূর্তের জন্য কথাবার্তা বলার ইচ্ছা থাকলেও অসম্ভব ছিল। শুধু পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখাও মুশকিল ছিল, কথাবার্তা তো দূরের কথা। আর এরকম অবস্থায় পড়লেই যথেষ্ট হয়েছে। ঘরে বসতে আলাদা একটু জায়গা পাওয়া মুশকিল, আলাদা হতে পারবনা তাও তো সত্যি। ভাবলাম, যদিও কোনো বন্দোবস্ত করে আলাদা হই, তবু স্বাধীন-ভাবে আচরণ করার কী সুবিধা থাকবে? মোটেই না। সকলকেই ভয় করে থাকতে হবে, আর কাছেই কোথাও ঘর ভাড়া নিতে হবে।

আমাদের পারিবারিক আদবকায়দা আর দশ-বিশজনে এক জায়গায় মাথা গুঁজে থাকায় কী লাভ তা আমি জানি না, কিন্তু কী লোকসান তা যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে তা হলে সে কথা আমি বিস্তারিত বলে দিতে পারি। কেন না, আমার নিজের অভিজ্ঞতা আর অনেক বন্ধু তাদের অভিজ্ঞতা থেকে যা আমাকে বলেছে, এই দুই প্রমাণ থেকে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি যে অপরিমিত লজ্জাশীলতা আর এক ঠাঁইয়ে সকলে মাথা গুঁজে থাকা —এতে খুব বেশী ক্ষতি হয়। লাভ যদি কিছু থাকে, তবে তা লোকসানের তুলনায় খুব কম। এই অপরিমিত লজ্জাশীলতার ফলে শুধু একরকমের নয়, নানারকমের লোকসান হয়। স্বামী-স্ত্রীর প্রীতি যতটা বাড়া বাঞ্ছনীয়, সেরকম বাড়তে পারে না। স্ত্রী নিজের মন তার স্বামীর কাছে কখনো খুলে বলে না। শুধু তাই নয়, এই লজ্জাশীলতার ফলে কত মেয়েরা তাদের অসুখ গোপন করে রাখে। আমার তিনজন বন্ধু আমাকে বলেছে যে তাদের জীর্ণজ্বর হয়, কিন্তু লজ্জায় তারা সে কথা বাড়ির কাউকে বলেনি। তাদের স্বামীরা জানতেন যে তাদের জীর্ণজ্বর, কিন্তু নিজের স্ত্রীর অসুখের কথা নিজ মুখে বলা কি উচিত? এমন বিষয়ে লজ্জা ছেড়ে স্পষ্ট কথা বলে নির্লজ্জতার দোষ স্বীকার করা কি ভালো? এরকম চিন্তা পোষণ করে তাঁরা নিজের স্ত্রীদের অবাধে মৃত্যুমুখে যেতে দিলেন। কেন না, সেই তিন জনের দু'জন সত্যি মারা গেল। একজনের হয়েছিল যক্ষ্মা রোগ, আর একজন মরল আঁতুড়ে। স্বামীস্ত্রীর সাধারণ সুখে ব্যাঘাত হয়, একথা যদিও বিশেষভাবে ভেবে না দেখি, তবু যখন প্রাণহানি হওয়া

সম্ভব, এমন সময়ে অনুচিত লজ্জা দূরে রাখা উচিত নয় কি? শিষ্টাচার আর আদবকায়দার অসংগত কল্পনায় কত লোকসান হয়, কত মেয়ে মারা যায়, তার খবর রাখা তো দরকার! কিন্তু কে খবর রাখে? আমি যা বলছি তা সত্যি না মিথ্যে তা নিজের মনে ভেবে দেখলেই হবে। একেবারে নিরুপায়, হাত-পা তুলতেও ক্ষমতা নেই এরকম—কিংবা তার কাছাকাছি—অবস্থা যতদিন না হয় ততদিন শ্বশুরবাড়ির বৌ কি কখনো নিজের অসুখের কথা বাড়িতে বলে? মনে হচ্ছে, এই প্রশ্নটার উত্তরে আমার শতকরা নিরানব্বুই জন ভগিনী—যদি তারা সাহস করে সত্যি কথা বলে—(কেননা, এরকম প্রশ্নের স্পষ্ট আর সত্যি উত্তর দেওয়াও আদবকায়দায় পোষায় না) তা হলে বলবেন: "কক্ষণো না।" আমি নিশ্চয় জানি যে, এই উত্তর ছাড়া অন্য উত্তর দেওয়াই অসম্ভব। আমি আমার মেয়ে-জাতির পক্ষ নিয়ে লিখছি বলে বোধহয় আমাকে অনেকে দোষও দেবেন। কিন্তু আমি যখন এসব কথা স্পষ্ট জানাবার জন্যই আমার জীবনকাহিনী লিখছি, তখন ওসব নিন্দাকে ভয় করতে যাব কেন?

দ্বিতীয় কথা, অনেক লোক এক জায়গায় মাথা গুঁজে থাকা কিংবা এক পরিবারভুক্ত হয়ে থাকা হচ্ছে সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপার। এর সঙ্গে দেশের হিত-অহিতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তা ভেবে দেখতে আমার ইচ্ছে নেই। আর এতো ব্যাপক আলোচনা করার ক্ষমতাও আমার নেই। তাই এ বিষয়ে তেমন কিছু না লিখে, আমি শুধু এই বলতে চাই যে অনেক লোক এক পরিবারভুক্ত থাকলে, বাড়ির কে বেশী উপার্জন করে, কে কম উপার্জন করে, কে একেবারেই উপার্জন করে না ইত্যাদি প্রভেদ হবেই। সেই প্রভেদের সঙ্গেই বেশী উপার্জনকারীর স্ত্রী, কম উপার্জনকারীর স্ত্রী আর যে মোটেই উপার্জন করে না তার স্ত্রী, এদের মধ্যে প্রভেদ হওয়াও অনিবার্য। এই রকম প্রভেদ পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে হিংসা-জ্বালা বাড়িতে ঢুকবেই। যে বেশী উপার্জন করে তার স্ত্রীর অমনি দেমাক হয়, সে ভাবে বাড়ির কাজকর্মের ভার যেন তার উপরে না পড়ে, আর বাড়ির সবাই যেন তার সেবা করে। যে কম উপার্জন করে, কিংবা যে মোটেই করেনা, তাদের স্ত্রীরা নিজের অবস্থা জেনে মনে মনে মুষড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু বেশী উপার্জনকারীর স্ত্রীর দেমাক সহ্য না করে তাকে হিংসা করা একেবারে স্বাভাবিক।

এ রকম হিংসা ও প্রতিহিংসা বাড়তে বাড়তে কত ঝগড়া হয়, ঘরে কত রকম বিড় বিড় চলতে থাকে। এক ঘরে এক পরিবারে থাকা সত্বেও, অধিকাংশ লোকের মন পরস্পরের কাছে খোলা থাকে না। অনেক পুরুষ আর মহিলা নিজের ঘরের কথা, ঘরের অনিষ্টকর অবস্থার কথা নিজের বন্ধুদের কাছে বলেন। আমার মনে হয় সম্ভবতঃ এমন একজন মহিলাও নেই যার বিয়ে মস্ত বড় পরিবারে হলেও সে নিজের বন্ধুদের কাছে সে-ঘরের গণ্ডগোলের কথা বলেনি। বাড়িতে কারো মন কারো বিষয়ে স্বচ্ছ থাকে না, তাই বাইরের কোনো বন্ধুর কাছে অন্তঃকরণ খুলে কথা বলা দরকার হয়। আমি আগেই বলেছি যে মনের সুখ কিংবা দুঃখ কাউকে না বললে মন শান্ত হয়না। ঘরে মুখ ফুটে কথা বলবার জো থাকে না, আর বলা দরকার তো ঘরেরই কথা!

গোবিন্দ খিলি ১

'মুখে মিষ্টান্ন, মাঝে শতেক বিঘ্ন' এই প্রবাদটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলতে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। বোম্বাইয়ের সেই পদটি পাওয়ার পথে অনেক ব্যাঘাত হল, কিন্তু ভাগ্যের কথা সেটা পাওয়া গেল। আর তক্ষুণি সেখানে যাবার হুকুমও এল। সে-পদটি পাওয়ার পথে কোন কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়েছিল তা আর এখন বলছি না। একে তো সবগুলি আমি জানিনা, আর দ্বিতীয়তঃ যে-কয়েকটা জানি সেগুলি বলার কোন তাৎপর্য হয় না। যাওয়ার হুকুম না আসা পর্যন্ত আমার প্রাণ খুব ব্যাকুল হয়েছিল আর আমি একেবারে অধীর হয়েছিলাম—একথা সত্যি। আমি তো মেয়েমানুষ, কিন্তু উনিও খুব উতলা হয়েছিলেন। তবু পুরুষদের অভ্যাস মতো আমাকে ঠাট্টা করতেন যে আমার নাকি বড় উতলা স্বভাব। কিন্তু ওঁর স্বভাবও কম উতলা ছিল না। আমি তো একদিন স্পষ্ট বললাম, "আহা! শুধু আমাকেই ঠাট্টা করতে হবে না, নিজেও কম উতলা হওনি।"

"তোমার মতো নয়, বুঝলে।"

"আমার দ্বিগুণ। তা আর বলে দরকার কী? না বলাই ভালো। দাদা যা বলে তা মিথ্যে নয়। দাদা বলেছিল সে যখন-তখন নাকি—একটা অভ্যাস—" এই শেষের ভাগটা আমি হাসতে হাসতে বলছিলাম সত্যি, কিন্তু পরে আমার কেমন মনে হতে লাগল যেন ভুল করে ফেললাম। কিন্তু উনি তা জানতে পারেন নি। উনি বললেন, "তুমি পাগল, তুমি কি কিছু বোঝ? তোমরা বাপু বাঁধা পথ দিয়ে শুধু আরামে ঘুরে বেড়াতে জানো।"

"আহা! সমস্ত পৃথিবী ঘুরে দেখে এসো কারা জীবনের পথ বাঁধছে আর কারা সেই পথে বেশ আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে পথ বাঁধতে বাঁধতে

১ গোবিন্দ খিলি—পানের একরকম খিলি। চারটে পান দিয়ে এই খিলি সাজা হয়। সেকালে এরকম গোবিন্দ খিলি সেজে স্ত্রী ভালোবাসার চিহ্ন হিসাবে প্রেমের সঙ্গে স্বামীকে দিত। এটা অবশ্য মহারাষ্ট্রীয় প্রথা।

হাতে ব্যথা আমদের, আর আমারাই নাকি আরামে ঘুরে বেড়াই!"

আমার একথা শুনে উনি এত হাসতে লাগলেন যে তা থামতেই চাই-ছিল না। আমার চিবুক ধরে নেড়ে বললেন, "বাঃ। এখন কথার উপর রসিকতা করতে আরম্ভ করেছ যে। বেশ চালাক হয়েছ দেখছি।" আমাদের এই কথাবার্তা হবার পরের দিনই সরকারী হুকুম হাতে এল।

তখন আর আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। আমার মনে হচ্ছে যে কেউ যদি বেঁচে থাকতে স্বর্গ দেখতে পায়, তবে তারও বোধ হয় এত আনন্দ হবে না। আমি তো বোম্বাই মানে একটা স্বর্গ মনে করলাম। যত সব আনন্দ আর স্বাধীনতা থাকতে পারে তা সেখানেই, এই ছিল আমার কল্পনা। আর সে হুকুম মানে তো স্বর্গ যাওয়ার পরোয়ানাই হাতে পাওয়া গেল। তিন-চার দিনের মধ্যে উপস্থিত হবার আদেশ ছিল। তাড়া-তাড়িতে আমি ভাবছিলাম যে আমার জামাকাপড়টা গুছিয়ে নিলেই হল, বাকি আর কোনো বাধা নেই। শাশুড়ীর পোঁটলা আর ওঁর কাপড়চোপড়, আর তার সঙ্গেই আমার জামাকাপড় আর খুঁটিনাটি ক'টা জিনিসপত্র নিলেই হবে। আগে আরো কিছু হওয়া যে দরকার, উনি প্রথমে বোম্বাই গিয়ে বাড়িঘর, সুবিধা অসুবিধা দেখাশোনা করে তবে আমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন, এটা প্রথমে আমি ভাবিই নি। কথাবার্তার সময় সে কথা যখন উল্লেখ করলেন, তখন এক মুহূর্ত আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগল, কিন্তু পরের মুহূর্তেই আমি আমার বোকামি বুঝতে পারলাম। আমার পাগলের মতো বোকা উতলা স্বভাব যে কেমন এই ভেবে আশ্চর্য মনে হতে লাগল। কিন্তু থাক সে-কথা। তিন দিনের দিন রাত্তিরে উনি যাবেন ঠিক হল। সেখানে গিয়ে দিন পনরোর মধ্যে একটা বাসা ঠিক করে তবে আমাদের নিয়ে যাবেন। আমার দুঃখ হল, কিন্তু উপায় কী? স্বপ্ন আর সত্য, এই দুয়ের মধ্যে যদি তফাত না থাকত, তাহলে কুঁড়ে ঘরগুলি হত রাজপ্রাসাদ আর ছেঁড়া ন্যাকড়া হত সুন্দর পাগড়ি।

তারপর দু'দিন আমাদের চোখে ঘুম ছিল না। গল্প, গল্প, শুধু গল্প করেছিলাম। কত কথাই যে বলেছিলাম সে সব যদি লিখি তাহলে সেটা একটা আবোল-তাবোল বই হবে! কিন্তু আমাদের সেই গল্পেই কত আনন্দ হচ্ছিল! কখন ফরসা হল তা আমরা বুঝতেই পারিনি। তিন দিনের দিন সকালে উঠে বাইরে যেতেই আমার ইচ্ছা ছিল না! আর আমাকে শীগগির

ছাড়তেও চাইছিল না, কেননা—যাবার আগেকার এই আমাদের শেষ দেখা। রাত্তির সাড়ে দশটার সময় যাত্রা করার কথা ছিল। উনি যাবার আগে আর আমরা কথা বলতে পারলাম না, যাবার সময় এগিয়ে চেয়ে দেখাও মহাপাপ, কারণ তাই রীতি! যাবার সময় বড়দের সামনে পতির মুখের দিকে চাওয়া যে বিষম অপরাধ! সে অপরাধ করে ফেললে চার-পাঁচ দিন বাড়িতে মুখ তুলে চাইবার জো নেই। প্রত্যেক মুহূর্তে কেউ না কেউ খোঁচা মারবেই। এমন অবস্থায় ছলছল চোখে ওঁর পানে চেয়ে, "সাবধানে থেকো, স্বাস্থ্যের অবহেলা কোরো না" একথা হাজার বার ঠোঁটের কোনায় উঠলেও গদগদস্বরে প্রকাশ করে বিদায় নেওয়া কি কপালে থাকতে পারে? শুধু ঘরের ভিতরে বসে, কিংবা হয়তো মাঝঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে গাড়ির চাকার শব্দ শুনে, না হয় বাড়ির যারা দুয়ার পর্যন্ত বিদায় দিতে যায় তারা ফিরে এলে জানতে হয় যে উনি গেছেন! এরকম অবস্থায় সে-দিন সকালই ছিল আমাদের বিদায়ের বেলা! তারপর সমস্ত দিন চোখা-চোখি হওয়াও বিষম দায়! তাই বিদায়ের চরম সীমা আসা পর্যন্ত, মানে যতক্ষণ একেবারে ফরসা হয়নি ততক্ষণ, আমি বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের ভয়ে, বহুঠাকুরঝি মুর্খের মতো কথা বলতে অবসর পাবে, এই ভয়ে, "যাচ্ছি, যেতে দাও" বলে উঠছিলাম আর উনি, "বোসো, এখনো বাড়িতে কেউ ওঠেনি, বোসো না, রাত্তিরে আমি চলে গেলে তার পরে যত খুশি ভোর বেলায় উঠতে পারো", এই বলে আমার হাত ধরে বসাচ্ছিলেন।

এই রকম অনেকক্ষণ চলছিল। "চিঠি দিও নিশ্চয়, সুস্থ শরীরে থেকো, দাদাকে চিঠি পাঠালে ও আমাকে এনে দেবে। এখন বোধহয় কিছু দিন আমি ওবাড়িতেই থাকব। আমি সেখান থেকে চিঠি লিখব।" এই সব যত কথা বলবার তা বলেছিলাম, কত বার যে বলেছিলাম তার ঠিক ঠিকানা নেই। আমাকে চিঠি লিখতে বলে উনি নিজেই চার-পাঁচ খালি খামের উপরে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে আমার কাছে দিয়ে বললেন, "চার দিন বাদে বাদে চিঠি আসা চাই। না হলে বাপু নিজেরটা নিজে ভেবে দেখো। আমি মোটেই ওখানে নিয়ে যাবো না। আমরা সেখানে কলেজে বেশ আরামে খেয়ে দেয়ে দিব্বি থাকি," এই বলে আমাকে সতর্ক থাকতে ইঙ্গিত দিলেন। আমি বললাম, "ওবাড়িতে থাকলে নিশ্চয় লিখব, কিন্তু এবাড়ি থাকলে লিখব কী করে?" কিন্তু উনি বললেন,

"কেন? এই ঘরে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে লিখলেই হবে।" এই বলে নিজের কথাই ধরে বসলেন। আমিও "আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ," করে ঘাড় নাড়লাম। শেষে একেবারে চরম দেরি হল, তখন, তখনকার মতো বিদায় নিয়ে, ওঁকে সাবধানে থাকতে বলে, চিঠি লিখতে বার বার অনুরোধ করে, বড় কষ্টে, নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে, জলভরা চোখে যেমন-তেমন করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। শুধু তখন বোম্বাই যাবার কথা ছিল, আর দিন পনরোর মধ্যেই আমাকে নিয়ে যেতে আসবার কথা ছিল, তবু আমার কত কষ্ট হয়েছিল! ভাবছিলাম যে নিদেন আর পনরো দিন তো বাড়িতে আমার নিজের কেউ নেই! সে কি শুধু পনরো দিনেই শেষ হবে? দরকার হলে বেশী দিনও তো থাকতে পারেন! ততদিন বাপের বাড়ি গেলে হয় তো একটু স্বাধীনতা পাবো, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে কি তা পাওয়া যাবে? শ্বশুরবাড়িতে এক উমাশাশুড়ী আমাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু শত হলেও তিনি আমার চেয়ে বড় আর একটু গম্ভীর, তাই তাঁর সঙ্গে মন খুলে কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। এই রকম অনেক কিছু ভেবে আমার মন কেমন করছিল। কিন্তু, আশা সবচেয়ে বলবতী কিনা, তাই সে আমার সব ভাবনা দূর করে শেষে বলত, "এরকম অবস্থা আর কতদিনই বা থাকবে? একবার এখান থেকে মুক্তি পেলে তার পরে তো আর তুমি এ জঞ্জালে আটকে পড়বে না।" তার সেই কথায় আমি সান্ত্বনাও পেলাম।

তথাপি সেদিনটা আমার বড় কষ্টে কেটে গেল। বোম্বাই যাওয়াটা আনন্দেরই বিষয় ছিল। এখন থেকে আমার বোম্বাই যেতে কত ইচ্ছা ছিল! যত সম্ভব শীগগির যাবার জন্য আমি উতলা হয়েছিলাম। কিন্তু যখন উনি যেতে বেরোলেন তখন আমার মনের অবস্থা কেমন অদ্ভুত হল! ভাবলাম যে আজ পর্যন্ত আমার একলা থাকার অভ্যাস নেই, এখন আমার কেমন অবস্থা হবে? আমার মন বড় অস্বস্তি বোধ করছিল, আর দেখতে পেলাম যে ওঁর মনও ঠিক সেই রকম অস্বস্তি বোধ করছিল। নিজের সঙ্গে কী কী নিয়ে যাবেন তার জোগাড়যন্ত্র যখন চলছিল, সেই দুপুর বেলা অন্ততঃ দশবার উনি অন্তঃপুরে এলেন, আর আমিও একটা-না-একটা কারণ খুঁজে, লজ্জা আদব-কায়দা বিসর্জন দিয়ে, নিদেন চার পাঁচবার ও-ঘরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তেমন লুকিয়ে লুকিয়ে কি মন শান্ত হয়? ঠাট্টা করে একটা কথা বলতে না বলতেই 'কেউ এল বুঝি' এই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম।

হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে এল, আর আমার বুক আরও দুরুদুরু করতে লাগল। আটটা বাজল, খাওয়া-দাওয়া হল। সন্ধ্যাবেলায় আমি একটা 'গোবিন্দ খিলি' সেজে রেখেছিলাম, সেটা ওঁর হাতে দেবার জন্য মনটা বড় আকুল হয়েছিল। সন্ধ্যে থেকে আমার সাধের খিলিটা কোঁচড়ে রেখেছিলাম, ঠিক করেছিলাম যে চট্ করে উপরে গিয়ে ওঁর হাতে দেবো। কিন্তু সে ইচ্ছা সফল হবে কী করে? হাজার বার উপরে যাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু প্রত্যেক বার নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হল, কেননা দিদিশাশুড়ী, শাশুড়ী, বড়ঠাকুরঝি, কেউ না কেউ হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হতেন। একবার আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম, ঠিক সেই সময় ছোট মাসশাশুড়ী নীচে নেমে আসছিলেন, তাঁকে দেখে আমার কত লজ্জা করল তা কল্পনা করাই ভালো। তাঁকে দেখে তাড়াতাড়ি পিছনে সরে পড়লাম, তখন তিনি বললেন, "কী বৌমা? পাতা করেছ? চলো, এই আমি আসছি।" তিনি ভাবলেন যে তাঁকে খেতে ডাকতেই আমি যাচ্ছিলাম, তাই বাঁচোয়া। আমি ভয় করেছিলাম যে না জানি এখন কী বলবেন। কিন্তু ভালোয় ভালোয় মিটে গেল।

আমাদের সকলের খাওয়া-দাওয়া হল। ওঁর যাবার সময় হল। আমি থালাবাটি তুলছিলাম। উমাশাশুড়ী উনুনের দিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছিলেন। এমন সময় বিদায় নেবার জন্য উনি এলেন। কিন্তু ওঁর পিছনে দিদিশাশুড়ী ছিলেন। তিনি অমনি বললেন, "ওরে, সত্যিঠাকুরের সামনে আগে পয়সা আর সুপুরি থুয়ে আয় দেখি।" আমার পানের খিলিটা অমনি রইল! সেটা আমি ঠাকুরের সামনে রাখলেও বেশ হত। ওঁর জন্যই সেটা আমি রেখেছি ভেবে, হয়তো উনি নিজে থেকেই সেটা তুলে নিতেন। কিন্তু এখন যে সে চিন্তা বৃথা। আমার বড় দুঃখ হল। চোখে জল এল। হাত তুলে চোলীর হাতায় চোখের জল মুছে, চুপ করে এঁটো থালা তুলছিলাম, কিন্তু মন টানছিল। যাবার সময় তাড়াতাড়ি একবার আমার দিকে চেয়ে উনি চলে গেলেন। বাড়ির সকলে দুয়োর পর্যন্ত সঙ্গে গেল। আমি শুধু মাঝ ঘরের দুয়োরে দাঁড়িয়ে, বাইরের দুয়োরের পানে চেয়ে রইলাম। চোখ বেয়ে অবিরাম ঝরনা ঝরছিল, কণ্ঠ রোধ হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেলাম। গাড়ি চলে গেল, আর কত আশা করে সাজা আমার সাধের পানের খিলিটা পড়ে রইল!

পরস্পরের পত্র

এখন শ্বশুরবাড়িতে দু'দিন থাকতেও আমার ভালো লাগছিল না। বাপের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করত। সেখানে যা অবস্থা তা তো জানা। মাঈসাহেব আর বৌদির সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল, তা আবার বলে দরকার নেই। তবুও সেটা তো বাপের বাড়ি! হাজার হলেও শ্বশুর-বাড়ির চেয়ে সেখানে স্বাধীনতা বেশী। তাছাড়া সেখানে আমার দাদা ছিল! দাদা যতদিন ছিল, ততদিন আমার কোনো কষ্ট ছিল না। তার সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প করলে যে কোনো বিষয়ে দুঃখ জমে থাকুক না কেন সে দুঃখ একেবারে দূর হত, মন শান্ত হত। তার মন ছিল খুব কোমল। আর আমাকে তো সে বিশেষ ভালোবাসত। এ সব কারণ তো ছিলই, কিন্তু আমার সব চেয়ে টান ছিল দাদার নামে বোম্বাই থেকে আমার যে-চিঠি আসার কথা ছিল—তার জন্য। সে চিঠি কখন আসবে, কখন সেটা পড়তে পারবো, আর আমার কাছে দেওয়া খামে কখন তার উত্তর পাঠাব, এই ভেবে আমার মন উতলা থাকত।

কিন্তু কী উপায়? বাপের বাড়ি যাবার কোনো একটা কারণ খুঁজতে লাগলাম। মাঈসাহেব আমায় নিতে কাউকে পাঠালে, কিংবা দিদি-শাশুড়ী নিজে থেকে আমাকে সেখানে পাঠালে তবেই আমি সেখানে যেতে পারতাম, তাছাড়া অন্য উপায় ছিল না। এছুটোর একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত কোনো আশাই ছিল না, আর এদুটো হবে তারও আশা ছিল না।

কিন্তু আমার ভাগ্যে শুধু নিরাশাই সঞ্চিত ছিল না। শুধু তাই নয়, আকস্মিক ভাবে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে বেশ সুখে দিন পনরো আমি বাপের বাড়ি থাকতে প্রায় এমন সুযোগ এল। উনি বোম্বাই যাবার ঠিক তিন দিনের দিন দাদা এল। আমি ভাবলাম যে দাদা কোনো একটা কারণ খুঁজে আমাকে দেখতে আর আমার চিঠি দিতে এসেছে, কিন্তু তার আসার কারণ ছিল আলাদা। সে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। কেন?

ঠাকুমা আর সুন্দরী আগের রাত্তিরে এসেছিলেন। দাদার মুখে সে-কথা শোনামাত্র আমার কত আনন্দ হল! আজ কতদিন ঠাকুমার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। আর সুন্দরীকেও দাদার বিয়ে হওয়া অবধি দেখিনি। তারা দুজনে এসেছে শুনে আমি বড় খুশি হলাম। কেননা, এখন বাপের বাড়ি যাওয়ায় সত্যিকার সুখ ছিল। শুধু তাই নয়, মনে হতে লাগল যে বাপের বাড়ি থাকার আমার একটা অধিকার আছে। ঠাকুমা এসে বিশেষ এমন কী হত? বাস্তবিকপক্ষে ঠাকুমাকে কেউ মানত না, অথচ এক রকম আরাম মনে হল। কথায় বলে, 'যার মা নেই, তার বাবা কই?' মা মারা গেলে বাবা যে পর হয়ে যান!

ঠাকুমা এসেছিলেন তাই আমাকে দাদা নিতে এল, তখন আর দিদি-শাশুড়ী কোনো আপত্তি তুলতে পারলেন না। অমনি বললেন, 'পাঠিয়ে দেব'খন।' আর কথামতো সন্ধ্যাবেলা পাঠিয়ে দিলেনও। বাড়ি গিয়ে আমি ঠাকুমাকে প্রণাম করামাত্র তাঁর যা কণ্ঠরোধ হয়ে এল, তা বলতে পারছি না। আমাকে কাছে টেনে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "যমু মা, তোর বেশ ভালোই হয়েছে। এখন মার মতো আচরণ করে সকলকে সুখে রাখিস।..." তার পরের কথা তিনি বলতে পারছিলেন না। তাঁর চোখে জল ভরে এল। কাছেই অপর দিকে মাঈ দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠাকুমা তা লক্ষ্যই করেননি। হঠাৎ বললেন, "তোর এই মুখ দেখতে সে যদি বেঁচে থাকত, তাহলে কত ভালো হত! তার বদলে আমার যদি মরণ হত, তবে কত ভালো হত! কিন্তু তা কি হয়?"

ঠাকুমার মুখে একথা শোনামাত্র আমারও কান্না পেল, কিন্তু তা চেপে রেখে আমি বললাম, "ঠাকুমা, সে কী কথা? যা হয়ে গেছে তার কী চারা আছে?" তখন তিনি বললেন, "তাকে মনে পড়ে কান্না যে মা উপচে আসে, থামতে চায় না, কী করি?" এমন সময় সুন্দরী, কোথায় খেলতে গিয়েছিল, এল। সে এখন কত বড় হয়ে গেছে! আমি তাকে শেষ দেখার পর বেশী দিন হয়নি, কিন্তু সেই অল্প দিনেই তাকে কত বড় দেখাচ্ছিল! বেশ বিবাহযোগ্য মনে হয়েছিল। এ বছরে নয় আসছে বছরে তার বিয়ের চেষ্টাচরিত্র করতে হবে। প্রথম দেখার কান্নাকাটি শেষ হলে ঠাকুরদার কথা উঠল। তিনি একেবারে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিলেন, পুণায় এসে চিকিৎসা করাতে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল; একবার নাকি বাবা তাঁকে

চিঠিও লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি সে-কথা একেবারে শুনতে চাননি। এখন ক'দিন তাঁর শরীর ভালো ছিল, তাই ঠাকুমা নিজেই আমাদের দেখতে এসেছিলেন। তিনি যে আমাদের প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতেন। দাদা নাকি তাঁকে ওঁর পরীক্ষার কথা লিখেছিল, আর ওঁর ভালো চাকরি পাওয়া সম্ভব তাও নাকি লিখেছিল। তাই বিশেষ খুশি হয়ে—তাছাড়া প্রথম থেকে তিনি আমাকে বড় ভালোবাসতেন, আর এত সব ভালো ঘটনা ঘটেছিল,—তাই বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে, তিনি এসেছিলেন। তিনি এসেছেন, তাতেই তো আমার বিশেষ আনন্দ হল; কেননা, একবার আমি বোম্বাই গেলে তাঁর সঙ্গে কবে দেখা হবে তার কি কিছু ঠিক ছিল?

দ্বিতীয় দিন সকালে ওঁর চিঠি পেলাম। উনি লিখেছিলেন, "নির্বিঘ্নে বোম্বাই এসে পৌঁছেছি। ভেবোনা। ঘরভাড়া পাওয়ার সুবিধা দেখছি। অধীর হয়ো না।"—ইত্যাদি। সে চিঠিটা আমি অন্ততঃ পনরো বার পড়ে দেখলাম। প্রথমেই অমন প্রেমময় চিঠি পেয়ে অনেকবার পড়েও মন সন্তুষ্ট হতে চাইছিল না। শেষে দাদা ঠাট্টা করে বলল, "আহা! কী না চিঠি? আর কতবার যে পড়ছ!" তখন আমি বললাম, "কই? হাতের লেখা এক বারে ভালো করে পড়তে পারিনি, তাই শুধু দ্বিতীয় বার পড়ছি।"

আমার সে কথা শুনে দাদা হেসে বলল, "তোমার প্রথমবার আর দ্বিতীয়বার যে বেশ দেখছি! আমার বাপু মনে হচ্ছে এটা তোমার একশো বারের বার।" এ কথা শুনে আমি শুধু হাসলাম, তাকে বেশী কিছু বললাম না।

এখন, সেই চিঠির উত্তর কী লিখি, এই আমার ভাবনা হল। কত কথাই লিখতে ইচ্ছে করছিল। আমার সাধের পানের খিলিটা কেমন শুকিয়ে গেল, বাপের বাড়ি যাব কী উপায়ে, এটা আমার কত বড় একটা ভাবনা হয়েছিল, তার পরে হঠাৎ ঠাকুমা এলেন, তাই কেমন অনায়াসে বাপের বাড়ি আসতে পেলাম, এখানে এসে ঠাকুমার সঙ্গে কী কথাবার্তা হল, তিনি কী বললেন, আমি কী বললাম, দাদা কী বলল, সুন্দরী কেমন আছে, সে এখন বিয়ের যোগ্য হয়েছে, উনি যেদিন গেলেন সেদিন রাত্তিরে আমার ঘুম আসেনি, কত স্বপ্ন দেখলাম, এই রকম কত কথাই ভাবছিলাম। মনে মনে ঠিক করলাম সে যাই হোক না কেন, সে সব কথা গুছিয়ে আস্তে লিখে পাঠাব। দুপুরে খাওয়াদাওয়া হওয়ামাত্র, দাদা ইস্কুলে

যাবার আগে তার কাছ থেকে বেশ চার-পাঁচ তা কাগজ চেয়ে নিলাম। আমার এমন স্ফুর্তি হল যে তা আর কি বলব? ব্যস্। অবসর পাওয়া-মাত্র, মাঈসাহেব কী বলবেন, কী না বলবেন ইত্যাদি একেবারে ভেবে না দেখে, সটান উপরে দাদার ঘরে গিয়ে দোয়াত কলম নিয়ে লিখতে বসলাম। লিখতে বসলাম মানে, লিখবার জিনিসপত্র সাজিয়ে নিয়ে বসলাম। কেননা, কাগজ নিয়ে লিখতে আরম্ভ করব, কিন্তু আগে পাঠ কি লিখব, কোথা থেকে আরম্ভ করব, এই চিন্তা উপস্থিত হল।

মনে কত কি জমা হয়েছিল উপরে লিখেছি। আর যখন সত্যি দোয়াত-কলম কাগজ সামনে নিয়ে বসলাম, তখন অর্ধেকের বেশী কথা কোথায় যেন গুলিয়ে গেল। আর বাকিগুলিরও সেই অবস্থা হবে এরকম লক্ষণ দেখতে পেলাম। শেষে শিরোনামাটা দাদা এলে পরে লেখা যাবে মনে করে সেটা তেমনি ছেড়ে দিলাম। কেননা, চার-পাঁচ তা কাগজের দু-তিন তা শিরোনামা আর আরম্ভটা গুছিয়ে লিখতে লিখতেই ফুরিয়ে গেল! শেষে সে দুটোর একটাও লেখা হলনা, আর সময় লাগল দু'ঘণ্টা! তারপর, বাঁকাচোরা, হিজিবিজি, যেমন-তেমন কিছু লিখে কাগজের একটা তা ভরে গেল। কত জায়গায় কালির দাগ পড়ল, কতগুলি লাইন বাঁকা হল, আর লিখলাম কী? আমার সেই চিঠিখানা এখানে দিতে বড় ইচ্ছে করছে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ না হয়ে লোকের চোখে শুধু অবমানিত হতে হবে। আর সকলে আমাকে লক্ষ্য করে হাসবে এই মাত্র লাভ হবে। সেই চিঠিটা এখন আমার সামনে আছে, এখুনি আমি সেটা পড়ে দেখেছি। তাতে বানানের ভুল কতবার করেছি, অগোছালো কথা, একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো সম্বন্ধ নেই, একটা বাক্য ঠাকুমার আসার সম্বন্ধে, আর দ্বিতীয়টা "পানের খিলি দেবার জন্য আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম, আর ঠিক সেই সময় উপর থেকে মামীশাশুড়ী নেমে আসছিলেন।" একবার লিখেছি যে তোমার চিঠি পেয়ে আমার কত আনন্দ হয়েছে, আর অমনি তার পরেই লিখেছি, "সুন্দরী ছোটবেলায় বড় কাঁদুনী ছিল, কিন্তু এখন সে বেশ বড় হয়েছে।" আর মোটমাট দশটা কি বারোটা বাক্য লিখেছি। তাতেই আছে সতেরো হাজার কথা। একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্ক নেই, সতেরোটা দাগ, আর পঁচিশ-ত্রিশটা ভুল। সতেরো বার চিঠিখানা লিখে ছিঁড়ে ফেলছিলাম। তবু যা হোক একটা কিছু লিখতেই হবে, তাই শেষে উপরের বর্ণনা মতো চিঠি

লেখা হল। আর ততক্ষণে চারটে বাজল। তখন মাষ্টারমশাই ডাকলেন, তাই চিঠিটা অমনি দাদার বাক্সর উপরে রেখে নিচে গেলাম।

মনে করেছিলাম যে সন্ধ্যাবেলা দাদা এলে তাকে দেখিয়ে তবে চিঠিটা পাঠাব। কিন্তু সে ঠাট্টা করবে ভয় করছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে দেখাব ঠিক করে তার পথ চেয়ে রইলাম। যেই সে এল অমনি তাকে উপরে নিয়ে গিয়ে, "ঠাট্টা করবে না ?" এইরকম কবুল করিয়ে নিয়ে তার হাতে চিঠিটা দিলাম। হাতে দেবার আগে ঠাট্টা না করতে আবার অনুরোধ করলাম। আর, "কিন্তু ভাই, আগে আরম্ভ কী দিয়ে করতে হয় বল তো"—এই বলে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তখন "বাঃ! আরম্ভই যদি কর নি, তবে চিঠি লিখলে কী রকম ?" এই বলে সে চিঠিটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মনযোগ দিয়ে পড়ে বলল, "বাঃ! সুন্দর লিখেছ। 'এতে যে কোনো ভুল থাকতে পারে তার জন্য ক্ষমা কর, রাগ কর না', এই কথাটা এমন সুন্দর!" এই বলে সে আমাকে ঠাট্টা করতে লাগল ; আর আমি খেপে গিয়ে সেটা ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হলাম। তখন সে আমাকে বুঝিয়ে বলল, আমি সে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিতে রাজি হলাম। আর শেষে, 'হ্যাঁ, না' করতে করতে সেটা পাঠিয়ে দিলাম। দাদা ঠাট্টা করতে আরম্ভ করল, তখন আমার রাগ হল, তার কারণ এই যে, আজ অবধিও সেই চিঠিখানা আমার একেবারে বিচ্ছিরি, ছিঁড়ে ফেলার যোগ্য, হাসবার উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে, তবু তখন সেরকম মনে হয়নি। শুধু তাই নয়, আমি চিঠিখানা বেশ ভালোই লিখেছি, এতক্ষণের চেষ্টাটা বৃথা হয়নি, তখন এই ভাবছিলাম। কিন্তু বাইরে এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যে 'আমি নিশ্চয় জানি যে লেখাটা অতি বিচ্ছিরি হয়েছে।' আমার যত কথা লিখতে ইচ্ছা করছিল, তার দশ ভাগের এক ভাগও লিখতে পারিনি, কিংবা যে রকম লিখব মনে করেছিলাম সে রকমও লিখতে পারিনি। কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম সে যা লিখেছি সেটা একেবারেই মন্দ নয়।

শেষ পর্যন্ত চিঠিখানা গেল। তার পরে সেটা ওঁর পছন্দ হবে কি ? তার বিষয়ে উনি আবার কী লিখবেন ?—এই ভেবে মন আবার কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এখান থেকে ডাক যায় কখন, চিঠিগুলো বোম্বাইয়ে পৌঁছয় কখন, আমার চিঠি উনি পাবেন কখন, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে দাদাকে সেদিন আমি খুব জ্বালাতন করলাম। "এতক্ষণ বোধ হয় চিঠি পেয়েছেন, না ?" "তার উত্তর আজই দিলে কাল সকালে এখানে এসে

পৌঁছবে, না ?” এই রকম বোধহয় এক লক্ষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু সে কখনও বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়নি, তবু ঠাট্টা করবার জন্ম দু-একবার বলল, “আহা সমস্ত পৃথিবীতে যেন তুমি একাই চিঠি লিখেছ ; আর কি কেউ লিখতে পারে না ?” তখন আমিও তাকে খোঁচা মেরে বললাম, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ, আমি একা লিখি না হলে দোকলা লিখি, কিন্তু বৌদি তো লিখতে পারে না।” এই কথাগুলো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লে, আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি দাঁতে জিভ কামড়ালাম। আমি ভেবেছিলাম সে কথায় দাদা হয়তো মনে.কষ্ট পেল, কিন্তু তার মনের ভাবটা বাইরে না দেখিয়ে সে বলল, “তুমি তো পারো, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তুমি যেন এই রকমই খুব ভালো লিখতে পারো, এই আমার ইচ্ছে।” তার এই শান্ত, সরল উত্তর শুনে আমার যা দুঃখ হল, সে যদি আমাকে দুটো চড় বসিয়ে দিত, তাতেও ততটা হত না। আমি একেবারে মূর্খের মতো ভুল করেছি, এই ভেবে আমি ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। শেষে আমি দাদাকে বললাম, “দাদা-ভাই, মন খারাপ কোরনা, আমি অমনি বললাম।”

দ্বিতীয় দিন আমি বড় উৎকণ্ঠিতভাবে আমার সেই চিঠির উত্তর অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আমার সে উৎকণ্ঠা বৃথাই ছিল। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম দিনের দিনও সেই অবস্থা গেল। শেষে রাগ করে আমি ঠিক করলাম যে আর একখানা চিঠি লিখব। আরও ঠিক করলাম যে আর কক্ষনো চিঠি লিখবো না, আর নিজের মনে নিজে গোঁ হয়ে রইলাম।

কিন্তু শেষে, এতদিন যে চিঠির অপেক্ষা করেছিলাম সেটা এল, আর আমার হাতে পড়ল। সে চিঠিখানাও এখন আমার সামনে আছে। এই এক্ষুনি আমি আবার সেটা পড়লাম। চিঠিখানা পড়ে বিভিন্ন স্মৃতি আমার মনে পড়ছে আর চিত্ত উদ্বিগ্ন হচ্ছে। চোখের সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, কণ্ঠরোধ হয়েছে, তাই এক মুহূর্ত কলমটা নামিয়ে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি।

আমার চিঠির উত্তর

ওঁর হাতের এই চিঠিটা কী সুন্দর! আমি যাতে চিঠিটা নিজে পড়তে পারি, পড়ে শোনাবার জন্য অন্য কারো কাছে মিনতি করবার দরকার না হয়, তাই কত যত্নে, স্পষ্ট অক্ষরে, সুন্দর হাতের লেখায় চিঠিখানা লিখেছেন। উত্তর পাঠাতে দেরি হল সেই ত্রুটি সংশোধন করবার জন্যই বুঝি অত বিস্তৃত চিঠি লিখেছেন। আমার চিঠিটা সত্যি কত নোংরা, বিচ্ছিরি ছিল, কিন্তু মোটেই তার নিন্দে করেন নি, প্রশংসাই করেছেন। আমি এখনি দু-তিন-খানা চিঠি লিখলে, বেশ সুন্দর চিঠি লিখতে পারব বলে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। এখান থেকে উনি যাওয়া অবধি যা যা হয়েছিল সে-সব লিখে তৃপ্তি হয়নি বলেই বুঝি চারদিন কী কী স্বপ্ন দেখেছেন, তাও লিখেছেন, আমি লিখেছিলাম যে আমার পানের খিলিটা দিতে পারিনি, তাই রসিকতা করেছেন। আমার হাতের পানের খিলি পেলেন না বলে দুঃখ করেছেন, এমন অদ্ভুত ইতিহাসওলা সেই পানের খিলিটা তুলে রাখতে বলে আবার যখন আমাদের দেখা হবে তখন সেটা ওঁকে দিতে বলেছেন ঐ রকমে, সেই সুন্দর হাত দিয়ে। শুদ্ধ আর প্রেমময় মন ঢেলে লেখা সেই সুন্দর চিঠিটি আজ আবার একবার, দু'বার, তিনবার পড়ে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়েছে, এতে আশ্চর্যের কী? স্বামী যখন স্ত্রীকে চিঠি লেখেন তখনকার বিবিধ প্রেম কথা, দু'একবার আমাকে স্বপ্নে দেখেছেন সে বিষয়ে আমোদ, বোম্বাই যাবার সম্বন্ধে কী কী বন্দোবস্ত হয়েছে, কী হওয়া এখনো বাকী আছে, সে-সব বলে আবার আমার উতলা স্বভাব নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। বার বার আমাকে কেমন মনে পড়ে, কাপড়-বাজারে ছিট দেখলে আমাকে কতবার মনে পড়ল, ইত্যাদি কত কথা লিখেছেন; আবার শ্বশুরবাড়ির সবাই, ঠাকুমা, দাদা, মাঈ সাহেব, এঁদের কুশলাদি সম্বন্ধে খবর নিয়েছেন, আমার বন্ধু দুর্গীর খবরও জিজ্ঞাসা করেছেন।

আমাকে ও-সব কথা লিখেছেন-এতে আশ্চর্য বোধ করবার কিছুই নেই।

আমাকে বিস্তৃত চিঠি লিখতে হলে ও-সব কথাই তো লেখা দরকার। অন্য আর কী লিখবেন? কিন্তু তা নয়, এই চিঠিতে কলেজের অনেক কথা, আর নতুন পরিচিত দু'একজন ভদ্রলোকের কথাও লিখেছেন! শেষের ভাগে আমাকে যা প্রশংসা করেছেন, তা পড়ে আমার মনের যা অবস্থা হয়েছে, তা কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব! আমিই বা কী, আমার চিঠিই বা কী—আমার কত প্রশংসা করেছেন! আবার, চিঠি লিখতে চার দিন দেরি হয়েছে তাই ঠিক আমি রাগ করেছি ভেবে লিখেছেন, "চিঠি পাঠিয়ে চার দিন হল, এখনও আমার উত্তর পাওনি তাই বোধহয় খুব রাগ করেছ, রোজ না জানি ডাকওয়ালার জন্য কত অপেক্ষা করেছ। আর চিঠি না দিয়ে ডাকওয়ালা চলে গেলে না জানি কত নিরাশাই তোমার হয়েছে। নিরাশার মুখে না জানি, 'কুঁড়ে', 'চিন্তাহীন', এ-রকম কত বিশেষণই পেয়েছি! আর বোধহয় এত রাগ করেছ,—কিন্তু কী উপায়? আমি এত দূরে থেকে তোমার সে রাগ দূর করে তোমাকে প্রসন্ন কী উপায়ে করতে পারি? সময় পাইনি, কাজ ছিল, ইত্যাদি ওজর লিখে তোমাকে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তাই সত্যি বলছি, "দয়া করে ক্ষমা করো, আর কক্ষনো এ-রকম করব না।"

কিন্তু এ আমি কী করছি? যে কারণে আমি আমার চিঠিটা উদ্ধৃত করিনি, সেই কারণেই এ চিঠিটাও আমার এখানে দেওয়া উচিত হবে না। কেন না, একে তো সে চিঠি একলা আমাকে লেখা হয়েছিল, তাই তাতে এমন অনেক কিছু আছে যা আর কারো নজরে পড়া উচিত হবে না। দ্বিতীয়তঃ, সেই চিঠিতে আমার চিঠির অতিশয় প্রশংসা করেছেন। আমার তো এত প্রশংসা করেছেন যে বলা যায় না। তাই, এমন চিঠি যদি লোকে দেখতে পায়, তাহলে তাদের নিশ্চয় হাসি পাবে, তার বেশি কিছু হবে না। অনেকে নিশ্চয় বলবেন, "আহা, কী বা স্ত্রী, আর কী বা তার চিঠি, যে ভদ্রমহিলা এত বিস্তৃতভাবে তার ব্যাখা করেছেন! সবটাই হচ্ছে একটা মূর্খতার ব্যাপার।" তাই সে চিঠির বিষয়ে আর কিছু না লিখে এগিয়ে চলাই ভালো।

সেই চিঠি পাওয়া অবধি চার-পাঁচ দিন বেশ আনন্দে কেটে গেল। ঠাকুমা আসার পর থেকে মাঈসাহেবের খোঁচানি একটু কম হয়েছিল। তিনি যে ঠাকুমাকে ভয় করতেন তা নয়, কিন্তু শত হলেও শাশুড়ীই তো!

তাই একটু ইয়ে আর কী।

ঠাকুমা আর আমি দু'একবার দুর্গীর বাড়ি গেলাম। দুর্গীর প্রসব কাল একেবারে কাছে এসেছিল। কিন্তু কী জানি কেন, দুর্গীকে অত্যন্ত ফ্যাকাশে আর রোগা দেখাচ্ছিল। কী করবে বেচারি? বোধ হয় নিজের ভাবী দুর্গতির চিন্তায় শুকোচ্ছিল। স্বামী তো ওই রকম! তাকে কেউ যদি খেতে পরতে দিয়ে, কোনো ঝঞ্ঝাটে পড়তে মানা করে, তাহলেও সে শান্তভাবে বসতে চায়না, টাকা উপার্জন করার আক্কেল নেই, ইত্যাদি তার কত ভাবনা। এ বিষয়ে আমাদের দু'জনে দু-তিনবার কথাবার্তা হল, তখন ও আমাকে বলল, "যমু, তোর মতো শ' দু'শো টাকা নাই বা পেলাম ভাই, শুধু দশটাকাও যদি উপার্জন করেন, তবুও আমি এমন গুছিয়ে সংসার করব—কিন্তু, আমারই কপাল দোষ।" আর ও যখন একথা বলত, তখন আমার বড় মন কেমন করত। সত্যি বলছি, দুর্গী বড় বুদ্ধিমতী ছিল, আর ও যদি ভালো স্বামী পেত, তাহলে ও আরও কত চালাক হত। ওর কপালে কেবল ওই বজ্জাত স্বামী জুটেছিল তাই ওর সব গুণের, বুদ্ধির, তৎপরতার আর গর্বের সর্বনাশ হয়েছিল। আর লক্ষ্মীছাড়া এত নির্লজ্জ ছিল যে, চুরির ব্যাপার নিয়ে এত গণ্ডগোল হলেও, ঘরে মার উপরে কোনোদিন রাগ করলে শ্বশুর বাড়িতেই খেতে-দেতে আর শুতে আসত। ব্যস্। দু'দিন থাকত আর ফিরে যেত। কারো বলবার সাধ্য ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার ওঠা-বসার ব্যবস্থায় অল্প একটু অসুবিধা হলেই স্ত্রীকে আর শ্বশুরবাড়িকে গালাগালি আরম্ভ করত। এরকম অবস্থায় দুর্গীর যে ওরকম দশা হবে তাতে আশ্চর্য বোধ করবার কিছুই নেই। তার মা, ঠাকুমা আর বাবা পর্যন্ত মেয়ের ভাবনায় একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলেন। একদিন দুর্গীর ঠাকুমা আমার ঠাকুমার সঙ্গে কথাবার্তা করবার সময় স্পষ্টই বললেন, "ও-যে আমাদের বুকে একটা সড়কি হয়ে বসেছে! পরে কী যে হবে তার ঠিক নেই। মেয়েটার যে কী রকম অবস্থা হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ভালোয় ভালোয় খালাস হলেই বাঁচি। সেটাই একটা বিষম ভাবনা।" এই শেষের ভাগটা বলবার সময় দুর্গীর ঠাকুমার মুখভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে দুর্গী ভালোয় ভালোয় নিরাপদে প্রসব হবে এরকম আশা তাঁর মনে ছিল না। এ আশংকা যে সত্যি তাঁর বুকে ছুরির ফলার মতো বিঁধে ছিল! বেচারী দুর্গীও, না জানি

কী ভাবত! স্বামী তার বাপের বাড়িতে থাকতে এলে না জানি তার কত সংকোচ আর লজ্জাবোধ হত। তাছাড়া সে নিজের মনে সর্বদা ভাবত যে প্রসবকালে সে বাঁচবে না। সে-কথাও সে আমার কাছে দু-তিনবার ব্যক্ত করেছিল। মানুষ প্রাণের মতো অন্য কিছুই ভালোবাসে না, কিন্তু যখন সুখের কোনো আশাই থাকে না, অপিচ পরে অপেক্ষমান দুঃখের আঘাতের ভয় প্রত্যেক মুহূর্তে হয়, তখন সেই দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার আশা করে মানুষ নিজের থেকে নিজের মরণ কামনা করে। দুর্গার সেই দুর্গতি হয়েছিল। আমি যতবার ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি ততবার ও বলেছে, "যমুদি, সত্যি আমার মরণ হলে বাঁচি। আমি নিজে মুক্তি পাব, আর বাবা-মার প্রাণের জ্বালা জুড়োবে! ওর সেই কথা শুনে আমার কত দুঃখই না হত! কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলতাম, "দুর্গা, এ কী কথা ভাই যখন তখন? এমন অমঙ্গলে কথা কেন বলিস ভাই বল দেখি? পোয়াতী তুই। অমন কথা বলিসনে ভাই। তোকে দেখে আমাদের কি দুঃখ হয় না? কিন্তু তুই ওকথা বললে বহিনা কাকিমা আর তোর বাবা মা কী মনে করবেন? ভাই, এ-দিন কেটে গিয়ে ভালো দিন নিশ্চয় আসবে। সারা-জীবন কি এক রকম অবস্থা থাকে?"

আমার এ-কথায় তার কতটুকু সান্ত্বনা হত, তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। সে নিশ্চয় ভাবত যে আমি একটা কিছু নিরর্থক কথা বলছি। একদিন আমি ওরকম সান্ত্বনা দেবার জন্য কী যেন বলেছিলাম, তার আগের দিনই নাকি তার স্বামী এসে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল। আর সেদিন আমি সেখানে যাবার আগেই সে দুর্গাকে চেঁচিয়ে, "তুই এখন বাড়ি চল্, বাপের বাড়ি থাকতে হবে না। বাড়িতেই হোক খোকা, এদের মুখ যে দেখবে সে চার বাপের ছেলে, বড় দেমাক দেখাচ্ছেন নিজের সম্পত্তির! চল্ তুই"— এই বলে তাকে টানতে উদ্যত হয়েছিল। তাই দেখে তার শাশুড়ী নাকি শুধু, "ওমা! এ কী? ওর এখন ন'মাস আরম্ভ হয়েছে, আর কদিনে বাচ্চা হবে, আর তুমি এ কী কাণ্ড আরম্ভ করেছ"—এইমাত্র বললেন। তখন সে যা ভয়ানক মুখ ছেড়ে দিল।—"পথে বাচ্চা হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এক্ষুনি ওকে নিয়ে যাব। চলো তুমি। চলো চলো বলছি, নইলে বাপু ভেবে দেখ, ছাড়ব না, লাথি মারব। এদের এত দেমাক কেন? চলো, চলো বলছি।" এই বলে সেই পশুটা সত্যি সত্যি সে বেচারী 'গরীব

গাভীকে'[১] টানতে লাগল। দুর্গী বেচারীর চোরের মায়ের অবস্থা হয়েছিল। ডাক ছেড়ে কাঁদবারও জো ছিল না। কী করবে বেচারা? চুপ করে একটা পুরোনো কাপড় নিয়ে যাবার উদ্যোগ করল। তার বাবা বাইরে গিয়েছিলেন, বহিনাকাকিমা বলছিলেন, "তিনি আসা পর্য্যন্ত সবুর করো।" কিন্তু সে নরাধম কি শুনতে চায়? স্ত্রীর হাত ধরে জোরে টান দিল। দুর্গী মার দিকে চেয়ে "মাগো"—বলে ডাকল, অমনি ওর মা—মূলতঃ তাঁর কড়া স্বভাব, কিন্তু এতক্ষণ তিনি একেবারে মুখ বুজে ছিলেন; কিন্তু মেয়েটার দুর্দশা হবে, এখনও চোখের সামনে হচ্ছে দেখে তাঁর ভয়ানক রাগ হল—এগিয়ে এসে মেয়ের হাত ধরে তাকে পিছনে টেনে নিজে সামনে এসে চেঁচিয়ে বললেন, "পাঠাব না মেয়েকে। দেখি কেমন করে নিয়ে যাও! বাড়িতে কেউ নেই দেখে যাচ্ছেতা—ইয়ে—এত বড় স্পর্দ্ধা।" তিনি যখন ধমক দিয়ে দুর্গীকে আগলে ধরলেন, তখন ভীতু এক পা দু'পা করে পেছোতে আরম্ভ করল। মুখে কিন্তু শুধু চেঁচামিচি আর গালিবর্ষণ করছিল। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে, সেখানে শ্বশুরমশাইকে দেখতে পেয়ে অমনি 'য পলায়তি' করে ছুটে পালাল।

এই ঘটনার একটু পরেই আমি সেখানে গেলাম। তখন সবাই ক্রুদ্ধ ছিল। দুর্গী আড়ালে বসে অবিরাম কাঁদছিল। কী করবে? আমি সারাদিন তাদের বাড়িতেই থাকলাম। আমার ক্ষমতা মতো তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলাম। সত্যি বলতে গেলে, তাকে সান্ত্বনা দেবার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু সান্ত্বনা দেবার জন্য কিছু বলে চেষ্টা করে দেখা তো দরকার। তাই আমি উপরে যেমন লিখেছি ঐরকম কথা বলেছিলাম। "না ভাই, অমন নিরাশ হোস্‌নে, পোয়াতি তুই, আর একটা বিপদ হয়ে পড়লে? আজ নয় কাল ওঁর স্বভাব পরিবর্তন হয়ে উনি জানবেন।" এই শেষের কথাটা যেই আমার মুখ দিয়ে বেরোল, অমনি দুর্গী কেমন যেন এক অদ্ভুত হাসি হাসল। সে হাসি এমন ভয়ংকর যে আমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হল। একে তো ওর সেই ফ্যাকাশে চেহারা, আর তাতে সেই ভীষণ হাসি। আমার দিকে তার উজ্জ্বল, দীপ্তিমান চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, "যমু, কখন সুখ পাব বলব তোকে?" আমি কিছু বললাম না। তার

১ হিন্দুধর্মে গাভীকে অত্যন্ত পবিত্র মানা হয়। গাভীর মতো সুস্বভাব, পবিত্র, সরল, উপকারী মহিলাকে মহারাষ্ট্রে গরীব গাভীর সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী গাভীর সম্বন্ধে লিখেছেন "Cow is a poem of pity", ঠিক সেইভাবে স্ত্রীলোককে মহারাষ্ট্রে 'গরীব গাভী' বলে।

সেই অদ্ভুত হাসি আর অদ্ভুত চাহনি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আমি শুধু ওর দিকে চেয়ে রইলাম। তখন সে আবার বলল, "দেখ যমু, এক আমার মরণ হলে, না হলে—" এইটুকু শুনে সে না জানি কী বলবে এই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "ষাট্, ষাট্! ও কথা বলতে—" কিন্তু আমাকে বাধা দিয়ে দুর্গী বলল, "না হলে ওঁর মরণ হলে আমি বাঁচব! তাছাড়া আর এ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই ভাই।"

এই ভয়ংকর কথা কানে শোনামাত্র আমার গা শিউরে উঠল! ওমা! এ কী কথা সে বলছে! এই ভেবে আমি তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে বললাম, "দুর্গী, দুর্গী ও কী কথা ভাই! পাগল না কি?"—কিন্তু আমাকে আর এক অক্ষরও বলতে না দিয়ে, চোখ রাঙিয়ে, ঠোঁট কামড়ে ধরে সে বলল, "আমি এই আঁতুড়ে মরলে ভালো, না হলে নিশ্চয় আত্মহত্যা করব; না হলে—" আমি ঠিক ভাবলাম যে তারপরে ভয়ংকর একটা কিছু বলবে! তার চেহারা রাগে ফুলে উঠে অত্যন্ত লাল হয়েছিল। আমি ভাবলাম যে তখন তার মনের চিন্তা বুঝি বুক ফেটে বেরিয়ে যাবে! তাই তাড়াতাড়ি ওর মুখের উপরে হাত দিয়ে আমি ওকে থামাতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে দেখে দুর্গী অজ্ঞান হয়ে আমার গায়ে ঢলে পড়ল! আমি ঘাবড়ে গেলাম। তার মা ছুটে এলেন। দুর্গীর হাত-পা একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার মুখে-চোখে জল দিয়ে, আরও কত কী করে, তবে অনেকক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে এল। আমি কী যে করি তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। তার জ্ঞান ফিরে এলে তাকে শুইয়ে দিয়ে, তবে আমি সেখান থেকে বাড়ি ফিরে এলাম।

অনেক চেষ্টা করেও সে-ঘটনা মন থেকে সরাতে পারছিলাম না। দুর্গীর সেই ভয়ংকর কথা আমার কানে সর্বক্ষণ গুন্‌গুন্ করছিল। অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হলে মানুষ কত ক্রুদ্ধ হতে পারে, আর কী বলতে পারে তার ঠিক নেই। এখনকার বিষম যন্ত্রণার তুলনায় বৈধব্যের নরকজ্বালাও কি তার সহনীয় মনে হচ্ছিল? যদি সে তাই ভেবে থাকে, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। দুপুর বেলার ঘটনায়, মানুষের হাজার শান্ত স্বভাব হলেও তার মনে ক্রোধ আর দুঃখ জাগাবার মতোই ছিল। তাই, এতদিনের জ্বালাতনে বিরক্ত হয়ে, দুঃখে ভেসে, গালিগালাজে অসহ্য হয়ে, সেই সরলা মেয়ে দুর্গী রাগের ঝোঁকে যদি ওরকম কথা বলেই ফেলে, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

এ মাসিমা আবার কে?

সে-সব ব্যাপার দেখে আমার মন কেমন হয়েছিল তা কি কেউ বুঝবে? আমার ছেলেবেলার বন্ধু, আমার প্রাণের একনিষ্ঠ বন্ধু, আমার দুর্গা, তার এই দুর্দশা! আজ না হলে কাল, না হলে পরশু, একদিন না একদিন সুখ পাবে এ আশার গন্ধও তার জীবনে বাকি ছিল না। বরঞ্চ আঁতুড় ঘরে মরণ হলেই বেশ হবে ভেবে সে নিজের মরণ কামনা করছিল। তেমন মরণ যদি না হয়, তাহলে আত্মহত্যা করতে সে প্রস্তুত হয়েছিল। আর তাও যদি না হয়, তাহলে সেই বজ্জাত, দুষ্ট দুর্যোধন স্বামী যেন মারা যায় এই কামনা সে আমাকে স্পষ্ট বলে ফেলল! 'এ আমি কী বলছি'—ভেবে দেখা দূরে থাক, যে-হাসি দেখামাত্র আর শোনামাত্র ভয়ে মানুষের গা শিউরে ওঠে সে রকম ভয়ংকর হাসি সে হাসল! তখন আমার আশ্চর্য মনে হ'ল, আর ভাবলাম সত্যি, এ কী ব্যাপার! ভাবছি, দুর্গার মনের না জানি কী অবস্থাই হয়েছিল! যাকে আমরা অত্যন্ত পূজনীয় মনে করি, সমস্ত লোক নিন্দা করলেও যাঁকে ঠাকুর মনে করে ভক্তিভরে যাঁর সেবা করি, যিনি জীবিত থাকলেই আমরা নিজেকে জ্যান্ত মনে করি, যাঁর মুখের হাসি দেখে আমরা হাসি, যিনি 'এইটুকু জল খাও' বললে আমরা সেইটুকু জল খাই, যে কোনো কাজ করবার বেলা যাঁর অনুমতি পেলে তবে সে কাজটা করি—তিনি মানা করলে করি না, যিনি বসতে বললে বসি আর উঠতে বললে উঠি, যিনি এক গালে চড় মারলে দ্বিতীয় গালটা সামনে ধরি, যিনি লাথি মারলে, "আহা, পায়ে ব্যথা লেগেছে" বলে পা টিপতে রাজি হই, যাঁর বিষয়ে আমাদের মনে এত প্রেমপূর্ণ সম্মান—নিদেন শুধু সম্মান, অন্ততঃ সে-রকম বাইরে দেখাতে হয়—যাঁর স্বাস্থ্যের যত্ন করবার জন্য আমাদের নিজের প্রাণের কোনো পরোয়াই করতে ইচ্ছে করেনা—কেননা, তাঁর ভালোমন্দর উপরে আমাদের জীবন নির্ভরশীল—এমন পতিদেবতার মরণকামণা মনে উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত যার অবস্থা পৌঁছেছে, যাঁর মৃত্যুর পরের যম-যাতনা,

অতি নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা পর্যন্ত যে শ্রেয় মনে করতে লেগেছে, তখন সে-দুষ্টের বিষয়ে তার মনে না জানি কতো ঘৃণাই জন্মেছিল। "তার সঙ্গে সম্পর্ক যেদিন শেষ হবে সেটা সুদিন, যেদিন এ-যমযাতনা থেকে মুক্তি পাব, তা সে নিজের, না হলে তার মরণ হয়েই হোক্"—এরকম চিন্তা মনে বাসা বেঁধে ছিল, মানে জ্বালা কোন সীমানায় পৌঁছেছিল, তার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে? সে জ্বালাতনের কথা আমি কতবার দুর্গীর মুখে শুনেছি, আর কতবার নিজের চোখে দেখেছি! আমার মন তখন আকুল হত, গা শিউরে উঠত। সে-সব আজ আমার মনে পড়ছে! সে-সব দুর্গীর সহ্য করার ক্ষমতা পেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে পীড়নের ধরন একই রকমের ছিল, তাই হয়তো সেগুলি পাঠকদের কাছে একঘেয়ে আর বিরক্তিকর মনে হবে, সেজন্য এ বিষয়ে এখানেই বিরাম দিয়ে এর পরের ঘটনা লিখি, সেই ভালো।

আজকাল আমাদের উপরে মাঈসাহেবের প্রেম বড় অদ্ভুত হয়েছিল। 'অদ্ভুত' শব্দের অর্থ বড় অদ্ভুত! ইচ্ছামতো তার অর্থ করা যায়। তাই, আমার মনের অর্থ নিজেই স্পষ্ট করে বলা ভালো। আজ পর্য্যন্ত যত ঘটনার বিবরণী আমি দিয়েছি, সেগুলি থেকে পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আমাদের সম্বন্ধে তাঁর আচরণ ছিল দু'মুখো, কপট। বাবার সামনে আমাদের সঙ্গে, কিংবা বাবার কাছে আমাদের সামনে, আমাদের বিষয়ে মাঈসাহেবের কথা, আর বাবার পশ্চাতে আমাদের সঙ্গে কিংবা আমাদের পশ্চাতে তাঁর সঙ্গে আমাদের বিষয়ে মাঈসাহেবের কথায় আকাশ-পাতাল তফাৎ ছিল। আমরা খুব বড় অপরাধ করে থাকলেও বাবার সমক্ষে, আমাদের সেই অপরাধটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছেন এরকম ভাব দেখাতেন। শুধু তাই নয়, সে অপরাধটা যেন বাবা জানতেই না পারেন, সেজন্য তিনি নিজে যেন কত চেষ্টাই করছেন, আর তাঁর সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে যখন বাবা অপরাধটা জানতেই পাচ্ছেন, তখন সেটাকে তাঁর অত্যন্ত ছোট রূপ দেবার চেষ্টা যাতে আমরা দেখতে পাই, সে রকম কথা বলা—এ-সব মনে পড়লে বড় আশ্চর্য মনে হয়! আজকাল তার আমাদের উপরে এই রকম প্রেম বিশেষ প্রকট হতে লাগল! তাই তো তার এই প্রেমকে আমি 'অদ্ভুত' এই বিশেষণ দিয়েছি। ঠাকুমা আসার পর এই প্রেম মাঈসাহেবের দ্বিগুণ হল। ঠাকুমাকে তিনি এত সম্মান করতে

লাগলেন যে তা বলার জো নেই। ঠাকুমার তো বড় আশ্চর্য মনে হল। সে কথা একদিন রাত্তিরে তিনি আমাকে স্পষ্ট করে বললেন, "যমু, আজকাল বৌমা যে বেশ সরল হয়েছে দেখছি? সে কী রকম? আজকাল ওর মা এখানে নেই, সেইজন্য নাকি? আর ঐদিনে তিনি তো ফিরে আসছেন? তার পরে আবার বোধহয় সব আগের মতো হবে?"

আমি যদি মাঈসাহেবের রকম না জানতাম, আর কেউ কাছে নেই দেখে, "এখানে আসার কী দরকার ছিল? যেন আর কোনো মেয়ের আর একেবারেই বিয়ে হচ্ছেনা!" ইত্যাদি তাঁর যে বিড়বিড় চলত, তা যদি না শুনতাম, কিংবা ঠাকুমা আসবার আগে পর্যন্ত আমার যা অভিজ্ঞতা ছিল যদি আমার মনে তা না থাকত, তা হলে আমিও ঠাকুমার মতোই বলতাম। কিন্তু সে-সব আমার মনে ছিল, আর তার বিড়বিড়োনি আমি বিনা চেষ্টাতেই শুনতে পেয়েছিলাম, তাই ঠাকুমার কথা শুনে আমার মনে মনে হাসি পেল। তবু আমি আসল ব্যাপারটা ঠাকুমাকে জানতে দিই নি। শুধু তাই নয়, আমি ঠাকুমাকে বললাম, "আজকাল সে রকম কিচ্ছু নেই। আজকাল আমাদের এত ভালোবাসেন যে আমরা যে তাঁর সতীনের ছেলেমেয়ে তা কেউ জানতেই পারবে না। তোমাকে একটুও ভাবতে হবে না।" দেখতে পেলাম যে আমার কথা শুনে ঠাকুমার বড় সন্তোষ হল। তিনি বললেন, "সেই ভালো মা, সেই ভালো, নইলে তোদের মুখ পূবে আর ওর মুখ পশ্চিম দিকে থাকলে কি ভালো হয়? তোর জন্য আর তত ভাবনা নেই, কিন্তু আমার গণুর জন্যই বড় মন কেমন করে। তুই নিজের বাড়ি যাবি, আর ঘরকন্না করবি। তোর সঙ্গে বৌমার ভালোবাসা থাকলে না হয় তোকে চার দিন এনে রাখবে, কাউকে পাঠাবে, তোর সময় থাকলে তুই আসবি। তা না হলে, তোর সব আছেই, কোথাও যাচ্ছেনা। গণুরই যে কী হবে তাই ভাবছি! ওর স্বভাব হচ্ছে একটু লজ্জাশীল আর চাপা। কেউ 'যা দূর' বললে ও 'কেন দূর' বলবে না, কিংবা পাতে বসে ও খাবার জিনিস চেয়ে নেবে না। ওর বৌ বড় হবে, সব ব্যবস্থা দেখবে, সে-সব এখনও অনেক দূর; তাই আমার এই ভাবনা যে ওর কী ব্যবস্থা হবে? এখন তো মন বেশ ভালোই দেখতে পাচ্ছি।" ঠাকুমার কথা শুনে আমি শুধু ঘাড় নাড়লাম, বেশী কিছুই বললাম না। কী বলতাম? সব কথা বলার কোনো মানে হয় না।

ঠাকুমা বেচারী চার দিন এখানে থাকবেন, এ-সব বলে তাঁর প্রাণে একটা হৃদ্‌রোগ উৎপন্ন করে দরকার কী? এই ভেবে আমি কিছু না বলে ভালোই করেছি।

একটা বিষয় কিন্তু আমি আজকাল বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলাম। আজকাল মাঈসাহেবকে একটু উদাস উদাস দেখাত। তার আগেকার চটপটে ভাব, উচ্ছ্বাস, আজকাল আর দেখতে পেতাম না। আজকাল তিনি বিশেষ সেজেগুজে বেড়াতেন না। সেই আলগা খোঁপা-টোঁপা ছিল, কিন্তু পরণের ছাপাই শাড়ীর বদলে সাধারণ মখমলের শাড়ী, গায়ের চোলীও সাধারণ, আর গয়না-গাঁটিও বড় বেশি পরতেন না। প্রথম প্রথম আমি এ-সব ততটা লক্ষ্য করিনি, কিন্তু পরে একবার দু'বার বিশেষ উপলক্ষ্যেও যখন এই অবস্থা দেখতে পেলাম, তখন আমার ভারি আশ্চর্য মনে হল। মানুষের যদি সাজাগোজার স্বাভাবিক শখ থাকে, তার পরে সে যদি তার সেই শখ ইচ্ছে করে চেপে রাখবার চেষ্টা করে, তা হলে সে-ব্যাপারটা আর সকলের নজর এড়াতে পারে না। আর আমি তো তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতাম, তাই সে-পরিবর্তন আমি সহজেই দেখতে পেতাম। কিন্তু মনে হল যে তিনি ঐ সব ইচ্ছে করে করেন। কেন এমন হল তার ইঙ্গিত আমি বুঝতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যে দুটি বলবার মতো ঘটনা ঘটল। তখন আমি আরও আশ্চর্য হলাম।

দুর্গীর সেই ঘটনার দু'দিন পরে, দুপুর দেড়টার সময় বাড়িতে সব ছিল শান্ত, নিস্তব্ধ। ঠাকুমা রান্নাঘরে এসেছিলেন. সুন্দরীও তাঁর কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঈসাহেব কোথায় যেন বাইরের না ওপরের ঘরে ছিলেন। আমি অমনি বসে ঠাকুমার সঙ্গে গল্প-সল্প করছিলাম, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন, তাই আমিও শুয়ে গা এলিয়ে দিলাম। সেদিন সকালেই বৌদিকে বাপের বাড়ি থেকে নিতে এসেছিল, তাই সে বাপের বাড়ি গিয়েছিল। এখন আমি কি ভাবছিলাম তা আমার মনে নেই। কিন্তু হঠাৎ কী যেন ভেবে আমি উঠে আস্তে আস্তে দাদার ঘরে চল্লাম, যেতে যেতে দেখতে পেলাম যে বাবার হল ঘরে কী একটা সংবাদপত্র পড়েছিল, সেটা পড়ে দেখতে ইচ্ছে হল আর আমি সোজাসুজি হল ঘরে গেলাম। অপর দিকে বাবার শোবার ঘর। সে ঘরের দরজা একটু ফাঁক ছিল। প্রথমে আমি তা লক্ষ্য করিনি। আমি সোজা সেই

সংবাদপত্রের কাছে গিয়ে সেটা খুলে ধরতেই হঠাৎ "নারীশিক্ষার আবশ্যকতা" এই শিরোনামার উপরে আমার নজর পড়ল। তখন সেই স্তম্ভে কী লেখা আছে তা পড়ে দেখতে আমার ইচ্ছে হল, আর অমনি সেখানে বসে বিড়বিড় করে পড়তে আরম্ভ করলাম। এমন সময় হঠাৎ একটা অপরিচিত স্বর শুনতে পেলাম, কে যেন বলল, "চাও তো আমি বলব, কিন্তু এত টাকা নইলে চলবে না। আর দশ টাকা যে তোমাদের পক্ষে বেশি হবে, তাও নয়।" আমার মনে হচ্ছে এই কথার আগে সে মোটামুটি নিশ্চয় কিছু বলেছিস। আমি কথার যে-ভাগটা শুনতে পেলাম, সেটা নিশ্চয় সংলাপের আরম্ভের ভাগ ছিল না। এ কী ব্যাপার? আর দশ টাকা কীসের? কে কাকে বলছে? আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমার মনে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। কারো গুপ্ত কথোপকথন শুনতে নেই, উঠে চলে যাওয়াই উচিত কিন্তু সেটা আমার মনেই হল না। আমি অপ্রতিভ হয়ে সেখানেই বসে রইলাম। এমন সময় আবার শুনতে পেলাম—

"হ্যাঁ গো মাসিমা, হ্যাঁ, তা তো সব সত্যি, বিশ-দশ টাকা কাছে না থাকলে দেব কোথা থেকে? নিজের প্রাণটা তো"—তার পরের কথা শুনতে পেলাম না। কিন্তু এ-কথা কে বলছিল তা আমি তক্ষুনি বুঝতে পারলাম আর আরও বেশী অপ্রতিভ হলাম। এ মাসিমা আবার কে! মাঈসাহেবের যে কোনো এক মাসিমা ছিলেন, তা তো আমি কই মোটেই জানতাম না। আবার কিসের জন্য দশ টাকা চাইছে? হয়তো হবে কোনো গুপ্ত কথা। আমার তা শুনে দরকার কী? এই ভেবে আমি সেখান থেকে উঠে যেতে উদ্যত হলাম, এমন সময় আবার শুনতে পেলাম, "ত্যাখো, দিদিমণি, তোমার মা কাশী যাবার সময় আমাকে বলে গেছে, তুমি দু'দিন বললে, তাই আমি এ ঝঞ্ঝাটে পড়েছি, আর এখন তুমি যদি পেছপাও হও, তা হলে আমি সে লোকটিকে কী বলব? আমার মুখ—" তার পরের কথা আবার আমি শুনতে পেলাম না। কিন্তু এই কথা শুনেই আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল, আর সেখান থেকে চলে না গিয়ে পরে কী কথাবার্তা হবে তাই শুনতে ইচ্ছে হতে লাগল। আমার মিথ্যে কথা লিখে কাজ কী। এর আগেই আমি কতবার বলেছি যে ছেলেবেলা থেকেই, কেউ কোথাও কথাবার্তা বললে তার অভিপ্রায়টা জানতে আমার বড় ইচ্ছে করত। তখন আমার অনিচ্ছা সত্বেও আমায় সেই সহজাত স্বভাব চাগিয়ে উঠলে

তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমি স্পষ্টই বলছি।

ভাবলাম, ব্যাপার কি? আর তার পরের সংলাপ শুনতে ইচ্ছে হল। আমার সুমতি যদিও হাজার বার বলল, "এমন ইচ্ছে মন্দ, এটা চেপে রাখা দরকার", তবু সুমতিকে চুপ করাবার জন্য কুমতি গুনগুন করতে লাগল, "এখান থেকে এখন ওঠা উচিত হবে না। এখন যদি উঠি তাহলে ভিতরে মাঈসাহেব জানতে পাবেন, আর হয়তো সব কথা আমি শুনেছি ভেবে রাগ করবেন, তাই এই জায়গায় বসে থাকাই সবচেয়ে ভালো।" যে বেশী কথা বলে তার কথাই অনেক সময় সত্য বলে মনে হয়, সেই ন্যায় অনুসারে মনের ওই কথাই আমাকে টেনে নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো আচরণ করাতে বাধ্য করল। কেউ ভালো বলুক বা মন্দ বলুক, আমি কিন্তু আমার মনের দ্বিতীয় ইশারাই মানলাম। সেখান থেকে মোটেই উঠলাম না। সংবাদ-পত্রটার দিকে আমার চোখ ছিল, কিন্তু আমার মন আর কান ছিল সেই ঘরের ভিতরে কথোপকথনের দিকে। এখন আমায় কে কী বলবে? কিন্তু কী জানি কেন, অনেকক্ষণ আমি শুনতে পাব এমন জোরে তাদের কথাবার্তা হলই না। তারা যে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, সে-রকম অস্পষ্ট ফিস্‌ফিস্ শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তারা যে কী কথাবার্তা বলছিল তা বুঝতে পাচ্ছিলাম না। আমি খুব সতর্ক হয়ে তাদের কথা শুনবার চেষ্টা করছিলাম, একটু শব্দও যদি আমার কানে ঢুকত তাও আমি ফস্‌কে যেতে দিতাম না। কিন্তু ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্ ছাড়া যে কিছুই শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। একবার আমার একেবারে দরজার কাছে গিয়ে শুনতে ইচ্ছে করল কিন্তু আমার সুমতি তক্ষুনি আমার কুমতিকে চেপে ধরল: "ছি ছি ছি। এ-রকম আড়াল থেকে লুকিয়ে শোনা একেবারে খারাপ, তুমি এতক্ষণ যা করেছ তাই অনুচিত হয়েছে, আবার এই গণ্ডীও পেরিয়ে যেতে চাও?" আমার স্পষ্ট মনে হল যে, কে যেন আমাকে এই ভাবে বকছে। তাই আমি সেখানেই বসে রইলাম। কিন্তু কথায় যে বলে, 'আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনে যে, নিজের নিন্দা শোনে সে', তাই আমি অনুভব করলাম। মাঈসাহেবের মুখে এই কথা শুনতে পেলাম "রোসো, দেখি দুষ্টু ছুঁড়িটা কোথায়। শাশুড়ী ঘুমিয়েছেন, কিন্তু ও নিশ্চয় ঘুরঘুর করে চারিদিকে ঘুরছে। তোমাকে দেখতে পেলেই হয়েছে। আমার কিছু মন্দ করবার ওর সাধ্য

নেই, কিন্তু যেখানে সেখানে—এমন চালাক মেয়ে, বলবার জো নেই।" আমার যা রাগ হল, কিন্তু কী করব? "হ্যাঁ, ওই টাকা ক'টা আর গয়নাটা—তা সত্যি, আর কেউ জানতে পেলেও আমি কারো বাবাকে ভয় করিনে! কিন্তু—"

এই পর্যন্ত আমি কানে শুনতে পেলাম। আর মনে হল যে দরজায় মাঈসাহেবের হাত ঠেকল, কিন্তু দরজা খুলবার জন্য নয়, বোধ হয় বন্ধ করার জন্যই! আমাকে তিনি কি দেখতে পেলেন?—এই ভেবে আমার যেন কেমন অদ্ভুত মনে হতে লাগল। তিনি কি জানতে পেরেছেন যে আমি এখানে ছিলাম আর তাদের সব কথা শুনেছি? তা হলে তিনি এখন কী বলবেন? এমনিই তো তিনি আমাকে এত ঘেন্না করেন, তবে এখন না জানি কত বকবেন! এখন তো দরজাটা বন্ধ, তবে এখানে বসব না উঠে চলে যাবো? গেলে তিনি কী বলবেন?—এই রকম কত চিন্তা আমার মনে হতে লাগল। আর এত সব চিন্তা কত অল্প সময়ের মধ্যে হল তা কি কেউ জানে? আমার মনে হচ্ছে এক পলও বোধহয় হয়নি। কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যে কিছু ভয়, কিছু ভাবনা নিয়ে আমি উঠে চলে গেলাম। তারা দু'জনে ঘরের বাইরে আসা পর্যন্ত আমি আর সেখানে বসিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে সটান দাদার ঘরে গিয়ে বসলাম। কিন্তু মনের ধর্ম এ কী! মাঈসাহেব কী করেন, আর সেই স্ত্রীলোকটি কে জানতে আমার এত ইচ্ছে করল যে ভালো মন্দ কিছু না ভেবে দেখে আমি সিঁড়ির মুখেই দাড়িয়ে রইলাম।

এমন সময় মাঈসাহেব বাইরে এসে এদিকে-ওদিকে দেখতে দেখতে অপর দিকে রান্নাঘরে গেলেন আর অমনি আবার ফিরে এসে সেই স্ত্রীলোকটিকে বাইরে নিয়ে এলেন। সে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই আমি তার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু দেখলাম যে সে ভারি মোটা, বেঁটে, আর একটু খোঁড়াচ্ছে। হঠাৎ সে বলল, "হ্যাঁ, তবে তাঁকে দেব আর বলব এতেই যা হয় করুন, আর শীগগির—" কিন্তু তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে মাঈসাহেব বললেন, "হুঁ হুঁ, চুপ করে বিদায় হও, আর পনরো দিন এসো না।—তেমনি—আমি ডেকে পাঠাব,—" তার পরের কথা আমি শুনতে পেলাম না। তাঁরা দু'জনে নিচে চলে গেলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে সেখানে দাড়িয়ে রইলাম।

স্ত্রীলোকটিকে পৌঁছে দিয়ে মাঈসাহেব ওপরে আসবার সময় আমি নিচে গেলাম। তখন তিনি উপরে উঠছিলেন। তাঁকে দেখে আমার মনে হল যে, আমাকে দেখেই আমার উপরে ঘৃণা তাঁর চেহারায় স্পষ্ট ফুটে উঠল। কথায় বলে, "যে খায়, তাকেই লাগে."[১]—সেই অবস্থা আর কী! আমি ভাবছিলাম যে মাঈসাহেব দেখেছিলেন যে আমি সেখানে বসেছিলাম, আর যদি তিনি তা দেখে থাকেন, তবে তাঁর মুখে ঘৃণা ফুটে ওঠা স্বাভাবিকই ছিল। তার পর আবার তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "কী, যমু ঠাকরুণ, উপরে বসে কী পড়া হচ্ছিল?" তখন আমি ভাবলাম যে তিনি নিশ্চয় আমাকে দেখেছেন! কিন্তু সেটা আমার একেবারেই ভুল হয়েছিল। সময় হাতে থাকলে আমি দাদার ঘরে বসে কিছু-না-কিছু একটা পড়তাম। আমি এদিকে-ওদিকে কোথাও ছিলাম না দেখে তিনি ভেবেছিলেন যে আমি নিশ্চয় দাদার ঘরে বসে পড়ছি, ; আর তাই বোধহয় তাঁর মনের অন্য চিন্তা দূর করার জন্য তিনি সহজ ভাবেই ঐ প্রশ্ন করেছিলেন এ-কথা যখন আমি ঠিক বুঝতে পারলাম তখন আমার মন শান্ত হল।

আমি যদি বলি যে বাড়িতে অমুক ঘটনা ঘটেছিল, আর আমি তা দাদাকে বলিনি, তাহলে নিশ্চয়ই সে-কথা কেউ আর বিশ্বাস করবে না। যদি বলি, শুধু অমুক ঘটনা ঘটেছিল আর সে-কথা দাদাকে বলব কি না তাই আমি ভাবছিলাম, কিংবা মনে আর কোনো দ্বিধা ছিল, তাহলেও আমাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। যে-কোনো বিষয় আমার যখনি কিছু গূঢ় রহস্যময় মনে হত অমনি সেটা আমি দাদাকে বলতাম। তাই তক্ষুনি আমি ভাবলাম যে আজ যে-সব অদ্ভুত ব্যাপাব আমি দেখলাম, যে-সব কথা শুনলাম, এবং সে-সব দেখে-শুনে মনে যে-অদ্ভুত সন্দেহ জেগেছিল, সে-সব সন্দেহ, সে-সব চিন্তা, সে-সব ঘটনা দাদাকে বলে, সেও কিছু জানে কিনা জিজ্ঞাসা করলেই হবে। ঠাকুমাকে বলবার চিন্তা মনেও আসেনি আর যদি বা আসত, তাহলে তক্ষুনি আমি তা চাপা দিয়ে ফেলতাম। কেননা, সে-বেচারী এ-গণ্ডগোলের কী বা বুঝতে পারতেন? ব্যাপারটা জানতে পেরে তিনি যদি খামোকা কিছু বলতেন, তাহলে আবার ঝগড়া বেধে যেত! তিনি ছিলেন পুরানো কালের একটি সরল মানুষ। কিছু শুনতে পেলেই সোজা জিজ্ঞাসা করে ফেলতেন। বাইরে, ভিতরে,

১—একটি মারাঠি প্রবাদ।

আগে, পিছে এ-সব কিছু তিনি বুঝতেন না। তা-ছাড়া ছোট বেলায় আমি যেমন একটু কিছু হলেই অমনি গিয়ে ঠাকুমাকে বলতাম, তেমনটি আর ছিল না। কোন কথা ঠাকুমাকে বলা উচিত, কী বলা উচিত নয়, সে-জ্ঞান এখন আমার হয়েছিল। তা-ছাড়া, বর্তমান ঘটনা আমি জানি, আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখেছি এ-সব মাঈসাহেব যেন জানতে না পারেন, তাঁকে লুকিয়ে আমি যেন কিছু জানতে পারি—সেই স্ত্রীলোকটি কে, কেন এসেছিল, টাকা কেন চাইছিল, না না বলতে বলতে মাঈসাহেব টাকা দিলেন কেন, আর কত টাকা দিলেন, আরও কিছু দিলেন কি না—ইত্যাদি সব কিছু জানতে আমার বড় ইচ্ছা ছিল! যাতে আমার সে-ইচ্ছা তৃপ্ত হয় তাই ছিল আমার উদ্দেশ্য ; আর ঠাকুমাকে বললে আমার উদ্দেশ্য সফল না হয়ে একটা গণ্ডগোল বেধে যাবে এই ভয়ে আমি ঠাকুমাকে কিছু বললাম না।

সন্ধ্যাবেলা দাদা এলে সুবিধা দেখে আমি দুপুরবেলার সব ঘটনা তাকে আগাগোড়া বললাম। সব কথা শুনে দাদা চুপ করে বসে রইল। শেষে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা, কেন ভাই, এমন ভাবে চুপ করে বসে আছো?" তবু সে কিছু বলল না। অনেকক্ষণ পরে আমাকে বলল, "কি বললে যমুদি, সেই স্ত্রীলোকটি বেঁটে আর মোটা?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"কিছু না। মনে হচ্ছে মাঈসাহেবের মা কাশী যাবার আগে এই স্ত্রীলোকটিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দু'তিনবার আসতে দেখেছি। নাকটা এই রকম চ্যাপ্টা তো? থ্যাদা? আব প্যাঁটপ্যাঁটে চোখ!"

"আমি ভাই তার মুখটা দেখতে পাইনি। সে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। আমি সিঁড়ির উপরে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। হল ঘর থেকে ওদিক দিয়ে সে ওই নিচের সিঁড়ির কাছে গেল। পায়ের তলা এমনি মোটা! আমার মনে হচ্ছে যে সে মাঈসাহেবের মার কোনো বন্ধু। তিনি বোধহয় যাবার সময় বলে গেছেন যে কিছু দরকার-টরকার হলে,—"

"আমার সে-রকম মনে হচ্ছে না," দাদা হঠাৎ বলল," কত টাকা? দশ টাকা চাইছিল? আর কী বলল? 'ওঁকে আমি কী বলব?' উনি কে? টাকা কিসের? গয়না—"

এই শেষের কথাগুলি সে বেশ জোরেই বলতে লাগল, তখন আমি

তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললাম, "দাদা, এ কী? তুমি কোথায় তা মনে আছে? নিচে শুনতে পেলে—

"সত্যি যমু, আমার যেন বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল," সে একেবারে চুপি চুপি বলল। "আমার মনে ভাই কেমন যেন—"এই বলে সে জিভ কাটল, আর তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে আমাকে বলল, "যাই হোক্ না কেন, আমাদের তাতে কী? সত্যি যমু, দুর্গার খবর কী? কখন খোকা হবে? ওর জন্য আমার বড় মন কেমন করে।"

দাদা কথা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে দেখে আমার বড় অদ্ভুত মনে হল। কিন্তু আমি কি তাকে অমনি ছাড়ি? আমি তক্ষুণি তাকে বললাম, "দাদা তুমি কী বলতে যাচ্ছিলে তাই বলো না? দুর্গার খোকা হতে এখনও দেরী আছে।"

"কিন্তু না ভাই," সে তাড়াতাড়ি বলল, "আমি এমনি ভাবছিলাম, কিন্তু তার কোনো তাৎপর্য নেই। যদি তেমন কিছু তোমাকে বলার মতো হত, তবে কি আর বলতাম না?"

"তুমি এমনি করো। আমি এতটুকু নতুন কিছু জানতে পেলেই অমনি তোমাকে বলি, তোমাকে বলার জন্য আমি কত উতলা হই, আর তুমি কিন্তু কিছুই বলতে চাও না। আমি কতবার তা অনুভব করেছি। আর আমার কাছ থেকে কোনো কথা বের করে নেবার বেলা এমন করো"—

"যমু, এখন আর তোমার এরকম ছেলেমানুষি সাজে না। তুমি এখন বড় হয়েছ, এখন তুমি পণ্ডিতের স্ত্রী, নিজে বড় পণ্ডিতা, অবিলম্বে—"

"থাক, থাক। মনের কথা বলবার ইচ্ছে না থাকলে তুমি এমনি করে ঠাট্টা করে সময় কাটিয়ে দাও। আমি তা বুঝতে পারিনে ভাবছ। আমি সব বুঝতে পারি। বলো আমায় তুমি, কী ভাবছিলে? আমায় শুনতে দাও। তারপরে আমিও কী মনে করেছি তা বলব।"

"আমার যা মনে হয়েছে তা তোমাকে বলার উপযুক্ত নয়, আর তোমার তা জিজ্ঞেস না করাই ভালো। তুমি যা ভেবেছ তা কিন্তু আমায় বলে ফেল।" তার সে-কথা শুনে সত্যি বলছি আমার একটু রাগ হল, আর আমি আমার বয়স, আর যে-বিষয়ে কথা কইছিলাম তার গুরুত্ব ভুলে গেলাম। বোধ করি আমার ছেলেবেলার স্বভাব জেগে উঠল। কেননা, মুখভঙ্গী করে তার বাক্যগুলি অবিকল মুখস্থ বলে আমি তাকে ভেঙালাম।

"আমার যা মনে হয়েছে, তা তোমাকে বলার উপযুক্ত নয়, আর তোমার তা জিজ্ঞেস না করাই ভালো। তুমি যা ভেবেছ তা কিন্তু আমায় বলে ফেলো।" সত্যি এ-কথা উচারণ করার সময়, কেউ যদি আমাকে দেখত, তবে আমায় কী বলত? বলত, এত বড় মেয়ে, আর ভাইকে বেশ ভেঙাচ্ছে।

আমি যখন ওরকম করে ভেঙালাম, দাদা তখন উচ্চৈঃস্বরে হেসে বলল, "বাঃ বাঃ! কী সুন্দর পণ্ডিতাগিরি। এবার বোম্বাই গিয়ে এই শিখবে না কি!" তার এ-রকম কথা, আগুনে তেল নয় তো কী? তখন যে আমার গায়ের জ্বালা বেড়ে গেল, তাতে আর আশ্চর্য কিসের?

কখনো-কখনো ঘটনার চরম না হয়ে থাকে না। আমি যখন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলাম, আমার দিকে তাকিয়ে দাদা বলল, "আচ্ছা, তবে সত্যি বলব আমি কি ভেবেছি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বলো।" আমার সব রাগ ভুলে গিয়ে বড় উৎকণ্ঠিতভাবে তাকে বললাম। তখন একেবারে আমার কানে কানে সে বলল, "মাঈ-সাহেবের মা বোধহয় এই স্ত্রীলোকটির মারফৎ কারো কাছে টাকা ধার করেছে, সেই ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে। সে চাইতে এল, তাই বোধ-হয় মাঈসাহেব দিতে রাজী হলেন। মা কাশীবাসী, তার ঋণ পরিশোধ করতে ইচ্ছে, তাই বোধহয় কাউকে জানতে না দিয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে সেটা শোধ করছেন।"

দাদার এ-কথা তখন আমার অনেকটা সম্ভব মনে হল। কিন্তু তার চেহারার দিকে চেয়ে দেখে আমার একটু সন্দেহ হল যে দাদা বাস্তবিক যা ভেবেছিল তা হয়ত আমায় সত্যি বলেনি। এই চিন্তা এক মুহূর্ত মনে এসে আবার উড়ে গেল। তার কথাই সত্য মনে হল। কিন্তু রাত্তিরে যখন শান্তভাবে ভাবছিলাম, আর মাঈসাহেবের সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটির সমস্ত কথাবার্তা মনে পড়ল, তখন স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে দাদা যে-কথা অনুমান করে আমাকে বলেছিল, তা একেবারে ঠিক নয়। বোধহয় ইচ্ছা করেই দাদা আমাকে তা বলেছিল, সত্যি ব্যাপারটা আমার কাছে চাপাই রইল!

ঠাকুমার উপদেশ—বোম্বাই যাবার আয়োজন

কোনো ব্যাপারেই একটু বাড়াবাড়ি হলে সে-বিষয়ে অত্যধিক চিন্তা করা আমার অভ্যাস ছিল, তা এখন সবাই জানে। তাতে ভালো এই ছিল যে, কোনো বিষয়ের সম্বন্ধে আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবতাম বটে, কিন্তু তা অন্য একটা কিছু ঘটনার দিকে চিত্ত আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত। একবার মনটা সেদিকে নিযুক্ত হলে তারপর আর আগেকার ঘটনা মনেও থাকত না। আমার এই অভ্যাস ছিল তাই, যদিও সে-দিন সারাদিন সেই ঘটনাটি আমার মনে ঘুরে ফিরে আসছিল, তবু সন্ধ্যাবেলা বোম্বাই থেকে চিঠি এলে আমি ঘটনাটি ভুলে গেলাম। তাতেও ভুলে যাবার বিশেষ কারণ এই ছিল যে, চিঠিতে উনি লিখেছিলেন: "সুন্দর ঘর পেয়েছি, আর আট-দিনের মধ্যে আমি তোমাদের নিয়ে যেতে আসছি।" তখন আমার যে কি আনন্দ হল! আমার সমস্ত 'তন মন ধন' সেই না-দেখা বোম্বাইয়ের দিকে চেয়ে রইল। এখন নিশ্চয় বোম্বাই গিয়ে স্বাধীনভাবে থাকার সুবিধা হবে ভেবে আমি বোম্বাইয়ের ধ্যান করতে লাগলাম। সে-দিন ঠাকুমা তাঁর যাবার কথা তুললেন। আমি তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করে বললাম, "আমি গেলে পর তুমি যেও। আমি এখন শীগগিরই যাব।" তবে নিজের মুখে কী করে বলব যে আমি বোম্বাই থেকে চিঠি পেয়েছি, আর তাতে অমুক লিখেছেন? কিন্তু ঠাকুমা জানতেন যে আমার চিঠি এসেছে। তাই তিনি আমাকে বললেন, "তোর কথা আলাদা, তোর বর তোকে নিয়ে যাবে, তোর দিদিশাশুড়ী মামীশাশুড়ী পাঠিয়ে দেবেন তখন তুই যাবি। আমি এখানে এসেছি এতদিন হল, একটুকরো চিঠিও কি পাঠিয়েছেন? পাগলের মতো আমি ওঁকে ফেলে এসেছি, কিন্তু ভাবলাম, বাছাদের কতোদিন দেখিনি, তাদেরও চোখে দেখতে পাব, আর এই মেয়েটার বিয়ের কথাও তুলে দেখব। কিন্তু এখানে যে সবই ঠাণ্ডা! না,

না, ও যে এই দ্বিতীয় পক্ষের বৌয়ের এত বাধ্য হবে তা আমি কখনো ভাবিনি, আজকাল দেখছি যে একেবারে”—

“ওই রকমই হয়,” আমি বয়স্কা স্ত্রীলোকের মতো বললাম, “মা যখন ছিলেন, তখন বাবা ছিলেন একেবারে জমদগ্নির অবতার! আর এখন হয়েছেন একেবারে গুগলি-শামুক। কিন্তু, ঠাকুমা, আমি যতদিন আছি তুমি ততদিন থাকো না কেন? আমার যেতে আর বেশী দিন নেই, আট দিন পরে আমাদের নিয়ে যেতে আসবেন,”—

“সত্যি নাকি? তোকে আজকের চিঠিতে তাই লিখেছে বুঝি? ওমা! আজকালকার এই ছেলেরা যে একেবারে গণ্ডি পেরিয়েছে! বৌকে কী যে চিঠি লেখে, আর কত কী পাগলামিই না করে! আমরা বাপু এ-রকম”—কিন্তু ঠাকুমা ও-সব কেবল পুলকিত হয়ে ভালোবাসা-মিশ্রিত বিস্ময়ে বলছিলেন। আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম যে উনি আমাকে চিঠি লেখেন দেখে ঠাকুমার সত্যসত্যই ভালো লেগেছিল। তাই তাঁর কথা শুনে হাসি পেয়ে আমি বললাম, “তাতে কী হল ঠাকুমা? পরস্পরের কুশল জানতে হবে না?” তাই শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাসতে হাসতে ঠাকুমা বললেন, “আহা, মরি মরি! আমরা কি কখনো কুশল জানতে পেতাম? বাড়ির লোকে চিঠি পেলে কি আর কুশল জানা যায় না! যত সব ন্যাকামো আর কী!” আমি শুধু হাসলাম, কী বলব? কিছুক্ষণ পরে উনিই আমার মুখে-পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, “তোর এই মুখ দেখতে যদি বৌমা বেঁচে থাকত যমু, তাহলে কত ভালো হত! কিন্তু ওর বরাতে ছিল না। ও মোলো, তার চেয়ে আমিই যদি”—আমি ঠাকুমাকে বাধা দিলাম। কিন্তু আমাদের এমন সুখের ভাগ্য দেখলে ওঁর ঠিক মাকে মনে পড়ত আর উনি প্রায়ই বলতেন, “তার চেয়ে আমি মোলেই ভালো হত!” কতবার ঠাকুমা ওকথা বলেছেন, কতবার আমি তাঁকে বাধা দিয়েছি।

ওই চিঠির অভিপ্রায়—অবশ্য সংগত ভাবটা—আমি আস্তে আস্তে লাজুক লাজুক ভাবে ঠাকুমাকে বলতে তিনি ভারী খুশি হয়ে সে-দিন রাত্তিরে, অপর জায়গায় গেলে কী-রকম আচরণ করতে হয়, শাশুড়ীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত, এই সব বিষয়ে আমাকে কত উপদেশ দিলেন। তাঁর সেই সব উপদেশের শেষে একটি কথা ছিল। যা বলবার

তা বলে শেষে একেবারে গদগদ স্বরে, ধরা গলায়, তিনি আমাকে বললেন, "যমু, যমু, তুই তোর মার মতন আচরণ করিস, মা।…" তারপরে তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কাঁদতে আরম্ভ করলেন। আমার মনে হচ্ছে, তিনি আমাকে যে-সব উপদেশ দিচ্ছিলেন, তা তাঁকে মার সব আচরণ মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আর মার গুণ মনে করেই শেষে তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে এল; তখন শেষে একেবারে, "তুই তোর মার মতন আচরণ করিস" বলে একেবারে কেঁদে ফেললেন। ক'বছর আগে আমরা কখনো মনে করিনি যে ঠাকুমা মাকে এত ভালোবাসতেন। কিন্তু আজকাল, মাকে মনে পড়েনা এমন এক দিনও তাঁর যেত না। মার মূর্তি আর সব কৃতি তাঁর বুকে কেমন যেন সুস্পষ্ট অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, আমরা তা স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

এমনভাবে ঠাকুমা মাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আমার মনের উপরে তার স্থায়ী ফল হল! আমি মার আচরণ রোজ রোজ স্মরণ করে কতবার সংকল্প করলাম যে আমি ঠিক তাঁব মতো আচরণ করব আর সকলকে সন্তুষ্ট রাখব। ঠাকুমা রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে কেঁদে ফেললেন আর খাণিকক্ষণ পরে বললেন, "যমু, সে এত লক্ষ্মী ছিল যে সে-সব মনে পড়লে ভারি অবাক লাগে। সত্যি, ছোটবেলা থেকেই সে কক্ষনো কোনো কিছুর লোভ করেনি। সে একেবারে লোভী ছিল না। বিয়ের আট দিন পরেই ওকে বাড়ি নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন, উনি একটা সংকল্প করলে —সে যে ব্রহ্মার লিখন। তা কি বদলানো যায়! বৌমাকে সেই বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল, আর ছ'মাস পর্যন্ত সেখানে রাখা হল। আবার কথা ছিল যে বাপের বাড়ি থেকে তার সঙ্গে কেউ এলে চলবে না! তাই বাছাকে একলা নিয়ে যাওয়া হল। ছ'মাস তাকে বাপের বাড়ি পাঠালেন না। তাদের বাপের বাড়ির শিক্ষাও অমনি ছিল! তোদের দাদামশাই পনরো দিন অন্তর চিঠি পাঠাতেন, কুশলাদি খবরাখবর নিতেন, কিন্তু মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে লিখতেন না। শেষে উনিই কী মনে করলেন, আর আমিও তাঁকে বললাম, তখন ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে রাজী হলেন। কিন্তু ঠিক সে-দিন রাত্তিরেই ওঁর জ্বর হল। তার পরের দিনও ঠিক সেই রকম জ্বর হল। কিন্তু ওঁর মুখের কথা কক্ষনো ঘুরত না! অমনি বললেন, 'আমার জ্বর হলেও এখন বৌমাকে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।' আমি বৌমাকে পাঠিয়ে

দেবার সব আয়োজন করলাম। কিন্তু বৌমা আমার কাছে এসে একেবারে আস্তে বলল, 'কর্তাঠাকুরের জ্বর, আমি এখন যাবনা। মা আমায় বকবে, 'ওঁর জ্বর, তুই এমন সময় চলে এলি কেন?' যমু, বৌমার এই কথা শুনে আমার বড়ই আশ্চর্য বোধ হল। প্রথম বার শ্বশুরবাড়ি এসেছিল, সঙ্গে বাপের বাড়ির কেউ ছিল না, ছ'মাস একলা ছিল, আর আবার বাছা বলল, 'আমি যাচ্ছি না, কর্তাঠাকুর সেরে উঠলে তবে যাবো'খন।' আমি সে-কথা ওঁকে বললাম, তখন বৌমাকে সামনে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি যাও মা, তুমি এসেছ ছ'মাস হয়ে গেছে, আমার জ্বর আর চারদিনে সেরে যাবে, কাল শুভদিন আছে, তুমি যাও।' তবুও সে বলল, 'আপনি সেরে উঠলে আমি যাব।' কিন্তু সেটা যেন বৌমার বেশ পরীক্ষারই সময় ছিল। যেদিন ওরকম কথা হল তার পরের দিনই তোর দাদামশায়ের চিঠি এল। তিনি লিখেছিলেন, 'বাড়িতে গিন্নীর প্রসবকাল কাছে এসেছে, মেয়েটা গিয়েছে ছ'মাস হল, যদি পাঠিয়ে দিতে পারেন, তা হলে আনতে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তখন বৌমার যাবার জন্য উনি খুব আগ্রহ করলেন। কিন্তু অত কম বয়সেও বৌমা বলল, 'না, আমি এখন যাব না, আপনি সেরে উঠলে আমায় পাঠিয়ে দেবেন।' তাই শেষে তার বাবাকে উনি তেমন চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। পরে দু'মাস পর্যন্ত ওঁর অনবরত জ্বর হচ্ছিল, বিছানা ছেড়ে উঠতে শক্তিও ছিল না, এমন অবস্থা হয়েছিল। তখন একটুও বিরক্ত না হয়ে বৌমা ওঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছিল। সেই সময়ে উনি রোজ ওর গুণগান করতেন, জানিস! একদিন তো বললেন, 'এ বৌ নয়, একটি রত্ন আমরা পেয়েছি।' পরে উনি যখন একেবারে সুস্থ হলেন, তখন বৌমা বাপের বাড়ি গেল। কিন্তু, তখন থেকে বৌমার মুখ থেকে কথা বেরিয়েছে আর সেটা উনি অগ্রাহ্য করেছেন, এমন কখনো হয়নি। এত কড়া স্বভাব, এমন জমদগ্নির অবতার, কিন্তু ওকে কখনো বকতেন না, ওকে বড্ড ভালোবাসতেন! সব তাতে আগে বৌমাকে চাই! এখান থেকে যাওয়া অবধি হাজারবার বলেছেন, 'আমাদের বাড়ির শোভা শেষ হল! আর ও বেটা মূর্খ উপেক্ষা করে মালক্ষ্মীকে মেরে ফেলল!'"

এইভাবে ঠাকুমা আমাকে মার সৎ গুণের কত কথাই না বললেন। 'সে কাউকে প্রত্যুত্তর করেনি, কাজকর্ম করবার বেলা কখনো পেছ পাও

হয়নি, কখনো কাউকে উপেক্ষা করেনি।'—মার এমন কত রকমের কত গুণ-বর্ণনা করে আমায় বললেন, আর প্রত্যেক বারই তাঁর চোখে জল না এসে রইল না। তাঁর সে-সব কথা শুনে আমার মনের অবস্থা কী হয়েছিল তা কি কেউ জানে? সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রথম প্রথম ক'দিন ঠাকুমা মাকে জ্বালাতন করেছিলেন, সেইজন্য তাঁর বিশেষ কষ্ট হত, আর কান্না পেত। অবশ্য সে-কথা ঠাকুমা স্পষ্ট বলতেন না।

দ্বিতীয় দিন শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাকে নিতে এল তাই আমি সেখানে গেলাম। আমার যে-রকম চিঠি এসেছিল সেই রকম চিঠি ও-বাড়িতেও এসেছিল। তাদের চিঠিতে অবশ্য লিখেছিলেন যে 'সংসার পাতবার দিক দিয়ে এখানে বেশ সুন্দর বাসা পেয়েছি, আর পাড়াপ্রতিবেশীরাও বেশ ভালো। এখানে বাসা করলে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ভালো হবে। কলেজের রান্না খেয়ে খেয়ে আমার বিরক্তি ধরেছে—' ইত্যাদি। অনেক-রকম লিখে, নিজের বাসা করবার, সংসার পাতবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। এরি মধ্যে সেই পত্র পাঠমাত্র সংসার পাততে অনুমতি দেওয়া ভালো না মন্দ, তাই নিয়ে বাড়িতে আলোচনা ও বিতর্ক সুরু হয়েছিল। ছোট ঠাকুর বলছিলেন, "কলেজে খেয়ে খেয়ে ও নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে। বাসা করলে ভালো হবে। বাড়ির লোকে যেমন ব্যবস্থা করে, তেমন ব্যবস্থা কি কলেজে হতে পারে?" কিন্তু শংকর ঠাকুর ঠিক তার উলটো বলছিলেন। তিনি বারবার বলছিলেন, "মোটেই না। ওর এখন পড়াশোনা করা দরকার। এই ঘরটরের ঝঞ্ঝাটে পড়লে বৃথা সময় নষ্ট হবে, কষ্ট হবে। সে-সব কিছু দরকার নেই। আর বোম্বাইয়ে ঘর মানে কি কম খরচ হবে! ও-সব কিছু চলবে না, ও নিজের দরকার মতো দশ-বারো টাকা নিজের জন্য রেখে নিয়ে বাকি কটা টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিক। এত ছোট বয়সে তার কাছে টাকাকড়ি না রাখাই ভালো। বোম্বাই শহর, সেখানে নানা ভড়ং। আরও—"কিন্তু থাক। তাঁর সব কথা আমি লিখতে বসছিনে। ও রকম ভটর-ভটর অনবরত চলছিল। ওঁর উপরে আমার এত রাগ হল যে তার সীমা নেই। কিন্তু কী উপায়। ওঁর মুখ অবাধে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে চলছিল। তাতে আবার বিশেষ কথা এই যে দিদিশাশুড়ীর মন শংকর ঠাকুরের দিকেই ঝুঁকবে এ রকম চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন আমার বড্ড ভয় করতে লাগল।

বাকি ছিলেন ছোট মামীশাশুড়ী আর বনু ঠাকুরঝি। তাঁরাও বিড়বিড় করে শংকর ঠাকুরের মতে যোগ দিতে লাগলেন। আর শাশুড়ী তো কিছুই বলছিলেন না। কিন্তু শেষে ছোটঠাকুর রাত্তিরে যাবার সময় শাশুড়ীকেই বললেন, "দিদি, তোমার ইচ্ছা থাকলে তুমি যাও। মার কথার কোনো তাৎপর্য নেই। তোমার ওর কাছে থাকাই ভালো। ও নিশ্চয় বোর্ডিং-এর খাবার খেয়ে বিরক্ত হয়েছে। আর এখন ও বড় হয়েছে, নিজের সংসার করুক! কতদিন—"

"তাতে কী।" শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বললেন, "সংসার কীসের? কিন্তু এই খাওয়াদাওয়ার সম্বন্ধে ওযাবার সময়ই বলছিল। তাছাড়া, আমরাই বা আর কতদিন তোমাদের"—তারপর তিনি বলতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর কথার অভিপ্রায় বুঝে ছোটঠাকুর আমাদের পাঠিয়ে দেবার কথা ধরে বসলেন। শংকর ঠাকুর কিন্তু কুৎসিত ঠাট্টা আরম্ভ করলেন, "এখন আর কি ওর এখানে ভালো লাগবে। এখন বাপু ওর ছেলে মাইনে পায়, এখন কবে যেতে পারব বলে উতলা হয়েছে, না দিদি। আচ্ছা বেশ, তবে আমরা কি আসব তোমাদের ওখানে দিন কতক। দেখি কেমন সংসার সাজায়। ছেলে, বৌমা, আর নিজে…।" আমার শাশুড়ী বেচারী ছিলেন সরল, তিনি তাঁর কুটিল কথা মোটেই বুঝতে পারলেন না। তিনি অমনি সরলভাবে বললেন, "তুমি কি আসবে? কিন্তু যদি পারো তো উমা-বৌদিকে পাঠিও।" তাঁর মুখ দিয়ে এ-কথা বেরোনোমাত্র—ভূতের হাতে মশালের অবস্থা আর কি! তিনি নাছোড়বান্দার মতো শুধু সেইরকম ঠাট্টাই আরম্ভ করলেন। "হুঁ, হুঁ। মানে সংসার পাতবার সংকল্প হয়েছে দেখছি। বৌকে আর মাকে নিয়ে যেতে ওকে 'তার' পাঠিয়ে দেব? তোমাদের ফিট্‌ফাট সংসারে বাবা, দ্বিতীয়-তৃতীয় মানুষের কী দরকার? এবার একবার স্বাধীন হও…" সে কী এক কথা? মূর্খ, চাপা স্বভাবের, হিংসুটে স্ত্রীলোকেরা যে রকম ভটর-ভটর করে, সেইরকম তাঁর মুখের কল চলছিল। বাইরে বাইরে তিনি ঠাট্টার ভান করছিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে মনে মনে তাঁর দুঃখ আর হিংসা হচ্ছিল।

বাস্তবিক আমি দিদিশাশুড়ীকে ভয় করেছিলাম, কিন্তু তিনি তক্ষুনি নিজের কথা ছেড়ে দিলেন। মেয়ের খোকা বড় হয়ে টাকা উপার্জন করছে, এতদিন কষ্টে-দুষ্টে তিনি যত সুখ করেছিলেন তার সমাধা হল, তাই

তাঁর সন্তোষ হয়েছিল। আর আগে যদিও তিনি বলেছিলেন যে অত তাড়াতাড়ি করে দরকার নেই, তবু পরে তাঁর মত বদলেছিল। তিনি যতই নিষ্ঠুর হোন, যতই বকুন, তবু নিজের মেয়ের সংসার বেশ সফল হয়েছে দেখে তাঁর আনন্দ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তার সংসার সাজিয়ে দিয়ে কৃতকার্য হওয়ারও বোধহয় তাঁর ইচ্ছা ছিল। প্রথমে শংকর ঠাকুরের কথা শুনে তিনি শুধু শুধু মনে করেছিলেন যে অত তাড়া করে দরকার নেই। কিন্তু গোপাল ঠাকুর যখন তাঁকে একটু বুঝিয়ে বললেন, তখন সে দাঁড়িপাল্লাটা অন্যদিকে ঝুঁকল। আমাদের বোম্বাই যাওয়া ঠিক হল আর সবাই তার আয়োজন করতে লাগল। যেমন সন্ন্যাসীর বিয়েতে টিকি থেকে আয়োজন করতে হয়,[1] তেমনি আমাদের সংসারের আরম্ভ বাসনের আয়োজন থেকে করতে হল। শাশুড়ী এ-বাড়িতে আসবার সময় নিজের সংসারের বাসন-টাসন সব জড়ো করে গুছিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু সে-বাসনগুলি এত বছর বাড়িতে ব্যবহার করা হচ্ছিল, সেগুলি আবার নিয়ে যাওয়া কী ভালো?

এই রকমে আয়োজন শুরু হয়ে থলি-টলি সেলাই করা, খুঁটিনাটি সব জিনিসপত্র জোগাড় করে রাখা—এ-সব করে দু'চার দিন কেটে গেল। যেমনি দিনগুলো কেটে গেল, অমনি ওঁকে দেখবার জন্য আমি ক্রমশ বেশী উতলা হয়ে উঠলাম। উনি লিখেছিলেন যে, আর আট-দশ দিনে তোমাদের নিতে আসব; তাই সেই দিনটা কবে যে আসবে, আর ওঁকে দেখতে পেয়ে, সব কিছু জিজ্ঞাসা করে আমি কখন সুখী হব, এই আমার চিন্তা হয়ে বসল। সেই মূর্তি চোখের সামনে দেখতে লাগলাম। তাঁরই ধ্যান করতে লাগলাম, আর বোম্বাই যাবার ভাবনায় আমার আর কিছুই ভালো লাগছিল না। উনি আসবেন বলে কর্তাঠাকুরকে চিঠি লিখেছিলেন, তাই নিশ্চয় জানতাম যে তিনি আসবেন। সেই দিনটার উদয় হল। সকালে সাতটা সাড়ে-সাতটার সময় দরজায় একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল, আর উনি ঘরে ঢুকলেন। আমি সব দেখছিলাম। কিন্তু উনি আমাকে লক্ষ্য করেন নি, তাই আমার বড় দুঃখ হল। মনে মনে ঠিক করলাম যে এবার দেখা হলে মিথ্যে মিথ্যে অভিমান করব। কিন্তু সে দুষ্টু সংকল্পটার কি সবুর সয়? ব্যাগ হাতে করে, মাকে প্রণাম করতে ভিতরে আসছিলেন, তখন—ইচ্ছে করে—যা

১ একটি মারাঠি প্রবাদ। অর্থ সুস্পষ্ট।

একটা কিছু কাজ নিয়ে আশেপাশে আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। আমার দুরন্ত চোখদুটি মনের বারণ না শুনে সেদিকে চেয়ে দেখতে লাগল; শুধু তাই নয়, সেই চোখদুটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আর উনি মুচকি হাসলেন। তক্ষুণি বেচারা আমার দুর্বল সংকল্প ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ল; আমিও ফিক করে হেসে ফেললাম।

বোম্বাই চললাম

তিন দিনের দিন রাত্তিরে বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেল। বাড়ির তিন জনের প্রবাসে যাবার কথা ছিল। একজন তরুণ, একজন তরুণী আর একজন প্রৌঢ়া মহিলা। তাই আয়োজনের কী বিষম তাড়া! 'এটা নিলে'? 'ওটা নিয়েছ'? এই রকম প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এদিক থেকে ওদিকে, ওখান থেকে এখানে দৌড়াদৌড়ি। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের, আর প্রেমিক ছোটদের 'বোম্বাই গেলে পরে এমন কোরো তেমন কোরো' ইত্যাদি উপদেশ বর্ষণ! সেই তরুণ আর বিশেষতঃ সেই তরুণীর যা আনন্দ হয়েছিল তার বর্ণনা করা যায় না। সেই তরুণীর তো বিষম তাড়াতাড়ি। তার বাপের বাড়ি থেকে দু'জন এসেছিল, তারা মাঝে মাঝে তাকে 'এমন আচরণ করিস, তেমন ব্যবহার করিস' ইত্যাদি উপদেশ দিচ্ছিল। বাপের বাড়ির সেই দু'জনের সঙ্গে একটি ছোট মেয়েও এসেছিল, তাকে বুকে নিয়ে সেই তরুণী বলল, "সুন্দরী, ঠাকুমাকে জ্বালাতন করিসনি, তাঁর কথা শুনিস। এই নে, মিষ্টি খাবি! আমি বোম্বাই থেকে তোর জন্য পুতুল পাঠিয়ে দেব, কেমন? ওই যে ফাটকদের[1] খুকুর পুতুলটা দেখেছিস তো? সেই রকমের পুতুল।" এই বলে সে তার হাতে একটা টাকা দিল। এই টাকাটা সেই তরুণীর হাতে কোথা থেকে এসেছিল? আমাদের যুবতীর হাতে আস্ত টাকা! সে যে এক আশ্চর্য ব্যাপার! যাক্।

হতে হতে দশটা সওয়া-দশটা বাজল। গাড়ি আনতে যে-লোকটা গিয়েছিল সে গাড়ি নিয়ে এল। যাবার তোড়জোড় শুরু হল। সেই যুবতীর কোলে খণ-নারকোল দেওয়া হল, সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করল। মেয়েদের চোখ বেয়ে অবিরাম জল গড়াচ্ছিল। একজন বৃদ্ধা সবাইকে বলছিলেন, "সাবধানে থেকো, রাত্তিরে সাবধানে ঘুমিও, গাড়িতে ভিড় হবে, সাবধানে যেও।" অন্য দুজন ঠাকুরঝি বলছিল, "সাবধানে যেও,"

১ ফাটক—একটি মারাঠি পদবী।

"সীতা, মাকে যত্ন কোরো। পনরো-ষোল বছর পরে তিনি ঘরের বাইরে যাচ্ছেন।" যাদের প্রবাসে যাবার কথা তাদের মধ্যে প্রৌঢ়া মহিলাটি গাড়িতে বসলেন, সেই তরুণীটি গাড়িতে বসল, আর সেই তরুণ গৃহস্থ আর একজন তরুণও গাড়িতে বসল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করবার সময় সেই বয়স্ক মহিলা বললেন, "মা, আসি," সেই তরুণীর মুখ দিয়ে বেরুল "ঠাকুমা, চললাম, সুন্দরী—" আর অমনি গাড়োয়ান গাড়ি চালিয়ে দিল। স্টেশনে গিয়েই টিকিট কেটে, জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে সবাই রেলগাড়ির কাছে গেল। কিন্তু তাদের শুধু তিন জনই গাড়ির এক কোণে ভালো জায়গা দেখে নিয়ে বসল। একজন সেই তরুণ গৃহস্থ, আর সেই দুই নারী। দ্বিতীয় তরুণটি বাইরে প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। সঙ্গের সেই বয়স্কা স্ত্রীলোকটিকে লজ্জা করেই বোধহয় সেই তরুণটি বাইরের তরুণের সঙ্গে একেবারে আস্তে আস্তে কথা বলছিল।

"বেশ, হয়েছে তো এখন মনের মতো? চললে বোম্বাই? এতদিন চলছিল—এখনো চিঠি আসছেনা, এখনো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, যতসব কুঁড়েমি…।"

"আহা! কী যে বলো! একটি বারও ওকথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে? তুমি সত্যি যখন তখন ঠাট্টা করতে চাও। আমি কি কখনো বলতে পারি?"

"মোটেই না, জানেন গণপতরাও," গাড়ির সেই ভদ্রলোকটি বাইরের ভদ্রলোককে আস্তে বললেন, "আমার আসা অবধি ঘ্যানর ঘ্যানর চলছে, আর শুধু এই বলছিল—"

"গণপতরাও—এই নাও, আমার কথায় এখন আর কী প্রমাণ চাই?"

"আমার মাথা খাও, একটু আস্তে কথা কইলে হয় না? মা শুনতে পাবেন। তুমি কিন্তু সত্যি কিছু বোঝো না। কোথায় ঠাট্টা করা উচিত, কোথায় করতে নেই সব…"

এমন সময় ঘণ্টা বাজল, আর গাড়ি ছাড়ার সময় হল। গাড়ি চলতে লাগল। শেষে, "আসি তবে, চিঠি দিও," "তুমি পাঠিও নিয়মিতভাবে, আর টাঙ্গা করে যেও, পায়ে হেঁটে যেও না।" দু'জনের মুখে এরকম কথা ফুটে উঠল। শেষের কথা সেই তরুণীর মুখের ছিল। কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করার সময় তার গলা এত আটকাচ্ছিল যে বলা যায় না।

তার চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ল। আর গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত সে সেই তরুণের দিকে তাকিয়ে ছিল। শেষে নিচে বসে সে নিজের চোখ মুছল। তখন অন্য তরুণ গৃহস্থটি জানালার বাইরে চেয়ে দেখবার ভাণ করে আস্তে তরুণীটির কাছে গিয়ে বলল, "কেন, চোখ মুছছ যে? এতক্ষণ..." কিন্তু সেই তরুণী চোখের ইশারা করে তাকে চুপ করতে বলল। এটা স্পষ্ট যে, 'উনি শুনতে পাবেন' তার ইশারায় এই অর্থ ছিল।

হে পাঠকগণ, সেই তরুণী কে? তা কি আর বলতে হবে। সেই তরুণীটি আমি, যমুনা, আর সেই স্ত্রীলোকটি আমার শাশুড়ী, আর—

আমাদের এতদিনের আশা এখন সফল হল। আমরা এখন স্বাধীনতার সুখ অনুভব করবার জন্য বোম্বাই চলছিলাম। রবিবারে উনি আসা অবধি আমাদের দু'জনের দেখা হলে শুধু এই গল্পই চলত; আর কিছু নয়। ঘর ভাড়া কোথায় নিয়েছেন, কোনো 'চাল'* বস্তিতে নিয়েছেন নাকি, এরকম অনেক প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'চাল' বস্তির ঘর ভালো হয় না, সেখানে শ' শ' ভাড়াটে থাকে, গ্যাকামো চলে, এই রকমের অনেক কথা আমি কারো কারো মুখে শুনেছিলাম, তাই শুনে অন্ততঃ আমার কল্পনা হয়েছিল যে 'চাল' বস্তির ঘর মোটেই ভালো নয়। তাই আমি 'চাল' বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়েছেন নাকি তাই জিজ্ঞাসা করলাম। আর যখন উত্তর পেলাম যে 'না', তখন অমনি কত যে আনন্দ হল। কী আশ্চর্য! বাস্তবিক 'চাল' বা সেরকম বস্তি, আমি কখনো দেখিনি। সে বিষয়ে বাস্তব ধারণা আমার মোটেই ছিল না। যতটুকু জানতাম তা ওঁর মুখের কথাটথা শুনেই জানতাম। কিন্তু অতটুকুতেই আমার 'চাল' বস্তির বিষয়ে বড় খারাপ ধারণা হয়েছিল। আর পরে সে বিষয়ের অভিজ্ঞতার ফলে আমার সে ধারণা সংশোধন হয়নি, বোধ করি আরো খারাপই হয়েছিল।

কিন্তু আমাদের জন্য যে-বাসাটা দেখেছিলেন সেটা সে রকম বস্তিতে ছিল না। গিরগাঁওয়ে[১] একটা পাড়ার দুটো বাংলো ছিল, তার একটার দোতলায় আমাদের বাসা ছিল। এই বাংলোটি ছিল তেতলা। আর

* বহু ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ভাড়াটে বাড়ি।

১ গিরগাঁও—বোম্বাইয়ের একটা মহল্লা।

তার অন্য দু'তলায় যে দু'জন ভাড়াটে ছিল তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তেতলার ভাড়াটেরা ব্রাহ্মণ। দোতলায় আমাদের ঘর। তার নিচের তলায় অবিকল আমাদের মতোই একটি পরিবার থাকত। "এমন প্রতিবেশী কখনো পাওয়া যায় না। দু'টাকা ভাড়া বেশি, কিন্তু সেই প্রতিবেশীর ভরসায় আমি রাজি হলাম। ওপরের তলার ভাড়াটেরা হচ্ছে শুধু স্বামী আর স্ত্রী। নীচের তলার পরিবার ঠিক আমাদেরই মতো—স্বামী, স্ত্রী আর মা। আগে আমার সেই গৃহস্থের সঙ্গে খুব অল্প পরিচয় ছিল, বোম্বাই গিয়ে এখন খুব ভাব হয়েছে। সে আমাদের কলেজেই ছিল, এখন চাকরি করছে। তার আর আমার অবস্থা ঠিক একই রকম। থেকে থেকে আমার আশ্চর্য মনে হয় যে, বোধহয় এটা ঈশ্বরের সংকেত যে আমাদের দু'জনের যেন এমন মিল হয়।"…এ রকম কত কথা উনি আমাকে আমাদের নতুন বাসা সম্বন্ধে বললেন, আর সে সব শুনে আমার অত্যন্ত আনন্দ হল। দু'রাত্তির ধরে শুধু এই কথা। বোম্বাই গেলে তবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে জানাশোনা হওয়ার কথা, কিন্তু আমি আগেই জানতে পেলাম। তাতে আবার সেই দুই ভাড়াটে ঘরের মেয়েদের যা প্রশংসা করলেন, তার সীমা নেই। সত্যি যদি তাঁরা সেই প্রশংসার মতো হন, তাহলে তাঁদের কাছে আমি যে একেবারে অপদার্থ! আমি তাঁদের সঙ্গে কী কথা বলব? কী করব? এই মনে করে আমার মন একবার-দু'বার উদ্বিগ্ন হল। কিন্তু আমাকে শুধু শুধু ঠাট্টা করবার জন্য ইচ্ছা করে একটা কিছু অতিশয়োক্তি করে বলছেন ভেবে আমি শান্ত হলাম।

যাবার দিন দিদিশাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে আমি বাপের বাড়ি গেলাম। সেখানে ঠাকুমার সঙ্গে আমার কী কথা হল, বাবা আমাকে কী বললেন, দাদা কী রকম ঠাট্টা করল, বৌদিকে আমি কী পাঠিয়ে দেব বললাম, ইত্যাদি কথা বলতে আর কেন বসি? সে সব সবাই কল্পনা করে নেবেন। ঠাকুমা আমাকে নানা রকম উপদেশ দিলেন। কার মর্জি কেমন করে সামলানো দরকার, কেউ কিছু বললে পালটা উত্তর করা উচিত নয়, ঝি-চাকরদের সঙ্গে একেবারে উত্তম ব্যবহার করা দরকার, ইত্যাদি অনেক রকম উপদেশ তিনি আমায় দিলেন। আর তার সঙ্গে যত উদাহরণ দিলেন সব আমার মার জীবনচরিত্র থেকে। তিনি এমন করতেন, তাঁর এমন রীতি ছিল, অমুক ব্যাপারে তিনি অমুক করেছিলেন, তাই

পরে এমন হল। এই রকম ঠাকুমা বারবার বলছিলেন, আর তাঁর চোখে জলও আসছিল। দাদার সব ধরনই ছিল ঠাট্টার। কিন্তু, আমি যাব বলে তার মন কত উদ্বিগ্ন হয়েছিল, তাও সহজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। বাইরে-বাইরে সে ঠাট্টা করছিল, কিন্তু তার মনে মনে সত্যি দুঃখ হয়েছিল। মাঈসাহেবও সেদিন ততটা দেমাক দেখাচ্ছিলেন না। আমার সঙ্গে ভালো ভাবে কথা বললেন। বৌদি কখনো কথা বলল, কখনো বললনা। কিন্তু বলতে বলতে যা একটি বাক্য বলে ফেলল, সেটা আমার বেশ মনে রয়েছে! "ঠাকুরঝি, তুমি বেশ স্বাধীন হলে ভাই। আমি এমনি···" তারপর সে কিছুই বলল না। কিন্তু তার অভিপ্রায়টা আমি তক্ষুনি জানতে পেরেছিলাম।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমি দুর্গীর বাড়ি গেলাম, এ কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে না। তারা আশা করছিল যে দুর্গীর দু'এক দিনে খোকা হবে, কিন্তু সে রকম কিছুই হচ্ছিল না। তার ন' মাস পুরো হয়ে, দশ মাসেরও কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছিল। এ কী ব্যাপার? সে একটিবার ভালোয় ভালোয় খালাস হলে বাঁচে, এই চিন্তায় তারা সবাই ছিল। আমি গিয়ে দু'দণ্ড তার কাছে বসলাম। তার মুখের ভাব কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। চেহারাটা কেমন যেন ফোলা ফোলা দেখাচ্ছিল, আর হাত পাও সেইরকম। সে যে জায়গায় বসত, সে জায়গা ছেড়ে উঠতেও তার শক্তি ছিল না। সব সময় তার গা ছম্‌ছম্‌ করত। আজ কতদিন ধরে এই পীড়া হ'য়েছিল, কিন্তু কেউ তার খবরই রাখত না। 'হতে পারে, 'প্রসবকালে মেয়েদের অমন হয়', এমনি করে সব কিছুর উপেক্ষা হচ্ছিল। আমি যখন সেখানে গেলাম, তখন দুর্গী আবার আমাকে তার নিজের সে সব ব্যাধির কথা বলল। শেষে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেও আমাদের গল্প কখনো ফুরোবে না বলে আমি যাবার জন্য উঠলাম।—তখন জলভরা চোখে দুর্গী আমার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, "যমু, আর কি তোকে দেখতে পাব ভাই? এই আমাদের শেষ দেখা তো। আচ্ছা, আয় ভাই······।" তার সেই আর্ত স্বরের দুঃখময় কথা শুনে আমার বুক থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। আমি মুখ ফুটে কথা বলতে পারছিলাম না। তেমন সময় কী বলব? আমি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসলাম। কিন্তু আবার তাড়াতাড়ি তাকে বললাম, "দুর্গী,

ভরা ঘরে পোয়াতী বউ তুই। যখন তখন অমন কথা উচ্চারণ করে নিজেকে আর বাড়ির সকলকে কেন মিছিমিছি দুঃখ দিস? শান্ত হ'। কাল খোকা কোলে করে······," কিন্তু তার পরে আমার মুখ ফুটে কথা বেরুচ্ছিল না। আমার চোখ বেয়ে ঝরনা বইতে লাগল। শেষে, আর একেবারে বসবার সময় নেই জেনে, যেমন তেমন করে দুর্গীর মা আর ঠাকুরমার কাছে বিদায় নিলাম। তাঁরা কোলে খন নারকোল তুলে দিলেন, তাই নিয়ে আবার বাপের বাড়ি ফিরে এলাম। দাদা এলে তার কাছে বিদায় নিয়ে আমার যাওয়া উচিত, তা এমন সময় দাদাও এল। আমি যখন রওনা হচ্ছি, তখন ঠাট্টা না করে দাদা মন ঢেলে বলল, "যমু, চললে তুমি? এখন সাত-আটদিন বাদে আমাকে সুখের দু'কথা বলবে বাড়িতে এমন আর কেউ রইল না। আচ্ছা। চিঠি দিও কিন্তু। প্রত্যেক আট দিনের দিন চিঠি লিখো। তুমি বাঁকাচোরা অক্ষরে হলেও চিঠি লিখতে পারো। তোমরা যেখানে থাকবে সেখানকার মেয়েরা বিদ্বান। তাদের কাছে বিদ্যালাভ করে নিও। তাদের একজন নাকি ইংরিজিও বেশ জানেন। দেখো, তোমার স্বামী আমাকে সব কথা বলেছেন।" আমি শুধু ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বললাম; কিন্তু আমার মন দুর্গীর বিষম অবস্থার ভাবনায় ব্যগ্র হয়ে ছিল। তাই আমি দাদাকে বললাম, "দাদা, আমি চিঠি পাঠাব, কিন্তু তুমি আমাকে সব খবর দেবে তো? এখন তোমার চিঠিতেই আমি যা সংবাদ পাব ভাই। আর দাদা, যে করে হোক, চিঠি লিখবার আগে দুর্গীর বাড়ি গিয়ে তার খবর আমায় দিয়ো। ওর অবস্থা খুব খারাপ। ওর খোকা হলে, অমনি আমায় চিঠি দিও। ওর জন্য আমার বড্ড ভয়। ওর লক্ষণ ভালো নয়। তুমি যাই করো ভাই, তাদের বাড়ি গিয়ে, আমাকে ওর খবর দিয়ো।" দাদার মনেও দুর্গীর বিষয়ে একরকম স্নেহ ছিল। সে তক্ষুণি বলল, "যমু, এ-কথা কি বলতে হবে? আট দিনে দু'বার তাদের বাড়ি গিয়ে আমি তোমাকে ওর খবর দেব, তাহলে তো হল?" দাদার সেই আশ্বাস শুনে আমার সন্তোষ হল। তারপরে এদিক-ওদিকের গল্প করতে করতে একেবারে সন্ধ্যা হয়ে এল। তখন আর বসবার জো ছিল না। আমাকে সকাল সকাল ফিরে আসতে বলেছিলেন, আর আমি এত দেরি করেছি, তাই ঠিক বিষম বকবেন মনে করে আমি দাদাকে সঙ্গে করেই শ্বশুরবাড়ি এলাম। পথেও আমাদের সেই রকমই

কথাবার্তা চলছিল, একথা না বললেও বুঝতে পারা যাবে। পথেই দাদা আমাকে বলেছিল যে, সে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে আসবে। শুধু তাই নয়, সে ঠাকুরমাকে নিয়ে—অবশ্য সুন্দরীও তাঁর সঙ্গে এল—রাত্তিরে আমাদের বাড়ি এল। তার পরের ঘটনা তো আগেই বলেছি।

অবশেষে বোম্বাই

দ্বিতীয় দিন সকাল সাতটার সময় গাড়ি বোম্বাই পৌঁছুল। সেই প্রকাণ্ড স্টেশন দেখবামাত্র আমার বুকে কেমন যেন মস্ত বোঝা অনুভব করতে লাগলাম। দশ-পোনরোটা স্টেশন আগে থেকেই লক্ষ্য করছিলাম একেবারে আলাদা রকমের ঘর বাড়ি, কোনো কোনো স্টেশনে দেখতে পাচ্ছিলাম মিলের ইমারত, আকাশ-ছোঁওয়া চিমনি, এ-সব দেখে তো আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। তার উপর যখন আবার সেই প্রকাণ্ড স্টেশন দেখলাম, তখন আমার মনের কী রকম অবস্থা হল, তা যারা অভিজ্ঞ তারাই বুঝতে পারবে। বোম্বায়ের বিষয়ে আমার শুধু এই ধারণা ছিল যে, সেটা পুণার চেয়ে খুব বড়ো শহর। পুণায় তেতলা বাড়ি আর বোম্বায়ের বোধহয় সাততলা বাড়ি। কিন্তু এখানে যা দেখি সবই আলাদা। পুণার সঙ্গে কিছুই মিল নেই। ওমা! কত রকমের গাড়ি, কত ট্রামওয়ে। সবই যে ভিন্ন রকমের। আমরা ভাবতাম যে আমাদের পুণা শহর কত বড়। কিন্তু এটা যে বিরাট একটা শহর—শহর নয়, যেন একটা দেশ। এর সঙ্গে পুণার কোনো তুলনাই হতে পারে না। এমন প্রকাণ্ড শহর দেখে হতভম্ব হয়ে যাব তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আমি তো থতমত খেয়ে চুপ করে[১] বোবিন্দর স্টেশনে বসলাম আর পাগলের মতো এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। আমার চেয়েও মার অবস্থা বড় অদ্ভুত হয়েছিল। ঘোড়ার গাড়িতে বসলে তিনি ওঁকে বললেন, "কী বাবা, এত সব ভিড়, কতো গাড়িঘোড়া, এ কী ব্যাপার? আমাদের কোথায় এনে ফেলেছ? এ কী, এত সব মানুষ, কী ব্যাপার?" তাই ওঁর বা হাসি পেল! আর আমিও হাসি চেপে রাখতে পারছিলাম না, একদিকে মুখ করে নিজের মনে হাসছিলাম।

সে-সব আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে দেখতে আমরা গিরগাঁওয়ে আমাদের

১ বোবিন্দর—বোম্বায়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনের মারাঠি নাম।

পাড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। গাড়িটাকে একেবারে পাড়ার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সামনের বাংলোটা পেরিয়ে, পাশ কেটে পিছনের দিকের বাংলোতে আমাদের ঘর ছিল। আমরা সেখানে গিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম, এমন সময় দুটি আমার চেয়ে বয়সে একটু বড় আর দেখতে সুন্দর তরুণী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "আসুন কাকিমা, এসো সীতাবাই, আমরা তোমাদের পথ চেয়েই আছি।" মানুষের মুখ দেখে তার অন্তঃকরণ যে-রকম মনে হয়, সত্যি যদি সে-রকম হয়, তাহলে সে মেয়ে দুটি নিশ্চয় অতি সুশীলা আর সুস্বভাব ছিলেন। আমাদের সঙ্গে যেন তাঁদের কত দিন ধরে জানাশোনা, এমন ভাবে তাঁরা কথা বলতে লাগলেন। একজন নিজের চাকরকে ডেকে আমাদের জিনিসপত্র উপরে পাঠিয়ে দিলেন। ওঁর সামনে তাঁরা দুজনে অমন মন খুলে কথা বলতে লাগলেন, হাসলেন, দেখে আমার কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। কিন্তু আধ মুহূর্তেই সেটা ভুলে গেলাম। আমরা উপরে যেতেই একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা এসে মার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। এমন সময় সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে উনি বললেন, "গোপিকাকিমা, আমরা এখন আপনার কাছে এসেছি। এরা কিছু জানেন না, আপনার[১] নানার মতোই আমি, তখন......"

সেই সুশীলা মহিলা বললেন, "তুমি একটুও ভেবো না। আমরা তো আর এখন কেউ পর নই।..." আমরা এ রকম কথাবার্তা বলছি এমন সময়, ওঁর চেয়ে একটু বয়সে বড় দু'জন তরুণ সেখানে এলেন আর বললেন, "কী রঘুনাথ রাও, এলেন সপরিবারে?" তাঁরা আসামাত্র আমি চট্ করে অন্য ঘরে চলে গেলাম। মাও যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু, এমন সময় গোপিকাবাই মাকে বললেন, "আপনার যেতে হবে না, যেমন আমি, আপনিও সেই রকমই তো?" আর সে দু'জনের যিনি একটু বেশি বড় ছিলেন তিনিও অমনি বললেন, "কাকিমা, যেমন আপনার রঘুনাথ রাও, আমরাও তেমনি। আমরা আসতেই আপনি কেন ভিতরে চলে যাবেন?" আমি ভিতরে যাওয়ামাত্র সেই দু'টি তরুণীও আমার সঙ্গে ভিতরে এলেন। তাঁরা দু'জনে আমার হাত ধরে আমাদের বাসার সব জায়গা দেখালেন। দেখলাম, সব পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, আর সব কিছু প্রস্তুত। কাঠ এনে

১ নানা—একটি মারাঠী ডাক নাম।

রাখা ছিল, জল ভরে রাখা ছিল, চাল টাল এনে রেখেছিলেন; ছিল না এমন জিনিস নেই। ঠিক যেন আমরা কতদিন ধরে সেখানে সংসার করছিলাম, আর মাঝে দু'চার দিন ঘরে তালা দিয়ে কোথাও গিয়াছিলাম। কোথাও ঠেকে যাবার মতো কিছুই ছিল না। এত সব ব্যবস্থা এত যত্নে কে করেছিল? আমাদের আমড়ে যাবার আগে উনিই সব প্রস্তুত করে রেখেছেন এটা অসম্ভব, কেন না একে তো এত সব যোগাড়যন্ত্র ওঁর পক্ষে ভেবে পাওয়া অসম্ভব ছিল; তাছাড়া অমন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ব্যবস্থা নিশ্চয়ই মেয়েলি হাতের; অন্ততঃ মেয়েদের তদারক ছাড়া হতেই পারে না। থাক্। সে ব্যবস্থা কে করেছিল, তা আমিই যখন সে সময় জানতে পারিনি, তখন তা আগেই বলা উচিত হবে না। এত সব প্রস্তুত থাকা সত্বেও তাঁরা সেদিন সকালে আমাদের তাদের বাড়িতেই খেতে অনুরোধ করলেন। সন্ধ্যাবেলা না হয় নিজের ঘরে রান্না করবেন, এখন করতে হবে না, এই অনুরোধ করলেন। নিচের তলায় যাঁরা ভাড়াটে ছিলেন তাঁদের ওখানেই সকলের, মানে উপরের তলার লোকেরও নাকি, সেদিন খাবার কথা ছিল।

সেদিন যখন আমরা খেতে বসলাম, তখন বাইরে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সেই তিনমূর্তি দেখে, আর ভিতরে আমার সামনে যাঁরা বসেছিলেন, সেই দু'টি মেয়েকে দেখে আমি কী ভাবলাম, তা কি কেউ জানে? যদি বলি আমার মনে হয়েছিল যে আমরা তিনজন আর বাইরের তিনজন একেবারে উচিত-মাফিক উপযুক্ত জোড়া মিলেছি তা হলে কেউ যেন না হাসে। কেন না, তখন আমি ওই রকম ভেবেছিলাম সত্যি। আমার শাশুড়ী আর গোপিকা-কাকিমা ও এঁরা দু'জন তখন খেতে বসেন নি। তাঁরা দু'জনে আগ্রহ করে আমাদের আগে খেতে বসতে বাধ্য করলেন। আমরা অনেক বললাম যে আমরা পরে খাবো, কিন্তু তাঁরা কি তা শোনেন? বললেন, "পরে আবার কী আবার? এক সঙ্গেই হোক।" আমরা আসার পর এক প্রহর হতে না হতে আমার শাশুড়ী আর গোপিকা-কাকিমা দু'জনের বেশ জমল। আমার সঙ্গে সেই দুজন তরুণীরও বেশ মিল হল।

কত আর তরুণী তরুণী বলব? একজনের নাম ছিল লক্ষ্মীবাঈ, আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিল যশোদাবাঈ, একথা একেবারে বলে ফেলাই ভালো। লক্ষ্মীবাঈ যশোদাবাঈয়ের চেয়ে বয়সে একটু বড় ছিলেন। দেখতে

বেশ কমনীয়, রং একটু শ্যামল ছিল। তিনি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। বাইরে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁর নাম বিষ্ণুপন্ত, তিনি তাঁর স্বামী। এই দুজনের জুটি কত সুন্দর…

আর…কী বলব? এই জুটির উচিত বর্ণনা আমি করতে পারছি না। আমি মনে মনে বলতাম যে আমাদের দু'জনের জুটি বড়ো সুখী, কিন্তু এদের দেখে আর কী বলব সেই অন্য জোড়াটিও দেখে, সেদিন থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে আমাদের মতো সুখী দম্পতি জগতে আরও আছে। শুধু তাই নয়, আমি ভাবতে লাগলাম যে আমাদের চেয়েও এই দুটি জুটি বেশী সুখী। কেন না, বিষ্ণুপন্তের স্ত্রী-শিক্ষায় একেবারে স্বামীর মতো না হলেও তাঁর কাছাকাছি গিয়েছিলেন। ইংরিজি বই পড়ে তিনি একটু-আধটু বুঝতে পারতেন। আর তার পরের পড়াশোনা তাঁর চলছিলই। যশোদাবাঈও যেমন রূপসী তেমনি বুদ্ধিমতী ছিলেন। এঁর স্বামীর ডাক নাম ছিল নানা। এই দুই পরিবারের সহবাসে আমাদের দু'আড়াই বছর বেশ সুখে কেটে গেল। সে যে কত সুখে, তা আমার পরের ইতিহাস পড়ে বোঝা যাবে। তাই, বোম্বাই বাসের সময়ে, যাদের সান্নিধ্যের ফলে আমার মন এমন বিকশিত হল, তাঁদের অল্প বর্ণনা দেওয়া এখানে দরকার মনে করে, পরের ঘটনা বলবার আগে আমি এঁদের একটু বর্ণনা দিচ্ছি।

প্রথমে নানাসাহেব আর তাঁর পরিবারের কথা বলতে আরম্ভ করি। কেন না, তাঁর আর ওঁর জীবনচরিতের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। উনি যেমন মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন, তেমনি নানাসাহেব তাঁর কাকার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন। উনি পুণা কলেজে পড়াশোনা শেষ করে বোম্বাই এসেছিলেন, ঠিক সেইরকম তিনিও এসেছিলেন। কিন্তু পরে আমি জানতে গেলাম যে, কাকার সঙ্গে কোনো কারণে তাঁর একটু মতভেদ হয়েছিল তাই বোধহয় তিনি এসেছিলেন। তাঁর আর ওঁর চিন্তাধারা একেবারে এক রকমের। মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে, ছোট বয়সে বিয়ে দেবার সম্বন্ধে, বিভক্ত পরিবারে থাকা সম্বন্ধে, সব বিষয়ে দু'জনের মতের মিল ছিল। তাঁর পরিবার—মানে তিনি, তাঁর মা, তাঁর স্ত্রী। তাঁর এক বোন ছিল, কিন্তু সে তার শ্বশুরবাড়িতে থাকত। কখনো কখনো এদের বাড়ি আসত। সম্প্রতি এখানে ছিল না।

দ্বিতীয় পরিবারের লোক বিষ্ণুপন্ত আর তাঁর স্ত্রী। আগেই বলেছি যে, এদের মতো সুখী পরিবার দুনিয়ায় পাওয়া মুশকিল। আহা! কত যে তাঁদের পরস্পরের ভালোবাসা। সেই যে বলে, একজন হোঁচট খেলে দ্বিতীয় জনের বেদনা[১] হয়, সেকথা এদের সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি ছিল। অবশ্য তার কারণও ছিল। এঁদের ইতিহাস বিশেষ অদ্ভুত, তাই আমি সেটা এখানে দিচ্ছি। এরা দু'জনে ছেলেবেলা থেকে এক জায়গায় মানুষ হয়েছিলেন একসঙ্গে খেলাধুলো আর পড়াশোনা করেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা, বিষ্ণুপন্ত ইস্কুল থেকে ফিরে নিজের ভাবী স্ত্রীকে কিছু না কিছু পড়তে শেখাতেন। ছুটির দিনে কোনো বই তাঁকে পড়ে শোনাতে বলতেন। কোনো কিছু করার সময় দুজনে একজায়গায় একমত হয়ে করতেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁরা কখনো পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন বলে তাঁদের মনে পড়ে না। বিষ্ণুপন্তের ছোটবেলাতেই তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাই বিষ্ণুপন্তের বাবা নিজের সম্পত্তিশুদ্ধ ছেলেটিকে লক্ষ্মীবাঈর বাবার কোলে তুলে দিয়েছিলেন। ফলে লক্ষ্মীবাঈর বাবা-মাই বিষ্ণুপন্তের মা-বাবার মতন হয়েছিলেন। তাই তাঁদের সব সময়টাই পরস্পরের সান্নিধ্যে কেটেছিল, আর ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই ছিল যে তাঁরা আজীবন পরস্পরের সহবাসে কাটাবেন। তাঁর বাপ-মা মানে যমুনাবাঈর বাপ মা—তাঁর বাপের বাড়ির নাম আমার যা-নাম তাই ছিল—কাশীযাত্রায় গিয়েছিলেন। বিষ্ণুপন্তের আর তাঁর স্ত্রীরও চিন্তাধারা ঠিক আমাদের এর মতো ছিল বললেও চলে। লক্ষ্মীবাঈ বুঝতে পারতেন না এমন বিষয় ছিল না। সব কিছুর খবর আমরা তাঁর কাছে পেতাম। যশোদাবাঈও তেমনি ছিলেন, কিন্তু এককংকা[২] কম। দুজনে সমান ছিলেন বললেও চলে। আজকাল আমি ভাবতাম যে আমিই হাবাগোবা মেয়ে তাদের মধ্যে এসে পড়েছি, আর আমার লজ্জা বোধ হত। রবিবারে পুণায় আসা অবধি উনি যে তাঁদের কথা এত বিশেষভাবে বলেছিলেন তা প্রত্যক্ষ সত্য যখন দেখতে পেলাম, তখন আমি মনে মনে কী ভাবলাম? যে এইরকম মেয়ে হওয়াই ধন্য। এই ভেবে আমার কত যে লজ্জা করল। দু'একবার সত্যি বোধ হল যে, আমি

১ একটি মারাঠী প্রবাদ।
২ একটা মারাঠী প্রবাদ। অর্থ অস্পষ্ট।

নিশ্চয় ওঁর যোগ্য নই। উনি সাধ করে ভালো মেনে নেন এই! এ-কথা আমার শুধু মনে হয়ে রইল না, বোম্বাই গিয়ে পাঁচ ছদিন যেতেই একদিন সে-কথা আমি ওঁর কাছে বলে ফেললাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা খাবার সময় পুরুষদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে কথা আপনা থেকেই উঠেছিল। আমাদের বাড়ি উনি খেতে বসেছিলেন, এমন সময় অমনি বিষ্ণুপন্ত আর নানাসাহেব এসে বসলেন। তখন কি রকম করে যেন উঠল সেই কথা। কোনো একটা বালিকা বিদ্যালয়ের কি যেন খবর তাঁরা পড়ছিলেন, তাই বোধহয় সে কথা উঠেছিল। সেটা ঠিক এখন আমার মনে নেই। আমি অবশ্য পরিবেশন করতে করতে সে-কথা শুনলাম। আজকাল রোজ রাত্তিরে আমাকে একঘণ্টা পড়তে বলতেন। পড়তে পড়তে আমি যখন ভুল করতাম তখন উনি আমায় বলতেন, "নাঃ, একেবারেই যে তুমি নির্বোধ! ওই দেখো তো, নিচে-উপরে কি রকম?" উনি এই উদাহরণ দিতে অমনি আমার সত্যি সত্যি মনে হল যে আমি ভয়ানক নির্বোধ, আর আমার বড় দুঃখ হল। আমি মুখ ভার করে বললাম, "আজকাল আমি খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করি জানো? আমি কি বুঝতে পারি না যে আমি তোমার যোগ্য নই? কিন্তু কি করব?" একথা বলবার সময় আমার বুক এত কাঁপছিল যে বোধকরি তার ছায়া আমার মুখে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গিয়ে থাকবে। হয়তো সত্যি, দেখতে পাওয়াও গিয়েছিল। কেননা চট করে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমার মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, "না না! সে কি কথা? তা কক্ষনো হতে পারে না। পাগলি কোথাকার! আমার কথার এই অর্থ করলে তুমি? না। তুমি নিশ্চয় একেবারে আমার যোগ্য। আমি যেমনটি চাই, সেরকম মাণিকই আমি পেয়েছি।"

"তুমি তো সব কিছু ভালো বলে মেনে নাও! কিন্তু আমি এখন সত্যি তোমার যোগ্য হব, কেমন? লক্ষ্মীবাঈ আমাকে কত সাহায্য করেন। আমাকে কত শিক্ষা দেন। আমি সময় পেলেই ওঁর কাছে যাই, না হলে ওঁরা দু'জনে আমাদের এখানে আসেন। ওঁরা দু'জনে এত বিদ্বান, কিন্তু ওঁদের একটুও গর্ব নেই। আমি একেবারেই কিছু জানিনে বললেও ভুল হয় না। কিন্তু লক্ষ্মীবাঈ কিংবা যশোদাবাঈ একটুও ঠাট্টা করেন না। উলটে যে-দিন তাঁরা আমাকে প্রথম পড়ে শোনাতে বললেন,

সেদিন বললেন, "বাঃ! শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি অমন অবস্থায় থেকেও তুমি তো বেশ সুন্দর পড়তে পার!"

"হুঁ! তবে তো নিশ্চয় গর্বে কেটে পড়লে।"

"আহা! ও কী কথা? আমি কি সত্যি বিদ্বান যে আমার লেজ মোটা হবে!"

"আচ্ছা বেশ। মোট কথা যে-রকম ইচ্ছে ছিল সে-রকম, মনের মতন বাসা হয়েছে তো? এখন দেখা যাবে আপনার পড়াশোনা কেমন হয়। আচ্ছা, তাঁরা কিন্তু সব্বাই, স্বামীস্ত্রীরা এক জায়গায় বসে আলাপ আলোচনা করেন, সেখানে তুমি আসবে? আজ চার-পাঁচ দিন হল তাঁরা আমাদের ভয়ে, মা জানতে পেলে কী মনে করবেন ভেবে, সে-রকম গল্প করতে বসেন নি। কিন্তু, আমি তাঁদের বলেছি যে আপনারা বেশ বসতে পারেন, আমরা দু'জনেও আসব।"

"সে কি? এক জায়গায় বসে কথাবার্তা বলেন? তা কি কখনো হয়? মেয়ে আর পুরুষ এক জায়গায়?"

"কেন? 'তা কি কখনো হয়' বলবার কী হল? আমার বাপু এ রকম বেশ পছন্দ হয়। দেখো, আমরা সমান বন্ধু! আমরা আর আমাদের স্ত্রীরা রাত্তিরে দু'দণ্ড একত্র বসে কথাবার্তা বললাম, কিংবা বসে কিছু পড়লাম, তাতে ক্ষতি কি? এরকম একসঙ্গে বসে কথাবার্তা বললে তো পরস্পরের চিন্তাধারা বুঝতে পারা যাবে। আজ আর হচ্ছে না, কিন্তু কাল আমরা দু'জনে যাব। চাও তো তুমি যশোদাবৌদির সঙ্গে যেও। আমি, আমি—"

"ছিঃ! মা কি বলবেন? বলবেন যে একেবারেই গণ্ডি পেরিয়েছে! নিজের নিজের বউ নিয়ে একত্রে বসে কী যে গল্প করে!"

"মা কিছু বলবেন না। ওই যে, নানার মা নেই? তিনি কিছু বলেন? আমাদের মাও তেমনি। এই পাঁচ ছ'দিনে শাশুড়ী বউতে কখনো ঝগড়াঝাঁটি শুনতে পেলে? শাশুড়ী কিছু বলবার কারণ পেলে তো? বৌমা কেমন লক্ষ্মীটি দেখেছ তো। তুমিও তেমনি আচরণ করলেই হল। মা জানেন যে আমি কখনো অনুচিত কাজ করব না। তবে, কি বলো? কাল আমরা যাব, কেমন?"

"দেখো বাপু, আমি তোমার কথা ঠেলতে পারি না। কিন্তু মা—"

"সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না। সে আমি দেখে নেব। শেষ পর্যন্ত, মা যদি পছন্দ নাই করেন, তাহলে পরে আর যাব না। কালকে তো যাব—"

"কালকে থাক। আর কোনো দিন।"

"কেন? আর কোনো দিন মানে কি? শুভক্ষণ দেখবে নাকি?"

"শুভক্ষণ কিসের? কিন্তু শুধু—"

"শুধু না, কিছু না। আমি এবার বিষ্ণুপন্তের স্ত্রীকে বলেই তোমাকে ডেকে পাঠাব, তাহলে তো আর...ব্যস্, ঠিক তাই হবে।"

আমার মনে সেদিন রাত্রে সেই এক চিন্তা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। কেমন করে যাব? কী রকম করে বসব? কী বলব? মা কী বলবেন?

ভারি চিন্তা হল

সকালে উঠেই বা আমার কি আর অন্য কোনো চিন্তা ছিল? এত সব লোকের মধ্যে আমি বসব কেমন করে? বলব কী? আমাকে লোকে কী বলবে? মা কী বলবেন? পুণায় দিদিশাশুড়ী টের পেলে তিনিই বা কী বলবেন? মামীশাশুড়ী কী বলবেন? প্রত্যেক মানুষ কী বলবে? এই সব ভেবে আমি চিন্তামগ্ন হয়েছিলাম। একবার মনে হচ্ছিল যে আমার না যাওয়াই ভালো। আবার ভাবছিলাম যে ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ করা উচিত নয়। আমি ঘরের কাজকর্ম সবই করছিলাম, কিন্তু মনে শুধু এই এক চিন্তা ছিল। যে-কাজ কখনো করিনি, সেটা করবার প্রসঙ্গ এলে এমন হয়ই। তিন-তিন বার মনে হচ্ছিল তাঁরা দু'জন কী রকম করে বসেন? কী রকম কথা ক'ন? বিষ্ণুপন্তের স্ত্রীকে নানার সঙ্গে আর তাঁর স্ত্রীকে বিষ্ণুপন্তের সঙ্গে কথা কইতে, হাসতে আমি দু-তিন বার দেখেছিলাম। তখন আমার তা কত যে অদ্ভুত মনে হয়েছিল। কিন্তু দেখতে পেলাম যে নানার মা তাতে তেমন কিছু মনে করলেন না। আর নানা তো হেসেই উলটে লক্ষ্মীবাই আর বিষ্ণুপন্তকে ঠাট্টা করতে লাগলেন। কেউ হয়তো মনে করবে যে নানাসাহেবের বৃদ্ধা মার মর্যাদা কেউ রক্ষা করত না! কিন্তু সে-রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। কেন না, তাঁরা সবাই গোপিকাকাকিমাকে এত মান্য করতেন যে অতিশয় শালীন ছেলেমেয়েরাও বোধহয় নিজের মাকে এত মর্যাদা দেয় না। তাঁর সামনে—একটু মর্যাদা রেখে—বৌমা আর ছেলে পরস্পরের সঙ্গে বেশ মন খুলে কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু তিনি কখনো তা অনুচিত মনে করেন নি। শুধু তাই নয়, তাতে তাঁর অসীম সন্তোষ ছিল। তিনি কখনো কখনো ঠাট্টা করে সকলের সামনে বলতেন, 'হ্যাঁরে, বলি, তোমরা যে আমার সামনে বেশ কথা কও? আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে দেখছি একেবারে ভব্যতার সীমা পার হয়েছে, না

বিষ্ণুপন্ত? কী হে রঘুনাথ রাও, তোমরাও কি এই রকম তোমাদের মার সামনে কথা কও?' তাঁর সে-কথা শুনে সবাই হাসতেন, আর নানা বলতেন, 'বাহবা, নিজেই তো বললে যে বেশ কথাবার্তা বলতে পারো; আর সকলের সামনে এখন আমাদের লজ্জা দিচ্ছ? বেশ তো!'

একটা বিষয়ে কিন্তু মা-ছেলেতে, আর শাশুড়ী-বউতে সব সময় কথা-কাটাকাটি চলত। সেটা এই যে, শাশুড়ী যেন বউয়ের হাতের রান্না খান। নানা আর তাঁর স্ত্রী গোপিকাকাকিমাকে সব সময় অনুরোধ করতেন যে তিনি যেন নিজের বৌমার হাতের রান্না খান। এছাড়া, সমস্ত দু-আড়াই বছরের মধ্যে তাঁদের কথা-কাটাকাটি আমি কখনো শুনিনি। থাক্, পরের অনেক কথা আমি আগেই কেন বলছি।

উপরে বলেছি সেদিন সেই অদ্ভুত চিন্তায় আমার মন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। খাওয়াদাওয়া সারা হলে আমি আর যশোদাবাঈ রোজকার মতো উপরে লক্ষ্মীবাঈর ওখানে গেলাম। মা নিচে শুয়েছিলেন। লক্ষ্মীবাঈর ঘর এত পরিপাটি আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত যে সেখানে গেলে আমি ভাবতাম, কেমন করে বসি, কোথায় বসি, ওদিকে বসলে ব্যবস্থা বিগড়ে যাবে না তো? এদিকে বসলে কি হবে? তিনি সব জিনিসপত্র ভালো করে গুছিয়ে রাখতেন। নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস নানা জায়গায় সাজিয়ে রেখেছিলেন। তার উপর লক্ষ্মীবাঈ নিজের হাতের তৈরি অনেক রেশমের, পশমের, জোয়ারী গাছের শুকনো মজ্জার কলা-কৌশলের কাজ জায়গায় জায়গায় সাজিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলি দেখে তাঁর বুদ্ধির, চাতুর্যের আর কৌশলের তারিফ না করে থাকা অসম্ভব হত। আর তাঁর সহবাসলাভ হলে তাঁর শালীনতা, সুস্বভাব, মনের নির্মলতা, ইত্যাদি দেখে খুব আশ্চর্য হতাম। লোকে যে বলে দেবতা কখনো কখনো এসে পৃথিবীতে বাস করেন, সে-কথা মিথ্যা হতে পারে না। শাশুড়ীর সম্বন্ধে তাঁর নিজের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। কিন্তু তিনি আমার শাশুড়ীকে আর নানার মাকে নিজের শাশুড়ীর চেয়ে সমীহ করতেন। তাই লক্ষ্মীবাঈ যা করতেন, তা করতে শাশুড়ীর অনুমতি নেবার আমাদের ততটা দরকার হত না, এইরকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

আমরা উপরে গেলে নিত্যকারের মতো আমাদের কিছু কিছু কথাবার্তা শিক্ষা সুরু হল। কিন্তু আমার মন সেই আগের দিন উনি যে-কথা বলে-

ছিলেন তাতে নিমগ্ন হয়ে ছিল। তাই বার বার ভাবছিলাম যে লক্ষ্মীবাঈ যশোদাবাঈকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনারা রাত্তিরে এক জায়গায় বসে কি কথাবার্তা বলেন? কী রকম করে কথা বলেন?' তাই আমার কাজের দিকে আর গল্পের দিকে লক্ষ্য ছিল না। যশোদাবাঈ সেটা অনুমান করে হঠাৎ আমাকে বললেন, "কী সীতাবাঈ, আজ তোমার মন ঠিক নেই দেখছি—কোথায় ধাবিত হয়েছে? যেদিকে তোমার উনি বাইরে গিয়েছেন সেদিকে নাকি? লক্ষ্মীবাঈর সব সময় অমন হয়, তাই বলছি।"

লক্ষ্মীবাঈ—আহা, মরি মরি! নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জগৎকে চিনতে যাচ্ছেন দেখছি! আসলে আজ আপনারই কিছু—

যশোদাবাঈ—আমার তো কিছু নয়। কিন্তু সীতাবাঈর মন আজ নিশ্চয় ঠিক নেই।

আমি—কিছু নয় গো। কেন শুধু শুধু আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেন? আমি শুধু ভাবছিলাম যে আপনারা দুজনে এত বিদ্বান, আর আমি একেবারে বোকা, তাই এখন আমি শিখব কী করে? আর কখন? আমাকে যখন-তখন উনি অপদস্থ করেন তাই, অমনি—

লক্ষ্মীবাঈ—সত্যি নাকি? মোট কথা, আজকাল তোমার পিছনে ভারি জুজু লেগেছে দেখছি! কিন্তু তুমি অমন ভয় পাও কেন? বলে দিয়ো যে এক বছরের মধ্যে ঠিক আপনার মতো লিখতে পড়তে পারব। তোমার অত ভয় কিসের? আজকাল তুমি যে-রকম পড়াশোনা কর, ঠিক তেমনি রোজ কোরো, তা হলে দু'আড়াই বছরে তৈরি হয়ে যাবে। আর দেখো একটু নির্ভীক হও। ওগো—

যশোদাবাঈ—সত্যি লক্ষ্মীবাঈ, জিজ্ঞেস করো না এঁকে। পাঁচ-ছ'দিন হয়েছে তো? আমাকে তো কালই বললেন,...

যশোদাবাঈ অর্ধেক কথা বললেন, আর অমনি উতলা হয়ে আমি বলে ফেললাম, "কি, কী বললেন আপনাকে?" আমি ভাবলাম বোধহয় আমাকে উনি যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে যশোদা-বাঈর স্বামী তাঁকে বলেছেন। আর শেষে তাই সত্যি হল। উতলা হয়ে এই প্রশ্নটি আমি জিজ্ঞাসা করা-মাত্র লক্ষ্মীবাঈ তাড়াতাড়ি বললেন, "তাতে কি? তাতে এঁকে জিজ্ঞেস করার আছে কী? যেমন আমরা, তেমনি ইনি! কিন্তু এঁর শাশুড়ীর জন্য যা একটু ভয়। তিনি যদি পছন্দ না করেন,

তা হলে এঁর কষ্ট হবে। আমাদের বিষয়ে এঁর মনে অশ্রদ্ধা জন্মাবে। তবে দেখে তো মনে হচ্ছে এঁর শাশুড়ীর স্বভাব গোপিকাবাঈর মতোই, তাই অত ভয় করতে হবে না। (আমার দিকে চেয়ে) কী গো, তোমার শাশুড়ী কি রাগ করবেন?"

তাঁর প্রশ্ন কোন বিষয়ে ছিল তা আমি এখন ঠিক বুঝতে পারলাম, তাই তক্ষুনি বললাম, "কি জানি! এখনো পর্যন্ত সংসারের কোনো ব্যাপারে তাঁর কোনো অধিকারই ছিল না। তাই তাঁর কী পছন্দ, কী অপছন্দ তা ঠিক জানা নেই! কোনো কিছু তাঁর পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক তিনি কিছু বলবেন বলে মনে হচ্ছে না। তবে কার্যকালে কেমন দাঁড়াবে তা বলতে পারি না।"

তাঁরা কিসের বিষয়ে কথা বলছিলেন তা আমি জানি দেখে যশোদাবাঈ বললেন, "রঘুনাথ রাও তোমাকে সব কথা বলেছেন দেখছি! তোমাকে জিজ্ঞেস করেছেন?"

"সেইটাই তো আমার মনে ঘুরঘুর করছিল, তাই আমার কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল। কখন থেকে তোমাদের জিজ্ঞেস করব ভাবছি। কিন্তু কেমন করে জিজ্ঞেস করব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না।"

"বাঃ! জিজ্ঞেস করবার কী আছে?" লক্ষ্মীবাঈ বললেন, "আমি তোমার শাশুড়ীর কথা ভেবে ভয় পেয়েছিলাম, না হলে দ্বিতীয় দিনই আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম। এরকম পরস্পরের সঙ্গে কথা বললাম, হাসলাম, এক জায়গায় বসে কিছু পড়লাম, তাতে হল কী? এ কী বিচ্ছিরি রীতিনীতি! আমরা যখন পুণায় ছিলাম, তখন থেকেই নানাসাহেব আমাদের বাড়ি আসতেন, আমরা পরস্পরের সঙ্গে তর্ক করতাম, কথা বলতাম, মা কিংবা বাবা কখনো কিছু বলতেন না। আর কাকা তো কোনো দিনই কিছু বলেননি, বরঞ্চ তিনি সে-সব ভালোবাসতেন। আমি তোমাদের স্পষ্ট বলছি, এই রকম পুরুষ আর মেয়েরা এক জায়গায় বসে কথাবার্তা বললে ভালোই হবে। এই বয়সে আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করলেই লাভ হবে। না হলে কী? আমরা তো আজ অনেক দিন ধরে এক জায়গায় বসে রোজ রাত্তিরে কিছু-না-কিছু পড়ি। আমাদের খবরের কাগজ পড়বার সময়টাও তখনি।"

তিনি যে-কথা বলছিলেন তা আমার স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। তা সত্যি হলে সে-সম্ভাবনা কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হল। আমি চুপ করে আছি দেখে যশোদাবাঈ হেসে বললেন, "কেন? এমন নিস্তব্ধ হয়ে বসলে কেন? তোমার বোধহয় বড় বিসদৃশ মনে হচ্ছে, না? আমরা তো কেবল কথা বলছি, যদি এতেই কেমন-কেমন ভাবো, তা হলে সন্ধেবেলা নিজের চোখে দেখলে কী ভাববে? তখন আমাদের একেবারে বেহায়া বলবে, না? ভাববে, আমাদের কত বড় স্পর্দ্ধা!"

"সে কী যশোদাবাঈ, আমি কেন তোমাদের অমন বলতে যাব? আমি কিছু জানি না, তাই আমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। একবার মিলেমিশে গেলে···কিন্তু আমায় আগে বলো, তোমরা সেখানে পরস্পরের সঙ্গে সকলের সামনে কথা কেমন করে বলো?"

আমার এই প্রশ্ন শুনে যশোদাবাঈ উচ্চৈঃস্বরে হেসে ঠাট্টা করে বললেন, "এইরকম করে গো, এই রকম! যেমন আমরা তোমার সঙ্গে কথা বলি, তেমনি, সেই রকমই তাঁদের সঙ্গেও বলি।"

লক্ষ্মীবাঈ—ও কী? মিছিমিছি ওকে ঠাট্টা করছ কেন? ও-বেচারি সরলভাবে জিজ্ঞেস করছে। কিছু নয়, সীতাবাঈ। আজ খাওয়াদাওয়া সেরে তুমি এসো, তখন সব বুঝতে পারবে। মিছে ভাবছ কেন এত!"

এই রকম কথাবার্তা হল। অন্যদিনের মতো তাঁরা আমাকে যা বলবার বললেন, শিক্ষা দি ন, আর চারটে বাজতে আমি আবার নিচে গিয়ে রান্নার আয়োজন করতে লাগলাম। আমাদের বাড়িতে আর ওঁদের দু'বাড়িতেও সন্ধেবেলা ঠিক সাতটার আগেই খাওয়াদাওয়া হত। উনি কলেজ থেকে ফিরলেই খেতে রাজি! নানা আর বিষ্ণুপন্তও তাঁদের কাজ সেরে ছ'টা, সাড়ে ছ'টার সময় আসতেন, আর বাড়ি এসেই প্রথম কাজ খাওয়া। খাওয়াদাওয়া সেরে তাঁরা আটটা-ন'টা পর্যন্ত এদিক-ওদিক করতেন, তারপর ন'টার পর সবাই একজায়গায় জমা হয়ে গল্প করতেন। আমরা সেখানে যাবার আগে থেকেই তাঁদের এরকম নিত্যকর্মের ধারা ছিল। আর আগেই বলেছি যে উনি সে-সব খুব পছন্দ করতেন।

সন্ধ্যাবেলা আমি রান্না করতাম, কেন না মা কিছু খেতেন না। তাই আমি লক্ষ্মীবাঈর ওখান থেকে নিচে এসে নিজের কাজ করতে লাগলাম। আমাদের বাংলোর কাছেই একটা মন্দির ছিল, গোপিকাকাকিমা আর

মা সন্ধ্যাবেলা সেখানে পুরাণ-পাঠ শুনতে যেতেন। দ্বিতীয় না তৃতীয় দিনে গোপিকাকাকিমা মাকে বললেন, "কাকিমা, এখন আপনি যতটা সম্ভব বৌমার উপরেই সংসার সঁপে দেবেন, আর আমার সঙ্গে কথা-পুরাণ শুনতে আসবেন। সকালবেলার কাজকর্ম তো আমরা নিয়েই আছি। ওরা বেশ ভালো বৌ পেয়েছে, এখন ওরা যা খুশি করুক। নারায়ণের কৃপায় আমাদের ছেলেরাও ভালো। এখন ওরা সংসার করুক, আর আমরা খুশি হয়ে দেখি চলুন।" আমার শাশুড়ীর স্বভাবও সেই রকম আর একেবারে সরল ছিল। যে যা বলবে, তাই তিনি শুনতেন। গোপিকাবাঈর কথা তাঁর একেবারে সত্যি মনে হল, আর তিনি সেই রকম আচরণ করতে লাগলেন। মন্দিরও বেশি দূরে ছিল না, তাই উনিও বারণ করলেন না। বরঞ্চ উনি বলতেন, "মা, মামাবাড়িতে তুমি অনেক খেটেছ, এখন ভগবানের দয়ায় কিছু টাকাকড়ি পাচ্ছি, তুমি আরামে বসো। সকালেও তুমি উনুনের পাশে যেয়ো না, একেবারে আরামে থাকো। দরকার হলে একজন রাঁধুনী রাখব, এতে টাকা জমানো যাবে না, এইতো! তা নাই বা জমল!"

"না না বাবা, রাঁধুনী-টাধুনী কিচ্ছু চাই না। তিনজনের রান্নাই বা কত! আর······"

"সে জন্য বলছিনা মা। কিন্তু আজ এত বছর তুমি কি কম খেটেছ? তাই বলছি; আর রাঁধুনী না রাখলেও তুমি আরামে শান্ত হয়ে বসো।"

"বাহবা রে বাহবা! আর এই মেয়েটাকে কাজকর্মে জুতব?"

"তাতে কী? আমি ঝটপট করে ফেলব," আমি বললাম।

"তোমরা এই বলেছ এতেই আমার আনন্দের অবধি নেই, বুঝলে বাছারা? আমি সকালের রান্না ছাড়ব না, তবে সন্ধ্যাবেলা আর রান্না করব না। ওই গোপিকাবাঈর ব্রত ধরব আমি। তিনি আমায় গুরূপদেশ দিয়েছেন।" এই রকমে মার নিত্যকর্মের আচরণ শুরু হল।

সেদিন যখন আমাদের খাওয়াদাওয়া চলছিল, তখন উনি আমাকে আস্তে বললেন, "কি বলো? আজ উপরে যাব, কেমন? যশোদাবাঈ যাবার সময় অবশ্য ডাকতে আসবেন। তাঁকে বলে রেখেছি।"

"আহা, মরি মরি! ওঁর স্বামীকে বলে ওঁকে বলে রাখার কি দরকার ছিল? কী যে করো!"

"বাঃ! তাতে কি হল? কিছু…"

"হবে আবার কি? কিন্তু একেবারে ওঁকে বলে…আমি কি তোমার কথায় না বলেছিলাম? একটু ভেবেছিলাম যে মা কি বলবেন, তাই একটু…"

"আচ্ছা, মার স্বভাব তুমি এখনো বুঝতে পারনি। তাই তুমি ওরকম ভাবলে, আর কিছু নয়। ওগো, মা আমাকে কিছুই বলবেন না।"

"না বললে তো ভালোই! কিন্তু ভাবলাম, যাতে তিনি প্রাণে কষ্ট পান তা না করাই ভালো। তিনি কোনো দিক দিয়েই যেন দুঃখ না পান। আজ পর্যন্ত তিনি কী রকম ভাবে কাল কাটিয়েছেন, আর এখন যদি আমরা এরকম…"

"ওঃ! বা রে বাঃ! শাশুড়ীর জন্য আজ ভারি ভাবনা দেখছি যে!"

"ভাবনা কিসের? কিন্তু আমি সেখানে না গেলে কি চলবে না? সেখানে আমার পাগলের মতো অবস্থা হবে। সকলে 'আহা! কী নির্বোধ, বোকা বউ', বলে তোমাকে ঠাট্টা করবে! নিজেরটা একবার ভেবে দেখো কিন্তু!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আজ পর্যন্ত আমি যে তাদের দু'জনের কাছে তোমার বুদ্ধির আর নির্ভীকতার যত গুণগান করেছি সে সব বৃথাই হবে দেখছি!"

"খালি খালি গুণগান কর্ তে গেলে কেন? তাও আবার লক্ষ্মীবাঈ, যশোদাবাঈর স্বামীর কাছে! বেশ! তবে তাঁরা নিশ্চয় আমাকে দেখে তোমায় পরীক্ষা করেছেন!"

"তাইতো বলছি। এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো। লজ্জাবনত হয়োনা, ধৈর্য দেখাও। সময়-মতো আমি পড়তে বললে, পড়তেও পিছপা হয়োনা।"

"না না, তেমন বিপদে আমায় ফেলোনা। তাহলে আমার লজ্জার আর সীমা থাকবে না।"

"বেশ বাপু, থাক। কিন্তু শুধু এসে বসো, আমরা যা কথাবার্তা বলব, তা শুনতে তো কোনো আপত্তি নেই?"

"তাই বা কি রকম হবে তখন দেখা যাবে!"

সভায় আমার ধৈর্য

যেমন ন'টার সময় কাছে আসতে লাগল, আমি কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কী আশ্চর্য দেখো! সমানবয়সী বন্ধু-বান্ধব নিজ নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে করে এক জায়গায় বসল, কথাবার্তা বলল, তাতে ক্ষতি কি? তাতে একটুও কোনো লোকসান আছে? কিন্তু না! আমাদের ছোট নজর তাতেও মন্দ ভাব দেখতে আরম্ভ করেছে। একজন স্ত্রীলোক আর একজন পুরুষ বসে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে দেখতে পেলে আমাদের নোংরা মনে সন্দেহ ছাড়া অন্য চিন্তা যেন কখনো আসেই না। মনটাকে 'ভালো নয়' এই শিখিয়ে শিখিয়ে একেবারে পঙ্গু করে ফেলা হয়েছে। কোনো কিছুতে সুচিন্তা কিম্বা ভালো যেন দেখতেই পায় না। এই রকম অবস্থায় বাস্তবিক যা একেবারে ভালো, একেবারে যুক্তিযুক্ত, সে বিষয়েও আমার বড় ভয় করছিল। এবার যখন যশোদাবাঈ আমাকে 'চলো' বলে ডাকতে আসবেন তখন আমি কি করব? যাব কি যাব না, এই আমি ভাবতে লাগলাম। এমনিতে যশোদাবাঈ এলেন, আর মার সামনেই আমাকে 'চলো, একটু উপরে লক্ষ্মীবাঈর ওখানে যাই' বললেন। কাজকর্ম সব সারা হয়ে গিয়েছিল, তাই মাও অমত করলেন না। কিন্তু আমি শুধু শুধুই ভাবলাম যে আমি যাই এমন তাঁর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সেটা আমারই কল্পনা। কেন না, তিনি আমাকে উলটে বললেন, "যাও, বসো না কেন ওখানে খানিকক্ষণ। আমিও এখন দুদণ্ড গোপিকাবাঈর ওখানে গিয়ে বসবো। এই বেলা বিছানায় শুয়ে পড়লে ঘুমিয়ে পড়ি, আর মাঝ-রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গিয়ে আর ঘুম আসতে চায় না।" কথায় বলে 'ঝরা ফলের আদেশ', যশোদাবাঈর সেই রকম অবস্থা হল। তিনি আমায় তাড়া দিতে লাগলেন। শেষে 'হ্যাঁ, না,' করতে করতে আমি কোনোমতে তাঁর সঙ্গে গেলাম। ঠিক তখন আবার লক্ষ্মীবাঈ নিজের কাজকর্ম সেরে আমাকে নিয়ে যাবার

জন্য নিচে নামতে উদ্যত হয়েছিলেন।

ছাদে একটা গোলটেবিল রাখা ছিল। তার উপরে একটা ইংরিজি ধরনের খুব জোরালো আলো রাখা ছিল। তার চারদিকে পাঁচ-ছয়খানা চেয়ার আর অপর দিকে একটা কৌচ পাতা ছিল। তাঁরা তিনজন টেবিলের পাশে বসেছিলেন। আমরা দু'জনে উপরে যাওয়ামাত্র লক্ষ্মীবাঈ তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে আমাকে ছাদের দিকে নিয়ে গেলেন। আমি একেবারে লজ্জিত হয়ে, 'না না না' করে অনিচ্ছা দেখাচ্ছিলাম। কিন্তু যশোদাবাঈ আর তিনি দুজনে কি আমাকে ছাড়েন? ছাদের পাশের দরজার কাছে যাওয়া মাত্র আমার ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু এবার একে-বারে উপায় নেই দেখে, মন শক্ত করলাম আর তাঁরা আমাকে টানবার আগেই তাদের পিছন পিছনে ছাদে গেলাম। তাঁরা দুজনে সোজা গিয়ে কৌচের উপর বসলেন। অতজন পুরুষের সামনে আমার বসতে সাহস হচ্ছিল না। ভাবছিলাম কখন যে পালিয়ে যেতে পারব! যেদিকে পুরুষরা বসেছিলেন সেদিকে অর্ধেক পিছন ফিরে আমি তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম, আর তাঁরা দুজন আমাকে 'বসো' বলে অনুরোধ করতে লাগলেন তখন বিষ্ণুপন্ত হঠাৎ যশোদাবাঈকে বললেন, "বাঃ! যশোদাবৌদি? এ খাসা উপায় বাপু, আগে নিজে বসে তারপর অন্যকে 'বসো বসো' করে অনুরোধ!"

"বটে, কালকেই তো পড়ে দেখালে যে উপদেশের চেয়ে উদাহরণ ভালো," লক্ষ্মীবাঈ চট করে বললেন, "তাই তো আমরা আগে বসে উদাহরণ দেখিয়ে দিলাম। অত লজ্জা কীসের সীতাবাঈ? বসো।"

যশোদাবাঈ বললেন, "আমাদের কথায় কেন উনি বসবেন? উনি···"

উনি তার পরে কী বলবেন তা ধরতে পেরে আমি, "থাক্ থাক্, আমাকে অত ঠাট্টা করতে হবে না" বলে বসে পড়লাম। তখন উনি নিজে থেকে বললেন, "হ্যাঁ! এখন বেশ হয়েছে! কিন্তু মুখখানা বেশ সামনে ফিরিয়ে বসতে আপত্তি কী? অমন ঘুরে বসার কি দরকার?"

ওঁর এই কথা শোনামাত্র আমার যা লজ্জা করল। আমি রাগ করে বেশ কপাল কুঁচকে ওঁর দিকে চেয়ে দেখলাম। কিন্তু আমি আলোর থেকে দূরে আর ঘুরে বসেছিলাম তাই বোধ হয় উনি সে রাগটা দেখতেও পাননি। এই রকমে আমার আবাহন আর প্রতিষ্ঠা হলে তাঁরা সকলে কথাবার্তা বলতে লাগলেন আর আমি একেবারে বোবার ব্রত ধরে বসে রইলাম।

এখনও পর্যন্ত আমার অল্প যা কিছু গর্ব বাকি ছিল, সে বোধকরি কোথায় যেন লুপ্ত হয়ে গেল! আগে আমি একবার স্পষ্টই বলেছি যে, বহুঠাকুরঝি আর উমাশাশুড়ীর অবস্থা দেখে আমি ভাবতাম যে, শুধু আমরাই দুজনে পরস্পরকে ভালোবাসতাম, আর আমাদের মতো সুখী স্বামী স্ত্রী কেবল আমরা দুজন। নিজেদের জুটি ছাড়া অন্য কোনো সুখী দম্পতি আমি আগে দেখতেই পাই নি। এখনো পর্যন্ত যত সব ঘটনা আমি বলেছি, সেগুলি পড়ে ছোট মামীশাশুড়ীর স্বভাব কী রকম ছিল তা পাঠকেরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। তাঁদের দুটিকে সুখী মনে করা সম্ভবই ছিল না, এটা একেবারে স্পষ্ট! আমার মা-বাবা আর ঠাকুমা-ঠাকুরদা—এঁদের সম্পর্ক কেমন ছিল তাও মনে করলে আমার অবস্থা নিশ্চয় গর্ব করার মতো ছিল। এই রকম অবস্থায় সবাই নিশ্চয় বলবে যে আমাদের দুজনের সুখের বিষয়ে একটু গর্ব হওয়া স্বাভাবিক। এই তো গেল দাম্পত্য সুখের বিষয়ে।

দ্বিতীয়তঃ, আমি কিছু কিছু লেখাপড়া জানতাম, সেটাও আমার একটু গর্বের বিষয় ছিল এ কথা স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই। আমি আমার লেখা সেই যে চিঠিখানা দাদাকে দেখিয়েছিলাম, তার একটা বাক্য পড়ে দাদা আমাকে ঠাট্টা করেছিল, তখন আমার কেমন রাগ হয়েছিল, এ-সব কথা বলেছি, তাই জেনে হোক কিংবা না জেনেই হোক আমার মনে আমার জ্ঞানের সম্বন্ধে গর্ব ছিল, এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বোম্বাই এসেই যখন এই দুটি মহিয়সী নারীকে দেখতে পেলাম তখন আমার সে দুটি বিষয়েরই গর্ব একেবারে ধূলিসাৎ হল। আর আজ রাত্তিরে সবাই একত্রে বসে যখন আলাপ-আলোচনা চলছিল, আর লক্ষ্মীবাঈর সব কথা যখন শুনতে পেলাম তখন আমার অবশিষ্ট গর্ব একেবারে খর্ব হয়ে নিজের মনে বড়ো লজ্জা বোধ হতে লাগল।

ভাবতে লাগলাম যে আমার জীবন বৃথা ছাড়া আর কী! আমার বরাত ভালো ছিল যে, 'মেয়েদের জীবন শুধুই রান্নাবান্নার উপযুক্ত, তার চেয়ে বেশী জাগরণ তাদের হতে দেওয়াই অনুচিত, তাদের বুদ্ধির সীমা শুধু উনুনের আশে পাশে দু'চার হাত, আর হয়তো মাঝঘর পর্য্যন্ত, ব্যস্! এই গণ্ডি পেরিয়ে তারা চোখ তুলে কেবল দেখলেও সেটা নির্লজ্জতা!'—এই পাগলের মতো, অসভ্য সংস্কারে আমার মন মগ্ন হয়নি। সেই দোষে যদি আমার মন গ্রস্ত হয়ে থাকত, তাহলে তো একেবারে গ্রহণ লেগে যেত!

তার উপরে কিছু দিয়ে টানলে কি কিছু আঁকা যেতে পারে। এই রকম পূর্ব ধারণায় যাদের মন গ্রস্ত হয়ে আছে, এ রকম ভগিনী আজ কি কম আছেন? আমি এতেই তখন সুখ মানলাম। আর আজও নিশ্চয় মানি যে, ভাগ্যিস আমি তাদেরই একজন হইনি। ছোটবেলা থেকে যে-কোনো কারণে হোক আমার পড়বার অভ্যাস হয়েছিল। পরে যাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী হবার সৌভাগ্যলাভ করলাম, তাঁর তো সে বিষয়ে অত্যন্ত শখ ছিল আর এখানে এসে এরকম রত্নদের সঙ্গলাভ হল, তখন আর কী চাই? সবই উত্তম হল।

সে-দিন কী পড়া হল, কী আলোচনা হল, সে-সব এখন আর আমার ঠিক মনে নেই। আর উপরেই বলেছি, আমি ভাবছিলাম কখন একবার এখান থেকে উঠে যেতে পারব! এমন মনের অবস্থায় কি কিছু মনে থাকতে পারে? তবু যশোদাবাঈ আর লক্ষ্মীবাঈ মাঝে মাঝে আমাকে প্রশ্ন করে আমার মুখে কথা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্ট করছিলেন। আমি শুধু হুঁ, হুঁ করছিলাম তাঁদের কিছু কিছু কৌতুকপূর্ণ, কিছু কিছু গম্ভীর কথা শুনে মাঝে মাঝে আমার মন সেদিকে টানছিল আর আমার চমৎকার মনে হচ্ছিল। আর মনে হচ্ছে, একবার দুবার আমার মনে হয়েছিল, না জানি কখন আমি এমন কথাবার্তা বলতে পারব। একবার আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে-ছিলাম, যশোদাবাঈ আর লক্ষ্মীবাঈ আমাকে দু'তিনবার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন আর আমি শুধু হুঁ হুঁ করলাম, তখন উনি পর্যন্ত বললেন, "বা, আজ আমরা এখানে একটা পুতুল এনে বসিয়েছি, বুঝলেন নানা সাহেব?" কিন্তু নানা অমনি, "আপনি দেখছি গণপতরাওয়েরই ভাই! একটুও সবুর সইতে পারেন না দেখছি। ওহে, আজই তো প্রথম দিন, আজ পর্যন্ত যা একেবারেই জানা নেই, তা চট করে পেরে ওঠা কি সম্ভব?" এ ছাড়া আরো কিছু বলে আমার দিকটা সামলে নিলেন। তখন আমার বড় সন্তোষ হল।

আমার মনে পড়ছে যে সেদিন কী একটা সংবাদপত্র না মাসিক পত্রিকা থেকে কী যেন পড়া হয়েছিল, কিন্তু তা যে কী বিষয়ে ঠিক কিছুই মনে নেই। এই রকমের দু'ঘণ্টার কাছাকাছি—সেদিন সেটা আমার শাস্তিই মনে হয়েছিল—সেই শাস্তি ভুগে তারপর আমি আর যশোদাবাঈ নিচে এলাম, আর আমার পিছনে পিছনে উনিও নেমে এলেন। পরে অবশ্য উনি

আমার কুণ্ঠিত আচরণের সম্বন্ধে টীকা করেছিলেন। নিজের স্ত্রীর ওরকম বৈঠকের একেবারে অভিজ্ঞতা নেই জেনেও তার দিকটা সামলে না নিয়ে উলটে আবার ঠাট্টা করলেন বলে আমিও কিন্তু কম বকিনি। আর শেষে অভিমান করে জব্দ করবার ভয় দেখালাম। কিন্তু উনি ভয় পাওয়া দূরে থাক, হো হো করে হেসে আমার চিবুক ধরে নেড়ে বললেন, "বাহবা! আমি তো তাই চাই।" তখন আমি একেবারে নিরুপায় হলাম। ভুরু কুঁচকে খুব রাগ করলাম। অত লোকের সামনে আমাকে ঠাট্টা করার অপরাধের জন্য ওঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা না বলার সংকল্প করলাম। সেই সংকল্পটা বলেও ফেললাম। আর, আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমার সংকল্পটা খুব অল্পক্ষণ নয় বেশ চার মিনিট পর্যন্ত মন শক্ত করে পালন করলাম। আমার এই বড়াই শুনে কেউ হয়তো আশ্চর্য মনে করবে, কিন্তু তার কোনো কারণ নেই। কেন না, আমি চার মিনিট পর্যন্ত শুধু আমার সংকল্প ধরে বসেছিলাম, কিন্তু আমার সেই গোঁ ভাঙবার জন্য সেই চার মিনিটের মধ্যে উনি কতরকম আর কী কী চেষ্টা করেছিলেন তা ভেবে দেখলে, আর আমার সংকল্পটাও তেমনি কাঁচা ছিল, একথা না ভুললে আমার অবস্থা অবশ্য যে বড়াই করার যোগ্য ছিল তা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। যাক্ সে কথা।

এই রকমে আমার সেই ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে আমরা অনেকক্ষণ সেদিনকার সেই অপূর্ব ঘটনার সম্বন্ধে গল্প করছিলাম। কথা বলতে বলতে আমি সেখানে কি কি শুনেছিলাম জিজ্ঞাসা করলেন। আরো জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি যখন মুখ বুজে বসেছিলাম তখন যশোদাবাঈ আর লক্ষ্মীবাঈ আমার মুখে বুলি ফোটাবার কত চেষ্টা করে, অনেকবার কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন আমি কেন শুধু 'হুঁ হুঁ' করছিলাম। তখন আমি বললাম, "নানাসাহেব এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, তাতে সন্তোষ হল না?" এই বলে দুষ্টুমি করে আমি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে নানা কার যেন নাম তুলেছিলেন, আর অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, "সত্যি, তিনি যে গনপতরাও বললেন, উনি কে? যশোদাবাঈ আর লক্ষ্মীবাঈর মুখেও আর একদিন ওই নামটা শুনেছিলাম। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করব, এমন সময় অন্য কি একটা কথা উঠল, আর আমার কৌতূহলটা অমনি রইল!"

"জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, তবুও তুমি জিজ্ঞেস করলে না? এ যে খুব আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি!"

"কেন! তাতে আশ্চর্য কিসের? যে-বিষয়ে জেনে আমার দরকার নেই আমাকে কি দরকারের চেয়ে সে-বিষয়েও কৌতূহলী বলে মনে করেছ?"

"কে বলেছে?"

"বেশ, আমি তাই! কিন্তু তখন তো কিছু জিজ্ঞেস করিনি? আচ্ছা এখন আমায় বলো না। তিনি এই বন্ধুদেরই একজন দেখ্‌ছি, তাই তো? যশোদাবাঈ তাঁকে ঠাকুরপো বললেন, আর লক্ষ্মীবাঈও তাই বললেন।"

"সে-ভদ্রলোকটি হচ্ছেন এমনি আমাদের একজন বন্ধু। নানার সঙ্গে তাঁর একেবারে ছেলেবেলা থেকে ভাব। বিষ্ণুপন্তেরও তাঁর সঙ্গে তেমনি ভাব, তবে নানার চেয়ে একটু কম। আমার তাঁর সঙ্গে শুধু দেখাদেখি আলাপ। ব্যস্‌। শুনেছি উনি নাকি বড় ভালো লোক!"

"তিনিও নাকি এখন এখানে আসছেন শুনি?

"হ্যাঁ, বোধ হয় সত্যি আসছেন, আমিও তাই শুনেছি।"

এই রকম গল্প করতে করতে উনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম আসছিল না! ছাদের উপরের সেই দু'ঘণ্টার কথা বারবার মনে পড়ছিল! সেখানে কী কী গল্প হল, আমি তা আপন মনে স্মরণ করেছিলাম। মনে করতে করতে একটা কথা মনে হয়ে আমার হঠাৎ দুর্গীকে মনে পড়ল। "ও বোধ হয় এতদিনে প্রসব করেছে। ওর এখন কী হবে? আঁতুড়ে ও নিজের প্রাণহানিকর কোনো গণ্ডগোল বাধিয়ে বসবে না তো? ওকে আমাদের বাড়ি আনতে পারব কি? ওর মা-বাবা ওকে দু'চারদিন আমাদের বাড়ি পাঠাতে রাজি হবেন! আর যদিও ওঁরা পাঠাতে রাজি হন, তবু তার সেই হতভাগা স্বামী যে 'হাত ধুয়ে তার পিছন নিয়েছে',[১] সে কি তাকে আসতে দেবে?" এইরকম নানান প্রশ্ন আমার মনে হল, আর আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুম আরও উড়ে গেল। এরকম কতক্ষণ চলে? অল্পক্ষণেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। শুধু সে ঘুম একেবারে অশান্ত ছিল।

১ "হাত ধুয়ে পেছন নেওয়া"—একটি মারাঠি প্রবাদ। মানে, সর্বক্ষণ, অনবরত জ্বালাতন করা।

দাদাকে আমার চিঠি

অনেক সময় এমন হয় যে যা পরে ঘটবে তারজন্য আগে থেকেই মন চঞ্চল হয়ে থাকে। সে দিন—মানে সেই রাত্তিরে ঠিক সেই রকম হল। দুর্গাকে মনে পড়ল, তার ভাবী অবস্থার, প্রসব কাল, ইত্যাদির বিষয়ে আমার মনে উদ্বেগজনক চিন্তার জন্য আমার ঘুম এল না। যখন এল তখন খুব দেরি করে, আর তাও একেবারে অশান্ত, এ কথা আমি আগেই বলেছি। তাই দ্বিতীয় দিনও আমার মনের উপরে তার বড় অদ্ভুত রকম ক্রিয়া হয়েছিল। আমি একেবারে উদাসীন ছিলাম। দাদার চিঠি কেন আসেনি? আমি ভাবছিলাম যে দুর্গার যদি প্রসব হয়ে থাকে, তাহলে দাদা আমাকে নির্ঘাৎ সে সংবাদটা লিখবে। তথাপি, দাদা ওদের বাড়ি যাবে তো? ভালো করে ওর খোঁজ খবর নেবে তো? এই রকম প্রশ্ন আমার মনে উপস্থিত হয়ে, দু'একবার মনে হল, যে আমি নিজেই তাকে একটা চিঠি লিখি, সেই ভালো। তাই চিঠি লিখব ঠিক করে, খাওয়া দাওয়ার পরে যখন ওঁকে পান দিতে ওঁর ঘরে গেলাম, তখন সে কথা ওঁকে জানিয়ে ফেললাম। উনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্য লেখো! আর সন্ধেবেলা আমি ফিরে এলে আমায় দেখিও।" অমনি আমি, "তবে কাগজ, দোয়াত, কলম, ইত্যাদি সব লিখবার উপকরণ গুছিয়ে বাইয়ে বার করে রেখো!" এই বলে যাব এমন সময়, চিবুক ধরে "জী, রানী সরকার!" এই বলে আমায় ঠাট্টা করে জোরে হাসলেন। তখন, "থাক্ থাক্, আমার অত বড় পদবী নিয়ে দরকার নেই," বলে আমি যেতে উদ্যত হলাম। তখন, "এখন আর দেবার কী আছে? রাজত্বই তো তোমার এখন।" এই বলে হাসতে হাসতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনার পান চাইনে? নিজে পান খাবেন না?" আমি "ও কী!" এই বলতে বলতে পালিয়ে গেলাম।

সব কাজকর্ম সারা হলে দুপুর বেলা যশোদাবাঈ কিংবা লক্ষ্মীবাঈর ওখানে না গিয়ে, ওঁর ঘরে গিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম। চিঠিটা কী রকম হয়েছিল,

আর বানানের কী দশা হয়েছিল, তার আন্দাজ পাঠকদের অবশ্য আছে। তাই আমি সেই চিঠিটা আগাগোড়া এখানে না দিয়ে তার সারাংশটুকু বলছি। আমরা স্টেশন ছেড়ে আসা অবধি সব, মানে একেবারে সব, কথা আমি তাকে লিখলাম। বাঁকাচোরা, যেমন পারি তেমন কিন্তু প্রতিদিনের ঘটনা বেশ ভালো করে, বিস্তৃতভাবে লিখলাম। সেই একটা চিঠিতে আমার সমস্ত দুপুরবেলাটা কেটে গেল। একবার দু'বার আমি ভাবলাম যে, লক্ষ্মীবাঈর কাছে গিয়ে তাঁর কাউকে লেখা চিঠি দেখে আসি, কিন্তু আবার ভাবলাম আমি তাঁর চিঠি তাঁর কাছে চাইব কী করে? তা ছাড়া সমস্ত চিঠিটা ওঁকে দেখাব না, না দেখানোই ভালো, তিনি হয়তো হাসবেন, এ কথাও যে ভাবছিলাম তা একেবারে ঠিক। কিন্তু শেষে একটা উপায় আমি স্থির করলাম। ঠিক করলাম যে সন্ধ্যাবেলা উনি ফিরলে ওঁকে চিঠিটা দেখিয়ে, উনি যদি বলেন, যে আর কাউকে দেখালে ওঁর আপত্তি নেই, তাহলে দেখাব।

বাড়ি এসেই উনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "চিঠি লিখেছ?" তখন চট করে 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়ে বললাম, "ব্লটিং পেপারের ভাঁজের মধ্যে চার পাঁচখানা কাগজ আছে।" মা মন্দিরে গিয়েছিলেন, আমি কাচা কাপড় পরে রান্না করছিলাম। তাই চিঠিখানা আমার সামনেই পড়বার জন্য সবগুলো কাগজ গুছিয়ে নিয়ে আমার কাছে, উনুনের পাশে এসে বসলেন। তখন আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হল, আর আমি বললাম পর্যন্ত, "ওমা! এ কী, লোকে হাসবে যে! একেবারে যে উনুনের পাশে এসে বসলে? তোমার ঘরে বসলে ভালো হয় না?"

"নিষ্কর্মা লোক যত সব। তারা হাসলে কী আসে যায়? বাড়ি এসে নিজের বৌয়ের কাছে গল্প করতে বসব না তো কার কাছে বসব? বেশ বাপু, আমি এখানে না বসাই যদি ভালো, তবে তুমি চলো আমার ওখানে, আমার তাতে কী?"

"হুঁ, আর রান্না তবে কে করবে?"

"এই ছাখো! আমি এলাম, তা সহ্য হচ্ছে না, নিজেও এখানে আসবে না, রাঁধুনী রাখতে বারণ করবে, এ যে বিষম জ্বালা দেখছি।"

"ওমা, তাতে জ্বালা কী গো? ভাবলাম লক্ষ্মীবাঈ কি যশোদাবাঈ যদি এসে পড়েন, আর দেখতে পান, তাহলে কী বলবেন? তাই তো! আমি

কি চাইনে যে তুমি এখানে বসো? আমি তো সব সময় ভাবি যে তুমি আর আমি সর্বক্ষণ একসঙ্গেই থাকি, যেন কক্ষণো দূর না হই।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, একটা ফন্দি বার করতে হবে।"

"হুঁ", আমি হাসতে হাসতে বললাম।

"দেখো, কিন্তু পরে পিছনে হটবে।"

"কক্ষণো না।"

"দেখো।"

"দেখেছি"।

"কী দেখেছ? কী দেখেছ? কাল যেখানে আমরা বসি সেখানে নিয়ে গেলাম, আর সেখানে তোমার সামনে মেয়েরা ছিলেন, তবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলে, আর বলছ নাকি সর্বক্ষণ কাছে থাকতে ইচ্ছে করে। মুখের কথা শুধু যত সব।"

"কী? মুখের কথা কিসের? কাল একেবারে প্রথম দিন ছিল, তাই। আর চারদিন পরে দেখো। কাউকে কথা বলতেই দেব না। সব কথা আমি একলা বলব—বুঝলে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝলাম। মানে, কেমন?—একেবারে পরিষ্কার বুঝলাম। তুমি একলা থাকলে কথা বলবে তো? তখন আমরা কী করে শুনব?"

"আহা, থাক্ থাক্। যাই বলো, তার পরে নিজের একটা কথা আছেই। আচ্ছা, চিঠিটা পড়বে তো এখন?"

"এখুনি কেন? রাত্তিরে সকলের সামনে পড়লেই হবে।"

এই কথা শোনা-মাত্র আমি থতমত খেয়ে গেলাম। বুকের উপরে কেমন একটা মস্ত বড় বোঝা অনুভব করতে লাগলাম। আমার বাঁকাচোরা চিঠি-খানা নানা, বিষ্ণুপন্ত আর তাঁদের স্ত্রী দু'জনের সামনে পড়বেন, মানে ব্যাপার কী? এই ভেবে আমি চট্ করে উঠে তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে গেলাম, আর, "না গো না, তা কোরোনা" বলে অনুরোধ করতে লাগলাম। আমার সেই একটু রাগের, একটু কাতরভাবের অনুরোধ শুনে আর আমার ভীত চেহারা দেখে, একেবারে হেসে ফেলে উনি আমাকে বললেন, "কেন গো, এখন কোথায় গেল তোমার সে সাহস?· ফুরিয়ে গেল না কি? চিঠিখানা শুধু অন্তদের সামনে পড়ব বললাম, অমনি এত ঘাবড়ে গেলে, তবে প্রত্যক্ষ বলা-কওয়ার সে-সব বড়াইয়ের হল কী?"

ওঁর এই কথা শুনে আমি বুঝলাম যে "সকলের সামনে পড়ব" বলেছিলেন কেবল ঠাট্টা করে। আমার মনের বোঝাটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল। আমি বললাম, "বলা মাত্র অমনি সাহস হয় বুঝি? আস্তে আস্তে হবে গো। আচ্ছা, কিন্তু আগে চিঠি খানা পড়ো না একবার, মা আসবার সময় হয়েছে, পরে আবার খাবার সময় হবে।" এত অনুরোধ করাতে তবে চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলেন।

আমার বাঁকাচোরা চিঠি, কিন্তু কত ভালোবাসলেন। সব সময়ই অমন ছিল। আমি যাই করি না কেন—দু' একবার ঠাট্টা করতেন সে কথা আলাদা—কিন্তু সব সময় তার প্রশংসা করে আমায় উৎসাহ দিতেন, এই ছিল ওঁর রীতি। এই ব্যাপারেও তাই হল। পুণা থেকে ওঁর নামে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, তারপর ক'দিন হয়েছিল? বোম্বাই এসে তো আট দিনও পুরো হয়নি, ততদিনে কী উন্নতি হতে পারে? কিন্তু আমাকে অনেক উন্নতি হয়েছে বলে কত প্রশংসা করলেন। আমি একটি মাত্র সংশোধন দেখতে পাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে স্বচ্ছতা। বাকি ব্যাকরণের ভুল, অক্ষর পড়ে যাওয়া, ইত্যাদি আগে যেমন ছিল এখনও তেমনই রইল। কোথাও দাগ ছিল না, কাগজটায় পেনসিল দিয়ে রুল কেটে নিয়েছিলাম তাই লাইনগুলো বাঁকাচোরা হয়নি, অক্ষরগুলো আলাদা আলাদা আর ফাঁক-ফাঁক করে লেখার চেষ্টা করেছিলাম, তাই হিজিবিজি খুব কম হয়েছিল, এই সব উন্নতি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। আর এ সব লক্ষ্মীবাঈয়ের চারদিনের শিক্ষার ফল।

সেই চিঠিখানার অত প্রশংসা শুনে আমার বড় আনন্দ হল, একথা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় দিন চিঠিটা লক্ষ্মীবাঈকে দেখিয়ে তার পরে ডাকে ফেলতে উনি বললেন, কিন্তু আমি চিঠিতে লক্ষ্মীবাঈর অতিশয় প্রশংসা করে তাঁর বিষয়ে অনেক কথা লিখেছিলাম, তা হয়তো তাঁর পছন্দ হবেনা, তিনি হয়তো সে সব লিখতে মানা করবেন, তাই আমার ইচ্ছে ছিল যে উনি নিজেই রাত্তিরে ভুলগুলো সংশোধন করে দিলে আমি পরের দিন চিঠিটা আবার ভালো করে লিখে ডাকে দেব। সত্যি, আমি সেই চিঠিতে লক্ষ্মীবাঈ আর যশোদাবাঈর খুব প্রশংসা করেছিলাম। এক জায়গায় তো লিখেছিলাম যে লক্ষ্মীবাঈ দেখতে প্রত্যক্ষ মহালক্ষ্মীর মতন। উনি সেইটুকু রাত্তিরে সকলের সামনে বলে ফেললেন, আমার তখন বিষম লজ্জা

করতে লাগল। শেষে লক্ষ্মীবাঈ নিজেই আমার কাছে চিঠিটা চাইলেন। তিনি নিজেই চাইলেন, তখন আমি কি আর 'না' বলতে পারি? কিন্তু তাতে কোনো কাটাকাটি চলবে না, আমার যা মনে হয়েছে আমি তাই লিখেছি, তার জন্ম কিছু বলবেন না, ইত্যাদি আগে কবুল করিয়ে নিয়ে তবে আমি চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম। চিঠি পড়ে তিনি তার ভুলগুলি আমায় বুঝিয়ে দিলেন, আর বললেন, "কবুল করেছি, তাই এখন আর কিছু কাটতে বলছি না। না হলে অনেক কিছু বাদ দিতে বলতাম।" এই বলে তার পরের দিন আবার আমাকে দিয়ে চিঠিটা ভালো রুলকাটা কাগজে লিখিয়ে ডাকে দেবার ব্যবস্থা করলেন। যেদিন চিঠি পাঠালাম ঠিক সেই দিনই কলেজ থেকে আসা-মাত্র আমার নামের একটা খাম উনি আমায় দিলেন। সে চিঠি নিশ্চয় দাদার ছিল, কেন না, হাতের লেখাটা আমি তক্ষুনি চিনতে পারলাম। চিঠিটা হাতে নিয়েই মনে হ'ল যে দাদা নিশ্চয় বেশ লম্বা চওড়া চিঠি দিয়েছে।

ওদিককার খবর দাদার এই রকম লম্বাচওড়া চিঠি এলেই পাওয়া সম্ভব ছিল। তাছাড়া আর কি অন্য কোনো উপায় ছিল? তাই দাদার লম্বা চিঠি দেখামাত্র খামখানা খুলে পড়তে ইচ্ছা হল, আর আমি ওঁকে সেটা পড়তে বললাম।

দাদার চিঠি

"অনেক আশীর্বাদ বিশেষ। কথামত আমি পরশুদিন দুর্গীর বাড়ি গিয়েছিলাম। সেদিন সকালেই সে প্রসব করেছিল। কিন্তু আমার ধারণা যে তার অতিশয় কষ্ট হয়েছিল। কেন না, তার ভাইকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে তিন-চার দিন আগে থেকেই তার প্রসববেদনা হচ্ছিল, আর ডাক্তার-টাক্তার ডাকা দরকার হয়েছিল। আমি তার মার সঙ্গে দেখা করলাম, কিন্তু আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেশীকম খবর নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তথাপি, যতটা সম্ভব খোঁজ খবর নিয়েছি। সেইটুকুতেই আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে তার ভয়ানক কষ্ট হয়েছে। তার ঠাকুমার কাছে জানলাম যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার পেটে যে বেদনা করছিল দুর্গী সে কথা কাউকে জানতেই দেয়নি। খোকা হয়েছে, এই সন্তোষজনক সংবাদটাই তোমায় দিচ্ছি। তারপরে আঁতুড়ে তার কী রকম তালাশ হবে তা আমি যেমন যেমন জানতে পারব, তেমন তেমন তোমাকে খবর দেব। এ কথা তো ঠিক যে আমার পক্ষে মেয়েদের মতো সম্পূর্ণ খবর পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যেমন তুমি দুর্গীকে ভালোবাস তেমনি, কিংবা একটু বেশিই—আমিও দুর্গীকে ভালোবাসি। তার জন্য আমার এত দুঃখ হয় যে বলতে পারিনা। তুমি এখানে থাকলে ওর ওখানে যেতে, অনেকক্ষণ ওর কাছে বসতে, কথাবার্তা বলতে, তা হলে তার সন্তোষ হত। আমি কি তা করতে পারি? আমি বাইরে বাইরে থেকে যা খবর নেব তাই। কিংবা হয় তো দূরে দাঁড়িয়ে, 'কেমন দুর্গাবাঈ, যমুদিদিকে (আজকাল আমি কারো কাছে তোমার সম্বন্ধে কথা বলার সময় "যমুদিদি" এই অভিধানই দিই, আর ভাবছি যে চিঠিতেও তাই লেখাই উচিত হবে) কি 'কিছু খবর দিতে হবে?'—এই জিজ্ঞেস করব। কী জানি বেচারীর বরাতে কী আছে। ওর স্বামী নাকি সম্প্রতি এখানে নেই। কোথায় যেন চাকরির সন্ধানে গিয়েছে। এখন আবার কীসের চাকরি পাবে, কী

করবে কে জানে! কিন্ত আমি বলি—গিয়েছে যে, তা এক অর্থে ভালোই। বেচারী দুর্গা আঁতুড়ে কষ্ট পাবে না। যখন গিয়েইছে, তখন পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে যেন ফিরে না আসে।

মাঈসাহেবের চিত্তবৃত্তি আজকাল ঠিক থাকে না। তুমি যে সে দিন কোন স্ত্রীলোকটি এসেছিল বললে, আমি তাকে আবার দু'বার দেখেছি। কিন্ত সে কেন এসেছিল জানতে পারিনি। ঠাকুমা কাল বাড়ি গিয়েছেন। যাবার সময় বারবার তোমাকে এ কথা লিখতে বলেছেন যে শাশুড়ীর, রঘুনাথরাওয়ের মর্জি রেখো, অবাধ্য হয়ো না। আমাকেও সেই উপদেশ দিয়েছেন। আজকাল আমি বড় ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি কিছুই ভালো লাগে না। তুমি ছিলে, তখন আট-দশ দিন বাদে তবু আসতে, আর আমরা এখানকার ওখানকার গল্প করতাম। কিন্ত গেল আট দিন আমার বড় মন কেমন করেছে। দিনের মধ্যে কতবার তোমাকে মনে পড়ে। আচ্ছা যমু, না অপরাধ করেছি—যমুদিদি, আপনি যাওয়া-মাত্র আগাগোড়া ঘটনার চিঠি লিখবেন বলেছিলেন, তার কী হল? বোধহয় ভুলে গিয়েছেন। একেই আপনার স্বভাব কৌতূহলী নয়, তাতে বোম্বাইয়ে সবই নতুন, তাই বলছি। থাকবার ব্যবস্থা কী হয়েছে? এই আট দিনে কী কী করলেন? তোমাদের প্রতিবেশী কারা তা আমি জানতে পেরেছি, তাই আপনার চিঠিতে তাদের বর্ণনা একবার জানতে পারি এই ইচ্ছা। সে দিন রঘুনাথ-রাও আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁরা সবাই একেবারে এক নমুনার লোক। তাহলে আপনি নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছেন। একবার গিয়ে দেখতে হবে।

"বেশ, এখন তোমার অবস্থা কী রকম? বোম্বাই গিয়ে হেন করব, তেন করব যে সব বড়াই মারা হচ্ছিল, সে রকম কিন্ত করা চাই! এখন দেখব আট দিন বাদে যে চিঠি আসবে তাতে কত উন্নতি দেখা যায়। বোম্বাইয়ে এখন যা-যা দেখবে যা-যা পড়বে সে সব আমাকে লিখতে হবে। আমিও এখানকার ঘটনা বিস্তৃতভাবে নিশ্চয় লিখব। সে বিষয়ে কোনো আশঙ্কা কোরোনা।

"আর কি লিখি? বিশেষ এমন আর কিছু হয়নি। যদি কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে অবশ্যই লিখব। তোমার মামাশ্বশুরবাড়ি কিন্ত আমি যাইনি। তোমার সেই শংকরঠাকুর লোকটাকে দেখলেই গা

জলে যায়। সে দিন রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে যাইনি, কিন্তু সেই নিজে থেকে সামনে এসে আমাকে আগলে ধরে বললে, 'কিহে গণপত রাও, আমার উপর এত রাগ কেন মশাই?' আমি বিশেষ কিছু না বলে লোকটার ন্যাকামীর সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে চলে গেলাম। আমার কখনো কোনো মানুষের উপরে এত ঘৃণা হয়েছে বলে মনে নেই। নিজে থেকে তার সঙ্গে কথা বলতে যাও, ও নিশ্চয় তোমার দিকে লক্ষ্য না করে অন্য দিকে চলে যাবে। বেশ, নিজে লোকটাকে উপেক্ষা করে তার সঙ্গে কথাটথা না বলে চলতে আরম্ভ করো, ও অমনি এসে আগলে ধরে কথা বলবেই বলবে। এই রকম একটা অদ্ভুত, সাংঘাতিক লোক। ওর সেই তিলক আর টুপি, কপালে ভস্মের পটি, তার উপরে সেই চন্দনের লম্বা ডোরা, আর লোকের মুখে······কিন্তু আমি এ কী করছি? সেই লোকটার নাম তুললে আর তাকে চোখের সামনে দেখতে পেলে, বুদ্ধি যেন স্থিরই থাকে না, তুমি তো জানোই। তখন আব তা লিখে কাজ কী? তা ছাড়া সে লোকটা হচ্ছে তোমার মামাশ্বশুর, তখন তার বিষয়ে কিছু কমবেশি লিখলে তুমি আবার রাগটাগ করবে। কিন্তু এখন আমি এই লম্বা চিঠিখানা শেষ করি, রাত খুব হয়েছে! শুধু শুধু জাগব কেন? বারে বারে চিঠি লিখে সব খবর দিও। তোমার লম্বা, বড়ো চিঠি যদি পাই, তাহলেই আমার মন একটু-আধটু সান্ত্বনা পাবে। না হলে এখানে যে কী রকম তা তো তুমি ভালো করেই জানো। ইতি······।"

চিঠিটা আমি একবার নিজের মনে পড়ে দেখলাম, তখন উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী খবর।" আমি বেশ এখন সাহসী হয়েছিলাম, কেননা, চিঠিখানা ওঁর সামনে ধরে আমি বললাম "পড়ে দেখো।" অমনি "না গো না, তোমাকেই পড়ে শোনাতে হবে," এই জিদ ধরে বসলেন। ইতস্ততঃ করতে করতে শেষে আমি রাত্তিরে পড়ে শোনাতে রাজি হলাম। সত্যি রাত্তিরে পড়ে শোনাতে হল। পড়বার তাড়াতাড়িতে অমুখ জায়গা বাদ দিয়ে পড়তে হবে, অমুক জায়গা পড়ে দরকার নেই, এসব কি মানুষের মনে থাকে? আমি পড়তে পড়তে প্রথমেই ঠাকুমার সংসারের মধ্যে ওঁর নামটা তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করে ফেললাম, তখন আমাকে যা ঠাট্টাই না করলেন! আমি কেন এমন আত্মহারা হয়েছিলাম এই ভেবে আমারও বড় আশ্চর্য

মনে হল। আর হাসিও পেল।

"না না বাপু, আজকাল মেয়েরা ভারি সভ্যভব্য হয়েছেন। বেশ অবাধে স্বামীর নাম উচ্চারণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে নাম ধরে ডাকতেও আরম্ভ করবেন। আমরা পুরুষেরা এখনো মেয়েদের নাম ধরে ডাকি না, আর তোমরা? এরি মধ্যে......"

"আহা, মরি মরি! হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তাই নিয়ে কত ঠাট্টাই না করবে। অমন করলে আমি এর পর আর পড়বনা বলছি, তখন কী করবে?"

"বাবা গো! অত বড় শাস্তি দিও না বাপু। আমি আমার সব ঠাট্টা ফেরৎ নিচ্ছি; ক্ষমা চাইছি।"

"এও তো আবার ঠাট্টাই। বলেন কিনা, 'ক্ষমা চাইছি'!"

"বেশ বাপু, আমি তবে চুপ করে বসছি। তা হলে তো হল? তারপর পড়ো না।"

তারপর চিঠিটা আমি পড়ে শেষ করলাম, আর সেই নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলাম। চিঠিতে যা-যা লেখা ছিল, সে সব কিছুর সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু কথা বলছিলাম, এমন সময় রোজকার মতো নানাসাহেব উপরে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে ওঁকে ডেকে বললেন, "চলুন মশাই, উপরে যাচ্ছেন তো?" অমনি, "এই যে আসছি" বলে উনি চলে গেলেন। আমার আজ উপরে যেতে ইচ্ছা করছিল না। কেন না, দাদার চিঠি আরও দু'একবার পড়ে দেখতে ইচ্ছা করছিল। তবু, ওঁকে সে কথা বলিনি তাই ভাবলাম যাওয়াই ভালো। আর যশোদাবাঈর জন্য অপেক্ষা না করে আমি সটান উপরে গেলাম। উপরে যেতে যেতেই মনে মনে ঠিক করলাম যে আজ একেবারে লজ্জা করব না, কিছু না কিছু কথা বলব। আমি উপরে যাওয়া মাত্র লক্ষ্মীবাঈ বললেন, "কা সীতাবাঈ, আজ একেবারে একলা উপরে এলে যে? আর একেবারে না ডাকতেই? আজকের ভাবগতিক আলাদা দেখছি!" তাঁর কথা শেষ হবার আগেই যশোদাবাঈ এলেন। এসেই তিনি বললেন, "ওমা! সত্যিই আজকের রকম-সকম কেমন যেন আলাদাই ঠেকছে! আজ আমার জন্যও অপেক্ষা করল না, তাই বলছি। কিন্তু সে কথা থাক। কালকের ব্যবস্থা কি একে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।"

লক্ষ্মীবাঈ—বলে ফেললেন এরি মধ্যে? তবু আমি দুপুর বেলা থেকে

ভাবছিলাম যে, কী রকমে সে কথাটা প্রস্তাব করব? নিয়ে যাব, সেটা অত কঠিন কী? ওঁর তো কোনো আপত্তিই নেই। তখন আমি সকলের সমনেই বলব ভাবছিলাম, তা হলে সবই ঠিক হয়ে যেত।

যশোদাবাঈ— বাঃ! তবে এখনো কী হয়েছে? সেখানেই বলবেন, তা হলে ও 'না' বলতে পারবে না।

লক্ষ্মীবাঈ— কিন্তু আগে ও না বলবেই বা কেন?

তাদের যখন এই রকম কথাবার্তা চলছিল, তখন আমার মনে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। তাঁরা কীসের বিষয়ে কী বলছেন, ও 'না' বলবে না কী? আর 'হ্যাঁ' বলবে তাই বা কী? আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমি বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাঁদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা কী বলছ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

তখন যশোদাবাঈ হেসে বললেন, "চলো এখন, উপরে গিয়েই বলছি।" তাঁরা দুজন উপরে যেতে লাগলেন। আমি ঠিক করেছিলাম যে আজ মোটেই ভয় করব না। কিন্তু হতভাগা আমার সংকল্পটা যে কী। ছাদের দরজার কাছে সকলকে দেখামাত্র আমার পা আপনা থেকেই পিছিয়ে এল আর মাথা হেঁট হল। অভ্যাসের এমন প্রবল জোর! কিন্তু তবুও তেমনি লাজুক-লাজুক ভাবেই, কারো অনুরোধের অপেক্ষা না করে সোফার উপরে বসলাম। কিন্তু মন এখনো স্থির ছিল না। ইতিমধ্যে যশোদাবাঈ নানা সাহেবের দিকে চেয়ে তাঁকে বললেন, "কাল আমরা সীতাবাঈকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব?"

নানাসাহেব—আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ বাপু? উনি আছেন, ওঁর স্বামী আছেন। আমরাও এখানে আছি। সুতরাং আমার কী হে?

বিষ্ণুপন্ত—তাতো বটেই! এখন রঘুনাথ রাও স্বয়ং এখানে আছেন, সোজা তাঁকেই জিজ্ঞেস করলে হয়।

লক্ষ্মীবাঈ—তাঁকেই তো জিজ্ঞেস করছি। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে হলে এখানে কি জিজ্ঞেস করতাম?

নানাসাহেব—ঠিক ঠিক। আমার দিকে চেয়ে অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলা! এ একটা নতুন চাল জানতে পারলাম। তা বেশ! তাতে কোনো আপত্তি নেই। রঘুনাথ রাও, দিন বাপু উত্তর।

রঘুনাথ রাও—উত্তর আবার কী দেব? পুণা থেকে এনে আপনাদের হাতে সঁপে দিয়েছি। যেখানে খুশি যাক্, যা খুশি করুক, আমার অনুমতির আবার দরকার কী? যে যাবে সে রাজি থাকলেই…

লক্ষ্মীবাঈ—তা কি কখনো হয়? রাজি কীসের? ওঁকে আমরা 'চলো' বলে ডাকলে ও নিশ্চয় আসবেই। কিন্তু ওঁর শাশুড়ীর কী মত?

রঘুনাথ রাও—সেটা আপনারা দেখে নিন। গোপিকাকাকিমাকে দিয়ে কথাটা তুললেই হবে।

নানা—ব্যস ব্যস। ওদিক দিয়ে কাজটা বেমালুম হয়ে যাবে।

যশোদাবাঈ—(রঘুনাথ রাওর দিকে চেয়ে) তা তো সত্যি, কিন্তু আপনার তো কোনো আপত্তি নেই? আর যত কিছু সে আমি দেখে নেব।

রঘুনাথ রাও—তা হলে আমার আর কী আপত্তি? আর আমাদের আপত্তি থাকলেই বা আজকালকার মেয়েরা কি শোনে? তারা আজকাল বেশ আমাদের নাম ধরে ডাকতেও আরম্ভ করেছে। জিজ্ঞেস করে দেখুন যদি মিথ্যে কথা বলে থাকি?

আমার ঘাড়ে এই অপরাধটা চাপিয়ে দেওয়ামাত্র আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "না, তা নয়, দেখুন আমার মনে ছিল না, দাদার চিঠিতে নাম লেখা ছিল, ভুলে সেটা পড়ে ফেলেছি।" আমার মুখে এই কথা বেরুবামাত্র উনি জোরে হাসলেন, অমনি আর সকলেও হেসে ফেললেন। কিন্তু তাঁরা অবশ্য নিজেদের হাসি চেপে রাখলেন। ইতিমধ্যে, আমি ভয়ানক লজ্জা পেয়েছি দেখে আমার পক্ষটা সামলাবার জন্য লক্ষ্মীবাঈ বললেন, "সীতাবাঈ, তুমি অতো ইয়ে কেন করো? বেশ, নাম করলে তো করলে, ওঁর নামই তো করলে। অন্য কারু নাম তো করনি।"

রঘুনাথ রাও—বাহবা! অন্য কারো নাম উচ্চারণ করলে আপত্তি কি ছিল? স্বামীর নাম উচ্চারণ করা, স্বামীর সঙ্গে কথা বলা, তাতেই তো যত সব লজ্জা? অন্য কারো সঙ্গে কথা বললে তাতে কিছু আসে যায় না, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে কিংবা স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে কথা বললে কিংবা পরস্পরের নাম উচ্চারণ করলেই অমনি সব মর্যাদায় আর আদব-কায়দায় ঠেকে। সেইটুকু করলেই অমনি মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করা হল! সকলের অপমান হল! কী বিচ্ছিরি রীতি! বলে কিনা আমরা যেন লোকের সামনে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলি! আর স্ত্রী তো মুখ তুলে আমাদের দিকে চেয়েও যেন না দেখে!

নানাসাহেব—সত্যি—সত্যি বাপু, এ সব একেবারে মূর্খতার কথা, একেবারে অকিঞ্চিৎকর, যেদিন উঠে যাবে সেটা সুদিন। অবশ্য, আমাদের সে বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞতা নেই।

বিষ্ণুপন্ত—আর আমাদের তো মোটেই নেই। আমাদের কাকা তো বিয়ে দেবার সময় এক মজাই করলেন।

লক্ষ্মীবাঈ—আচ্ছা, থাক সে সব কথা—

বিষ্ণুপন্ত—জানেন রঘুনাথ রাও, আমরা যেই শশহোম করতে লাগলাম, তখন তিন-তিনবার পুরুত ঠাকুর হাতে হাতে ছুঁতে বলেছিলেন, আর একজন ছুঁতে চাইছিল না, তার লজ্জা করতে লাগল। কাকা তখন কাছেই ছিলেন। উনি বললেন, "এ্যাঁ, কাল-পরশু তো আমাদের সামনে পরস্পরে পরস্পরের সঙ্গে কথা কইছিল, দোলায় বসে দু'জনের গুনগুন করে গল্পগুজব চলছিল, আর এখন লজ্জায় নুয়ে পড়লে যে।" অমনি সবাই যা হাসতে লাগল! আর একটা মানুষ তো এতো লজ্জা পেল যে তার সীমা নেই। আর দ্বিতীয় দিন তো কাকা আমাদের আড়ালে নিয়ে গিয়ে স্পষ্টই বললেন, "তোমাদের বিয়ে যে দিয়েছি, তা এমন লজ্জাটজ্জা করার জন্য নয়, বুঝলে? আজ পর্যন্ত তোমাদের যে রকম চলছিল, তেমনি চলতে দাও।" আমি বাপু তখন থেকে বেশ আগেকার মতো ব্যবহার করতে লাগলাম। ইনিই লজ্জাটজ্জা করতে লাগলেন, আর রাধাকাকিমা তাতে সায় দিতেন। কিন্তু আমাদের সেই দাজিবা ছিলেন, তিনি আর আমি মিলে সে সব ব্যাপার ঠিক করে ফেললাম।

নানাসাহেব—আমাদের তত বেশী অসুবিধা হয় নি। আমাদের এঁর আবার এ বিষয়ে আমার চেয়ে জোর বেশি বললেই ঠিক হয়।

যশোদাবাঈ—অমনি যা খুশী বললেই হল! আহা, নাকি নিজের চেয়েও বেশি জোর!

রঘুনাথ রাও—আর আমাদের এখানে কতটা জোর তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।

এই রকম সব কথাবার্তা হল। কিছুক্ষণ পরে আমরা নিজের নিজের ঘরে ফিরে এলাম। কিন্তু কাল আমাদের কোথায় যাবার কথা ছিল, আর তার অনুমতি কিসের, তা আমি কিছুই জানতে পারিনি। তাই অবশ্য নীচে এসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাকে, "আমি

কিছু জানিনে, লক্ষ্মীবাঈ বললেন, তাই আমি হাঁ বলেছিলাম। তাঁরা দু'জনে যেখানে যাবেন সেখানে গেলে তাতে আমাদের কোনোই ক্ষতি নেই"—এই বলেছিলেন। কিন্তু ওঁর হাসি দেখে আমি বুঝলাম যে, উনি কোথায়, কী ব্যাপার—সে সব নিশ্চিতরূপে জানেন কিন্তু আমাকে বলছিলেন না। আমি যখন নাছোড়বান্দার মতো ধরে বসলাম, তখন শেষে বললেন, "কোথায় যেন মেয়েদের সভা না কী, কাছেই বোধ হয় আছে, সেখানে যাবার কথা আর কী!" আমি চমকে উঠে বললাম, "সত্যি? তাঁরা দুজনে আমাকে নিয়ে সভায় যাবেন? ও মা!…"

"ওমা! কী হল গো মা!" উনি হেসে আমায় ভেংচিয়ে বললেন, "সমস্ত পোঁটলা-পুঁটলি ডুবে গেল নাকি? সভা বললেই অমনি একেবারে সর্বনাশ হল, না?"

আমি একেবারে থতমত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসলাম। কী যে বলব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এইটুকু কিন্তু মনে হল যে যেতে রাজি না হওয়াই উচিত হবে। মেয়েরা আবার সভায় যাবে, মানে ব্যাপার কী? মা সেটা কী করে পছন্দ করবেন? পুণায় জানতে পেলে তাঁরা কী বলবেন? শংকর ঠাকুর তো আকাশ-পাতাল এক করে ফেলবেন, কেননা তিনি তো কারো একটু দোষ দেখতে পেলেই অমনি তাকে 'ত্রাহি ভগবান' করে ফেলতেন। তাতেও আবার আমাদের সংসার-পাতার সম্বন্ধে তাঁর কী মত ছিল তা আগেই লিখেছি।

আমার বিস্ময় একটু কম হওয়া-মাত্র আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না। একে তো মার পছন্দ হবে না, দ্বিতীয়তঃ পুণায় বাড়িতে জানতে পারলে তাঁরা কী বলবেন, কিছু ভেবে দেখেছ?"

"পুণায় কে কী বলবে? আর যদি বলেও তাতে আমাদের অত ভয় কী? আর তাদের কে বলতে যাচ্ছে? গোপালমামা এক অক্ষরও উচ্চারণ করবেন না। আমি জানি যে তিনি এ-সব চান। তাঁর মত এর বিরুদ্ধে নয়। ছোট মামীমাও একটু ইয়ে কি—না তাই…"

"যাক তাঁর কথা, কিন্তু শংকরঠাকুর আছেন তো?…তিনি কি…"

আমাকে কথাটা শেষ করতেও দিলেন না। বললেন, "ঢের হয়েছে। আমার কাছে তার নাম পর্যন্ত কোরো না। তাঁর ধার মোটেই ধারিনে। তাঁর ঢং, তিলকটুপি, সব আমি জানি। নিজের আচরণ যাচ্ছেতাই, অশুদ্ধ

আর হাবভাব করেন পুরোণো লোকের। এমন লোকটাকে কী ভয় করি? সম্পর্কে মামা তাই…”

এই রকম চরম কথার পর আমি আর কী বলব? একা মার ওজর দেখিয়ে বলতে লাগলাম, কিন্তু আমি নিজেই জানতাম যে সে ওজর খাটবে না। কেননা, ভাবলাম যে, যশোদাবাঈর শাশুড়ী তাঁকে যেতে দিলে আমার শাশুড়ী আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বাধা দেবেন না। তাতেও, আজকাল তিনি গোপিকাকাকিমার কার্যধারা অনুসরণ করে চলতেন, আর তাঁদের বেশ ভাব হয়েছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত তাঁরা দু'জনে বেশি সময় ঠাকুরদেবতা আর ধর্মকর্মে নিমগ্ন থাকতেন। গোপিকাকাকিমার মুখে আমি দু'তিন বার একথা শুনেছি, “কাকিমা, আপনি এখন আমার ব্রত ধরুন। আমাদের ছেলেরা তো বোকা নয়, বৌমারাও বেশ নিপুণ; আমরা যা বলব তা কখনো অগ্রাহ্য করবে না। তাই তারা যা খুশি করুক না কেন! আমি ঠিক জানি যে তারা কখনো অনুচিত কাজ করবে না, আপনিও নিশ্চয় তা জানেন?” নানাসাহেবের মার এই রকম সুন্দর স্বভাব, তাঁর নিজের ছেলে-বৌমার উপর অগাধ বিশ্বাস, এই দু'টো আমাদের উপকারে এল। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে আমার শাশুড়ী তাঁর মতো আচরণ করতে লাগলেন। কেউ তাঁদের দু'জনকে আলাদা বলত না। আর তাও তো ঠিক। দু'জ বহুদিন সমান অবস্থায় দিন কাটিয়েছিলেন, দু'জনেই নিজেদের ছেলের উপর নির্ভর করেছিলেন, দু'জনের ছেলেই নাম কামিয়ে একেবারে তাঁদের সেবায় তৎপর ছিলেন, তাঁদের একটুও দুঃখ দিতেন না। দু'জনেরই বৌমা—এখানে কেউ হয়তো আমাকে আত্ম-প্রশংসার দোষ দেবেন, কিন্তু সত্যি কথা বলবার সময় সে-দোষকে অত ভয় করে দরকার নেই—একটুকুও তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ করত না। তাঁরা যেন তাঁদের নিজের মেয়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন, এই রকম ছিল। তখন আর কী? তাও প্রথম প্রথম গোপিকাকাকিমা কোনো-কোনো কারণে নানাসাহেবকে দু-একবার একটু বকেছিলেন, তখন সেই সময়ের মতো সে কথাটা ছেড়ে দিয়ে, নানা পরে নিজের মাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন; শেষে আজকাল এই রকম অবস্থা হয়েছিল! নানাসাহেবের সেই কাজে আজ আমাদের কত লাভ হল।

সভায় গেলাম

আজ পর্যন্ত সভা শব্দটা শুধু কানে শুনেছিলাম। তার চেয়ে বেশি সে বিষয়ে আমার কিছু জানা ছিল না। কানে শুনে এই বুঝেছিলাম যে জন-কয়েক পুরুষ একত্রে জমা হয়ে কথা বলাকে সভা বলে। তাও দাদার কাছে যা শুনেছি। সে পুণায় হিরাবাগানে সভায় কখনো কখনো যেত, আর বাড়ি এলে, আমি আমার স্বভাবমত আদ্যন্ত ঘটনা জিজ্ঞাসা করতাম, তখন সে আমাকে সব বলত। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত 'সভা' এই শব্দের অর্থ আমি বুঝতাম অনেকগুলি পুরুষ একত্র হয়ে কিছু বলা। মেয়ে মানুষ আর সভা, এই শব্দ দুটি একত্র করে আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। সে শব্দ আজ একসঙ্গে শুনে আমার মনের কী রকম অবস্থা হল আর তার ফলে সারাদিন আমি কত অশান্ত হলাম, তা অভিজ্ঞরা ছাড়া আর কেউ বুঝতেই পারবে না। আমার কপালে সেখানে যাবার প্রশ্ন না আসাই ভালো, অন্ততঃ এইবারের মতো না আসাই ভালো—এ রকম আমি কতবার ভাবলাম দু'একবার আমি সে ভাবনা ওঁর কাছে ব্যক্তও করলাম। কিন্তু সে সব চলবেনা, লক্ষ্মীবাঈ আর যশোদাবাঈয়ের কথামতো করতে হবে, এই উত্তর পেলাম। তবু একটা কথা বলতে কোনো আপত্তি নেই যে, মাঝে মাঝে শুধুই হঠাৎ আমার মনে হতে লাগল যে ব্যাপারটা কী তা সেখানে গিয়ে দেখলেও মন্দ হয় না। এই রকমে আমার মন দোলা খেতে খেতেই দুপুর হল। কাজকর্ম সেরে আমি তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীবাঈয়ের ঘরে গেলাম আর সব কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও হাসতে হাসতে আমাকে সব বললেন। ইতিমধ্যে যশোদাবাঈও উপরে এলেন। তিনি হঠাৎ আমায় বললেন, "সীতাবাঈ, তোমার শাশুড়ী তোমায় পাঠাচ্ছেন না। তবে এখন কী করি বলো তো?"

এখন পর্যন্ত আমি ভাবছিলাম যে আমার যেতে ইচ্ছা নেই, কিন্তু যশোদাবাঈয়ের কথা শুনে আমার মনের যে রকম অবস্থা হল, তাতে স্পষ্ট

দেখতে পেলাম আমার যেতে ইচ্ছা করছিল। কেননা, যশোদাবাঈয়ের সেই কথা শুনে আমার মন কেমন যেন নিরাশ হল। ভাবলাম যে এঁরা দু'জন যখন যাচ্ছেন, তখন আমার শাশুড়ী আমাকে কেন বারণ করবেন? কিন্তু সে-চিন্তা এক মুহূর্তমাত্র মনে এল। তক্ষুণি আবার ভাবলাম যে তিনি যা করেছেন তাই ঠিক। আর অমনি আমি যশোদাবাঈকে বললাম পর্যন্ত, "হ্যাঁ, তাও তো সত্যিই। তোমাদের কথা আর আমাদের কথা আলাদা, আমরা সংসার পেতেছি এখনো চারদিন পর্যন্ত হয়নি। এরি মধ্যে অত স্বাধীনভাবে চললে চলবে কেন? আমার দিদিশাশুড়ী এত কড়া যে তিনি জানতে পারলে আর আমাদের বাড়ির দুয়োর মাড়াতে দেবেন না।"

"তোমার দিদিশাশুড়ী যতই কড়া হোন না কেন, তোমার শাশুড়ী কিন্তু তেমন দেখছিনে। তাঁর কাছে আমি শুধু এইমাত্র বললাম যে, আজ আমরা দুজনে বাইরে যাব, সীতাবাঈকে সঙ্গে নিয়ে যাব? অমনি তিনি বললেন, হ্যাঁ নিয়ে যাও। আমার মনে হচ্ছে যে তোমার স্বামী আগেই তাঁকে বলে রেখেছিলেন। তিনি একেবারে একটুও আপত্তি করলেন না, তাই বলছি।"

"আমার শাশুড়ীর একলার কথা কি নিয়ে বসলে? বাড়িতে আরও কতজন আছেন আমাদের বকতে! আমরা এখানে এলাম, তাতে কী হল? আচ্ছা, সত্যিসত্যিই মা আমায় নিয়ে যেতে বলেছেন? তুমি তাঁকে কী বললে?"

"এই যা বললাম, তাই বলেছি, আর কিছু না।"

"তাতে কী? সভায় যাব বলেছ? সেটা বললে তিনি যদি রাজী হতেন, তবেই তো সত্যি।"

"ওমা! সে কথা কী করে বলব? কিন্তু আমার কথা শোনো। তিনি যদি জিজ্ঞেস না করেন, তাহলে কিছু বলে দরকার নেই। যদি জিজ্ঞেস করেন, তখন বলব'খন। তুমি একেবারে ভয় পেয়ো না। আমার শাশুড়ী ও-দিকটা বেশ সামলে নেবেন।"

তিনি যখন ওই রকম বললেন, তখনও আমার মন একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল, আর এ রকম ঠিক নয় ভেবে আমি বললাম, 'না না, ও রকম ঠিক নয়, "ওকে বলে যদি অনুমতি পাই, তা হলেই ঠিক—না হলে…"

এমন সময় লক্ষ্মীবাঈ হঠাৎ বললেন, "রোসো, আমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে আসছি। দেখি তিনি কী বলেন? তাঁকে কৌশল করে বলব,"—এই

বলে তিনি গেলেন। আমিও আড়াল থেকে শুনবার জন্য তাঁর পিছু পিছু গিয়ে আড়ালে দাঁড়ালাম। আমার পিছনে যশোদাবাঈও এলেন, তিনি সটান এগিয়ে গেলেন।

লক্ষ্মীবাঈ গিয়েই খানিকক্ষণ এদিককার-সেদিককার গল্প করে, তারপরে বললেন, "আজ আমরা সন্ধ্যেবেলা বাইরে যাচ্ছি, সীতাবাঈকে পাঠাবেন? সঙ্গে নিয়ে যাব?" তখন মা বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্য নিয়ে যাও। তোমাদের সঙ্গে যেতে বাধা কী? এই একটু আগেই যশোদাবাঈকে বলিনি? কোথায় যাবে মা? কিছু দেখতে-টেখতে যাবে না কি? আমিও..."

তিনি পরে কী বলবেন এই ভেবে আমার ভয় করতে লাগল। আর মনের যে কী অবস্থা হল তা কল্পনা করাই ভালো। আমি ভাবলাম তিনি বুঝি বলবেন 'আমিও আসব।' কিন্তু ততক্ষণে লক্ষ্মীবাঈ বললেন, "না না, দেখতে-টেখতে নয়, এই আমাদের বয়সেরই কয়েকজন মেয়েরা কাছেই একত্র হব, সেখানে যাব, দূরে নয়।"

"যাও, যাও মা। কিন্তু সকাল সকাল, দিনের আলো থাকতেই ফিরে এসো, কেমন?" মার এই কথা শুনে আমার যা আনন্দ হল! প্রথমে যে যাব কি যাব না ভাবছিলাম, সে সব ভুলে গেলাম। এখন আর যাওয়া না-যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। যাবার সময় হবে কখন আর আমি যাব কখন, এই ভেবে আমি উতলা হয়ে উঠলাম।

বিকাল চারটা হল। খোঁপা-টোপা বেঁধে আমি প্রস্তুত হয়ে রইলাম। গয়নাগাঁটির ব্যবস্থা করাই ছিল, তাই সেগুলি পরতে সময় লাগল না। ভালো কাপড় আর চোলী পরে—বোম্বাইতে কোথাও যেতেটেতে হবে বলে দিদিশাশুড়ী একটা পুরোনো শাল দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে আমি তৈরি হলাম। এমন সময় লক্ষ্মীবাঈও এলেন। দেখলাম যে তিনি কিছুই সাজ-সজ্জা করেন নি। তিনি সব সময় যেমন থাকতেন তেমনিই ছিলেন—শুধু শাড়িটা বদল করেছিলেন, আর পায়ে জোড়া[১] ও গায়ে শাল এই ছিল তাঁর

১ সেকালের মহারাষ্ট্রীয় জুতা বিশেষ। তাতেও আবার মেয়েদের জন্য এই রকম জুতা বিশিষ্ট রকমে—ভিতরে নরম গদি দিয়ে—তৈরি করা হত। এই জোড়ার রং হত লাল। এই উপন্যাসটির রচনাকালে মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ সবেমাত্র এই রকম জোড়া পরতে আরম্ভ করেছিলেন। তার আগের কালে তাঁরা বেশির ভাগ খালি পায়েই বাইরে যেতেন। এই লাল জোড়া পুণার বৈশিষ্ট্য ছিল।

সাজ। যশোদাবাঈয়েরও সাজ সেই রকমই ছিল। আমার পায়ে জোড়াটোড়া কিছু ছিল না। কিন্তু সেজন্য বিশেষ কিছু না ভেবেই আমরা তিনজনে বেরোলাম। সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈয়ের চাকর ছিল।

সভার জায়গাটা আমাদের বাংলোর কাছেই ছিল। আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন আরও সাত-আটজন মেয়ে এসেছিলেন। তাদের "লক্ষ্মীবাঈ, দেরি করে এলেন যে?" এই বলে আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভাবে দেখতে লাগলেন। আমার তা ভালো লাগল না। 'আমি বোকার মতো এদিকে ওদিকে চাইতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম—এ কী? এদের আবার সভা কি?—এই রকম অনেক প্রশ্ন মনে এসে, আমার মনে কেমন গোলমাল হয়ে গেল, আর আমার ভারি লজ্জা করতে লাগল। দ্বিতীয়তঃ, সে-সব মেয়েরাও লক্ষ্মীবাঈ আর যশোদাবাঈর মতো চালাক আর বিদ্বান ছিলেন, আর একমাত্র আমি বোকা তাদের মধ্যে এসে পড়েছিলাম, এই ভেবে আমার ত্রুটির জন্য বিশেষ কষ্ট হতে লাগল।

সে-দিন একজন মেয়ের নাকি "বাল্যবিবাহ" বিষয়ে প্রবন্ধ পড়বার কথা ছিল। এটা আমি সেখানে যাওয়ার পর জেনেছিলাম। তখন পর্যন্ত সে-দিন সেখানে কী হবে তা আমি কিছুই জানতাম না। সভা যখন হবে, তখন সেখানে এই রকম একটা কিছু হবেই, এ-কল্পনাও আমার ছিল না।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কয়েকজন মেয়ে হয়তো আসবেন বলে অপেক্ষা করে শেষে উপস্থিতদের মধ্যে একজনকে সভাপতি করে সভার কাজ শুরু হল। সে-দিন পর্যন্ত সভা যে কী তা আমি মোটেই দেখিনি, তাই আমার পক্ষে সে সবই নতুন! আমার সব কিছুতেই মজা মনে হল। সভাপতি কী, আর প্রবন্ধ পড়া কী, এ ব্যাপারই বা কী? আর এ-সব করবে কে?—কেবল মেয়েরা! এই রকম সব ব্যাপার ছিল, তাই আমার বিস্ময় আর আনন্দ মনে হলে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? যাঁর প্রবন্ধ পড়বার কথা ছিল. তাঁর নামটাম এখন আর আমি এখানে বলছি না। তাঁর সঙ্গে পরে আমার খুব আলাপ হয়েছিল, আর এখনো তিনি আমাকে চিঠি লেখেন—তাই আমি তাঁর নাম এখানে বলছি না। তিনি যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটা আজকের মাপে যদিও আমার উঁচুদরের মনে হচ্ছে না, তবু সে-দিন আমি ভেবেছিলাম যে এই মেয়েদের এত পাণ্ডিত্য এল কোথা থেকে? আমার সারা জীবনে তখনো এমন মেয়ে দেখিনি, আর তারা এমন শিক্ষিতা আর বুদ্ধিমতী

তাই আমি যে ভাবলাম বোম্বাইয়ের সব মেয়েরাই বুঝি বিদ্বান, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

সেই প্রবন্ধ-লেখিকা নিজের প্রবন্ধে যে আসল কথাগুলি লিখেছিলেন তা হল এই—ছেলেবেলায় বিয়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রে পরে স্বামী মূর্খ হয়, আর যে ব্যাপারের সঙ্গে পাঁচ-ছ' বছর পর্য্যন্ত পরিচয় হওয়াও উচিত নয়, এ রকম সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে, সর্বথা হানি কী রকম হয় ইত্যাদি তিনি যা বর্ণনা করেছিলেন, তা শুনে আমার মনের উপরে বিলক্ষণ প্রতিক্রিয়া হল। শুধু তাই নয়, সেই লেখিকার প্রবন্ধ পড়া হলে পর আরও দু-এক জন মেয়ে ওই রকমই কিছু কিছু ভাষণ দিলেন। আমাদের লক্ষ্মীবাঈও বক্তৃতা করলেন। তখন আমারও গুটিকতক কথা বলতে ইচ্ছে করতে লাগল। ভাবতে লাগলাম যে বেচারি দুর্গীর জীবনচরিতের সব কথা বলে ফেলি। আগের দিন সেই চিঠিটা এসেছিল, সেটা মনের মধ্যে ঘুরঘুর করছিল,তাছাড়া তাঁরা দু-তিন জনে বিভিন্ন কথা বলে সেই ছবি চোখের সামনে জাগিয়ে দিলেন, কাজেই বেচারা দুর্গীর কথা আমার স্বভাবতই মনে পড়ল। আমার সত্যি মনে হল যে আমি কিছু বলি ; কিন্তু এ-রকম আশা মুহূর্ত মাত্র থাকে, আর তক্ষুণি কী ভাবে অদৃশ্য হয় তার অভিজ্ঞতা আমার মনে হচ্ছে শুধু মেয়েদেরই নয় অনেক পুরুষেরও আছে। কিছু বলব ভাবা-মাত্র অমনি বুক ধড়ফড় করতে লাগল, আর মনে হল কে যেন ভিতর দিক থেকে ধড়াস্ ধড়াস্ করে ধাক্কা দিচ্ছে।

শেষে অনেক সময় কাটল, তখন সভা সমাপ্ত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। কর্তারা বাড়ি ফিরেছিলেন, আর উনি আমার পথ চেয়ে ছিলেন। আমি যেই উপরে গিয়েছি, অমনি বললেন, "আসুন মহাশয়া, এখন সভা করতে লাগলে বুঝি ? এখন দেখো কী হবে তা। সব সংবাদপত্রে ছেপে ফেলবে, তাতে তোমার নামও ছাপা হবে, সে-সব পুণার লোক জানতে পাবে আর তারপরে···"। এই কথা ওঁর মুখ দিয়ে বেরুনোমাত্র আমার বুক কেঁপে উঠল। আমি ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সভাটভা দেখে যা আনন্দ হয়েছিল, যা স্ফূর্তি হয়েছিল, সে-সব সমূলে লোপাট হয়ে গেল ! ওঁর কথা একেবারে সত্যি মনে হল। ভাবলাম যে আমার এই সভার খবর এখন পুণা পর্যন্ত গড়াবে আর আমার নাম নিয়ে কী কাণ্ডই না হবে !

আমি ঘাবড়ে গিয়ে দু'বার জিজ্ঞেস করলাম, "সত্যি নাকি? সত্যি নাকি?" উনি সোজা উত্তর না দিয়ে, "তাতে সন্দেহ কী"—এই বলে শুধু হাসলেন।

তখন একেবারে কাঁদোকাঁদো হয়ে আমি বললাম, "এত সব জানতে, তবে আমায় কেন 'যাও যাও' করে জ্বালাতন করলে? আচ্ছা বেশ, এক-আধবার মানুষ হোঁচট খায়। আবার! এই কান মলছি!"

এই কথা বলার সময় সত্যি আমার চোখে জল এল। তা দেখতে পেয়েই কিন্তু তাড়াতাড়ি বললেন, "আহা, ষাট্ ষাট্। একেবারে কাঁদতে বসলে যে! পাগলী কোথাকার! তোমাদের চারজন মেয়ের সভাই বা কী, তার আবার কে কী ছাপতে বসেছে? আর যদি ছাপেই তাতে ভয় কীসের? আচ্ছা, আগে সভায় কী, কেমন হল, তা তো বল আমায়!"

"কিচ্ছু হয়নি সভায়! সভা ছিলই না। কিন্তু আগে আমায় সত্যি করে বলো, নামগুলো কি ছেপে বেরোবে?"

"তোমার তাতে কী? সভা কী রকম হল তাই আমাকে বলো না কেন? সভাপতি..."

"আমাকে সত্যি কথা না বললে আমি কক্ষণো কিছু বলব না।"

"সত্যি, সত্যি আবার কী? বললাম তো একবার যে কেউ কিছু ছাপবে টাপবে না। আর যদি ছাপেও, তবু তার অত ধার ধারতে হবে না।"

"হ্যাঁ, ধার ধারতে হবে না তো কী করতে হবে? এই রকম কিছু ছেপে বেরোক, অমনি শংকরঠাকুর গিয়ে সেটা দিদিশাশুড়ীকে পড়ে শুনিয়ে আগুন ধরিয়ে না দিলে, যা তুমি বলবে তা শুনব।"

"তাঁর সেই আগুন ধরানোর খাতির করে কে? বড় পুরোণোপনার জাঁক দেখান! বিনা পয়সায় কিছু পেলে অমনি সেটা চলে। ট্যাঁকটা ঢিলে না থাকলেই হল!"

"সে যাই হোক। কিন্তু..."

"কিন্তু টিন্তু কিছু নয়। আগে কী কী হল তা বলো দেখি।"

"এখন একটু সবুর সও। মা আসবার আগে আমাকে অন্ত কাপড় পরে আগে রান্না আরম্ভ করতে দাও। তার পরে সেখানে বসে বসে কী হল

সে সব বলব।" এই বলে আমি আমার কাজ করতে লাগলাম। আর এদিকে যা হয়েছিল সে সব কথা বলছিলাম। বলতে বলতে এটাও না বলে ছাড়িনি যে আমার বক্তৃতা দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। আমি নিশ্চিত জানতাম যে উনি আমার কথা শোনামাত্র বলবেন, "তবে বললে না কেন?" উনি ঠিক তাই জিজ্ঞাসা করলেন, শুধু তাই নয়, উনি ধরে বসলেন যে, এরকম ঠিক নয়, "তুমি সে সব কথা লিখে, পরে আবার প্রসঙ্গমত এ রকম সভায় গিয়ে পড়ে শুনিও।"

কিন্তু ততক্ষণে মা এসে পড়লেন, কথাটা তেমনি রইল। তবু রাত্তিরে সে কথা উঠলই। আর সেও কোথায়? রাত্তিরে সবাই যখন একত্র বসে-ছিলাম সেখানে। ওঁর মনে অন্তরে-বাইরে কিছু আলাদা ছিল না। সোজা বলে ফেললেন, "আমার স্ত্রীর ছেলেবেলার একজন বন্ধু আছে। তার কাহিনী বড় অদ্ভুত আর মর্ম্মভেদী। আমি ওঁকে সেটুকু লিখে সভায় পড়তে বলছি। এতে কি বাপু কোনো দোষ আছে? আজই নিজে উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর সে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু…"

"বাঃ! এ আমি জানতাম না। আমি তক্ষুণি সেখানে বলতাম যে "সীতাবাঈ নিজের চোখে-দেখা একটি ঘটনা বলবেন," যশোদাবাঈ তাড়া-তাড়ি বললেন।

"আচ্ছা, সেখানে না হয় নাই হল, কিন্তু এখানে বলতে তো কোনো আপত্তি নেই। এখানেই বলুন দুর্গার দুর্গতির কথা, তার ছেলেবেলা থেকে। সেখানে যা বলতে ইচ্ছে করছিল তা এখানে বললেই হয়।"

ওঁর এ কথা শুনে আমার ভয়ানক রাগ হল। কিন্তু উপায় কী? আমি চুপ করে বসলাম। আমার আসল অবস্থা জানতে পেরে লক্ষ্মীবাঈ বললেন, "ওঁকে এমন অপদস্থ করবার দরকার কী? ও কি সভায় কখনো কিছু বলবে না? আপনার অত ইচ্ছা থাকলে, দেখবেন ও সব ঘটনা লিখে ফেলে কী না।"

তাঁর এই কথা শুনে আমি একটু জোর পেলাম, আর বললাম, "তবে সত্যি আমি যেমন পারি তেমন, বাঁকাচোরা, ভুলভ্রান্তি লিখব, তাতে অত ভয়ের কী আছে?"

যশোদাবাঈ—হ্যাঁ, এই রকম জোর ধরো তুমি সীতাবাঈ। জানো, পুরুষরা ভাবেন যে যত সব সাহস, সব বিদ্যা, তাঁদেরই আছে। কাল

দুপুরেই আমরা সেই মহিলাটির চরিত্র পড়লাম না লক্ষ্মীবাই? আমাদের এদিকে একটিও কি সে রকম উদাহরণ আছে!—মেয়েদের মধ্যে থাক—কিন্তু পুরুষদের মধ্যেও কি আছে?

বিষ্ণুপন্ত—নানাসাহেব, রঘুনাথ রাও, এখন আর আমাদের বলবার কি সুবিধা আছে। এখন আমাদের নীচে নাববার পালা এল।

রঘুনাথ রাও—আসুক, তাতে এমন কী। আমরা এমনি করে যখন উত্তেজিত করব, তখনই কিছু হবার আশা আছে। আমি যদি অমন উত্তেজিত না করতাম, তাহলে এইখানেই যে উনি মুখ ফুটে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, তা এখনও বলতেন না।

শংকরঠাকুরের চিঠি

আগের পরিচ্ছেদের ঘটনার পর আন্দাজ দু'মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে বলবার মতো কিছু হয়নি। আমার পড়াশোনায় আমার অজান্তে এত উন্নতি হয়েছিল যে তা বলতে পারছি না। আগের মতো বাঁকা-চোরা বাক্য কিংবা খুব বেশী বানানের ভুল আর করতাম না। পড়ার অভ্যাস খুব হল, আর বেশ গড় গড় করে ও বুঝেসুঝে পড়তে লাগলাম। আমাকে ঠাট্টা করবার আর কারো সুবিধা রইল না। এ-সব উন্নতি হবার কারণ আমার প্রতিবেশী—না, আমার বোনেরা, না, না, আমার প্রাণের একনিষ্ঠা বন্ধু লক্ষ্মীবাঈ আর যশোদাবাঈয়ের সাহায্য। আমি শুধু ভালো পড়তে লাগলাম তাই খুব ভালো মেয়ে হলাম, আমার উন্নতি হল, এ আমি বলছিনে; লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কত বিষয়ে জ্ঞান হল। স্বভাবত: আমার একটু কাজকর্মে আলস্য ছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গ গুণে আমিও এত পরিশ্রমী আর অধ্যবসায়ী হয়ে পড়লাম যে আমার নিজেরই আশ্চর্য মনে হতে লাগল। ওঁর কিন্তু ততটা আশ্চর্য মনে হয়নি। উনি ভাবতেন যে আমি মূলত: অধ্যবসায়ী, কিন্তু সুযোগের অভাবে আমার কর্ম-শক্তি ঢাকা পড়েছিল। এই দু'জনের সমাগমে সেই শক্তিটা জেগে উঠল। উনি আমাকে অতিশয় ভালোবাসতেন বলেই এ-রকম ভাবতেন, তা ছাড়া আর কিছু নয়। উনি আমাকে যে কী মনে করতেন, তার সীমাই নেই। আমি যে ওঁর বিষয়ে তেমন ভাবতাম তাতে কোনো আশ্চর্য নেই। কেন না, ওঁর এমন সব গুণ ছিল, যা আর কারো নেই। কিন্তু আমার তেমন কোনো যোগ্যতা, তেমন কোনো গুণ মোটেই না থাকাতে, উনি যখন আমার সব কাজই এত পছন্দ করতেন, তখন—মানুষ যাকে ভালো-বাসে তার সবই সুন্দর মনে করে—এই কথাটি প্রমাণ হয়। আমি একটু কিছু করলে তার কত প্রশংসাই না করতেন। আমি কোনো খাবার একটু ভালো রাঁধলেই অমনি সেই দুই বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। এই

ভাবে আমি কেবলই উৎসাহ পেতাম। ওঁর মুখে খারাপ কথা কখনো শুনিনি। আর সব সময় ভাবতাম যে কক্ষনো যেন ওঁর মুখে খারাপ কথা শুনতে না হয়। তাছাড়া আমি নিজেই জ্ঞান, পরিপাটি, কাজকর্ম, সুব্যবস্থা ইত্যাদি ভালোবাসতে লাগলাম, আর আমার সেই দুজন বন্ধুর সাহায্যের ফলে দিনে দিনে আমি বেশ চটপটে হতে লাগলাম। যখনকার তখন, যেখানকার সেখানে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ করা এমন অভ্যাস হয়ে গেল। বিশেষ কথা এই যে, পড়াশোনার দিক দিয়ে আর উলের কাজ করা, জামা কাপড় সেলাই করা ইত্যাদিতে রাতদিন মনের টান হয়েছিল, তাই আমরা একটু অবসর পেলেই অমনি সে-রকম কোনো কাজে মন দিতাম। অন্য মেয়েরা যেমন দু-তিন জনে একত্র মিললেই জানাশোনা মেয়েদের কুৎসিতভাবে নিন্দা করে, কিংবা খালিখালি গয়নাগাঁটির সম্বন্ধে আলোচনা করে, শুষ্ক গল্প করে, কিংবা অমুক লোক নিজের বৌকে অমুক করল, আর তার বৌ তাকে এই উত্তর দিল, সে-রকম মূর্খতাপূর্ণ গল্পগুজব করে, আমরা কখনো সে-ভাবে সময় কাটাইনি। এ-কথা বলতে পারার মতো মেয়ে আজ হাজারে-দু'হাজারে একজনও পাওয়া যাবে কি না কে জানে! এমন পাওয়া না গেলে আমি কারো দোষ দিচ্ছি না। সে বেচারীদের কী দোষ? তাদের মন ভালো কাজে নিমগ্ন হবার পথই যখন পায়না তখন তারা কী [illegible]বে?

এই রকমে সুখে দু-আড়াই মাস কেটে গেল। ইত্যবসরে আমাদের বোম্বাইয়ে স্থিতিতে বলবার মতো বিশেষ কিছু হয়নি। সময়ে সময়ে দাদার চিঠি আসত, আর আমি বাড়ির ও দুর্গীর খবরও কখনো কখনো পেতাম। দাদা একখানি চিঠিতে লিখেছিল যে, দশ দিন থেকেই দুর্গীর ভয়ানক কাসি হয়েছে, আর তার জীর্ণ জ্বর হয়। তখন থেকে আমার একটা ভাবনা হয়েছিল। পরে একটা চিঠিতে সে তার খোকার যে বর্ণনা দিয়েছিল, তা পড়ে আমার দুঃখ হল। আর তাতে হাসিও পেল।

জরৎকারুরই[1] ছবি! হাত-পাগুলো সরু, হাঁড়ির মতন পেট, আর তার জন্মাবধি মার বুকে একেবারেই দুধ নেই। সে-বাচ্চাটা গোলগাল হবে কী করে? তার দুঃখের মধ্যে সুখ ছিল এই যে, চাকরির ছুতো করে

১ মহারাষ্ট্রে—রোগা, রুগী মানুষকে জরৎকারু এই নাম দেবার একটা প্রথা আছে।

দুর্গীর স্বামী সেই যে গিয়েছিল আর এসে জ্বালাতন আরম্ভ করেনি। যা কষ্ট ছিল, সে তার অসুখের চিন্তায় আর খোকার জন্য উদ্বেগেরই। সে লিখেছিল, তা ছাড়া দুর্গীর পাও কেমন যেন অবসন্ন আর দুর্বল হয়েছিল। দাদার দু-চারখানা চিঠি আসার পর আমার দু-একবার মনে হয়েছিল যে তাকে একবার দেখে আসি। তার কথা আগাগোড়া বলে আমার সেই দুই বন্ধুকে আর নানাসাহেবকে জিজ্ঞাসা করামাত্র তাঁদের এত দুঃখ হল যে তা বলতে পারছি না। দাদার সেই চিঠিটা আসবার দিন আমরা সে বিষয়ে আর ঐ রকম প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলেছিলাম। বলতে বলতে যশোদাবাঈ তাঁর ননদের সম্বন্ধে ঠিক সেই রকম অভিজ্ঞতা আমাকে বললেন। তার কথাও বহুলাংশে দুর্গীরই মতো, তাই আমি সেটা এখানে দিচ্ছি না। আলোচনা করতে অবশ্য এ-রকম হবার মূল কারণ কী, এই চর্চা শুরু হল। এ রকম অনেকবার হত। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা শুনে সাধারণ ভাবে আমাদের কথাবার্তা হত, আর তারপর তর্ক-বিতর্ক শুরু হত। আমি এখন বেশ আর সকলের মতো নির্ভীক হয়েছিলাম বলতে আপত্তি নেই। আমি যা মনে করতাম তা স্পষ্ট ভাবে বলতে লাগলাম। কোনো দিন কোনো ভালো কথা বললে ওঁর কাছ থেকে যা উৎসাহ পেতাম তা বলা যায় না।

আড়াই মাস হল। এবার অবিলম্বে ছুটীর দিন আসবে, আর আমাদের পুণায় যেতে হবে এই ভয়ে আমার বুক দুরু দুরু করত। পুণায় গেলে এই স্বাধীনতা কি আর থাকবে? সেখানে আবার আগের মতো ঘাড় হেঁট করে, সব সময় বিড়্‌বিড়্ করার মতো কথা বলে, কিংবা একেবারে কথা না বলে, আর বললে কারো নোংরা ঠাট্টা, কারো নিন্দা, কারো পরনিন্দা আর কাপড়-চোপড়ের গল্প, এ ছাড়া কী বলব? কোথায় এখানকার মানসিক উদারতা আর সুখসংলাপ, আর কোথায় সেখানকার সকল সময়ের হিংসুটে ভটর-ভটর। এই রকম বিভিন্ন চিন্তা এসে আমার বড় দুঃখ বোধ হতে লাগল। তাছাড়া দু-একবার এও ভাবলাম যে পুণায় আমাদের এখানকার আচরণের বার্তা যদি পৌঁছে থাকে তাহলে আরো কত কী কষ্ট সহ্য করতে হবে! এখনও পর্যন্ত পত্রদ্বারা আমরা সেখান থেকে খবর পাইনি। তাই আমি এই ভাবছিলাম যে আমাদের এখানকার খবর সেখানে পৌঁছয়নি। যদি পৌঁছে থাকত, তাহলে আর কেউ না হোক

শংকরঠাকুর নিশ্চয় সে-বিষয়ে চিঠি না লিখে থাকতেন না। তাঁর অবশ্য চার-পাঁচখানা চিঠি এসেছিল, কিন্তু তাতে, "দু'টো আলোয়ানের থান,"[১] "ছেলেদের উপযুক্ত উত্তম ছিট", "পুরুষদের জামার উপযুক্ত লংক্লথ—পাঁচটা জামার দরকারমতো"—পাঠিয়ে দিও, টাকা শীঘ্রই পাঠিয়ে দিচ্ছি, এর চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। গোপাল-ঠাকুরেরও দু-তিনখানা চিঠি এসেছিল, কিন্তু তাতে কুশল সংবাদ ছাড়া কিছু ছিল না। শংকরঠাকুর চিঠি দিয়েছেন আর তাতে কিছু চান নি, এমন হতেই পারে না। টাকা পাঠিয়ে দেবার আশ্বাস প্রত্যেক চিঠিতেই দিতেন। মাত্র শেষের দু-একখানা চিঠিতে, "আগের জিনিসগুলোর আর এই নতুন জিনিসপত্রের আর কাপড়ের একুনে দাম অবিলম্বে পাঠিয়ে দেব," এই কথা ছিল। আর একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে, যে-চিঠিতে এই রকম কিছু পাঠিয়ে দিতে লিখতেন, সেই চিঠিতে "নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন কোরো, বোম্বায়ের হাওয়া বড় খারাপ, কলেজ কেমন, ঠিক চলছে তো?" ইত্যাদি খবরা-খবর অবশ্য নিতেন। তাঁর চিঠি এলেই অমনি চার-পাঁচ টাকার খরচ নিশ্চয় আছেই। তাতেও আবার এই মজা ছিল যে তিনি যা চাইবেন তা না পাঠিয়ে উপায় ছিল না! তাই আমরা ঠিক করেছিলাম যে, যাই হোক না কেন, তাঁর চিঠি এলে 'না' বলবো না, যা চেয়ে লিখবেন তা পাঠিয়ে দেব। আমরা একটা ক্রটী করলেই সে বিষয়ে যে কত টীকা হবে তা আমরা জানতাম, তাই ভাবতাম চুপ করে সহ্য করাই ভালো। হ্যাঁ, আমরা তাঁদের ঘরে মানুষ হয়ে, তাঁর চাওয়া জিনিস পর্যন্ত পাঠাই না, এ-রকম না হওয়াই ভালো। বাস্তবিক যিনি আমাদের যত্ন করে মানুষ করলেন, তিনি কখনো এক পয়সার জিনিসও পাঠাতে লেখেন নি। কিন্তু শংকরঠাকুর অন্য কিছু ভেবেই পেতেন না। যদি কখনো তাঁর লেখা অমান্য করি, তাহলে আমাদের শাপ দিয়ে আমাদের নামে কতো যে অপবাদ রটনা করবেন, তার কি কিছু সীমা ছিল? তাই, চুপ করে জিনিস পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য গতি ছিল না।

লক্ষ্মীবাঈ, যশোদাবাঈ কখনো এ-সব ব্যাপারে মন দিতেন না। কিন্তু একদিন কার যেন পুণায় যাবার কথা ছিল, তার সঙ্গে এমনি কী-একটা

১ সেকালের মহারাষ্ট্রীয় বিকেশিনী বিধবারা এক রকম লাল রঙের, পাড়বিহীন কাপড় পরতেন। সেই কাপড় আলোয়ান নামে পরিচিত ছিল।

পাঠাবার কথা, তাই আমি সে জিনিসটা বাঁধছিলাম, এমন সময় উনি হেসে তাঁদের বললেন, "আপনাদের বোধহয় আশ্চর্য মনে হয় যে এ সব সময় পুণায় কী পাঠায়?" তখন লক্ষ্মীবাঈ বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি আশ্চর্য মনে হয়," কিন্তু যশোদাবাঈ বললেন, "আমার অত আশ্চর্য লাগে না। আমার খুব অভিজ্ঞতা আছে। লক্ষ্মীবাঈ তখন এখানে ছিলেন না। আজকালই একটু কম হয়েছে।" তখন আমি তাঁদের শংকরঠাকুরের কথা বললাম, আর হেসেই লুটোপুটি হলাম। যশোদাবাঈ নিজের কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ অন্য কথা উপস্থিত হয়ে সেটা সেইখানেই চাপা রইল।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখতে হবে যে, শংকরঠাকুর যখন কোনো জিনিস চাইতেন, তখন আমার ছোট মামীশাশুড়ী বন্নুঠাকুরঝি আর উমা শাশুড়ীর জন্যও কিছু না কিছু পাঠাতাম। একবার আমি আমার জন্য চোলীর পাড় কিনেছিলাম। তখনই তাঁদের তিনজনের জন্য বেশী দামী পাড়, আর ছোট মামীশাশুড়ী ছিটের শাড়ি পরতে ভালোবাসতেন তাই সে রকম দু'খানা শাড়ি, একটা তাঁর ও আর একটা উমা-শাশুড়ীর জন্য, পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এ-কথা এখানে বলবার বিশেষ কিছু কারণ আছে।

এই রকমে দিন যাচ্ছিল। এমন সময় মার্চ মাসে একবার একটা মেয়েদের ইস্কুলে প্রাইজ দেবার সমারোহ ছিল। আমরা সকলে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। অবশ্য, এখন আর যাওয়া-না-যাওয়ার প্রশ্নটা তত বড় ছিল না। যাওয়াই ঠিক হল, আর তাও সবাই মিলে। কেননা, নিমন্ত্রণ পুরুষ মেয়ে সকলকে মিলেই করেছিল। আমরা সকলে মিলে গাড়ি করে গেলাম। পুরস্কার-সমারোহ যেমন জাঁকজমকে হবার কথা, সে-রকম হল। দিনে দিনে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হচ্ছে, এই ইস্কুল তারই সাক্ষী দিচ্ছে, ইত্যাদি অনেক কথার উল্লেখ হল, অনেক ভালো ভালো কথা তারা বলল। সন্ধ্যাবেলা আমরা ফিরে এসে সে বিষয়ে আলোচনা করে বড় আনন্দ পেলাম। কিন্তু তার পরের দিন——নামক সংবাদপত্রে সেই সমারোহের বৃত্তান্ত বেরুল। তাতে যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নাম ছিল। হিন্দুরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে বড় বেশি কেউ যেতেন না, তাই অবশ্য আমাদের সকলের নামগুলিও তাতে বেরিয়েছিল। তাই দেখা

মাত্র আমাকে ভয় দেখাবার জন্য উনি ইচ্ছা করে সংবাদপত্রটা আমায় এনে দেখালেন। নামগুলো ইংরাজিতে ছিল, তাই আমি গিয়ে লক্ষ্মীবাঈকে জিজ্ঞাসা করলাম। আর তিনি যখন "হ্যাঁ" বললেন, তখন আমি খুব ভীত হলাম। এই দু-আড়াই মাসের সাহস সব মিইয়ে গেল, আর ভাবলাম যে আমার আর পুণায় মুখ দেখাবার জো রইল না। এখন আমার নামে বেশ কুৎসা হয়ে দিদিশাশুড়ী আর মামীশাশুড়ী তো কিছু বলতেই দেবেন না। শংকরঠাকুর যে কী করবেন আর কী না করবেন তার ঠিক নেই। এখন করব কী, এই চিন্তায় বেশ দু'দিন গেল। ওঁর কিন্তু কিছুই চিন্তা ছিল না। বরঞ্চ সকলের সামনে আর বাড়িতে আমাকে ঠাট্টাই করতেন। কিন্তু যেমন আন্দাজ করেছিলাম, সে রকম সত্যই শংকরঠাকুরের লম্বা চওড়া চিঠি আমরা পেলাম। সেটা আগুন্ত আমি এখানে তুলে দিচ্ছি।

"স্ত্রী"

"অনেক আশীর্ব্বাদ বিশেষ। আজকালকার ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষা দিলে তারা একেবারে চঞ্চল হয়, তারা একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়, ইত্যাদি আমি অপরদের ছেলেমেয়েদের দেখে ভাবতাম, আর তাদের দেখে হাসতাম। আপনারাও সেই পথে চলেছেন এ-কথা আমাকে আজ পর্যন্ত দশ-কুড়িজনে বলেছিল, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করিনি। বরঞ্চ আমি তাদের সে-কথার খণ্ডন করতাম। যখন শুনলাম যে নরোপন্তের জামাই আপনাদের প্রতিবেশী, তখন মনে একটু সন্দেহ হল যে হয়তো আপনি বিগড়ে যেতে পারেন। কেন না, আমার নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস ছিল যে, সেই নরোপন্ত লোকটা হচ্ছে একটা যাচ্ছেতাই মানুষ, আর জামাই তো একেবারেই পাজি। আমি তখনই লিখে ফেলতাম যে, 'অমন প্রতিবেশী ত্যাগ করো'; কিন্তু আবার ভাবলাম যে অতদিন আমার কাছে থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে সে ছেলে কারো সঙ্গ-দোষে বিগড়াবে না। কিন্তু বাঃ! 'বিশ্বাসের মোষের ষাঁড়'[১] এই রকম অবস্থা হয়েছে! আমার শিক্ষার, আর এতদিন আপনাকে যত্ন করেছি তার এই ফল! যে কাজ আমাদের কুলের কেউ স্বপ্নেও কখনো করেনি, সেটা করে আমাদের বংশের বেশ নাম করেছ! আমাদের পক্ষে আর এখানে ঘরের বাইরে মুখ দেখাবারও উপায় নেই। সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে আসবার সময় 'বুধবারে'[২] খানিকক্ষণ সেই যে গোবিন্দরাও[৩] গন্ধের দোকানে গিয়েছিলাম, তার মধ্যেই আমায় দশ-পনেরো জন জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন শংকররাও, আপনার ভাগ্নে সংস্কারক হয়েছেন! পরশু কোথায় সভায় গিয়েছিলেন

১ মহারাষ্ট্রে বহুলোক মোষের দুধ খায়। তাই বাড়ির মোষের জন্ম এবং সে মোষ যদি মাদি হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দ হবার কথা। বাড়ির মোষ নিশ্চয় বকনা দেবে এই বিশ্বাস ও আশা করে বসলে যদি সেই মোষের এঁড়েবাছুর জন্মায় তাহলে যেরকম নিরাশা হয় সেরকম নিরাশা হলে 'বিশ্বাসের মোষের ষাঁড়' এই প্রবাদটি লেকে বলে।

২ —'বুধবার' পুণার একটি অঞ্চল।

৩ —সুগন্ধি ব্যবসায়ী। যাদের এই পৈতৃক ব্যবসায় ছিল, তাদের 'গন্ধে' পদবী হয়েছে।

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে! আপনি যে বলতেন 'আমাদের রঘু কখনো অমন গণ্ডগোলে পড়তে যাবে না!' একজন তো এসে আমাকে বলল যে, সীতা সেখানে সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছে, আর বাস্তবিক নাকি যাচ্ছেতাই একটা কিছু বলে তার বোকার মতো অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু কে যেন এক সাহেব প্রশংসা করে তার গলায় মালা পরিয়ে দিল! এই সব ব্যাপার আপনি যেমন পছন্দ করেন, তা করুন। আমার কিন্তু তা একেবারে পছন্দ নয়। শুধু তাই নয়, আমি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছি। আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি যে আজ পর্যন্ত আমি ঘরে একটা সাপের বাচ্চাই পুষেছি। আপনার লেখাপড়ার জন্য আমার যা টাকাকড়ি খরচ হয়েছে, আর আপনি ভালো শিক্ষা পেয়ে, আমাদের নামের যাতে মর্যাদা রক্ষা হয় সেই জন্য আমি যে অপরিমিত পরিশ্রম করেছি, তা নিষ্ফল, ব্যর্থ হয়েছে। এর চেয়ে কোনো মাধুকরী ছেলে……

"কিন্তু এখন আর লিখেই বা কী প্রয়োজন? আমার, আমাদের কুলের, আমাদের বাড়ির আপনি যে আবরু খারাপ করেছেন, সে লোকসান কি আর পূরণ হবে? ঘরের বাইরে পা ফেললেই যে-সে আমার মুখে থুথু দিতে আরম্ভ করেছে। 'কী হে, আপনার বৌমা যে বড় বিদ্বান হয়েছেন!' 'কেমন, আসছে মে মাসে হিরাবাগানে তাঁর মস্ত বড় ব্যাখ্যান হবে, তখন আপনি বোধ হয় সভাপতি হবেন?' সে কি এক কথা? শতেক কথা কাল-পরশু থেকে লোক এসে আমায় জিজ্ঞেস করছে! মার মাথা তো এত খারাপ হয়েছে যে তা বলবার জো নেই।

"কিন্তু এ আপনাকে লিখে কী ফল? আপনাদের কি সে-বিষয়ে কোনো লজ্জাবোধ হবে? আপনারা যদি আমাদের ঘর-বাড়ি, আবরু কিছু মান্য করতেন, তাহলে আপনাদের দ্বারা অমন ভ্রষ্টতা, মূর্খতা হতই বা কী করে? বেশ করেছেন! আমার টাকাকড়ি, শিক্ষা, উত্তম কাজে লাগিয়েছেন। আমাদের উদ্ধার করেছেন! আজ শুধু সভায় সম্ভাষণ দিলেন, সাহেব গলায় মালা পরিয়ে দিল, এর পরে না জানি কী হবে! এখন কেউ এসে যদি আমাকে কিছু বলে, তাহলে তা মিথ্যে ভাবতে হবে না। আমাদের বাড়ির বৌ-পনার বেশ দেমাক রটিয়ে দিলে! আজ পর্যন্ত আমাদের নিজের একটা নাম ছিল। এখন ওঁর নামে লোকে আমাদের চিনবে! ইনি কে? ইনি হচ্ছেন, সেই দিন সাহেব যার গলায় মালা পরিয়ে দিল, সেই স্ত্রী-

লোকটির মামাশ্বশুর! বাঃ! কী সুন্দর আমাদের কীর্তি।

"কিন্তু এখন বৃথা এ-সব লিখে নিজের মাথা ঘামিয়ে দরকার কী? আপনাদের কি একটুও তার জন্য লজ্জা আছে? এখন শুধু বলবার বাকি আছে যে, আপনাদের আর কষ্ট করে এ-বাড়িতে ফিরে আসবার প্রয়োজন নেই। বারুবাঈকে আপনারা না জানি কত আর কী রকম যত্ন করেন? তার কী মান রাখেন, তা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাই, আমার ইচ্ছে যে সে যেন অমন অনাচারে আর দুঃখ কষ্টে না থাকে। শুধু তাই নয়, আপনি যদিও তাঁর সুপুত্র, তবু মেহেরবানি করে তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। এখন তার ওখানে থাকা আর, আমাদের তাকে সেখানে থাকতে দেওয়া, মানেই হল তাকে খুব কষ্ট দেওয়া। আমরা আজ পর্যন্ত যেমন ওর মন ঠাণ্ডা রেখে ভরণপোষণ করেছি, তেমনি এর পরেও করব। বুঝব যে ওর স্বামী যখন মারা গেল, তখনও যেমন অনাথ হয়েছিল, আজও তেমনি হয়েছে। তখন ছেলে বড় হয়ে মাকে যত্ন করে মাতৃঋণ পরিশোধ করবে এই আশা ছিল, এখন আর তা নেই, এইটুকুই তফাত! অন্য লোকের ড্যাকরার মতো আচরণ দেখে যে-আমি হাসতাম, সেই আমার আজ মাথা হেঁট হয়েছে!

"যাক্। আপনারা সীতারামের জোড়া হয়তো কোথাও সভায় যাবেন, তাই এখন আরো লিখে বৃথা সময় অপহরণ করতে চাই না। আশ্চর্য এই মনে হয় যে-আপনি নিজের মুখের উপর মাছি বসলেও তাড়াতে সাহস পেতেন না এমন বোকা ছিলেন, সেই আপনি এত পণ্ডিত মূর্খ হয়েছেন, এর কারণ যে আপনার জ্ঞানী পত্নী তা আমি জানি না, এমন নয়। সে ভালো হবেই বা কেমন করে? তার নিজের মা'র কীর্তি তো কম শুনিনি, এখনকার মারও শুনছিই। বাপের কাজ কেমন তাও দেখা গিয়েছে। তার পরের কাজও কেমন তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। 'যেমন খনি, তেমন মাটি!'[১] বাবা জেলে গিয়েছিলেন, সেদিক দিয়ে ধ্বজা উড়িয়েছেন। এখন ইনি, সংস্কৃতা, শিক্ষিতা হয়েছেন, ইনি এদিকে পতাকা ওড়াবেন। আর মাঝখানে এঁর সংসর্গ-লোভে, আর সেই মোরোপন্তের জামাই আর নানা না ফানা আছেন, তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে আপনি প্রদীপ জ্বালাবেন! তাদের ব্যাপার

১. একটি মারাঠি প্রবাদ। এর অর্থ স্পষ্ট।

কেমন তা আমার জানা নেই, এমন নয়। কিন্তু তার মার কোথাও যাবার সুবিধা নেই। আপনার মার অবস্থা তেমন নয়। তার ভাইরা তাকে ভরণপোষণ করতে—তার চুলেও যেন ধাক্কা না লাগে এই রকমে তাকে ফুলের মতো যত্ন করতে—প্রস্তুত! অন্ততঃ আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন তাকে এখনকার মতোই যত্ন করব। এতটুকুও দূরে ঠেলব না। আমি নিজেই তাকে নিয়ে আসতাম, কিন্তু সেখানে মিছিমিছি আপনার সুখে বিঘ্ন ঘটাই কেন? তাছাড়া, আপনাদের সেই অনাচার আমার চোখ সহ্য করতে পারবে না। তাই, দূরে আছি, সেই বেশ, একবার লিখে দেখছি, যদি কিছু আক্কেল থাকে, তাহলে বুঝতে পারিবেন, না হলে কী হবে তা দেখতে পাচ্ছি। আপনি হয়তো ভাবছেন যে আপনি টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করেছেন তাতেই সব পেয়েছেন···, কিন্তু আমার প্রাণে মিছিমিছি জ্বালা ধরিয়ে লাভ কী? তাই এখন শেষ করছি। নিজের ইচ্ছামত আচরণ করে সুখে থেকো! আর এই রকমই কুলাঙ্গার হয়ে স্ত্রীর সাহায্যে অধিকাধিক সংস্কার করে, আর মস্ত বড় সংস্কারক বলে নাম করে একবার দিগ্বিজয় করো!"

এইরকম যাচ্ছেতাই চিঠি উনি যখন পড়লেন তখন ওঁর এমন রাগ হল যে তার বর্ণনা করতে পারছি না। আমি আজ পর্যন্ত কখনো ওঁকে এত রাগতে দেখিনি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাকে এ চিঠিটা এসেছে সে কথা বলেনই নি। কিন্তু যে কোনো কথা হোক—ভালো কি মন্দ—আমাকে না বলে দু'দণ্ডও থাকতে পারতেন না। তাই এ চিঠির কথা না বলে উপায় ছিল না। তাই আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম, "এত রাগ করেছ কেন? কার চিঠি?" তখন অনেক 'না, হ্যাঁ' করে আমাকে বললেন, আর চিঠিখানা আমাকে পড়তে দিলেন। দেখলাম যে সেই চিঠি আমি যেন পড়ি এইজন্যই বোধ হয়, ঠাকুর চিঠিটা ইচ্ছা করে বাল-বোধ[১] লিপিতে লিখেছিলেন। বোধহয় সে চিঠি অন্য মেয়েরাও যেন দেখে আর পড়ে, এ

১ এই উপন্যাসটি রচনাকালে মহারাষ্ট্রে মারাঠি হাতের লেখার লিপি আলাদা ছিল। ইংরাজীতে যেমন ছাপার আর হাতের লেখার লিপি আলাদা সেই রকম। মারাঠি হাতের লেখায় ব্যবহৃত লিপির নাম ছিল 'মোড়ী লিপি'। আস্তে আস্তে এই লিপিতে লেখার অভ্যাস কমতে কমতে আজকাল আর বড় বেশী কেউ এ লিপি লেখে না। মারাঠি দেবনাগরী লিপিকে আগে বলা হত বাল-বোধ।

অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। তাঁর মন যত কুৎসিত, নোংরা, খারাপ, বিচ্ছিরি সব বিষয়ের আকর ছিল, তাই তাতে সবকিছুই থাকা সম্ভব।

আজ যদিও আমি সে-বিষয়ে যেমন ইচ্ছা তেমন লিখছি তবু সে দিন কিন্তু সেই চিঠি পড়ে আমার এত রাগ হল, আর আমি কত যে কাঁদলাম তা বলা যায় না। আমি সে দিন খেতে পারিনি, কারো সঙ্গে কথা বলিনি, সারাদিন ঘরে বসে অবিরাম কেঁদেছিলাম। উনি নানা রকমে আমায় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি ওঁর সঙ্গেও কথা বলিনি। আমার বাবার সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছিলেন, সে কথা এর আগে আমি কানে শুনেছিলাম, তাই আমার সে বিষয়ে ততটা দুঃখ হয়নি। কিন্তু যাঁর নখের সঙ্গেও কারো তুলনা হতে পারেনা, যাঁর কথা স্মরণ করলে মন সংশোধিত হয়ে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যেত, যাকে আমি ভূলোকের দেবতা মনে করতাম, আমার সেই মায়ের সম্বন্ধেও যখন ওই চিঠিতে কুৎসিত ইঙ্গিত আমি পড়লাম, তখন আমার মনের অবস্থা কী রকম হল তা কি কেউ বুঝতে পারবে? আমার কত রাগ হল, কত কান্না পেল, তার অল্পটুকুও কি অভিজ্ঞতা ছাড়া কল্পনা করা যায়? আমার মার বিষয়ে কারো মুখে আজ পর্যন্ত আমি ঘুণাক্ষরে নিন্দা শুনিনি, সেই আমার স্নেহরূপিণী জননীর সম্বন্ধে, তাঁর মৃত্যুর পরে কারো হাতে লেখা নিজের মার কীর্তি তো কম শুনিনি, এই শব্দ পড়া আমার কপালে ছিল! আর তাও কে লিখেছিল? শংকরঠাকুরের মতো একটা অপদার্থ লোক! তখন রাগ হবে না তো কী হবে?

সত্যি, আমি সে দিন কেঁদে মাটি ভিজিয়েছিলাম। কিন্তু সব কিছুর একটা শেষ আছে, তাই আমার দুঃখ আর খেদ শেষ হয়ে শান্ত ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। আমার জন্য ওঁকে যত সব দোষ দেওয়া, আর আমাদের জন্য আমাদের প্রতিবেশীদের দোষ, শুধু তাই নয়, একবার তো আমি ভাবলাম যে আমার পরমপূজনীয়া মায়ের বিষয়ে যে কথা লিখেছিলেন, সেটা কেবল আমাকে অপমানিত করে, আমার উপরে রাগ প্রকাশ করার জন্যই ঠাকুর লিখেছিলেন। কার বিষয়ে কী বলা উচিত, আর কার বিষয়ে কী লেখা উচিত, সেটা কুৎসিত মানুষ কি কখনো ভেবে দেখে? তেমন মানুষ শুধু এই ভাবে যে নিজে কী বললে কিংবা কী লিখলে বেশী খোঁচাতে পারবে! আমি এর আগে পাঠকদের বলেইছি যে কাউকে খোঁচা দিয়ে, বিচ্ছিরি, কুৎসিত কথা বলতে শংকরঠাকুর একেবারে নিপুণ ছিলেন। তাই পাঠকরা

এই চিঠিতে কিছু আশ্চর্য মনে করবেন না।

কালে কালে লোকে সব কথাই ভুলে যায়! সাত-আট দিনে সেই চিঠির কথা আমরা প্রায় ভুলে গেলাম। উলটে আমার নিজের মনে হাসি পাচ্ছিল যে অমন চিঠির জন্ম আমি এত কাঁদলাম কেন? এই আট দিনে উনি আমাকে যত কথায় সান্ত্বনা দিয়েছেন, আমায় বুঝিয়ে বলবার যা চেষ্টা করেছেন, তার সীমা নেই। উপদেশ তো নানা রকমে দিয়েছেন। লক্ষ্মীবাঈ আর যশোদাবাঈ আমাকে কতবার জিজ্ঞাসা করলেন যে আজকাল তোমার কী হয়েছে? কিন্তু তাদের কেমন করে বলব? দু-একবার ভেবেছিলাম যে চিঠিটা তাদের দেখাই। কিন্তু আবার ভাবলাম দরকার নেই। আমার যেমন কষ্ট হচ্ছে, সেই রকম তাদেরও হবে, আর মিছিমিছি তাদের সুখে ব্যাঘাত হবে। কিন্তু আট দিনে সে চিঠির গুরুত্ব কমে গেল, একদিন রাত্তিরে নিজের মতো গল্প করতে করতে উনি বললেন, "ওহে, আপনাদের কাউকে দেখাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু পুণায় আমাদের নিয়ে যা বিষম কাণ্ড বেধেছে, আর আপনাদেরও তাতে অল্প কিছু কেমন নিন্দা হয়েছে, তা আপনাদের না দেখিয়ে থাকতে পারছি না। আপনারা কিন্তু তাতে দুঃখ পাবেন না।" এই বলে তাড়াতাড়ি "সেই চিঠিটা নিয়ে আসছি" বলে উনি উঠলেন। আমি কেশে, চোখ বড় বড় করে ইশারা করলাম, "যেও না, যেও না।" কিন্তু উনি, "এঁ্যা? তাতে কী? জগতে ক' রকম লোক আছে তা এঁদেরও তো জানা দরকার!"—এই বলে আমাকেই অপ্রতিভ করে ফেললেন। আমার মায়ের বিষয়ে মন্দ কথা শংকরঠাকুর যে তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন, এটা ওঁর তখন মনেই ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে চিঠিটা এনে বেশ অবাধে পড়ে শোনালেন। আমার ভয়ানক ভয় হয়েছিল। লক্ষ্মীবাঈ আর যশোদাবাঈর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম যে তারা তেমন কিছুই মনে করেননি। বরঞ্চ যশোদা-বাঈ বললেন, "ওমা, এইমাত্র! এঁকে জিজ্ঞেস করুন কাকার কাছে এরকম কত চিঠি এসেছে! তোমাদের এই চিটিটা তাদের তুলনায় কিছুই নয়। আচ্ছা, তোমার এই শ্বশুরমশাই অন্ততঃ একেবারে পুরোণো চাল-চলনের, স্নানসন্ধ্যাশীল নাকি?"

রঘুনাথ রাও—অতিশয়! তার তিলকটুপির ব্যবহারটা কিছু কি কম যায়! ভস্মের ডোরায় তো কথাই নেই। আর ওদিকে আড়ালে লুকিয়ে

কোথাও পেলে পান করতেও…

ব্যাপারটা গড়িয়ে চলল দেখামাত্র, বাধা দেবার উদ্দেশ্যে আমি মাঝ-খানেই হঠাৎ বললাম "আচ্ছা, এখন যথেষ্ট হয়েছে, নিজের মামা উনি, একটু তার ইজ্জত বজায়…"

রঘুনাথ রাও—ওরে বাপরে! এখন বৌমাই নিজে পক্ষ তুলে ধরলেন! তবু ভালো যে নিজেকেই সব দোষ দিয়েছেন। না, তবু পুরুষরা স্ত্রীদের প্রভাবেই বিগড়ে যায়, না, নানাসাহেব আপনার কী মত?

নানাসাহেব—ওহে, এতে মতের ব্যাপারটা কী আছে? বাস্তবিক অবস্থাই হচ্ছে ওই রকম। আমাদের কাকিমা আর আপনার মামা আমরা বখাটে ছেলে হয়েছি বলে যাদের দোষ দেন সেই মেয়েমানুষরাই তো ওরকম! আমার মেয়েমানুষ তো আমাকে বিয়ের আগেই বখাটে বানিয়ে ফেলেছে! আমার আর আমার কাকার ঝগড়ার কারণ কে দেখুন। বাপের বাড়ি গিয়ে প্রথম দিন থেকে……

যশোদাবাঈ—আমরা খুব বখাটে বানাবো, যারা বনে তারা……

নানাসাহেব—তুমি? তুমি কে? আর কাকে বখাটে বানাবে বাপু? তোমাকে কে কী বলেছে? শুধু শুধু নিজের গায়ে টেনে নেওয়া হচ্ছে, জানেন লক্ষ্মী বৌদি?

এইরকম রসিকতা হয়ে সে দিন শ্বশুরমশায়ের সেই চিঠিটা নিয়ে কেবল ঠাট্টাই হল।

দাদার দ্বিতীয় চিঠি

তবু সে চিঠির কোনো কোনো কথা আমার মনে এত বিশেষ আলা ধরাল যে অনেক করেও সেগুলি আমার মন থেকে দূর হচ্ছিল না। আমার বাবা জেলে ছিলেন, এ কথা আমি এই দ্বিতীয় বার শুনলাম। আগে একবার দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন সে আমাকে একটুও কিছু টের পেতে দেয়নি। তাই ভাবতে লাগলাম যে আবার তাকে চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করব। আমি জিজ্ঞাসা করি আর সে যদি আগের মতোই উড়িয়ে দেয়, তবে? এই মনে হয়ে ভাবলাম যে নিজের মান নিজে রাখাই ভালো। কিন্তু 'যে গুণ ছেলেবেলা, সেই গুণ সারাবেলা', এই প্রবাদের অনুরূপ আমার সাংঘাতিক কৌতূহলী স্বভাব জেগে উঠে আমার মনকে একেবারে অশান্ত করে ফেলল। আমি ওঁকে ব্যাপারটা কী তাই জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলাম। উনি বললেন:

—হ্যা, ওই চিঠির কথাগুলো কি সত্যি মনে করছ? উনি যা খুশী তা বকেছেন। ওঁর কি হৃদয় বলে কিছু আছে? উনি যত সব খারাপ কথা লিখতে পারেন তা লিখে ফেলেছেন! আর সেই চিঠি নিয়ে যদিও তুমি হাসিতামাশা করো, তবু তোমার মন থেকে সেটা যাচ্ছেনা দেখছি। আর সে-সব কথা জেনে তোমার দরকার কী?

—তাও তো সত্যি। কিন্তু এই নিয়ে তৃতীয় বার কি চতুর্থ বার আমি এ-কথা শুনলাম আর তার কিছুই আমি জানিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি। সত্যি, বলো না আমায় ব্যাপারটা কী?

—কিন্তু সেটা না জিজ্ঞেস করাই ভালো। তার জন্য কিছু ঠেকছে বলে তো আমার মনে হচ্ছেনা।

এই ভাখো! এমন কথার পরে কে কী বলবে? কিন্তু আমি তথুনি বললাম:

—আচ্ছা বেশ, আমি এখন দাদাকে চিঠি লিখে সব কথা জিজ্ঞেস

করব। সে কথা দিয়েছে যে 'বোম্বাই গেলে পরে আমি তোমায় সব কথা বলব', তা হলে হল তো?

—চিঠি লিখে আর দরকার নেই, তাঁকে আবার বিরক্ত করতে হবেনা। এটা কিছু......

—ওমা! এ কী! 'মা খেতে দেয়না, আর বাবা ভিক্ষে করতে দেয়না', সেই অবস্থাই হল দেখছি! কিন্তু কত দিন অমনি ইয়ে করে থাকব। কত বার আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু সে কথাটা উড়িয়ে দেয়, এড়িয়ে যায়। আর তুমিও দেখছি সেই রকম! যেন এখনো আমি কিছু বুঝতে পারিনে!

—ওরে বাপরে! তাই নাকি? না, না, আপনি যত বুঝতে পারেন, তত আমিও বুঝতে পারি না।

—সে যা খুশি তুমি বলো, দাদাকে চিঠি লিখে এখন আমি সব কথা জিজ্ঞেস করব।

—আচ্ছা বাপু, তা হলে ওসব করে দরকার নেই, আমিই তোমায় সব খুলে বলব, তা হলে তো হল? ভাইকে লিখে, আবার সব কথা বলে, অত কিছু করার প্রয়োজন দেখছি না।

—হ্যাঁ, এই এখন কেমন বলতে রাজি হলে? সত্যি ছিলেন না কি বাবা...?

আমার এই প্রশ্ন শুনে খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপরে আস্তে বললেন :

—হ্যাঁ, ছিলেন একমাস,—

এই কথা উচ্চারণ করে আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন :

—নিজের মানুষের বিষয়ে এই রকম প্রশ্ন করে নিজের মানুষের মুখেই সে খবর জানবার এ কী বিষম শখ!

আমি কিছু বললাম না। ভাবলাম যে তারপরে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার জন্ত নিজের উৎকণ্ঠা চেপে রাখাই ভালো। আর সত্যি, আশ্চর্যের আশ্চর্য এই যে সে-দিন আমি আত্মসংবরণ করে পরে কিছু জিজ্ঞাসা করা ছেড়ে দিলাম। আজ পর্যন্ত দাদা আমাকে বলেনি। তাই আমি চুপ করে ছিলাম, কিন্তু আজ কেবল ওঁকে অসন্তুষ্ট না করবার জন্তই আমি চুপ করলাম। আমি নিশ্চয় জানতাম যে আমি যদি আর একটু কিছুও জিজ্ঞাসা করি

তা হলে আমাকে খুশী করবার জন্য উনি আগাগোড়া সব কথা বলতেন। কিন্তু সত্যি যদি সে-কথা বলতে উনি যদি ভালোই না বাসেন, তাহলে আমার অনুরোধ না করাই ভালো—এই ভেবে আমি আমার কৌতূহল চেপে রাখলাম। তবু পরে আবার কখনো জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা জেনে নেবার সংকল্প আমার ছিলই।

দ্বিতীয় দিন সকালেই দাদার একটা চিঠি এল। চিঠিটা ছোট, কিন্তু রসিকতাপূর্ণ। সেটা এই রকম:

"আপনার বিষয়ে এখানে কী কাণ্ড চলছে তা কি জানেন? আপনারা উভয়েই খ্রীষ্টান হয়েছেন। সাহেব আপনার গলায় মালা পরিয়ে দিল। আপনি আর আপনার বন্ধুরা যখন খুশী গাড়িতে বসে বেড়াতে যান। আপনারা সারাদিন সভায় গিয়ে কাটান। আপনাদের তিনজনের প্রভাবে আপনাদের স্বামীরাও বিগড়ে গেছেন। সেদিন আপনারা নাকি কোন এক সাহেবের বাংলোয় ভোজ খেতে গিয়েছিলেন, আর···আর···সে কি এক কথা? কত অপবাদই না আপনার নামে রটে গেছে! এ-কথা আমাদের উপাধ্যায় মশায় বাবাকে যখন বলছিলেন, তখন শুনেছি। আমি তখন উপাধ্যায় মশায়কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কার মুখে শুনলেন?' অমনি তিনি আমায় বললেন, 'ওরে বাবা, গ্রামের সমস্ত লোক জানে। সমস্ত গ্রামে কথাটা যে ছড়িয়ে গে⁻⁻ছ।' তবু আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু আপনি নিজে কার মুখে শুনলেন?' তখন বললেন, 'আমায় বাবদেও-ভট্ট স্টলে বললেন।' আমি আরও খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে বাবদেওভট্টকে নর্দমাকলের পাশে আপনার মামাশ্বশুর-বাড়ির পুরুতঠাকুর সে-কথা বলেন, অবশ্য তাঁকে আপনার মামাশ্বশুর বে=(বেদ শূন্য) শা=(শাস্ত্র শূন্য)-সম্পন্ন শংকরঠাকুর বলেছেন! সার কথা বোম্বাই গিয়ে দু-আড়াই মাস যেতে না যেতে আপনি অনেক কীর্তি অর্জন করেছেন দেখছি! এখনো মাঈসাহেবকে সে-বিষয়ে কোথাও কিছু বলতে শুনিনি।

"হ্যাঁ সত্যি, মাঈসাহেবের মা পরশুদিনই ফিরে এসেছে। এইবার বেশ জমেছে। দেখতে পাচ্ছি যে কাল মা-মেয়েতে কিছু ঝগড়া হয়েছে। শনিবার ছিল, তাই ঘরেই ছিলাম। কী একটা টাকার বিষয়ে বোধ হয় খিটিমিটি চলছিল। সেই যে তোমার স্ত্রীলোকটি, সেও এসেছিল। মাঝে মাঝে

'মরী',[১] 'পোট',[২] 'জোড়ওয়ী',[৩] 'মালা', 'আর কিছু চাইনে', 'মহালক্ষ্মী'[৪] এই রকম টুকরো টুকরো কথা আমার কানে এল। সবটা শুনবার আমার ইচ্ছে ছিল না, তাই আমি উঠে সিঁড়ির কাছে যাইনি, না হলে সব শুনতে পেতাম, এত জোরে তারা কথা বলছিল। কী জানি কী ব্যাপার! কিন্তু আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি যে নিশ্চয় একটা বিশেষ কিছু গণ্ডগোল আছে। আমার মনে হল যে তারা তিনজনে ভেবেছিল যে আমি উপরে নেই। তা না হলে তারা একেবারে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলত না। কী জানি কী ব্যাপার! সম্প্রতি আর কিছু লেখার মতো নেই। আর আমার সময়ও নেই। এইটুকু যা-তা করে তাড়াতাড়ি লিখতে কোনো মতে সময় পেয়েছি। এখানে সকলের কুশল। আপনার চিঠি অনেকদিন হল আসেনি। কখন আসবে? সভা-টভায় যেতে হয়, তাই সময় পান না দেখছি। রোসো একবার, এখানে পুণায় আসুন। শংকরঠাকুর তাহলে আবার সব ঠিক করে দেবেন, না?"

একই সময়ে দুই আলাদা ধরনের কথা—আর তাও মনের উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া করতে পারে এমন কথা—শুনলে মনের অবস্থা যে কি হয়, তা আমি এই সময় বেশ অনুভব করলাম।

দেখতে পেলাম যে শুধু আমাদের চিঠি লিখে, কেবল আমাদের অবমানিত করে, গালাগালি করে তাঁর তৃপ্তি হয়নি। শংকরঠাকুর আমাদের নামে গ্রামময় ঢেঁড়া পিটিয়ে যার তার মুখে আমাদের নিন্দা ফুটিয়ে তোলবার যেন একটা ব্রতই নিয়েছিলেন। আমার মনে পড়ছে যে লক্ষ্মীবাঈ একবার সহজ ভাবে রসিকতা করে বলেছিলেন যে তাঁর মতো ধর্মাভিমানীর পক্ষে ব্রত বৈকল্য করা নিশ্চয়ই উচিত। নিত্য ব্রতগুলি সেরে তার সমাপ্তিও হয়ে গেছে কিনা, তাই আমাদের মতো সরল লোকের নিন্দা-ছলনারূপী নতুন

১ গলায় পরবার একরকম সোনার গহনা।

২ হাতে পরবার একরকম পুরু সোনার বালা।

৩ পায়ের আঙুলে পরবার রূপার সৌভাগ্য অলঙ্কার।

৪ আশ্বিন মাসের শুক্ল অষ্টমীর দিন, মহারাষ্ট্রে সীমন্তিনীরা দেবীর পূজা দেয়। সেদিন দেবীর মূর্তি আটা দিয়ে তৈরি করা হয়। এটা একটা কলা-কৌশলের কাজ। দিনে পূজা, সন্ধ্যারতি আর রাত্রে জাগরণ ইত্যাদি থাকে। এই দেবী মহালক্ষ্মী নামে অভিহিতা।

ব্রত তিনি নিয়েছেন। তখন পর্যন্ত আমি যখন কারো নিন্দা শুনতাম, ভাবতাম যে তার অনেক কথা সত্যি হতে পারে, তাই লোকে অমন কথা বলে, "না পাকলে বিকোয় না।"[১] কিন্তু মানুষের বিভ্রম দূর হতে হলে অভিজ্ঞতার মতো ভালো উপায় নেই—তা সত্যি। অভিজ্ঞতার ফলে নিশ্চিত-রূপে জানতে পারলাম যে, লোকনিন্দা মানে শুধু "পালকের পাখি করা" নয়; একেবারে ছোট্ট কোমল পালক থেকে মস্ত বড় পাখি বানানো! আমরা শুধু প্রাইজের সমারোহে গেলাম, আর তাই নিয়ে এত বড় চক্রান্ত রচনা করা হল! কিছুর কি সীমা আছে? কিন্তু যখন কারো নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে অন্যকে অপদস্থ করার শখ হয়, তখন আর কী উপায়? এমন লোক যা পায় তাই নিয়ে লোকের নিন্দা আরম্ভ করে। এই সময় আমার শ্বশুরবাড়ীতে কী চলছে, খাবার-দাবার সময়ে, ঘোরাফেরার সময়, কথা বলার সময়, হাঁটবার সময়, ঘুমোবার সময়, বসবার সময়, শংকরঠাকুর এখন নিশ্চয় অন্য কিছুই ভাবতে পারছেন না! এ তো আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সেখানকার বাস্তবিক খবর আমায় দেবে এ রকম কেউ নেই, তাই আমার একটু মন কেমন করত। দাদার চিঠি পড়ে আমি অনেক কথা জানতে পেলাম। কিন্তু তবুও ভাবতাম যে, সব কিছু কেমন কেমন হচ্ছে তা যদি জানবার উপায় থাকত তাহলে বেশ হত! শুধু এইটুকু জানলাম তারই বা কী প্রয়োজন ছিল? কিন্তু সত্যি জানবার ইচ্ছা ছিল। যদি শোনা যায় যে অমুক মানুষ নিজের বিষয়ে অমুক কথা বলছে, তাহলে অমনি, সে কেমন করে বলল, কী বলল, তার আগে কী হয়েছিল, কার কাছে বলল, তার পরে কী হল—সব কথা জানতে মানুষের কত উৎকণ্ঠা হয়! সে অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। তাই আমারও যদি সে ইচ্ছা হয় তাহলে আমাকে আশা করি, কেউ দোষ দেবেনা।

কী আশ্চর্য! আমার এখন মনে হতে লাগল যে কংস মামা যেমন জলে, স্থলে, কাষ্ঠে, পাষাণে, জগতে কৃষ্ণকে দেখতে পেত, শংকরমামার অবস্থা বোধ হয় সেই রকম হয়েছিল। উনি কৃষ্ণ আর আমি মায়া। দাদার এই চিঠিটা যখন পড়ে দেখলেন উনি, তখন ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে পেলাম যে উনি তাতে তেমন বিশেষ কিছুই মনে করেননি। হেসে শংকরমামার বিষয়ে রসিকতা মাত্র করলেন। কিন্তু আমার যে কেমন মনে হচ্ছিল, তা বলতে

১ একটি মারাঠী প্রবাদ—অর্থ অবশ্য স্পষ্ট।

পারি না। ওঁর এই রকম রঙ্গ দেখে আমার বড় অদ্ভুত মনে হতে লাগল। আমি বললাম :

—এ কী রকম? গলা পর্যন্ত এসে পৌঁছল তবু রসিকতা করে ছেড়ে দাও কী করে? এখন আমরা পুণায় যাবো, তার আগে সারা গাঁয়ে এই কথা ছড়িয়ে রাখবেন, আর তখন যে-সে এসে জিজ্ঞেস করবে। এ রকম হবে, তার আগে থেকেই সে ব্যবস্থা করতে হবেনা?"

—তার আবার কী ব্যবস্থা করতে হবে বাপু? লোকের মুখ কি চেপে ধরতে পারব?

—লোকের কেন ধরতে যাবে? আগে যিনি বার্তা রটাচ্ছেন···

—তাঁকে কী করব?

—কী করব মানে কী? বেশ একটা কড়া চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এ আপনি কী জুড়েছেন? আপনাকে কে এ খবর দিয়েছে? আর আর কোন সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে? শুধু শুধু কারো নামে সারা গ্রামে যাচ্ছেতাই মিথ্যে অপবাদ রটানোর মানে কী?

—বেশ, এই রকম লিখলাম, তারপর? আমাকে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

নিজে বড় চঞ্চল ভাবে কোনো কথা বলবার পরে, যাকে সে-কথা বলি সে যদি খুব শান্ত ভাব দেখায়, তা হলে মনে কি রকম অবস্থা হয়, তার অভিজ্ঞতা কার নেই? ওঁর সেই শান্ত ভাবে উচ্চারণ-করা প্রশ্ন শুনে আমার সত্যি এমন রাগ হল যে কি বলব। আমার এখন আর আগেকার মতো ভয় ছিল না। তাই সেই আবেগের মুখে আমি বললাম?

—এই তো! তোমার যখন-তখন এই রকম সরল ব্যবহার। বলেন কি না (একটু ভেঙিয়ে), 'বেশ, এই রকম নয় লিখলাম, তার পরে!' মরণ আর কী! বেশ স্পষ্ট একবার লিখে জিজ্ঞেস করো যে আমাদের নামে যেখানে সেখানে মিথ্যা অপবাদ কী জন্য প্রচার করছেন?

—নাঃ! তাও কী হয়? তুমি কি ভাবছ যে শংকরমামা আমার চিঠি পড়ে চুপ করে বসে থাকবেন? তিনি সেই চিঠির যা খুশি তা অর্থ করে আরো বেশী গণ্ডগোল যদি না বাধিয়ে দেন, তাহলে তুমি যা বলবে তাই শুনব। তা কিছু নয়। চুপ করে নিজের যা কাজ তা করে ও-দিকটা নিয়ে মাথা না ঘামালেই ভালো। তাঁর যা খুশি রটিয়ে বেড়ান না কেন!

আমাদের তাতে…

—আপনার পক্ষে সে সব ঠিক, কিন্তু পুণায় গেলে পরে আমার কী অবস্থা হবে তা জানো? ঘরে-বাইরে, যেখানে-সেখানে, উঠতে বসতে আমার 'সভা'…

—বেশ, তাতে কী? নিজের যখন যেতে ইচ্ছে করে, তখন লোকে কিছু বললে তা সহ্য করতে হবে না?

—বেশ, আচ্ছা, আমি আবার যদি যাই তবে…

—আহা! পাগল নাকি! সভা কী করেছে? তুমি নিজে কি তাতে কিছু অনুচিত মনে করেছ?

—আমি মনে না করলাম তাতে কী? এই যে লোকে…

—আহা, আমরা নতুন কিছু আরম্ভ করলে লোকে বিরক্ত তো করবেই। সেটুকু আমরা যদি সহ্য না করি, তা হলে নতুন রীতিনীতি আসবে কোথা থেকে?

—সে-সব সত্যি, কিন্তু…

—আর কিন্তু-টিন্তু না। লোকে এ-রকম বলবেই, তা আমরা চিঠি লিখি আর যাই করি। আমরা চিঠি লিখলে শংকরঠাকুর কি শান্ত হয়ে যাবেন? তিনি সে-চিঠির কথা সারা গ্রামে ছড়িয়ে না দিলে আমার নাম আলাদা! যে দেখতেই চায়না তার মতো অন্ধ, আর যে শুনতেই চায় না তার মতো বধির, কেউ থাকতে পারে না! শংকরমামার মতো লোক এই রকম একটা কিছু চায়। কেউ কোনো ভালো কাজ একটু পুরোনো রীতিনীতি ছেড়ে করতে গেলেই, তার বিষয়ে বিষম কাণ্ড বাধিয়ে তাকে আলাতন করবার জন্যই এদের জন্ম। তুমি কি ভাবছ যে এরা সত্যি সত্যি পুরানো রীতিনীতি মেনে চলেন? এদের নিজের আচরণ কেমন তা তো দেখতেই পাচ্ছো; এই শংকরমামার কথাই ধরো—থাকগে সে-কথা।… আমি এখন তোমাকে ইংলণ্ডের এক মহিলার কথা বলছি, শোনো। এই শংকরমামার মতো শতেক লোকে তাঁকে কত আর কী রকম আলাতন করল! তাঁর স্বামী তাঁকে আলাতন করল, আদালত পর্যন্ত ব্যাপারটা পৌঁছল, তাঁর মেয়েকে তাঁর কাছছাড়া করা হল, তাঁর বিষয়ে যাচ্ছেতাই লেখা হল। সংবাদপত্রে তো শুধু গালিবর্ষণই করা হল! কিন্তু তিনি নিজের পথ মোটেই ছাড়লেন না।

এই বলে উনি সেই মহিলার আগাগোড়া জীবন-কাহিনী আমায় বললেন। সে কাহিনী শুনে আমার মনে কেমন উদাত্ত ভাব এল। শংকরঠাকুরের মতো লোকের নিন্দাকে অল্প মাত্রও ভয় না করে, 'নিজের মন কেমন নিষ্কলঙ্ক রাখা যেতে পারে, নিজে বেশ ভেবেচিন্তে যে-পবিত্র পথ গ্রহণ করা হয়েছে সে-পথ না ছাড়বার জন্য কত কত সাবধানে থাকতে হয়— এই সব কথা সেই জীবনচরিতটি শুনে আমার মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হল।

দ্বিতীয় দিন দুপুর বেলা আমি লক্ষ্মীবাঈকে সেই মহিলার কথা বললাম। মনে হল তিনি আগে সে-জীবনচরিতের কথা শোনেননি। আমার মুখে সব শুনে তাঁর সে-জীবনী পড়তে ইচ্ছা হল। রাত্তিরে আমরা সকলে জমায়েৎ হলে, তিনি আবার সেই মহিলার কথা তুললেন আর তাঁর জীবন চরিতের পুস্তকটি কোথায় পাওয়া যায় তা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন উনি সেই পুস্তকের নাম বললেন। তখন নানা সাহেব বললেন, "ওহে, গণপত রাও আজ যদি এখানে থাকতেন, তা হলে তিনি তোমাদের সেই মহিলার কথা কতই বলতেন। তিনি তো তাঁকে প্রায় দেবতা বলেই মনে করেন! আর তাঁর জীবনকাহিনীটি পড়েও সত্যি তাই মনে হয়। আমাকে তিনিই একবার সমস্ত গল্প বলেছিলেন।" এই বলে তিনিও সেই মহিলার কষ্টের অনেক গল্প বললেন। সেই উদার জীবন-কথা শুনে সে-দিন আমার মনের আগেকার সেই বিরক্তিকর চিন্তা দূর হয়ে মনটা যেন মুক্ত হল এবং শংকর-ঠাকুরের চিঠি এবং তাঁর কীর্তিকলাপ, সম্পূর্ণরূপে যদিও নয়, তবুও অনেকটা ভুলে গেলাম।

এত সব গণ্ডগোল হল, শংকরঠাকুরের সেই ভয়-ধরানো চিঠি এল, কিন্তু তার একটি অক্ষর পর্যন্ত আমরা মার কানে যেতে দিই নি। তিনি যদি সে-কথা জানতেন, তবে অকারণে তাঁর প্রাণে কষ্ট হত। প্রথম প্রথম আমি অনুরোধ করেছিলাম যে তাঁকে সব কথা বলাই উচিত হবে। তা হলে পুণায় গিয়ে যখন সেই গোলমাল বাধবে, তখন সে-সব শুনে তাঁর অত দুঃখ হবে না। কিন্তু উনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে, সেখানে গেলে পরে যা হবার তা হবেই। আজ তাঁকে বললেও সেখানে গেলে পরে সেখানকার গোলমাল শুনে তাঁর যে কম কষ্ট হবে তা নয়। আমারও তা সত্যি মনে হল। আমি শংকরঠাকুরের স্বভাব জানতাম। তিনি একবার কাউকে জ্বালাতন করতে আরম্ভ করলে এমন জ্বালাতন করতেন, যে তা বলা যায়

না। আবার, একবার কারো গুণগান করতে আরম্ভ করলে তাও এত বেশী করতেন যে তার সীমা নেই। কিন্তু পরের যা-তা নিন্দা করবার কাজে তিনি যত চতুর ছিলেন, আর সে-কাজ করবার বেলায় তাঁর যে স্ফূর্তি হত তা বড় চমৎকার! তাই তাঁকে আগে বলেই বা কী, আর না বলেই বা কী? সেখানকার কষ্ট তাতে কম বেশি হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

আমাদের মর্যাদা

আগের পরিচ্ছেদের চিঠিগুলি আসবার পর আট-দশ দিন গেল। আমরা সে-সব প্রায় ভুলে গেলাম। সেই চিঠিতে মন অতিশয় ব্যথিত হয়ে, কোথাও যাওয়া-আসা নেই, বেশী কিছু লেখাপড়া নেই,—এমন যে একপ্রকারের বৈরাগ্য এসেছিল, সেটা ওঁর খোঁচানো কথায় আর লক্ষ্মীবাঈ ও যশোদাবাঈয়ের মিষ্টি উপদেশের ফলে দুর্বল হয়ে, এখন একেবারে অদৃশ্য হয়েছিল। আমাদের দিন আগের মতো চলতে লাগল, যেন ও-রকম চিঠি আমরা মোটেই পাইনি। আমার হঠাৎ কখনো কখনো সে-কথা একটু মনে পড়ত, কিন্তু উনি তা যেন একেবারেই ভুলে গেলেন। এই আট দিনে আমরা কোথাও বাইরে যাইনি, কারণ যাবার দরকারই হয় নি। আমার পড়াশোনা ঠিক চলছিল। যেই ভাবতে লাগলাম যে আমি মারাঠি অল্প কিছু শিখেছি, অমনি আমার মনে ইংরিজি শিখবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগল। তবু, কী জানি কেন, আমাকে ইংরিজি শেখাতে লক্ষ্মীবাঈকে বলব কী করে, তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু শেষে একদিন তাঁকে বলেই ফেললাম। তা ছাড়া ওঁর কাছেও কথাটা পাড়লাম। অমনি উনি হেসে বললেন, "হুঁ, হুঁ, মারাঠি শেখার ইতি শ্রী হয়েছে বুঝি? মারাঠি ভালো করে পড়তে পারে না, আর বলে কিনা ইংরিজি শিখব! যে-ভাষা শিখতে আমাদের দশ-পনরো বছর ধরে মাথা কুটতে হয়েছে, সেটা তুমি মারাঠি একটু-আধটু পড়তে-না-পড়তেই শিখতে চাও!" এ-সব ওঁর রসিকতার কথা ছিল। শুধু তাই নয়, ওঁর আন্তরিক ইচ্ছে ছিল যে আমি যেন ইংরিজি শিখি। সে-ইচ্ছা উনি দু-একবার ব্যক্তও করেছিলেন। তাই ওঁর রসিকতা শুনে আমার মোটেই দুঃখ হল না। আমার ইংরিজি শিখবার ইচ্ছা প্রবল হতে লাগল। ভাবতে লাগলাম যে মারাঠিতে একটু কাচা থাকলেও আপত্তি নেই, কিন্তু ইংরিজি শিখতে হবেই। তার উপর লক্ষ্মীবাঈয়ের উৎসাহ, তখন আর কী বাকি রইল! কিন্তু সে-মাসে পুণায়

যাবার কথা ছিল। সেখান থেকে ফিরে এলে পরেই শিক্ষা আরম্ভ করা ভালো হবে মনে করে, সম্প্রতি পড়াশোনা যেমন চলছিল তেমনি চলতে দিলাম।

এইভাবে আরও পনেরো দিন কেটে গেল। কী করা যায় এই চিন্তা হতে লাগল। গোপালঠাকুরের চিঠি মোটেই আসেনি, শংকরঠাকুরেরও সেই যে অদ্ভুত চিঠি এসেছিল, তারপর আর আসেনি। তাই আমাদের পুণায় যাবার দিন যতই কাছে আসতে লাগল, ততই আমার বুক দুরু দুরু করতে লাগল। এখন পুণায় গেলে কী যে হবে! না হলে, আমরা গিয়ে ঘরে ঢোকামাত্র শংকরঠাকুর যদি—"যাও, বেরোও, আমাদের কুলের আর পরিবারের আব্রু নষ্ট করেছ, তোমাদের এখানে দরকার নেই।"—এই বলে তাড়িয়ে দেন, তাহলে আমাদের কা মান রইল? এই রকম ভাবনা আমার মনে আসাতে আমি সেটা ওঁকে বললাম। কিন্তু, কী আশ্চর্য দেখো, আমি সে-চিন্তা যত গুরুত্বপূর্ণ আর ভেবেচিন্তে দেখবার যোগ্য মনে করেছিলাম, তেমন উনি মোটেই মনে করলেন না। বরং উনি বললেন :

—তুমি পাগল না কি? বলো বটে যে শংকরঠাকুর কেমন তা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু তুমি তাঁকে মোটেই চিনতে পারো নি। আমরা গিয়ে বাড়িতে ঢুকলে, একটি কথাও তাঁর উচ্চারণ করবার ক্ষমতা হবেনা। এটা তুমি এখন বেশ ভালো ভাবে দেখতে পাবে।"

ওঁর সে-কথায় আমার অবশ্য সান্ত্বনা হল না। পুণায় গেলে আমাদের বিষম কষ্ট হবে এই যে একটা ভয় মনে উৎপন্ন হয়েছিল, সেটা কত করেও যাচ্ছিল না। সে-কষ্ট কিভাবে হবে, তা আমি তখনো বুঝতে পারিনি। তবু, মনে হচ্ছিল আমাদের নিশ্চয় ভয়ানক কষ্ট হবে। আমাদের দুই বন্ধু, লক্ষ্মীবাঈ আর যশোদাবাঈ, এঁদের এ-রকম কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁরা এ-বিষয়ে আমাদের কী বলবেন? যশোদাবাঈয়ের একটু কষ্ট ছিল, সেটুকু তিনি আমায় বললেন। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর মিল হচ্ছিল না। আমার আগেকার সব জ্বালা, আর তাতে আমাদের এই নতুন কাজের ফলে আরও যা জ্বালাতন সহ্য করতে হবে তার যোগ করে, সে কষ্ট ভয়ানক বেশি মনে হতে লাগল। তবু, আমার স্বভাবই এমন ছিল যে আমি সব কিছু সহজেই ভুলে যেতাম—পাঠকদের

হয়তো মনে আছে যে এ-কথা আমি আগে অনেকবার বলেছি—তাই তখনকার মতো দু-এক দিন আগে আর পরে যা চিন্তা হল, তার পরে আর ততটা ভাবনা আমার থাকত না। আমার এই স্বভাবমতো আমার এই ভাবনাও বেশীদিন থাকবে না, এই আমার আশা ছিল।

কলেজের ছুটির আগে পরীক্ষা-টরীক্ষা যা হবার তা হয়ে গেলে আমাদের যাবার কথা ছিল। পরীক্ষার দিন এল। আর আট দিনের মধ্যেই আমাদের যেতে হবে, এই ভেবে মন আশঙ্কায় ভরে উঠতে লাগল। পড়াশোনায় মন লাগছিল না। ভাবতে লাগলাম যে-কোনো একটা উপায় খুঁজে যাওয়াটা যদি বন্ধ করতে পারি। আমাদের প্রতি-বেশীরা এর মধ্যে যাচ্ছিলেন না। তাঁদের যেতে তখনো দেরি ছিল। তা ছাড়া একলা বিষ্ণুপন্তরাই পুণায় যেতেন কিংবা যেতেনও না। তাঁদের কিছুই ঠিক ছিল না। তাঁরা নিজের গ্রামে, মানে যেখানে তাঁর বন্ধু গণপতরাও ছিলেন সেখানে, যাব-যাব বলছিলেন। তাই, আমরা একলা বোম্বাইয়ে থাকবই বা কেমন করে? আর আমরা যে কদিন আগেই এসে সংসার পেতেছিলাম, এমন অবস্থায় ছুটির দিনে বাড়ি না যাওয়াও ভালো দেখায় না। তাছাড়া মার মত কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। তিনি ওঁকে বলতেন, "আমার এখানেই বা কী আর সেখানেই বা কী? একই কথা। যেখানে তুমি, সেখানেই আমি থাকব। তবে কলেজ যখন ছুটি, তখন যাওয়াই ভালো, কিন্তু তোমার যদি কিছু কাজ-টাজ এখানে থাকে তাহলে যেও না।" তিনি ছিলেন একেবারে ভালো মানুষ তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। পরে যে-সব ঘটনা হল, তাতে তো আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে আমরা বাইরে বেড়াতে যাই, সভায় যাই, এ-সব তিনি মোটেই অনুচিত মনে করতেন না। তিনি যদি তেমন ভাবতেন, তাহলে একদিনও সে-কথা ব্যক্ত করে বলতেন তো? তারপর উনি তাঁকে বুঝিয়ে বলতেন, সে-কথা আলাদা। কিন্তু তিনি একদিনও সেরকম অসন্তোষের কথা উচ্চারণ করেন নি। একবার কবে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হ্যাঁরে, এরা প্রতি শনিবারে গিয়ে কোথায় কী করে?" তখন উনি চট্ করে বলেছিলেন, "কিছু না, কোথাও দেশলাইয়ের কাজ, কোথাও চিকনের কাজ, উলের জামাটামা বুনতে শেখে।" ব্যস্, এই কথায় তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন। তাছাড়া ওঁর সে-কথা সত্যি মনে

করবার আর একটা কারণ এই ছিল যে, আমরা তাঁকে আর গোপিকাকীমাকে মন্দিরে পেতে বসবার উপযুক্ত সাদা পশমের দু'খানা আসন বুনে দিয়েছিলাম, আর তিনি আমাকে দিদিশাশুড়ীর জন্যও একখানা বুনে রাখতে বলেছিলেন। তাই পরে সে বিষয়ে তিনি কখনো কিছু আর জিজ্ঞাসা করেন নি।

আমরা রাত্রে ছাদে একত্রে বসে গল্পটল্প করতাম, সে-কথা তিনি জানতেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। কেননা, তিনি গোপিকাকীমার ওখানে গিয়েই শুতেন। আর তাতেও আবার এই মজা যে তাঁর সঙ্গে আমরা অতিশয় শালীনভাবে ব্যবহার করতাম। তাঁর সামনে আমরা কখনো পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতাম না। তেমনি—সকালবেলায় রান্নার উপায় ছিল না, শত বুঝিয়ে বললেও তিনি শুনতেন না, তাই সে-কথা আলাদা; কিন্তু ঘরের অন্য কাজকর্ম আমি তাঁকে করতে দিতাম না। তিনি যখন নিচে যেতেন—তখন যশোদাবাঈ তাঁর নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে এঁর বিছানা চাদরের সব ব্যবস্থা করে রাখতেন। লক্ষ্মীবাঈয়েরও সেই রকম অভ্যাস ছিল। আমরা তিনজনে কখনো তাঁকে এতটুকুও কাজকর্মের কষ্ট দিতাম না কিংবা তাঁর সামনে তাঁর মনে অল্প একটুও কষ্ট হওয়া সম্ভব এরকম আচরণ করতাম না। আমাদের উভয়ের কথা তো আলাদা, কিন্তু নানা সাহেব আর যশোদাবাঈ কিংবা বিষ্ণুপন্ত আর লক্ষ্মীবাঈ এঁরা পর্যন্ত কখনো তাঁর সামনে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেন না।

একদিন সহজ ভাবে গল্প করতে করতে এই আদব-কায়দার বিষয়ে কথা উঠল। তখন, আমার মনে হচ্ছে, নানা সাহেব বললেন, "ওহে দেখো, এই বুড়োমানুষদের মন ঠাণ্ডা রাখতে ততটা কিছু দরকার হয় না। ছোটখাটো খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো তাদের মনের মতো করলে, তার পরে যদি একটা কোনো বড় কাজ করা যায়, তাহলেও তাঁরা তাতে আপত্তি তোলেন না। তাঁরা যদি ভাবেন যে তাঁদের সামনে কথা বলাটা আদব-বিরুদ্ধ, তাহলে নাই বললাম। কথা বলার সেইটুকুই যে সময় থাকে, এমন তো নয়?

"চারটে কাজ হলে তিনটের জন্য অনুমতি চাওয়া দরকার, তা হলে চতুর্থ কাজের বেলায় অনুমতি না নিলেও চলে। এ সব ছোটখাটো ব্যাপার, কিন্তু সেগুলি যদি আমরা না মানি, আর বাকি সব কিছু করি, তাহলে

সে-সব কাজের কোনো ফল নেই।"

তাঁর কথা আমার বড় পছন্দ হল। শুধু তাই নয়, আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে, নিজের ব্যাপারে এই কথাগুলি মনে রেখে আমি সে-রকম আচরণ করব। সে-দিন কথা হতে হতে অপরিমিত আদব-কায়দার কথা উঠল তখন উনি এক জায়গায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন :

—এই বয়োজ্যেষ্ঠদের কথাটা ঠিক। তাঁদের সামনে অন্য মানুষের সঙ্গে কথা নাই কইলাম, বেশী উঁচু মুখ তুলে নাই চাইলাম, আপনার কথা মতো না হয় তাঁদের ইচ্ছামতো আচরণ করলাম। কিন্তু মনে করুন আমরা বাড়িতে নেই আর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে কোনো ভদ্রলোক এসেছেন ; তখন তাঁকে—আমরা ঘরে নেই—এ-কথা বলবে কে? সেই নাসিকের কৃষ্ণ-রাওকে জানো তো? সে এই কদিন আগে পুণায় এসে সংসার পেতেছিল। আমি একদিন তাদের বাড়ি গেলাম। তার স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কৃষ্ণরাও আছেন?' একটা কথাও না বলে সেই মহিলাটি তাড়াতাড়ি দরজার আড়ালে সরে পড়লেন। আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি বাড়িতে আছেন কি নেই কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শেষে আবার জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি চট করে ভিতরে চলে গেলেন, আর শুনতে পেলাম যে কাকে যেন বললেন, "বাইরে কে এসেছে এঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে বল উনি বাড়ি নেই, যা বলগে যা।" এই শুনে আমি চুপ করে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু সেদিন থেকে ঠিক করলাম যে আমার স্ত্রীকে এই অসীম আদব-কায়দা ছেড়ে দিতে শেখাবো। এমন সময় মানুষের একেবারে বোকার মতো অবস্থা হয়। বাইরে যে ভদ্রলোক আসে, তাকে নিজের স্বামী বাড়িতে আছে কি নেই তা বললে সেটা আদব-কায়দার কোথায় ঠেকে? সবটাই একটা উদ্ভট কাণ্ড! তাও আবার মজা এই যে, যেখানে-সেখানে ধর্মের নাম গুঁজে দেওয়া হয়! তাতে এইসব বোকামী নষ্ট হতে দেরি হয়।

নানাসাহেব—আস্তে আস্তে নষ্ট হবে! যা এই কালের অযোগ্য, তা বেশী দিন থাকবে না, যাবেই। এইটা কিন্তু সতর্কভাবে দেখতে হবে যে, আমাদের ছেলেমেয়েদের মাথায় এসব বোকামী যেন না ঢোকে।

লক্ষ্মীবাই—তা তো নিশ্চয়। আগের কালের বুড়োদের আমরা কী করতে পারি? তাদের মনে একেবারে ছেলেবেলা থেকে সে-সব ধারণা

বদ্ধমূল হয়ে আছে, তার উৎপাটন কেমন করে হবে?

বিষ্ণুপন্ত—সে হল এক কথা। তা ছাড়া সেগুলি উৎপাটন করবার চেষ্টা করলে, তাতে যশোলাভ না হয়ে বরং যাচ্ছেতাই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে বসে।

রঘুনাথরাও—আর একটা কথা আপনারা ভোলেন কি করে? আমাদের শংকরমামার মতো লোক ইচ্ছে করে বাঁকা পথে চলে, তাদের কার্য কী করে ভুলে যাচ্ছেন? এরকম লোকের নিজের আচরণ ধর্মের দৃষ্টিতে অশুদ্ধেরও অশুদ্ধ। কিন্তু চ্যাটাং চ্যাটাং করে বড় ধর্মাভিমানীর মতো কথা বলতে একেবারে নিপুণ! তোমাদের আমাদের মতো লোকেদের গালাগালি করে, আবার—সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বলে নিজেদের চালাতে চান!

নানাসাহেব—ওহে, এ রকম লোকের কতদিন চলে? যতদিন তাদের কপটতা বাইরে বেরিয়ে পড়েনা ততদিন। একবার সে কপটতাটি বেরিয়ে পড়লেই বুঝতে হবে যে তাদের ছিঃ ফুঃর আর দাম নেই। লোকে একবার…

রঘুনাথরাও—না, হে না, আপনার এ একটা ভ্রান্তি! সাধারণ লোকের এদের প্রবঞ্চনা বোঝবার মতো আকেল থাকে না। তারা এদের ধাপ্পাবাজিতে বিশ্বাস করে। আপনি যে ভাবছেন যে একটিবার জানতে পারলে তারা বিশ্বাস করবে না, সেটা আপনার ভুল। আপনি কি মনে করেন যে লোকে এদের আচরণ একেবারেই জানে না? তারা সব জানে। কিন্তু সাধারণ লোকের ভালো-মন্দ ধারণা একেবারে বিগড়ে গেছে। সেই অমুক, সে এরকম করে,—তা করুক না কেন—করল তাতে কী? কিন্তু সন্ধ্যা-আহ্নিক তার কেমন কড়া? আর চতুর্থীর দিন অমুক মন্দিরে ব্রাহ্মণদের ভোজ দেয়। আর মশায়ের ধর্মে শ্রদ্ধা কেমন অটুট। তবে সে নিজে বাড়িতে যা খুশী করলে, আমাদের তাতে কী? মানে, এই রকম যখন ধারণা…

বিষ্ণুপন্ত—তা কিন্তু মিথ্যে নয়। আমি বাপু এই মনে করি যে, যার নতুন কিছু করবার ইচ্ছে আছে, সে আগে পিছে না চেয়ে নিজের ইচ্ছে মতো কাজটা করতে আরম্ভ করে দিলেই ভালো। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে। যতদূর পারা যায় সহ্য করে, একেবারে অসহ্য হলে ছেড়ে দিলেই হল।

যশোদাবাঈ—ছেড়ে দেওয়া মানে? তাহলে তার মতো যে লজ্জার কথা নেই!

বিষ্ণুপন্ত—লজ্জা কীসের তাতে? যতটা পারলাম, ততটা করলাম।

লক্ষ্মীবাঈ—তা হলেই লোকে বেশী বিরক্ত করবে, আর অন্য কেউ যদি সে কাজ করতে যায়, তাহলে তাকে আগের এই উদাহরণ দেবে। তাতেও আবার আমি তো ভাবি যে এই যুগের মেয়েদের কপালই মন্দ!

রঘুনাথরাও—সে কী, মেয়েদের কপাল মন্দ মানে?

আমি—মেয়েদের কপাল মন্দ মানে এই যে, তাদের পদে পদে দুমুখো আচরণ করতে হয়। পুরুষদের কাছে তাদের মনের মতো, তার বাড়ির বুড়োমানুষদের কাছে তাদের মনের মতন। মানে এই দুটো যারা আয়ত্ত করতে পারে তারাই সত্যি ধন্য!

বিষ্ণুপন্ত—এ আপনি কি বলছেন?

আমি—বলছি মানে? কিন্তু আপনিই বলুন, আমি যা বলছি তা সত্যি না মিথ্যে। মানে, এই দেখুন, আপনারা আমাদের কিছু করতে বললে, সেটা বাধ্য হয়ে করতে হয়। বেশ, সে-কাজ করেছি, বাড়িতে তা জানতে পারলে আমাদের যে পুজো হয়, তা মুখ বুজে সহ্য করতেই হয়। আমি যা বলছি তা সত্য কিনা তা সত্যি সত্যি ভেবে দেখুন।

রঘুনাথরাও—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি সত্যি। তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? আপনি জ্ঞানী তাই আপনি সে কাজে কৃতকার্য হবেন, আর আমাদেরও কৃতকার্য করবেন।

আমি—এ-ঠাট্টা কি কাজের? আমি মিথ্যে বলছি কোথায়, তা দেখিয়ে দিন। এখন এইটাই দেখুন না। পুণায় গেলে পরে আপনার যা কষ্ট হবে, তার চেয়ে বাড়িতে আমার একশো গুণ বেশী কষ্ট হবে। পদে পদে যদি আমাদের সভা, আর পড়াশোনার ব্যাপারে খোঁটা না দেওয়া হয় তো আপনি যা বলবেন তা শুনব!

রঘুনাথরাও—কিন্তু আপনারা যে ভাবী বংশের মাতা! আপনারা যদি সে-কষ্ট সহ্য না করেন আর ধৈর্যহারা হন, তাহলে কি চলে? কষ্ট হবেই। যতদূর সম্ভব আমরা তা এড়াবো; কিন্তু ভুগতে হলে ভুগতে হবেই। তা ছাড়া কি হয়? আপনাদের যা কষ্ট হবে তা আমাদের নিজের কষ্টেরই মতন তো? আমরাও সে কষ্টের অংশীদার। কী নানা সাহেব, আপনি কী বলেন? আপনিও তো একই কথা বলেন, না কী?

নানাসাহেব—একি আর বলতে হবে? এ তো একেবারে সত্যি।

আবার শংকর ঠাকুরের চিঠি

এ-সব উপদেশ প্রয়োগের দিন এগিয়ে এল। পুণায় যাবার মাত্র ছু'তিন দিন তখন বাকি। ছু'দিন আগে গোপালঠাকুরকে উনি চিঠি লিখেছিলেন যে আমরা চার-পাঁচ দিনের মধ্যে আসছি, যদি কিছু আনবার-টানবার দরকার থাকে তা হলে যেন তিনি চিঠি লেখেন। সে চিঠির উত্তর তিনি দেননি, কিন্তু শংকরঠাকুরের (তাঁকে চিঠি মোটেই না লেখা সত্ত্বেও, আর তাঁর সেই বিষম চিঠিটার উল্লেখ পর্যন্ত না করা সত্ত্বেও) চিঠি এল। সেটা এই :

শ্রী

—আশীর্বাদ বিশেষ। তোমাকে অত কড়া চিঠি লিখেছি সেইটুকু বুঝতে পেরেছ দেখে সন্তুষ্ট হলাম। শত হলেও আমার কাছে শিক্ষা পেয়েছ, নিজের চোখে দেখে সতর্কভাবে তোমাকে মানুষ করেছি। একটু কড়া করে লিখেছিলাম, তখনই মন কেমন করেছিল, কিন্তু অজ্ঞান মানুষের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছা করলে চোখে অঞ্জনের আঙুল বুলিয়ে দিতে হয়। তখন অবুঝ মায়া করে 'বেটা চেঁচাবে, চেঁচাবে' এ-কথা কেউ ভেবে দেখে না। সেই রকমই আমার অবস্থা হয়েছিল। অনেক দিন তোমার চিঠি নেই, তখনই ভাবলাম যে এটা অনুতাপের লক্ষণ। তোমার কালকের চিঠিটা পড়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। বাড়িতে মাকে বুঝিয়ে বলে তাঁর রাগ দূর করেছি। আমরা সকলে সুস্থ শরীরে আছি।

আসবার সময় এই জিনিসগুলি এনো :

ছু'টো জরির টুপি, প্রত্যেকের দাম যেন বেশী না হয়। মানে পনেরো টাকা না হয়। মানে পনরো টাকা জোড়া, এর চেয়ে বেশী দামী টুপিতে কাজ নেই। একটা চিরঞ্জীব[১] ধোণ্ডুর মাথার, আর দ্বিতীয়টা কিঞ্চিৎ বড়।

১ মহারাষ্ট্রে বাড়ির ছেলেমেয়েদের নাম লেখবার সময় নামের আগে চিরঞ্জীব লেখার প্রথা আছে।

চিরঞ্জীব সৌভাগ্যবতী[১] বারী আট-দশ দিনের মধ্যে এখানে আসছে। তার মেয়ের জন্ম একটা পশমের দামী জামা এনো।

এই রকম পাঁচ-সাতটা জিনিস আনতে লিখে শেষে এখানে এলে পরে টাকা দেবেন এই আশ্বাস ছিল। আর বারবার 'তোমার অনুতাপ হয়েছে, অল্প লেখাতেই বুঝে নিয়ে সেই সংস্কারকদের দল ছেড়ে দিয়েছ, অতিশয় ভালো হয়েছে,' এই কথা নানারকমে লিখেছিলেন।

চিঠি দেখে আমি কিন্তু হাসি সামলাতে পারছিলাম না। এমন সময় উনি আমাকে বললেন, "কী? শংকর মামা কেমন তা বুঝতে পারলে? কিন্তু এতেই খুশি হয়ে যেও না তুমি। পুণায় গিয়ে আমাদের কষ্ট কম হবে, কিংবা আমাদের নামে তিনি সেখানে যা কাণ্ড করেছেন তার কিছু কম হবে এমন মোটেই নয়। ওই টুপি আনতে লেখার দরকার ছিল, আর নিজের একটু দেমাক দেখাতে পারবেন তাই—হ্যাঁ, বাহাধন যখন আসবেই, তখন এই রকম লিখে নিজের একটু দেমাক দেখিয়ে দিলে মন্দ কী? জানো, উনি এখন বোধহয় যেখানে-সেখানে এই বলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, 'দেখো, আমার এইটুকু চিঠিতে ও কেমন সোজা হয়েছে, কত ভালো মানুষের মতো চিঠি লিখেছে, ওর কত দুঃখ হয়েছে, শেষে আমার দয়া হল তাই আমিই লিখলাম যে এখন পুণায় এসো, আর কখনো ও-রকম গণ্ডগোলে পড়তে যেও না।' গন্ধেদের দোকানে, ভটদের নালাকলের ধারে, যেখানে সেখানে ওঁর কারো সঙ্গে দেখা হলেই উনি এ-রকম কথা বলে বেড়াবেন।"

চিঠিখানা আবার পড়ার পর আমারও সত্যি মনে হল যে ওঁর কথাই ঠিক। রাত্তিরে সেই চিঠির কথা সকলকে বলার পর সকলে মিলে চিঠিটার যা ঠাট্টা করল তার সীমা নেই! নানারকম রসিকতা করে আমরা সবাই যথেষ্ট হেসেছিলাম। আরও অনেক কথা উঠলে পর বিষ্ণুপন্ত একজন ঔপন্যাসিকের গ্রন্থে নানা রকম স্বভাবের চরিত্রের কথা বললেন। নানা সাহেব তো বললেন "বাঃ! একবার তোমাদের শংকরঠাকুরকে দেখতেই হবে। কোনো উপন্যাসে কেউ যদি তাঁর বর্ণনা দেয়, তা হলে সুন্দর হবে। এসব মজা শুনতে আমাদের গণপত রাও থাকলে বেশ হত। আমাদের

১ মহারাষ্ট্রে সীমন্তিনীদের নামের আগে 'সৌভাগ্যবতী' লেখা হয়।

কাকা খুব মজার লোক, কিন্তু এর রকমটাই আলাদা দেখছি। আমাদের কাকা হচ্ছেন কাকীমার হাতের পুতুল। তিনি যা বলবেন উনি তাই করবেন। এক চুমুক জল খেতে বললে, ব্যস, সেই টুকু জলই খাবেন। এক ফোঁটা বেশী বা এক ফোঁটা কম খাবেন না! তোমাদের মামা বাপু অদ্বিতীয় ব্যক্তি! এঁকে কেউ কখনো বুঝতে পারবে না।"

রঘুনাথ রাও—দেখুন না কী রকম! যেই একবার এসব জিনিস-টিনিস নিয়ে গেলাম আর দেখে উনি খুশি হলেন, তার পর দু-একদিন যেতেই আবার আগেকার রূপ ধারণ করবেন বলে বুঝতে হবে। আমিও আগে আগে ওঁর চালাকি বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে যখন তাঁর রূপ দেখলাম, তখন ভাবলাম যে আচ্ছা, ব্যাপারটা এই রকম! খুব সতর্ক ভাবে থাকতে হবে!

আমি—আর খামখেয়ালিও এমন! আমাদের কথা তো দূরে থাক, নিজের প্রত্যক্ষ স্ত্রী এত ভালো মানুষ, সরল, কারু কিছুতে থাকতে চান না, কিন্তু তাঁকে একবার জ্বালাতন করতে আরম্ভ করলে এমন জ্বালাতন করতেন যে তার সীমা নেই। তিনি খেতে বসলে অমনি সমইটা[১] তুলে নিয়ে যেতেন, "থাকুনা বসে অন্ধকারে।" আর যখন দরকার নেই তখন মোমবাতি এনে তাঁর সামনে রাখতেন। তাঁর কপাল, পা টিপে দিতেও রাজি হতেন; আর একবার কথা বন্ধ করলে, সাত-আট দিন কথা বন্ধ করে দিতেন। সে কয় দিন তিনি বাড়িতেও থাকতেন না। আবার বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে, ছেলেপুলেদের সামনে, যে-কারো সামনে ঠাট্টা করতেন, বলতেন, "কী গো, রাগ করলে আমার উপর? তোমার পায়ে পড়ব? নাক ঘসব? এমন কেন করো?" আর দু'দণ্ড যেতে না যেতেই একটা কিছু তার মনের বিরুদ্ধ ঘটলেই অমনি ছেলেটাকে বলতেন, "ধোণ্ডু, মার গালে এক চড়!"

বিষ্ণুপন্ত—হুঁ। বড় সংঘাতিক লোক বলতে হবে! এ-রকম স্বামী কপালে জুটলে স্ত্রীর কি উপায়? আর ত্যাখো, এটা যেন একটা নিয়মই যে এ-রকম দুর্দান্ত মূর্খ স্বামী নির্ঘাত ভালো বউ পাবেই! এমন কত উদাহরণ আমি দেখেছি! স্বামী অদ্ভুত, আর স্ত্রী একেবারে নিখুঁত স্বভাব। স্ত্রী অদ্ভুত আর স্বামী একেবারে সরল। দু'জনেই ভালো এমন সহসা হয় না। কি জানি হাজারেও এমন জোড়া মেলে কিনা।

১ একরকম বাতি।

রঘুনাথ রাও—কেন বাপু? আমি তো হাজার দু'হাজার জোড় দেখিনি, কিন্তু সবদিক দিয় ভালো এ-রকম দু'টি জোড়া তো আমি চোখের সামনে দেখছি।

নানাসাহেব—একা আপনি কেন? আমাদের তিনজনের প্রত্যেকেই এখন নিজেদের চোখের সামনে সে-রকম দু'টি জোড়া দেখতে পাচ্ছি!

নানা সাহেবের সেই আন্তরিক কথা শুনে আমাদের তিনজনের প্রত্যেকে বিস্ময়পূর্ণভাবে, "তা কী হয়, তা কী হয়? আপনাদের কথা আলাদা," বলতে বলতে, কিন্তু মনে মনে খুশী হয়ে ঘরে ফিরে গেলাম। আমরা নিচে এসেও সেই চিঠির সম্বন্ধেই কথা বলছিলাম। উনি বললেন, "ও সব জিনিস-গুলো নিয়ে যেতে হবে। টুপির আমি কিছু বুঝিনে, বিষ্ণুপন্ত কিংবা নানা সাহেবকে বলে আনাতে হবে!" তাই শুনে আমি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "একটা টুপি ধোণ্ডু ঠাকুরপোর জন্য, কিন্তু অন্যটা কার জন্য আনতে লিখেছেন?"

তখন উনি হেসে বললেন, "কী জানি ওঁর কী গণ্ডগোল থাকে। লিখেছেন যখন আনতে, তখন এনে ওঁর হাতে দিলেই হল।"

আমি—সে কী কথা? সাত-আট টাকা দামের টুপির কথা উনি লিখলেন, আর অমনি আমরা নিয়ে যাব। আমার মনে হচ্ছে একটা নিয়ে যাই, আর অন্যটা পছন্দমতো পাওয়া গেল না বললেই হবে। এখানে আসা অবধি আজ পর্যন্ত কমসে কম তিরিশ টাকার জিনিসপত্র তাঁদের জন্য পাঠাতে হয়েছে।

রঘুনাথ রাও—যাকগে। সে-কথা ভেবে কাজ নেই, অন্তত এবারকার মতো তো মোটেই ভেবে কাজ নেই। আচ্ছা, তুমি সেই তোমার দুর্গীর জন্য আর তার খোকার জন্য কিছু নিয়ে যাবে না? না হলে সেখানে গিয়ে বলবে আবার যে এটা আনিনি, সেটা আনলে বেশ হত!

আমি—তাই তো! দুর্গীর খোকার জন্য একটা জামা নিয়ে যেতেই হবে। সত্যি আমি তোমাকে একটা জামা আনতে বলব ভাবছিলাম। আর একটা ছোট্ট টুপিও তার জন্য। বেশ সুন্দর উপহার দিতে হবে—ও কেমন আছে কী জানি!

রঘুনাথ রাও—বেশ, তোমার বাপের বাড়ির বৌদির জন্য, মাঈসাহেবের জন্য কিছু?

আমি—বৌদির জন্য ? চোলীর জন্য ছিট, জরির পাড়, রেশমী পাড়, ও-সব আমি আগেই ওর জন্য আর দুর্গার জন্য কিনে রেখেছি। মাঈ-সাহেবের কী জানি কী পছন্দ হবে। ওঁর পছন্দ হলে, আমার নিজের পছন্দ হলে, আমার নিজের জন্য কিনে রাখা পাড়গুলো ওঁকে দিয়ে ফেলব। ওঁর পছন্দ না হলে আমার জন্য থাকবে। এই দু'রকম ভেবেই আমি সেগুলো কিনেছি।

রঘুনাথ রাও—আচ্ছা, আচ্ছা, বড় বিচক্ষণ চিন্তা তোমার বাপু! কিন্তু এখন পুণায় গেলে পরে কেমন হবে ? সেই বড়ঠাকুরঝি আর ছোট মামী শাশুড়ী আর শংকর ঠাকুর, যখন সবাই মিলে কোলাহল বাধাবে, তখন ?

আমি—তখন কী ? তখন আমি স্পষ্ট বলব যে, আমার দোষ কী ? যা করতে বলবেন তাই করতে হবে। মা আর উনি দুজনে বললেন অমুক করো, তাই করলাম।

রঘুনাথ রাও—সার কথা, পুণায় গেলে স্পষ্ট বলতে বেশ সাহস হবে দেখছি! এ্যাঁ? আমাদের জন্য এ-সব করলে বলে 'স্পষ্ট' বলবে, না ?

সত্যি সত্যি সময়কালে আমার এই মুখের সাহস কতদূর টিকবে, আর অনেক চেষ্টায় টিকলেও তা কতটা কাজে লাগবে, আর কাজে লাগলেও আমার ভালোর জন্য লাগবে ..., এ-সব আমার মনে ছিল না তা নয়, কিন্তু আপাতত খালি খালি দেমাক দেখাতে আপত্তি কী ? তাই আমি বেশ মুখের বড়াই শুরু করলাম, "আমি কি বলতে পারব না যে 'আমরা মেয়েমানুষ, যার ঘরকন্না করি তাঁর কথা মতো চলি। আমায় যা করতে বললেন তাই করলাম। ওঁর কথা অমান্য করিনি, মেনেছি। মেয়েমানুষের তাতে অল্পটুকুও দোষ আছে ? সময় এলে এ-রকম আমি স্পষ্ট বলব। আমাকে কি তুমি পাগল মনে করো ? আমি বোকা নই, জানো ? যতক্ষণ সময় না আসে ততক্ষণ মুখ বুজে থাকি, এই প্রসঙ্গ এলে আমি মোটেই ভয় করব না।"

তখন উনি জোরে হেসে বললেন, "পুণায় গেলেই দেখা যাবে ভয় করো কিনা; কিন্তু আজকাল দিনে আমাকে ভয় করো না এটা অবশ্য ঠিক। মানে, এখন আমাকে পুণায় বড় সাবধানে থাকতে হবে। কিন্তু এই দ্যাখো, পুণায় গেলে, এখানে যেমন যা খুশী বলা, যখন খুশি আমার ঘরে চলে আসা চলে, তেমন কিন্তু চলবে না। নইলে মধ্যে মধ্যেই অমনি

ইচ্ছে হলে আসবে উপরে উঠে, কিছু-না-কিছু জিজ্ঞেস করতে।"

"আমার জন্য অমন ভয় নেই। আমি চোখ তুলে দেখবও না। তুমিই নিজে কিন্তু সাবধানে থেকো। রান্না করবার সময়ও কাছে এসে বসে গল্প করবার অভ্যাস হয়েছে! এসো না যেন আবার 'কী করছ' বলে!"

আমার এই কথা শুনে ওঁর যা হাসি পেল তা আর বলার জো নেই।

পুণায় গেলে পরে

তিন দিনের দিন সকালে আমরা পুণায় যাবার আয়োজন করতে লাগলাম। জিনিসপত্র যা নেবার তা প্রায় সবই আনা হয়েছিল। এ-রকম ব্যাপারে যা তাড়া হয়, সে তাড়া হয়ে শেষে কোনো কোনো জিনিস কেনা অবশ্য বাকি রইল। যাক্। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, আর ছুটি ফুরোলেই ফিরে এসে অমুক করব, তমুক করব, ইত্যাদি আশ্বাস দিয়ে আর নিয়ে, পরস্পরকে চিঠি লিখতে দু'-তিনবার অনুরোধ করে, আমরা বোম্বাই থেকে পুণায় যাত্রা করলাম। আন্দাজ দু'-তিনমাস আগে প্রথম পুণা ছেড়ে বোম্বাই আসবার সময় আমার মনের যা অবস্থা হয়েছিল, সে অবস্থা আমার এখনকার মনের অবস্থার চেয়ে কত ভিন্ন ছিল। তখনকার সেই আনন্দমুখী উৎকণ্ঠা কোথায়, আর আজকের এই ভয়-ধরানো ঔৎসুক্যই বা কোথায়? তখন যদিও কী হবে, কেমন হবে, সে ভাবনাই ছিল, তবু ঠিক জানতাম সে সব আনন্দময় হবে। আজও সেই ভাবনাই ছিল, কিন্তু মনে মনে জানতাম যে ভয়ঙ্কর কিছু হবে! তখন জানতাম যে বোম্বাইয়ে আমাদের মতন লোকের সঙ্গেই দেখা হবে আর তাদের সঙ্গে মিলেমিশে অপরিমিত সুখলাভ হবে, আর এখন যাদের মধ্যে আবার ফিরে যাব, তাদের কাছে দুঃখ-জ্বালা ছাড়া আর কিছু লাভের সম্ভাবনাই নেই। যখন আমি পুণা থেকে এলাম তখনকার কষ্ট আমার অত দুঃসহ মনে হত না। কিন্তু এখন থেকেই ভাবতে লাগলাম যে এখনকার কষ্ট অসহ্য হবে। তখন স্বাধীনতা আর সৎসঙ্গের অভিজ্ঞতা বেশী কেন, মোটেই ছিল না বললেও বাধা নেই। এখন আমি বেশ ভালোভাবে স্বাধীনতা অনুভব করে, আর আমি যাঁদের দেবতুল্য মনে করতাম, আমার সেই দুজন বান্ধবীর সংসর্গের চরম সুখ উপভোগ করে, আবার সেই মহা জঞ্জালের মধ্যে যাচ্ছিলাম। তাই আমার মনের এ-রকম বিলক্ষণ অবস্থা হবে তাতে আশ্চর্য কী? মার চোখ একটু ক্ষণ ঘুমে ঢুলে পড়েছে দেখেই আমি আস্তে আস্তে ওঁকে বললাম,

"আমার মনের অবস্থা এখন এমন অদ্ভুত হয়েছে যে তা বলতে পারছি না। আর সেখানে কী জানি সবাই কে কী বলবে এই ভেবে আমার ভয় ভয় করছে।"

"এত ভয় কিসের বাপু? আমার একেবারে ভয়টয় করছে না। দু'দিন বকবে-ঝকবে আর চুপ করবে! আমরা কানে না নিলেই হল!"

"তুমি বেশ তো কথা বলতে পারছ। কিন্তু আমাদের স্বভাব এখনো চেনো না। সে পালা একটিবার আরম্ভ হলে দু'-তিনদিনেও কি ফুরোতে পারে? যখন তখন খোঁচা মারবে—ওর এখন হেন নেই, তেন নেই, ওর এখন কাজকর্ম ভালো লাগে না। ওকে হয়তো সভায় যেতে হবে..."

"বেশ, না হয় বলল। একদিন নয় দু'দিন নয় যেন রোজ রোজ বকল, তাতে মনে অত দুঃখ করে লাভ কী? নিজের কানকে বধির করলেই হল।"

"তাও কিছু নয়, ঠিক, তোমাদের পুরুষদের কথা হচ্ছে। খেয়ে দেয়ে আঁচালেই লাফিয়ে পড়ে আবার খাবার সময় আসবে, তোমাদের ভাবনা কি? আমরা সারা দিন ঘরে মাথা গুঁজে থাকি। আমার আগেকার একটু অভিজ্ঞতা আছে, তাই আমি এ-কথা বলছি। আর আমি যা বলছি সেটা শীগগিরই দেখতে পাবে। এখন রোজ রোজ যা হবে, রাত্তিরে দেখা হলে নামতা পড়ে শোনাব। তখন..."

"আচ্ছা, আচ্ছা, মানে এখন সেখানে গেলে রোজ রাত্তিরে আমার কানের কাছে এই ঘ্যানর ঘ্যানর চলবে, পড়াটড়ার কিছু সম্বন্ধই থাকবে না বলছ তো? আমি তো ভাবছিলাম যে তোমাকে দিয়ে দশ-বিশখানা বই পড়িয়ে নেব। আমি বেছেও রেখেছি...কিন্তু..."

কিন্তু ততক্ষণে মা নড়া-চড়া করলেন তাই আমাদের কথা সেই পর্যন্তই হয়ে রইল। আর আমরা বসে নিজের নিজের মনে ভাবতে লাগলাম। উনি কী ভাবছিলেন তা আমি বলতে পারব না, আমি কিন্তু সেই এক কথাই বার বার ভাবছিলাম।

অবশেষে আমরা পুণায় পৌঁছুলাম। দাদা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে ষ্টেশনে এসেছিল। তাকে দেখেই আমার যা আনন্দ হল! 'রেলগাড়ী থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে চললাম। মনে যা অবিরাম গণ্ডগোল চলছিল। কিন্তু মা ছিলেন, তাই দাদা আমার সঙ্গে, আমি দাদার সঙ্গে মন

খুলে কথা বলতে পারছিলাম না। সে আমার দিকে আর আমি তার দিকে শুধু তাকিয়ে দেখছিলাম। দেখতে পেলাম যে সে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল, তবু তার চেহারা এই সময় আনন্দিত দেখাচ্ছিল। আর তাতেও আমাকে ঠাট্টা করবার ইচ্ছায় তার ঠোঁটে একরকম কৌতুকের মুচকি হাসি, আর ঠাট্টা করতে না পেরে অল্প খেদ, এই সবের ছটা মুখে ছিল, তাই তাকে ততটা শুকনো, রোগা দেখাচ্ছিল না। যাক্। যেতে যেতে আমরা আমাদের বাড়ীর দিকে ঘুরলাম। দাদা মাঝপথেই নেমে গেল। তার আমাদের বাড়ী আসতে ইচ্ছা ছিল না, তাই উনিও অনুরোধ করলেন না।

বাড়ী পৌঁছে গাড়ী থেকে নামামাত্র আমার যা বুক ধড়ফড় করতে লাগল, ভাবলাম যে এবার আমি বাড়িতে পা ফেলামাত্র নিশ্চয় কেউ কিছু বকবে। দরজার কাছে কেউই ছিল না, শুধু ধোণ্ডুঠাকুরপো দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "বৌদি, আমার টুপি এনেছ?" আমি "হ্যাঁ" বলে ঘরে ঢুকতেই বনু ঠাকুরঝি কপাল উঁচু করে, চোখ প্যাঁট প্যাঁট করে বললেন, "ওমা! একলা এলে নাকি বৌদি? আমি ভাবলাম হাতে হাত ধরে দু'জনে সাহেবের মতো আসছ বুঝি?" এই বলে তিনি নিজেই হাসলেন। আমি তা লক্ষ্য না করে এগিয়ে গেলাম। আমি নিশ্চয় জানতাম যে আমি আসামাত্র এ-রকম কিছু বলবেন ঠিক করেই তিনি বসেছিলেন; শুধু তাই নয়, দুি · আগে থেকে তিনি সে বাক্যটা নিশ্চয় মুখস্থ করে রেখেছিলেন। শংকর ঠাকুরের মতোই যে তিনি ছিলেন সে কথা কি বলতে হবে? বর্ণনা থেকে সকলে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। আর যদি কেউ নাই বুঝে থাকেন তা হলে এর পরে শীগগিরই তা বুঝতে পারবেন। সেই কথাটি বলেই তিনি সমস্ত দিনের জন্য কথা বন্ধ করে দিলেন। আমি ঘরে গিয়ে সব বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইলাম, আমার জামা কাপড়ের পৌঁটলা ভিতরে এনে ভেজাবার কাপড় চোপড় বের করে নেবার জন্য।[১] যাঁদের প্রণাম করলাম তাঁদের মধ্যে এক উমাশাশুড়ী ছাড়া আর কেউ কিছুই কথা বললেন না। কেউ মানে কি? দিদিশাশুড়ী

১ এই উপন্যাস রচনা কালে প্রবাস থেকে সঙ্গে আনা কাপড় চোপড়, বিশেষতঃ মেয়েদের পরার রঙিন কাপড়জামা, না ভিজিয়ে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। যে আসত সে কাপড়গুলি জড়ো করে দিত, আর বাড়ীর অন্য কেউ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে, উপর থেকে, সাবধানে জল ঢেলে দিত; এই রকমে কাপড়গুলি সম্পূর্ণ ভিজে গেলে তবে শুদ্ধ হত।

আর ছোট মামীশাশুড়ী। ছোট মামীশাশুড়ী তো শুধু "হু" বললেন। দিদিশাশুড়ী কী যেন বিড়্‌বিড়্‌ করলেন। "অষ্টপুত্রা সৌভাগ্যবতী ভব" বললেন না "এখন আর নমস্কার করে দরকার নেই" বললেন, কী জানি! আমি কী করব? মুখ বুজে পোঁটলা খুললাম, আর শাড়ীটাড়ী বার করে বড় ঠাকুরঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এগুলো ভেজাতে হবে, জল দেবেন?" কিন্তু তিনি তখন থেকে রাগ করেছিলেন। তাঁর কাছে কি আমার চিঁড়ে ভেজে? তাই প্রথম থেকে এইরকম অভ্যর্থনা দেখে আমার মনের যা অবস্থা হল! আমি অমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ কিছুই বলছিল না। তখন শেষে উমাশাশুড়ী নিচে এসে জল ঢেলে দিলেন। তারপরে একটিবার আমরা ঘরে এলাম।

মার সঙ্গেও কেউ ভালো করে কথা বলছিল না। প্রত্যক্ষ তাঁর মা, কিন্তু তিনিও তাঁর সঙ্গে একটু-আধটু ভাঙা-ভাঙাই কথা বলতে লাগলেন। এ যে কী ব্যাপার তা মা এখনো পর্যন্ত মোটেই কিছু জানতেন না। শংকর-ঠাকুরের চিঠির কথা আমরা তাঁকে কিছুই বলিনি। কাজেই তিনি এই অভ্যর্থনার অভিপ্রায় বুঝবেন কী করে? আমরা সভায় যেতাম, পুরস্কার-বিতরণ সমারোহ দেখতে গিয়েছিলাম, এ-সব কিছু তিনি জানতেন না। তিনি ঠিক ভাবতেন যে আমরা নিশ্চয় কোনো অনুচিত জায়গায় যাব না আর অনুচিত কোনো কিছু করব না। তাই আমরা কোথাও গেলে তিনি কখনো কোথায় গিয়েছিলাম তা জিজ্ঞাসা করতেন না। তাই আমরা বোম্বাইয়ে বাইরে যেতাম-আসতাম, সে সম্বন্ধে এখানে কী কী বার্তা ছড়িয়েছে আর কী হয়েছে, এ-সবও তিনি জানতেন না। কাজেই এটা স্বাভাবিক যে কেউ মন খুলে কেন কথা বলছিল না, তার কারণই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তখন তিনি বোকার মতো দিদিশাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, কথা কইছ না কেন?" তিনি তবুও যখন কিছু বললেন না, তখন মামীশাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি "আমি কী জানি?"—এইটুকু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন। তখন কিন্তু আমার মনে হল যে মাকে সব কথা আগে বলে রাখলেই ভালো হত। তা হলে অন্ততঃ এখনকার মতো অবস্থা তাঁর হত না। কিন্তু কথায় বলে তো যে 'আগে যায় বুদ্ধি তারপরে যায় পুঁজি,' আমাদের সেইরকম অবস্থা হয়েছিল। আগে আমরা যে-কথা ভাবিনি, কিংবা ভেবেও সেরকম আচরণ করিনি বললেই ঠিক হবে, এখন

তার জন্য দুঃখ করে কী হবে?

শেষে মা উমাশাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি কী বললেন তা জানতে পারিনি। কেননা তার পরে আমি সেখানে দাঁড়াইনি। কিন্তু কী বলে থাকবেন তা মনে মনে অনুমান করলাম আর দেখতে পেলাম যে আমার অনুমানই ঠিক! কেননা তার খানিকক্ষণ পরেই মার চেহারা পাল্টে গেল। তিনি যে রাগ করেছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁর মনে কষ্ট হয়েছে, কোনো বিষয়ে তিনি বোধহয় দুঃখিত হয়েছেন, এ-রকম দেখাচ্ছিল। তবু বাঁচোয়া যে শংকর ঠাকুর তখনো বাইরে থেকে আসেননি। তিনি সাতটার আগেই বাইরে গিয়েছিলেন না রাত্তিরে তিনি বাড়িতেই ছিলেন না, তা এখন আমার মনে নেই। কিন্তু নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত তিনি বাড়ি আসেন নি একথা সত্যি। তিনি এলে কী যে হবে সেইটাই আমার একটা বড় ভয় ছিল।

শেষে তিনি এলেন। আসামাত্র তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্যই বোধ হয় উনি অপেক্ষা করছিলেন। অমনি তাড়াতাড়ি টুপি দু'টো ওঁকে দেখিয়ে বললেন, "এই দেখুন টুপি!"] এই বলে অমুক এনেছি, তমুক এনেছি ইত্যাদি বললেন। হেতু এই যে শংকরমামা যেন খুশি হয়ে যান! আমি সেটা তখুনি অনুমান করলাম আর রাত্তিরে সে জন্য ওঁকে ঠাট্টা পর্যন্ত করলাম। তখন উনি আমাকে যা উত্তর দিলেন তা আমি ভুলিনি। "কী করব? আপনার প্রাণের জন্য আমাকে যত্নবান হতে হয়। নইলে আমি কি শংকরমামার এমন খোশামোদ করতে যাই? কিন্তু আপনি একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছেন, তাই অন্ততঃ দু'দিন যাতে কষ্ট না পান, তাই অমন করলাম। নইলে আমার কী দরকার? গোপাল মামা সে-বিষয়ে আমাকে ঘুণাক্ষরেও বলেন নি। আমার সঙ্গে বেশ ভালোভাবে কথাবার্তা বললেন! এখানকার সেখানকার খবরাখবর দিলেন। আমাদের নানা-সাহেব বিষ্ণুপন্ত এঁদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'বাঃ বেশ ভালো লোক দেখছি!' তাছাড়া কলেজের বাইরে বাকি সময় ভর্তি করতে আরম্ভ করেছি কিনা তাও জিজ্ঞেস করলেন।"

আমি—বাঃ! মানে মোট কথা, তোমার দিকটা ঠিকই হয়েছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে বাড়ির কেউ কথাটথা বলে না, তার কী? তাতেও আমি পোড়ামুখীর কথা নয় রইল। আমি তো বলি অমন খুঁচিয়ে বাঁকা কথা

বলার চেয়ে না বলাই ভালো। কিন্তু মা বেচারিকে আমাদের জন্যে··· আমি বলিনি ওঁকে আগে থেকে বলে রাখতে?

রঘুনাথ রাও—বেশ, তাতে কী হল? তুমি তো বললে যে উমা মাসী তাকে বলেছেন।

আমি—কী বলেছেন তা আমি ঠিক জানিনা। কী যেন বললেন... আর আমি বলি এমন কতদিন চলবে? কাল যদি এর একটা কিছু বন্দোবস্ত না হয়, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না। এ সব কি বেশী দিন চাপা থাকবে?

রঘুনাথ রাও—তুমি গাল খেতে বড্ড উৎকণ্ঠিত হয়েছ দেখছি!

আমি—আহা, মরি, মরি! আমার যেন বকুনি খাবার আর গাল খাবার একটা অভ্যাস! কী যে বলো? আমি নাকি গাল খেতে উতলা হয়েছি! আর তা থেকে যেন নিস্তার আছে?

বাদলের ঝাপটা

দিনের বেলা যদি খুব গরম হয়, আর সন্ধ্যা বেলা হঠাৎ—কিন্তু খুব বেশি নয়—মেঘগর্জন হয়ে আকাশে মেঘ করে বিজলি ঝিকিমিকি করতে লাগে আর মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে মেঘ গুরু গুরু করতে লাগে, তাহলে বুঝতে হবে ভয়ানক বৃষ্টি নামবে, অবিরল বৃষ্টিপাত আর ঝড় বাদল হবে। আমাদের বাড়িতে অবিকল সেই অবস্থা হয়েছিল। আমাদের বোম্বাইয়ের আচরণে পুণার বাড়ির সকলের বড়ই কষ্ট হয়েছিল। শংকরঠাকুর-রূপী বাতাস নিজের সর্বশক্তি একত্র করে কতো রকম মেঘ এক জায়গায় জমা করে রেখেছিল। দিদিশাশুড়ী অনেক বৃষ্টি চেপে রাখতেন কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর তর্জন-গর্জনরূপী মেঘগর্জন শোনা যেত। ছোট মামীশাশুড়ীর জিহ্বাবিদ্যুল্লতা মাঝে মাঝে এঁকে বেঁকে যাচ্ছিল। বহুঠাকুরঝি মাঝে মাঝে চাতক পাখীর মতো টঁ্যা টঁ্যা করে সূচনা দিচ্ছিলেন যে 'শীগগিরই বৃষ্টি পড়বে, তোমাদের দুদ্দাড় করে ছুটোছুটি করতে হবে।' এই অবস্থায় আমরা ঘাবড়ে গেলে তাতে আশ্চর্য কী?

তবু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে স্বাধীনতার শক্তি বড় প্রচণ্ড। যে একবার স্বাধীনতা অনুভব করেছে তাকে অবসন্ন অসাড় হয়ে যাবার মতো ভয়ভীত করা মহা কঠিন কাজ। আমি প্রথমে বোম্বাই যাবার আগে যদি এই বিপদে পড়তাম, তা হলে আমার অবস্থা একেবারে অন্য রকমের হত! এখন আমার যত ভয় করছিল তার চেয়ে শত গুণ হাজার গুণ বেশি আমি তখন ঘাবড়ে যেতাম। তখন আমি মোটেই জানতাম না যে কেউ আমার সহায় হবে। আর স্বাধীনতা, এ-শব্দটা তো স্বপ্নেও শুনিনি। কিন্তু এখনকার অবস্থা কত ভিন্ন! উনি যখন বললেন, "তুমি অত ভয় পাও কেন? আমরা তো চুরি করিনি? খুন করিনি? বকবে, বকবে আর চুপ করবে। সহ্য না করতে পারলে আমরা দূরেই থাকব। আমাদের মন পরিষ্কার থাকলে কাউকে ভয় করবার দরকার নেই।"

তখন স্বাভাবিকভাবে আমার মুখ দিয়ে বেরুল, "ঠিক, ঠিক, আমিও তাই বলি। সভায় গেলাম বলে তো ধর্মান্তর করিনি, কিংবা অমিতাচারও কিছু করিনি। তাহলে এদের এত ইয়ে কেন? এ-বছর দেখা যাক, অন্নের উপর দিয়ে গেলেই ভালো, নাহলে আর এখানে আসব না।" খানিকক্ষণ পরে আমার নিজেরই আশ্চর্য মনে হতে লাগল যে আমি অত কথা বলতে সাহস পেলাম কী করে! নিশ্চয়ই স্বাধীনতাদেবীর প্রসাদের অল্প যা ভাগ পেয়েছিলাম তার ফলেই এ-সাহস পেয়েছিলাম, এতে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। আর আমি এখানে এ-কথা না বলে থাকতে পারছি না যে যারা সে প্রসাদ সম্পূর্ণ পেয়েছে তারা ধন্য।

উনি যে ভাবছিলেন যে আমরা টুপি আনাতে শংকরমামা দু-একদিন বেশী বকাবকি করবেন না, তা একেবারে সত্যি হল। কিন্তু এও দেখতে পেলাম যে শংকরঠাকুরের মনে কোনো দুষ্টু বুদ্ধি ছিল আর তিনি অবিলম্বেই তাঁর পূর্ব কর্ম আরম্ভ করবেন।

এই রকমের গালি বর্ষণের অপেক্ষাই আমরা করেছিলাম। আমাদের দুজনের চেয়ে যার জন্যই বেশী ভয় ছিল। একটা গোটা দিন কেটে গেল তবু তাঁর মা ভালো করে কথা বললেন না। তাই স্বভাবতই তাঁর বড় দুঃখ হল। উমাশাশুড়ী তাঁকে অল্প কিছু বলেছিলেন কিন্তু তা থেকে তিনি স্পষ্ট কিছুই বুঝতে পারেন নি। তাই তিনি ওঁকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে ব্যাপার কী তা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন উনি তাঁকে আগাগোড়া সব কথা বললেন, "এ-সব শংকরমামার কাজ, জানো? আজ দু'দিন তিনি কিছু বলেন নি, তার কারণ আলাদা।" আমরা আসবার চার দিনের দিন সকালে দাদা আমাকে নিতে এল। সে দু'দিন আগেই আসত, কিন্তু আমিই তাকে এর আগে আসতে বারণ করেছিলাম। সে এল, সেই সঙ্গে আমরা যে গালিবর্ষণের অপেক্ষা করছিলাম, সেটা শুরু হল।

দাদা এসে নিয়মমাফিক দিদিশাশুড়ীর কাছে গিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতে বলল। অমনি তিনি ফোঁস করে বললেন, "এখন বাপু আর আমাদের সাথে ওর ও-সব ব্যাপারের সম্বন্ধ নেই। ওর কোনো কিছুর জন্য এর পর তুমি আর আমাদের কাছে মোটেই জিজ্ঞেস করতে এসো না। এখন ওর শাশুড়ী, ও নিজে আর ওর স্বামী যা খুশি করুক, আমাদের এখন কী সম্পর্ক? আমরা ওদের কে? আমাদের কে মানে? যাও, ওদের কাছে যাও।

আর আগে আমাকে জিজ্ঞেস করতে এলেই বা কেন? এখন কাউকেই জিজ্ঞেস করে দরকার নেই। ও নিজেই নিজের মালিক, স্বাধীন।"

শংকরঠাকুর কাছেই নাক ধরে বসেছিলেন, তিনি আস্তে আস্তে গম্ভীরভাবে বললেন, "মা, তুমি এ কী আরম্ভ করেছ? ও ছেলেপুলেদের কাজই বা এমন কী? আর তাতে অত মন দিয়েই বা দরকার কী? না হয় গেল এখন, তাতে কী? মা, শত করলেও আমাদের বাড়ির শিক্ষা, সে কি নিষ্ফল হয়? একটিবার হয়তো ভুল করেছে। তার অত…"

দিদিশাশুড়ী—আচ্ছা বেশ, লোকে মুখের উপরে থুথু ফেলছে তা তোমার পছন্দ হচ্ছে তো? আমার কিছু…

শংকরঠাকুর—মা, আমরা পছন্দ করলাম আর নাই করলাম? বাচ্চা যদি কোলে কিছু করে ফেলে, তাহলে উরু পর্য্যন্ত পা তো কেটে ফেলা চলে না? আমাকে কি কম লোকে জিজ্ঞেস করে, কী হে তোমার ভাগ্নে একেবারে এমন বিগড়ে গেল কী করে? কোথায় গেল তোমার শিক্ষা? তা করব কী? ওই যে রামু পানওয়ালা, আমাকে রাস্তা-ভর্তি লোকের সামনে জিজ্ঞেস করল…আমার এমন ভয়ানক রাগ হল, কিন্তু করব কী? নিজের দিকটাই যখন…এই ও বেটা যদি বৌকে সভায় নিয়েই না যেত আর তাকে…ওই দামুঠাকুর কী বলল, শুনলে তো মা?

দিদিশাশুড়ী—সব শুনেছি। কিন্তু উপায় কী? আমরা লোককে দেখে হাসতাম, এখন লোকে আমাদের দেখে হাসবে। কিন্তু আমি বলি এই গাধাটার এতটুকু আক্কেল নেই!

শংকরঠাকুর—ছি ছি মা, এ কী? ওর শ্যালকের সামনেই…আর এখন ও বড় হয়েছে, মাইনে পাচ্ছে একশো পঁচিশ টাকা, আর তুমি এ কী বলছ? আমার কথা যাক্। আমি নয় শুধু পঞ্চাশ টাকাই মাইনে পাই…

দিদিশাশুড়ী—আমি অতো টাকা.মাইনে-টাইনে শুনতে চাই না। আমি অমন ন্যাকামোতে ভুলব না। একশো নয় পাঁচশো টাকা মাইনে হল, তাতে আমার কী? ভগবানের দয়ায় আমার যথেষ্ট আছে। ও, ওর বৌ, আর ওর মার পছন্দ হলে সেও, বেশ স্বাধীনভাবে থাকুক আর যা খুশি করুক। সাহেবের বাড়ি যাক, সভায় যাক, আর মাকে বাড়িতে ঝির মতো খাটাক!

শংকরঠাকুর—এখন বোম্বাইয়ে তাই চলছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যি—আমি বলি—থাক সে-কথা। আমি কেন ও-কথা মুখে বলতে

যাব ? সত্যি বলতে গেলে, আমারও থেকে থেকে আশ্চর্য লাগে যে ছেলেটা এমন বিগড়ে গেল কী করে ? ওর আগেকার···সত্যি, আজকাল ওর সন্ধ্যে-আহ্নিকের রকম দেখেছ ? সেদিন সেই বচমৃভট এসেছিলেন ঠাকুর দর্শন করতে, তিনি আমাকে বলতে লাগলেন যে...কিছু বলব না ভাবি, কিন্তু না বলে থাকতে পারি না।

তাঁদের এই কথোপকথন চলছিল আর দাদা সেখানে বসেছিল। দাদা বেচারার জন্য আমার দয়া হল। শেষে একেবারে বিরক্ত হয়ে সে বলল, "তবে, যমুনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তো ?"

তার এই প্রশ্নে আর একটা ঢেউ উঠল। বাবা গো! তখন একেবারে খই ফুটতে লাগল। এতক্ষণ যে-শংকরঠাকুর আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন, তিনি মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। বড়ঠাকুরঝি ফুঁ দিতে লাগলেন। ছোটমামীশাশুড়ী ঘি ঢেলে দিলেন। আর, এই রকমে দিদিশাশুড়ীর দ্বারা জ্বালানো হোমাগ্নিতে আমাদের উভয়ের আহুতি পড়ল। শংকরঠাকুর মধ্যে মধ্যে বলছিলেন, "আশ্চর্যের কথা তো সত্যিই। মূর্খতা বটেই! লোকে এখন মুখ বার করতে দিচ্ছে না।" ইতিমধ্যে মা একসময় বললেন, "আচ্ছা তা না হয় ভুলটা করেছে কিন্তু তাই নিয়ে কতক্ষণ ইয়ে করবে ? একটা বড় অপরাধ তো করেনি। প্রতিবেশীরা গেল, তাই ওরাও গেল।" তিনি শুধু এইমাত্র বললেন, কিন্তু তাতেও ওঁর আর আমার আশ্চর্য লাগল যে মা এ কথাও বললেন কী করে। আগে কখনো তাঁর এমন কথা বলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ যেমনি ওকথা বললেন, অমনি হয়েছে!

"তোর পছন্দ হয়েছে তা ? বেশ হয়েছে। তোকে আমি আগের থেকেই চিনি, জানিস বাপু ? তুইও তো কম ন'স। এই যদি পরের ছেলে-মেয়েরা করত, তা হলে হেসে গড়াগড়ি যেতিস। আহাহা, মরি মরি। বড় দেমাক করে আমায় বলেছেন (একটু ভেঙিয়ে) 'না ভুল করেছে কিন্তু তাই নিয়ে কতক্ষণ ইয়ে করবে ?' কতো ইয়ে করব, না ? হ্যাঁ লো, বলি কী করলাম আমি ? পোড়ালাম না জ্বালাতন করলাম, বলি কী করলাম, কী ? আবার যদি কিছু বলি তো নিজের কান কেটে ফেলব।"

ছোট মামীশাশুড়ী—নয় তো কী ? এখন আর আপনার কিছু না বলাই

ভালো। উনি নিজেই যখন পছন্দ করেন—সত্যি কখনো ভাবিনি যে ঠাকুরঝি ওসব পছন্দ করবেন।

শংকরঠাকুর—বেশ পছন্দ করে! নিজের ছেলেই যখন করেছে, তখন করবে না? আমাদেরই শুধু ভাবনা হয়েছিল যে বেটাছেলে যে ও রকম ঢং করতে লাগলে তা ওর পছন্দ হবে না, তখন কী হবে? বেশ বাপু, এখন বেশ হয়েছে। ও নিজেই পছন্দ করছে। বেশ হয়েছে, চলতে দাও। কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে ও-সব না করলেই ভালো!

দাদা বেচারি উঠে যেতেও পারছিল না, তার বসতেও ইচ্ছে করছিল না। শেষে বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

এই রকমে আমাদের উপরে বাদলের ঘটা আরম্ভ হল। তার উপর আবার মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামছিল। এই দুদিন চেপে রাখা হয়েছিল কিনা তাই বোধ হয় বৃষ্টিপাতটা বিশেষ জোরে হচ্ছিল। বনু ঠাকুরঝির জোর তো এখন তিনগুণ হল। তিনি এখন আমাকে জল টল ছুঁতেও বারণ করতে আরম্ভ করলেন। আর তাঁকে বকবে বাড়িতে এমন কেউ ছিল না, তাই তাঁর সাহস দিনে দিনে বেড়ে চলল। উঠতে-বসতে তাঁর অন্য কাজ ছিল না। যখন তখন "কী বৌদি? আজ হিরাবাগে সভা আছে, তুমি বোধহয় যাচ্ছ? হ্যাঁ, তুমি না গেলে চলবে কেন? তুমি তো সেখানকার মুখ্য!" কখনো কখনো বলতেন, "সত্যি বৌদি, গলায় মালা পরিয়ে দেবার সময় সেই সাহেব তোমায় কী বলল?" সে কী এক কথা? সে-সব কথা ভাবলেও ঘেন্না করে। কিন্তু তাঁর কথাতে আমার কিছুই মনে হত না, বরং তাঁর জন্য দয়া হত। ভাবতাম যে তিনি এতেই আনন্দ পাবেন তাতে আশ্চর্য নেই। তিনি অন্য কী করবেন? স্বামীর দিক দিয়ে সুখ মানে কী তা জানতেন না। এ দিকে পড়াটড়ার অভ্যাস করে পুঁথিপত্র পড়ার শখ হবে, তাও ছিল না। মূলতঃ স্বভাব মন্দ, তাতে সব দিক দিয়েই অবস্থা খারাপ, তাই তিনি ও-রকম হয়েছিলেন, তাতে আশ্চর্য কী? ছোট মামী-শাশুড়ী আর দিদিশাশুড়ী বকতেন, তাই আমার দুঃখ হত। অবশ্য আমাদের বকতেন বলে নয়, কেন না আমরা মন বেশ শক্ত করেছিলাম। কিন্তু মা বেচারি বড় ভালো মানুষ! তাঁকে খোঁচা দিয়ে বকতেন, তাই বড় দুঃখ হত। তিনি অত সরল আর তাঁকে দু'জনে মিলে—একজন তো স্বয়ং তাঁর মা—যা খুশি বকতেন। আর এখন শংকরঠাকুরও হাসতে হাসতে

খোঁচা মেরে মেরে কথা বলতে লাগলেন।

একদিন তিনি যা দুষ্টামি করলেন তা বড় সাংঘাতিক। সকাল বেলা ওঁর নামে একখানা চিঠি এসেছিল। খামের উপরের ঠিকানা বালবোধ-লিপিতে লেখা ছিল। চিঠিটা আসতে সেটা তিনি হাতে পেলেন। সে-চিঠি কার ইত্যাদি তিনি দেখে নিলেন, এতে তো সন্দেহ নেই। খামের উপর ওঁর নাম স্পষ্ট করে লেখা ছিল। তবুও চিঠি খুলে তিনি পড়লেন, আর উনি যখন চান করে এসে মাঝ ঘরে ধুতি পরছিলেন, তখন কাছে এসে সকলে যেন শুনতে পায় এমন ভাবে জোরে বললেন, "ওহে, এই ভাখো, বোধহয় সীতার বন্ধুদেরই লেখা তোমার নামে চিঠি এসেছে। আমি ভাবলাম আমার চিঠি, তাই খুলেছিলাম। কোনো সভাটভার কথা লিখেছেন বুঝি, দেখি।" আর তিনি—তিনি আমার শ্বশুর, তাই কিছু বলতে পারছি না—সে চিঠিটা খুলবেন, এমন সময় উনি রেগে লাল হয়ে চট্ করে চিঠিটা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিলেন। কিন্তু শংকরঠাকুর তো সেটা আগেই খুলেছিলেন। এ-সব ব্যাপার নিজের চোখেই দেখলাম। রাগে আমার গা জ্বলে উঠল। ভয়ে গা কাঁপতে লাগল! নিশ্চয়ই ভাবলাম যে চিঠিটা বোধ হয় আমার পরম বন্ধু যশোদা বাঈ ও লক্ষ্মী বাঈয়ের ছিল। চিঠি খুলবার অসভ্যতা শংকরঠাকুর করেছিলেন বলে যত রাগ হয়েছিল, সে চিঠি তিনি পড়ে থাকলে কী যে কাণ্ড হবে তাই ভেবে ততটা ভয়ও করতে লাগল! কিন্তু কী উপায়? সে সমস্ত দিনটা আমি যে কেমন করে কাটিয়েছি তা কল্পনা পর্যন্ত করলে আজ আমার অসহ্য লাগে। সে-দিন ক্ষণে ক্ষণে সেই চিঠির জন্য আমায় কত খোঁচানো কথা শুনতে হল। "এখন ওর বন্ধুদের চিঠি আসতে আরম্ভ হয়েছে, এখন সাহেব, মেমসাহেব ওর সঙ্গে দেখা করতে এসে আমাদের সামনে ওর হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে যাবে; ওকে এখন একটা টেবিল-চেয়ার এনে দিতে হবে।" সে কি এক কথা—কাঁড়ি কাঁড়ি! শেষে একেবারে চরম-সীমায় উঠল।

আমার এতক্ষণের সব সাহস রাত্তিরে ওঁকে একান্তে দেখেই ফুরিয়ে গেল, আর সইতে না পেরে ওঁকে জড়িয়ে ধরে আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "এ-সব আর কত সহ্য করব?" অনেকক্ষণ আমি শুধু কেঁদেছিলাম। সে-চিঠির কথা আমি একেবারে ভুলেই গেলাম! শেষে যেমন তেমন করে

আমাকে বুঝিয়ে বলে উনি সেই চিঠিটা। আমাকে পড়তে বললেন। ওঁর মনও আজ ভারি খিন্ন, উদাসীন, আর ক্রুদ্ধ হয়েছিল। "তুমি আর একটুও ইয়ে কোরো না। এই ছুটিটা ফুরিয়ে গেলে ফিরে গিয়ে আর আমরা এখানে আসব না। তা হলে তো হল? আর এখন তুমি সাত-আটদিন বাপের বাড়ীই যাও। মিছে এ-জ্বালা সহ্য করবে কেন? আমার সামনে শংকরমামা বলুন, তাহলে……"

"কিন্তু তিনি তোমার সামনে কখনো কি কিছু বলেন? তুমি থাকতে দিদিশাশুড়ী বকতে আরম্ভ করলে কেমন 'চিনি ছড়াতে থাকেন' দেখলে তো?[১] মামীশাশুড়ীও ওই রকম। তোমার সামনে কেমন হেসে হেসে কথা বলেন, যেন শুধু ঠাট্টা, হাসিতামাশা করছেন! আর তোমার পিছনে…"

"দিদিমা হোন, মামীমা হোন, তাঁদের কথায় আমার অত দুঃখ হয় না জানো? কেন না, তাঁদের বুদ্ধির দৌড়ের উপযুক্তই তাঁদের কথা। কিন্তু শংকরঠাকুর…আজ এই চিঠিটা তিনি খুলেছেন—আমি নিশ্চয় জানি যে এটা তিনি পড়েছেনও—তাই আমার এত রাগ হয়েছে যে তার সীমা নেই। কিন্তু কী করা যায়? সাধে বলে যে 'আড়াল থেকে শোনে, সে নিজের নিন্দে ছাড়া অন্য কিছুই শুনতে পায় না,' যে লুকিয়ে চিঠি খুলে পড়ে তারও ঠিক সেই অবস্থা হয়! এই চিঠিটা যদি তিনি পড়ে থাকেন, তাহলে তিনি যা ভেবেছেন, তা—এখনি যদিও নয়—তবু দু'দিন পরে নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারব। ছাখো তো কি লিখেছেন," উনি বললেন। তখন, "আমি পড়তে পারছি না, তুমিই পড়ো" বলে আমি অনুরোধ করতে লাগলাম তাই উনি সে চিঠি পড়লেন। চিঠিটা বেশি বড় ছিল না। কিন্তু তাতেই সব কিছু লেখা ছিল। চিঠির নীচে দু'জনেরই সই ছিল। আর, আরও অনেক বন্ধুরা নমস্কার জানিয়েছিলেন। "তোমাদের বাড়ীতে তোমাদের কেমন অবস্থা হল? ধর্মাভিমানী শংকরঠাকুর তোমাদের ঘরে নিলেন, না বাইরে আলাদা ঘরে রাখলেন? যখন তোমারা টুপি, জামা, মিষ্টি, ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছ, তখন বোধ হয় বেশি কষ্ট পেতে হবে না। তোমাদের সঙ্গেই, তোমাদের শংকরঠাকুরের মুখে নিশ্চয় আমাদেরও উদ্ধার হচ্ছে। যাই হোক্ তোমরা সে-সব কিছু চুপ করে সহ্য করে এই সময়

১ একটি মারাঠি প্রবাদ, মানে কারো সামনে শুধু মিষ্টি কথা বলা।

বিলক্ষণ ধৈর্য রেখো। তোমাদের সহশীল আচরণ দেখে তাঁর নিজেরই অনুতাপ হবে। গণপত রাও ঠাকুরপো শীগগিরই এখানে আসছেন, তাই আমরা সকলে কোথাও যাওয়া রহিত রেখেছি! তিনি এলে পরে বোধ হয় কোথাও যাব। তখন তোমাকে নিশ্চয়ই জানাব। তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে! আজকাল রোজ কতবার তোমাকে মনে পড়ে"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই চিঠি যদি শংকরঠাকুর পড়ে থাকেন, তাহলে তিনি কী ভেবে থাকবেন, এই ভেবে আমি ভারি ভীত হলাম। প্রায় নিশ্চিতভাবে জানতাম যে তিনি চিঠি পড়েছেন। তাই এখন কী যে হবে সে-বিষয়ে বিষম ভয় পেয়ে ভাবতে লাগলাম যে, সত্যি দু'চারদিন বাপের বাড়ি যেতে পারলে বেশ হয়। কিন্তু তা হবে কী করে এই ভেবে একেবারে অস্থির হয়ে গেলাম।

এই জ্বালায় আরও দুদিন কেটে গেল। ও বাড়ি যেতে পাবার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিলাম না। দাদা যে আবার আমাকে নিতে আসবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। আর সে আসবেই বা কেন? যে-দিন এসেছিল সে-দিন কি তার কম অপমান হয়েছিল? তাই আমি ভাবছিলাম যে সে যেন সত্যি না আসে, আর আশা ছিল যে সে আসবেও না। কিন্তু ও বাড়ি যাবার কী উপায় করা যায়? বাড়িতে কাউকে জিজ্ঞাসা করার জোই ছিল না। এই রকম চিন্তায় আমি মগ্ন ছিলাম। এমন সময় বাবা নিজে এ-বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করতে এলেন। মে-মাসের ছুটিতে জামাই-বাবাজীকে আর বাড়ির সকলকে একবার খাওয়াতে হবে না? তিনি নিজেই এলে আর কে কী বলবে? তিনি এসে অবশ্য শংকরঠাকুরের কাছে গেলেন, কেন না, শংকরঠাকুর বাড়ির বড় ভাই তো। তখন শংকরঠাকুর অবশ্য তাঁর স্বভাবমতো "হ্যাঁ, হ্যাঁ," করে বড় সভ্যভাবে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু কথায় যে বলে "স্বভাবের ঔষধ নেই"[১] তা মিথ্যে নয়। বাবা উঠতে উঠতে সহজভাবে বললেন, "যমুকে আজ একটু সকাল সকালই পাঠিয়ে দেবেন।" অমনি শংকরঠাকুর হাসতে হাসতে আর হেঃ হেঃ করতে করতে বললেন, "দেখি, মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ওদের এই বোম্বাইয়ের আচরণে মা বড় ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমি ওঁকে কত বলি 'ছেলেমানুষের কাণ্ড, না হয় একটু ভুলই করেছে', কিন্তু মা কি শোনেন? আর ওঁরা বুড়োমানুষ,

১ একটি মারাঠি প্রবাদ।

ওঁদের কথাও তো ঠিকই। তাঁরা এই সভায় যাওয়া···হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের সময় আমরাও কি মনে করতাম? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।" গোপাল ঠাকুর কাছেই বসেছিলেন। দেখতে পেলাম যে শংকরঠাকুরের কথা তাঁর একেবারে ভালো লাগল না।

বাবা কিছু বললেন না। শুধু মাঝে মাঝে 'হুঁ, হুঁ' করছিলেন। শংকরঠাকুর নিজে কথা বলছিলেন আর নিজেই হাসছিলেন। আর যাবার সময় তিনি এও ইঙ্গিত করলেন যে তিনি পরান্ন খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

আমি বাপের বাড়ি যেতে পাবো কি না এই উৎকণ্ঠায়, কে কী বলবে তা মোটেই ভেবে না দেখে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিলাম। শংকর-ঠাকুরের এই শেষের কথা শুনে আমার মনের কী রকম অবস্থা হল তা কল্পনা করাই ভালো।

বাবা চলে গেলে শংকরঠাকুর ভিতরে এসে সব কথা বললেন। বাবা বাড়ির সকলকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন এ-সংবাদ ঘরে জানামাত্র নিশ্চয় কে কে যাবে এই প্রশ্ন উঠল। শংকরঠাকুর তো নিজে পরান্ন বর্জন করেছেন বলেছিলেন। তবু গোপালঠাকুর বললেন, "আমি বাপু যাব। ভদ্রলোক স্বয়ং এখানে এসেছিলেন, কাল আমার কোনো কাজের তাড়া নেই, আমি নিশ্চয়ই যাব। গোপালঠাকুরের এই কথা শোনামাত্র যেন সব ব্যাপারই মিটে গেল। দিদিশাশুড়ী বে·া কিছু বললেন না, কিন্তু ছোট মামীশাশুড়ী ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লাগলেন, "গিয়ে কাজ কী? ইনি মান-অপমান কিছুই বুঝতে পারেন না।" হেন বোঝেন না, তেন বোঝেন না। থাক্।

দুপুর বেলা মাঙ্গী সাহেব মেয়েদের নিমন্ত্রণ করতে এলেন, তখন তাঁর কাছে সমস্ত নামতা পড়া হল, এ-কথা আর বলতে হবে না। যেন তিনি কত বয়স্কা! হ্যাঁ, তিনি সে রকম ভাণ করতেও পারতেন বটে। আজকাল তিনি একেবারে সাদাসিধে ভাবে থাকতেন, আর শরীরটাও বেশ স্থূল হতে আরম্ভ করেছিল, তাই দেখতেও বেশ বড় হয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমার নিন্দনীয় (!) কাজের নামতা পড়া আর তাঁর 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করা শেষ হলে পর নিমন্ত্রণ করলেন। তখন অবশ্য, "কেউ যেতে পারবে না, বনীকে পাঠিয়ে···" কিন্তু বনুঠাকুরঝি বাক্যটা শেষ করতে দিলে তো? চট্ করে মাঝখানেই তিনি বললেন, "ওমা! সে কী কথা! আমি যেতে পারব না, দু'দিন থেকে আমার মাথা ধরছে।" তাই শুনে দিদিশাশুড়ী তাড়াতাড়ি আদর

করে বললেন, "বেচারার খেতে যাওয়ার সাধ—নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। আর কাল বরের সঙ্গে কোনো সভায়, না হলে কারো বাড়িতে খেতে যাওয়ার দরকার হলে?" তাঁর এই কথা শুনে, 'বাঃ, বৌ কেমন চমৎকার খোঁচা খেয়েছে' এই ভেবেই বোধ হয় সবাই হাসতে লাগল, আর বনুঠাকুরঝির তো আনন্দের সীমা রইল না। এখানে মানুষের স্বভাবের সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতার একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। অন্য কেউ আমাদের মন্দ ইচ্ছা করলে কিংবা উপহাস করলেও, আমাদের পক্ষে তাদের মন্দ কামনা করা ভালো নয়, এ-সব কথা সত্যি। কিন্তু "আর কাল বরের সঙ্গে কোনো সভায়…"এই বাক্যটা শুনে বনুঠাকুরঝি যখন হি হি হি হি করে হাসতে লাগলেন, তখন "বড় বরের আদুরে মাণিক কিনা, তাই সভাটভায় নিয়ে যাবে?"—এই রকম কিছু বলতে আমার ইচ্ছা করল। শুধু তাই নয়, ঠাকুরঝি একা থাকলে আমি হয়তো ও-কথা বলেই ফেলতাম। অমন কথা বলা ভালো নয়। অমন ছুরুত্তর কাউকে করতে নেই এ-সব আমি জানতাম; শুধু মনুষ্যস্বভাবের একটা উদাহরণ দিলাম।

কিন্তু এখন কথা আর বেশি লম্বা না করে আমি শুধু এই বলছি যদিও কিছু আপত্তি হল, দ্বিতীয় দিন সকালেই এঁরা আমাকে পাঠিয়ে দিতে রাজি হলেন। রাত্তিরে ওঁকে সব কথা বলে, "তুমি তবুও কি যাবে?" এই বলে আমি ঠাট্টা করলাম। তখন উনি বললেন, "আমি বাপু এমন ধর্মান্তর করে খ্রীষ্টান হওয়া, সংস্কারিত বউয়ের বাপের বাড়ি খেতে যাব না। যার গলায় সাহেব মালা পরিয়ে দিলে…"

"ঢের হয়েছে! আর ঠাট্টা করতে হবে না—"

"ঠাট্টা কিসের? জানো, আজ শংকরমামার অফিসের এক ভদ্রলোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে শংকরমামার সামনে আমাকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলেন।"

"ওমা! রাস্তায়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাস্তায়! হাঃ হাঃ করে দাঁত বার করে বললেন, 'আমরা যা শুনলাম, তা কি সত্যি? সত্যি তোমার মেমসাহেবের গলায় সাহেব মালা পরিয়ে দিলে?' আমার এত রাগ হল যে জুতো…কিন্তু কী করব? শংকরমামা ছিলেন সঙ্গে!"

"ওমা! কে সে পোড়ারমুখো?"

"সেই যে কানে রুদ্রাক্ষ পরে—সব সময় এখানে শংকরমামার কাছে

আসে। তাকে বেদান্তী মশাই বলে লোকে। ক'দিন আগে তার আসা বন্ধ হয়েছিল—দুজনে জুতো মারামারি হয়েছিল, তাই। কিন্তু আবার বোধ হয় ভাব পেতেছে দু'জনে।"

"ওমা! আর শংকরঠাকুর তাকে কিছু বললেন না?"

"আহা! উনি বলবেন? আমার তো মনে হয়, উনিই নিশ্চয় তাকে ও-কথা জিজ্ঞেস করতে বলে রেখেছিলেন। তোমার শ্বশুরমশাই শংকর-ঠাকুর কী যে করবেন তার কি কিছু ঠিক আছে?"

"আমার শ্বশুরমশাই? আর তোমার কে? তোমার কারণেই তো আমার শ্বশুরমশাই?"

কিন্তু আমার কথার দিকে ওঁর লক্ষ্য ছিল না। রাগে জ্বলে যাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপরে আমি বাপের বাড়ি কতদিন থাকব এই সব জিজ্ঞাসা করলাম। তখন উনি বললেন, "তুমি আর এসোই না। সর্বক্ষণ এ-জ্বালা সহ্য করার আর দরকার নেই। আবার সে-ব্যাটা আমার কাছে ও-কথা বলুক...লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! আর এঁর সঙ্গে ওঁর জীবচ্চ-কণ্ঠচ্চ বন্ধুত্ব! নেশা করে, গাঁজা খায়, আর যেখানে খুশি পড়ে থাকে! ইনিই অনেক চেষ্টা করে দশ-বারো টাকার কাজ নিজের আপিসে জুটিয়ে দিয়েছেন। আর তাকে 'মশাই মশাই' করে তার কত প্রতিষ্ঠা! বড় বেদান্তী উনি!"

"আচ্ছা, থাক না কেন? তা দিয়ে আমাদের কী কাজ? মিছিমিছি নিজে কষ্ট পাচ্ছ কেন?"

"কষ্ট মানে? এই পাজী লোকদের নাম করলে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে! কিন্তু উপায় কী? নাঃ, এরা সে বড়..."

"আচ্ছা, কিন্তু এখন রাত কত হয়েছে কিছু খেয়াল আছে? আমি ক'দিন ও-বাড়িতে থাকব বললে না যে!"

"বললাম তো ফিরে যাবার বেলা পর্যন্ত। নইলে এইবার, কোনো একটা উপায়ে ঠাকুমার বাড়িই চলে যাও। তাহলে ঠিক হবে।"

সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে অনেক রাত হল, আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

দ্বিতীয় দিন যেমন তেমন করে আমি যেতে তো অনুমতি পেলাম, আর অমনি তক্ষুণি চলে গেলাম। ঠাকুরমার ওখানে যাবার কল্পনাতে আমার মন

একটু চঞ্চল হল। ঠাকুমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করতে লাগল, কিন্তু কী উপায় করব তাই ভেবে মন একেবারে ভারি হয়ে রইল।

খাওয়া-দাওয়া যেমন হবার হল। পুরুষদের যাঁদের আসার কথা তাঁরা এলেন। মেয়েদের মধ্যে কিন্তু উমাশাশুড়ী ছাড়া আর কেউ এলেন না। কেউ আসবে না, তা আমি ঠিক জানতাম। সে-দিন আমি বিশেষ এই দেখতে গেলাম যে মাঈসাহেব রোজ যেমন পরেন তার চেয়ে বেশি কিছুই গয়নাটয়না পরেন নি। কেন, তা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। দাদাকে জিজ্ঞাসা করব ভেবে আমি সে-দিনটা কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যা-বেলাও আড়ালে দাদার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। তাকে আমি এ-কথাও জিজ্ঞাসা করব ঠিক করেছিলাম যে মাঈসাহেব আজকাল এমন উদাসীন কেন? আরও দেখতে পেলাম যে, তাঁর মার সঙ্গে বোধ হয় তাঁর ঝগড়া হয়ে থাকবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে, দু'জনেতে তেমন ভাব আর নেই। তার কারণ যাই হোক। মাঈসাহেবের মেজাজ দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে তিনি নিশ্চয় কোনো বিষয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন। কী বিষয়ে তা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তিনি আর আমাদের সঙ্গেও অত অহংকার-পূর্ণ আচরণ করতেন না।

আর আমার বৌদি? তিনি আগেও যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন। এমনিতেই তিনি কারো সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসতেন না। এখন তাঁর সেই স্বভাব আরও বেড়েছিল। তাঁর ব্যবহারে এইটুকু তফাৎ হয়েছিল—আর কিছু নয়। তিনি ভালো করে কথা বলতেন না। মুখ হাঁড়ি করে, তাও আবার বাঁকা করে বলতেন, "আমার কী গো? পোড়া কপাল নিয়ে এমনি সারা জন্মটা কাটাতে হবে।" এর চেয়ে বেশি কিছু আমি বৌদির মুখে প্রথম দিন থেকেই শুনিনি। তখন কিন্তু আমার সত্যি কষ্ট হল যে আমার দাদার মতো অত ভালোমানুষ অমন স্ত্রী পেয়েছে! কিন্তু, তবুও এর পরে ভবিষ্যতে সে ভালো হবে, এই আশা করে আমি চুপ করে রইলাম।

সে-দিন অবশ্যই আমি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাই নি। আমার দুর্গার বাড়ি যাবার ইচ্ছে ছিল। শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসাই যখন মহা কঠিন কাজ, তখন দুর্গার বাড়ি যাব কী করে? তাই, বাপের বাড়ী না এসে দুর্গার বাড়ি যাওয়াই সম্ভব ছিল না। আমরা দুজনে একেবারে বোনের মতো। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলা-ধুলো করলাম, কিন্তু তার বাড়ি যাওয়াও

আমার সাধ্য ছিল না। এই আমাদের স্বাধীনতা! এই আমাদের জীবন! প্রত্যক্ষ নিজের পিতার বাড়ি যেতেও সতেরো হাজার অনুরোধ আর অনুমতি! এর চেয়ে পরাধীনতা আর দাসত্ব কী থাকতে পারে।

পরের দিন সকালে মাঈসাহেবকে বলে "আঁতুড়-উপহার"[1] দেবার জিনিসপত্র, পান, নারকেল, ইত্যাদি যা বাড়িতে ছিল না তা আনিয়ে নিয়ে, দুপুরে আমি দুর্গীর বাড়ি গেলাম।

১ মহারাষ্ট্রে নিকট সম্পর্কের কারো ছেলেমেয়ে হলে মা ও সন্তানকে উপহার দেবার প্রথা আছে। সম্বল মতো মাকে ফল, কাপড়টাপড়, পান সুপুরি, আর শিশুকে যে যেমন পারে কাপড়, খেলনা, রূপোর বাটি, ইত্যাদি দেয়। মা সন্তান কোলে করে পিঁড়ির উপরে বসে, তারপরে তার কপালে হলুদ কুঙ্কুম পরিয়ে দিয়ে উপহার দেওয়া হয়, সেই উপহার আর শ্রীফল সে আঁচল পেতে নেয়। একে 'আঁতুড় উপহার' বলে।

দুর্গীর অবস্থা

আমাকে দেখতে পেয়েই তার ভালোবাসা যেন উথলে উঠল। সে ভালো করে উঠে বসতেও পারছিল না। তবু আমার বারণ অগ্রাহ্য করে সে চট্ করে উঠে বসল। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আমাকে বলল, "এখানে এতদিন এসেছিস, আজ এলি তোর বোনপোকে দেখতে? ছাখ, ছাখ, মুঠো তুলে তুলে তোর দিকে কেমন চেয়ে দেখছে।"

শিশুটিকে দেখামাত্র আমার গা শিউরে উঠল! তার চামড়া এত কুঁচকে গিয়েছিল, আর সে এত আস্তে আস্তে কাঁদছিল যে তা আর কি বলব। তার গায়ে একটুও জোর ছিল না। মনে হল যে একটু ধাক্কা লাগলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তাই দেখে আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ দুর্গী আমাকে বলল, "শুধু দেখছিস যে ওর দিকে, নে না কোলে তুলে? ছাখ, ছাখ, কেমন নড়াচড়া করছে। সোণা, মাণিক আমার! যা ধন যা, মাসিমার কাছে যা। আহা, মরি মরি! কী হল বাছার আবার?"

তার নিজের ছেলের উপর সেই অতিরিক্ত ভালোবাসা দেখে আমার বিষম আশ্চর্য লাগল। আমি ভয়ে ভয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলাম আর দোলাতে লাগলাম।

এমন সময় দুর্গীর ঠাকুমা বললেন, "বাঃ! বেশ সুন্দর মানিয়েছে! এবার তোমার খোকা হোক। শীগগিরই আমাদের খোকাবাবুর মাসতুতো ভাই হোক।" তিনি যখন এ-কথা বলছিলেন তখন আমার লক্ষ্য দুর্গীর দিকে ছিল। মোটামুটি তার অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে দেখে আমার বড্ড দুঃখ হল। ভাবলাম, এই কি সেই ছেলেবেলার দুর্গী? শুধু তাই নয়, মনে হল যে আমি বোম্বাই যাওয়ার আগের দুর্গীও এ-দুর্গী নয়! তথাপি একটা বিশেষ জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম যে সে তার খোকার আনন্দে একেবারে তন্ময় হয়ে থাকত। আমি খোকাকে কোলে করে দোলাতে আরম্ভ করামাত্র তার বড় সন্তোষ হল। তার সব সময় লক্ষ্য ছিল

আমার কোলের সেই শিশুটির দিকে। একবার দু'বার সহজেই বুঝি খোকার ঘাড়ে কোথায় একটু ধাক্কা লাগল। তখন তাড়াতাড়ি "হু", হু", যদু, সাবধানে ধর বাছাকে, ও কত ছোট্ট ভাখ তো! এমন কেন করছিস?" এই বলে ও খোকাকে আমার কাছ থেকে নেবার জন্য হাত পর্যন্ত বাড়াল।

খোকা হবার আগে দুর্গা আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছিল, সে-কথা তো সে আমার কাছেই স্পষ্ট ব্যক্ত করেছিল। আমিও দুর্গা সে-রকম একটা কিছু নিশ্চয়ই করবে ভেবে ভয় পেয়েছিলাম; কিন্তু দেখলাম যে সেই দুর্গা যে নিজের প্রাণের অযত্ন করে, সেই একমুঠো মাংসের পিণ্ডকে এত ভালোবাসতে লাগল এবং একেবারে এত তন্ময় হল যে, সে যেন আর কিছু দেখতেই পাচ্ছিল না! এই দেখে আমার আশ্চর্য লাগল আর একরকম আনন্দও হল। মনে হল এই খোকার জন্য সে নিশ্চয়ই সব রকম কষ্ট সহ্য করবে আর খোকার আনন্দে শীগগিরই সেরে উঠবে। নিজের জীবনের বিষয়ে সে একেবারে নিরাশ হয়েছিল, কিন্তু এখন বেঁচে থাকবার কিছু—কিছু কেন?—খুবই প্রবল হেতু হল। আমি ভাবলাম যে যতদিন এই খোকাটি বেঁচে থাকবে, ততদিন অন্য কিছু না ভেবে, হাজার রকম আপদ বালাই সহ্য করে, দুর্গা এখন নিজের প্রাণের কোনো বিপদ হতে দেবে না। এই ভেবে আমার খুব ভালো লাগল। তবু দুঃখের বিষয় এই যে সে-বাচ্চাটা বেশীদিন বাঁচবে বলে মনে হচ্ছিল না। আর সে যদি না বাঁচে তা হলে কিন্তু দুর্গা নিজের প্রাণের কী জানি কী বালাই ঘটিয়ে বসবে তারই বা কী ঠিক। দুর্গার স্বভাব আমি যা বুঝেছিলাম তা এই যে, সে ছিল একবগ্‌গা। ওর মনের ভাব দারুণ প্রখর ছিল। একবার কোনো বিষয়ে তার ঘৃণা জন্মালে, তার নাম পর্যন্ত সে করত না। একবার কোনো কিছু ভালোবাসলে একেবারে অতিশয় ভালোবাসত। সে ভালোবাসার পারাপার থাকত না। তার এ-রকম স্বভাব ছিল বলে সন্তানের উপরে ভালোবাসা তার নিজের হিতেরই ছিল। তাই দেখে আনন্দ হল। আমি অনেকক্ষণ বসলাম। এ-দিককার সে-দিককার গল্প করলাম, তার স্বাস্থ্যের খবর নিলাম। তার মা আর ঠাকুমাও বললেন যে আগেকার চেয়ে ওর শরীর এখন অনেক ভালো! শুনে আমার মনে হল যে সন্তান প্রসব করার পর দুর্গার শরীর না জানি কী রকম হয়েছিল! তার কল্পনাও আমি করতে

পারছিলাম না। সম্প্রতি তাকে কত খারাপ দেখাচ্ছিল তা আমি উপরে লিখেছি। এই যদি 'অনেক ভালো' হয়, তবে এর চেয়ে খারাপ শরীর না জানি কেমন? তা আমি বুঝতেই পারছিলাম না। তবু আমি বেশী কিছু না বলে, "বাপের বাড়ি থাকলে রোজ, নিদেনপক্ষে একদিন বাদে বাদে আসব" বলে সেখান থেকে উঠলাম।

ফিরে আসার পথে আমার যে কতরকম চিন্তা এল। কিছু দুঃখ, কিছু বিস্ময়, কিছু ভাবনা, অল্প আনন্দ—সব মিলে মন আমার একেবারে ভরে গেল। দুর্গার সেই অবস্থা দেখে আমার মনে এমন অদ্ভুত আর পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব কেন এল তার কারণ এখানে বলতে হবে না। আমার সেই বন্ধুর অবস্থাই এ-সময়ে এমন ছিল যে, তার বিষয়ে যে ভাববে তার মনে ও-রকম নানাবিধ ভাব জাগবেই জাগবে। তবু আমি ভয়ে ভয়ে নিজে থেকে ওর স্বামীর বিষয়ে কিছু খবর নেবার চেষ্টা করিনি। আগেই আমি অল্প অল্প এই জানতাম যে সে চাকরির খোঁজে কোথায় যেন গিয়েছিল, কিন্তু তার চিঠিটিঠি কিছু আসেনি। তাই দুর্গাকে কিংবা তার সামনে তার ঠাকুমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে অপ্রীতিকর কথা মনে করিয়ে দেবার দরকার কী?

এইরকম মনের অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলাম। দাদা তখনো আসেনি। আমাদের দু'জনের দেখা হলে তার সঙ্গে শান্তভাবে কথাবার্তা বলবার জন্য আমি পথ চেয়ে ছিলাম। দুর্গার বাড়ি থেকে আসা অবধি আমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিল আর দাদা কখন আসবে বলে আমি তার পথের দিকে চেয়েছিলাম। এমন সময় সে তার নির্দিষ্ট সময়েই বাড়ি এল, আর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

কিন্তু কেমন মজা দেখো। কারো সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ ভাবে যে তাকে হেন বলবে তেন বলবে, এটা জিজ্ঞাসা করবে ওটা জিজ্ঞাসা করবে; কিন্তু দেখা হওয়ামাত্র সব কেমন যেন গুলিয়ে যায়। আমি এ-কথা অনেকবার অনুভব করেছি, এই এবারও ঠিক সেরকমই হল।

কিন্তু কিছুক্ষণ এদিককার সেদিককার গল্প-সল্প, খবরাখবর, ঠাট্টা-রসিকতা হবার পর, সব আগের মতো মনে পড়ল। তখন আমরা একেবারে ছোটবেলায় যেমন গল্প করতাম সেইরকম গল্প করতে লাগলাম। সে আমাকে বোম্বায়ের কত কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আমি তাকে সবকিছু বললাম। লক্ষ্মীবাঈ, যশোদাবাঈ, নানাসাহেব, বিষ্ণুপন্ত এদের কথা সে

বারবার জিজ্ঞাসা করেছিল, আর আমি তাকে বারবার সে সব কথা বললাম। আর প্রথম দু'জন কথা বলবার সময় তো আমার একটুও আলস্য ছিল না। হঠাৎ দাদা আমাকে বলল, "যমু, আমি আমি এ-বছরে কী করব ভাবছি—বলব? কিন্তু কাউকে যেন বোলো না দেখো।" আমি যেই বললাম যে "বলব না" অমনি সে আমাকে তার মনের কথা খুলে বলল। তখন চট্‌ করে "বাঃ! তাহলে তো বেশ সুন্দর হবে।"—এ-কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু খানিক ভেবে আমি তাকে বললাম, "কিন্তু দাদা, বাবা অনুমতি দিলে তো?"

"এই দেখো, রঘুনাথ রাও যদি চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আমি নিশ্চয় জানি যে বাবা বাধা দেবেন না। তাঁকে আমরা জিজ্ঞেস করতে বলব। কিন্তু এরি মধ্যে তুমি কিছু বোলো না। এখন সে-বিষয়ে ঘুণাক্ষরও উচ্চারণ করে কাজ নেই।"

দাদার সে-কল্পনা আমার ভারি পছন্দ হল। তাই তারপরে আমরা শুধু সে-বিষয়েই কথা বললাম। খানিকক্ষণ পরে আমি তাকে কী যেন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তখনি মাঈসাহেব ডাকলেন তাই যেতে হল। তবু সে-দিন রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা তার ঘরে বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছিলাম। প্রধানতঃ আমার মাঈসাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সকলে না ঘুমোলে সে-কথা জিজ্ঞাসা করব কেমন করে? তবু এই ভালো ছিল দাদার ঘরে কেউ শুত না। সে একলাই সে ঘরে থাকত। তাই অন্ততঃ রাত্তিরে আমরা অবাধে কথা বলতে পারতাম। এখানকার সেখানকার কথা হল, তারপর দুর্গার কথা পর্যন্ত হল, শেষে আমি আস্তে দাদাকে বললাম, "দাদা, কাল থেকে তোমায় জিজ্ঞেস করব ভাবছি, কিন্তু এখন সেই আগের মতো কোরো না। তুমি যা জানো তাই আমায় বলো, না হলে হ্যাঁ...এখন তো আমি ছোট..."

"না, না গো, যমু দিদিমণি, আপনি এখন কতো বড়! আকাশে ঠেকে ঠেকে! বাবা গো! আচ্ছা, কিন্তু কী জিজ্ঞেস করবে বলেছিলে, করো না।"

"আজকাল মাঈসাহেবের মনের ভাব এমন ভ্যাবাচ্যাকা কেন? কারো সঙ্গে বেশী কথা বলেন না। তাঁর মার সঙ্গেও তাঁর ততটা বনে না বুঝি? মা-মেয়েতে কেমন-কেমন ভাব দেখছি, তাই। আর হ্যাঁ, হ্যাঁ দাদা, আজকাল গয়না-টয়না একেবারে নেই' যে? কাল এত লোক খেতে

এসেছিল, কিন্তু মাঈসাহেব কই 'সরী'[১] পরেন নি তো? বড় নথটাও পরেন নি, পায়েও কিছু পরেন নি।"

"বাঃ! তুমি তো বেশ খুঁটিনাটিও লক্ষ্য করতে শিখেছ! যমু এই দেখো, আমার তো (আমার কানের কাছে এসে একেবারে খুব আস্তে) মনে হয় সে গয়নাগুলো নিশ্চয় বাড়িতে নেই।"

"মানে?" আমি আশ্চর্য হয়ে একদম চেঁচিয়ে বললাম।

"ও কী? চেঁচিও না, কেউ শুনতে পাবে। মানে আবার কী? আমি শুধু শুধু বলছি নে। আমি নিশ্চিত জানি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে গয়না কোথায় গেছে আর তার কী হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল আছে। সে গয়নাগুলো অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে বোধ হয় মাঈসাহেবের মা'র কিছু সম্বন্ধ আছে, তাই বোধ হয় দু'জনেতে আজকাল ঝগড়া।"

"মানে? দাদা তুমি বলছ কী? গয়না নেই?"

"আমার মন তো আমাকে নিশ্চিতভাবে ওই কথাই বলছে। যমু তুমি কি ভাবছ যে ও-রকম একটা কিছু না থাকতেও মাঈসাহেব একেবারে উদাসীন হয়ে সাদা কাপড় সাদা চোলী পরে, এমন সাদাসিধে-পনা করতে আরম্ভ করেছেন? তা কিছু নয়, মহারাজ; ও গয়না বাড়িতে নেই। তাই কিছু একটা ছুতো করে, 'আমি এখন আর ও গয়না পরবই না, অমুকই নেই, তমুকই নেই', এই রকম চলছে।"

"দাদা, তুমি যাই বলো, আমার কিন্তু এ-কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। ঘরের গয়না অদৃশ্য হবে কী করে?"

"তা যদি জানতাম আমি, আমি কি তোমাকে বলতাম না?"

"কিন্তু ও বিষয়ে কিছু..."

"আমার বাপু মনে হচ্ছে সেই যে তুমি স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিলে, যে আগে একবার এসেছিল আর আমি যাকে আবার দেখেছি বলে তোমায় লিখেছিলাম, তার নিশ্চয় এ-কাজে হাত আছে। আর কোনো একজন..."

সত্যি বলতে কি, দাদার কথা আমার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবুও আমার মন যেন কেমন অদ্ভুত হয়ে গেল! তাই সেই ব্যাপারে আরও কিছু কথাবার্তা বলে আমি ঘুমোতে চলে গেলাম।

১ গলার গহনা বিশেষ।

কিছু গূঢ় কথা

দাদার সে-কথা আমার ভারি অদ্ভুত মনে হল। 'গয়না বোধহয় বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়েছে'—মানে, ব্যাপারটা কী? আমরা খুব ধনবান ছিলাম না। কিন্তু বাবা কালেক্টার-কাছারিতে যা কিছু উপার্জন করেছিলেন, সে-টাকা গয়নাতেই বিনিয়োগ করেছিলেন। আমাদের মা'র জন্য তিনি বেশ কিছু গয়নাগাঁটি করেছিলেন, আর তা বেশ মোটামোটা। মাঈসাহেবের বিয়ের সময় আর তার পরেও তাতে যোগই হচ্ছিল। তা ছাড়া বৌদিকেও রীতিমাফিক কিছু বেশ বড়বড় গয়না দিতে হয়েছিল। আমাদের ঠাকুরদার খেতে ফসল হতই, তাই বাড়ীতে কিছু টাকাকড়ি পাঠাবার দায় বাবার হয়নি। বরং বাড়িতে কোনো ক্রিয়াকর্ম হলে ঠাকুরদাই সাহায্য করতেন। এই অবস্থা ছিল বলে গয়নাগাঁটির সম্বল আমাদের বেশ ভালোই ছিল। আর সেরকমে সত্যি সত্যি যদি গয়নাগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে, তার কারণ যাই হোক, তাহলে যে অবাক কাণ্ড! তাই ভেবে ভেবে কিছু বিষণ্ণতা, কিছু বিস্ময়, কিছু ভাবনা হওয়া নিশ্চয় স্বাভাবিক। আমি নিজের মনে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম যে এ কী ব্যাপার! মাঈসাহেবের গয়নাগাঁটি পরে সেজেগুজে বেড়াবার শখ হঠাৎ অদৃশ্য হল কেমন করে? আজকাল তিনি যে একেবারে সাজগোজ করতেন না, এমন নয়। এখনকার তাঁর সাজপোশাক ভালোই ছিল। কিন্তু বড় বড় পাড়ের কাপড়, গয়না পরে, খোঁপায় গোলাপ ফুল গুঁজে যে-প্রকার আগে ছিল, তার বদলে আলাদা রকমের—মানে যাতে সাদাসিধে ভাব দেখাবে এই রকম—বেশী বড় লোকের দেমাক না দেখিয়েও যাতে সেজেগুজে থাকা সম্ভব—সেই তাঁর সাজ ছিল। আরও দেখলাম আগেকার সেই তেড়েমেড়ে খ্যাঁক করে কথা বলবার রকম পাল্টে গিয়ে, অল্প স্বল্প কিন্তু ভেবেচিন্তে, বেছে-খুঁটিয়ে কথা বলবার একটা নতুন অভ্যাস তাঁর হয়েছিল।

তাঁর আচরণে এই এত অদ্ভুত তফাৎ কেন হল? সাক্ষাৎ নিজের মা'র সঙ্গেও ভালো করে কথা না বলার কারণ কী? এইসব অনেক কথা আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম। কিন্তু কোনো নতুন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই আস্তে আস্তে গয়নার সম্বন্ধে দাদার আন্দাজই সত্যি মনে হতে লাগল। কেন না, গয়না থাকতে মাঈসাহেব সে-গয়না পরবেন না এটা আদবে সম্ভবই মনে হচ্ছিল না। তা ছাড়া, ভাবতে ভাবতে আমার হঠাৎ মনে পড়ল বৌদির মালা আর 'নগপোওা'[১] কোথাও দেখতে পাইনি তো? মাঈসাহেবের গয়নার সঙ্গে সেগুলোও অদৃশ্য হয়েছে নাকি? একমুহূর্ত ও রকম মনে হল, আবার সে-চিন্তা আমি মন থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে-চেষ্টা কি সফল হয়? একে আমার কৌতূহলী মন তাতে মনে এ-রকম চিন্তা উৎপন্ন হবার যোগ্য ঘটনা, তাই বহু চেষ্টা করেও আমার মন থেকে সেই গয়নার কথা দূরই হচ্ছিল না। এ গূঢ় ব্যাপারটা আমার কাছে সুস্পষ্ট হবে কী করে? তার মর্ম আমি জানব কবে? তার উদ্দেশ্য কী? কী উপায়ে, আর কী রকম করে খোঁজখবর নিলে ও-কথা আমি জানতে পারি?—ইত্যাদি ভাবতে ভাবতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠেও আবার সেই ভাবনা। একবার ভাবলাম বৌদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি, কিন্তু আবার ভাবলাম যে বৌদির স্বভাব আবার আলাদা রকম! খুশি থাকলে ও বলবে, নয় তো 'ও কী? সে আমি কি জানি? তুমি মাকে না হয় কর্তাঠাকুরকে জিজ্ঞেস করো,' এই উত্তর দেবে। শাশুড়ীকে সে যে বড় শ্রদ্ধা করত কিংবা তার বিষয়ে অমন কোনো কথা অপরকে বলা উচিত নয় ভেবে সে ও-রকম উত্তর দিত, তা নয়। শুধু ওর খেয়াল। মনের খুশি-খেয়াল মতো কাজ, ব্যস্‌! তাই তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভয় করত।

তবু, আমার চিন্তা দাদাকে বলব ভেবে সময় দেখে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বৌদির গয়না কী হল, তা বৌদিকে জিজ্ঞাসা করব?" প্রথমে আমার কথা শুনেও সে শুনল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তখনো ওই রকমই করল। আবার যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তখন দাদা বলল,

১ বেণীর একরকম গহনা

"তুমি পাগল হলে নাকি যমু? ওকে কিছু বলতে কিংবা জিজ্ঞেস করতে যাওয়া, আর পেত্নীকে......"

"দাদা, দাদা, ও কী কথা? তোমার জিভে যেন হাড় নেই।"[১]

"আমার জিভে হাড়? আমি যে মানুষ, আমার জিভে হাড় থাকবে কি করে?"

"থাক্ থাক্ তুমি যেন ঠাট্টা না করে কখনো কথাই বলতে পারো না। না, সত্যি বলো না, বৌদিকে জিজ্ঞেস করব ব্যাপারটা কী?'

"তোমাকে একবার বললাম তো বোন, যে ওর সঙ্গে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। ও এই রকমই! তোমার কি আজ পর্যন্ত কম অভিজ্ঞতা হল? বলো তো আমায়? ও কখনো কারো সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলেছে বলে তোমার মনে পড়ছে? যমুনা, ও হচ্ছে একটা··· থাক্‌গে। কাল পরশু দু'দিন আমি তোমার কাছে ওর নাম করেছি? না কখনো চিঠিটিঠিতে ওর বিষয়ে কিছু লিখেছি?"

"বড় ভালোই করেন কিনা আপনি? আর আমাকে বড় বড় জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হয়? এমন করতে হয়, আর তেমন করতে হয়......'পরকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান, আর নিজে শুদ্ধ পাষাণ।'[২] এই তো?"

"তাতে কী?" দাদা একেবারে শান্তভাবে উত্তর দিল, "আমি যখন আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বললাম, তখনই আপনি সে জ্ঞান অর্জন করতে আরম্ভ করলেন তো?"

"হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ, কে সে-কথা অস্বীকার করছে? আর তো বলছি যে আমকে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিলে, তেমনি বৌদিকেও দিয়ে একবার......"

"বাঃ! তুমি তো বেশ কথা শিখেছ যমুদিদিমণি, কিন্তু এখন ইয়ে করো। যখন স্বয়ং অত জ্ঞানী ঠাকুরঝি এখানে এসেছ, তখন নিজেরই 'পুণ্য খরচ'[৩] করে, চেষ্টা করে দেখাও দেখি, তাহলে ঠিক হবে। আমি তো এখন সোজাসুজি ওর মধ্যে পড়তে পারি না তাই তুমি যা চেষ্টা করবার

১ একটি মারাঠি প্রবাদ—যেমন খুশি, যা ইচ্ছা তাই বলা—এর অর্থ।

২ একটি মারাঠি প্রবাদ, অর্থ স্পষ্ট।

৩ এটিও একটি মারাঠি প্রবাদ।

তা করে দেখো একবার—যমু, তুমি এখনো মানুষ চিনতে পারনি? ওর মতো অসভ্য মেয়ে আমি তো কখনো দেখিনি……তবে……"

এমন সময়ে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে আমি দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। তবু আমার মনে হল যে সে পায়ের শব্দ নিশ্চয় বৌদির। আমরা কি কথাবার্তা বলছিলাম শুনবার জন্য সে বোধহয় সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে ছিল। দাদারও সন্দেহ তাই, কিন্তু আরো ভয়ানক। তার এমন সন্দেহ হল যে সে মাঈসাহেবের আদেশেই বোধ হয় সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে আমার সে-রকম মনে হয়নি, পরে আমি ভাবতে লাগলাম যে আমরা দুজনে সব সময় না জানি কী গল্পগুজব করি, এই মনে করে মাঈসাহেবই বৌদিকে আমাদের কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনতে বলেছিলেন। সত্যি, ব্যাপারটা কী, তা কেমন করে জানতে পারব তাই ভাবতে লাগলাম আবার। বিষম আশ্চর্য মনে হল আর বারবার ভাবতে লাগলাম যে এ কী ব্যাপার? আমাদের বৌদির স্বভাব বুঝতে পারব কখন? সত্যি কি সে শাশুড়ীর আদেশেই নিজের স্বামী আর ননদ, তার শাশুড়ীর সম্বন্ধে কী বলছে তাই শুনে তাকে বলবার জন্য সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল?

এই ভেবে আমি সে-কথা দাদাকে বললাম। অমনি হেসে দাদা আমাকে বলল, "তুমি কি ভাবছ যে সত্যি ব্যাপারটা জানা বড় কঠিন কাজ? আহা, ওসব ভালোই হোক আর মন্দই হোক, ও যদি একেবারে গোপনে রাখতে পারত তাহলে অমন মানুষকে অসভ্য কে বলত? ও কী কী শুনতে পেয়েছে তা আমরা পরেই শুনতে পাব। এমন মানুষের মনে কিছু চাপা থাকতে পারে না।"

"তা তো সত্যি, ও যদি আমাদের এই গয়নার বিষয়ে কথাবার্তা মাঈসাহেবকে গিয়ে বলে, তা হলে কী হবে?"

"তাতে কী? যাই হোক না কেন, তোমার মতে কি সেখানে কারো কোনো উপায় আছে? না, ও যদি মাঈসাহেবের আদেশেই এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে গিয়ে নিশ্চয় বলবেই। তুমি যদি ওকে কম বেশী কিছু বলো, তা হলে শুধু শুধু বোকামি করা হবে। এ ছাড়া আমি তো অন্য কোনো অর্থ দেখতে পাচ্ছি না।"

"তুমি ভারি ইয়ে করো", আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "মনে হচ্ছে

না যে বৌদি অত অসভ্য। আর তাতেও যদি নিজের শাশুড়ী থাকত তাহলে কথা ছিল আলাদা।"

"আচ্ছা বেশ, দেখবে, বুঝবে। আর আমিই বা কেন বলব? ধরে নাও না ছুটিতে তুমি এখন এখানে যেমন আছ, ও-ও তেমনি আছে। বিবেচনা করে দেখো। তোমার শিক্ষায় ওর অসভ্যতা অল্প একটুও যদি কম হয়, তা হলে তুমি যা বলবে তা শুনব, জানো? তুমি তার কিছু জানো..."

"আহা, আর তুমিই বা কী জানো? ওর এখনো বয়স কম। এখন ও হয়তো বুঝতে পারে না, তাই বলে ও যে কক্ষনো ভালো মেয়ে হবে না—আর 'ও যদি ভালো হয়, তা হলে তুমি যা বলবে তাই শুনব'—বলার মতো কী হল? তুমিই বা ওর স্বভাব কখনো বুঝতে পেরেছ?"

"কিন্তু এখন আর এ নিয়ে কথা কাটাকাটি কেন? দেখে বোঝো আর তারপর বোলো—বলছি তো তোমাকে।" এই বলে একটু থেমে ও আবার তাড়াতাড়ি আমাকে বলল, "যমু, কিন্তু দুর্গার বাড়ির সব খবর আমায় দাওনি। আমার বড় আশা ছিল যে তুমি এলে আমি সব কিছু জানতে পারব।"

এ-কথা জিজ্ঞাসা করার সময় দাদার উৎকণ্ঠা দেখে, আর মুহূর্ত আগে বৌদির বিষয়ে কথা বলবার সময়কার তার উদাসীনতা দেখে আমার কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। আমি তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তাড়াতাড়িতে শুধু এই বললাম, "বলিনি তো কী হয়েছে?—ও বেচারির আর বলবার মতো কী আছে? ও যেমন আছে, তেমনি আছে।"

"তা নয়, তুমি বলেছিলে যে ও তার খোকাকে বড্ড......"

"বেশ তো, তুমি সবই জানো। আবার কী বলব?"

এই রকম করে আমি সে-কথা উড়িয়েই দিলাম। দেখতে পেলাম যে তখন দাদার মনে কষ্ট লাগল। কিন্তু ততক্ষণে আমি সেখান থেকে উঠে গেলাম।

সার কথা, দু-চার দিন পরে বড় মজার ঘটনা ঘটল। কোনো কোনো ঘটনা তো ভারি বড় অদ্ভুত, একেবারে অবাক হবার উপযুক্ত ছিল, আর আমরা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার তো অস্ত কিছু ভালো

লাগছিল না। শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ নিতে আসেনি। আমিও নিজে থেকে যাব কিনা ভাবছিলাম। ঠাকুমাকে দেখতে যাবার জন্ত কী উপায় করব তাও ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাঁকে দেখতে আমি তো ভয়ানক উতলা হয়েছিলাম। মোটের উপর মন একেবারে অস্থির হয়েছিল তবু আবার ভাবতাম যে ওঁকে বাড়িতে শংকর ঠাকুর আর দিদিশাশুড়ীর মুখের কামানের সামনে রেখে নিজে চলে যাওয়া ভালো নয়। দ্বিতীয়ত, মনটা আবার বলত যে আমাকে যেমন সকলে সর্বক্ষণ জ্বালাতন করে, সে-রকম তো ওঁকে করবে না? এ রকমে নানাপ্রকারে মন দোলা খাচ্ছিল, কিন্তু ঠাকুমাকে দেখতে যাবার ইচ্ছা কম হচ্ছিল না, কিন্তু সে ইচ্ছা সফল হবে কেমন করে?

বাবা আজকাল একেবারে মৌনব্রত নিয়েছিলেন। যা কখনো দু-একটা কথা বলতেন তা শুধু মাঈসাহেবের সঙ্গে। আমি এতদিন পরে এসেছিলাম, তবু প্রথম দিন শুধু একবার বললেন, "কেমন, যমু দিদি, ভালো তো?" এই বললেন। তারপর একটি অক্ষরও বলেননি। এত বড় হয়েও বাবার কাছে নিজে থেকে কোনো কথা পাড়বার সাধ্য আমাদের ছিল না। আমি আসামাত্র দাদা ঠাকুমাকে চিঠি লিখে খবর দিয়েছিল। তাই যদি তিনি চিঠি দিয়ে আমায় সেখানে যেতে লিখতেন, তা হলে সে একটা সম্ভব ছিল। কিন্তু তেমন কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম না! এখানে বাপের বাড়ি থেকে দূরে থাকার কোনোই তাৎপর্য ছিল না। কেন না, আমি নিজে থাকতে পারতাম না, আর উনি যদিও বলেছিলেন যে, বাপের বাড়িই থেকো, বাপের বাড়িই থেকো, তবু আমি গাঁয়ে থাকলে উনিও একলা থাকতে পারতেন না। আমি নিশ্চয় জানতাম যে দু-চার দিনের মধ্যে দাদার সঙ্গে না হলে আর কারো হাতে আমাকে চিঠি কিংবা আসতে খবর পাঠাবেন। তাই আমি ভাবছিলাম যে, আর দু-চারদিন এ-বাড়িতে থেকে নিজেই শ্বশুরবাড়ি চলে যাব। ঠাকুমার নিজের এখানে আসা মোটেই সম্ভব ছিল না। কেননা, ঠাকুরদার শরীর দিনে দিনে ক্ষীণ হচ্ছিল। তাঁর যে বিশেষ কোনো অসুখ ছিল, তা নয়। বুড়োবয়সেরই অসুখ। কিন্তু এমন সময় কাছে নিজের মমতার মানুষ কেউ না থাকলে কি চলে? আমাদেরও ইচ্ছা ছিল না যে, ঠাকুরদাকে ছেড়ে তিনি আসেন। মোট কথা, আসবার হলে ঠাকুমারই চিঠি আসত আমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্ত, তা ছাড়া

অন্য কিছু সম্ভব ছিল না! দাদা নিজে থেকে বাবাকে কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করত না, আমিও করতাম না। আর মাঈসাহেবকে বিনতি করে জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া?—তাঁর সঙ্গে আমাদের বড় ভাব কিনা!

ঠাকুরদার বাড়ি যাবার আয়োজন

মানুষের মনের সব ইচ্ছা সফল হয় না এ-কথা যেমন সত্যি, তেমনি যে ঘটনা ঘটুক—এমন ইচ্ছা যদি মনে থাকে তেমন অনেক ঘটনা ঠিক সময়ে ঘটে যায়ও। অন্ততঃ আমার মনের সেই ইচ্ছা—মানে ঠাকুমা যেন বাবাকে চিঠি দেন আর আমি যেন ঠাকুমার ওখানে যেতে পাই এই ইচ্ছা—পূর্ণ হল। শুধু তাই নয়, স্বয়ং ঠাকুরদার চিঠি এল যে 'চিরঞ্জীব গণুর এখন ছুটি, চিরঞ্জীব সৌভাগ্যবতী যমুও এখন ওখানে আছে, তার শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করে ওকে আর নাতবৌকেও কয়েকদিনের জন্য এখানে পাঠিয়ে দিও। আমার শরীর কিছু ভালো আছে। কয়েকদিন ছেলেমেয়েরা এখানে এলে তাদেরও আনন্দ হবে আর আমারও সন্তোষ হবে।' এই মর্মে চিঠি যখন এল তখন বাবা সেটা দাদার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, আর তার সঙ্গে একটা চিঠি যে 'তোমার আর যমুর যেতে ইচ্ছে থাকলে ওর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিতে রাজি আছেন কিনা দেখে এসো।' ঘরের ভিতরেই বাপ-ছেলেতে চিঠি লেখালেখির ব্যাপার আমি এই প্রথম দেখলাম, আর আমার বড় হাসি পেল। ঘরে থাকতে বাবার অমন চিঠি পাওয়া দাদারও এই প্রথম, কিন্তু তার হাসি পায়নি। বরং সে মনে করল যে প্রত্যক্ষ কথা বলার চেয়ে এই ভালো। চিঠি পেয়ে ও ঠিক করল যে দুপুরে সে ও-বাড়িতে যাবে।

কিন্তু যাবে কোথায় আর কাকে জিজ্ঞাসা করবে তা সে আর আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমরা সেই কথাই ভাবছিলাম, এমন সময় দাদা আমাকে বলল, "যমু, আমি রঘুনাথ রাওকে বলব যে আপনি চলুন আমাদের গ্রামে? তিনি আসবেন? যদি আসেন তাহলে বড় সুন্দর হবে। তুমি, আমি, তিনি বসে গল্প করব, নইলে সকালে বেড়াতে যাব, কেমন? ঠাকুরদা কিছু বলবেন না, বরং খুশিই হবেন।"

"শুধু তিনজন কেন বলছ দাদা? চারজন বলো। বৌদিও আসছে। ওকে ঠাকুরদা যেতে লিখেছেন।" আমি শুধু তার মনে ঠেকবে এমন সুরে ও-কথা বললাম, আর দেখতে পেলাম যে কথাটা তার বুকে বাজল।

ও তক্ষুণি বলল, "যমু, আমি একটুও দুষ্টুমি ভেবে ও-কথা বলিনি। তুমি কেন অমন কথা বলছ, বলো তো ভাই? তিনি যদি আসেন তাহলে সত্যি মজা হয় না?"

দাদা ও-কথা সর্বান্তঃকরণে বলেছিল বুঝতে পেরে ও-রকম খুঁচিয়ে কথা বলার জন্য আমার বড্ড দুঃখ হল। কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করা মানুষের স্বভাবে সয় না, এ-কথা যারা বুঝেছে তারা নিশ্চয় আমি ভুল স্বীকার করতে অনেকক্ষণ প্রস্তুত হইনি বললে আমাকে দোষ দেবে না।

দুজনে সে-বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করে ঠিক হল যে আমি সেদিন বিকেলবেলা শ্বশুরবাড়ি যাব আর তার পরের দিন সকালবেলা দাদা ঠাকুরদার সেই চিঠি নিয়ে সোজা গোপাল ঠাকুরের কাছে যাবে। প্রথমেই আর কারো কাছে গেলে আমাকে পাঠিয়ে দেবার কথা দূরে থাক, যাচ্ছেতাই কথা বলে সবাই টীকা করবে। তাই উপরে যেমন লিখেছি, সে রকম যুক্তি করে নিজের উদ্দেশ্য সফল করাই উচিত। এও ঠিক করা হল যে চিঠির কথা আমি যেন ওঁকে বলে রাখি। বিকেলে মাঈসাহেবের অনুমতি নিয়ে আমি শ্বশুরবাড়ি গেলাম। রাত্তিরে ওঁর সঙ্গে দেখা হলে সব কথা ওঁকে বললাম। শুনে উনি বললেন, "বাঃ! চার-পাঁচদিনে অনেক ষড়যন্ত্র করে নিজের ইচ্ছেমতো সব গুছিয়ে নিয়েছ, দেখছি! কিন্তু আমি বাপু যেতে দেব না। তোমাকে ছেড়ে আমার এক দণ্ডও ভালো লাগে না। এই চার-পাঁচ দিনে বেশ টের পেয়েছি।"

"আহা! সব মিথ্যে কথা। তা হলে একবার তবু তো আসতে ওবাড়ি, দাদার নাম করে? তাহলে কেউ নিশ্চয় নিন্দে করত না।"

"সত্যি, চার-পাঁচবার ভেবেছিলাম যে তোমার দর্শন নিতে যাই। কিন্তু কী উপায়? এখানে বাড়িতে জানতে পেলে সকলে ছিঁড়ে খেতো। তুমি যাওয়া অবধি বাড়িতে কী কী হয়েছে তা তুমি তো জানো না। শংকরঠাকুরের সব…"

"কী? কী? কী হয়েছিল?"

"হবে আবার কী? স্ত্রী বেচারীর উপরে যত রাগ! পরশু রাতে বুঝি বেচারীর জ্বর হয়েছিল। তাই সকালবেলা ওঁর পূজো-আহ্নিকের আয়োজন প্রস্তুত রাখতে বেচারী সকাল সকাল ওঠেনি। অমনি এঁর মেজাজ গরম হল! আর গালাগালি দিতে শুরু করলেন, 'লাথি মারবো, জানো না

এখনো? পুজোর আয়োজন এখনো করোনি মানে কী? এখন কি তোমার বাবা আসবেন নাকি আয়োজন করে দিতে?' "

"ওমা! আর? মারলেন নাকি ওঁকে গিয়ে?"

"ঝাঁ করে থেয়ে গিয়েছিলেন। এক চড় বসিয়ে দিয়ে, হাত ধরে টান মেরেছিলেন, এমন সময় গোপাল মামা আর আমি ছুটে গেলাম, তাই রক্ষা। গোপাল মামা ওঁকে খুব বকলেন। তখন তাঁকে কী বলবার সাধ্য? কিন্তু আমার উপরে গর্জন করতে লাগলেন, 'খবরদার বলছি, ফের যদি আমার সামনে আসবি। নির্লজ্জ কোথাকার! লজ্জা করে না? আমার বয়েস কত আর তোর কত? ভারি এসেছেন মেয়েদের পক্ষ-সমর্থনকারী, মুরুব্বি! ওকে আমি জুতিয়ে মারব। তুই কে রে? 'পায়ের চটি পায়েই মানায়!'[১] কাল যদি আমার পুজোর...জ্বর হয়েছে! কিসের জ্বর?...কিন্তু তুই মাঝে পড়তে এলি কেন? আমি কি তোর সমান নাকি? কী—কী যে হয়েছে লক্ষ্মীছাড়া, বেটাচ্ছেলেরা! ওরে বাবা, তুই তোর বৌকে নিয়ে যা খুশী কর! এ রাজত্বে 'কারো পাপোষ কারো পায়ে নেই।'[২] আমি হলাম গিয়ে তোর বড় মামা! ছোটবেলা থেকে তোকে মানুষ করেছি—কিন্তু তুই যদি এ-রকম করতে আরম্ভ করিস, তাহলে করব কী? চুপ করেই তো বসব? এই যদি পেশবাদের রাজত্ব থাকত—কিন্তু উপায় কী? তুই এখন নিজের স্ত্রীকে সাহেবের কাছেও যদি পাঠিয়ে..."

"দাদা, ও কী কথা বলছ?" গোপালঠাকুর বললেন। আমার সমস্ত গা জ্বলে উঠেছিল। সে সময়টাই এমন ছিল যে শংকরমামাকে যাচ্ছেতাই বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম, কিন্তু গোপালমামার দিকে চেয়ে দেখলাম; আর ততক্ষণে মা ডাকলেন। ভালো তো ভালো, দিদিমা ছিল না। কোথায় যেন তুলসীবাগে গিয়েছিল। কিন্তু ঝগড়া যদি খুব জোরে বেধে যেত, তবে—আজ আমরা বোম্বাইয়ে থাকতাম!

"ওমা! কী অদ্ভুত!" আমি শুধু এই বললাম।

"আহা! অদ্ভুত তো এর পরেই রয়েছে! তখন অত চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বললেন, আর সন্ধ্যেবেলা কতগুলো ওষুধ লিখে এনে, ফুটিয়ে

১ একটি মারাঠি প্রবাদ। এর অর্থ স্পষ্ট।

২ একটি মারাঠি প্রবাদ। মানে—সব গণ্ডগোলে থাকা।

কাথ বের করে মামীমাকে খাওয়াতে বসলেন। শুধু খাওয়াতে বসেন নি, নাছোড়বান্দার মতো সেই এক কথা ধরে রইলেন। গোপালমামা কুইনিনের বড়ি দিয়েছিলেন, সেগুলো 'ডাক্তারের ওষুধ চাই নে' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, নিজে উনুনের পাশে বসে সে ওষুধগুলো ফোটাতে লাগলেন। আর শুনলাম যে সেই কাথ নিয়ে গিয়ে উমা মামীমাকে খেতে অনুরোধ করছিলেন। আমাকে আর কিছু বলতে আসেন নি। কিন্তু ভেবেছিলাম যে দু-এক দিনে আমাকে 'তুমি যাতে ভালো হও তাই জন্যেই তো তোমায় ওকথা বললাম' বলতে আসবেন। হ্যাঁ! ওর কোনো অর্থই নেই।"

এই ঘটনার বর্ণনা শুনে তখন আমার মনে কী হল সে কথা আলাদা! কিন্তু এখন সে-সব সমস্তটা মনে করে আমি লিখছি, আর এসব পড়ে পাঠকরা কী মনে করবেন এই ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। শংকরঠাকুর ব্যক্তিটি ছিলেনই বা কী রকম? এটা অনেকে নিশ্চয় একটা গূঢ় রহস্য মনে করবে।

এই রকম কথাবার্তা যখন শুরু হল, তখন আমাদের যাবার কথা রইল দূরে, আর আমরা শংকরঠাকুরের দোষগুণের আলোচনা করতে করতে অবাক হলাম। এ-জঞ্জাল টিকে থাকলে এখানে আবার আসব না ঠিক করে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। আমি এও বুঝতে পারলাম যে ওঁরও আমাদের সঙ্গে যাবার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু যাবেন কী করে? কোনো উপায় খুঁজে যদিও যেতেন, তবু মাকে নিতে ওঁকে ফিরে আবার আসতে হতই।—নাঃ, ওঁর যাওয়া হবার নয়! সম্প্রতি সেটা অসম্ভব ছিল। কিন্তু উনি ভারি খুশী হয়েছিলেন ওঁকে যেতে বারবার মিনতি করেছিলাম বলে।

তার পরের দিন দাদা এসে গোপালঠাকুরকে চিঠিটা দিল। চিঠি পড়ে তিনি তক্ষুণি বললেন, "ঠিক, মাকে বলে ব্যবস্থা করছি। তুমি নিজে যাচ্ছ তো? যাও চার দিন। ওর যেতে ইচ্ছে আছে তো?"

দাদাও অমনি বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা যদি পাঠিয়ে দেন।"

দাদার কথা শেষ হতে না হতেই গোপালঠাকুর তাড়াতাড়ি বললেন, "পাঠাব না কেন? যতদিন ওঁরা দুজন বেঁচে আছেন তত দিনই তো। বেশ, তুমি যাও, আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

তাঁর এ-রকম আশ্বাস পেয়ে দাদা একেবারে খুশি হয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করেই বাড়ি চলে গেল। গোপালঠাকুর যখন সেই চিঠিখানা দিদিশাশুড়ী, আমার শাশুড়ী আর শংকরঠাকুরকে পড়ে শোনালেন তখন কী কী রকম হল, "ওকে পাঠানো না পাঠানো এখন আমাদের হাতে কী? ওর স্বামী ওর শাশুড়ী যা খুশী করুক"—ইত্যাদি একঘেয়ে কথা কতবার শুনলাম। আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে মিনতি করবার জন্য নিজে না এসে বাবা অতটুকু খোকাকে পাঠিয়ে দিলেন, তাতে নাকি বাবার অহংকার দেখা গেল, আর তিনি নাকি আমাদের পরিবারকে তুচ্ছ মানেন বলে কত রকম নিন্দে শুনতে পেলাম। শেষে গোপালঠাকুর আমাদের পক্ষ নিয়ে বললেন, "ওসব ধরো না হয় সত্যি! তবু তাতে মেয়েটির কী দোষ? ওকে যেতে বাধা দাও কেন? সে কিছু নয়, ওর যাবার আয়োজন করে দাও।" তাই শুনে দিদিশাশুড়ী তাঁকেও বেশ অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন। শংকর-ঠাকুরের কত বিচ্ছিরি কথা শুনতে হল। তবু এত সব হয়ে শেষে আমরা যাব ঠিক হল, সব কথা এখন আর আমি বিস্তৃত বলতে বসছি না। তেমনি, আমাদের যাবার ঠিক হল আর তার আগের দিন রাত্তিরে ওঁর সঙ্গে আমার কী কী কথা হল, তাও আমি বলতে বসছি না। আমি যাব বলে ওঁর আর আমারও কত মন কেমন করল। "মে মাসের ছাব্বিশ তারিখের পরে এক মুহূর্তও ওখানে থেকো না। আর বার বার চিঠি দিও। এখন তুমি বেশ সুন্দর লিখতে পার।" এ-কথা আমাকে কতবার যে উনি সর্বান্তঃকরণে বললেন—যেন আমি কত দূরে, কত কঠিন প্রবাসে যাচ্ছিলাম, আর সেখানে কী যে হবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আমার মনে হচ্ছে যে আবার কবে দেখা হবে তার ঠিক নেই, আর নিজের স্ত্রী অন্ততঃ পাঁচ-সাত হাজার ক্রোশ দূরে যাচ্ছে, এমন অবস্থায়ও বোধ করি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে এত বুক ভরে, সতর্কভাবে, বারবার করে সাবধানে থাকতে আর চিঠি লিখতে বুঝিয়ে বলে না! আমিও সেই কথাই বললাম, আর আমার চোখে জল এল, এতে কিছু আশ্চর্য নেই। কেন না, সে তো আমার ধর্মই ছিল। কিন্তু ওঁর প্রেম আর ভালোবাসা কিছু বিশেষ রকমের ছিল।

শেষে যেমন তেমন করে আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে ঠাকুমার বাড়ি যাবার উদ্দেশে বেরোলাম। এদিকে দাদাও তৈরি ছিল, আর বৌদিরও যাবার

আয়োজন চলছিল। কিন্তু দেখলাম যে বৌদির আমাদের সঙ্গে আসার সম্বন্ধে দাদা একেবারে উদাসীন ছিল। বরং তার কোনো কোনো কথার ভাবে বুঝতে পারছিলাম যে সে ভাবছিল যে বৌদি যদি আমাদের সঙ্গে না যায় তা হলেই ভালো হয়। কিন্তু আমার অতিশয় ইচ্ছা ছিল যে সে যেন আমাদের সঙ্গে যায়! কেন না, আমি ঠিক করেছিলাম যে বৌদিকে পরীক্ষাই করব সে সত্যি সত্যি কেমন!

এখন থেকেই দাদার মন ওর বিষয়ে যদি পূর্বধারণায় দূষিত হয়, তাহলে পরে ওদের দুজনেতে মিল হবে কেমন করে। আর তেমন মিল যদি না হয়, তা হলে দুজনেরই কী সুখ? বাড়িতে ভবিষ্যতে মাঈসাহেব আর দাদাতে যে কতদূর বনবে তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছিল। তখন, তার যদি কোনো সুখলাভের আশা থাকে, তা হলে অন্য কোথাও চাকরি টাকরি নিয়ে দূরে থাকলেই যা কিছু আশা ছিল।

এই অবস্থায়, তার আর তার স্ত্রীর এখন থেকেই—এখনো তাদের কোনো সম্বন্ধ যখন নেই—যদি না বনে, তা হলে কোনো কৌশলে যাতে দু'জনের মিল হয় এমন কিছু করা দরকার। সে রকম কোনো উপায় করা কিংবা বৌদির স্বভাব সত্যি কেমন ছিল তা জানতে পারার সুবিধা পুণার চেয়ে আমাদের গাঁয়েই বেশি এটা একেবারে নিশ্চিত। তাই বৌদি আমাদের সঙ্গে আসুক এই ইচ্ছা আমার কন ছিল তাও স্পষ্ট। তবু আমার ভয় করছিল, না জানি মাঈসাহেব আবার হঠাৎ কী ব্যাঘাত উপস্থিত করেন। কিন্তু যে কারণে তিনি অন্য সব কিছুতে উদাসীন থাকতেন, সেই কারণেই বোধ হয়, এতেও মন দেবার ইচ্ছা তাঁর হয় নি। অন্য কোনো কারণ তাঁর মনে থাকলে তিনিই জানেন, কিন্তু আমাদের কারো যাবার কথায় তিনি বাধা দিলেন না। বাবা আমাদের সঙ্গে একজন চাকর দিলেন, আর শেষে আমরা তিনজন আমাদের গ্রামে রওনা হলাম।

ঠাকুরদার বাড়ি

ছেলেবেলায় যে-জায়গায় আমরা খেলাধুলো করেছি, কিংবা বহুকাল কেটে গেলেও মনে থাকবে এরকম ঘটনা যে জায়গায় ঘটেছে এমন জায়গা অনেক বছর পরে আবার দেখলে মনের কী রকম অবস্থা হয়, তা যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তারাই বুঝবে। কিংবা অন্য কেউ বর্ণনা করলে তারাই তার মর্ম বুঝতে পেরে মাথা নাড়বে। সারা দেশময় কত সংস্কার হয়ে রেলগাড়ি ইত্যাদি হল, কিন্তু আমাদের গাঁয়ের রাস্তাটা চিরকাল যেমন ছিল ঠিক তেমনি রইল। কোনো রকমের পরিবর্তন হয়নি। তাই আগের বারের দেশযাত্রার পথের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে, আমি আর দাদা পরস্পর সে কথা বলে হাসতে হাসতে, আর মাকে মনে পড়ে দুঃখপূর্ণ কথা বলতে বলতে গাঁয়ের পথে এগিয়ে চললাম। মাঝে একবার দাদার সেই পথ ভোলার কথা বলে আমি সহজভাবে বৌদিকে বললাম, "তোমার স্বামী এই রকম গুণবান, জানো বৌদি?" তক্ষুনি নির্ভীক ভাবে দাদার দিকে চেয়ে বৌদি বলল, "আমার মতো অসভ্য গাধাকে কেন ও-সব কথা বলছ ঠাকুরঝি? আমি একটা আস্ত গাধা।" এ-কথা বৌদি কোন প্রসঙ্গের সূত্রে বলেছিল তা আমি তক্ষুনি বুঝতে পারলাম; কিন্তু বাইরে তা দেখাবো কেন? আমি যেন কিছু বুঝিনি, এই ভাবেই বললাম, "কেন? তুমি অসভ্য বা আস্ত গাধা হতে যাবে কেন? আমাদের মতোই তো বেশ তুমি। মন্দ কিসে হলে?"

"আহা! তার জন্য কি কিছু হওয়া দরকার? মোটেই না। ওটা মানুষের একটা স্বাভাবিক ভাব জানো? আর জানো ঠাকুরঝি, আমি কক্ষনো ভালো মেয়ে হব না।"

দাদা স্বয়ং আমাদের কাছেই গাড়িতে, এ-অবস্থায় বৌদিকে বেশ নির্ভীক ভাবে তাকে আর আমাকেও খোঁচা মেরে কথা বলতে দেখে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমি তাঁর স্বভাব পরীক্ষা করব ঠিক করেছিলাম কিনা! চার দিন আগে আমরা দু'জন এক জায়গায় বসে যে কথাবার্তা বলেছিলাম তা বৌদি শুনেছে, আর ঠিক মনে রেখে উপযুক্ত সময় দেখে, মোটেই ভয়

না করে, স্পষ্ট বলে ফেলল! এ কী অজ্ঞান অবুঝপনার লক্ষণ না অন্য কিছু, এমন প্রশ্ন মনে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? আমার তো তার এখনকার আচরণ দেখে মনে হল যে সে অতিশয় চাপা স্বভাবের মেয়ে আর ওর মনে নিশ্চয় অনেক কিছু আছে। আমাদের এত সব কথাবার্তায় দাদা একটুও মন দেয়নি। বরং বৌদির সেই শেষের কথা শুনে সে গাড়ি থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে পায়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। আমি তাকে কত বারণ করলাম কিন্তু সে কি আমার কথা শোনে! দাদা নেবে যাওয়াতে শুধু আমরা দু'জনই গাড়িতে রইলাম। চাকর আগে থেকেই হেঁটে চলেছিল।

এই সুযোগটা ভালো দেখে বৌদিকে বললাম, "বৌদি, তুমি তো এখন আর ছোট নও? তুমি এটুকু বুঝতে পারো না যে জীবনে তোমার সহায় দাদা, দাদার সহায় তুমি? তোমাদের পরস্পরের সহায় অন্য কেউ নেই যে।"

"ওমা! আমি এমন একটা আস্ত গাধা মেয়ে, ও-কথা কেমন করে বুঝব ঠাকুরঝি? এ কী কথা তুমি আমায় জিজ্ঞেস করছ?" বৌদি আমাকে খোঁচা মেরে বলল।

আমি তার কথা শুনেও শুনলাম না। আবার তাকে বললাম, "দাদার মন কেমন তা তুমি জানো না। আর মাঈর কথায় তুমি আড়ালে আড়ি পেতে আমাদের দুজনের কথা শুনতে দাঁড়ালে?"

সে-কথা শোনামাত্র ভ্রূকুটি করে, চোখ বড়ো করে বৌদি আমায় বলল, "কী? কার কথায় দাঁড়িয়েছিলাম, আর কোথায়?"

"সে-দিন দাদার ঘরে বসে আমরা কথাবার্তা বলছিলাম, তখন সিঁড়ির উপরে তুমি দাঁড়াও নি? কে তোমায় ওখানে দাঁড়াতে বলেছিল? মাঈ-সাহেবই তো?"

"যার কথায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম বলে তুমি ভাববে, তারই কথাতে দাঁড়িয়েছিলাম, তবে তো হল?"

"সেটা কি ভালো? কী কী শুনতে পেলে তুমি সেদিন?"

"যা শুনলাম তাই!"

"গিয়ে সব মাঈসাহেবকে বললে তো?"

"হ্যাঁ, তুমি যখন ভাবছ যে তিনিই আমায় ওখানে দাঁড়াতে বলেছিলেন সে-কথা শুনতে, তখন না বলে কি থাকতে পারি?"

এ সব উত্তর অবুঝ মানুষের নিশ্চয় নয়! এটুকু তো স্পষ্টই বুঝলাম। এইটুকু বোঝামাত্র—ও যদি অমন মূর্খ, অবুঝ নয়, তাহলে ব্যাপার কী—এই প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল, তাই সে রকম আমার অবশ্যই মনে হল। তা ছাড়া আমার আরও মনে হল যে হয়তো সেদিন বৌদি মাঈসাহেবের আজ্ঞায় আমাদের কথা শুনতে দাঁড়ায়নি। এই বিষয়েই আমি ভাবছিলাম। দাদা এগিয়ে চলছিল, হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলল, "যমু, ওই দেখলে গাছগুলো? এই যে ঝোপ? এখানে কী হয়েছিল মনে আছে? আবার ওরকম একটা মানুষ আসবে, জানো?" এই বলে সে জোরে হেসে উঠল। আমিও হেসে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। সে দিনের সেই সব ঘটনা মনে পড়ে আমার এখনও কিঞ্চিৎ ভয় করতে লাগল।

এমনি করে আমরা আমাদের গাঁয়ে গিয়ে তো পৌঁছুলাম। একেবারে সন্ধ্যাবেলায় আমরা পৌঁছেছিলাম। তাই ঠাকুমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়া আর কিছু হল না। ঠাকুরদাকে দেখে আমার মন হুহু করে উঠল। তিনি ভয়ানক রোগা হয়ে গিয়েছিলেন, তবু স্পষ্ট কথা বলার ক্ষমতা তাঁর কমেনি। ঠাকুমাও তাঁর ভাবনাতেই হয়তো, কিংবা কী জানি আরো অনেক ভাবনায়—একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা তিনজনে সেখানে যাওয়ামাত্র তাঁর যে কত আনন্দ হল, তা কি আর বলতে হবে?

বৌদি সেখানে এই প্রথমই এসেছিল। তাই তার কেমন মনে হচ্ছিল কী জানি! আমাদের কিন্তু বড্ড আনন্দ হল। শুধু এইটুকু কমতি ছিল যে উনি সঙ্গে এলেই বেশ হত। তাহলে আমাদের সুখের কিছুই ঘাটতি থাকত না!

ছেলেবেলার কত কথা আমাদের মনে পড়ল! সেই কুশী? এখন সে কোথায়? তার বিয়ে হয়ে সে তার স্বামীর সঙ্গে হৈদ্রাবাদ পেরিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল, সেখানে তার স্বামী চাকরি করত। তার চারটে ছেলেপুলেও হয়েছিল। তেরো বছর বয়সেই তার প্রথম সন্তান হয়। আর সেই অমুক কোথায়? প্রসবকালে বায়ুর তড়কাতে সে মারা গিয়ে চার বছর কেটে গেছে। আর সেই তমুক? তার স্বামী মারা গিয়ে, সে এখন তার দেওরের বাড়িতে রান্নাবান্না করে দিন কাটায়।

এই রকমে আমার ছেলেবেলার পরিচিত সেই গ্রামের সব মেয়েদের খোঁজখবর নিলাম। সে-সব সংবাদ শুনে আমার মনে নানারকমের কী সব

ভাব জাগছিল, আর তাদের প্রত্যেক জনের খবর শুনে আমি কী কী ভাবলাম সে সব যদি লিখতে বসি, তাহলে এই পরিচ্ছেদটি কত লম্বা হবে তার ঠিক নেই। তা ছাড়া সেসব কথা জেনে কারো কোনো লাভ আছে বলেও মনে হচ্ছে না। আমার বোম্বায়ের দুজন বন্ধু, উনি নিজে, আর কখনো কখনো দাদা আমাকে যে সব উপদেশ দিয়েছিল, তার ফলে আমার মনের গঠন যে রকম হয়েছিল, তার অনুরূপ চিন্তাই আমার ছেলেবেলার বন্ধুদের খবর জেনে আমার মনে জাগল, এইটুকু বললেই বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয় বুঝে নেবেন। কোনো মেয়ে ছোট—মানে বালিকা থাকতেই বিধবা হলে তার······কিন্তু থাক সে কথা। আমার সে-কথা শেষ পর্যন্ত লেখা সহ্য হবে না। তাই এরি মধ্যে সে ব্যাপারে না পড়াই ভালো। এই জীবন কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত আমার হাতে লেখা হলে—সব কথা তাতে পরে আসবেই। অদৃষ্টের কথা যখন লিখতেই বসেছি, তখন সে কথা এড়াতে যাব কেন? কিন্তু এখন আর এগোতে পারছি না, তাই এই পরিচ্ছেদটি এখানেই শেষ করি।

বৌদিতে দাদাতে মিল হবে কেমন করে ?

বৌদি আর দাদাতে মিল হবে কেমন করে ? এই হেঁয়ালি সমাধান করতে কী উপায় করব তাই ভাবছিলাম। আমার প্রায় নিশ্চিতভাবেই মনে হচ্ছিল যে ওকে নির্বোধ ভাবা আমাদের একটা ভুল, তবে ওর স্বভাব কেমন এ প্রশ্নটা উপস্থিত হতে বাধ্য। ও তো এখন আর ছোট ছিল না ? (আর আমার মনে হল যে অন্ততঃ বুঝবার-সুঝবার কাজে বৌদি মোটেই ছোট ছিল না—নিদেন আমাদের হিন্দু ধারণা অনুসারে ছোট ছিল না।) আমার বড় আশ্চর্য মনে হত যে দাদার সে আর তার দাদা ছাড়া, অন্য কেউ তাদের আপন বলবার ছিল না, এটা সে কেন বুঝত না। আর তাই আমার ইচ্ছা ছিল যে আমরা তিনজনে ঠাকুমার বাড়ি গেলে আমি বৌদিকে দু'কথা বুঝিয়ে বলব ; সে-কথা তো আমি আগেই বলেছি। কিন্তু এখন সে-কাজ আরম্ভ করব কেমন করে, তাই আমি বুঝতে পারছিলাম না।

আমি অল্প অল্প অনুভব করতে লাগলাম যে বৌদিকে কিছু বললে সে ভালো করে উত্তরই দিত না। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করলে সে তক্ষুনি কপাল কুঁচকে আর মুখ হাঁড়ি করে শুধু—"আমি কী জানি ?" এই উত্তর দিত। তার মুখে আনন্দের আভা আমি কখনো দেখতে পাইনি। সন্তুষ্টি তো যেন তার পাড়াতেই ছিল না। বাপের বাড়ি থাকবার সময়ে এ-সব আমি ততটা দেখতে পাইনি। কেন না, একে তো আমি ও-বাড়িতে অল্পদিন থাকতাম, আর তা ছাড়াও আমি সেখানে থাকবার সময়ে প্রথম প্রথম ও 'নতুন বৌ' হয়েই কিছুদিন কাটাল। তা ছাড়া শাশুড়ী নিজের নয়, সৎ শাশুড়ী বড় জ্বালাতন করে, তাই বোধ হয় ওর রকম অমন ; এই কল্পনাতেই কিছুদিন কেটে গেল। কিন্তু এখন তো তেমন কিছু ছিল না, তবুও ওর আচরণ ওই রকমই ছিল। তা হলে ব্যাপার কী ? মানে ওর মূল স্বভাবেই বোধ হয় কোনো দোষ আছে এটা স্পষ্ট হল।

দেখলাম ঠাকুমাও বোধ হয় এ-কথা লক্ষ্য করেছিলেন। কেন না, একদিন কথাবার্তা বলতে বলতে তিনি দাদাকে বললেন, "গণু, তুই বাবা বউ ভালো

পাসনি। তোর কী যে হবে তাই ভাবছি।" কিন্তু আমি জানতাম যে কাছেই, দেয়ালের অপর পাশে বৌদি দাঁড়িয়েছিল, তাই আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "ভালো নয়তো কী ঠাকুমা? বৌদি খুব ভালো। কাজে কর্মে কিছুতে কি ও কিছু কম?" আমার ইচ্ছা ছিল যে আমার কথা শুনে বৌদির মনে সন্তোষ হয়। তাই আমি ঠাকুমার কথাই ঘুরিয়ে ফেললাম আর অন্য কথা আরম্ভ করলাম।

আমি এখানে এসেছি আট দিন হল। পুণা থেকে যে চিঠি এল, তাতে বিশেষ কিছু ছিল না। নিত্যনৈমিত্তিক কান্নাকাটি চলছিলই, উমামাসীর শরীর ভালো, ইত্যাদি লিখেছিলেন। দুর্গীর খবর আমাকে জানাবে এমন কেউ এখন আর ওখানে ছিল না, তাই তার কোনো খবর পাব কেমন করে? তাকেই চিঠি লিখে খবর নিতে গেলে সেটা কেমন দেখাবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। বোম্বায়ের বন্ধুদেরও কোনো চিঠি পাইনি।

আমি আগেই বলেছি যে ঠাকুরদার শরীর খুব ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। তাই ঠাকুমার অনেকটা সময় তাঁর শুশ্রূষাতেই যেত। ঘরকন্নার অন্য খুঁটিনাটি কাজকর্ম আমরা দু'জনেই করতাম। তাই আরও সুযোগ হয়ে পদে পদে বৌদির স্বভাব জানতে পারছিলাম। তার খামখেয়ালী ভাব আর হিংসুটে স্বভাব বিশেষভাবে প্রকাশ হতে লাগল। দাদা যত প্রফুল্ল বৌদি ততই বিষণ্ণ, ও যত মিলে মিশে থাকতে ভালোবাসত বৌদি ততই খিট্‌খিটে, দাদা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে যত ভালোবাসত, বৌদির ততই তিরস্কার ছিল। এ-সব তো এখন আমার কাছে একেবারে স্পষ্টই হয়েছিল। এমন যে কেন, তার কারণ কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না। সে আমাদের দু'জনকে কিছু পড়তে কিংবা হাসিঠাট্টা করতে দেখলেই অমনি ভ্রূকুটি করত! আমার বড় শখ ছিল যে বৌদি, আমি আর দাদা স্বচ্ছন্দে এক জায়গায় হয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঠাট্টা করে হাসি খুশিতে সময় কাটাই। সেই জন্য আমি একবার দু'বার আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখানে তাকে ডাকলামও, কিন্তু সে মোটেই আসতে চাইল না। একবার দু'বার তাকে টেনে আনতে চেষ্টা করতে সে চোখ পাকিয়ে বলে বসল, "আমার এ রকম ভালো লাগে না বলছি! ও সব ঠাকুরঝি তোমাকেই সাজে ভাই। আমার মতো গরীবের ও সব নিয়ে কাজ কী!"

আমি বললাম, "বৌদি ভাই, কেন অমন করো? দাদার যখন ইচ্ছে যে তুমি লেখাপড়া শেখো, তখন তুমি আস্তে আস্তে কেন শিখতে আরম্ভ করো না? তাতে কিছু…"

কিন্তু সে আমাকে স্পষ্ট বলল, "হ্যাঁ, এখন আমি পুণায় ফিরে গেলে, সেই যে হাইস্কুল না ফাইস্কুল কী যে বলে, সেখানে যাব। তা হলে বেশ এখন থেকেই অভ্যেস হবে—সাহেব মেমসাহেবের সঙ্গে বসবার আর কথা বলার।" এ-রকম উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই অজ্ঞতার লক্ষণ ছিল না। যদি বলি সব জেনে শুনে ও ও-রকম আচরণ করত, তার পক্ষে ওর বয়সও তত বেশি ছিল না। তখন আমি ভাবতে লাগলাম যে এটা বোধহয় আমার ঠাকুরঝির মতোই একটা নমুনা! কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

এই কথোপকথন যেদিন হয়েছিল, সেদিন তো আমি সে কথা দাদাকে বলিইনি, কিন্তু তার চার-পাঁচ দিন পরে যখন সহজভাবে বললাম তখন সে ভারি রাগ করল। "তোমায় আমি কতবার বলেছি যমু, কিন্তু তুমি একেবারেই শুনতে চাওনা। আমি তোমাকে বলেছি তো? ও ঝঞ্ঝাটে তোমার কাজ কী? 'একটি ভাত টিপে দেখলেই সমস্ত ভাতের পরীক্ষা হয়[১]!' তোমার যা অপমান হবার তা হয়েছে, এখন ও পথ ছেড়ে দাও! এমন মানুষের…আমি দেখব, দেখব আর শপথ করব যে আর কক্ষনো ওর নাম পর্য্যন্ত করব না। তোমাকে অমন কথা বলার মানে কী?" তার অত বিষম রাগ দেখে আমি একেবারে আধখানা হয়ে গেলাম। ভাবলাম না-জানি কেন আমি ওকে ওকথা বলতে গেলাম। আর স্থির করলাম আবার বৌদি ওরকম কিছু বললে দাদাকে কিছু বলব না। বেশ করে নিজের কান মলে নিলাম। ভালো তো ভালো, নইলে রাগের নেশায় ও কোনোদিন যাচ্ছেতাই শপথ করে ফেললে করব কী?

বৌদির এইরকমের ভাবগতিক দেখে অবশ্যই বাধ্য হয়ে আমার তার সঙ্গে আলগা আলগা আচরণ করা দরকার হল। এখানে আগে তার কাছ থেকে তার মনের কথা জেনে নিয়ে তার স্বভাব পরিবর্তন করার যা ইচ্ছা ছিল, তা নিশ্চিত ভাবেই এখন অল্প অল্প দূর হতে লাগল। তবুও আমি একেবারে নিরাশ হইনি। মাঝে মাঝে চেষ্টা করতাম, কোনো

১ একটি মারাঠি প্রবাদ—এর অর্থ স্পষ্ট।

কোনো দিন গল্প শুনবার জন্য ওকে এনে বসাতাম। কিন্তু না—ও নিজের জেদ ছাড়তে চাইত না। শেষে একদিন মন বেশ শক্ত করে তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললাম, "বৌদি, তুমি এরকম মনে মনে হিংসে করে বিরক্ত হও কেন ? বৌদি, আমরা দু'জনই তো শুধু তোমার ননদ, সুন্দরী আর আমি। দাদার মতো তোমার স্বামী, আর তুমি এমন ব্যবহার করো ! কেন এমন করো বৌদি ? তুমি যদি এমন আচরণ করো, তার মনের মতো কিছুই না করো, তা হলে পরে কী রকম দাঁড়াবে। তুমি তোমার নিজের হিত একটুও বুঝতে পারছ না ? স্বামী-স্ত্রীর একজনের মুখ একদিকে, আর একজনের মুখ অপর দিকে হলে তাদের মিল হবে কেমন করে বলো তো বৌদি ? ভেবে দেখো না ভাই। আজ মিল হচ্ছে না, কালও হবে না, এমন যদি সব সময় হয়—তা হলে কক্ষনোই কিছু ভালো ভাবে হবে না। বৌদি, শীগ্‌গিরই তুমি সংসার......"

"ওগো ঠাকুরঝি, আমার আবার কিসের সংসার ?"

"এ কী ভাই পাগলের মতো কথা বলছ ? তোমাদের সংসার, ঘরকন্না করবার দিন কি একেবারে ফুরিয়ে গেছে ?"

তার পরে কিচ্ছু না বলে, শুধু মুখ বাঁকা করে সে ঘাড় নাড়ল, আর কিছুক্ষণ পরে কপাল কুঁচকে বলল, "আচ্ছা বেশ, তাই নিয়ে কথা কাটা-কাটি কেন ? আমি দুষ্টু তো ? একবার বুঝলে, আবার তাই নিয়ে মাথা ব্যথা কেন ?"

"কে তোমাকে দুষ্টু বলেছে ?"

"কেউ বলতে যাবে কেন ? যা সত্যি, তা কেউ বলবার দরকার করে না।"

"ওমা ! ও কী কথা ? ওকথা কেন বলো ?"

"আমি যখন সত্যিই দুষ্টু, নির্বোধ, বোকা, আমি......"

"থাক্, থাক্। এতেই তো সব বিগড়ে যায়।"

"তাতে আবার কী বিগড়ে যাবে ? ওগো ঠাকুরঝি, 'কুকুরের লেজ বারো বছর নলে পুরে রাখলেও কি তা কখনো সোজা হয়'[১] ?"

"বৌদি, এমন খুঁচিয়ে কথা বলে কাজ কী ? তুমি এখনো দাদার মন বুঝতে পারো নি ভাই। তার মতো স্নেহশীল প্রেমময়......"

১ একটি মারাঠি প্রবাদ। অর্থ সুস্পষ্ট।

"আমি কি তা নয় বলেছি ঠাকুরঝি? তুমিই মিছিমিছি অত ইয়ে করো কেন? আমি বলি সব্বাই ভালো, আমিই শুধু মন্দ!"

"বৌদি, এবার ও চাকরি পেয়ে, অন্য কোথাও……"

তারপর আমি কিছু বলতে যাব এমন সময় বৌদি কেমন যেন অদ্ভুত রকম মনঃকষ্টের হাসি হাসল আর বলল, "এ-জীবনে তো তা দেখছি নে……"

সে-কথা শুনে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হলাম। বৌদির বয়স কম, সে অজ্ঞ তাই ও-রকম করে, এই যে আমার একটা বিভ্রম ছিল, সেটা তার সেই কথার ধাক্কায় একেবারে অদৃশ্য হল। নিশ্চিত বুঝলাম যে ওর চেহারাখানা ছোট হলেও ওর মন সাধারণ নয়। উপরের কথাগুলি ছোট বয়সে সাজে না। বেশ প্রগলভ বুদ্ধিরই উপযুক্ত সে-কথা। এ-কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরে আমি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসলাম। তবুও সত্যি ব্যাপারটা কী তাই জানবার জন্য আমি আরও বললাম, "কেন? এরি মধ্যে সমস্ত জীবনের তুমি কী বুঝলে?"

"বুঝব আবার কী ঠাকুরঝি? এখনও পরীক্ষাটা কি……"

তার পরে ও কী বলবে তাই শুনবার জন্য আমি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়ে উৎকর্ণ হলাম। কিন্তু ততক্ষণে দাদা "যমু, যমু" বলে ডাকল, আর তক্ষুণি বৌদি চুপ করল। দাদা আবার ডাকল, তাই আমিও তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। কিন্তু এখনকার মতো অদ্বিতীয় সুযোগ আবার নিশ্চয়ই পাব না ভেবে আমার বড় দুঃখ হল। যে-কোনো কারণেই হোক, মনে হল যে আজ বৌদির মন একটু খোলা ছিল। এমন সুযোগের মধ্যে হঠাৎ বিঘ্ন এসে কথাটা সেইখানেই আটকে রইল।

তবু সে যেটুকু বলেছিল তাতেই তার মনের ভাব বুঝতে পারা সম্ভব ছিল, তার সে-কথা ভেবে দেখবার উপযুক্ত ছিল। তাই সে-দিন থেকে আমি তার সত্যি স্বভাব অনুমান করে ফেললাম। আর দিনে দিনে আমার সেই অনুমান দৃঢ় হয়ে আমার ভাগ্যবশে সত্যি হল। বৌদির সঙ্গে সে-রকম কথাবার্তা বলে তার মন জেনে নেবার তেমন সুযোগ আর কখনো আমি পাইনি। আর সত্যি বলতে গেলে, আমি তেমন চেষ্টাও করিনি। কেন না, আমি তার তাৎপর্য প্রায় সবটুকুই বুঝেছিলাম।

দাদার মতলব

এক রাত্তিরে দাদা আর আমি ঘরের বাইরে জ্যোৎস্নায় বসে গল্প করছিলাম। কোনো বাঁধা বিষয়ে যে আমাদের গল্প চলছিল তা নয়; নানান বিষয়ে কথাবার্তা চলছিল। আমাদের বোম্বায়ের বসবাসের, সেখানকার লোকের, দুর্গী, মাঈসাহেব, আমাদের শংকরঠাকুর ইত্যাদির বিষয়ে আমরা কথোপকথন করছিলাম। শংকরঠাকুরের নিন্দা করে আমরা হাসছিলাম, দুর্গীর কথা বলে বিষণ্ণ হচ্ছিলাম, বোম্বায়ের কথা বলে আনন্দিত হচ্ছিলাম। এমন সময় দাদা আমাকে হঠাৎ বলল, "যমু, আমার মতলব কী জানো? আমি যদি পরীক্ষা পাশ করি তা হলে কলেজে টলেজে যাব না।"

"মানে? দাদা, পরীক্ষা পাশ করে কলেজ যাবে না তো কী করবে?" বৌদির সে-কথা মনে পড়ে আমি তাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম।

."কী করব?" গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে দাদা শুধু এইটুকু বলে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ও কী বলছে কেন বলছে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। উপরের কথাটুকু বলে তার পর কিছু না বলে ও শুধু গম্ভীরভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমিও তার দিকে চেয়ে ভাবছিলাম। ভাবতে লাগলাম যে প্রথম পরীক্ষাটা পাশ করলে তারপর দাদা কলেজ-টলেজ যাবে না বলছে তার মানে কী? পরীক্ষাগুলো ভালো করে যদি পাশ না করে, লেখাপড়া যদি এখন থেকেই ছেড়ে দেয়, তা হলে ভবিষ্যতে ওর হবে কী? ভালো চাকরি ও পাবে কেমন করে? বেশ, কলেজে যদি যাবে না, তবে ও করবে কী? তবে কি ও এখন থেকে চাকরি করবে? তাই যদি করে, তা হলে এখন ওকে দশবারো টাকার চেয়ে বেশী টাকার চাকরি দেবে কে? এই রকম চিন্তা আমার মনে এল, তাই আমিও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

কিন্তু এ-রকম কতক্ষণ চলবে? কিছুক্ষণ পরে আমি কিছু বলতে যাব,

এমন সময় ও নিজেই বলল, "যমু, তুমিই দেখো, আমার যে-ভাবে আচরণ করতে ইচ্ছে করে তেমন আচরণ আমি কি বাড়িতে কখনো করতে পারব? ঠিক মনের মতো আচরণ করার কথা নয় থাক্, কিন্তু আজকাল বাড়িতে আমার একটুও ভালো লাগে না। ঘরে এলেই মনে হয় যেন জেলখানায় এসেছি। তাই আমি তো ঠিক করেছি যে যত শীগগির পারি স্বাধীন হবার চেষ্টা করব। বাবা তো আজকাল কথাই বলেন না। কিন্তু ছ-সাত মাস আগে মাঈসাহেব তাঁকে বলছিলেন, 'ছেলেটা এত বড় হল তবুও পরীক্ষা দিতে যায় না, তাই বেয়ানরা খোঁচা মেরে কথা বলেন।' তাই শুনে বাবা বেশী কিছু বলেন নি; কিন্তু খানিকক্ষণ পরে শুধু একটা কথা বললেন। সেটা এখনো আমার মনে একেবারে বিঁধে আছে।" এই বলে সে চুপ করে রইল।

আমি অতিশয় উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলাম তাকে, "কী? কী বললেন?"

"নাঃ, বিশেষ কিছু নয়, তিনি যা বললেন তা স্বাভাবিকই।"

"না, কিন্তু বললেন কী?"

"বলবেন কী? তিনি বললেন, 'ও যদি দু-একটা পরীক্ষা পাশ করে তা হলে কোথাও একটা চাকরি জুটিয়ে দেব', আর কী বলবেন?"

"অমনি তিনি তোমায় চাকরি জুটিয়ে দেবেন?"

"হ্যাঁ।"

"আর এরি মধ্যে?"

"তিনি তো তাই বললেন।"

"কিন্তু এরি মধ্যে চাকরি, মানে পাবে হয়তো দশবারো টাকার।"

"সেটাই না হয় পাওয়া যাক্—তাহলে…"

"কিন্তু দাদা, বাবা কেন অমন করেন?"

"তিনি নিজেই জানেন! কিন্তু যমু, মাঈসাহেবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে সেটা তাঁর নিশ্চয়ই প্রথম আলোচনা ছিল না। তাঁরা নিশ্চয় অনেকবার আমার সম্বন্ধে কথা বলেছেন।" এই কথা বলে আবার সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। আমিও চুপ করে বসে রইলাম। বৌদি যে-কথা অর্দ্ধেক উচ্চারণ করেছিল, সে-কথা স্মরণ হওয়ায় হঠাৎ মনে হল যে মাঈসাহেব আর বাবার এই কথা কিংবা এই রকম অন্য কোনো কথার সঙ্গে বৌদির

সেই কথার যোগসূত্রে নেই তো? এরকম কথা শুনে দুঃখিত হয়েই বৌদি ওরকম আচরণ করে না তো? তা ছাড়া, তার বাপের বাড়ির লোকও তাদের বাড়িতে দাদার বিষয়ে কিছু বলে না তো? আমি ভাবতে লাগলাম যে ওর বাড়িতে যদি দাদা পরীক্ষা পাশ করেনি এই নিয়ে কখনো কথাবার্তা হয়ে থাকে, আর এ-বাড়িতে দু-চারবার শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখেও যদি ও সেই কথাই শুনে থাকে, তা হলে মনে কষ্ট পেয়ে স্বভাবতই ওরকম আচরণ করতে পারে। তবু আমি ঠিক করলাম যে সে-বিষয়ে দাদার কাছে একটা শব্দও উচ্চারণ করব না। সে নিজেই কী বলবে তাই শুনবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে চুপ করে বসলাম। হ্যাঁ, একেই বৌদির স্বভাব একটু দুষ্টু আর চাপা, আর—আর—এখন সময় হয়েছে তাই বলে ফেলি—হিংসুটে; আর তার ওপর যদি আমি তার স্বামীর কাছে তার কুৎসা করি তা হলে তো তার হিংসার সীমাই থাকবে না! গেল পাঁচ-সাত দিনে আমার তো ঠিকই মনে হচ্ছিল দাদার এই স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সুখেরই আশা নেই। কিন্তু তেমন অবস্থা হওয়ার কারণ কিছু অংশে আমি নই তো? বৌদি কি আমার আর দাদার এমন অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখতে পারে না? তেমনি, আমার অবস্থা ভালো, তাও কি তার সহ্য হয় না? এই রকম চিন্তা আমার মন থেকে যাচ্ছিল না। একবার সে-চিন্তা মনে আসামাত্র অন্য অনেক কথার খেই মনে পড়ে আমার সে চিন্তা দৃঢ় হতে লাগল। আমি ভাবতে লাগলাম যে, স্বামী-স্ত্রীতে অমিল হওয়ার ব্যাপারে আমি আর একটা কারণ না হওয়াই ভাল।

অনেকক্ষণ নীরবে কেটে যাবার পর দাদা আবার আমাকে বলল, "যমু, ওঁদের চিন্তাধারা যখন ও-রকম, তখন আমার বোঝা তাঁদের ঘাড়ে চাপানো কি উচিত? তুমি কী মনে করো? এই যে সুন্দরীর বিয়ে হবে, কেমন পাত্র পাওয়া যাবে সেটাই একটা ভাবনা। বেশী টাকাকড়ি যেন খরচ না হয় তাই মাঈসাহেবের জিদ—জানো, আজকাল আস্তে আস্তে আরম্ভ হয়েছে, 'এখন তো আর পেনসন পাবে না, কিছু না, নিজের বুড়ো বয়সের জন্য চার টাকা ট্যাঁকে রাখতে হবে তো? সব কিছু মেয়েটার পায়ে ঢেলে দিয়ে বসবে নাকি?' এই বিড়বিড় কখন চলছিল জানো? তুমি এখান থেকে বোম্বাই গেলে পরে একদিন ঠাকুমা বুঝি তোমাকে 'বুগড়ি'[১] দেবার কথা

১ সেকালের মহারাষ্ট্রীয় ধরনের একরকম কানের গহনা।

পেড়েছিল। তাই ঠাকুমা চলে গেলে পরে এই ঘ্যানর-ঘ্যানর শুরু হয়েছিল। এই রকম যখন অবস্থা, আর বাড়ির গহনা অদৃশ্য হয়েছে আমার এই অনুমানটা যদি সত্যি হয়, তাহলে সবই পরিষ্কার।"

এই বলে আবার সে থামল। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে নানারকমের চিন্তা আসছিল। কিন্তু তখন দাদাই বলল, "যমু, তোমারও কি আমার মতোই মনে হয় না? তুমি কী মনে করো?"

"হ্যাঁ, আমিও তো তাই ভাবছি—" আমি কী বলছিলাম, কী উত্তর দিচ্ছিলাম তা আমি নিজেই বুঝতে পারিনি।

তা বুঝতে পেরে দাদা বলল, "তোমার মন কোথায়? কী ভাবছ? সত্যি বলো, আমার কথা তোমার সত্যি মনে হচ্ছে না? তুমিই বলো তো এই অবস্থায় আমার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপানো কি উচিত, যমুনা, তুমি তো অন্য মেয়েদের মতন নও, তুমি সব বুঝতে পারো, তাই তোমায় বলছি। এই দেখো, এখন আর পরীক্ষা টরীক্ষা আমার মতো মানুষের কোনো কাজের নয়। তোমার স্বামীর মতো বিলক্ষণ বুদ্ধিমান মানুষের কথা আলাদা। কিন্তু আমার মতো মানুষ ধাক্কা-হোঁচট না খেয়ে পরীক্ষা পাশ করে না। অত করেও পাঁচ-ছ'বছরে না হয় বি. এ. পাশ করলাম, তবু তাতে লাভ কী? ত্রিশ-চল্লিশ টাকা মাইনের কোথাও একটা চাকরি জুটবে, নইলে তারপর আরও কিছু......তাতে কোনো লাভই নেই। তাই আমি আলাদা মতলব করেছি।"

তখন, "কী তোমার মতলব" এই প্রশ্নটা আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ কথা সত্যি, কিন্তু তত বেশী উৎকণ্ঠিত হয়ে করিনি। কেন না, আমি ভাবলাম যে দশ-পনরো টাকার চাকরি নেব—এই কথাই তো সে বলবে? সেটা তো আমার একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল যে যদি অন্ততঃ শ'-পঁচাত্তর টাকা সে উপার্জন করে, তাহলেই কিছু ভালো হতে পারে। তাই আমি অমনি যা একটা কিছু জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু দাদা আমাকে তক্ষণি উত্তর দিল "আমি ঠিক করেছি যে এই পরীক্ষাটা পাশ করলেই ওকালতির[১] পড়াশুনা আরম্ভ করব। দু'বছরে সে পরীক্ষাটা পাশ করলে বেশ হবে। কোথাও ওকালতি করতে পারব। বেশ স্বাধীন ব্যবসা,

১ এই উপন্যাস রচনাকালে ওকালতির পড়াশোনা করতে হলে বি. এ. পাশ করা দরকার ছিল না, প্রথম পরীক্ষা পাশ করলেই ওকালতি শিক্ষার সুযোগসুবিধা ছিল।

আবার কিছু টাকাও আয় করতে পারব।"

তাই শুনে আমার মন একটু প্রফুল্ল হল। কিন্তু বেশী কিছু না বলে দাদা তারপরে কী বলবে তাই শুনবার জন্য আমি বললাম "হুঁ।"

দাদা তারপর বলল, "আমার শুধু এই ইচ্ছে যে বোম্বায়ে তোমাদের ওখান থেকে রঘুনাথরাওর শিক্ষামতো পড়াশোনা করি। তিনিও সেই পড়াশোনাই করবেন, নিজের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলে তাঁরও সুবিধা হবে আর আমারও শিক্ষা ভালো হবে। প্রথমবারেই পরীক্ষা পাশ করে······তাছাড়া······"

এইটুকু বলেই সে হাসল। তখন আমি তাকে কখন,—কী, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু সে "কিছু না, ভাবলাম তোমাদের সেখানকার লোকের সঙ্গে চেনা-শোনা হয়ে দিনগুলো সুন্দর কাটবে,"—শুধু এই কথা বলল, কিন্তু দেখতে পেলাম যে তার মনে বোধহয় আরও কোনো কথা ছিল। তবু আমার মন তার সেই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, তাই আমি তাকে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। তারপরে আমরা অনেকক্ষণ সেইরকম কথাবার্তা বললাম আর তার সেই মতলবটার ভালোমন্দ ভেবে দেখলাম। হতে হতে রাত যে কত হল তা আমরা বুঝতেই পারিনি। স্বচ্ছ জ্যোৎস্না হয়েছিল, সুন্দর বাতাস বইছিল। কথা চলছিল গুরুত্বপূর্ণ, তখন সময়ের কথা কে স্মরণ করবে? কিন্তু শেষে ঠাকুমা ডাক দিয়ে বললেন, "ওরে আজ ব্যাপারটা কী? বারোটা বেজে গেল, তবু তোমরা করছ কী?" তখন আমরা উঠে ভিতরে গেলাম। দাদা এগিয়ে গেল, আমি একটু পরে গেলাম। এমন সময় ঘরের বাঁ দিকের চালের নিচে কী যেন খস খস করল! আমি "ও কে?" বলে চেঁচাব, এমন সময় চুড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। কে ছিল তা বুঝতে পেরে আমি এগিয়ে গেলাম, এমন সময় আমার পিছন থেকে এসে কে আগে চলে গেল! আমি গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম আসছিল না।

ঠাকুরদার মৃত্যু

আরও চার-পাঁচদিন কেটে গেল। মোটামুটি আমাদের নিত্যকর্ম ঠিক চলছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছিল যে ঠাকুরদার শরীর বেশ ক্ষীণ হচ্ছিল। তাঁর স্বরটর কিছু ছিল না, আর তিনি খেতে পারতেন না, অন্নে অরুচি জন্মেছিল, আর একটু কাশিও হয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর স্নান, সন্ধ্যা-আহ্নিক কিংবা আশপাশের গাঁয়ে যাওয়া ছাড়েননি। কিন্তু এই দু-এক দিনেই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে তাঁর কাশি বিশেষ বেড়েছিল।

অবশ্য তিনি কখনো নিজে থেকে আমার অমুক অসুখ কিংবা আমার অমুক ব্যথা করছে বলতেন না। বরং কেউ যদি তাঁকে বলবার চেষ্টা করত যে "আপনার শরীর ভালো নয়, আপনি অমুক ওষুধ খান" তাহলে তিনি বলতেন, "ধ্যেৎ। আমি বেশ আছি। এই একটু কাশি হয়েছে, একটু ঘোল খেলেই সেরে যাবে।" আর সত্যি তিনি সের-দু'সের ঘোল খেতেন। উপায় কী? বুড়ো বড় একগুঁয়ে ছিলেন। তা তো আমি আগেই বলেছি। এই আচরণ তাঁর স্বভাব মতোই ছিল। কাশির জন্য ঠাকুমা কিছু ওষুধ-টষুধ তৈরি করে দিলে বলতেন, "ধ্যেৎ", আর অমনি ওষুধটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। শুধু তাই নয়, বলতেন, "কী আশ্চর্য্য, ইনি ভাবছেন যে আমি এক্ষুনি মরতে বসেছি। তুমি কি ভাবছ যে নিজে স্বাধীন হবে?" আর হাসতেন। কিন্তু ঠাকুমাও কথায় কিছু কম যেতেন না। তিনি বলতেন, "হ্যাঁ দেখো, 'আমার ঘুঁটে নদীর ধারে',[1] আর আমি এখন নাকি স্বাধীন হব। আর সেই জন্যে নাকি তোমাকে ওষুধ-টষুধ দিয়ে···বুড়ো বয়েস হল তবু এখনো···"

"কীসে হল বুড়ো বয়েস? আর অন্ততঃ দশ বছর আমি মরব না, বুঝলে? হোক বেটা কাশি, দেখি তার কী করবার সাধ্য! আমি তার বাবাকেও ভয় করিনে। আমার বুড়ী স্ত্রীকে পথে এগিয়ে দিয়ে তবে আমি

১ একটি মারাঠি প্রবাদ। মানে বৃদ্ধ হয়ে শ্মশানে যাবার দিন এসেছে যেন তাই দরকার মতো ঘুঁটে পর্যন্ত শ্মশানে রওনা করে দেওয়া হয়েছে।

পটোল তুলব। আগে কক্ষনো মরব না; আমি মরে তোমায় স্বাধীন হতে দেব না।"

"ওগো কে চায় স্বাধীন হতে? তোমার চোখের সামনে, তুমি থাকতে আমার মরণ হোক, আমার অন্য-কোনো ইচ্ছে নেই, বুঝলে?"

"তবে মরো শীগগির, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।"

"কিন্তু এখনো দশ বছর সময় আছে তো? তবে এর মধ্যে অত তাড়া কেন?"

"শীগগির মরো, তাহলে আমার পিছনের কোনো ভাবনা থাকবে না। কী বলিস তোরা ছোকরার দল?"

সেই বৃদ্ধ দম্পতির এই রকম রসিকতা কখনো কখনো আমরা দেখতে পেতাম। তখন ঝগড়ার মুখে ঠাকুরদা কী বলতেন তার ঠিক থাকত না। তার নমুনা এর আগে আমি দিয়েছি।

যাক্, এই রকমে দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু রোজ অল্প অল্প করে পাঁচ-ছ দিনে ঠাকুরদার অসুখ এত বেড়ে গেল যে একদিন বিছানা ছেড়ে তিনি উঠতেই পারলেন না। তখন কিন্তু ঠাকুমা ঘাবড়ে গিয়ে বাবাকে চিঠি লিখতে বললেন। দাদাও বাবাকে চিঠি লিখল। তার পরের দিন ঠাকুরদার কাশি ভয়ানক বেশী হল, বিছানায় পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতাও তাঁর রইল না। কিন্তু তবুও বুড়া চান করবার জন্য একেবারে অস্থির। হঠাৎ ভয়ানক কাশতে আরম্ভ করতেন—ঠেসান দিয়ে বসবার জন্য তাঁর পিছনে একটা বিছানা গুটিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই বিছানায় মাথা দিতেন; আবার একটু মাথা তুলে আমাদের গালি দিতেন, আর রেগে রেগে বলতেন, "চান করতে দাও, আমায় সন্ধ্যে আহ্নিক করতে দাও, নইলে তোমাদের মাথা ভাঙব। আর এই বুড়ীথুথ্‌ড়িটাও ওদের দলেই মিশেছে; আমি উঠতে পারছি না, তাইতো তোমাদের অত ইয়ে।" আমরা দু'জনে "ঠাকুরদা আজ আপনি চান করবেন না" বলে তাঁকে বিরক্ত করছিলাম। তাঁর বিড়্‌বিড়্‌ অবিরাম চলছিল। আমাদের ক্ষমতামতো আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তিনি কি শুনতে চান? ঠাকুমাকে গালি দিতে লাগলেন। শেষে তিনিও কাঁদতে কাঁদতে ওঁকে চান করিয়ে দেবার অনুরোধ করতে লাগলেন। তখন আমরা দু'তিন জনে ধরাধরি করে তাঁর গায়ে জল ঢেলে তাঁকে চান করিয়ে দিলাম। ঠাকুমা

তখন একদিকে সুর করে কাঁদছিলেন। কিন্তু চান করার পনেরো মিনিট হতে না হতেই তাঁর ভয়ানক শীত করতে লাগল! বাবাগো, কী ভয়ানক শীত! সমস্ত শরীর থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। গায়ে কত কাপড় ঢাকা দিলাম, গা টিপে দিলাম তবুও তাঁর শীত কম হচ্ছিল না। শেষে আস্তে আস্তে জ্বর হল, আর সেই জ্বরে বুড়ো একেবারে চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

দু-তিনদিন গেল, তবু বাবা এলেন না। ঠাকুমা চোখের জলে ভেসে, ধরা গলায় বললেন, "ও আসবেই না, ওর এতটুকুও দয়ামায়া নেই। এখানে মানুষ মারা গেলেও ওর কী আসে যায়?" দাদা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বাবাকে আর একখানা চিঠি লিখল। রাত্তিরে ঠাকুরদার জ্বর কম হত, কিন্তু কাশি যেত বেড়ে। দিনের বেলা কাশি কম হত আর জ্বর বেশি হত-এই রকম চলছিল। আরও দু-তিন দিন গেল। আমরা সবাই একেবারে ঘাবড়ে গেলাম। ঠাকুমার চোখের জল একবারও থামতে চাইছিল না। তিনি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। শুধু হতাশ নয়, তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন যে ঠাকুরদা আর বাঁচবেন না। একদিন রাত্তিরে তো চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি জেগে উঠে দেখি ঠাকুমা বসে কাঁদছেন। ঠাকুরদা তখনও বেশ স্পষ্ট কথা বলতে পারেন। তিনি বুঝি তাঁকে বলেছিলেন, "আমি আর এ অসুখে বাঁচব না।" ওই হয়েছে! ঠাকুমাকে কাঁদতে দেখে আমারও কান্না পেল। হঠাৎ ঠাকুরদা বললেন, "ওকী, কাঁদছ কেন? তোমার আমার দুজনেরই এখন বয়েস হয়েছে তো? হয় আমি আগে যাব, নয় তুমি আগে যাবে, তাতে কী দুঃখ? একদিন না একদিন একজন আর একজনের অনুসরণ করবই। আমার শুধু এই ভেবে দুঃখ হচ্ছে যে আমার পরে তোমার কী অবস্থা হবে! গণু, আমার পরে ওকে ত্যাগ করিস না, বুঝলি"—এই রকম কত কী তিনি বলছিলেন।

এই রকমে আরও দু-তিন দিন কেটে গেল, তবুও বাবা এলেন না। তখন আমরাও বাবার নিন্দা করতে লাগলাম। ঠাকুরদার অসুখ গুরুতর হল। একবার তো তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এসেছে? এসেছে?" তখন আমরা কী উত্তর দেব? শেষে তিনিই বললেন. "বেশ, এল না তো এলনা, আমার গণু তো আছে!" হঠাৎ একবার খুব জোরে কাশতে লাগলেন,

আবার থামলেন ; তার পর আবার বললেন, "আমার এঁর জন্যই ভাবনা, এখন বুড়ো বয়সে ওঁর যেন কষ্ট—না হয়—" আস্তে আস্তে তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে লাগল ; আর পরে তো কথা বলার ক্ষমতাই রইল না। রাত্তিরে তিনি বেশী বেশী ক্ষীণ হতে লাগলেন তবু ইঙ্গিত করতে লাগলেন যে তাঁর হাত পা জ্বালা করছে। ঠাকুমা তাঁর মাথায় ঘি মালিশ করতে লাগলেন। আমি তাঁর কাছে বসলাম।

মধ্য রাত্রে তিনি ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এমন সময় দুয়োরের পাশে বাবা ঘোড়া থেকে নামলেন আর ভিতরে এসেই এই অবস্থা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে মাথার কাছে বসলেন। ঠাকুমা থাকতে পারছিলেন না, তক্ষনি বললেন, "দু'দিন আগে আসতে পারলিনে?" এই বলে কাঁদতে লাগলেন। "ছুটি পেলাম না" শুধু এইটুকু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বাবা ঠাকুরদার দিকে চেয়ে রইলেন। ঠাকুরদা চোখ মেলে তাঁর দিকে দেখলেন, "এলে···" এই রকম কী যেন অস্পষ্ট বললেন আর হঠাৎ বাবার দিকে পিছন হয়ে পাশ ফিরলেন। মরণোন্মুখ হয়েছিলেন, তবু তাঁর তেজ কমেনি।

তিনি আরও বেশী দুর্বল হয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ পরে তিনি আবার বাবার দিকে ফিরে চেয়ে দেখলেন, মুখ তাঁর কাছে আনতে সংকেত করলেন আর অতি ক্ষীণ স্বরে বললেন, "আমি ওকে সুখ দিতে···তুমি কি আর···" তারপর তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। হাত তুলে সংকেত করবারও তাঁর শক্তি রইল না। আমি নুয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঠাকুরদা একটু দুধ খাবেন? আনব?" তখন 'না' বলে তিনি আমার হাত দূরে সরিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজলেন—শেষবারের মতো। আর তিনি চোখ খুললেন না। আমরা সকলে কাঁদতে লাগলাম। ঠাকুমার কান্নার তো সীমাই ছিল না।

তার পরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদির কথা আর আমি বলতে বসছি না। প্রথম দিন থেকে তেরো দিনের দিন পর্য্যন্ত যে-সব ক্রিয়া অনুষ্ঠান আমাদের রীতি অনুসারে হওয়া উচিত সে-সব হল। সে জন্য মাঈসাহেব আর তাঁর মা আমাদের এখানে এসেছিলেন। সব ক্রিয়া-কর্ম হয়ে গেলে আমরা সবাই ঠাকুমাকে নিয়ে পুণায় এলাম। আর সে গ্রামে কে থাকে? বাবা সেখানকার অন্য সব ব্যবস্থা কিছু কিছু করে ফেললেন, আর আবার এসে সব

ব্যবস্থা ভালো করে করবেন বলে সব গুটিয়ে নিলেন।

এইভাবে আমাদের আবার গ্রামে যাবার পালা শেষ হল। আমরা কোন উৎসাহে সেখানে গিয়েছিলাম আর কোন অবস্থায় ফিরে এলাম এই ভেবে মন কত দুঃখিত হয়েছিল তার সীমা নেই। ঠাকুরদার বয়স হয়েছিল, তাই তাঁর কিছুই মন্দ হয়নি। কিন্তু ঠাকুমা তাঁর আগে চোখ বুঁজলে ভালো হত। বাবার কাছে থেকে তাঁর সুখলাভের কোনো আশা ছিল না, এ কথা ঠাকুরদা জেনেছিলেন। ঠাকুমাও থেকে থেকে তাই ভাবছিলেন, আর আমাদেরও যে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল, তা নয়। সেদিক দিয়ে ঠাকুরদার মৃত্যু একটা বিপদই হয়েছিল। যাই হোক—তাঁরা দুজনে যতই ঝগড়াঝাঁটি করুন না কেন, পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে ভালোবাসতেন না। সব সময় পরস্পরের কাছে থাকতে চাইতেন। এমন অবস্থায়, এই পরিস্থিতি একটা বিপদ নয় তো কী? ঠাকুরদা একদিন রসিকতা করে বলেছিলেন, "তুমি স্বাধীন হবার জন্য আমার মরণ অপেক্ষা করে আছ।" কিন্তু বাস্তবিক তাঁর রাজত্বে ঠাকুমা যত স্বাধীন ছিলেন, তাঁকে নির্ভর করে তাঁর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে, তিনি যত তাঁর জেদ খাটাতেন তার শততম অংশও তাঁকে এখন কেউ মানবে না তা আমরা ঠিক জানতাম। সে বিষয়ে দাদাতে-আমাতে আলোচনা পর্য্যন্ত হয়েছিল। পুণায় এসে ঠাকুমা একেবারে দীনের মতো হলেন; আর এই নতুন কারণটা দাদার মতলব দৃঢ় করতে সমর্থ হল। দাদা তো তখন আমাকে বললই, "যমু, ঠাকুমাকে এই অবস্থায় কতো দিন রাখব? তোমার কাছে আমি সে-দিন যেমন বললাম সেই ভাবে এ-বছরের পরীক্ষাটা পাশ করে ওকালতির পড়াশোনা করব। অন্য কোনো উপায়ই এখন নেই। আমি শীগগীর টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করলে ঠাকুমার কোন কষ্টই হবে না। কেননা, তখন আমার একটু ক্ষমতা হবে। না হলে, 'আমাদের যা খুশী করলেও ব্যাটা যাবে কোথায়' এই ভেবে এরা বেশী জোর পায়। ততদিন, মানে দু-তিন বছরই শুধু, যা কষ্ট হবে—কিন্তু তার উপায় নেই।"

তার কথা এখন আমার অধিক উচিত মনে হল। তবুও, সে পরীক্ষা দেবে না এটা আমার ভালো লাগছিল না। মনের ইচ্ছা ছিল যে সে ওঁর মতোই চার-পাঁচটা পরীক্ষা পাশ করুক। তাই, হ্যাঁ, কিন্তু "সে এখনো দূরের কথা," এই বলে আমি সেকথা সেখানেই থামালাম।

এইভাবে সে ছুটিতে আমাদের গাঁয়ে যাওয়া, আর—কক্ষনো সেখানে না যাওয়ার সূচনা—হল। কিন্তু আমি দুঃখের মধ্যে এই সুখ মানছি যে ঠাকুরদার মৃত্যুসময়ে, আর ঠাকুমার সেই বিপদকালে আমি তাঁর পাশে ছিলাম। ছুটিতে পুণায় এসে বোম্বাই ফিরে যাবার পর যদি এসব ঘটনা হত, তাহলে শুধু কানে শুনতাম, এই তো?

বোম্বাই ফিরে যাওয়া

মানুষ যখন ভাবতে আরম্ভ করে যে তার নিজের আর কেউ নেই, নিজের জীবন এখন অপরের কৃপার ওপরে নির্ভর করেই কাটাতে হবে তার মন কত কোমল হয় তার অভিজ্ঞতা এ-পর্য্যন্ত যদিও আমার ছিল না, তবুও ঠাকুমার অবস্থা কী ভাবে কেমন হবে, এই ভেবে আমার মন বড় হু হু করত। আজ পর্যন্ত বাবা তাঁর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করছেন! আর এখন তো তিনি এ-বাড়িতে চিরদিনের মতো থাকতে এসেছিলেন। তাই আমার বেশী মন কেমন করত। কিন্তু শুধু মন কেমন করে কী লাভ? তাঁর অবস্থা পাল্টানো কি আমার সাধ্য ছিল? দাদারও আমার মতোই মন কেমন করত তাই সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করলে ওকালতির পড়াশোনা করবার সংকল্পই পাকা করে ফেলল। এ-সব কথা আমি আগে বলেছি। তবু, এ-সব অবশ্যই দূরের কথা ছিল। সম্প্রতি সে-সব মতলব কোনো কাজেরই ছিল না। এখন ঠাকুমাকে সুখে রাখবে এমন ক্ষমতা কারো ছিল না। তখন শুধু মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে 'হায় হায়' করা ছাড়া আমাদের হাতে কী ছিল?

আমরা পুণায় ফিরে আসার পর আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করবার জন্য আমাদের বাড়ি এল, আর আর সবও রীতিমাফিক হল। তারপর চার-পাঁচ দিন বাপের বাড়িতে থেকে আমিও শ্বশুরবাড়ি চলে গেলাম।

ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র ঠাকুরদাকে আর আমাদের গ্রামের সব দুঃখকারী ঘটনাগুলি মনে পড়ে আমার কান্না উপচে এল। ঠাকুমার ভাবী অবস্থার সম্বন্ধে আমার চিন্তা ওঁর কাছে প্রকাশ করামাত্র উনি তক্ষুণি বললেন, "তাঁকে বলো, চলুন আমাদের সঙ্গে বোম্বাই।" কিন্তু সেটা কত অসম্ভব ছিল এ-কথা ভেবে দেখামাত্র আমাদের অশেষ দুঃখ হল। তেমনি বোম্বায়ের উল্লেখ হওয়া মাত্র অন্য সব কথা ছেড়ে দিয়ে আমাকে দু'খানা চিঠি দেখালেন। সে চিঠি বোম্বাই থেকে এসেছিল। চিঠি পড়ে আমার কা মনে হল সে-সব কথা আমি বিস্তৃতভাবে লিখতে বসছিনে। আমাদের

কথাবার্তায় বাড়ির যে দুটি কথার উল্লেখ হল আর যাতে আমি বিশেষ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, শুধু সেই দু-কথা আমি এখানে বলছি।

বোম্বায়ের চিঠি পড়ে আমি যখন বোম্বায়ের কথা বলতে লাগলাম, তখন হঠাৎ চেহারা গম্ভীর করে আমাকে বললেন, "কিন্তু এখন তোমরা বোম্বাই আসছ কি না সে-বিষয়েই আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

"তবে?" আমি অতিশয় আশ্চর্য আর ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"তবে আবার কী? বাড়িতে আলোচনা চলেছে যে এখন তোমাকে আর মাকে ওখানে পাঠিয়ে দরকার নেই। শংকরমামা রোজ ওকথাই বলছেন। দিদিমাও তাঁর কথাতেই সায় দিচ্ছেন।"

"কিন্তু সে কী কথা? আমাদের আলাদা করে রেখে তাদের লাভ কী?"

"তাদের লাভ কী মানে? আমাদের শংকরমামার বংশের মুখ কালি হবে কি না? তা যেন না হয়, তাঁর বংশ একেবারে শুদ্ধ, পবিত্র থাকা চাই, তবে তিনি চার জন রক্ষিতা···"

"তাঁর সে-সব নিয়ে আমাদের কাজ কী?" আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তবে তুমি কী ভাবছ? একলা যাবে?"

"হ্যাঁ, বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা শুনতে হবে না? তাঁরা যদি তোমায় পাঠিয়ে না দেন, তাহলে কী উপ' .?

এই নিরাশাময় কথা শোনামাত্র আমার কত কষ্ট হল, তা কি বলতে হবে? উনি ঠাট্টা করে না সত্যি করে ও-কথা বলেছিলেন তা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। উনি ঠাট্টা করেছেন এমন সন্দেহ পর্যন্ত আমার হল না। আগেই আমার মন দুর্বল হয়ে ছিল, আর তাতে এই প্রসঙ্গ—তা কি আমার সহ্য হয়? ভেউ ভেউ করে কাঁদতে ইচ্ছা করল! আমাকে ছেড়ে উনি বোম্বাই গেলে আমার অবস্থা কেমন হবে তার এমন ভয়ঙ্কর ছবি চোখের সামনে দেখতে লাগলাম যে, উমাশাশুড়ীর অবস্থা বরং তার চেয়ে আমার ভালো মনে হতে লাগল। এর আগে একবার আমি স্পষ্টই বলেছি যে স্বাধীনতার সুখ যত দিন অনুভব করিনি তত দিন পরাধীনতার দুঃখ এত ভীষণ মনে হয় নি। কিন্তু একটিবার স্বাধীনতার সুখের বাতাস খেয়ে তারপর যদি পরাধীনতারূপী নরকে পড়বার পালা আসে, তা হলে সে রকম দুঃখময় অবস্থা আর নেই! আমার ঠিক মনে হল যে অধোগতি, অধঃপতন,

ইত্যাদি যা সব লোকে বলে তা এই। বেচারি ঠাকুমার কী অবস্থা হবে তাই আমি ভাবছিলাম, উমাশাশুড়ীর অবস্থা কী রকম তাও আমি চোখে দেখতাম। তাই, আমার অবস্থা যদিও ঠিক তেমন নয়, তবু অনেকটা সেই রকমই হবে ভেবে আমার যে কান্না উপচে এল তাতে আশ্চর্যের কি। তাতেও আবার, সত্যি বলতে গেলে, ওঁর মুখে "কী উপায়? বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা শুনতে হবে না?"—এই কথা শুনে আমার বড্ড রাগ হল, আর সেই রাগে কাঁদতে কাঁদতে অপর দিকে মুখ করে শুয়ে, আপন মনে জ্বলতে লাগলাম।

রকম দেখে ওঁর মনে সত্যি কষ্ট হল! আমাকে অনুনয় করে কত মিনতি উনি করলেন! "আমি তোমায় একবার আশ্বাস দিয়েছি তা ভুলে গেলে? যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন আমি তোমায় আমার কাছছাড়া করব না, আমার এই আশ্বাস কি তুমি ভুলে গেলে? তুমি কি ভাবছ যে একবার স্বাধীনভাবে আচরণ করে আমি তোমাকে এখানকার কষ্টে ফেলব? অমন পাগল কেন তুমি? তোমার মন দুঃখিত ছিল, একটু ঠাট্টা করে স্ফূর্তি আনবার জন্য ওকথা বললাম, তাও বুঝতে পারলে না? আমার মনে ছিল না, আমি ভুল করেছি—" ইত্যাদি কত রকম অনুনয় করে আমাকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছিলেন—কিন্তু তখন আমি সেখানে থাকলে আমার যে কতরকম কষ্ট সহ্য করতে হবে তার নিরাশাময়, অন্ধকারময় ছবি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। আর তেমন অবস্থায়, যখন তখন দিদিশাশুড়ী, ছোটশাশুড়ী আর শংকরঠাকুর কত যে কথা বলবেন সে-সব আমার কানে গুন গুন করতে লাগল। তাই আমি অন্য কিছু দেখতেও পাচ্ছিলাম না, শুনতেও পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওঁর সেই মিষ্টি মুখে, "আচ্ছা, আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করো," এই কথা শোনামাত্র আমার রাগ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল! সেই ঠাট্টার কথা অত দূর গড়াতে দিয়ে আমি ভয়ানক মূর্খতা আর কৃতঘ্নতা করেছি ভেবে আমার বিষম লজ্জা পেল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "আহা, এ কী কথা! এমন কি বলতে হয়? কিসের অপরাধ আর ক্ষমা কিসের?" আর কিছুই আমি বলতে পারলাম না, ওঁর কাঁধে মাথা দিয়ে শুধু কাঁদতে লাগলাম।

সেই অতটুকুতে কান্নাকাটি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ভেবে কেউ হয়তো আশ্চর্য বোধ করবে। কিন্তু যারা আমার মতো অবস্থায় পড়েছে, কিংবা

তাদের যারা চেনে, তারা এতে কিছুই আশ্চর্য মনে করবে না। জলাশয়ে জল যখন বেশি হয়ে ছাপিয়ে ওঠে, তখন সেই জল বাইরে প্রবাহিত করবার জন্য যেমন খাল কাটা দরকার হয়, তেমনি শোক-ক্ষোভের জোর কম করবার জন্য চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে যাওয়া মাত্র আমার মন একটু শান্ত হল। অন্য কিছু ভাবতে পারার মতন মনের অবস্থা হল। তক্ষুণি, উনি যত কিছু বলছিলেন, সে সব কথা বেশ বুঝতে পারলাম, আর মনটা খানিক স্বস্তি বোধ করতে লাগল। তারপরে, শংকরঠাকুর, দিদিশাশুড়ী এদের সঙ্গে বেশী ঝগড়াটগড়া না করে, নিজের মনোমত আচরণ করতে কী উপায় করব, তাই আমরা একমনে ভাবতে লাগলাম। শংকরঠাকুর সত্যিই নানারকম ছুতো আর আপত্তি তুলে আমাকে আর মাকে বোম্বাই ফিরে না পাঠাবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন।

"আলাদা সংসার পেতে কী দরকার? মিছিমিছি খরচ! ছুটির দিনে এখানে এলেই হল। যা নয় তা আহ্লাদে কাজ কী? সঙ্গী সব জুটেছে মন্দ···" সে কি এক কথা? নানা রকম কথা বলে তিনি আমাদের যাওয়ায় বাধা দেবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন। শেষে উনি একদিন ভয়ানক রেগে মাকে বললেন, "মা, আমি কিন্তু তোমাদের এখানে থাকতে দেব না। কলেজের রান্না খেয়ে খেয়ে আমি বিরক্ত হয়েছি, তাছাড়া ঘরটা ভাড়া করেছি এক বছরের জন্য। 'নটান, চালডাল, কিনেছি তা···তা কিছু নয়! শঙ্কর মামা যাই বলুন, তাঁর মত যাই হোক, আমি মোটেই একলা যাবনা। তোমাদের নিয়ে যাব।"

"হ্যাঁ, তা তো সত্যি। কিন্তু মা আর ও যখন বলছে, তখন নিজেরই জিদে"—মা আরও কিছু বলতে যাবেন এমন সময়, তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, উনি বললেন, "দিদিমার কোনো আপত্তি নেই। এসব শঙ্কর-মামারই চাল। সে কিছু নয়, মা, তুমি দিদিমাকে স্পষ্ট বলো যে, 'আমায় যেতেই হবে, ও একলা যাবে না'—তা কেন? আমাকে যদি দিদিমা জিজ্ঞেস করে, তা হলে আমিই স্পষ্ট বলে ফেলব।"

উনি যখন একথা বলছিলেন তখন ওঁর দৃঢ় সংকল্প স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মা বেচারি কী করবেন? কিন্তু মায়ে-পুতের কথাবার্তা বড়ঠাকুরঝি আড়ি পেতে শুনলেন, আর মশলাটশলা দিয়ে 'রিপোর্ট' করলেন। ওই হয়েছে! ঘরময় আগুন জলে উঠল! কিন্তু যা হল তা এক দিক দিয়ে ভালোই হল।

কেন না, ওঁর সঙ্কল্পটা দিদিশাশুড়ীর কানে তোলা বড় মুশকিল ছিল। নিজে থেকে বলবার জো ছিল না, মা কখনো মুখ ফুটে সে-কথা বলতেন না। তখন সে-কথা তাঁর কানে কেমন করে যাবে সেটাই একটা মুশকিল ছিল। সে মুশকিল দূর হল বললাম তার কারণ এই যে বনুঠাকুরঝির লাগানির ফলে প্রথমে ঘরময় রাগের আগুন জ্বলে উঠে শেষে সব সময় যিনি আমাদের সাহায্য করতেন, সেই গোপালঠাকুরই আমাদের সহায় হলেন। বাড়িতে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে তিনিই একটা উপায় খুঁজে ঝগড়া মিটিয়ে দিতেন। সেইভাবে তিনি কিছুটিছু বলে আমাদের যাওয়া ঠিক করলেন।

দিদিশাশুড়ী আগে তাঁকে অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে "যাক না কেন? আমার তাতে কী? যে সে নিজেরটা নিজে ভালোবাসে, আমাদের মাথা ব্যথায় কাজ কী?" এই রকম অনেক কিছু বললেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের যাবার আয়োজন হল। আমরা নাছোড়বান্দাই ছিলাম! যে উপায়েই হোক না কেন, আমাদের যাওয়া ঠিক হল, আমরা এবাড়ির ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচলাম, এই আনন্দেই আমরা মত্ত ছিলাম। শংকরঠাকুর আমাদের আর আমাদের চেয়েও মাকে কত যে মন্দ কথা বলেছিলেন! তাঁর সে-সব কথা শুনে আমার এমন ভয়ানক রাগ করছিল যে তার সীমা নেই! কিন্তু কী করব? কোনো উপায় ছিল?

বোম্বাই যাবার আগের দিন সকালেই আমি বাপের বাড়ি গেলাম। আমি চলে যাব বলে ঠাকুমার অত্যন্ত দুঃখ হল। ঠাকুমার মন এখন একেবারে খাপছাড়া হয়েছিল, তাঁর এখন নিজেকে একেবারে নিরাশ্রয়ের মতো মনে হত। এমন সময় আমি তাঁর কাছে থাকলেও কী হত? কিন্তু সে বাস্তবিক সহায় থাকতেও নিজেকে একেবারে অসহায় ভাবে, সে অল্পতেও মনে দুঃখ পায়। ঠাকুমার যেমন দুঃখ হল, তেমনি তাঁকে ছেড়ে যেতে আমারও মন অত্যন্ত খারাপ হল, একথা বলার প্রয়োজন নেই। আমার বড্ড কাঁদতে ইচ্ছা করল! আমি সেখানে থাকলে কি তাঁর বড় সুখলাভের কথা ছিল? আমার ক্ষমতা মতো তকে সান্ত্বনা দিলাম। তিনিও আমাকে যা বলবার বললেন।

দাদাতে আমাতে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে আর মোটামুটি আমাদের ভাবী অবস্থার বিষয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল, তখন আমরা কী কী বলেছিলাম সে আর এখানে বিস্তারিত বলে দরকার নেই। তার সঙ্গে কথা বলতে

বলতে একটি চিন্তা আমার মনে এল ; কিন্তু তার কোনো তাৎপর্য নেই ভেবে আমি সে-চিন্তা মনে চেপে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তবুও আমার মন আমাকে বলতে লাগল যে, যখন সে কথা ভেবেছি তখন একেবারে চুপ করে না থাকাই ভালো। একবার শেষ পরীক্ষা হয়ে যাবে। মন 'করব কি করব না' ভেবে দোল খাচ্ছিল। শেষে, একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক ভেবে, দাদাকে পর্যন্ত না জানিয়ে, সে যখন বাইরে গিয়েছিল তখন, মাঈসাহেব কাজে ব্যস্ত থাকার সুযোগ নিয়ে, বৌদিকে আমি চুপি চুপি উপরে ডেকে আনলাম। সে অবশ্য তার অভ্যাস মতো কপাল কুঁচকে, "কী ? কেন ? আমার সঙ্গে এত কানে কানে কথা কিসের ?" এই রকম বিড়্‌বিড়্‌ করতে করতে উপরে এল। আমি তাকে "বসো না বৌদি, বসো না ভাই" বলে কত অনুরোধ করলাম, কিন্তু আমার কথায় কান না দিয়ে সে শুধু বলল, "বলো, কী বলবে। না হলে শাশুড়ী ডাক দেবেন।" এই রকম আরম্ভ যখন হল, তখন আমার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হবে তা দেখতেই পাচ্ছিলাম, তবু তখন পিছিয়ে প্রয়োজন নেই, এই ভেবে আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, "বৌদি, কেন তুমি এমন করো ? সত্যি তুমি যদি সব সময় এই রকমই করো তাহলে ভবিষ্যতে কী হবে ? এখন ঠাকুমার কী অবস্থা হবে তা তো তুমি বুঝতে পারো ? তুমি যদি ওঁকে যত্ন না করো, আমাদের সঙ্গে যেমন খিট্‌মিট্‌ ক ‍ ‍া, ওঁর সঙ্গেও যদি তেমনি করো, তা হলে উনি কেমন করে সুখ-শান্তি পাবেন, বলো তো ?"

"হ্যাঁ, আমি ওই রকম খিট্‌মিটে !" বৌদি রেগে উদ্ধত ভাবে জবাব দিল।

কিন্তু আমি সে-দিকে লক্ষ্য না করে বললাম, "বৌদি, সত্যি সত্যি ঠাকুমার জন্য যার মন কেমন করবে, এমন নিকট সম্পর্কের বউ তুমিই তো ?..."

'আ মরণ ! কেন ? আমার শাশুড়ী নেই নাকি ? আমি যে একেবারে অসভ্য, বোকা, হাঁদা !" সে খোঁচা মেরে বলল।

তবু আমি সে-কথা শুনেও শুনলাম না। যেন আমি ও-কথা শুনিনি এই ভাবে বললাম, "দাদা ওঁকে কত ভালোবাসে, জানো ? দ্যাখো, বৌদি ভেবে দ্যাখো। অমন করো না তুমি। দাদা হয়তো কখনো ভুল করে কিছু বলেছে, কিন্তু..."

"হয়েছে তোমার কথা শেষ? আমি নির্বোধ ও-সব কিছু বুঝতে পারি না, তাই জিজ্ঞেস করছি আমায় ও-সব বলে দরকার কী?" হঠাৎ সে বলল। সে-কথা শোনা মাত্র আমি মনে কত কষ্ট পেলাম তা কি কেউ বুঝবে? আমার ভারি কষ্ট আর একটু রাগও হল, আর সেই রাগেই আমি বললাম, "হ্যাঁ হয়েছে, তুমি যেতে পারো!" এই বলে আমি চুপ করে বসলাম।

এর পর বৌদির স্বভাব সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ থাকা সম্ভব ছিল কি? নিশ্চয়ই আমি ভাবলাম যে ওর কাছে দাদা,—শুধু দাদাই কেন—কেউই সুখলাভ করবেনা, আর আমি বিষণ্ণ হয়ে বসলাম। এ ঘটনা আমি দাদাকে মোটেই বলিনি। কেননা, তাতে তাদের দু'জনেতে শুধু অসদ্ভাব বাড়বে। তাছাড়া তাতে কোনো লাভ ছিল না।

যেদিন বৌদির সঙ্গে এই সব কথা হল, সে-দিনই দুপুরে আমি শ্বশুরবাড়ি গেলাম। রাত্তিরে আমাদের বোম্বাই যাবার কথা ছিল।

ঠিক বেরুবার সময় ঠাকুরের সামনে রীতিমতো পয়সা সুপুরি রাখতে উনি ভুলে গেলেন! অমনি শংকরঠাকুর "ওরা যে সংস্কারক, ও-সব রীতিনীতির ধার ধারে না।" এই খোঁচা মারলেন। ঠিক সময় আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। তখন চেঁচিয়ে "সংস্কারক সৌভাগ্যবতী ভব, সংস্কারক-বিজয়ী ভব" এই বলে হেঃ হেঃ হেঃ করে নিজেই হাসতে লাগলেন। রাগে আমার গা জ্বলে উঠল। উনি তো রেগে আগুন হলেন। কিন্তু কী করবেন? মুখ বুঁজে গাড়িতে চড়ে রওনা হলাম।

বোম্বাই এলে পরে

সম্প্রতি যে-সব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি মনে পড়ে মন বিষন্ন হয়েছিল, নিজের মনের মতো হয়নি বলে মনে মনে জ্বলে প্রতিহিংসা তুলবার জন্যই বোধ হয় শংকরঠাকুর আমরা বেরুবার সময় হেঃ হেঃ হেঃ করে হেসে খোঁচা মেরে যে কথা বলেছিলেন, তাতে রাগ হয়েছিল, কিন্তু 'কিছুদিন তবু এই ঝঞ্ঝাট আর যন্ত্রণা থেকে বাঁচলাম' ভেবে মন একটু স্বস্তিও বোধ করছিল! এই রকম নানাবিধ আবেগে মন ভরে ছিল, তাই আমাদের দুজনের মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরুল না। শেষে মনের কোন ভাবটা প্রবল হয় এই ভেবে আমার মনে কেমন যেন গোলমাল চলছিল। তবে উনি কী করছিলেন কী জানি? তেমনি, মা কী ভাবছিলেন তাও আমরা অনুমান করতে পারছিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে উনি মাকে বললেন, "আমার বড় ভয় করছিল যে না জানি তুমিই কী করো? ভাবতাম যে ঠিক বেরুবার সময় শকংরমামার যাচ্ছেতাই কথা শুনে মনে কষ্ট পেয়ে তুমি বুঝি বলবে, 'বেশ তবে আমি ওর সঙ্গে যাচ্ছি না'। আব আমার তো দৃঢ় সংকল্পই যে তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।"

"আমিই বা তোমায় ছেড়ে থাকব কেন? এখন তুমি যাই কর না কেন, আমি তোমায় ছেড়ে দূরে থাকব না। তুমি ভেবে-চিন্তে চললেই হবে। ওরা যখন ভালোবাসে না, তখন সে রকম কিছু নাই করলে, তাতে ক্ষতি কী?"

"কিন্তু মা, তুমি নিজেই দেখতে তো আমরা কী করতাম আর কী না করতাম? একদিনও কি তুমি তাতে কিছু অনুচিত দেখেছ? বেশ কেউ কি সেখানে মন্দ লোক ছিল? তুমি প্রত্যক্ষ দেখতে, তাই রক্ষে। যদি শুধু কানে শুনতে—আর তাও যদি শংকরমামার মশলা-মাখা খবর কানে শুনতে—তাহলে তো তুমিও বোধহয় ওদের মতোই ভাবতে।"

"আমি কিছু ভাবতাম না, আর ভাববও না। তুমি বেশ স্বচ্ছন্দে থাকলেই হল। ছেলেবেলা থেকে…"

কিন্তু হঠাৎ গাড়ির অন্য যাত্রীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হল, আর মায়ে-ছেলের সেই কথা সেইখানটাতেই থামল। সে কথা আর মার মুখের সেই রকমই আরো অনেক কথা আমার মনে পড়ছে আর তাঁর সেই প্রেমময়ী পবিত্র মূর্তি চোখের সামনে দেখতে পেয়ে ভাবছি, আমার মতো অভাগনীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তাঁর মতো গুণবতী, সতীর ভাগ্যে এরকম আপদ—তবে কি সেই পরম ন্যায়বান, সত্যনারায়ণ পরমেশ্বরের বিষয়ে আমাদের কল্পনা একেবারে ভুল? যে স্বপ্নেও কোনোদিন কারো অনিষ্ট চিন্তা করে নি—জাগ্রত অবস্থায় করা তো অসম্ভবই—সে করুণাময়ীর কপালে অমন অসহ্য আঘাত তার সারাটা জীবন বিপদে আর অন্যকে নির্ভর করে যাপন করা দরকার হয়? কিন্তু ঘটনা যে কেন ঘটে তা আমরা যখন বুঝতে পারি না, তার জন্য বৃথা কুতর্ক করে সেই নারায়ণকে দোষ দেওয়া কেন? কোন ঘটনা কখন, আর কেন, যিনি ঘটান তা তিনিই জানেন এই বলে চুপ করে বসা ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি?

উপরে যা লিখেছি তার চেয়ে বেশি কিছু কথাবার্তা হল না, আমরা নিরাপদে বোম্বাই পৌঁছুলাম। আমাদের বন্ধুরা আমাদের পথ চেয়েই ছিল। তারা এ বছর কোথাও যায় নি। 'গণপতরাও' 'গণপতরাও' করে, যাঁর নাম না নিয়ে আমাদের একটি দিনও কাটত না, সে ভদ্রলোকটি এখনো আসেন নি। রোজ তাঁর কথা হত। রোজ তাঁর বাড়ির লোকের বিষয়ে কথা হত। আর প্রতি মুহূর্তে দেখতে পেতাম যে তাঁদের সকলের মনে গণপত-রাওর উপরে নিতান্ত ভালোবাসা ছিল। তাই আমি আগে থেকেই তাঁকে দেখবার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আমার বড় আশা ছিল যে এবার বোম্বাই গিয়ে তাঁকে দেখতে পাব, কিন্তু বোম্বাই এসে সে আশা বৃথা হল।

বোম্বাই আসার পাঁচ-ছদিন পরেই আমাদের সেই আগেকার নিত্যকর্মের ধারা শুরু হল। পাঁচ ছদিন আমরা পুণার কান্নাকাটি, তাতে মনে কত দুঃখ হল, শংকরমামার গল্প, তাঁর সেই আশীর্বাদ, তাঁর ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি বর্ণনা করে হাসি-তামাশায় কাটিয়ে দিলাম। নিত্য কর্মের ধারা শুরু হতেই অবশ্য পড়াশোনা আরম্ভ হল। লক্ষ্মীবাঈ আর যশোদাবাঈ এই দুজন শিক্ষিকা আমাকে কত কাজের শিক্ষা দিলেন! তেমনি প্রত্যেক শনিবারে, আগের সেই জায়গায় আমাদের প্রবন্ধ পড়া, ছুঁচের কাজ করা, শেলাই করা ইত্যাদি

নিয়মিত ভাবে হয়ে দিনে দিনে আমার মন উন্নত হতে লাগল। মা আর গোপিকাকাকিমার স্বভাবের সুন্দর মিল হয়েছিল, তাঁরা দুজনে সংসারের সব দায়িত্ব আমাদের উপরে সঁপে দিয়ে নিজেরা সত্য-সত্যই হরিনামকীর্ত্তন করতে লাগলেন। দুপুর বেলার রান্না কিন্তু মা আমাকে কক্ষণো করতে দেন নি। আর আমার হাতের রান্না না খাওয়ার সংকল্পও তিনি গোপিকা-কাকিমার মতোই অটল রেখেছিলেন। নানা সাহেবের মতোই উনি কতো অনুরোধ করে বুঝিয়ে বলতেন, কিন্তু নাঃ, দুজনের একই কথা—"আমাদের হাত পা অক্ষম হলে ওরা তো আছেই। তখন আমরা নিশ্চয় অন্য কোথাও খাবো না, কিন্তু ততদিন না খাওয়াই ভালো, তাই ভগবান যা ঠিক করে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে আমরা যাব কেন? আর আমরা দুপুরের রান্না করি, সেই মানায়। না হলে লোকে বলবে, 'বৌ দুটোকে খাটিয়ে খুটিয়ে বুড়িরা বসে খায়।'" এই রকম আরও অনেক কিছু বলে তাঁরা দুজনে রান্না করবার জিদ ছাড়তেন না। অনেক রকমে বুঝিয়ে বলা হল, কিন্তু দেখা গেল যে তাঁরা শুনতেই চাইতেন না। শেষে সবাই সে অনুরোধ করা ছেড়ে দিল। মা তো আমাকে খুশি হয়ে বলতেন, "সেই অমুককে একটা টুপি বুনে পাঠিয়ে দিও বৌমা; ঠাকুরঘরের গোপাল-কৃষ্ণের জন্য একটা ভালো জামা শেলাই করে দিও," ইত্যাদি।

এই রকম রীতিমতো সব কাজকর্ম শুরু হল। আমি তখন মারাঠি বেশ ভালোই লিখতে পড়তে পারতাম। ইংরেজি এ, বি, সি, ডি, পড়া আরম্ভ হল। কিন্তু আমি মোটেই ভাবিনি যে এখন ইংরেজি আরম্ভ করে আমি বেশ সুন্দর পড়তে পারব আর বড় জ্ঞানী হব, আমার পোড়া কপাল অবিলম্বেই আমাকে রসাতলে অন্ধকারে কোণ ঠাসা করে ফেলল, তাই আমার আর শিক্ষাও হল না। যদি আমার মন কিছু সুশিক্ষিত হয়ে থাকে, যাকে জ্ঞানীজন সুশীলতা বলে তা যদি আমি কিছু অর্জন করে থাকি, তা হলে তা আমার সেই আধভাঙা ইংরেজি শিক্ষার ফলে আর বিশেষতঃ মারাঠি জ্ঞানের, আর জ্ঞানীলোকের সংগলাভ, তাঁদের সহবাস, তাঁদের শিক্ষা, উপদেশ আর তাঁদের উদাহরণের ফলেই। শুধু ইংরেজি কেন, যদি আরও গণ্ডা কত ভাষা শিখতাম, আর যদি যাঁর সঙ্গে আমার জন্মের মতো বাঁধন হল, তা যদি না হত, তা হলে লক্ষ্মীবাঈ যশোদাবাঈ এঁদের স্নেহ আমি পেতাম না, তাঁরা দুজন, বিষ্ণুপন্ত, নানা সাহেব, গণ-

পতরাও এঁদের সঙ্গে বসে যে অলোচনা করতেন তা কানে শুনতে পেতাম না, শনিবারের দুপুরের সভায় সেখানে যাঁরা আসতেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরস্পরের মত জানতে পারা সম্ভব হত না। বোম্বায়ের মতো শহরে নিত্য যে ভালো ভালো ঘটনা ঘটে তা কানে শুনতে পেয়ে, পারিতোষিক বিতরণ-সমারোহের মতো ঘটনা চোখে দেখে মনের উপরে যে প্রভাব হয় তা যদি না হত, তাহলে কি লাভ হত? আমার দুর্ভাগ্যক্রমে—আর তাও একজন বিশেষ মানুষের রূপ নিয়ে সে দুর্ভাগ্য আমার পিছন নিয়েছে তাই—আমার সে সব লাভ আর কাউকে দেওয়া আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। সে কথা আলাদা, কিন্তু আমার এই জীবনকাহিনী থেকে এ সব লাভের উপযোগিতা আর আবশ্যকতা যদি লোকে বুঝতে পারে—আর যদি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পায় যে সমাজরক্ষী আর তার ভক্ত বলে ভাণ করে ঢাক বাজিয়ে যারা বেড়ায়, তারা কী ক্ষতিই না করেছে, তা হলেই যথেষ্ট।

দাদার দুটি চিঠি

আগের পরিচ্ছেদে আমি লিখেছি যে আমাদের দৈনিক কাজকর্ম রীতিমতো শুরু হল, আর আমরা আগের মতো রাত্তিরে ছাদে বসে গল্পসল্প করতে লাগলাম। আবার একবার শুধু এই বলছি যে (এ সব কথা বারবার বলে আমি যখন ক্লান্ত হচ্ছিনে, তখন আমি নিশ্চয় জানি যে যাঁরা আমার এই জীবনচরিত পড়বেন তাঁরাও ক্লান্ত হবেন না, আর চর্বিতচর্বণ করেছি বলে আমাকে দোষ দেবেন না) রোজ কিছু কিছু নতুন—অন্তত আমার পক্ষে নতুন—গল্প-আলোচনা করে আমাদের দিন কাটতে লাগল। সেই দেবী দুটির সঙ্গে বাসের ফলে আমার বুদ্ধি আর মন কত বিকশিত হল, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি অভাবে সবই বৃথা, একথা অন্তঃকরণে ভেবে আমি সম্পূর্ণ মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলাম। ছেলেবেলা থেকে যে অনাবশ্যক লজ্জাশীলতা শিক্ষা পেয়েছিলাম তা আস্তে আস্তে কম হয়ে যতটুকু উপযুক্ত আর আবশ্যক ততটুকু লজ্জাশীলতা আমার রইল, ইত্যাদি ইত্যাদি। তেমনি, আমবা ছ' সাত জন রোজ রাত্তিরে ছাদে বসে কত রকমের গল্প করতাম, আমাদের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে আলোচনা চলত, পুরুষরা তাঁদের আর আমরা মেয়েরাও নিজের নিজের অভিজ্ঞতা, মতামত স্পষ্ট বলতে লাগলাম। কোথাও সভা, পারিতোষিক-বিতরণ সমারোহে গিয়ে, পরে সে সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে কখনও বালবিবাহ, কখনো স্ত্রীশিক্ষা, কখনো সংবাদপত্র, কখনো উপন্যাস ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা করে কত সুখে দিন ভালো কেটে গেল, তেমনি কোনো নতুন বই বেরোলে কিছুদিন আমাদের কেউ রাত্তিরে সেই বইটা পড়ত ও আর সকলে শুনত, মাঝে মাঝে তার গুণের বিষয়ে মন্তব্য করতাম। তাতে লিখিত ব্যাপারের সত্যাসত্য বিষয়ে বাদানুবাদ হত, কখনো কোনো বই ভালো কিংবা মন্দ হলে, আমাদের একজনকে আমরা সে বিষয়ে লিখতে বলতাম, সেই সমালোচনা সকলের সামনে পড়ে শোনালে সেটা খবরের কাগজে প্রকাশ করার জন্য পাঠান হত, ইত্যাদি অনেক প্রকারে বোম্বায়ের দিনগুলি এত সুখে কেটে গেল যে তার যথাযোগ্য বর্ণনা

করার ক্ষমতা আমার নেই। দ্বিতীয়তঃ যদি বর্ণনা করার চেষ্টা করি, তবু সে ঘটনা আমরা নিজে যত সুখকর আর আনন্দদায়ক ভাবতাম, সকলে তত ভাববে না। তাই শুধু সেদিনের যে সব প্রসঙ্গ আমি নিজে মহত্বপূর্ণ ভাবি সেগুলোই বলব। তাতে 'অল্পেই সুরুচি' এই নীতিটিও অক্ষুন্ন থাকবে।

দাদার চিঠি থেকে আমরা সেখানকার খবর জানতে পেতাম। আজকাল সে তার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত তাই সব কিছু বিস্তৃতভাবে লেখার সময় পেত না। তাই আমিও তাকে তেমন অনুরোধ করতাম না। আমি কিন্তু আমাদের এখানকার সব খবর সময়ে সময়ে তাকে লিখে পাঠাতাম। এই রকমে প্রায় তিন মাস কেটে গেল। এই তিন মাসে শংকরঠাকুরের যে-সব চিঠি আসত, সেগুলি অবশ্যই দম্ভপূর্ণ থাকত, তাছাড়া সময়মতো, দরকার মতো আর খেয়াল মতো কখনো কখনো তাতে আমাদের নিন্দা আর কখনো বা প্রশংসা করতেন। এই ছাড়া সে তিন মাসে বলবার মতো উপযুক্ত কিছু হয় নি। দুর্গীর অবস্থারও বলবার মতো কোনো তফাত হয়েছিল বলে দাদা তার চিঠিতে কখনো লেখেনি। একটা চিঠিতে কিন্তু দাদা লিখেছিল যে দুর্গীর স্বামীর এখনও কোনো ঠিকানা নেই, আর দুর্গী তার খোকার যত্নে এত নিমগ্ন ছিল যে তার ফলে তার নিজের শরীর আস্তে আস্তে ভালো হতে আরম্ভ হয়েছিল। তার দু-তিন খানা চিঠি থেকে বুঝতে পারলাম যে দাদা এখন পরীক্ষা শেষ করে এখনকার লোকের মধ্যে এসে মিশবার জন্য বড্ড উতলা হয়েছিল। দাদা আর আমি দুজনেই ভাবতাম যে তাহলে সত্যি সুন্দর হবে।

একদিন সন্ধ্যে বেলা দাদার একখানা ছোটো চিঠি এল, তার মর্ম বড় অদ্ভুত ছিল :

"গয়নার বিষয়ে আমি যা বলেছিলাম, তাই বোধ হয় সত্যি। পরশুদিন ঠাকুমার একজন পুরানো বন্ধু তোমার আদুরে বৌদিকে নিমন্ত্রণ খেতে ডেকে-ছিলেন। ঠাকুমা মাঈসাহেবকে তাঁর গয়না পরতে বললেন। তখন নগগোণ্ডার বিষয়ে কথা-কাটাকাটি হল, আর ঠাকুমা মাঈসাহেবের গয়নারও খোঁজখবর জিজ্ঞেস করলেন। মাঈসাহেব সেই কথাটা এড়াবার খুব চেষ্টা করলেন আর ঠাকুমাকে 'আপনার সে খবরে কাজ কী?' —এই মর্মে উত্তর দিলেন।

"কাল মা-মেয়েতে ঝগড়া হল। ঝগড়ার দু' একটি কথা সহজেই আমি

শুনতে পেয়েছি। তা শুনে আমার মনে তো আর কোনো সন্দেহই নেই। 'তুমি যা খুশি করো, কিন্তু সেই পোড়ারমুখীর কাছ থেকে···নিয়ে এসো। ও তোমারই বিশ্বাসের লোক। তুমিই তো আমায় বললে ওর কাছে··· আমি শুনতে চাই নে।'

"হ্যাঁ দ্যাখো! মরণ আর কি! আমি মিছিমিছি কাশী ছেড়ে এলাম! আবার চলে যাই, সেই বেশ!'

"যেখানে খুশী যাও—নিমতলায় যাও -কিন্তু জিনিসগুলো এনে দিয়ে তবে যেও।'

"তারপর আমি কিছুই শুনতে পেলাম না। কিন্তু যতটুকু শুনেছি তাতে ঝগড়ার কারণ আর গয়নার পাত্তা যদি না বুঝি, তা হলে আমার বুদ্ধি কী?

"এ সব ঘটনা তোমায় লিখেছি; এখন আমার অনুমানই সত্যি বলে তুমি বিশ্বাস করবে তো? না এখনও আমার কথা যাচ্ছেতাই একটা কিছু?"

এইটুকুই সে চিঠিতে ছিল। আর কিছু ছিল না। চিঠিটা খুব তাড়াতাড়ি লেখা ছিল।

এই গোলমেলে চিঠি যখন পেলাম, তখন আমার মনের কী রকম অবস্থা হল, তা কি কেউ বুঝতে পারবে? মাঈসাহেব আর তাঁর মার যে কথোপকথন দাদা শুনেছিল তা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিল, তার ফল আমার মনে কী হয়ে থাকবে, তার কল্পনাও কি কেউ করতে পারবে? পেটের মেয়ে মাকে নিমতলায় যাও বলল, এমন উদাহরণ কি কোথাও আছে? তাদের সেই কথোপকথনের সম্বন্ধে আমি যত বেশি ভাবতে লাগলাম, ততই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে মাঈসাহেব নিজের মা'র একনিষ্ঠ বন্ধুকে—আমি যে স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিলাম তাকে—সেই গয়নাগুলো হজম করবার জন্য কিংবা অন্য কোনো কারণে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি বোধহয় গয়নার সন্ধান পর্যন্ত জানতে দিচ্ছিল না।

এসব অনুমান আমি করলাম। কিন্তু তবুও, সেই স্ত্রীলোকটিকে মাঈসাহেব গয়না দিলেন কী করে আর কেন, এই প্রশ্নের উত্তর আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। মাঈসাহেব সাধারণ মেয়ে ছিলেন না, অন্ততঃ যেমন-তেমন একটা ধাপ্পাবাজিতে তিনি ভুলতেন না, এই ধারণা তখন আমার ছিল। তবে সত্যি ব্যাপারটা কী ছিল তা বলতে পারি না। আমি নিজে চিঠিটা পড়ে ওঁকে দিলাম; উনি ঠিক কিছু অনুমান করতে পারলেন না। 'নিজেরই

দাঁত, আর নিজেরই ঠোঁট'[১] এই ভেবে আমি সে চিঠির মর্ম অন্য কাউকে বলিনি। নিজের মনেই চেপে রাখলাম।

আন্দাজ আরও একমাস কেটে গেল। সেই সময়ে দাদার বেশী চিঠি আসেনি। মাসের শেষে আর একখানি চিঠি এল, তাতে গয়নার বিষয়ে বেশী কিছু ছিল না। শুধু "সুন্দরীর বিয়ের কথা শুরু হয়েছে। ঠাকুমা যখন তখন সেই কথাই পাড়েন। আমি তাঁকে 'তুমি আর এ বিষয়ে বেশী কিছু বোলো না' বলে অনুরোধ করি, কিন্তু ওঁর সেই স্বভাব, কাজেই কী উপায়? রোজ সুন্দরীর বিয়ের কথা তুলতে লেগেছেন, আর দেখতে পাওয়া যায় যে বাবারও সেই ইচ্ছে। তিনিও যত শীগগির পারেন সুন্দরীর বিয়ে দিয়ে ফেলতে চান। আর যমুদিদিমণি, সত্যি বলব? আমিও ভাবতে আরম্ভ করেছি যে ওর বিয়ে হয়ে গেলেই ভালো। এখন বাড়িতে ওর যা অবস্থা, তার চেয়ে বেশী খারাপ অবস্থা শ্বশুরবাড়িতে হতে পারবে বলে মনে হয় না! ঠাকুমার আদরে তার স্বভাব কেমন যেন অদ্ভুত হয়েছে। ঠাকুমা তাকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসেন, তাকে কারো হুঁ করে চোখ রাঙাবার উপায় নেই। ঠাকুমার হাতে কোনো অধিকার নেই, তবুও উনি কিছু না কিছু বলতে যান। তাতে অবশ্যই অপমান সহ্য করতে হয়, আর সুন্দরীর আরও অবহেলা হয়। আমার অবস্থা বাড়িতে না থাকার সময় সমান! কিন্তু আমার বড় আশ্চর্য্য মনে হয় যে বাবার সেই আগেকার কড়া স্বভাব গেল কোথায়? আজকাল তিনি এত বেশী বেশী নরম হচ্ছেন যে তার সীমা নেই! তিনি কি এখনো সেই গয়নার কথা জানতে পারেন নি? যদি বলি জানতে পেরেছেন, তবে এতদিনে রাগের চিহ্ন একেবারে দেখতে পাইনি। যদি বলি, জানতে পারেননি, তবে এতদিনে তিনি সে কথা জানতে পারলেনই বা না কেন?—" এই সব কথা দাদা লিখেছিলেন।

দাদার যখন এইরকম চিঠি আসত, তখন আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হত। ঠাকুমার জন্য বড্ড মন কেমন করত, ভাবতাম পরে সুন্দরীর কী হবে? ঠাকুমার স্বভাব একটু কেমনতরো, কিন্তু তিনি সুন্দরীর বিয়ের জন্য উতলা হয়েছিলেন, তা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। আর দাদার চিঠি পড়ে আমিও ভাবলাম যে সুন্দরীর বিয়ে হয়ে গেলেই ভালো! সে এখন বিয়ের

১ একটি মারাঠি প্রবাদ—এর অর্থ স্পষ্ট।

যোগ্য (শুধু তা নয়, পুরানো মত অনুসারে একটু বেশী বড়ই) হয়েছিল বলতে কোনো বাধা থাকতে পারে না। এই মনে করে আমি ওঁকে বললাম "কলেজ-টলেজ, নইলে আর কোথাও ভালো পাত্র দেখ", তখন প্রথম উনি আমাকে ঠাট্টা করলেন, কিন্তু সব সত্যি ব্যাপার যখন বুঝিয়ে বললাম, "আচ্ছা, দেখব" বলে আশ্বাস দিলেন। কী আশ্চর্য! তার পরের দিন উনি দাদার একটা চিঠি পেলেন। তাতেও আমার সেই অনুরোধই সে করেছিল। শুধু লিখেছিল যে বাবার আদেশে সে চিঠিটা লিখেছিল।

ঘরের বাইরে যাওয়া

একদিন সন্ধ্যাবেলা খাওয়া-দাওয়া হওয়ার পর বড্ড গরম হচ্ছিল তাই বিষ্ণুপন্ত বললেন, "চলুন, আজ সবাই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই।" যেদিনের কথা লিখছি, সেদিন বোম্বায়ে বিষম গরম পড়েছিল। লোকে বলে যে তার চেয়ে গ্রীষ্মঋতু বরং ভালো। আমার সে বিষয়ে কোনোই অভিজ্ঞতা ছিল না। আমরা গ্রীষ্মকালে সেখানে ছিলামই না! কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের শেষ থেকে এমন ভয়ানক গরম পড়তে লাগল যে বলবার জো নেই। আর যে-বিশেষ দিনের কথা আমি লিখছি সেদিন তো গরম হয়ে প্রাণ একেবারে ছটফট করছিল। এমন সময় ও প্রস্তাব কি কেউ অগ্রাহ্য করে? নানাসাহেব নিজের মাকে আর আমাদের মাকে জিজ্ঞাসা করবার ভার নিলেন। আর তাঁদের অনুমতিও আনলেন। সমুদ্রতট আমাদের বাসা থেকে বেশী দূরে ছিল না। তাই আমরা সকলে পায়ে হেঁটেই সেখানে গেলাম।

সমুদ্র খুব শান্ত ছিল। মৃদু মৃদু বাতাস বইছিল, তাই কিছুক্ষণ সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে বড় খুশি হলাম। এর আগে আমি এমনি ভাবে সকলের সঙ্গে কক্ষনো বেড়াতে আসি নি তাই আমার একটু একটু লজ্জা বোধ হল। কিন্তু সেখানে আমাদের মতোই আরও পাঁচ-ছয়জন বেড়াতে এসেছিলেন দেখে, আগেই আমার যে-মনটা তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছিল সেটা আরো একটু শক্ত হল। বরং যারা এ সব কথায় ব্যঙ্গ করে নাক বাঁকায়, হাসে, কুৎসা করে, তাদের মূর্খতার জন্য আমার হাসি পেল, আর কেবল কুসংস্কারের দাসত্বে দুর্বল হয়ে এমন লোক জীবনে কতোরকম আনন্দ হারিয়েছে ভেবে তাদের দয়া করতে ইচ্ছে হল। আমার মনে পড়ছে যে উনি একবার আমাদের বৈঠকে বলেছিলেন. "সমান বয়সের স্ত্রী আর পুরুষ, ভাইবোন, মা-ছেলে দুদণ্ড বেড়াতে গিয়ে সুখে কাল কাটালে যারা সহ্য করতে পারে না, নিজে সে রকম করা দূরের কথা, আর কেউ তেমন করলে যারা দেখতে পারে না, তাদের মতো ক্রীতদাসের অবস্থার উপযুক্ত লোক কি আর কেউ থাকতে

পারে?" আমি বিশ্বাস করি যে ওঁর সেকথা একেবারে সত্যি। আমরা মেয়ে-জাতি এমন কী পাপ করেছি যে খোলা হাওয়া খাওয়াও আমাদের পক্ষে অনুচিত?

একজন সংস্কৃত কবি বলেছেন যে মেয়েরা যেন মনে রাখে যে তাদের পক্ষে ঘরের বাইরে পা ফেলা মানে কেউটে সাপের ফণা মাড়ানো। এ কথা প্রাচীন কালে হয় তো সত্য ছিল, কিন্তু আজও আমি আমার ভগিনীদের সেই কবির উক্তিই মনে রাখতে বলব। তার পরে এই কথা বলব যে "সে কবি 'মেয়েরা যেন কক্ষনো ঘরের বাইরে না যায়,' এই ইঙ্গিত করে ওকথা লিখেছেন, আমি আমার বোনদের এই উপদেশ দিতে চাই যে 'ঘরের বাইরে' পা ফেলা মানে কেউটে সাপের ফণা মাড়ানো এ কথা মনে রেখো, কিন্তু সে কাজ করতে ভয় কোরো না। আমাদের দুয়ারে এই কুসংস্কাররূপী কেউটে সাপ কত কাল পড়ে আছে। কেউ—বিশেষত মেয়েরা—যদি তাকে ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তা হলে বুঝতে হবে যে তক্ষুনি ফোঁস করে তার প্রকাণ্ড ফণা খাড়া করে নিজের লক্ষ লক্ষ মুখে সে-গোখরো সাপ তাকে দংশন করবেই করবে! এই যখন অবস্থা, তখন আর কত দিন ঘরে কোণঠাসা হয়ে থাকব? আমরা আর আমাদের জীবনসঙ্গী উভয়ে মিলে এক সঙ্গে যদি সে-সাপের মাথায় সজোরে পা দিই, তা হলে তার কয়েকটা মুখ তো তবু চ্যাপটা হয়? তার গায়ে পা পড়লে সে কামড়াবে বলে ভয়ে ভয়ে মরণকাল পর্যন্ত ঘরের কোণে বসে ছট্‌ফট্‌ করার চেয়ে আমাদের পতির সাহায্যে সেই দুষ্ট সর্পিণীর গলায় সজোরে পা দিলে কতো সুখ পাওয়া যাবে! এ কথা কি কেউ কখনো আগে ভেবে দেখেছে? আমরা মেয়ে জাতি পিছিয়ে থাকি আর অন্যকেও পিছনে টানি বলে আমাদের দোষ দেওয়া হয়; সেই দোষ দূর করা চাই; এজন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা দরকার। এটা তোমরা কেমন করে ভুলে যাও যে স্বামীর সঙ্গে সন্ধ্যা বেলা বসে গল্প করলে কিংবা পড়লে, কিংবা খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসবার জন্য কয়েক পা এদিক ওদিকে ঘুরে এলে যে-সর্পিণী তাকে আমরা ডিঙিয়েছি বলে রাগ করে নিজের লক্ষ লক্ষ ফণায় ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসে, মাথায় পা দিয়ে তাকে পিষে ফেলার কাজটা আমরা আর আমাদের স্বামীরা পরস্পরকে সাহায্য না করলে কক্ষনো সফল হবে না? আমরা একলা সে-কাজ করতে পারব না এটা তো স্পষ্টই; কিন্তু তিনিই বা একলা সে কাজ

কী করে করবেন? এ সবকিছু ভেবে আর সেই সংস্কৃত কবির উক্তির মতো পিছপাও না হয়ে, দুয়ারের সামনের ওই কুসংস্কাররূপী সর্পিণীর মাথা পায়ের তলায় মাড়িয়ে পিষে ফেলবার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য উদ্যত হও।"

এই উপদেশ আমি পালন করব বলেছি, তার চেয়ে করেছিলাম বলাই ভালো, কেননা আমি আমাদের সেই শনিবারের সভায় একদিন একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তার অনেক দিন পরে আবার সেটা অনেক চেষ্টা করে ভালো করে লিখেছিলাম, আমার এই উপদেশ হচ্ছে সেই প্রবন্ধেরই একটা অংশ। সেই প্রবন্ধের বিষয় ছিল, "ঘরের বাইরে যাওয়া।" আমার তখন লেখা সেই পাতাগুলো এখনও আমার সামনে পড়ে আছে। থাক। যা বলছিলাম তাই আবার শুরু করি।

আমরা সেখানে বেড়াতে বেড়াতে সহজেই সেখানকার একটা বেঞ্চির উপরে বসলাম, তার পরে নানা রকমের গল্প আরম্ভ হল। হঠাৎ গল্প আরম্ভ হবার কারণও তেমনি আশ্চর্য রকমের ছিল। আমরা যখন বসে কথাবার্তা বলছিলাম তখন বিষ্ণুপন্ত আর নানাসাহেবের জানাশোনা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। কিছু কথাবার্তা হবার পর সেই ভদ্রলোকটি চলে গেলেন, তখন বিষ্ণুপন্ত তাঁর অদ্ভুত কাহিনী আমাদের বললেন। সেই ভদ্রলোকটির বোন যখন ছ'বছরের তখন তার বিয়ে হয়। তার পরে দশ বছর হতে না হতেই তার স্বামী মারা গিয়ে তার জীবন দুঃখময় হয়ে গেল। তার ভাই লোক ভালো, তাঁর মতও ভালো; বোনের বরাতে সংসার সুখ নেই দেখে, অন্ততঃ কিছু শিক্ষা-টিক্ষা দিয়ে তার ভালো ব্যবস্থা করবার জন্য তাকে কোংকন থেকে বোম্বাই নিয়ে এসে ইস্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মা-বাবা খুব হৈ চৈ কাণ্ড বাধালেন কিন্তু সে ভদ্রলোকটি তাঁদের কথায় কান দিলেন না। নিজের কাজ রীতিমতো করতে লাগলেন। তিনি নিজে বেশী মোটা মাইনে পেতেন না, তাই তাঁরা ব্যারাকে থাকতেন। তবুও তিনি শান্তভাবে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, এই রকম তাঁর আচরণ ছিল। কিন্তু ব্যারাকের নীচ লোকরা তাঁকে ভয়ানক জ্বালাতন করতে লাগল। মেয়েটিকে যাচ্ছেতাই চিঠিপত্র লিখতে লাগল, তার সামনে হাজার রকম নীচ ছোট কথা বলতে শুরু করল, পাজিপনার একেবারে পরাকাষ্ঠা করল। তার বাবাকে "আপনার মেয়ের চরিত্র বিগড়ে

গেছে, তার ভাই তাকে সাহেবের কাছে পৌঁছে দিয়েছে; সম্প্রতি তার পুনর্বিবাহ হয়েছে; সে খ্রীষ্টান হয়েছে" ইত্যাদি নানা রকমের চিঠি, আর একবার জরুরী তারও পাঠিয়েছিল। তার ভাইকে আর তাকে যাচ্ছেতাই চিঠি লিখত। তার সম্বন্ধে যত রকম সম্ভব নীচ, পাজি কুৎসা রটিয়ে দিল! আর এত সব করার কারণ কী? তা কি কেউ জানে?— সে এখনো চুল কাটেনি, আর ইস্কুলে যেত, সেই নাকি তার আর তার ভায়ের মহা অপরাধ! মহা পাপ! এই পাপের জন্য যাঁরা নিজেকে ধর্মমার্তণ্ড মনে করতেন তাঁরা—নিজেরা আস্ত উট গিলে অন্যকে ছোট্ট পোকা মাকড় খেতে দেখে 'হুঁহুঁ' করে নাক বাঁকাতেন এমন সব হতভাগা লোক—তাদের ভয়ানক জ্বালাতন করতে লাগল। কিন্তু ভাইয়ের উপর নির্ভর করে, কাউকে ভয় না করে মেয়েটি বেশ দিন কাটাচ্ছিল। দিনে দিনে তার বেশ সুন্দর শিক্ষা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে সে বেশ ভালো কর্মনিপুণ মহিলা হয়ে দাঁড়াবে। তার মা তো ততদিনে মারাই গিয়েছিলেন, আর বাবার রাগও খানিকটা শান্ত হল, তিনিও বকুনি কিছুটা কম করেছিলেন। সেই ভদ্রলোকটির মহৎ আকাঙ্ক্ষা বাড়তে লাগল। কিন্তু নিষ্ঠুর কালপুরুষের মনে তাকে বেশী সুখ দেবার ইচ্ছে ছিল না, সে মেয়েটিকে হঠাৎ টেনে নিয়ে গেল! তখন থেকে ভদ্রলোকটি পাগলের মতো হয়েছিলেন। জীবনের উপরে তাঁর কিছুমাত্র মমতা রইল না! যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতেন, যা খুশি করতেন। এই কাহিনী আমি একেবারে সংক্ষেপে বলেছি, কিন্তু বিষ্ণুপন্ত যখন তার বর্ণনা করলেন তখন আমাদের গা শিউরে উঠল। লোকে সে-ভাইবোনকে যে-যন্ত্রণা দিয়েছিল, তা যদি আমি বিস্তৃতভাবে বলতে যাই, তা হলে সেটা একখানা ছোটো বই হবে!

এখানে শুধু এই বলতে চাই যে সেই ভদ্রলোকটির মর্মস্পর্শী কাহিনী শুনে আমরা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে উদাসীনভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখছিলাম আর মাঝে মাঝে, "কী সাংঘাতিক! আহা! কী ভয়ানক!" এই বলছিলাম। কিছুক্ষণ পরে এই আবেশ যখন একটু কম হল তখন আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করতে লাগলাম। উনি তো বিষম রেগে বললেন:

"'লোক লোক' সবাই যাকে বলে সে যদি কোনো একটি ব্যক্তি হত, তা হলে এই নীচ কাজের জন্য তাকে খুন করে ফেলতাম। ধর্মের

মিথ্যে গর্ব করে হারামজাদারা অকারণ জ্বালাতন করে। নীচ! অধম! আহা, অমন মেয়েটির ওই রকমে মৃত্যু হল?"

"বাঃ! রঘুনাথ রাও," নানাসাহেব বললেন, "আপনি এরকম কথা বলতে আরম্ভ করলে আমাদের গণপত রাওকে মনে পড়ে। এরকম কোনো কথা বলতে শুনলে তাঁরও এমন ভয়ানক রাগ হত যে তার সীমা নেই। এই ভদ্রলোকটিকে তিনিই আগে চিনতেন। তারপরে আমাদের পরিচয় হল। এই ভদ্রলোকটির বোনের মর্মভেদী কাহিনীর কথা তিনি যখনই শুনতেন তখনই রেগে বলতেন, 'ওহে, যে দেশে এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার চলে সে দেশের মাথা উন্নত থাকবে কেন? দিনে দিনে আরও হেঁট হয়ে নুয়ে পড়বে। তাই আমাদের উপযুক্ত।'"

"তা মিথ্যে নয়," লক্ষ্মীবাঈ হঠাৎ বললেন, "ঠাকুরপোর কথা মোটেই মিথ্যে নয়। এই তো হবে! যে দেশে মেয়েদের উপরে এমন অত্যাচার করা হয় সে-দেশের মাথা কক্ষনো উন্নত হতে পারে না। কশাইয়ের মাথা কি কেউ কক্ষনো উঁচু হতে দেখেছে? স্বামী মারা গেলে এক বছরও সে যাপন করেনি, তাই গ্রামের লোক তার বাবা আর মাকে কী হয়রানই না করল!"

"ছিঃ! কিন্তু কী উপায়? লোকে জুলুম অত্যাচার করে, সব সময় কানে শুনি, কিন্তু শুনে কী উপায়? নিজে বসে বসে গাল দেওয়া আর অভিশাপ দেওয়া ছাড়া তো অন্য কোনো উপায় নেই।" আমি যশোদা বাঈর দিকে চেয়ে বললাম।

"উপায় কী? প্রত্যেকে নিজের বাড়িতে চেষ্টা করলেই…"নানাসাহেবের এই কথা শেষ হবার আগেই একেবারে উত্তেজিত হয়ে উনি বললেন, "তা অসম্ভব। কক্ষনো সাধ্য হবে না। বাড়িতে নতুন চিন্তাধারার লোক থাকে একজন কি দু'জন; আর সবাই থাকে গণ্ডাকতক। তখন প্রত্যেকে কী করে ও কাজ করতে পারবে? যেই সনাতন প্রথার বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করবে, অমনি সবাই ঝাঁ করে তেড়ে এসে গোলমাল বাধিয়ে বিষাক্ত চক্ষু দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করবে।"

"তবে আপনি কী বলতে চান?" নানাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি বলতে চাই যে সরকারী চাবুকের জোরে……তখনই……" কিন্তু সে কথা সেখানেই থামল। কেন না, একজন ভদ্রলোক দূর থেকে 'কী হে' বলতে বলতে কাছে এলেন।

সেই ভদ্রলোকটি হঠাৎ আসায় আমাদের চর্চার রসভঙ্গ হয়ে গেল আর ততক্ষণে কত রাত হয়েছে মনে পড়ে আমরা ঘরে ফিরে এলাম। সেই মেয়েটির কাহিনী শুনে সেদিন রাত্তিরে আমার মন কী ভয়ানক অস্থির হয়েছিল তা বলবার ক্ষমতা আমার নেই। আজ সেসব কথা লিখবার সময় আমার মন আরো অস্থির হয়েছে। হে ভগবান, না জানি আমরা কী পাপই করেছি যে সারা জীবন এরকম যন্ত্রণা আর অত্যাচার সহ্য করতে হবে!

দেওয়ালির কথা*

দেওয়ালি এসে পড়ল। আমরা পাকাপাকি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে পুণায় যাব না। তাই, ছুটি যদিও ছিল, তবু পুণায় যাবার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। তবুও বোম্বায়ের দেওয়ালি দেখতে আসবার জন্য সকলকে চিঠি লেখা কর্তব্য ছিল, তাই মা'র অনুমতি নিয়ে উনি সে রকম চিঠি লিখলেন। আমি কিন্তু মোটেই ভাবিনি যে কেউ আসবে। দিদিশাশুড়ী আর ছোটশাশুড়ীর ভয়ংকর অহংকার। মেয়ের বাড়ি আসবেন কেন এই ভেবে দিদিশাশুড়ী আসবেন না, আর ছোট মামীশাশুড়ী অভিমানিনী, তাই তিনিও আসবেন না। আসবার যোগ্য এক উমাশাশুড়ী, কিন্তু আজকাল তাঁর বারবার অসুখ করত আর শরীর ভালো থাকত না, তা ছাড়া তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর অধীন। তাঁর স্বামী কি তাঁকে আসতে দেবেন? মোট কথা, এই রকম ছিল সব ব্যাপার, বহু ঠাকুরঝি হয়তো আসতেন, কিন্তু তাঁর সে রকম খেয়াল তখন হওয়া চাই। ধোণ্ডু ঠাকুরপোকে শংকর ঠাকুর আমাদের মতো সংস্কারকের বাড়ি পাঠাতে যাবেন কেন? মানে, কেবল একটা রীতি বলে আমরা তাদের চিঠি লিখলাম, এই পর্যন্ত। আমি দাদাকেও লিখেছিলাম যে "পরীক্ষার জন্য আসবে, তা পারো তো চারদিন আগেই এসো।" সেও বোধ হয় আসব লিখেছিল। আমার ইচ্ছে ছিল যে সে যদি আসে তা হলে যেন বৌদিকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। কিন্তু সে ইচ্ছে কি সফল হওয়া সম্ভব? একে বাবা পাঠিয়ে দেবেন, তাতে দাদা সাহেব সঙ্গে নিয়ে আসবে—আর সব শেষের আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে নিজে আসতে কি সে রাজি হবে! এ সবই মনে হচ্ছিল। আমি আমার দিক থেকে বাবাকে ওঁর হাতের লেখা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যে 'দাদাকে আর বৌদিকে পাঠিয়ে দেবেন।' তার ফলে দাদা আসবে এটুকু নিশ্চিতরূপে

* কালি পুজার দিন মহারাষ্ট্রে যে উৎসব হয় তার নাম দীপাবলী। দীপাবলীর সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়ালি।

ঠিক হল। শ্বশুরবাড়ি যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তার যা হবে ভেবেছিলাম, তাই হল। আমাদের চিঠি পাওয়া মাত্র গোপাল ঠাকুরের বেশ সুন্দর একখানা চিঠি এল। তিনি লিখেছিলেন, "কেউ আসতে পারবে মনে হচ্ছে না, তোমরাই আসতে পারলে এসো।"

আর একখানা লম্বাচওড়া চিঠি এল। বাবা গো! তাতে আমাদের অনেক পুষ্পাঞ্জলি* ছিল আর শেষে লেখা ছিল, "এই ভাবে নিজের আচরণে আমাদের বংশে কলঙ্ক মেখে আবার ন্যাকামো করে তুমি আমাদের বারবার চিঠি লেখো তার তাৎপর্য কী? আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমাদের কারো নখ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের বাড়িতে দেখতে পাবে না" ইত্যাদি কত কথাই না তাতে ছিল। এ চিঠিটা কার তা নিশ্চয় বলার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু শুধু এই কথা বলা দরকার যে দেওয়ালির ঠিক আগের দিন সকাল সাতটার সময়, এই চিঠিটা যিনি লিখেছিলেন তাঁর শুধু নখই নয়, সমস্ত শরীর আর সেই শরীরের সঙ্গে একজন ছোট ছেলে আর একজন তরুণী—এত জন লোক আমাদের বাড়ি এসে হাজির হলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যকর ঘটনা ঘটলেও আমরা তত অবাক হতাম না, যত আমরা তাদের সকলকে দেখে হলাম। কেন না, আমরা যদিও ভাবতাম যে শংকর ঠাকুরের স্বভাব আমরা সম্পূর্ণরূপে জানতে পেরেছি, তবু নিজের সই করা চিঠির পিছু পিছু,"ভাবলাম, লোকে বলে-কয়, তাতে কিছু বস্তু আছে, না অমনি শুধু শুধু লোকে যাচ্ছে-তাই আমাদের কানে অকারণে লাগিয়েছে সেটা একবার নিজে গিয়ে দেখি, চক্ষুর্বৈ সত্যম্" বলতে বলতে শংকর ঠাকুর হাজির হবেন এ কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। তাঁর সেই চিঠি পড়ে আমরা কত হাসি তামাশা করেছিলাম। কেন না, একে তো উনি তাঁকে মোটেই চিঠি লেখেন নি, লিখেছিলেন গোপালঠাকুরকে। রীতিমাফিক যা উত্তর পাঠাবার তা তিনি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শংকর ঠাকুর তাঁর চিঠি নিজের গায়ে টেনে নিয়ে আমাদের আর সংস্কারকদের নিন্দে করে সওয়া হাত লম্বা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাতেই ব্যাপারটা শেষ হয়েছে ভেবে আমরা মজায় ছিলাম। এখন দাদা এলে বেশ হবে, তাকে হেন বলব,তেন বলব, এটা জিজ্ঞাসা করব, সেটা জিজ্ঞাসা করব, ইত্যাদি আমি ভাবছিলাম। এমন সময়, দাদার আগে হঠাৎ এই ত্রিমূর্তি এসে হাজির হলেন!

* এই শব্দটা উপহাস করে 'গালি' এই অর্থে ব্যবহার হয়।

কেউ যদি হঠাৎ আমাদের গায়ে একটা পাথর ঠেলে ফেলত তাতে আমার যত ভয় করত না সে দিন অন্তত তার চেয়ে বেশি আমার করল। এখন মশাই কী করবেন আর কী না করবেন তার কল্পনাই করতে পারছিলাম না। তবুও আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে যাই হোক না কেন, তাঁকে আমাদের সংস্কারক বলে নিন্দে করবার সুযোগই দেব না। কিন্তু শেষে তিনি 'স্বভাব যায় না মলে, আর ইল্লৎ যায় না ধুলে' এই প্রবাদটির সত্যতা কী রকমে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, সেই কথাই আমি এখন সংক্ষেপে বলব।

আমরা সকলেই, মানে আমাদের বন্ধুরাও, তাঁর ভয়ে এখন বিশেষ সাবধানে আচরণ করতে লাগলাম। বিষ্ণুপন্তদের বাড়িতে তাঁরা খাবার সময় রেশমি কাপড়চোপড় পরা ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরাও আবার সেই কাপড় পরা আরম্ভ করলেন। নানাসাহেবের বাড়িতে আগে থেকেই আমাদের মতো রীতি ছিল। আমরা ভাবতাম যে যদিও কোনো কোনো রীতি আমাদের পছন্দ আর বিশ্বাস হয় না, তবু বড়োদের পক্ষে সে রকম আচরণ করতে আপত্তি কী? তাতে নিশ্চয়ই কোনো ক্ষতি নেই। বিষ্ণু-পন্তদের বাড়ি বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ ছিল না তাই তাঁরা ছুত-অচ্ছুতের বিষয়ে একটু শিথিলতা এনেছিলেন, তাও ঠিকই ছিল। যারা সে রকম সনাতনী রীতি ব্যবহারের রদবদল করতে পারে, তারা যদি তা না করে, তা হলে বোকার মতো ছোঁয়াছুঁয়ির পাগলামি নষ্ট হবে কী করে? কেউ যদি একটুও ভেবে দেখে, তা হলে সহজেই বুঝবে যে, ছুতমার্গ আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এ-দু'টির মূলের ঐক্য চলে গিয়ে দুটোতে অনেক তফাতই হয়েছে। পুরুষদের 'মুকটা'* কি সত্যি 'বিশুদ্ধ' নামের যোগ্য? বছরের পর বছর বেচারা জলে ভেজে না, সেটা যে কত পরিষ্কার, সেকথা না তোলাই ভালো। আর, রেশমী আর পশমী কাপড়, পীতাম্বর হচ্ছে দামী জিনিস, ধুয়ে ধুয়ে যদি খারাপ হয়, তা হলে কি বারবার পাওয়া যায়? কাজেই, পশুদের লোম কেটে কিংবা পোকার পেটের একরকম তন্তুবিশেষ দিয়ে যদিও সে রকম কাপড় তৈরি হয়ে থাকে, তবুও তাদের বিশুদ্ধতা ভীষণ! সে কাপড় বছর বছর—কিংবা দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ-ষাট বছরেও যদি জলে ভিজিয়ে ধোওয়া না হয় তবুও আপত্তি নেই!

* এই উপন্যাস রচনা-কালে মহারাষ্ট্রীয় পুরুষেরা সন্ধ্যাহ্নিকের সময় কিংবা খাবার সময় যে রঙীন রেশমী কাপড় পরতেন তাকে 'মুকটা' বলা হত।

কিন্তু যদি সেই কাপড়টা তুলোর তন্তু থেকে তৈরি হয়ে থাকে, আর এই খানিকক্ষণ আগে ধুয়ে শুকোতে দেওয়া হয়ে থাকে, আর যদি কারু গায়ের বা আঙুলের স্পর্শ পেয়ে থাকে, তা হলেই হয়েছে! অমনি সেটা অশুদ্ধ হয়ে গেল! তক্ষুনি সেটা টেনে আবার জলে ডুবিয়ে আনতে হবে। 'ঋষির কুল, নদীর মূল'—আর আমি এখন তাতে তৃতীয় একটা যোগ দিচ্ছি—'বিশুদ্ধ অশুদ্ধ আর ছোঁয়াছুঁয়ির পাগলামি'—এই তিনটের চিন্তা যতটা সম্ভব না করাই ভালো। নিশ্চয়ই এই পাগলামি যতশীঘ্র সম্ভব ছেড়ে দেওয়াই দরকার।

কিন্তু আমি এ কী করছি! শংকর ঠাকুর যখন এলেন, তখন যেমন হতভম্ব হয়েছিলাম বোধহয়, সে কথা শুধু মনে পড়া মাত্র আজও আমি তেমনি হতভম্ব হয়েছি, তাই অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখছি। যাক।

শংকর ঠাকুর আসবার প্রথম দিনটা অন্তত সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত বেশ কেটে গেল। আমার এখন শুধু দাদার ভাবনাই ছিল। সে আসবে তো? সে আসবে কখন আর আমরা দুজনে কথাবার্তা বলতে পাব কখন, এই ভেবে আমি বড্ড উতলা হয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন সকালে সেও এল। আমার বড় আনন্দ হল। কিন্তু শংকর ঠাকুরকে দেখামাত্র সে এমন অদ্ভুত মুখ-ভাব করল। তাঁর সঙ্গে তার কত ভাব তা তো সকলেই জানে! তাঁকে দাদা ভয়ানক ঘেন্না করত। আর তিনি আমার বিষয়ে যে সব কুৎসা রটিয়েছিলেন আর সে কুৎসা পুণায় যার তার মুখে ছড়িয়ে পড়বার জন্য যত ষড়যন্ত্র করেছিলেন সে সব মনে পড়ে দাদার রাগ দ্বিগুণ হল। আড়ালে দাদা আমাকে বলল, "যমুদিদিমণি, আসতে ওর লজ্জা করল না? তোমাদের সম্বন্ধে যাচ্ছেতাই বলে, যেমন খুশি নিন্দে করে, আবার তোমাদের এখানে হাজির হয়েছে! ওর এতটুকুও লজ্জা নেই!" এরকম কথা বলতে আরম্ভ করলে দাদার বড়ো উত্তেজনা হত। এবারও তেমনি হয়ে তার গলার স্বরের জোর বাড়তে আরম্ভ হল আর তার সে স্ফূর্তি স্পষ্ট দেখা দিতে লাগল। আমি তাকে মিনতি করে বুঝিয়ে বললাম, "দোহাই দাদা, চুপ করো। চার দিন এখন আর কিছু বোলো না ভাই।" কেন না, শংকর ঠাকুর যদিও তখন কাছে ছিলেন না, তবু বন্নুঠাকুরঝি ছিলেন, তিনি কখন কোথা থেকে কী শুনবেন তার ঠিক ছিল না। আর যা শুনবেন তাতে কত মসলা মাখাবেন তার তো আরও সীমা ছিল না।

আমি যে ভেবেছিলাম দাদা এলে কত মজা হবে, তেমন কিছু হল না। কিংবা দেওয়ালির সময় সকলের ছুটি, তখন ঘরময় আনন্দ-উল্লাস হবে ভেবেছিলাম, তাও হল না—একথা আর বিশেষ করে বলবার দরকার নেই। কেন না, একটা প্রবাদ আছে যে একমণ দুধে ছোট্ট একটি নুনের কণা পড়লেও সমস্ত দুধ নষ্ট হয়, কেটে যায়। এ প্রবাদটি কতদূর সত্য তার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। কিন্তু আমাদের সুখ-দুঃখের মধ্যে এসে কত বড় একটা নুনের বস্তা এসে পড়ল—নুনের কারখানা বললেও ক্ষতি কী? তখন আমাদের সুখের কী রকম অবস্থা হল তা কল্পনা করাই ভালো। শংকর ঠাকুরের ভয়ে আমরা মন খুলে কথাবার্তা বলতেও পারতাম না। বড় ঠাকুরঝির খিটখিটে স্বভাব-দোষে ঘরে কিচ্ছু ভালো লাগত না। আমার জন্য লক্ষ্মীবাঈ আর যশোদাবাঈ কত অনুনয় করে তাঁকে বুঝিয়ে বলতেন, কিন্তু তাঁর খোঁচানো কথা আর হাঁড়ি মুখ কক্ষণো সোজা হয় নি। আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় তাঁর কপাল কুঁচকে উঠতই।

লক্ষ্মীবাঈ একবার তাঁকে বললেন, "আসুন, ছুঁচের কাজ শেখাই," তক্ষুণি অসভ্যের মতো মুখহাঁড়ি করে তিনি বললেন, "তোমাদের ওই মেম সাহেবী ছুঁচের কাজ নিয়ে আমার দরকার নেই। আমরা গরীব মানুষ, ওসব নিয়ে আমাদের কাজ কী?" কিন্তু লক্ষ্মীবাঈ বড্ড সহ্যশীল ছিলেন, তিনি শান্তভাবে বললেন, "আহা, মেমসাহেবী ছুঁচের কাজ আর আমাদের কি আলাদা? একই। দেখুন তো একবার" এই বলে তিনি খুব অনুরোধ করলেন। কিন্তু ঠাকুরঝি মোটেই শুনতে চাইলেন না। যশোদাবাঈ বুঝি কোথায় তাঁকে বললেন, "লিখতে পড়তে পারেন?" অমনি তিনি অসভ্যের মতন বললেন, "লিখতে পারি, পড়তে পারি, লেকচার না কেকচার কী যে বলে তাও দিতে পারি; তা ছাড়া হাতে ধরে বেড়াতে পারি।" আমি কাছেই ছিলাম। আমার ভয়ানক রাগ হল। যাঁর সঙ্গে ঠাকুরঝির একেবারে জানা-শোনা নেই, তাঁকে ও-রকম উত্তর দেওয়ার মানে কী? এই ভেবে আমার গা জ্বলে উঠল। এমন স্বভাব আবার মানুষের থাকে! আর শেষে যখন তিনি বললেন, "তাছাড়া হাতে হাত ধরে বেড়াতে পারি", তখন আমার ঠোঁটের আগায় এই শব্দ উঠে এসেছিল, "ওই জুতো ধরা হাত দু'টি ধরে বেড়াবে এমন কেউ থাকলে তো? স্বামী তো জুতো মেরেও খবর রাখছে না।" আমি যদি এ-কথা বলতাম তাহলে

না জানি তিনি কী কাণ্ডই বাধিয়ে ফেলতেন। কিন্তু আমি ও কথা বলিনি, আত্মসংযম করলাম। শুধু তাই নয়, পরে যখন ভেবে দেখলাম, তখন তাঁর কথায় রাগ হওয়ার চেয়ে তাঁকে আমার দয়া করতেই বেশি ইচ্ছে হল। ভাবলাম, বেচারির মন অমন কুৎসিত হবে না কেন? তাঁর আর কী দোষ? আমি কিন্তু তাঁর কাছে লেখা-পড়া কিংবা সেলাই-টেলাইর কথা মোটেই তুলিনি। নিজে থেকে তাঁর সঙ্গে কথাই বলিনি, বললেও ক্ষতি নেই। তিনি কথা বললে তাঁর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতাম। তাঁর আদর-আতিথ্য একটুও কম করতাম না; তাঁর কাপড় কুঁচিয়ে গুছিয়ে রাখা পর্যন্ত সব কাজ করতাম, এই রকমে দিন কেটে যাচ্ছিল।

একদিন আমি তাঁর কাপড় কুঁচিয়ে রাখছিলাম, আর অপর দিকে তিনি গা ধুচ্ছিলেন। ওদিক দিয়ে দাদা এল; সে কিছু জানত না। তাই সে হাসতে হাসতে বলল, "ওহো! খেঁদি ঠাকুরঝির কাপড় কুঁচিয়ে রাখা হয় বুঝি?" আর—ওমা! সে কথা ঠাকুরঝি শুনলেন। ওই খেয়েছে! রেগে আগুন হয়ে, হন্ হন্ করে এসে খপ্ করে আমার হাত থেকে কাপড়টা টেনে নিয়ে বললেন, "খবরদার যদি আমার কাপড়ে হাত দিবি! হাত দিবি তো আমার গলা কেটে ফেল্‌বি। আমাদের ঘরদোর ছিল না তাই এখানে এসেছি কিনা এরকম কথা শুনতে? জানি নিজে কী সুন্দরী, রম্ভাপুতলি! আমি যেমনই হই না কেন তোর তাতে কোনো ক্ষতি নেই তো?" এই বলে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। সেদিন তিনি খেলেন না। "তুমি না খেলে আমি খাব না"—এই বলে ঠিক "নরক চতুর্দ্দশীর"[১] দিনের মতো আমি উপোস করলাম। তাঁর পায়ে পড়লাম, নাক ঘসলাম, নানা রকম মিনতি করলাম, কিন্তু তিনি একেবারে গোঁ হয়ে বসলেন! দুঃখের

১ দেওয়ালি—আশ্বিনের শেষের দু'দিন, আর কার্ত্তিকের প্রথম দু'দিন, এই চারদিন মহারাষ্ট্রে দীপাবলী উৎসব হয়। প্রথম দিন নরক চতুর্দ্দশী, সে দিন খুব ভোরে উঠে ঘর ঝাঁট দিয়ে আঙিনায়, দুয়োরে, পিছন দুয়োরে, স্নান ঘরে, সর্বত্র প্রদীপ জ্বেলে ঘর আলোকিত করা হয়। কোনো কোণেও আঁধার থাকে না। সবাই ভোর বেলায় সুগন্ধ তেল মেখে স্নান করে, তারপরে ঘরের দেবতাকে মিষ্টান্নের নৈবেদ্য দিয়ে, সকলে সকাল সকাল খাবার খেয়ে—এ সব খাবার মেয়েরা ঘরে তৈরী করে—আমোদ-প্রমোদ করে। ছেলে মেয়েরা আতসবাজি খেলে। নরকাসুর বধের কাহিনীর সঙ্গে এই দিনের উৎসবের সম্বন্ধ মানা হয়। দ্বিতীয় দিন অমাবস্যার দিন—লক্ষ্মী পুজা; তৃতীয় দিন 'বলি প্রতিপদা'—এটা হচ্ছে বিক্রম সংবৎসরের প্রথম দিন—এদিন ঘরের কর্তা—বিশেষতঃ স্বামীদের গৌরবের দিন। চতুর্থ দিন, যমদ্বিতীয়া—ভাইফোঁটা।

মধ্যে সুখ এই যে তিনি তাঁর সেই রাগের ঝোঁকে শংকর ঠাকুর যখন কী হল জিজ্ঞাসা করলেন তখন তাঁর কান্নার স্পষ্ট কারণ বললেন না। সেটা তিনি কী করে চেপে রাখলেন তাই আমার বড্ড আশ্চর্য মনে হল। শুধু "কিছু না" এই দুটি শব্দ উচ্চারণ করা আর কাঁদা ছাড়া তিনি কিছু করলেন না। পুণায় গেলে পরে কিন্তু তিনি সে বিষয়ে যা বিষম কাণ্ড বাধালেন তা বলবার জো নেই। একে তো তিনি বললেন যে ও-কথা আমিই নাকি বলেছিলাম, আর সে কথার আগে আর পরে গোটাকতক বিশেষণ জুড়ে দিয়ে তিনি একটা পুরাণ বানিয়ে ফেললেন। সে কথা যাক। সেদিন সন্ধ্যে বেলায় তিনি ভাত খেলেন। তখন পর্যন্ত অবশ্যই আমাকেও তাঁর সঙ্গে উপোস করতে হল। শুধু এই একটা নমুনা বললাম। আমাদের আনন্দ নষ্ট হবার যোগ্য এ রকম কত ঘটনা যে হল তা বলা অসম্ভব।

পিতাশ্রীর রকমও তেমনি ছিল। আর ধোণ্ডুঠাকুরপো যদিও এখন এত বড় হয়েছিলেন তবুও তাঁর দৌরাত্ম্য একটুও কম হয় নি। পিসীমার কাছে যখন তখন খাবার খেতে চাওয়া, আর ওঁর কাছে আতসবাজি চাওয়া এ-সব ছাড়া তাঁর যেন কিচ্ছুই আর ভালো লাগছিল না। প্রতিপদের দিন তো তিনি আমাদের মুখ শুকিয়ে ফেললেন। রাত্তিরে কোন্ সময়ে সকলের নজর এড়িয়ে নিচে গেলেন তো একেবারে বাইরে চলে গেলেন। আগের দুদিন আমরা গাড়ি করে আলোকসজ্জা দেখে বেড়িয়ে এসেছিলাম। তাতে তৃপ্ত না হয়ে, তিনি জামা টুপি পরে সোজা বাইরের রাস্তা ধরলেন! কাউকে জানালেন না কিচ্ছু না। আমরা ভাবছিলাম, নিচে বোধহয় কোথাও আতসবাজি খেলছেন। রাত অনেক গড়িয়ে গেল তবুও যখন তিনি এলেন না, তখন খুঁজতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু ধোণ্ডুঠাকুরপো কোথায়? আশে পাশে সব জায়গায় খুঁজে উনি হয়রান হলেন। কোথায় ঠাকুরদ্বারের[১] রাস্তায়, কোথায় মার্কেটের দিকে, চারদিকে লোক খুঁজতে গেল। বেচারা নানাসাহেব আর বিষ্ণুপন্তও তাঁকে খুঁজতে গেলেন। দাদাও অবশ্য গেল। বহূঠাকুরঝি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। শংকর ঠাকুর শুধু "ওকে যেতে দিলে কী করে? এতটুকুও নজর রাখলে না?" —এই বললেন।

১ বোম্বারের একটি পাড়া।

ছেলেটা কি কচিখোকা ছিল যে তাকে নজরের আড়ালে যেতে দেবে না? শেষে রাত্তির দু'টোর সময় মশাই এলেন: তিনি পথ না হারিয়ে এলেন কী করে এটাই আমরা ভারি আশ্চর্য মনে করলাম। কেননা, তিনি বোম্বায়ে নতুন ছিলেন, কিছু জানতেন না, আর রাত্তির বেলা। কিন্তু শীগগিরই আমাদের সন্দেহ দূর হল। আমাদের অপর দিকের পাড়ায় কে একজন স্যাকরার না প্রভুদের ছেলে থাকত, দু'তিনদিনে তার সঙ্গে ঠাকুরপোর ভাব হয়ে, দুজনে মিলে নাকি সেদিন রাত্তিরে ঐ সময় বাইরে যাওয়া ঠিক করেছিলেন। সেই সংকল্পমতো মশাই বাইরে গিয়েছিলেন। আমরা সবাই ভেবেই সারা। কিন্তু ভাগ্যিস নিরাপদে ফিরে এলেন, তাই পরে কোনো ভাবনা রইল না। তিনি ফিরলে তখন আমাদের ভাবনা দূর হল—আর তার পর বাবামশাইয়ের যা ভয়ানক রাগ। অত বড় ছেলেটাকে তিনি যাচ্ছেতাই গালাগালি করে ঠেঙাতে আরম্ভ করলেন। ঠাস্ ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিচ্ছিলেন আর মুখে অবিরাম বকছিলেন, "বোম্বাই এসেই ছোঁড়ারা কী রকম স্বাধীন হয় দেখ!" দু' চারটি চপেটাঘাত খাওয়া মাত্র ধোণ্ডুঠাকুরপো হঠাৎ চট্ করে বললেন, "খবরদার—যদি আমাকে মারো! আমি এখন আর ছোটো নই। কোথাও কোনো মাগীর বাড়ি যাইনি, বা মদ খেতেও যাইনি।" আর কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। আমরা দুতিন জন মেয়েমানুষ একেবারে অবাক হলাম। আর সকলে তখনো ঠাকুরপোকে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। শংকর ঠাকুর রেগে একেবারে লাল হলেন, আর "দূর হ, বেরো আমার চোখের সামনে থেকে, নইলে মেরে ফেলব"—এই বলে ঠাকুরপোর দিকে ঝাঁ করে তেড়ে গেলেন। ধোণ্ডুঠাকুরপো, "মারো দেখি" এই বলে বুক ফুলিয়ে সামনে দাঁড়ালেন। আমি ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। কিন্তু তখন উনি এলেন আর ঠাকুরপোকে পিছনে টেনে অন্য দিকে নিয়ে গেলেন। তিনি একটানা "মারবেন! মেরে ফেলা বড় সোজা কথা কিনা!" —এই বিড় বিড় করছিলেন। শংকর ঠাকুর এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর ঠোঁট থর থর করে কাঁপছিল আর মুখ ফুটে কথা বের হওয়া মুশকিল হয়েছিল। শেষে উনি তাঁকেও শান্ত করে একদিকে নিয়ে শুইয়ে দিলেন। তবু তিনিও বিড়বিড় করছিলেন, "ছোঁড়ার মুখ যদি আবার দেখি তো—! হারামজাদা আমার মুখে কালি মাখিয়ে দিল!" আর আশ্চর্যের

আশ্চর্য এই যে তিনি ঠিক করে ফেললেন যে ছেলেটার ও-সব কাণ্ড বোম্বাই আসারই ফল!

এই রকম সব মজা সে দেওয়ালিতে হল আর আমরা ঐ সময়টা কী সুখেই কাটালাম, কী আনন্দেই কাটালাম ইত্যাদি কথা এখন বর্ণনা না করলেও কি বুঝতে পারা যাবে না?

তবুও আর একটি কথা বিশেষত বলা দরকার। সে-কথা যদি না বলি, তা হলে পাঠকরা আমাদের সে দেওয়ালির কথা সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবেন না। দেওয়ালি তো এখন শেষ হল। দু চার দিনে সকলের বাড়ি যাবার কথা। শংকর ঠাকুরের ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল, কাজেই যাবার আয়োজন করা দরকার। শংকর ঠাকুর সঙ্গে নিয়ে যাবার জিনিসপত্রের বেশ একটা লম্বা ফর্দ বার করলেন। তার আরম্ভ কী চমৎকার করলেন! "এই লক্ষ্মীছাড়াদের কী যে বলি! জিনিসপত্র আনতে বলে, কিন্তু বেটা-ছেলেরা আগে টাকা হাতে দেবে না। একজন বলে কিনা 'আমার জন্য এই নিয়ে এসো,' আর একজন বলে, 'সেই সেটা নিয়ে এসো, এখানে এলেই পয়সা দেব।' ওরে, পয়সা আগে দিসনে কেন? আগে পয়সা দিতে কি আমি তোদের বারণ করি? কিন্তু না! যেন আমাদের এখানে টাকার খনি রয়েছে! গাধা কোথাকার! এরা কিচ্ছু বোঝে না। এক দু'জনকে—তারা একটু ইয়েই ছিল—আমি স্পষ্টই বললাম যে বাপু টাকা যদি আগে দাও তাহলে তোমাদের জিনিস আনব, না হলে বাপু আমার দ্বারা হবে না। হ্যাঁ, এমন ব্যাপারে সাফ থাকাই ভালো। কী হে নানাসাহেব, আমার কথা সত্যি—? কিন্তু তাতেও আবার এমন গণ্ডগোল থাকে যে কাউকে কাউকে তেমন স্পষ্ট বলার সুবিধা থাকে না। হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আমাদের একটু আলাদা সম্পর্ক থাকে কিনা, তাই 'হ্যাঁ' বলতে হয়। কী উপায়? আর হ্যাঁ, শুধু 'হ্যাঁ' বলে চলে না, প্রাণ গচ্ছিত রেখে সে জিনিসগুলো নিয়ে যেতে হয়। বেশ, আমি আসবার সময় আমার কাছে ছিল মোটে দশটি টাকা। মাসকাবারের তখনো বাকি তো, ভাবলাম, আছে সেখানে রঘু, তার কাছ থেকে নেব—আর জিনিসগুলো যাদের, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে তক্ষুনি পাঠিয়ে দিলেই হবে। জিনিসও তো তেমন বেশী নয়? দু-চারটি বিলিতি শালেরই বা দাম হবে তাই, বাকি সব জিনিসগুলি ছোট খাট। কোথায় বিনুনির আয়না, চিরুনির বাক্স, ছেলেমেয়েদের পুতুল,

এটা-ওটা, এই বেশি আর কী? দু-এক দিনের মধ্যে একবার সময়মতো এনে ফেলিস রঘু।"

এই রকম আরম্ভ হলে আমরা কী করব? কিছু করার ক্ষমতা ছিল? মুখ বুঁজে ট্যাঁকের টাকা খরচ করে জিনিসগুলো আনা ছাড়া অন্য উপায় কি ছিল? জিনিস যদিও অন্য লোকের জন্য ছিল, তবু আমাদের পক্ষে তার দামের উপরে প্রত্যাশা ছেড়ে দেওয়ারই কথা ছিল তো! তাতে কোনো সন্দেহই ছিল না। এর আগের জিনিসপত্রের টাকা আসবে কি না সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহই ছিল না। আমরা জানতাম যে সেগুলির কোনো কোনো জিনিসের দামের উপর চার আনা আট আনা বেশিই আদায় হবে; কিন্তু আশঙ্কা শুধু এই ছিল যে সে টাকা কি আমাদের হাতে আসবে? আশঙ্কা কেন? নিশ্চয়ই জানতাম যে সে টাকা আমরা পাব না। কিন্তু উপায় কী? "অদৃষ্টের মতো ভুগতে প্রস্তুত হওয়াই ভালো," এই প্রবাদটি উচ্চারণ করে ঘরের টাকা বার করতেই হল।

ঠিক সেই দিনই বন্নুঠাকুরঝি বাবার কাছে একটা ছিটের শাড়ির জন্য বায়না ধরে বসলেন। দেওয়ালির উপহার বলে আমরা তাঁকে একটা আমেদাবাদী জরিপাড় চোলী সেলাই করে দেব ঠিক করেছিলাম। সেই রকম একটা খন এনে আমি চোলী সেলাই করতে আরম্ভ করেছিলাম। আমাদের কাছে তো কিছু চাইবার সুবিধা ছিল না। বাবা কত দেবেন তা জানাই ছিল, তবু চেয়ে নিয়ে এনে দেবার জন্য তিনি বাবাকে ধরে বসলেন। "আমাদের গেরস্তের বাড়ি ওসব ছিটের শাড়িটাড়ির চাল চাইনে, আমি কিনে দেব না, আর আমার কাছে টাকা নেই," এই যখন বাবা স্পষ্ট বললেন, তখন ধপ্ ধপ্ করে পা ফেলতে ফেলতে বন্নুঠাকুরঝি ভিতরে যেখানে আমি বসে-ছিলাম সেখানে এসে বললেন, "ওই বসন্তী মাগীর বুকে ঢেলে দেবে যত ইচ্ছে ..." তারপর তিনি কী বিড়্‌বিড়্‌ করলেন তা আমি শুনতে পাইনি, কিন্তু এমন সময় তাঁর ভাই তাঁকে বললেন, "দিদি, বসন্তীর ছেলেদের টুপি দিলেন তা জানো না? সে তোমার মা আর তাকে অমন কথা বলো?" ওমা! তারপর তাদের দুজনেতে যা কথা কাটাকাটি শুরু হল। আমি তার তাৎপর্য বুঝতে পেরে, বেশি শুনতে ইচ্ছে থাকলেও সেখান থেকে উঠে চলে গেলাম। তাঁরা যে রকমের কথাবার্তা বলেছিলেন তা কিন্তু আমি শুনতে পারছিলাম না। তাঁরা যে নামটি উচ্চারণ করলেন কিংবা তাঁদের কথার যা তাৎপর্য ছিল

তা আমি এর আগে জানতাম না কিংবা কানে শুনিনি তা নয়; কিন্তু ওরকম ব্যাপারের উল্লেখ না করা উচিত ভেবেই আজ পর্যন্ত সে বিষয়ে লিখিনি। শংকর ঠাকুর নিজে বড় ধর্মজ্ঞ বলে বড়াই মারেন, কিন্তু তাঁর খাওয়া-দাওয়া, পান করা, আর অন্য অনেক আচরণে কত আত্মসংযম ছিল তা আমি অনেক দিন আগেই ওঁর আর দাদার মুখে শুনে জানতে পেরেছিলাম। সে সব ব্যাপার যে এই ছেলেমেয়েরাও জানতে পারে তা আমি ভাবিনি। কিন্তু আজ যে সব বেরিয়ে পড়ল, আর তাদের নিজের বাবার বিষয়ে তাদের কী ধারণা ছিল, তাঁর আচরণ তারা কতখানি জানে, তাঁকে তারা কতদূর ভালোবাসে আর শ্রদ্ধা করে তা দেখতে পেলাম।

সে-দিনের ঘটনা মনে পড়ে আজ সে-সব লিখতে আমার ইচ্ছে করছে। আবার ভাবছি যে ওরকম বাবার বিষয়ে নিজের ছেলেমেয়ে কী বলল তা যদি লিখি তাহলে বোধহয় অনেকের চোখের ধাঁধাঁ কেটে যাবে, আর এই ভেবে আমি সেই ঘটনা লিখছি। কারোর নিজের ছেলেমেয়ে যদি তাঁদের বিষয়ে অমন কথা বলে আর নিন্দা করে তাহলে তা অবশ্যই মন্দ। কিন্তু যেখানে তেমন কারণ আছে, সেখানে যদি ওরকম হয়, তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কারণ কী?

দ্বিতীয় দিন আমি ওঁকে বলে ঠাকুরঝিকে তাঁর পছন্দমতো একটা শাড়ি দিলাম কিন্তু বহু মিনতিতেও তিনি সে শাড়িটা নিতে চাইছিলেন না, নিদেন প্রথমটা সে রকম ন্যাকামি করলেন। বাপমেয়েতে আর বাপছেলেতে কথা বন্ধই ছিল, তাই যাবার কথা কেউই তুলছিল না। তবু শংকর ঠাকুরের ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল, তখন তিনি যেতেই বাধ্য ছিলেন। তাই যাবার আগের দিন তিনি হৈ হৈ করে তর্জন গর্জন আরম্ভ করলেন, "আমি একলাই যাব। লক্ষ্মীছাড়াদের আমার দরকার নেই। ধোণ্ডুকে তো বাড়ির উঠানও মাড়াতে দেব না। লক্ষ্মীছাড়া ভিক্ষে করে বেড়াক। আমায় পালটা উত্তর করে। বেটাচ্ছেলে কোন্‌দিন আমাকে খুন করে ফেলবে। এই ছুঁড়িটাও তেমনি।" আমাদের ভয় করছিল যে সত্যি সত্যি তিনি তাঁর কথামতো ভাইবোন দুটিকে আমাদের বাড়ি রেখে যাবেন নাকি। কিন্তু তেমন কিছু হল না। বয়ুঠাকুরঝি স্পষ্টই বললেন যে তিনি মোটেই এখানে থাকবেন না; আর ধোণ্ডুঠাকুরপো তো প্রাণ গেলেও এখানে থাকতেন না। কেন না, তিনি নিশ্চয় জানতেন যে এখানে পুণার মতো স্বাধীন ভাবে থাকতে

পারবেন না। সে যাই হোক, আমাদের সত্তর-পঁচাত্তর টাকার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে সেই তিনটি মূর্তি চলে গেল।

আমাদের আন্দাজ-মতো সেখান থেকে একটা সওয়া হাত লম্বা, যথেষ্ট খোঁচা মারা চিঠি এল। কিন্তু এখন আর আমরা ও-রকম চিঠির কোনো ধারই ধারতাম না, তাই এই চিঠিতে শুধু আমাদের খানিকক্ষণ আমোদ হল। এর চেয়ে সে চিঠি বেশী কাজের হল না। চিঠিতে একটি বিশেষ কথা কিন্তু ছিল। মা'র আর তাঁর সঙ্গে গোপিকাকাকিমারও অতিশয় নিন্দে করেছিলেন। তার কারণ কি কেউ জানে? তিনি যাবার দু'-তিন দিন আগে, আমার মনে হচ্ছে, ধোণ্ডুঠাকুরপো যেদিন তাঁকে ঝাঁঝালো উত্তর দিলেন তারপরের দিন সকালেই যখন নাক ধরে বসেছিলেন, তখন মা তাঁকে বলেছিলেন, "দেখলে তো? এখানে কিছু গণ্ডগোল আছে? আর মিথ্যে কেন ওদের নামে ইয়ে করো?" মা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ঠাকুর আড় নয়নে, বিরক্ত ভাবে আমার দিকে আর ওঁর দিকে চেয়ে বললেন, "না, না! কিচ্ছু নেই! তোমার খোকা কত শুচিভূর্ত! আর বৌমার কথা তো বলতেই হবে না—আর তুমি তো, বাঃ! আমি পাগল, মিথ্যে মিথ্যে যাচ্ছেতাই বলি!' এই বলে তিনি মর্মভেদী হাসি হাসলেন আর আবার, "ওম্ পৃথ্বিত্বয়া…উঁ উঁ উঁ উঁ……" করতে লাগলেন। আমাদের মা ভিতর-বাহির কিছু জানতেন না। তিনি সহজেই, "তোমার সত্যি মিছিমিছি নিন্দে করা একটা অভ্যেস," এই বলে বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। আমরা সে-কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু শংকরঠাকুর কি তা ভুলতে পারেন? ঠিক সেই কথা মনে রেখে তিনি নিজের বিষয়েই, "উনিও এখন সংস্কারক—উন্নতিসাধক হয়েছেন, উনিও কাল বেড়াতে বেরুবেন আর বলবেন যে তাতে মন্দ কী হে বাবা?"—মাগো মা! সে কি এক কথা? নানা রকমে তিনি সে-কথা লিখেছিলেন, সে-সব কথা এখানে লিখতে বসছিনা। তা ছাড়া, তাতে আর সকলের বিষয়েও যাচ্ছেতাই লেখা ছিল। তবু ভালো, সবাই তাঁকে ভয় করে চলত। তা যদি না হত তাহলে বোধহয় তিনি এক রিম কাগজ ভর্তি করে চিঠি লিখতেন।

দাদা পাশ করল

সেই ত্রিমূর্তিরূপী বিষম ঝড় আর তারপরের এই চিঠিরূপী বিষম বৃষ্টিপাত হবার পর অনেকদিন পর্যন্ত আমরা বেশ মনের সুখে ছিলাম। দাদা তার লেখাপড়ায় নিমগ্ন ছিল, আমাদের মধ্যে এসে বসতও না। ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর থেকে তার পড়াশোনার দিকে বিশেষ টান হয়েছিল। সে ভাবত যে কিছুদিন পরে বাবার সঙ্গে তার মিল হবে না। আমাদের ছেলেবেলার মতো তাঁর সেই ক্ষ্যাপা, কড়া স্বভাব থাকলে বরং ভালো হত। কিন্তু আজকাল তাঁর স্বভাব একেবারেই অদ্ভুত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ চার-পাঁচ বছরের মধ্যে এমন পরিবর্তন হল কেমন করে? এটা আমরা একটা গূঢ়তম রহস্য বলে মনে করতাম। এখনো আমাদের পক্ষে তা পরিষ্কার হয় নি। যারা এই রকম গূঢ় বিষয় বুঝতে পারে, তারা যদি জগৎকে তা পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেয়, তা হলে বড় উপকার হবে।

উনিও আজকাল বলতেন, "আমাকেও এখন খুব ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে, আর খরচও কমাতে হবে। কেন না, এই ফেলোশিপটা এক বছর পর্যন্ত আছে, তার পরে কিছুদিন অন্য কিচ্ছু না করে মন দিয়ে পড়তে হবে, তা হলেই পাশ করবার নিশ্চিত আশা করতে পারি।" আর সত্যিই উনি সে রকম আচরণ করতে লাগলেন। আমিও আমার পড়াশোনা বেশ ভালোভাবে আরম্ভ করলাম। সব কাজকর্ম বেশ সুন্দর চলতে লাগল। পুণা থেকে খবর পাওয়ার পথই এখন বন্ধ হয়ে গেল। ঠাকুমার খবর কী? দুর্গীর অবস্থা কী রকম? তার স্বামী?—ইত্যাদি কোনো খবরই পাইনি। সেই জন্য মাঝে মাঝে যা একটু মন কেমন করত। তা ছাড়া বিশেষ কিছু হয় নি।

যে দিনগুলি সুখে কাটাই, সেগুলি যেন কত শীগগীর কেটে গেল মনে হয়। এর অভিজ্ঞতা কার নেই? আমার মনে হচ্ছে যে সুখের দিন এমন তাড়াতাড়ি চলে যায়, তাই বোধহয় বড়ো বড়ো সাধুপুরুষেরা উপদেশ দেন,

"সুখ এক রত্তি, দুঃখ বিশাল অতি!" কত সুখে যে দুমাস কাটালাম তার বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যেক জন নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত; আর সবাই হাসিখুশি, ঠাট্টাতামাশা করে আনন্দে ছিলাম। যথাসময়ে দাদার পরীক্ষা আরম্ভ হল। তার পড়াশোনা বেশ ভালো চলছিল, তাই দাদা আশা করিছল যে সে পাশ করবে। পরীক্ষার ফল জানতে অনেক দেরি থাকে। সেই অবসরের দিনগুলো তো দাদা, আমি, যশোদাবাই আর লক্ষ্মীবাই খুবই আনন্দে কাটালাম। দাদার কোনো কাজ ছিল না, আর আমাদেরও কাজ ছিল না! তাই দুপুর বেলাটা একখানি ভালো বই পড়ে আমরা দিন কাটাতাম। কখনো কখনো সে পড়ত, কখনো বা আমাদের পড়তে বলত। যে জায়গাটা আমরা বুঝতে পারতাম না, তা যদি দাদা বুঝতে পারত তাহলে আমাদের বুঝিয়ে দিত, আর সেও না বুঝতে পারলে, রাত্তিরে সকলের সামনে সে বিষয়ে আলোচনা করে বুঝে নিতাম। এই রকমে কেবল কল্পনা-সৃষ্টিতে—আর আজ তো যে সব ঘটনা কল্পনার সৃষ্টির চেয়েও কাল্পনিক মনে হচ্ছে—সে দিনগুলো যাপন করলাম। পরীক্ষার ফল বেরোবার দিন যতো এগিয়ে এল ততোই আমার বুক দুরু দুরু করতে লাগল। তখন দাদার মনের অবস্থা না জানি কী রকম হয়েছিল! সে ভাবত যে সে নিশ্চয়ই পাশ করবে, তবুও কখনো কখনো বলত, "কী জানি, কী হবে—" তখন কিন্তু আমার বড্ড ভয় করত। যেদিন ফল বেরোবার কথা, তার আগের দিন তো আমরা অত্যন্ত উতলা হয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে ভাবী কালে অত্যন্ত ভয়ংকর প্রসঙ্গ আসবার কথা ছিল তাই বোধহয় ভগবান তার আগে অনেক দিন আমাদের সম্পূর্ণ সুখে রেখেছিলেন। দাদা একেবারে প্রথম বারেই পরীক্ষা পাশ করল, তাই আমার যে কত আনন্দ হল তার বর্ণনা করতে পারছি না। বাবাকে তক্ষুণি চিঠি লিখে সে সংবাদটি জানাল। সেখানে ঠাকুমা ছাড়া আর কারো নিশ্চয়ই এত আনন্দ হয়নি।

পরীক্ষা পাশ হয়ে আনন্দের দিনগুলো কেটে গেলে, অবশ্যই এখন কী হবে এই প্রশ্নটা আমাদের সামনে উপস্থিত হল। দাদা ভাবত যে সে যদি এখানে আর ওঁর দেখাশোনার আওতায় একালতি পড়ে, তা হলে প্রথম বারেই পরীক্ষাটা পাশ করতে পারবে। আমার ইচ্ছা ছিল যে সে যেন কলেজে যায় আর বি. এ. পাশ করে। কিন্তু দাদা কলেজে না গিয়ে

ওকালতি কেন পড়বে তার কারণ আমাকে একদিন স্পষ্ট বলল। সে বলল, "যমুদিদিমণি, কলেজ গিয়ে আমি যে তিন বছরে পাশ করব, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমার মতন অনেকে আজ কতো চেষ্টা করছে। আর অত করেও না হয় আমি পাশ করলাম, কিন্তু তাতে লাভ কী? ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার একটা চাকরি পাবার সুবিধা হবে এই তো? তার চেয়ে ওকালতিই আমার শতগুণে ভালো মনে হচ্ছে। এটা হচ্ছে একটু মুখস্থ করার ব্যাপার, আর রঘুনাথ রাওর সঙ্গে যদি তা করতে পারি, তা হলে বুঝতে পারার কোনো অসুবিধাই হবে না। প্রথমবারেই সব সময়ে কেউ এই পরীক্ষাটা পাশ করে না; কিন্তু আমার ইচ্ছেমতো আমি যদি এখানে থাকি আর ওঁর শিক্ষামতো অধ্যয়ন করি, তাহলে আমি নিশ্চয়ই—প্রথমবারেই পাশ করব। আমার বুদ্ধি যদিও ততটা তীক্ষ্ণ নয়, তবু একবার পাশ করলে, চার-ছ' মাস পুণায় থাকব, আর তারপর 'এখানে ঠিক জমছে না, অন্য কোথাও যাওয়া দরকার', বলে শান্তভাবে অন্য কোথাও গিয়ে থাকব। তাহলে হল তো?" সেসময় দাদা ওসব কথা এত ব্যাকুলভাবে আর আনন্দিত হয়ে বলল যে আমার তক্ষুনি তার কথাই সত্যি মনে হল, উনিও তার কথাই ভালো বিবেচনা করলেন। ওঁর এই মত ছিল যে বি. এ. পাশ করে কোনো লাভ নেই। আর দাদার ইচ্ছামতো সে ওকালতি পড়বে এই ঠিক হল।

কিন্তু এখন সে কথা বাবাকে লিখে তাঁর অনুমতি পাওয়া যাবে কী করে সেইটা একটা বড়ো মুশকিল মনে হল। কিন্তু সব ভালো হবার দশায় শত্রুও যদি কারো মন্দ করার চেষ্টা করে তা হলে তার সে চেষ্টাও মানুষের লাভকর হয়। মাঈসাহেব বোধহয় দেখলেন যে মাস-দুমাস দাদা বাড়ি ছিল না তাতে কিছু লাভ হয়েছে, বোধহয় তিনি ভাবলেন যে পরেও যদি সে এমনি দূরে থাকে তাহলে আরও লাভ হবে, কিংবা হয়তো বা মনে করলেন যে মাসে মাসে কলেজের জন্য পোনর-কুড়ি টাকা খরচ না করাই ভালো; সে খরচের ফলে তাঁর পুঁজি কমে যাবে; তাই ওঁর হাতের চিঠি—আমার আর দাদার অনুরোধে উনি বাবাকে বিস্তৃত একখানা চিঠি লিখে দাদার উদ্দেশ্য জানিয়েছিলেন—পাওয়ামাত্র মাঈসাহেব বাবার কানের কাছে সারাক্ষণ ঘ্যানর-ঘ্যানর আরম্ভ করলেন, "তাই ঠিক। জামাই যা লিখেছেন তাই উচিত মনে হচ্ছে। তোমার শরীরও তো এখন দুর্বল হচ্ছে? ও

যদি বছরে দু'বছরে ওকালতির পরীক্ষা পাশ করে উকীল হয়, একটা বোঝা অন্ততঃ হালকা হবে। মিছিমিছি ওই কলেজের খরচে দরকার কী?"
প্রথমে বাবার ইচ্ছা ছিল যে দাদা যেন কলেজে যায়। দাদা পাশ করেছে খবর পেয়েই তিনি যে চিঠিটা লিখেছিলেন, তাতে তিনি সে কথা স্পষ্টই লিখেছিলেন। আমার মনে হচ্ছে যে তখনো তাঁর আর মাঈসাহেবের সে বিষয়ে কথাবার্তা হয়নি। কেন না, অনেকদিন পরে, ঠাকুমার কাছে জানতে পারলাম যে পরে আবার আমাদের চিঠি যাওয়া পর্যন্ত এই বিড়্-বিড়্ সুরু হয়েছিল, "এই আবার একটা কলেজের খরচ এসে দাঁড়িয়েছে। কী যে হবে।" যাক্। কিন্তু "সব ভালো যার শেষ ভালো"—মাঈসাহেবের ঘ্যানর-ঘ্যানর আমাদের উপকারেই এল। আর তার পরিণতি আমাদের মনের মতো হল! দাদা আমাদের কাছেই রইল।

ভাবনা এখন শুধু আমাদের ঠাকুমার জন্যই ছিল। বৌদিদিমণির নামই তো ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্মীবাই আর যশোদাবাই পাঁচ-সাত বার সে বিষয়ে দাদাকে ঠাট্টা করলেন, কিন্তু এমন আশ্চর্য যে, আর সব সময়ে দাদা হাসিতামাসা করত, কিন্তু এই বিষয়টা উঠলেই সে ভ্রূকুটি করত, আর তার চেহারাতেও একটু গাম্ভীর্য, একটু বিরক্তি দেখা দিত।—আর সে বিষয় ছেড়ে অন্য বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত সে চুপ করে থাকত। চার-পাঁচবার তাঁরা দুজনে এই ব্যাপার দেখে তার সঙ্গে সে বিষয়ে কথা বলা ছেড়ে দিলেন, কিন্তু একদিন আমাকে আড়ালে আড়ালে ব্যাপারটা কী তা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁদের সব কথা বললাম, কিন্তু তাতে তাঁদের সন্তোষ হল না। আর সত্যি বলব? আমি যদিও জানতাম যে বৌদির স্বভাব খুব ভালো নয়, কেমন যেন অদ্ভুত, তবুও আমি ভাবতাম যে দাদার ওকে অত তিরস্কার করার কোনো কারণ নেই। আমরা তিন জনে তো ঠিক করলাম যে বৌদিকে একবার এখানে এনে দুজনের অসদ্ভাব দূর করবার চেষ্টা করব। কিন্তু দাদাকে সে কথা জানতে দিইনি।

এই ভাবে আমাদের অনেক দিন সুখে কেটে গেল।

ওমা, তোমাদের দাদাসাহেব বড্ড সরল হয়েছেন ভাই

আমি আগে লিখেছি, "সুখের দিন কত তাড়াতারি কেটে যায়," তার সঙ্গে এ কথাও সত্যি যে সুখের দিনের ঘটনা বিস্তৃতভাবে বললে, সে কথা শুনে অন্যদের সুখ দেবার মতো ঘটনাও তাতে খুব কম থাকে। তাই ভাবছি যে আমাদের সুখের বর্ণনা করে নিজেই আনন্দিত হবার চেষ্টা করার চেয়ে, সে সুখময় দিনগুলি যত তাড়াতাড়ি কেটে গেল আর সেই সময়ের সব সুখ দায়ক ঘটনা (আর সে সুখের মূল্য যাতে যাচাই করে বুঝতে পারি, তাই কোনো কোনো ছোট খাটো দুঃখজনক ঘটনাও) যত শীঘ্র শেষ হল, ঠিক তত তাড়াতাড়ি সে ঘটনার বর্ণনা আমি করে ফেলি তো সেই ভালো। কেন না, আমি যদি বিস্তৃতভাবে সে সব বলতে বসি, তা হলে সে ঘটনা মনে পড়ে আমি অল্প অল্প সান্ত্বনা পাচ্ছি বলে কোথায় গড়িয়ে যাব তার ঠিক নেই। এতেই নিমগ্ন হয়ে যদি আমার শেষ হয়, তা হলে যে উদ্দেশ্যে আমি এ কাহিনী লিখছি তা অপূর্ণ থাকবে।

প্রথমেই আনন্দের যে কথাটা বলা দরকার সেটা এই যে সুন্দরীর বিয়ে হল আর আমাদের আর ঠাকুমার মনের ভাবনা দূর হল। সুন্দরীর বিয়েতে আমরা সবাই পুণায় গিয়েছিলাম। কোন আনন্দই যেন নির্ভেজাল হয় না, তাতে কিছু না কিছু দুঃখ কিংবা বিরক্তির অংশ যেন থাকেই। আমাদের এই আনন্দের সময়ও তেমনি হল। সুন্দরীর বর—লোকটি বেশ ভালো! প্রথম পক্ষ, জ্ঞানী, তার মতগুলিও ভালো, বোম্বায়ে কলেজে পড়ত ; উনি, বিষ্ণুপন্ত, নানা সাহেব সকলের পছন্দ-মতো পাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু মাঈসাহেব যৌতুকটৌতুকের ব্যাপারে যত বেশী সম্ভব বিরক্ত করলেন। পাত্র ভালো চাইলে যৌতুকটৌতুক ভালো না দিয়ে কি পাওয়া যায়? যা হোক—শেষ পর্যন্ত বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হল। ছেলের টাকাকড়ির সম্বল তেমন ছিলনা, মা-বাবাও ছিলেন না। তিন বড় ভাই, অল্পস্বল্প উপার্জন করে কষ্টেস্বষ্টে সংসার চালাতেন। এরি মধ্যেই তিন জনে মিলে

যেমন তেমন করে এই ছেলেটির বিসর্জনের ব্যবস্থা করবেন ঠিক করেছিলেন আর ছেলেটিও তেমনি প্রতিভাবান ছিল। উনি তাকে অনেক বার দেখেছেন, বেশ চিনতেন। কিন্তু বিয়েতে মাঈসাহেব বিশেষ করে বরের তিন ভাজকে সতের বার উদ্ধতভাবে কথা বলে অপমান করলেন। আর বৌদিও কম অসভ্যতা করেনি। সে এখন বেশ বড় হয়েছিল, কিন্তু এখনো স্বভাব আগের মতোই ছিল (যে বিষয়ে অনেক কথা বলা দরকার, তাই এই বেলা এইটুকুই লিখে ফেলি)। আমি এখন বেশ বড় হয়েছিলাম, তাই সে সব ঝঞ্ঝাট যখনকার তখন মিটিয়ে ফেলতাম।

যেমন তেমন করে বিয়ে তো হয়ে গেল। বরকনের মিছিলকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম, 'আর একটিবার গঙ্গার ঘোড়া চান করল'* এই ভেবে আমি আর ঠাকুমা সুখ-দুঃখের গল্প করতে লাগলাম। রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল, আর ঠিক করলাম যে পর দিন দাদাকে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করব। সেই মতো আমি দাদাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি তো বলেছিলে যে গয়নাগুলো অদৃশ্য হয়েছে? তবে আজকাল মাঈসাহেব যে গয়না পরেন সে কোথাকার?" দাদা একটু অদ্ভুত রকম হেসে, এদিক সেদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে আমাকে বলল, "যমুদিদিমণি, গয়না সত্যি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেগুলো এত নতুন কী করে হল? আমার বিষম সন্দেহ হচ্ছে। কিছু বুঝতে পারছিনা, নাহলে পরীক্ষাই করে দেখতাম। এই গ্যাখো, এত বছরের গয়না, এমন চক্‌চকে নতুন কেমন করে দেখায়? প্রথমতঃ আমার মনে হচ্ছে যে সেগুলো অন্য কারো, নাহলে..." এইটুকু বলে সে জিভ কাটল, কিন্তু তক্ষুনি আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কী? কী? না হলে কী?"...অনেকক্ষণ সে কিছু বলল না। আমরা ফিরে যাবার আগে একদিন যে কোনো উপায়ে ওই নথ আর সরীটা নিয়ে এসো, তার পর আমরা দেখব।"

দাদা যখন "নিয়ে এসো" বলল তখন হঠাৎ সে ক'দিনে দেখা একটি বিশেষ কথা আমার মনে পড়ল। সে কথা এই যে মাঈসাহেব সে গয়না এক মুহূর্তের জন্যও কারো হাতে দিতেন না। আর তাঁর কাণের বুগড়ি আগের চেয়ে বেশ বড়ো দেখাত, তেমনি হাতের

* একটি মারাঠি প্রবাদ। মানে একবার কার্য্য সমাধা হওয়া।

তোড়া দু'টিও বড়ো দেখাচ্ছিল। এই ব্যাপার আমি আগে লক্ষ্য করিনি কেমন করে, এটাই আমার বড় আশ্চর্য মনে হল। গয়না কারো হাতে না দেবার বিষয়ে তাঁর এত সতর্কতা দেখলাম যে রাত্তিরে নিজে গয়না খুলে, তক্ষুণি বাক্সয় তুলে, তালা চাবি দিয়ে, চাবি কোমরে গুঁজে তবে তিনি শুতেন। এক বার দু'বার আমি নিজে "আমার আর তোমার দুজনের গয়না রেখে দিই, খুলে দাও না," বললাম, তখন তিনি একেবারে, "নাঃ, তুই হাঁদা কী যে করবি! এ'দিকে ওদিকে কোথাও ফেলে দিলেই হল!" এই কথা অন্য মেয়েদের দিকে চেয়ে হেসে বলে নিজেই উঠলেন। এখন আমার মনে হতে লাগল যে তাঁর এরকম আচরণের নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য ছিল। পরে দু-চার দিনে আমার এই ধারণাটি পাকা হল, কেন না, বিয়ে চুকে যাবার চার দিন পরেই আবার তিনি গয়না না পরা সুরু করলেন।

দাদা সংকল্প করল সে যাই হোক, সে তার সন্দেহ মেটাবে; সে কখনো ও রকম ব্যাপারে মন দিত না, মাঈসাহেবের কাছেও যেতনা তবু আমাদের যেদিন কথা হল সে দিন মাঈসাহেব যখন তাঁর বাক্স খুলে কী যেন তোলা-পাড়া করছিলেন তখন দাদা কাছে গিয়ে এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে চট্ করে সরীটা তুলে নিয়ে বলল,' "বাঃ। কী সুন্দর পালিশ করা হয়েছে! মনে হচ্ছে যেন একেবারে নতুন গড়িয়েছে!" তার কাণ্ড দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। দাদা কখনো এমন সামান্য আচরণ করত না, আর এ কী ও আরম্ভ করেছে! এই ভেবে আমি তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মাঈসাহেব প্যাঁট্ প্যাঁট্ করে দাদার হাতের সেই সরীর দিকে আর দাদার দিকে কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে চেয়ে রইলেন। ওঁকে খুব ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল, কপাল ভয়ানক কুঁচকে ছিলেন। এই শত্রুটা কখন যে সরী ফিরিয়ে দেবে এই ভেবে তিনি ভয়ানক অধীর হয়েছিলেন। সে চিন্তায় তাঁর মুখে বিষণ্ণতা আর রাগ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। দাদার মতলব কী? আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। দাদার সে কাণ্ড তখন আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। ভাবছিলাম যে সে খানিকক্ষণ পরে উঠবে, কিন্তু তার আজকের উদ্দেশ্যই বুঝতে পারছিলাম না। এত বেশী ছেলেমানুষি ভাব এলো কোথা থেকে? সে এত লক্ষ্য করে বার বার সেই সরীর দিকে চেয়ে চেয়ে কী পরীক্ষা করছে? আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম

না, আর কেমন বোকার মতো হয়ে গেলাম। হয়তো দাদা বেশীক্ষণ বসেনি, কিন্তু আমার মন বড্ড উতলা আর কেমন যে অদ্ভুত হয়েছিল, তাই বোধহয় আমার মনে হচ্ছিল যে সে অনেকক্ষণ সেখানে বসে আছে। সে যাই হোক—দাদা সরী ফেলে দিয়ে আবার কি যেন তুলে নিল। আমার মনে হচ্ছে সেটা নথই ছিল। আর সেটা হাতে করে দেখতে লাগল। মাঈসাহেবের গা রাগে জ্বলে উঠেছিল তা কি সে বুঝতে পারেনি? নাঃ! তা কি সম্ভব? কিন্তু সে শান্তভাবে, বেশ স্বচ্ছন্দে, যেন সব কিছু বেশ সহজভাবে করছে এইভাবে হাতের সেই নথের দিকে চেয়ে দেখছিল। আর দু-একটা কথা বলছিল।

মাঈসাহেব রেগে লাল হলেন। তাঁর চোখ দু'টি ভয়ানক উগ্র দেখাতে লাগল। তিনি জোরে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। কিন্তু ইচ্ছা করে হাসি মুখ করে বললেন, "বাঃ, আজ যে বড্ড মাঈর সঙ্গে গল্প করবার খেয়াল হয়েছে? দাও দেখি নথটা, কোথায় ফেলবে-টেলবে। এই কদিন হল পালিশ করে গেঁথে আনা হয়েছে। চলো, আমাকে উঠতে দাও।" এই বলে তিনি তার হাত থেকে নথটা টেনেই নিলেন। তার পরে অবশ্য দাদা সেখান থেকে উঠে পড়ল। কিন্তু উঠতে উঠতে বিষণ্ণভাবে একটু হেসে, কেমন যেন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে দেখল। আমিও তার দিকে চাইলাম। মাঈসাহেবের দৃষ্টি যে আমাদের দু'জনের দিকে ছিল তা আমি লক্ষ্য করিনি। দাদা চলে যাবার পর হঠাৎ আমার দৃষ্টি মাঈসাহেবের দিকে গেল, তাঁর চেহারা বড়ো নিষ্ঠুর, ক্রুদ্ধ, আর তিরস্কারপূর্ণ দেখাচ্ছিল। দাদা গেল সেদিকে তিনি একবার চেয়ে দেখলেন, আমার দিকে চাইলেন আর, "ওমা, তোমাদের দাদাসাহেব বড্ড সরল হয়েছেন ভাই!" এই বলতে বলতে সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন।

আমার মনে হচ্ছে যে কালকূট, হলাহল, কালীয় সাপের বিষ ইত্যাদি সব বিষ একসঙ্গে মিশিয়ে ঘন করে মহা পরিশ্রমে যদি কোনো এক রকমের বিষ বানানো হয়, তা হলে বোধহয় মাঈসাহেবের সে কথায় যে-বিষ ভরা ছিল তার সমান হতে পারে। তাঁর সেই বাইরে বাইরে, 'কী যমুদিদি তোমাদের দাদাসাহেব বড্ড সরল হয়েছেন ভাই!' এই কথা আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখা, এই দুটিতে আমার বুক এমন কেঁপে উঠল সে তা বলতে পারছি না! তাঁর তখনকার সেই ঠোঁট কামড়ে ধরা, কপাল

কোঁচকানো, আর চোখে ভীষণ তিরস্কার, আর "দেখবো, এর প্রতিশোধ না তুলে কি আমি ছাড়ি ?" এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট দেখতে পেয়ে আমার মনে হল, না জানি দাদার আজকের আচরণ অবিলম্বেই অনর্থের মূল হবে কিনা। এই ভেবে আমি একেবারে মুষড়ে পড়লাম। দাদাকে কী যে বলি! ও কখনো এ রকম গণ্ডগোলে পড়তে চায় না, আর আজই তার কোথা থেকে এমন কুবুদ্ধি হল? ও যদি অত খোঁজ-খবর নাই নিত? এরকম কত চিন্তা আমার মনে আসতে লাগল। কিন্তু আবার অল্পক্ষণ পরেই ভাবলাম যে বোধ করি "যা মনে, তাই স্বপনে।" কিন্তু নাঃ! তেমন কি হয়? এই ভেবে মন একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

বলার দরকার নেই, দাদাকে ব্যাপার কী তা জিজ্ঞাসা করিনি; কেন না, দাদার আর আমার সম্বন্ধে মাঈসাহেবের মনে যদি কিছু ভালো-মন্দ থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের উপর নজর রাখবেন, আমার মোটামুটি বিশ্বাস ছিল যে আমরা যদি কিছু কথাবার্তা বলি, তা হলে তা চুপি চুপি শোনবার ব্যবস্থা তিনি করবেন। তাই সে আপদ বালাই এড়াবার জন্য আমি দাদার সঙ্গে আড়ালে দেখাই করলাম না। কিন্তু মন বড় অস্থির হয়েছিল। দাদার উপরে রাগ হল, ভাবলাম যে দাদা ভালো কাজ করেনি। কিন্তু সে যা করল তাতে কী নিষ্পন্ন হল, তার মনে কী সন্দেহ ছিল, এসব জানতে বড্ড উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম। তার মনের সন্দেহটা আমি মনে মনে আন্দাজ করেছিলাম। আর আমার বিশ্বাস ছিল যে আমার সে অনুমান অনেকটাই সত্যি। শেষে রাত্তিরে দাদার সঙ্গে দেখা তো হল, দেখা হওয়ামাত্র আমি একেবারে রাগের অভিনয় করে তাকে বললাম, "দাদা, আজ তুমি একেবারে পরাকাষ্ঠা করলে! এত সাহস তোমার কোথা থেকে হল? না বাবা! কেউ যদি কখনো আমায় এসে বলত যে দাদা ওই কাণ্ড করেছে, তা হলে আমি তা কক্ষনো বিশ্বাস করতাম না! আর আজ আমি নিজের চোখে যখন দেখেছি তখন অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। কিন্তু থেকে থেকে আমার সে কথা মিথ্যাই মনে হচ্ছে আর কতো যে আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে তা বলতেই পারছি না। সত্যি দাদা, যে কাজ তুমি কক্ষনো করো না, সে কাজ আজ তুমি করলে কেমন করে?"

"আহা, কেমন করে আর কী? আজকের সময়ই তেমন ছিল। তোমাকেই করতে বলতাম, কিন্তু তোমার দ্বারা সে কাজ হত না। এখন

আমাদের শীগগীরই ফিরে যেতে হবে, তাই ভাবলাম একবার মনের সংশয়টা দূর করে ফেলি, সেই বেশ। শুধু শুধু মন হু হু করে কাজ নেই। কিন্তু কাজটা চমৎকার হয়েছে, তা তুমি যাই বলো। তুমি আশ্চর্য মনে করবে, তাতে কী? কিন্তু আমি নিজেই ভাবছি, যে আমি কক্ষনো একেবারে কোনো কথাই বলি না, সে আমি একদম নির্ভীক—আর আহ্লাদেই বলো না কেন—খানিকক্ষণ—হলামই বা কেমন করে? ত্তাখো যমুনা, আমি তখন সত্যি যেন পাগল হয়েছিলাম। জানো, আমি আরও খানিকক্ষণ বসতাম, কিন্তু হঠাৎ ভাবলাম যে যাক্‌গে। আমার যা জানতে ইচ্ছে ছিল তা জানতে পেরেছি, যথেষ্ট হয়েছে।"

"কিন্তু কী যথেষ্ট হল? তুমি কী জানতে পারলে? আমাকে কিছু বলবে তো?" আমি তাকে বললাম।

"কেন? আমার উপরে অত রাগ করলে, আর এখন জানতে চাও?"

"কেন মানে? তুমি সম্প্রতি আমার তত্ত্বাবধানে আছ। আর আমার শিক্ষায় তুমি সরল হয়েছ তখন ব্যাপার কী তা আমায় জিজ্ঞাসা করতে হবে না? বলো শীগগীর কী ব্যাপার?" আমি হাসতে হাসতে, রসিকতার সুরে বললাম।

"ওহো! মানে আজকাল আমার উপরে আপনার নজর থাকে নাকি? আমি তা জানতাম না। বেশ আপনার শিক্ষায় আমি কেমন সরল হয়েছি বলুন দেখি?"

আমি চালাকি করে আস্তে আস্তে বললাম, "সে কথা মাঈসাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। আমি নিজেই কেন বলতে যাব?"

"আচ্ছা, আচ্ছা। মানে মাঈসাহেব আপনাকে আমি সরল হয়েছি বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন বুঝি? ঠিক, তবে আর কী বাকী রইল?"

"বেশ, সে কথা যাক্‌গে। সে গয়নাগুলোতে তুমি অত কী পরীক্ষা করে দেখলে তা আগে বলো ভাই।"

"আমার যা দেখতে ইচ্ছে ছিল তাই দেখলাম, আর আমি যা চেয়েছিলাম তাই পেলাম।"

"আহা, সেটা কী তাই তো আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি। তুমি বাবা ভারী ইয়ে! এখনো তোমার সে ছেলেমানুষি যায় নি; এখন তুমি মস্ত বড় উকিল হবে, আর এ রকম করছ?"

"বা! উকিল হব তাই তো এ রকম করা দরকার। উকিল নিজে যা জানে তা তার কাউকে কক্ষণো বলতে নেই। আচ্ছা যমু, আমি তোমাকে বলছি, একটি অক্ষর পর্যন্ত কাউকে বলো না—কেমন?" এইটুকু বলে সে খুব গম্ভীর হয়ে বলল, "সরী আছে, কিন্তু নথ—হ্যাঁ, তবু সরীর ব্যাপারটা আমার ধারণা-শক্তির বাইরে। কেন না, আমার দৃঢ় সন্দেহ এই যে সরীটাই প্রধানতঃ গেছে। এটা বোধহয় ক'দিনের জন্য কারো কাছ থেকে চেয়ে আনা হয়েছে।"

"যাও, তোমার ভাই যাচ্ছেতাই একটা অনুমান," আমি এই বললাম। কেন না, কতক জায়গায় দাদা কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে শুধু মুখের হাবভাব করল। তাতে তার মনের অর্থ বুঝে আমি সত্যিই ভাবলাম যে সে একেবারে বোকা, আর, "কী কারণে তুমি ও রকম ভাবছ? তুমি যা মনে করছ তা সত্যি কী সে?" ইত্যাদি প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু সে বলল, "তাই তো সে কারণগুলি আমি নিশ্চিতরূপে জানি না, তাই তো আমিও এই গোলমালে পড়তে পিছপাও হচ্ছি। না হলে এই গয়নার সন্ধান তক্ষুণি পেতাম। আমাদের দিদিমা আর বিয়েতে সেই যে বুড়িটা এ-দিক সে-দিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দু'জনে মিলে কিছু গণ্ডগোল করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।"

"দেখো ভাই, যা নয় তা একটা কিছু করে শেষে আমাদের সম্বন্ধে বাবার মনে ভালোমন্দ কিছু ঢুকবে, আর কী?"

"এখন আবার ঢুকবে কী? তুমি কি ভাবছ যে বাবা ভাবেন আমি বড় ভালো? মোটেই না। তিনি নিশ্চয় ভাবেন যে আমি একটা খিটখিটে, চাপা স্বভাবের, নির্বোধ মানুষ!"

"আর তা তো মিথ্যে নয়—" আমি হাসতে হাসতে রসিকতা করে বললাম। কিন্তু সে তা মোটেই লক্ষ্য করেনি। সে যেন নিজে যা বলছিল তাই একমনে শুনছিল। তারপর কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

বৌদির সম্পূর্ণ পরীক্ষা

এই সময়ের আর একটি বিশেষ ঘটনা এই যে, আমি আর আমার বোম্বায়ের দুজন বন্ধু মিলে দাদা আর বৌদিতে মিল হবার জন্য যে চেষ্টা করছিলাম, সে সব নিষ্ফল হল। দাদা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার অল্প দিনের মধ্যেই আমি বৌদিকে বোম্বাই আনলাম। তাকে পাল্টাবার কত চেষ্টা যে আমরা করলাম, তার সীমা নেই। এখন সে বেশ বড় হয়েছিল। সে সব কিছু বুঝত, কিন্তু তার বোকমি আর অসন্তোষ শত চেষ্টা করেও কমানো গেল না। আমার এখন মনে হতে লাগল যে আমি পুণায় তার যা স্বভাব দেখেছিলাম তা কিছুই নয়। কেন না, সে বোম্বাই এলে পরে তার একটা অসামান্য দোষ আমি দেখতে পেলাম। সেটা হচ্ছে হিংসা! তাকে এই ভয়ানক দোষ ধরেছিল। লক্ষ্মীবাইর কাছে সে পাঁচ-সাত বার এমন কথা বলল যে তা না বলাই ভালো। আমারা সবাই যখন তেতলায় ছাদে বসতাম, তখন তাকে অনুরোধ করলেও সে আসত না। একদিন তো সে আমাকে স্পষ্ট উত্তর দিল "আমার এ-সব সহ্য হবে না, আমাকে পুণায় পাঠিয়ে দাও দেখি।" ব্যাপার কী? বৌদি কি সত্যি একটা হাঁদা মেয়ে?—না, ও মনে মনে সত্যি কিছু পুষে রেখেছে?—এই আশঙ্কায় যখন তদন্ত করলাম, তখন সত্যি ব্যাপারটা বেরিয়ে এল। 'পরের বাড়ি থাকা ভালো নয়, তার স্বামী একটা মূর্খ, তার বাপ তাকে পাতকুয়োয় ঠেলে না ফেলে এখানে ঠেলে দিয়েছে এই তফাত!'—এই রকম সব নানাবিধ চিন্তা ছিল তার মনে। আর নিরুপায় হয়ে সে সে-কথা প্রকাশ করত না। তাই তো। যখন জ্বলে তখন আগে দুর্গন্ধ আসে, পরে আসে ধোঁয়ার রাশি, আর শেষে অজ্ঞানের শিখা না বেরিয়ে কখনো থাকে না। আস্তে আস্তে সব বেরিয়ে পড়ল। আমি আগেই বলেছি যে একবার দুবার লক্ষ্মীবাই আর যশোদাবাইর কাছে সে অসভ্যভাবে তার মনের ভাবটা একটু আধটু প্রকাশ করেছিল, কিন্তু তা অত স্পষ্ট ছিলনা। তার কারণ—প্রথমে আমি এই ভেবেছিলাম

যে সে ভেবেছিল সে কথা আমার আর তার স্বামীর কানে না পৌঁছে থাকবে না। কিন্তু পরে একদিন দাদার সঙ্গে যখন সে বিষয়ে কথা বলছিলাম তখন সে আশঙ্কা দূর হল। কেননা, প্রত্যক্ষ দাদাকেই সে নাকি একবার দুবার নয়, পঁচিশবার বলেছিল, "পরের ঘরে কতদিন থাকবে? ঢের হয়েছে খামোকা বাজে কাজ! পড়াশোনা হয় না আর কিছু। অন্য কোথাও একটা চাকরি ধরো, আর চলো।" কেউ যদি তাকে বলত, "তুমি এখন উকিলের বউ হবে" তা হলে ধরে নিতেই হবে যে সে কপাল কুঁচকে উত্তর করবে, "এ জন্মে তো নয়।"

শেষে আমরা সবাই শান্ত হলাম। বিশ্বাস হল যে প্রথম থেকে দাদা যা বলছিল তাই সত্যি, আমাদের চেষ্টা বৃথা। আমাদের সকলের মনে হল আর ঝঞ্ঝাটে পড়ে, দরকার নেই। দাদা তো কবে থেকেই ওর নাম করাই ছেড়ে দিয়েছিল। ও বৌদিকে অপমান করত না, কিংবা তার সঙ্গে মন্দ আচরণ করত না। মোটেই না। শুধু স্ত্রীর কাছে যেমন সুখ পাওয়া যায় তা নিজের বরাতে নেই এটা নিশ্চিত রূপে জেনে, তার সঙ্গে কমবেশী কিছু না বলে কোনো রূপ নিষ্ঠুরতা না করে সে বৌদিকে তার মনের মতো চলতে দিত।

একদিন তার এত দুঃখ হল যে সে আমাকে বলল, "যমু, বেচারি দুর্গীর অবস্থা ও রকম, আর আমার এ রকম! যেখানে একটি আছে সেখানে দ্বিতীয়টি নেই। তোমরা কত ধন্য! আর তোমাদের এই প্রতিবেশীরাও কত ধন্য। কিন্তু তোমাদের মতো লোক খুব কম, বুঝলে? আমাদের মতন লোকই জগৎ ভরে আছে।" তার এই নিরাশাময় কথার পর তার মনে কোনো আশা জাগাতে পারবার মতো কী কথা বলতে পারি? কেবল, "অত নিরাশ কেন হচ্ছ ভাই দাদা? আজ নয় তো কাল ও ভালো হবে, তুমি নিজে এখনো কিছু উপার্জন করোনা, ওর স্বাধীনতা নেই, তাই হয়তো ওর মনে কষ্ট হয় আর তাই ও অমন করে। কিন্তু অল্প দিনেই তোমরা স্বাধীন হলে বৌদি খুব ভালো ভাবে সংসার করবে, আর আমাকে কিছু দিন তোমাদের বাড়িতে থাকতে ডাকবে। তুমি একটুও চিন্তা কোরোনা।" এই বলে আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার যখন বিশ্বাস একেবারে বিপরীত, তখন কেবল কথা বলায় লাভ কী? দাদা বিষন্নভাবে হেসে বলল, "যমু, আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি যে তুমি লক্ষ্মী,

বৌদি, যশোদা-বৌদি এদের সঙ্গে মিলেমিশে দিন কাটাতে পেয়েও যার সন্তোষ হয় না, সে আজীবন কক্ষনো সুখী হবেনা। আর—আর আমি তোমাকে এই শেষের মতো বলে রাখছি যে তুমি এ বিষয়ে আর কক্ষনো আমার সঙ্গে কথাবার্তা বোলো না। তোমাকে একেবারে দুটি হাত জোড় করে বলছি। আর তুমি ওর নামও কোরো না, বুঝলে?"

ও যখন অত কথা বলল, তখন আমি কী বলব? তথাপি অমনি কিছু বলে মনে মনে ঠিক করলাম যে তার কথামতোই চলব। আমার দাদা তার মনোমত স্ত্রী পায়নি, শুধু তাই নয়; তার স্বভাব অতিশয় অদ্ভুত, তখন দাদার সংসারটা হবে কী রকম? বৌদির মাঈসাহেবের সঙ্গে অত মিল কেমন করে হল?—এত দিনে ঘরে যত ঝগড়াঝাঁটি হল, তার চেয়ে বেশী হল না কেন? ইত্যাদি ভেবে আমার আশ্চর্য মনে হতে লাগল। এত দিনের সব ভুল কেটে গিয়ে দাদার ভাবী অবস্থার চিন্তায় আমার বড্ড। দুঃখ হল আর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথা মনে পড়ে আমি সে-বিষয়েই ভাবতে লাগলাম। থাক। শেষে আমরা সকলেই ভাবতে লাগলাম যে বৌদির যদি সত্যি ইচ্ছা থাকে তা হলে তাকে পুণায় পৌঁছে দেওয়াই ভালো। কারণ, আমাদের এখানে রেখে তার উন্নতিসাধনের কোনো আশাই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমরা দুপুরে কোথাও বসলে বৌদি সেখানে আসত না। কোথাও একটা পুরানো কাপড় পেতে স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে থাকত! কোনোদিন কাজকর্ম করার খেয়াল হলে সমস্ত ঘর ঝাঁট দিয়ে, নিকিয়ে, নর্দমা ধুয়ে যেমন খুশি তেমন কাজ করতে আরম্ভ করত। একদিন দুপুর বেলা সে এমন ঘুমোলো যে দু-তিন ঘণ্টা উঠলই না। তাই আমি সহজভাবে বললাম, "এ কী বৌদি, দুপুরবেলা কোনো ভালো কাজটাজ করবে, তা নয় একেবারে ঘুমুচ্ছ যে!" সরল মনের কোনো মানুষই এ কথায় নিশ্চয়ই মন্দ কিছু দেখতে পেত না। কিন্তু বৌদিদিমণি বিষম চমৎকার অর্থ দেখতে পেলেন। "আমরা তোমাদের এখানে আছি, তাই তো এ রকম কথা সহ্য করতে হচ্ছে! আমি ঝি, বটেই তো? এইটুকুও শুতে পাব না। আমার অদৃষ্টই এই। আমার জীবন এ রকম অপমানের জ্বালায় কাটবে! এখন আমাকে তোমাদের বাড়ির কাজকর্মই তো করতে হবে।" এই শুধু নয়, নানা রকমে বৌদি গজর গজর করতে লাগল আমি অনেক রকমে তাকে বুঝিয়ে বললাম, "আমার

কথার তেমন মানে নয় বৌদি, আমি শুধু তোমাকে ঘুমের জন্য বললাম। আমার ঘরের কাজকর্ম করার জন্য আমি তোমাকে এখানে আনিনি। তুমি বেশ রাজার মতো থাকো, লেখাপড়া করো, আমাদের সঙ্গে সভায় এসো", কিন্তু সে কি শুনতে চায়? সে নিজের কথাই ধরে বসল। আমাদের ঘরে দিনের বেলায় দোতলার কলে জল আসত না, রাত্তিরে আসত। তাই আমরা রাত্তিরে জল ভরে রাখতাম। বৌদি তাড়াতাড়ি কলসী তুলে নিয়ে নীচের তলা থেকে জল ভরে আনতে আরম্ভ করল। আমি ওর হাতের কলসীটা তুলে নিলাম, তখন ও একটা হাঁড়ি তুলে নিল। আমি নানা রকমে ওকে বললাম, "বৌদি, এমন করোনা।" কিন্তু সে কি শুনতে চায়? "কাজ করিনি বললে যে! এখন কাজ করব আর কিছু না!" সেদিন থেকে সে সেই গান ধরল। শত বললেও শোনে না। মা তাকে বুঝিয়ে বললেন, গোপিকাকাকিমাও বললেন, আমরা তিনজনে বললাম; কিন্তু সে তার জিদ ধরে রইল। এর পর ওর সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল হল। ও কখন যে কী ভাববে তার কি ঠিক কী? এ সব কথা আমি কখনো দাদার কানে যেতে দিতাম না। কেন না, এরকম ব্যাপার দাদাকে জানালে তাতে লাভ তো কিছু নেই, বরং দিনে দিনে তাদের দুজনের মধ্যে অসদ্ভাব বাড়বে। কিন্তু দাদা ঘরেই থাকত। সুতরাং এসব কথা অবশ্যই—অন্তত কিছুটা—সে জানত। এই রকমে অনেকগুলি দিন কেটে গেল। শেষে একেবারে নিরুপায় হয়ে, আর দাদার অত্যন্ত অনুরোধে একটা কিছু যুক্তি করে বৌদিকে পুণায় পাঠিয়ে দিলাম!

তারপর অনেকদিন আমাদের বেশ সুখে কেটে গেল। ওঁর আর বিষ্ণুপন্তের 'এল্. এল্. বি'-র পড়া আর দাদার ওকালতির পড়াশোনাও খুব জোরে আরম্ভ হল। এখন আর আগের মতো সময় কাটাবার সুবিধা ছিল না। আমার আর তাদের দুজনের পড়াশোনাও ভালো রকম চলতে লাগল। এখন আমার ইংরিজি শেখার বেশ অগ্রগতি হবার চিহ্ন দেখতে লাগলাম। আমাদের শনিবারের সভা আমরা কক্ষনো বন্ধ করিনি। সেখানে গিয়ে কখনো সম্ভাষণ করা, কখনো সেলাই, কখনো ছুঁচের কাজ, জরীর কাজ এসব ঠিক মতো চলছিল। দিনে দিনে অনেক মেয়ে সেখানে আসতে লাগল আর সে সভার যথেষ্ট উন্নতি হল। আমি নিজেই তিনবার প্রবন্ধ পড়লাম। একবার "আমাদের মেয়েজাতির আজকের অবস্থা" এই

বিষয়ে, একবার "বিয়ে আর তাতে মেয়েদের দায়িত্ব," এই বিষয়ে, আর একবার "শ্বশুরবাড়ির আচরণ" এই বিষয়ে আমি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। কিন্তু ভাবছি যে সে বিষয়ে আর অন্য অনেক কথা একটু বিস্তৃতভাবে বলব।

একটি মর্মন্তুদ ঘটনা

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি রান্না করবার আয়োজন করছিলাম। উনি কোথায় যেন গিয়েছিলেন। দাদাও বুঝি ওঁর সঙ্গেই বাইরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ দাদা একলাই ফিরে এসে বলল, "রঘুনাথরাও আজ বাড়ি আসবেন না। কলেজেই থাকবেন।" আজ পর্য্যন্ত এমন কক্ষনো হয়নি, দাদার কথা শুনে তাই আমি চম্‌কে উঠলাম আর "কেন? কেন?" করে জিজ্ঞাসা করে দাদাকে একেবারে হয়রাণ করে ফেললাম। সে সম্পূর্ণ কিছু জানত না, কিন্তু এইটুকু সে আমাকে বলল যে তাঁর বয়সের একজন ভদ্রলোকের বড্ড অসুখ তাই তার কাছে বসবার জন্য উনি সেখানে থাকবেন। এইটুকু থেকে আমি কী বুঝব? তবু চিন্তার কোনো কারণ নেই ভেবে আমি দাদাকে খেতে দিলাম, আর নিজে খেয়ে শান্ত হয়ে বসলাম। কিন্তু সে রাত্তিরে আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হয়েছিল। বোম্বায়ে গেল দেড বছর—পৌনে দু বছরের মধ্যে এমন ব্যাপার কখনো হয় নি। পরের দিন সকালে যখন উনি বাড়ি ফিরে এলেন তখন ওঁর চেহারা এত বিষণ্ণ দেখলাম যে তা বলতে পারছিনা। যে-ভদ্রলোকটির অসুখ করেছিল সে বি. এ. ক্লাসের দ্বিতীয় বর্ষের একজন বড় বুদ্ধিমান, চতুর ছাত্র। ওঁর আর তার মধ্যে গভীর ভালোবাসা ছিল। কখনো কখনো সে আমাদের বাড়িতেও আসত। পরীক্ষা কাছে এসেছিল তাই একটু বেশী পড়াশোনা করেছিলেন তাই, কিংবা হয়তো অন্য কোনো কারণে পাঁচ দিন আগে তার হঠাৎ জ্বর হয়ে প্রত্যেক দিন না কমে আরো বাড়তে লাগল। এমন বিপদে তার যত্ন করার নিজের লোক কেউ কাছে ছিল না। চিঠি লিখে কাউকে আনাবেন, তা চারদিন পর্যন্ত অযত্ন হবে। স্বয়ং ডাক্তারবাবু পর্যন্ত সে জ্বর জটিল কী না তা বুঝতে পারেন নি। পাঁচ দিনের দিন বোঝা গেল যে সে-জ্বর খুব খারাপ ধরনের। তখন তার বাড়িতে তার করা হল। বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধ বাবা আর তাঁর কাছাকাছি বয়সের মা ছিলেন। বাড়ি ছিল কোংকনে রত্ন গিরিতে। এই গত মে মাস তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এমন অবস্থায় আগে-পিছনে দেখবার সময় ছিল না, তবু আমাকে জিজ্ঞাসা না করে উনি কিছু করতেন না, তাই আগে সকালে ঘরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"ভাবছি যে ওকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসি, কেমন? তুমি কী মনে করো?"

"ওমা! সে কী কথা! এই সময়ে এ কথাও কি আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে?" আমি তাড়াতাড়ি ছল ছল চোখে বললাম। তার মা-বাবার আর অল্পবয়সী স্ত্রীর ছবি আমার চোখের সামনে এসে আমার চোখে তখন জল এল। তক্ষুনি, "আচ্ছা, বেশ" বলে উনি নানাসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন আর কলেজে গিয়ে সাহেবের অনুমতি নিয়ে সন্ধ্যাবেলা ছেলেটিকে বাড়ি নিয়ে এলেন। আমরা তিন জনে যতদূর সাধ্য তাকে যত্ন করলাম, সব ব্যবস্থা করলাম। চার জন পুরুষের কেউ না কেউ একজন সব সময় তার কাছে থাকত। তেমনি আমাদের তিন জনেরও একজন আশেপাশে থাকতাম। কিন্তু এমন আপদে পরমেশ্বর কাউকেই যশ দেন না, তখন আমাদেরই বা কেন দেবেন? যা কিছু বিপরীত তাই ঘটবে এই যদি নিয়তির লেখা থাকে, তা হলে তাঁকেই বা আমরা কেমন করে দোষ দিতে পারি?

সে বেচারার জ্বর দিনে দিনে বাড়তে লাগল। সাত দিনের দিন তার বাবা মা এলেন। আহা! বেচারীরা কত বৃদ্ধ ছিলেন! তাঁদের সঙ্গে কে একজন তাঁদেরই দূর সম্পর্কের লোক এসেছিল। তাঁরা দুজনে যেদিন এলেন, সেদিন সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত ছেলেটি বেশ সচেতন ছিল। মা-বাবা কাছে গিয়েই যখন কাঁদতে লাগলেন তখন ক্ষীণ স্বরে, "কেঁদো না, আমি সেরে উঠব। (ওঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে) এঁরা সবাই আমাকে তোমাদের চেয়ে বেশী যত্ন করছেন।" এই ধরনের কী যেন কথা বলল। তার অল্পক্ষণ পরেই সেই জ্বরের উপর আরও বেশী জ্বর হল। আর রাত্তিরে একেবারে ঘোর বিকার, নানা রকম প্রলাপ বকতে লাগলেন। বুড়োবুড়ি দুজনে কেঁদেই সারা। তাঁরা আর কিছু করতেই পারছিলেন না। আমরা সবাই মিলে তাঁদের কত সান্ত্বনা দিলাম—না, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এমন অবস্থায় কি কৃতকার্য হওয়ার আশা করা যায়? কী বললে তাঁরা সান্ত্বনা পাবেন? বেচারিদের একমাত্র সন্তান। সম্প্রতি তার বিয়ে দিয়েছিলেন। বড়ো চালাক, বুদ্ধিমান, সবেমাত্র পূর্ণ বয়স হয়েছিল, আর তাকে বুঝি তারা আর পাবে না, এই ভেবে তাঁদের শোক অসীম হয়ে থাকবে তাতে আশ্চর্য কী? বুড়োবুড়ি একেবারে পাগলের মতো হয়ে যার-তার পায়ে পড়তে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, "আমাদের রামকৃষ্ণ বাঁচবে কি

বাবা ? ও সেরে উঠবে কি মা ? না ! ও কি আর উঠবে ?" যে যা বলছিল তাই তাঁরা ছেলের উপশমের আশায় করছিলেন কিংবা আমাদের করতে বলছিলেন। মা আর গোপিকাকাকিমা তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু তাতে কী লাভ ? এদিকে ছেলের জ্বর বাড়তে লাগল আর প্রলাপও বাড়তে লাগল। কারো কোনো পরামর্শে কোনো কাজ হচ্ছিল না। নিজে যে-কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন তাতে সফলকাম হবেন না দেখে ওঁর অত্যন্ত দুঃখ হল। কত আশা করে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন, ভালোয় ভালোয় সে আরোগ্যলাভ করলে কত ভালো হত !

কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল ! আট দিনের দিন রাত্তিরে তিনি খুব বেশী প্রলাপ বকতে লাগলেন। একেবারে প্রথমে পড়াশোনার সম্বন্ধে কী সব বলছিলেন, কিন্তু সেই দিনই ভোর বেলায়, কিছু অজ্ঞান অবস্থায়, কিছু বুঝে সুঝে প্রলাপ বকতে লাগলেন। সে প্রলাপের খানিকটা তার স্ত্রীর সম্বন্ধে ছিল। "কেন ? আমি বারণ করেছিলাম তো ? এখন কী উপায় ? এখন তাকে বল যে আমি তোমার নই।" এই অদৃষ্ট ! আমাদের বরাতই এই ! ...ক্রমশঃ জ্বর আরও বেশি হল। আর তার পরদিন বারোটার সময় বেচারা মারা গেল। তাঁর মাতাপিতার তখনকার অবস্থা বর্ণনা করার চেষ্টা করা অসম্ভব। তা ছাড়া, সে সব কথা যদি এখন মনে আনি, তা হলে এখনো পর্য্যন্ত আমি যে আমার মনকে আগলে রেখেছি, সে আর কোনো বাধা না মেনে একেবারে ভেঙে পড়বে। তাই, সংক্ষেপে শুধু এই বলছি যে যেমন তেমন করে সব ব্যবস্থা করে সেই বৃদ্ধ দম্পতিকে কোনো রূপে তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেদিন থেকে দুমাস পর্যন্ত আমাদের কারো মুখে আনন্দ কিংবা হাসি দেখা যায় নি।

ওঁর মনে সেই অকরুণ প্রসঙ্গের এমন অদ্ভুত পরিণতি হল যে, তা মুছে যাবে কেমন করে এটাই আমার একটা বিষম ভাবনা হল। তার উপর দুষ্ট, নিষ্ঠুর, পাড়াপ্রতিবেশীরা সেই বৃদ্ধ দম্পতিকে জ্বালাতন করে করে, তাদের হাতে করে—তাদেরই হাতে কিসে ? নিজেরাই সেই বালিকার—এখন আমি লিখবই বা কী ? সেই কঠোর হৃদয়হীন, চণ্ডালদের দুষ্কৃতির নামই বা করতে যাব কেন ?—তখন থেকে তো আমাদের সকলের আনন্দ একেবারে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে গেল। বেচারা রামকৃষ্ণের মৃত্যুতে মোটামুটি যে সব অনর্থ হল, তখন থেকে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের কিছু ভালো

লাগছিল না। কিন্তু কালের অনিবার্য প্রবাহ সব কিছু ধুয়ে নিয়ে যায়, আমাদের মনের দুঃখের ছাপও সে মুছে ফেলল। তবু তার ফলে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, তার প্রথমটি এই—

আমি আগেই বলেছি যে সেই ছেলেটির মৃত্যুতে সকলের চেয়ে ওঁর মনে সব চেয়ে বেশী আঘাত লেগেছিল। সে মারা যাবার পর পোনর দিনের দিন রাত্রে আমাকে জাগিয়ে উনি খুব বিষণ্ণভাবে, আস্তে আস্তে বললেন, "রামকৃষ্ণের অবস্থাতে আর আমাদের অবস্থাতে বিশেষ কিছুই তফাতে নেই, না?" সে প্রশ্নটা শুনে আমি একেবারে চমকে উঠলাম! আর ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে ভয়ে ভয়ে বললাম, "ওকী কথা বলছ? খামোকা ভাবনা কেন? আজকাল সমস্ত দিন মনে এ সব কি ভাবতে থাক?" আমি কী বলছিলাম সেদিকে ওঁর লক্ষ্যই ছিল না। উনি নিজের মনেই বললেন, "বুড়ো হোক না কেন, কিন্তু ওঁর বাবা তো তবু আছেন! কিছু টাকা-কড়ির সঞ্চয়ও থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের কী আছে?…" আবার আমি শক্ত করে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "কী যা নয় তা বলছ?" তবুও উনি আমার কথা শুনলেনই না। অনেক্ষণ পরে, "তাই তো। তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। না হলে সেই…" এই রকম কিছু বললেন, আর "হু" করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। তখন কিন্তু আমি বিষম ঘাবড়ে গেলাম। আবার একটু বিরক্তভাবে বললাম, "ব্যাপারটা কী বলোতো?" তখন "কই,… কোথায়…?" এইমাত্র আমতা-আমতা করলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে আবার আমাকে বললেন, "তোমার মনে হয় না যে কিছু ব্যবস্থা করা দরকার?" আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না, তবু আমার মনে হল যে উনি নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু ভাবছেন। আমি বললাম, "কীসের ব্যবস্থা?— আর কীসের কী?" আবার কিছুক্ষণ উনি চুপ করে রইলেন, আর শেষে আবার আমি যখন "এঁ্যা" করে জিজ্ঞাসা করলাম তখন শুধু এই বললেন, "আমার যদি এমন কিছু হয়, তা হলে তোমার আর মার…?" শুধু সংক্ষেপে এইটুকু উত্তর দিলেন।

"বলি আজ তোমার মনে এ কী ভাবনা এসেছে?" আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। ওঁর সে কথা শুনে আমার মনের কী রকম অবস্থা হল, তার কল্পনা তেমন অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারাই করতে পারবে। অন্য

কেউ তা বুঝতে পারবে না।—আর ভগবানের দয়ায় তা বুঝবার প্রয়োজন যেন তাদের জীবনে না আসে!

আমি যখন অমন কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তাড়াতাড়ি আমার পায়ে হাত রেখে গদগদস্বরে উনি বললেন, "তুমি লেখা পড়া শিখেছ, বিদ্যা বুদ্ধি আছে, তা এই নাকি? অন্য অশিক্ষিত মেয়েদের মতো তুমিও এরকম শুধু মুখের কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়ে—'এ কী কথা, এমন কথা কি কেউ বলে'—এই বলবে? এ বিষয়ে বাস্তবিক তোমার ভেবে দেখা দরকার। আমি বলি এ রকম দুর্ভাগ্য কি কম লোকের হয়? সে বিষয়ে দুজনে মিলে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে না?" এই বলে, আমার মনে কী প্রতিক্রিয়া হল তাই দেখতেই বোধ হয় উনি একটু থামলেন। আমি কিছু বললাম না। কেন না, ওঁর কথার "আমার পিছনে" এই কথা দু'টি আমার চোখের সামনে যে ভয়ংকর ছবি দাঁড় করিয়ে দিল, তা দেখে আমি একেবারে ভয়ে শিউরে উঠলাম! তাও আবার সেই ছবিতে যে একজন অত্যন্ত ভীষণ জল্লাদ প্রাণীকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তাকে দেখে তো আমার বুক কাঁপতে লাগল। সে ভয়ংকর ছবিটা চোখের সামনে থেকে যেন অদৃশ্য হয় আমি যেন সেটা দেখতে না পাই। এর প্রকৃষ্ট উপায় ভেবেই বোধ করি আমি ওঁর বুকে মুখ গুঁজে ওঁকে শক্ত করে ধরলাম। আমি ভাবলাম যে এই মুহূর্তেই বুঝি কেউ ওঁকে টেনে নিতে এসেছে! না জানি তার শক্তি কী! আমার এরকম অবস্থা দেখামাত্র, "আচ্ছা বেশ, আমি এই সময় কিছু বলছি না, কিন্তু এ রকম পরিস্থিতি যদি আসে, তা হলে তোমাকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ কথা বুঝে চলা দরকার।"—এই বলে সে বিষয়টা ছেড়ে দিলেন। আমি কিন্তু সে বিষয়ে খুবই চিন্তা করতে লাগলাম। কিংবা সে চিন্তা না করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম বলাই ঠিক হবে কিন্তু আমি যতই সে চিন্তা এড়াবার চেষ্টা করি, ততই সে কথাই বার বার আমার মনে ঘুরতে লাগল। সেই চিত্রটি চোখের সামনে থেকে দূরে সরাবার জন্য আমি যত চেষ্টা করতে লাগলাম, ততই সেটা যেন বেশী স্পষ্ট হতে লাগল। তারপরে অনেক চেষ্টা করেও মোটেই ঘুম আসছিল না। একেবারে ভোর-বেলায় ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু সে ঘুমের মধ্যে সব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে লাগলাম যে আমি যেন অত্যন্ত দুঃখময় অবস্থায় আছি, আর কে একজন দুষ্ট প্রাণী (এখানে তার নাম করার ইচ্ছা আমার নেই) পিছন থেকে এসে

আমার খোঁপা ধরে একটা ছোরা দিয়ে আমার গলা কেটে ফেলল! তক্ষুণি আমি চেঁচিয়ে উঠলাম,কিন্তু আমার পাশে উনিই ছিলেন, আর কেউ ছিল না।

এই ঘটনাটি এখানে বলার কারণ এই যে, এই ঘটনার পরে বারবার সে রকম কথা বলে উনি সে বিষয়ে আমার মন একটু কঠিন, অন্ততঃ শক্ত করবার অনেক চেষ্টা করলেন। আর নিজের জীবনের উপর পাঁচ হাজার টাকার বীমা করে ফেললেন। আমি এ বিষয়ে আর কিছুই লিখব না।

রামকৃষ্ণের এই ঘটনাতে, আর বিশেষতঃ তার বাবা পাড়াপ্রতিবেশীরা যে অধমের চেয়েও অধম কাজ করল, তাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হলাম। কিন্তু কালের প্রবাহে সেই উদাসীনতাও একেবারে ধুয়ে মুছে গেল; আর অল্প দিনেই আমি সেই ঘটনা আর আরো চার-পাঁচ জন মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে, যে রীতি হিন্দু ধর্ম আর লোকের মুখে কালি মাখায়, যে রীতির নামে, ধর্মের নামে অধমাধম লোক ছোট্ট ছোট্ট মেয়ে আর অনাথা মহিলাদের অত্যন্ত জ্বালাতন করে, সেই দোষাবহ, অত্যন্ত নীচ রীতির সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখলাম, আর সেটা আমাদের শনিবারের সভায় পড়লাম। সে প্রবন্ধটা এখনো আমার পাশে পড়ে রয়েছে। সেটাতে অনেক জায়গায় কাটাকাটি করে আমার সেই প্রিয় হাতের লেখায় ভুল সংশোধন করা আছে, তা দেখতে পাচ্ছি। তাই সে সময়কার ঘটনা সব মনে পড়ে আমার বড্ড কান্না পাচ্ছে। মন [illegible] ডাক ছেড়ে কাঁদতে আমি একেবারে উতলা হয়েছি। কিন্তু, না। আমার এই কর্মকথা একেবারে শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি আমার দুর্বল মনের অধীন মোটেই হব না। আর যতদূর সম্ভব সাহস করে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনা সত্যি যেমন যেমন হল তা নির্ভীকভাবে লিখব—এই সংকল্প করেছি। তাই কান্নাকাটি কিছু না করে আমি বেশ সাহস করে এই কথা বলছি যে, উপরে যে স্বপ্নটির কথা বলেছি, কিংবা যে ভয়ংকর চিত্র দেখতে পাচ্ছিলাম সেটা পরে সত্যিকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে, এ কথা যদি আমি আগে জানতাম তা হলে আমার সেই প্রবন্ধটা আরো কঠোর হত, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু আজ আমি ভাবছি যে এই বিষয়ে লিখবার বেলায় যে নরাধমরা ধর্মের ঢাক পিটিয়ে কশাইএর কর্ম করে, তাদের যত কঠোর ভাবেই নিন্দা করা যাক না কেন, তা অসম্পূর্ণই হবে। কিন্তু মন অত্যন্ত আকুল হয়েছে; এমন অবস্থায় চুপ করে শান্ত হয়ে বসাই ভালো; তাই আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসছি!

ধোণ্ডুঠাকুরপোর পলায়ন

এর আগের পরিচ্ছদের ঘটনাগুলি একেবারে ভুলে যাবার পর অনেক দিন কেটে গেল। এখন সেরকম অন্য কোনো ঘটনা শুনতে পেলেই সে সব ঘটনা মনে পড়ত আর খানিকক্ষণ মন কেমন করত এই যা। দাদা আর উনি দুজনেই পড়াশুনো বেশ মন দিয়ে করছিলেন। এখনো পরীক্ষার এক বছর দেরি ছিল। কিন্তু সে পরীক্ষার অভ্যাস নাকি বড় কঠিন, শুধু পাশ করতেই না কি অনেক মার্ক দরকার, আর প্রথম ক্লাশে উত্তীর্ণ হতে হলে কত পড়া দরকার তার সীমাই নেই। এখন, চাকরি তো যা হোক দুবছর হল। তৃতীয় বছরে যে থাকবেই তার ঠিক ছিল না, কিন্তু রইল। এখন অন্য কোথাও, পঞ্চাশ-ষাট টাকা উপার্জন হবে, কিন্তু দিনে দু'তিন ঘণ্টার চেয়ে বেশী কাজ করতে হবে না, এরকম কোনো একটা কাজ দেখবার ইচ্ছা ছিল। বললেই কী আর এরকম কোনো কাজ পাওয়া যায়? কিন্তু দাদা আর আর সকলে বলছিলেন যে, "আপনার ফেলো শিপ যাবে না।" এই ভাবে দিনগুলো চলছিল। দাদার পরীক্ষা শীগগীরই, মানে তিন-চার মাসে হবার কথা ছিল। তার পরীক্ষা একটা বিষম ব্যাপার! দু-দুশো পরীক্ষার্থীর মধ্যে দশ কিংবা বারো জন পাশ করলেই যথেষ্ট! কাজেই সে যে পাশ করবে কি না ভয় করছিল তা স্বাভাবিকই ছিল। তবু সকলে তাকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, আর সেও কোমর বেঁধে পড়ার তোড়জোড় করেছিল। ওই চার ছ'মাসে সে একটুও অন্যমনস্ক হয়নি। তাই আমিও ভাবতাম যে দুশো লোকের মধ্যে দশ-বারো জনই যদি পাশ করে, তাহলে আমার দাদাও নিশ্চয় পাশ করবে। কেন করবে না?

সেই সময়ে পুণায় দু'টি ঘটনা ঘটল। এক, দিদিশাশুড়ী কাশী গেলেন, আর দ্বিতীয় বড় গুরুতর ঘটনা যা হল, সেটা এখানে বলে রাখি। সে হচ্ছে ধোণ্ডুঠাকুরপোর পলায়ন। আমরা সে-ঘটনা জানতে পেলাম তার কারণ গোপালঠাকুর আমাদের 'তার' করেছিলেন, আর পরের দিন

শংকরঠাকুরের চিঠি পেয়েছিলাম। বাপ-ছেলেতে ভয়ানক ঝগড়া হয়ে ধোণ্ডুঠাকুরপো হঠাৎ বাড়ি থেকে চলে গেলেন। পুণায় সকলে ভাবল যে পুণার বাইরে যদি গিয়ে থাকে তা হলে বোম্বায়ে আমাদের এখানেই আসবে। অন্য কোথায় যাবে? তাই তাঁরা 'তার' ক'রে আমাদের এখানে খোঁজ নিলেন। উনিও তক্ষুনি উত্তর দিলেন, 'আসেনি, এলেই খবর দেব।' আমরা আগে থেকেই জানতাম যে এই রকম একটা কিছু হবে। আগে একবার বোম্বায়ে দীপাবলীর কথা লিখেছি সে ঘটনার পর থেকে বাপ-ছেলেতে বিষম ঝগড়া বেধেছিল। যাকে অপমান করে যেমন খুশি কথা বলবার শিক্ষা যে পুত্রকে পিতাঠাকুর দিতেন সেই পুত্র এখন সে শিক্ষার ফলে সুবিধামতো বাবাকে যাচ্ছেতাই পাল্টা জবাব করতে লাগল। আর তাতে 'শিষ্যাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম' এই ন্যায়ে পিতার সন্তোষ হচ্ছিল এতে সন্দেহ নেই। আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু এ রকম ব্যাপার কানে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না। আসে যায় এমন লোকরা পর্যন্ত যেতে আসতে বলে ওহে তোমাদের অমুকের অমুক এরকম করেছে।

ধোণ্ডুঠাকুরপোর পালিয়ে যাবার বিশেষ কারণ হল যা তা শুনলে কেউই আশ্চর্য মনে না করে থাকতে পারবে না। সে কারণটি হচ্ছে মায়ের পক্ষ নেওয়া। একথা শুনে কে আশ্চর্য হবে না? ভদ্র ঘরে যে ধরনের স্ত্রীলোকের কস্মিনো প্রবেশ করা উচিত নয়, এমন একজন স্ত্রীলোককে ঘরে খেতে নিমন্ত্রণ করে, তাকে পরিবেশন করতে আর তার মেজাজ রাখতে নিজের স্ত্রীকে হুকুম করেছিলেন। ছোটঠাকুর বাইরে কোন গ্রামে গিয়েছিলেন। ছোটমামীশাশুড়ী রেগে গম্ গম্ করতে লাগলেন কিন্তু তাতে কী লাভ? মেয়েজাতির রাগ উনুনের সীমা পেরিয়ে বাইরে যেতে পারে না, তা সে মহিলা আমাদের ছোটমামীশাশুড়ীর মতো কোপনস্বভাব কিংবা আরো কর্কশ হোন না কেন। ছোটশাশুড়ী নিজের ক্ষমতামত যা পারলেন করলেন। অর্থাৎ উপরে দোতলার ঘরে গিয়ে পুরোনো একটা কাপড় পেতে শুয়ে পড়লেন, আব গজর-গজর করতে লাগলেন। বসুঠাকুরঝি আমতা আমতা করতে লাগলেন, আর উমা শাশুড়ী একটু দাপাদাপি আর বিড়বিড় করলেন। তখন ঠাকুরঝি গিয়ে সেইটুকু বাবাকে বললেন। ওই খেয়েছে। ভয়ানক ক্ষেপে শংকরঠাকুর তেড়েমেড়ে উমাশাশুড়ীকে অকারণে বকতে লাগলেন, বকতে বকতে

মারতে উদ্যত হলেন; এই ব্যাপার দেখেই ধোণ্ডুঠাকুরপো একেবারে চেঁচিয়ে "আমার মাকে মারতে লজ্জা করে না?" এই বলে বাবার দিকে তেড়ে গেলেন। আর এসব হল কার সামনে?

একটা হৈচৈ কাণ্ড বেধে গেল। মারামারির পালা পর্যন্ত এল। ধোণ্ডুঠাকুরপো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উমাশাশুড়ীকে অত্যন্ত জালাতন সহ্য করতে হল। দুদিন পরেই ছোটঠাকুর ফিরে এলেন, আর তিনি ব্যাপারটা জানতে পেরে তক্ষুণি আমাদের 'তার' করলেন। সে খবর যখন শংকরঠাকুর পেলেন, তখন "আমি লক্ষীছাড়াটার মুখ দেখতে চাই না, আমি ধরে নিয়েছি যে ও মারা গেছে। এমন লক্ষীছাড়ারা যদি নাই জন্মায় তা হ'লে কি দুনিয়া শূন্য হবে? এই ইংরিজি বিদ্যার গুণই এই, বাপের অমর্যাদা অপমান করা। ও যদিও সেখানে থাকে, তবুও আমায় জানিও না। গোপাল 'তার' করেছে, কিন্তু সেটা অগ্রাহ্য করে, লক্ষীছাড়াটা যদি তোমাদের ওখানে গিয়ে থাকে, তাহলে লাথি মেরে দূর করে দিও"—এই মর্মে চিঠি ছাড়লেন। সে চিঠি পড়ে সে সময় আমরা তত মজা বোধ করিনি; কিন্তু পরে অবিলম্বেই যখন ঘটনাটা আগাগোড়া জানতে পারলাম, তখন সে চিঠিটার তাৎপর্য বুঝতে পেরে খুব হাসি পেল। অমন হতচ্ছাড়া ছেলে জন্মালে বাবা বেচারা কী করবেন? যাক।

আমরা যখন 'তার' আর চিঠি পেলাম, তখন নিজের কর্তব্যকর্ম ভেবে উনি ধোণ্ডুঠাকুরপোর খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু মহাসাগরে ছুঁচ অন্বেষণ করা আর বোম্বায়ের মতো শহরে এরকম পলাতক মানুষকে খুঁজে বের করা সমানই সহজ। তাতেও আবার এই মজা যে ধোণ্ডুঠাকুরপো বোম্বায়েই এসেছিলেন বলে আমরা ঠিক জানতাম না। মোটামুটি আন্দাজ করেছিলাম—এইমাত্র! যতটা সম্ভব খোঁজ করা হল, কিন্তু পাত্তা পাওয়া গেল না। কেমন করে পাওয়া যাবে? শেষে শুধু এই আশা রইল যে তিনি নিজে থেকে দুচার দিনের মধ্যে আসবেন, কিন্তু তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পোনর দিন হয়ে গেল। তারপর একখানা চিঠি পেলাম। কোথা থেকে এল সে চিঠি আন্দাজ করতে পারেন? বড়ঠাকুরঝির স্বামীর ওখান থেকে। "এই রকমে আপনাদের ছেলে পালিয়ে আমাদের এখানে এসেছে। ও বলছে যে একটা চাকরি দেখে দাও। আমি তাকে বলেছি যে তুমি ফিরে যাও আর লেখাপড়া করো। কিন্তু তার দৃঢ় সংকল্প দেখছি

যে সে পুণায় ফিরে যাবে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি। সে চিঠি পেয়ে আমরা অবাক হলাম। কেননা, যাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, যিনি নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন বলে সব সময় আমরা যাঁর নিন্দাই করতাম, তাঁর ওখানে ধোণ্ডুঠাকুরপো এইভাবে যাবেন আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। আর ধোণ্ডুঠাকুরপো সত্যিই গেলেন, এখন কী কর্তব্য? তাঁকে কোনো লোভ দেখিয়ে চাকরি দেব বলে কিংবা যে কোনো উপায়ে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতেই হবে।

চিঠি পাঠানো হল, নিজে নিতে আসছি বলে লেখা হল; তখন শেষ কালে তিনি আসতে রাজি হলেন। এখান থেকে টাকা পাঠানো হল, তখন মশাই একটিবার বোম্বাই এলেন। তাঁর আসার পর অনেকদিন পর্যন্ত মৌনব্রত নিয়েছিলাম। না জানি কেউ কিছু বললে মশায়ের যদি আবার মাথা খারাপ হয়!

কিন্তু একদিন মশাই নিজে খুব খুশি হয়ে সব কথা আমাকে বলতে লাগলেন। আমি আগে যে কথা শুনেছিলাম তাতে আর তাঁর মুখের কথায় অনেক তফাত ছিল। তিনি মার পক্ষ নিয়ে বাবার বিষয়ে এমন যাচ্ছেতাই কথা বললেন যে তা বলবার জো নেই। মাঝে মাঝে যে মানুষটি বাড়িতে আসার ফলে এসব অনর্থ হয়েছিল তাকে তো লক্ষ লক্ষ গালি দিলেন। সেদিন তিনি খুশি হয়ে বাবার এত গণ্ডগোল আমাকে বললেন আর বাবার সম্বন্ধে এত কঠোরভাবে কথা বললেন যে আমার গা শিউরে উঠল। যে শংকরঠাকুর সকালে চার-চার দণ্ড নাক টিপে ধরে বসতেন, পুরানো রীতিনীতি ছেড়ে কারো পা একটুও বাঁকা পথে (তাঁর মতে বাঁকা পথ) পড়লে, যিনি ধর্ম ডুবে গেল বলে আকাশ-পাতাল এক করতেন আর সেই মানুষের যেখানে খুশি যেমন খুশি নিন্দা করতেন, সেই শংকর-ঠাকুররূপী ভদ্রলোকের ছেলে তাঁর সম্বন্ধে স্পষ্ট ওরকম বলতে আরম্ভ করল আর তার ভালোমন্দ গণ্ডগোল জগতের সামনে খুলে দেখিয়ে দেবার পালা আনল, এর মতো লজ্জাস্কর ঘটনা আর কী থাকতে পারে? কিন্তু তাঁর মতো লোক সেটাকে সম্মান হানি বলে মানলে তো। মনুষ্যস্বভাবই এই যে নিজের অহিত যে করতে যায় তারই যদি অহিত হয় তাহলে মানুষের আনন্দ হয়। আমাদের অহিত করবার চেষ্টা যে করবে, তার নিজের অহিত হলে যখন আমাদের দুঃখ হবে. তখনই মানুষকে সত্যি সত্যি সুশিক্ষিত বলতে

হবে। আমি অন্য কোনো কোনো মেয়েদের চেয়ে পড়াশোনার দিক দিয়ে যদিও অনেক সুশিক্ষিত হয়েছি, তবু সাধারণ মনুষ্যস্বভাব আমার যায়নি একথা আমাকে স্পষ্ট স্বীকার করতে হবে। ধোণ্ডুঠাকুরপো সে সব কথা বললেন, তার কোনো কোনো কথা এর আগেও আমি শুনেছিলাম, কিন্তু সোজা তাঁর মুখে (তাতে কিছু কিছু কমবেশি হয়ে) যখন শুনলাম, তখন একরকম যেন সান্ত্বনা পেলাম ! ভাবলাম যে ধর্মের মিথ্যা অহঙ্কার করে যিনি ঢাক বাজাতেন সেই শংকর ঠাকুরের বেশ প্রায়শ্চিত্ত হল। সেই সান্ত্বনায় নিমগ্ন হয়ে আমি একটু আনন্দে ছিলাম।

আরো মজা এই যে, রাত্তিরে আমরা যখন গল্প করতে বসতাম তখন ধোণ্ডুঠাকুরপো সকলের সামনে নিজের বাবার সম্বন্ধে যেমন খুশি কথা বলতেন। প্রথমদিন তিনি যখন সে রকম কিছু বলতে লাগলেন তখন আমি তাঁকে চুপ করতে ইশারা করলাম, কিন্তু তিনি কি তা শোনেন ? তিনি আরও চেপে কথা বলতে লাগলেন। দ্বিতীয় দিন উনিও তাকে চুপ করতে ইশারা করলেন, তবুও তিনি শুনলেন না। আবার নিজের বোনের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথা যখন তিনি বললেন তখন দেখলাম তাঁর যেন খুব স্ফূর্তি হয়েছিল। আর তিনি তাঁর ভগিনীপতির ওখানে থাকতে যে সব ঘটনা দেখেছিলেন, তার বর্ণনা যখন করলেন, তখন আমার বন্সুঠাকুরঝির উপরে দয়া হল। তিনি আমার যতই মন্দ কামনা করুন আর হিংসে করুন, কিন্তু তাঁর বরাতে এর পরে কখনোই সংসারসুখ নেই দেখে আমার মন দুঃখ বোধ না করে পারল না। তাঁর স্বামী তো ওদিকে স্বচ্ছন্দে সংসার করছিলেনই— আর এ বেচারী সেই তার—কিন্তু এখন আর সে সব মন্দ ব্যাপারের বর্ণনা এখানে না দেওয়াই ভালো। তাই যে কথা ছেড়ে দিয়ে, তার পরের কাহিনী লিখতে আরম্ভ করি। এইখানে শুধু এই বলে রাখছি যে ধোণ্ডুঠাকুরপোকে অনেক অনুনয় বিনয় করে এখানেই হাইস্কুলে ভর্তি করা হল।

দাদার ওকালতি পরীক্ষা

এই পরিচ্ছেদে আমি অনেক কথাই বলে ফেলব। আজকাল কী জানি কেন আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে। সেই দিনের কত সুখদুঃখের কথা আমার মনে আসে। কিন্তু শেষে সে সব ঘটনা অন্ধকারে ছেয়ে ফেলবে এমন ভয়ংকর যে ঘটনাটি হল সেটি চোখের সামনে আসে আর অন্য সব কথা যেন ভুলে যাই। দিনে দিনে আমি দুর্বল হচ্ছি আমার এই জীবন কাহিনী শেষ পর্য্যন্ত—আজকের দিন পর্য্যন্ত—শেষ করতে পারব তো? এই ভেবে মনে গোলমাল বেধে যায়। দাদার আর আমার ইচ্ছে যে আমার হাতে যেন এটা সমস্ত লেখা শেষ হয়। দাদা আমাকে কত যত্ন করে। কিন্তু এখন আমি অল্পদিনেই…হায় হায়! কিন্তু আমি পাগলের মতো এ কী করছি? আমি আমার সংকল্প—ধৈর্য হারা না হবার সংকল্প—কি একেবারে ভুলে গেলাম! আমি যদি ধৈর্য হারাই, তাহলে দাদা কী মনে করবে? এ সব চিন্তা ছেড়ে ফেলে দি। আবার মন দিয়ে লিখতে আরম্ভ করি এখনো পর্য্যন্ত আমি যে সব কথা বলেছি, তাতে কোনো কোনো সুখের আর কোনো দুঃখের কথা বলেছি। তেমনি, এই পরিচ্ছেদেই একটি সুখের আর একটি দুঃখের কথা বলব।

আগের পরিচ্ছেদে বলেছি যে দাদার পরীক্ষা দিতে যেতে দু'তিন মাস দেরি ছিল। তিনমাস পরে তার পরীক্ষা হল আর আনন্দের কথা এই যে সে পাশ করল। ওকালতির পরীক্ষায় প্রথম বারেই পাশ করা প্রায় অসম্ভব কথা, কিন্তু সেটাও সফল হল। আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। ভাবলাম যে ভগবান বোধকরি এরপরে আমাকে নিরঙ্কুশ আনন্দেই রাখবেন ঠিক করেছেন। এখন ওঁর পরীক্ষারই ভাবনা শুধু রইল। কিন্তু সেটা তেমন ভাবনার বিষয় ছিল না। উনি পরীক্ষা পাশ করবেন কিনা এ বিষয়ে কারো কখনো কোনো সন্দেহই ছিল না। তাই আমরা সে বিষয়ে কোনো চিন্তাই করতামনা। কিন্তু দাদা পরীক্ষা পাশ করায় অত্যন্ত আনন্দ

হল ; আর ঠাকুমা তো যেন আনন্দে পাগল হয়ে গেলেন। দাদার নিজের যা আনন্দ হল তা তো বলবারই জো নেই। সে ভাবল যে এখন যখন ইচ্ছা স্বাধীনভাবে থাকতে কোনো বাধা নেই ; পুণায় ওকালতি করবার সনদ না নিয়ে অন্য কোনো জেলায় নিলেই হল। নিজের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ নয়, তবুও প্রথম থেকে সে ভেবেছিল, এই ভাবে সে ঠাকুমার সহায় হতে পারবে, তাই তার বড় আত্মগৌরব মনে হল। সে পুণায় ফিরে যাবার আয়োজন করল, ঠাকুরমার ইচ্ছা ছিল যে আমিও দুচার দিন সেখানে যাই। আমিও ভাবলাম যে একবার পুণায় গিয়ে দুর্গী, ঠাকুমা এদের সকলের সঙ্গে দেখাশোনা করে তাদের খবর নিয়ে আসি। আমরা দুজনে ভেবে দেখে ঠিক করলাম যে আমি দাদার সঙ্গে যাব আর মে মাসের শেষে উনি আমায় নিয়ে আসবেন। এখানে এমন ওঁর পড়ার তাড়া ছিল ; পুণায় গেলে সেখানে মনোমত বসবার জায়গাও থাকে না, তাই উনি এখানে থাকাই ভালো মনে করলেন। এবং আমার যাবার অনুমতি দিলেন। এত সব ঠিক হয়ে আমি আর দাদা পুণায় এলাম।

পুণায় এসে কয়েকদিন আনন্দে কেটে গেল। সুন্দরীকেও পাঠিয়ে দেবার জন্য তার স্বামীকে আর তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের চিঠি লেখা হয়েছিল। সেইমতো তাঁরা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুদিন পরে আমি দুর্গীর বাড়ি গেলাম। সেখানে তার খবরাখবর নিলাম তার শরীর এখন একটু ভালো ছিল ; কিন্তু খোকাটা একেবারে রোগা। কোলে তুলে নিতে গেলে ভ্যাঁ ক'রে কাঁদতে বসত, এমনি ছিল। এখন দু-চারটি কথা উচ্চারণ করতে আরম্ভ করেছিল, তবে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যেত তার সব বল, চালাকি মুখেই ছিল। দুর্গী তাকে প্রথম থেকে যেমন ভালোবাসত তেমনি—তা কেন ?—দেখলাম সে আগের চেয়ে সে তাকে সহস্রগুণ বেশী ভালোবাসত। সে স্বপ্নেও ভাবত না যে তার খোকার অমুক একটা গুণ নেই। আমি দুর্গীর কাছে যাওয়ামাত্র সে তার খোকাকে তুলে দিয়ে, 'ঐ ত্যাখ, ঐ ত্যাখ, তোর যমুনা মাসীমা' এই বলে তাকে আমার সামনে ধরল। সে কিন্তু আপন মনে কাঁদছিল। আবার মার কোলে গেল ; মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে লাগল। ছেলেটা যদি একটু গোলগাল হত, তা হলে তাকে বেশ সুন্দর দেখাত ; ভারি চালাক, অবিকল তার মার প্রতিমা। সব তাতেই মার প্রতিমা বললেও ক্ষতি নেই, কেননা, সে এত

একগুঁয়ে ছিল যে তা বলবার জো নেই। একবার তার কোনো একটা জিনিসের দরকার হল আর সেটা দাও বলল তা হলে যতক্ষণ সে জিনিসটা তাকে না দেবে ততক্ষণ সে মাথা খুঁড়ে বিষম আলতন করবে। আমাদের দৃষ্টিতে যদিও ছেলেটার এত সব দোষ ছিল, তবু দুর্গী তার খোকার গুণ-গানই করত। সে তার খোকাকে না জানি কী করত! সে সব দেখে আমার কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল; তবু মোটের উপর সন্তোষ হল। কেন না, তার সেই অত্যন্ত বাৎসল্যের জোরেই সে বেঁচে ছিল। না হলে নিশ্চয়ই বাঁচত না। তার স্বামীর হঠাৎ মধ্যে মধ্যে ঠিকানা পাওয়া যেত, আবার হঠাৎ সে অদৃশ্য হত কিন্তু এতদিনের মধ্যে মশাই ঘরে কখনো আসেনি। কেউ বলত সে কোনো নাটকের দলে ঢুকেছে, কেউ বলত খামোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার নিজের একটা চিঠি পর্যন্ত বাড়িতে আসেনি। তার বিষয়ে দুর্গীর মনের অবস্থা কী রকম হয়েছিল তা দেখবার জন্য আমি ভয়ে ভয়ে যখন তার কাছে কথা পাড়লাম তখন সে তার স্বামীর সম্বন্ধে আগের মতোই অদ্ভুত আর তিরস্কারপূর্ণ কথা বলল, 'আসবেন' খন! যাবেন কোথায়? আমার গঙ্গারাম তো…' ও তার পরে কিছু বলবে, এমন সময় দেউলির প্রদীপটি গঙ্গারাম টুপ করে ছুঁয়ে ফেলল। তখন দুর্গী কথা শেষ না করেই তাড়াতাড়ি খোকার দিকে ছুটে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ দ্যাখো কী যে বলি তোর ঝুমিকে! ঐ দ্যাখ্ মাসীমা তোকে দুষ্টু পাগলা ছেলে বলছে, তুই কি পাগলা, দুষ্টু?' আর তাকে নিজের কাছে চুপ করে বসে থাকতে মিনতি করতে লাগল। নিজের স্বামীর সম্বন্ধে আর খোকার সম্বন্ধে এক নিশ্বাসে কথা বলবার সময়কার তার সেই অদ্ভুত স্বর শুনে আমি কী ভাবলাম? স্বামীর সম্বন্ধে কথা বলবার সময়ে তার স্বরে যে তিরস্কার, বিদ্বেষ, রাগ ছিল আর খোকার সঙ্গে কথা বলবার সময়ে তার স্বরে কত কোমলতা, বাৎসল্য ছিল, এর মধ্যে কত আশ্চর্য রকমের পার্থক্য ছিল! সে যাই হোক, মোটামুটি তার অবস্থা ভালো দেখে আমার বড় সন্তোষ হল। তার বাপের বাড়ির লোকের অবস্থাও এখন মোটামুটি ভালোই ছিল। দুর্গীর বাবার মাইনেও এখন বেড়েছিল, ভাইও বুঝি প্রথম পরীক্ষার ক্লাশে পড়ছিল। দাদা ওকালতি পরীক্ষা পাশ করেছে আর অবিলম্বেই উকিল হবে শুনে তাদের সকলের আনন্দ হল। 'আমাদের জামাইবাবুও যদি ঠিক থাকতেন, আর এই রকম কোনো

পরীক্ষা পাশ করতেন, তাহলে আমাদের সংসারেও কোনো দুঃখ থাকত না' বহিনাকাকিমা বললেন। তখন তাঁর বৌমা বললেন, 'আচ্ছা থাকনা সে কথা। এখন আর তাতে কী? এই গঙ্গারামই—বাছা বেঁচে থাকুক, বড় হয়ে একটা নাম কিনবে।'—এই বলে তিনি বহিনাকাকিমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

মোটকথা, এই রকম সব খবর শুনে, দুর্গীকে আমাদের বাড়ি যেতে নিমন্ত্রণ করে আমি ফিরে এলাম।

এইমাত্র আমি বলেছি যে দাদা পাশ করেছিল তাই আমাদের সুখের সীমা ছিল না। আমি ভাবছিলাম যে এখন বৌদির স্বভাবে কিছু পরিবর্তন হবে, আর আমি সেকথা দাদার কাছে প্রকাশ করলাম। তখন সে হাসতে হাসতে তার স্ত্রীর সামনে বলল, 'পরিবর্তন এখন একবারই হবে।' তার সেই 'একবারই' অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। তাই আমি সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম 'সব সময় ও কী দাদা? একবারই মানে কখন?' তখন বৌদি ভ্রুকুটি করে আর চোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'ওমা! তুমি বুঝতে পারলে না ঠাকুরঝি? 'একবারই' মানে 'ওঙ্কারেশ্বরে* গেলে!'

এমন কথার উপরে কে কী বলবে? মাগো মা! আমি তো তার সে কথা শুনে শিউরে উঠলাম। দাদা কিছুই বলল না। সে বৌদিকে কখনো বকত না। আর যতদূর সম্ভব বাড়াবাড়ি হতে দিত না। আমি যে ভেবেছিলাম দাদার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াতে বৌদির স্বভাব কিছু সরল হবে, সে ভুল আমার ভেঙে গেল, আর—'স্বভাব যায় না মলে, ইল্লৎ যায় না ধুলে', এই প্রবাদটির সত্যতা উত্তমরূপে বুঝতে পারলাম। তার সত্যি কী যে ইচ্ছা ছিল তা কখনো বুঝতে পারা যেত না। আমি শুধু এইটুকু নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছিলাম যে তার বড্ড ইচ্ছা ছিল যেন তারা একটু-স্বাধীন হয়। কিন্তু স্বাধীন হবার সাধন যে এই পরীক্ষা, সেটি দাদা পাশ করল, তবুও তার যখন সন্তোষ হল না, তখন আশ্চর্য হবার কথা নয়তো কী? আর দেখতে পেলাম যে দাদার আর আমার এমন গভীর ভালোবাসা সে বোধহয় সহ্য করতে পারত না। তবু এটা আমাদের শুধু সন্দেহ ছিল।

* পুণার একটি শ্মশানভূমি। পেশবাদের কালে পুণায় নদীতীরে ওঙ্কারেশ্বরের মন্দির রচনা হয়েছে। সেই মন্দিরের একটু কাছেই শ্মশান।

সে সন্দেহ সত্যি না মিথ্যা তা জানতে এখনো বিলম্ব ছিল। যথাসময়ে সেসব বলব। পুণায় যদিও আমি বাপের বাড়ি এসেছিলাম, তবু দু'-একদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকা দরকার ছিল। তাই আমি সেখানে গেলাম।

সেই সময়ে আমার মনে দুঃখদায়ক, কিন্তু যাঁর হল তাঁর পক্ষে সুখকারী একটি ঘটনা হল। তা সংক্ষেপে বলছি। আজকাল উমাশাশুড়ীর জ্বর হত, আর সেই জ্বরগায়ে তিনি কাউকে না বলে বেশ স্বচ্ছন্দে ঠাণ্ডাজলে গা ধুতেন। তাঁর জ্বর বাড়িতে কেউ জানতেই পেত না। দিনে দিনে তিনি নিস্তেজ হচ্ছিলেন। এইরকম অনেকদিন চলছিল আর তিনি নিজের শরীরের একেবারে যত্ন করতেন না। আমার তো মনে হল যে তিনি নিজের জীবনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন, আর কোনো উপায়ে প্রাণটা বেরিয়ে গেলে বাঁচবেন ভেবে নানারকমে মরণকে ডাকছিলেন। আমি এখন বড় হয়েছিলাম, আর তাঁকে বড় ভালোবাসতাম, তিনিও আমাকে খুব আদর করতেন। একবার আমি তাঁকে বললাম, 'আজকাল আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? আপনার কি জ্বরটর হয় না কি?' কিন্তু সে মমতাময়ী নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ না করে আমাদের সম্বন্ধে আর মা'র সম্বন্ধেই খবরাখবর নিলেন। আর তার দু'তিনদিন পরে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'বৌমা, ঠাকুরঝির সঙ্গে আর কি আমার দেখা হবে, মা? তুমি তাঁকে যে চিঠি লিখবে তাতে লিখো যে শাশুড়ীর কাশী-ফেরতের ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানের সময় তাঁর আসবার কথা, তার কদিন আগেই যেন আসেন, তাহলে বেশ হবে।' একথা যখন তিনি বললেন, তখনকার তাঁর চেহারা এখনো আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর অনুজ্ঞামতো আমি সে কথা মাকে লিখলাম। তখন থেকে রোজ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'উত্তর এসেছে?' আমি চিঠি লিখবার দু'দিন পরেই তিনি আবার আমাকে বললেন, 'বৌমা, তুমি আর এখান থেকে যেয়োই না।' আমি সত্যি তাঁর সেকথার উদ্দেশ্যই বুঝতে পারছিলাম না। শুধু একটু সন্দেহ হল যে তিনি বোধহয় ভাবছেন যে অল্পদিনেই তিনি মারা যাবেন আর তাই বোধ করি আজকাল তিনি ওরকম কথা বলতে শুরু করেছিলেন। তার চার-পাঁচ দিন পরে সত্যিই তার খুব জ্বর হল। গোপালঠাকুর ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এলেন, কিন্তু অনেক অনুরোধেও তিনি ওষুধ খেতে রাজি হচ্ছিলেন না। ডাক্তার ডেকে আনতে শংকরঠাকুর ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে

একটা কাথের ফর্দ লিখে আনলেন আর সেই কাথ খাবার হুকুম করলেন। কিন্তু শাশুড়ী তাও খেলেন না। আমি কিংবা গোপালঠাকুর ছাড়া আর কেউ কাছে গেলেই তিনি চোখ বুঁজে চুপ করে শুয়ে থাকতেন। তখন অবশ্যই তাঁর শুশ্রূষার জন্য আমাকে থাকতে হল, আর আমিও সত্যি সর্বান্তঃকরণে সেখানে থাকলাম। বড়ঠাকুরঝি সামনে এলেও তিনি সইতে পারতেন না। বাক্লঠাকুরঝিকে আনবার কথা যখন. জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি গোপালঠাকুরকে বললেন, 'দেখুন যদি আসে!' তিনি তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করলেন। দিদিশাশুড়ী, মামীশাশুড়ী এখন একটু ভাল আচরণ করতে লাগলেন। উমাশাশুড়ী আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করতেন, 'তোমার শাশুড়ী এলেন?' ধোণ্ডুঠাকুরপোকে তিনি অবশ্যই ভালবাসতেন, শত হলেও সে যে পেটের ছেলে, তাতে আবার একমাত্র। হতে হতে আমি দু'তিনবার চিঠি পাঠালাম, আর গোপালঠাকুর একবার লিখলেন তখন উনি বোম্বাই থেকে মাকে নিয়ে এলেন।

কী আশ্চর্য! উমাশাশুড়ী যেন মাকে দেখবার জন্যই প্রাণ রেখেছিলেন। যেদিন সন্ধ্যাবেলা মা এলেন, তার পরের দিন ভোর বেলায়ই তাঁর প্রাণটা উড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল, মরবার আগে সকলকে নাম ধরে ডাকলেন, আর ক্ষীণ আর্তস্বরে বললেন, 'আমি তবে এখন। কোনো কথায় রাগ মেনোনা।' গোপালঠাকুরকে তিনি দু'তিনবার ডাকলেন, কিন্তু কী বলতে চেয়েছিলেন তা বোঝা গেল না। আমার মনে হচ্ছে যে বলবার ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। আন্দাজ পৌনে এক ঘটিকার পর তিনি আবার প্রলাপ বকতে লাগলেন, 'এ জন্মে ছিলাম তোমার, এবার বাঁচলাম! স্বচ্ছন্দে থেকো। আরও চারজন……' তার পরের কথা তাঁর মুখের মধ্যেই গুলিয়ে গেল। এ কথা তিনি কাকে মনে করে বলছিলেন তা নিশ্চয়ই খুলে বলবার দরকার নেই। সে কথায় কার মনে কী প্রতিক্রিয়া হল, তা এখন আমি বলতে পারব না। আমি কিন্তু মনে মনে ভাবলাম যে, সে কথার মধ্যে অপরিমিত অর্থ ভরে ছিল! সেই কথায় উমাশাশুড়ী তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা, সুখ দুঃখ সব কিছু প্রকাশ করেছিলেন! আমার মনে হচ্ছে এরকম কথা অন্য মেয়েরা স্পষ্ট উচ্চারণ করুক কিংবা না করুক, বোধকরি অনেক মেয়েদের মনেই এই চিন্তা থাকে। তা ছাড়া যাদের উমাশাশুড়ীর মতোই অবস্থা, তারা নিশ্চয়ই মরণান্তিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে ভাবে, এতে কোনা সন্দেহ নেই।

যাক সে কথা সে কথার পর তিনি আর কোনো কথাই উচ্চারণ করলেন না। কিছু পরে গলায় ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ হল, আর তাঁর ইহলোকে বসবাস শেষ হল।

শংকর ঠাকুরের অদৃষ্ট

উমাশাশুড়ীর মৃত্যুতে কার কত দুঃখ হল তার বর্ণনা দিয়ে এখন দরকার নেই, এতদিনের তাঁর ইতিহাস মনে আনলে সবাই তা বুঝতে পারবে। আমার মার, ওঁর, আর গোপালঠাকুরের অত্যন্ত দুঃখ হল। আমাদের বড্ড ইচ্ছা ছিল যে তিনি যেন কয়েকদিনের জন্য বোম্বায়ে আমাদের বাড়ি আসেন আর সে ক'দিন সুখে থাকেন। কিন্তু ভগবান সে ইচ্ছা সফল হতে দিলেন না। তাঁর সরলতা, সহনশীলতা, আমাদের দুজনের আর মার প্রতি তাঁর মমতা ইত্যাদি মনে পড়ে থেকে থেকে আমাদের মন কেমন করত। গোপাল-ঠাকুরের উপর তাঁর বড্ড মায়া ছিল। আর গোপালঠাকুরও তাঁকে খুব ভক্তি করতেন। উমাশাশুড়ী নিজের ঠাকুরপোকে ভূষণ বলে মনে করতেন। আর গোপালঠাকুরও ভাবতেন যে তাঁর বৌদির যেন কোনো দিন কোনো কিছুর অভাব না হয়। তিনি যদি তাঁর চিন্তা না করেন, তাঁকে যত্ন না করেন, তাহলে তাঁর বৌদির বড়ো অবহেলা হবে, একথা তিনি কক্ষণো ভুলতে পারেননি। বড় ভাইয়ের সামনে কিছু বলা যায়না কাজেই উপায় নেই, কিন্তু শংকর ঠাকুর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যেমন আচরণ করতেন তাতে গোপালঠাকুরের মনে তাঁর সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা জন্মেছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। দিদিশাশুড়ী কিংবা ছোট মামীশাশুড়ী উমাশাশুড়ীকে বকতে আরম্ভ করলেই গোপালঠাকুর যদি তা শুনতে পেতেন তা হলে তক্ষুনি উঠে এসে মিটমাট করে ফেলতেন। এখন সে সমস্ত কথা বলা সম্ভব নয়; কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে উমাশাশুড়ীর জীবনে তিনি যদি অল্প কিছু সুখলাভ করে থাকেন তা হলে গোপালঠাকুরের জন্যেই তিনি তা পেয়েছিলেন। বাকি জীবনটা তাঁর কেবল অসহ্য জ্বালা ছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই। থাক সে কথা। দিদিশাশুড়ী অনেক কান্না কাঁদলেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা এই যে, চারদিন পর্যন্ত ছোট মামীশাশুড়ীর চোখের জল থামল না। থেকে থেকে তাঁর কান্না উপচে আসত। যিনি কখনো

ভালো করে আমার সঙ্গে কথাও বলতেন না, সেই ছোট মামীশাশুড়ী মৃত্যুর তিন দিনের দিন আমার কাছে তাঁর সরলতা, সহনশীলতা ইত্যাদির বর্ণনা করে ভেউ ভেউ করে কাঁদলেন, তাঁকে তিনি যা জ্বালাতন করেছিলেন, খোঁচা মেরে মেরে বকেছিলেন, সে সব মনে পড়ে আর সে বেচারিকে মিছিমিছি যন্ত্রণা দিয়েছিলেন ভেবে তাঁর মন হু হু করতে লাগল। তাতেই আবার কথাবার্তা হতে হতে, আমার দুঃখের আবেগে আমি যখন তাঁকে উমাশাশুড়ীর শাড়ির জন্য তাঁর বাপের বাড়ি থেকে যে টাকা এসেছিল তার সত্যি ঘটনা বলে ফেললাম, তখন তো তাঁর এত দুঃখ হল আর এত আবেগে কান্না উপচে এল যে তা বলবার জো নেই। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তাঁর এত অনুতাপ হবে। কিন্তু মৃত্যু এমন আশ্চর্য জিনিস! তার সামনে পাথরও গলে যায়! আর মানুষ যদি বুঝতে পারে যে যার মরণ হল, তাকে অত জ্বালাতন করার কোনো কারণই ছিল না; বরং সে শ্রদ্ধেয়, আদরণীয় ব্যক্তিই ছিল; তাহলে তো দুঃখের সীমাই থাকে না।

দিদিশাশুড়ীরও যে দুঃখ হল তা আর বলতে হবে না। তবু তাঁর আর শংকরঠাকরের দুঃখ একদিনের বেশী সবুর সইতে পারল না। দ্বিতীয় দিন থেকেই তাঁদের দু'জনের সামনে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল কিনা, তাই সে কাজে মনোযোগ দিতে হল! এখন তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে, কনে কী করলে শীগগির পাওয়া যায়, বৈশাখ মাসটা তো প্রায় শেষ হয়ে এল, আর মৃত্যুর পরে নিদেন চোদ্দ দিন এ কর্ম করা যায়না, কাজেই বৈশাখ মাসের শেষের দু'টি বিয়ের লগ্ন দিন পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল, তবু জ্যৈষ্ঠ মাসের সাতটি শুভদিনের প্রথম যেটি সম্ভব, সেটিকে কাজে লাগাতে হবে, এটা তো নিঃসন্দেহ। তখন এই রকম সব ব্যবস্থার চিন্তায় তাঁদের মনে উমাশাশুড়ীর জন্য শোকের স্থান আর রইল না। সে সব ব্যাপার দেখে আমাদের উভয়ের ভয়ানক রাগ হল কিন্তু উপায় কী? নিজের মনে বিরক্ত আর উত্তেজিত হওয়া ছাড়া কী করবার ক্ষমতা আমদের ছিল? পরস্পরের কাছে অনেক কথা বললাম, নিন্দা করলাম, মানুষের নির্দয়তা সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করলাম—আর চুপ করে বসলাম। শংকরঠাকুরকে মুখের উপরে বলে তাকে দু'কথা শুনিয়ে দেবেন ভেবে উনি একদিন সে কাজে একেবারে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি ওঁকে নির্বন্ধ অনুরোধ করলাম যে 'তাতে

কোনো লাভ নেই। বরং আমাদের গালাগালি খেতে হবে। আমাদেরকে ঠাট্টা করবে, আর সে সব সহ্য করে চেষ্টা করলেও তাতে কোনো ফল হবেনা। আমাদের কথায় আর আমাদের নিন্দে শুনে তিনি কি বিয়ে না করে থামবেন? এমন দুঃখের সময় খ্যাঁচাখেঁচি, ঝগড়াঝাঁটিই হবে।' আমার কথা শুনে উনি বললেন, 'তোমরা মেয়েরা এই রকমই। সব তাতে পিছপাও। নিজেও পিছিয়ে থাকবে, আর অন্যকেও পিছনে টানবে।' ওঁর এ রকম অনেক কথা সহ্য করলাম, কিন্তু সব মিটমাট করে আমি ওঁকে সে ঝঞ্ঝাটে পড়তে দিলাম না।

তখন উনি বিষম রেগে "আমি কাল বোম্বাই চললাম, আমি ওসব দেখতে চাই না," এই বলে একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। তখন আবার আমি ওঁকে শান্ত করে বললাম, "চোদ্দদিন পর্যন্ত কোথাও গিয়ে কাজ নেই।" কিন্তু ততক্ষণে আমি নিজেই ভাবলাম 'এখানে থাকা মোটেই ভালো হবে না। এদের বিয়ের শখ, সমারোহ হবে, নিন্দেন কথাটথা তো হবে, আর সে সব সহ্য না হলে না জানি কখন বিবাদ বাধবে! তাই, এখানে না থাকাই ভালো'—আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তক্ষুনি উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমিওতো তাই বলছি! আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। না, আপনি উমা মামীমার বারোতেরো দিনের ভোজ খেয়ে, আবার বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে চান?" তখন আমি বললাম, "তুমি একটা কিছু ছুতো করে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারো, আমি কি তা পারি? আমাকে থাকতেই হবে। বারোদিনের ভোজের বেলায়ও থাকতে হবে আর বিয়েতেও থাকতে হবে। কোনো যুক্তি করে যদি নিয়ে যেতে পারো তাহলে আমিও যেতে রাজি আছি। আমি কি এখানে থাকতে চাই? আমার এসব দেখে রাগ করে না? এত বয়েস হয়েছে, নাতি-নাতনি হয়েছে, এখন কোথায় ধোণ্ডু ঠাকুরপোর বিয়ে দেবেন, তা নয় নিজে বিয়ে করতে যাচ্ছেন? অত বড়ো সমান বয়সের স্ত্রী মারা গেল, চোখে এক ফোঁটা জল নেই, কিংবা মুখে দুঃখের শব্দ নেই! কোনো ভদ্রলোক এলে গেলে তার সামনে শুধু, 'হুঁঃ! তার আর আমার এ জন্মের ঋণের সম্বন্ধ ফুরোল।' এই বাক্যটি ছাড়া ওঁর মুখে একটি অক্ষর পর্যন্ত বেরোয় না! এসব দেখে কি আমার প্রাণে কিছুই দুঃখ নেই? আমারও কি ভয়ানক রাগ হয় নি? কিন্তু কী করব? যাতে নিজের কোনো উপায় নেই, তা চুপ করে দেখা ছাড়া কী করা যায়?

আমাদের বিরাগ কিংবা হটুকটানিতে তাঁর বিয়ে নিশ্চয়ই বন্ধ হচ্ছে না। পরশু দিন থেকে দু'তিনটি মেয়ে দেখা হল! আর সেই হতচ্ছাড়া গুণ্ডোপন্ত। দু'তিনবার কুষ্ঠি নিয়ে গেলেন!"

"সত্যি নাকি? আর যৌতুক-টৌতুকের কী ঠিক হচ্ছে?"

"কী জানি! যাই হোক না কেন! আমাদের তাতে কোনো দরকার নেই। আজকাল দুপুরবেলার রেওয়াজ যা আরম্ভ করেছ, তাই বেশ। খাওয়াদাওয়া হলে দাদার ওখানে গেলেই হল। তখন আর ঘরের কথা কি মনে থাকে? আচ্ছা বাবা, বাড়িতে কে কী করছে…"

"কী করছে মানে? পড়াশোনা সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের এই বিয়ের কথাবার্ত্তা শুনতে বসব? পাগলি কোথাকার! বেশ, সে কথা থাক। আমি বলি কি, তুমি আমার সঙ্গেই চলো। এরা যা খুশি স্বচ্ছন্দে করুক।"

"বললাম তো আমি এক্ষুনি যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তা বড়ো মন্দ দেখাবে। যদি কোনো যুক্তি খুঁজে পাও…"

"আমি বাপু যুক্তিটুক্তি ভেবে পাচ্ছি না। তুমিই তো সব সময় আমাকে যুক্তি খুঁজে দাও, তবে এখন একটা উপায় ভেবে ছাখো।"

"তা পারব না, তুমি যাও, আর বিয়ের যদি বিলম্ব থাকে, তা হলে আমি তোমায় লিখে জানাব। তখন যে কোনো একটা কারণ দেখিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে লিখো! আমি দাদাকে সঙ্গে নিয়ে, না হলে…"

"তবে এখুনি এলে ক্ষতি কী?

"এখুনি কেমন করে আসব? লোকে কী বলবে? আর দিদিশাশুড়ী কত রাগ করবেন। তেমনি কিছু হবে না। তুমি সে সব সইতে পারবে না, তুমি যাও।"

"বেশ আমিই যাচ্ছি। তুমি এখন বেয়ান সেজে বিয়েতে যথেষ্ট মানসম্মান…"

"ও কী কথা! তুমি যাবে তার একটা কারণ আছে। আমায় নিয়ে যাবে তার একটা কারণ বলতে পারবে?"

এই রকম নানা কথায় আমি ওঁকে বুঝিয়ে বললাম। তারপর উনি বাড়িতে "আমায় যেতেই হবে, এখানে পড়াশোনা একেবারেই হচ্ছে না ইত্যাদি বলে যাবার কথা তুললেন, তখন দিদিশাশুড়ী চোখে আঁচল দিয়ে

বললেন, "আমরা বড়ো বিপদে পড়েছি। এই বিপদটা এই সময় না এলে কি কোনো ক্ষতি ছিল? যাকৃগে, এখন উপায় কি? যা হয়েছে তা কি আর ফিরে আসবে? তার পরের ব্যবস্থা এখন দেখতেই হবে। তাই বলছি সেটুকু হয়ে গেলে যেও তোমরা……" দিদিশাশুড়ী বুঝি বারোতেরো দিনের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে বলছেন ভেবে উনি চট্ করে বললেন," "তাতো সত্যিই। কিন্তু এখন এখানে কী করব? আমরা থাকলাম আর নাই থাকলাম, তাতে মামীমার কী?"

"ওঁর আবার এখন তাতে কী? কিন্তু এই যে এখন এই অন্তটা ঠিক হচ্ছে, যদি পনেরো ষোলো দিনের দিন সেরে নিতে পারি……"

শংকরঠাকুর কাছেই বসেছিলেন, তিনি হঠাৎ বড্ড দুঃখে কষ্টে বললেন, "হুঁঃ! যেমন অদৃষ্ট তেমন করতেই হবে! ওর সঙ্গে ততটুকুই ঋণানুবন্ধন ছিল, এখন অন্য……"

তাঁর সে কথা কানে যাওয়া মাত্র ওঁর যা ভয়ানক রাগ হল তা বলবার জো নেই! আমি ভাবলাম বুঝি ভয়ানক ঝগড়া বেধে যাবে। কিন্তু তা অল্পেই শেষ হল! রাগে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে উনি সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। পরে গোপালঠাকুরকে বলে অনুমতি নিলেন। গোপালঠাকুর ওঁর কথার সব মর্ম অবশ্যই বুঝতে পারলেন। তবু প্রথমে সংক্ষেপে বললেন, "ছাখো যদি বারোতেরো দিনের অনুষ্ঠানের সময় থাকতে পারো—"কিন্তু তক্ষুনি আবার, "কিন্তু যাও, এখানে থেকেই বা কী করবে?" এই বলে যেতে অনুমতি দিলেন। তখন রাত্তিরে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আর, "চিঠি দেবো, অমনি কোনো একটা যুক্তি করে চলে এসো," ইত্যাদি বারবার বুঝিয়ে বলে উনি বোম্বাই চলে গেলেন।

শংকর ঠাকুরের বিয়ে

এগারো দিন হল। তার পরের দু'দিন শ্রাদ্ধ শান্তিতে কেটে গেল। খোণ্ডঠাকরপোর খুব দুঃখ হল, একথা অবশ্য বলবার দরকার নেই। তাতেও আবার যখন শুনলেন যে তার সৎমা আসবে তখন থেকে তো তাঁর মাথা ভয়ানক গরম হয়ে ছিল। বঠ্ঠাকুরঝি ভাবলেন যে তিনি বোধহয় তাঁর মার গয়নাগাঁটি মোটেই পাবেন না, তাই বোধ হয় তিনি রেগে ফোঁস্ ফোঁস্ করছিলেন। তিনি বড় আশা করেছিলেন যে মার গয়নাগাঁটিগুলো তিনিই পাবেন। এ কথা লিখতে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সত্যি কথা না লিখে আর থাকতেও পারছি না। দেখতে পেলাম যে তিনি কক্ষনো ভাবেননি যে নিজের মা'র গয়নাগাঁটির অন্য কেউ মালিক আসবে। কিন্তু যেই তিনি হঠাৎ তা বুঝতে পারলেন তখনি যা ফোঁস্ ফোঁস্ হন হন করে গর্জন করতে লাগলেন তার বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। আমরা আপন মনে দুঃখ করছিলাম। তার উপরে আমার বোম্বায়ের বন্ধুদের কথা মনে পড়ল, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে যা আনন্দ লাভ করতাম তা মনে পড়ল। আর কী জানি কেন, সেই রামকৃষ্ণের কথা আর তার স্ত্রীর অবস্থা চোখের সামনে এল। ভাবতে লাগলাম যে পুরুষ মারা গেলে তার পর স্ত্রীর কী রকম অবস্থা হয়, আর স্ত্রী মারা গেলে পুরুষের অবস্থা কেমন হয়। আর দু'টোরই উদাহরণ যখন চোখের সামনে দেখতে লাগলাম, তখন মনটা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিষাদে, ক্ষোভে আমার মনটা ছেয়ে গেল। আর ভয়ানক অশান্তি বোধ করতে লাগলাম। ভাবলাম, হে ভগবান—এই কি আমাদের অবস্থা।

তেরোদিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় মেয়ে দেখার কাজ জোরে আরম্ভ হল। এক পুরুতঠাকুরের মেয়ে পছন্দ হল। বারো বছর পেরিয়ে মেয়েটি তেরোয় পা দিয়েছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার তেরো দিনের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের জিনিসপত্রের সঙ্গে আরো কিছু কিছু যোগ দিয়ে ঠিক ষোলো

দিনের দিন শংকরঠাকুর আমাদের দ্বিতীয় উমাশাশুড়ীকে ঘরে আনলেন। এখন আমি যদি সে বিয়ের বর্ণনা দিই, তা হলে কত লোকে আমাকে কত রকম দোষ দেবে। কিন্তু আমি এখানে একথা স্পষ্ট না বলে থাকতে পারছি না যে প্রথম পক্ষের বিয়ের সব সুখ শখ শংকরঠাকুর এই বিয়েতে উপভোগ করতে কম করলেন না। ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে তো গেলেনই, বিড়িকাটাকাটি করলেন, এক সঙ্গে স্নান করবার অনুষ্ঠানও হল। ভদ্রলোকটি সুপুরি লুকিয়ে খেলা করতে পর্যন্ত পিছপাও হলেন না; আর কী চাই? ভোজের বেলা মুখে গরাস দেওয়া নেওয়া এসবের তো কোনো অর্থ নেই, তা সে সব তো হলই। আমি অবাক হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছিলাম, আর কী করব? তাতে আবার এই মজা যে, প্রত্যেকবার তাঁর এই সুখসমারোহ যারা দেখছে, তাদের দিকে চেয়ে তিনি হেসে বললেন, "ওহে, আমার কী, সব শখ তো আগে হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের তো এসব প্রথম বারই? এ্যাঁ?" এই বলে তিনি নিজেই 'হোঃ হোঃ করে হেসে সকলের দিকে চেয়ে দেখতেন, যেন কত গভীর রসিকতা করেছেন ভেবেই তিনি হাসতেন। তাঁর সে সব সুখসমারোহ চলত, কিন্তু আমার তা বিষের মতো মনে হত। আর আমি বিষণ্ণমনে কাজ করে যেতাম। এই জঞ্জাল থেকে সরে পড়ার জন্য আমি বড্ড উতলা হয়েছিলাম।

বিয়ে হল। এবার বাপের বাড়ি যেতে পারলে বাঁচব ভেবে মনটা ভারি ছটফট করছিল। যাবার সময় উনি বুঝি দাদাকে বলে গিয়েছিলেন যে এবাড়ির সব গণ্ডগোল শেষ হলে সে যেন আমাকে নিয়ে যায়। সেই মতো দাদা চোদ্দদিনের দিন সকালেই আমাকে নিতে এসেছিল। কিন্তু দিদিশাশুড়ী তাকে স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'এখন এই নতুন বিয়ের ধর্মকর্ম শেষ না হলে তাকে পাঠাব না।' কাজেই কী উপায়! আমারও যাওয়া অনুচিত মনে হল। আমার নিজের পছন্দ নেই সে কথা সত্যি, কিন্তু তাতে কী? যেখানে নিজের পছন্দ-অপছন্দমতো কাজ হয় সেখানে তার চিন্তা মানায়! যেখানে নিজের পছন্দ হোক আর অপছন্দ হোক, যা হবার তা হবেই, সেখানে খামোকা নিজের মনে জ্বলে পুড়ে লাভ কী? প্রথম থেকে আমার এই চিন্তাধারা ছিল, তাই আমি মুখ বুঁজে রইলাম। কিন্তু আমি দাদাকে বলেছিলাম যে 'বিয়ে হয়েছে শুনতে পাওয়ামাত্র তুমি আমাকে নিতে এসো।' সেইমতো তার আসবার কথা। কিন্তু সে দু'দিন এলই

না। আমি বড্ড অস্থির হয়েছিলাম। নিজে থেকে 'যাব ?' বলে জিজ্ঞাসা করতেও পারছিলাম না। কিন্তু তিন দিনের দিন দাদা এল, দিদিশাশুড়ীও যেতে অনুমতি দিলেন, আর আমি দাদার সঙ্গে বাপের বাড়ি গিয়ে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেখানে গেলে দাদাসাহেব শংকরঠাকুরের উদ্দেশে আমাকে যা ঠাট্টা করলেন তা বলবার জো নেই। আমার নাম রাখলেন 'বেয়ানদি'। বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'কচি খোকা শংকরের বিয়ে হল ?' তাঁকে স্বচ্ছন্দে গালি দিল। 'নিজের ছেলের বিয়ের বয়স হল, আর গেরস্ত নিজে বিয়ে করছে·········'আমি তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরে বললাম, 'থাক না দাদা, তাতে তোমার কী ? যার যা খুশি করুক না কেন ?' কেননা, ঠিক সেই সময় যাঁরা নিচের, তাঁরা উপরের ঘরে গেলেন। তারপরে সে বিষয়েই আমাদের কথাবার্তা হল। কত রসিকতা করলাম। শংকর-ঠাকুরের যত অসৎ কর্ম সে জানত, সে সব প্রকাশ করে সে ভীষণ ঠাট্টা শুরু করল। তাঁর সেই গোমুখীতে হাত গুঁজে বসা, কপালে ভস্মের রেখা, আর ধর্মের মিথ্যা গৌরব, এর উপরে তো তার ভয়ানক ঘৃণা ছিল। তাতে আবার আমি যখন বিয়েতে তাঁর সে রকম রসিকতা চলছিল বিড়ি-কাটাকাটি, গায়ে কুলকুচো ফেলা, ইত্যাদি ঘটনা সব বললাম, তখন তো তার রাগের আর রাগের ঝোঁকে বকুনির সীমাই রইল না। আমার যে তার সেই গালিবর্ষণ ভালো লাগছিল না, বা শুনতে ভালো লাগছিল না, তা নয়। বরং আমার তো মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে নতুন কথা বলে আমি তার রাগ উত্তেজিতই করছিলাম। তবুও বেশী বাড়াবাড়ি হলে মাঝে মাঝে বলতাম, 'যাক্ গে, তাতে কী ? যার কর্ম তারই সাজে। তিনি কি তোমাদের বলতে এসেছিলেন যে অমুক কোরো, আর অমুখ কোরো না ? তবে মিছিমিছি তাঁকে গালি দেবার দরকার কী ? তাঁর নিজের মনে ধর্মের অহমিকা আছে, সেই মতো তিনি বিয়ে করলেন। তিনি কখনো সংস্কারের বড়াই করেন নি, কিছু না—'

'ও রকম ধর্মের মিথ্যে ভণ্ডামির জন্যই তো এরকম লোকেদের মুক্তি······'

'মিথ্যে ভণ্ডামি কিসের ?' সত্যিই তো তিনি যা পুরানো তা ভালো-বাসেন। বাসেন না কীসে ?' এই কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুতে না বেরুতেই দাদা যা রেগে আগুন হল! হঠাৎ আমাকে বলল, 'যমু, তুমি

এখন আমায় চটিও না বলছি। ও ব্যাটা বিনা খরচায় পেলে যত ইচ্ছে মদ খায়, যত ইচ্ছে রক্ষিতা………"

দাদার ক্ষুদ্ধ মুখ দিয়ে কোন বাক্যটি বেরুবে তা আমি তক্ষুনি বুঝতে পেরে, সেভাবে কিছু বলবার আগেই, 'আমার মাথা খাও, তুমি চুপ করো দাদা। আমি ভুল করেছি, তোমায় ও সব কথা বলেছি, তাহলে তো হল ?' এই বলে আমি তার মুখের কথা সেইখানেই থামালাম।

তার পরে সাত আট দিন যেতে না যেতেই আমি ওঁর একটা চিঠি পেলাম। তাতে উনি লিখেছিলেন, "গোপালঠাকুরকে একখানা চিঠি পাঠালাম যে 'সম্প্রতি আমার খাওয়াদাওয়ার কষ্ট হচ্ছে, পড়া অভ্যাসের দিনে এরকম খাটুনিতে সময় কাটালে চলবে কেন ? মিছিমিছি ঘরভাড়া ঘাড়ে পড়ে কাজেই মাকে পাঠিয়ে দেবেন।' তিনি মর্ম বুঝে তোমাকেও অবশ্য পাঠিয়ে দেবেন।" সে চিঠিটার তাৎপর্য বুঝে শ্বশুরবাড়ি যেতে দেখলাম সে বিষয়েই আলোচনা চলছিল। শেষে ঠিক হল যে তারপর তৃতীয় দিনে আমরা যাব। তাই আমি দুর্গার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আর ঠাকুরমার কাছে বিদায় নিতে এসে আর একদিন বাপের বাড়ী রইলাম। দুর্গার সঙ্গে দেখা করলাম, ঠাকুমার সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হবার তা হল, দাদাকে বারবার চিঠি লিখব বলে আশ্বাস দিয়ে আর তার কাছে বিদায় নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এলাম। রীতিমাফিক দাদা আমাকে রওনা করে দিতে ষ্টেশনে এসেছিল। উনি লিখেছিলেন যে আমাদের দুপুরের গাড়িতে উঠিয়ে দিলে উনি সেখানে আমাদের নিতে আসবেন। সেই মতো সব ব্যবস্থা হল। আর শেষে আমরা পুণা ছেড়ে চললাম। আসবার সময়ে যে-আনন্দে এসেছিলাম এখন তার চেয়ে কত বিপরীত অবস্থায়………

ধোণ্ডুঠাকুরপোর চিঠি

বোম্বাই এসে সুস্থিরভাবে আবার কাজকর্ম শুরু হল। প্রথম কিছুদিন অবশ্যই পুণার গল্প হল আর তাই নিয়ে রসিকতা, হাসি-তামাশা হল। সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলবার মতো নেই।

এই রকমে আন্দাজ একমাস কেটে গেল। একদিন হঠাৎ ধোণ্ডু-ঠাকুরপো আমাদের বাড়ি এলেন। আগে একবার তিনি পালিয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁর খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির সব ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। এখন তাঁর স্বভাবের একটু পরিবর্তন হয়েছিল। তার উপর একবার আমাদের প্রতিবেশিনী দু'জন তাঁকে দু'কথা শুনিয়ে বুঝিয়ে বলেছিলেন, আর বিষ্ণুপন্ত নানা সাহেবও তাঁকে দু'কথা বুঝিয়ে বলেছিলেন। তখন থেকে তিনি পড়া-শোনায় একটু মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি যে খুব বুদ্ধিমান হবেন এমন কোনো আশা ছিল না, কিন্তু আগের চেয়ে আর পুণায় যেমনটি ছিলেন তার চেয়ে তাঁর উন্নতি হচ্ছিল। সঙ্গী আর চোখের সামনের দৃষ্টান্তে মানুষের মনের গঠনের কত পরিবর্তন হয় ধোণ্ডুঠাকুরপো তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক বছর সওয়া বছর আগে বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে তিনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, তখন থেকে তাঁর সাধারণ স্বভাবের স্পষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তিনি পুণায় গিয়ে তাঁর বাবার আবার বিয়ে হবার পর যখন ফিরে এলেন তখন দেখতে পেলাম যে তাঁর স্বভাবের চমৎকার পরিবর্তন হয়েছে। বাবার নাম করলে তিনি তক্ষুনি কপাল কুঁচকে তাঁর নিন্দা করতেন। আশ্চর্য এই যে তিনি এখন নিজের মা'র সম্বন্ধে অত্যন্ত ভক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। যে মাকে তিনি চূড়ান্ত অপমান করেছিলেন সেই মায়ের উদ্দেশে এখন তিনি কতবার কাঁদলেন। সেই মাকে নিজের বাবা অকারণে জ্বালাতন করে হয়রান করেছিলেন আর এখন আবার দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছিলেন, তাই ঠাকুরপোর অত্যন্ত রাগ হয়ে গা জ্বালা করত। মায়ের কথা আর সেই সঙ্গে বাবার দ্বিতীয় বারের বিয়ের কথা আরম্ভ হলে

তিনি একেবারে রেগে লাল হতেন আর যেমন খুশি বকতে আরম্ভ করতেন। আমরা সে কথা হেসেই উড়িয়ে দিতাম। তা ছাড়া আর কী করব?

একদিন তিনি যশোদাবাইর পাশে বসে নিজের আর নিজের মায়ের সব কথা বললেন, আর এখন বাবা দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছেন বলে বিষম রেগে বললেন, "একবার আমার তাঁর সঙ্গে দেখা হোক, আমি তাঁকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেব।" কখনো বলতেন, "আমি তাঁকে খুব অপদস্থ করে লজ্জা দেব।" আমি তাঁকে ও রকম কথা বলতে কখনো উৎসাহ দিতাম না, তাঁর কথার প্রতিবাদ করতাম। আমি যাই করি না কেন, তার রাগ কম হত না। কোনো কোনো মানুষের স্বভাব এমন যে তারা যে দিকে ঝুঁকবে সেদিকের একেবারে পরাকাষ্ঠা করে ছাড়বে। যতই বিপদ হোক কিংবা আর কিছু হোক, এমন লোকরা তখন তাদের ধরা গোঁ ছাড়তে চায় না। আমি ঠিক বুঝলাম যে ধোণ্ডুঠাকুরপো সেই রকমের লোক। মাকে এতদিন তিনি এত জ্বালাতন করেছিলেন, সেই মায়ের সম্বন্ধে তাঁর মনে এখন অসীম শ্রদ্ধা উৎপন্ন হল। আমাদের দু'জনের সম্বন্ধে তাঁর মত প্রথম দিকে খুব খারাপ ছিল, কিন্তু এখন তাঁর মত এত ভালো হল যে তিনি আমাদের প্রশংসা করতে লাগলেন। আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে তাঁর ইচ্ছা করত না।

একটু আগে আমি বলেছি যে পুণা থেকে ফেরা অবধি তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন বড়ো চমৎকাররূপে দেখা যাচ্ছিল। পোনর দিন কাটতে তো সে পরিবর্তন আমরা এত বিলক্ষণ অনুভব করলাম যে ভয়ে আমাদের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। সে ব্যাপারটা কী তা বললে অনেকের হয়তো হাসি পাবে। বোম্বাই আসার পর পোনর দিন পর্যন্ত বাবার বিয়ের জন্য রাগ আর মায়ের মৃত্যুর জন্য শোক তো চলেছিল। তারি মধ্যে একদিন কী জানি কোথায় কাদের বাড়ি বসে, ধোণ্ডুঠাকুরপো শংকরঠাকুরকে একখানি বেশ লম্বা চওড়া আর যাচ্ছেতাই চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন। ঠাকুরপো যে ও রকম একটা কিছু করবেন তা আমি তখন ভাবিনি। কিন্তু খামখেয়ালী মানুষের অদ্ভুত স্বভাব যে-রূপ নিয়েই বজায় থাকুক না কেন, সেটা অদ্ভুতই। তাতে ভালো কিছু পাওয়াই মুশকিল। এই ন্যায়মতো ঠাকুরপো সে কাজটা করেছিলেন। চিঠিতে বাবার ধর্মের ভণ্ডামি, কু-অভ্যাস, হিংসুটে স্বভাব ইত্যাদির সম্বন্ধে আর মাকে জ্বালাতন করে করে শেষে মেরে ফেললেন ইত্যাদি যা খুশি লিখেছিলেন, দ্বিতীয়পক্ষের বিয়ের জন্যতো তাঁকে যা ভর্ৎসনা

করেছিলেন তা বলবার জো নেই। আর শেষে আমাদের দু'জনের খংসার পরাকাষ্ঠা করেছিলেন। "আপনার কোনোই যোগ্যতা নেই, 'সংস্কারক', 'সংস্কারক' বলে মিছিমিছি হয়রান করেন।" মা গো মা! সে কি এক কথা? যা যা মনে এল তা সব একটুও ভেবেচিন্তে না দেখে, যেমন খুশি লিখে ফেলে দু'চার তা কাগজ ভর্তি করলেন, আর দিলেন বাবার নামে পাঠিয়ে। আমরা তার গন্ধ পর্যন্ত পাইনি। না হলে সেটা তক্ষুনি নিশ্চয়ই ছিঁড়ে ফেলতাম।

চিঠিটা সেখানে গেল, আর যা আগুন জ্বলে উঠল তার সীমা নেই! তার পরের দিন আমরা একটা লম্বা চিঠি পেলাম। তাতে আমাদের সকলের নিন্দে—গালমন্দ বললেও ক্ষতি নেই—করেছিলেন! শংকরঠাকুরের ও রকম লেখা পড়ে এখন আমার মন বেশ শক্ত হয়েছিল তবুও সেই চিঠিটা পড়ে আমার মন বড্ড অস্থির হল, আর চোখের জল অনেকক্ষণ থামল না। আমাকে, ওঁকে, বিষ্ণুপন্তকে, নানা সাহেবকে আর তাদের স্ত্রীদের এমন গালি দিয়েছিলেন যে তা বলবার জো নেই। মোটামুটি 'সংস্কারক' বলে যাচ্ছেতাই লিখেছিলেন। আমাদের তো পরোক্ষে 'দেহবিক্রয়কারিণী' 'বেশ্যা' ইত্যাদি নাম দিলেনই, কিন্তু ওঁদের সকলকে কত যে বিচ্ছিরি নাম দিলেন সে সব মনে পড়লে আমার এখনো রোমাঞ্চ হচ্ছে। তাঁর খোকাকে নাকি আমরাই ভুলিয়েছিলাম, চিঠি আমরাই মুসাবিদা করে ঠাকুরপোর হাতে লিখিয়ে নিয়েছিলাম। নিজের বাবাকে ওরকম চিঠি লিখবে এমন আক্কেল তার নেই। অত সব ও ভাবতেই পারে না, শত হলেও সে তাঁর নিজের ছেলে! আমাদের শিক্ষায় বিগড়েছে! তাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে আমরা তাঁর বুক পোড়াবার মতলব এঁটেছি। এই রকম গুরু অভিযোগ করে, তারপরে প্রত্যক্ষ আমাদের নাম না লিখে, সাধারণ সংস্কারক এই কথার আড়ালে এত কিছু (কী বিশেষণ দিলে তার যথার্থ বর্ণনা হলে তা আমি ভেবে পাচ্ছি না) যাচ্ছেতাই—সভ্য মানুষের অন্তত অনুপযুক্ত—যা সব কথা সে চিঠিতে লিখেছিলেন তা পড়ে তিন চারদিন আমার পড়াশোনা কিচ্ছু ভালো লাগল না।

আমার অবস্থা কী রকম হল তা লিখেছি। সে চিঠিখানা এখন আমার পাশে পড়ে আছে। কিন্তু তা আমার জীবনকাহিনীতে উদ্ধৃত করবার যোগ্য নয় তাই এখানে উদ্ধৃত করছিনা। ধোণ্ডুঠাকুরপোকে ডেকে তিনি কী কী লিখেছিলেন যখন জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি সব কথা বললেন। শুধু

তাই নয়, তিনি পেন্সিলে লেখা সে চিঠির একটা নকলই আমাদের দেখালেন। সেটা পড়ে উনি তাঁকে খুব বকলেন, কিন্তু ধোণ্ডুঠাকুরপো তা 'হেঁঃ হেঁঃ' করে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। এর চেয়ে বেশী আবার তাঁকে কী বলা যায়? কিন্তু দু' তিন দিন পরে শংকরঠাকুরকে একটা ছোট চিঠি লিখে উনি তাঁকে জানালেন যে "সে-চিঠি লেখার ব্যাপারে আমাদের হাত ছিল না। শুধু তাই নয়, আপনার চিঠি যখন পেলাম তখন পর্যন্ত ওরকম চিঠি যে ধোণ্ডু আপনাকে লিখেছে এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সাক্ষাৎ বাবাকে ছেলের হাতে ও রকম চিঠি লেখানো, এরকম নীচ কাজ করবার প্রবৃত্তি এখনো আমার হয় নি, আর এর পরেও কখনো হবে এমন আমার মনে হচ্ছে না। আশা করি, এ কথা আপনি বিশ্বাস করবেন, তবে সত্যি যা হবে তা ভগবানই জানেন।"

এই চিঠি যাওয়ামাত্র তাঁর একটা চিঠি এল। তাতে স্পষ্ট যদিও ওঁকে মিথ্যেবাদী বলেননি, তবু, "আপনার হাত এচিঠিতে নেই এ কথা অসংগত, অসম্ভব! আপনি, না হলে আপনার-আশেপাশের পণ্ডিতমূর্খ সংস্কারকদের আছেই—" ইত্যাদি কথা লিখেছিলেন। তখন ওঁর ভয়ানক রাগ হল। তবু, "আপনি যাই মনে করুন, বিশ্বাস করুন কিংবা অবিশ্বাস করুন, আমাদের কারো সে চিঠির সঙ্গে কোনো রূপে সম্বন্ধ নেই, পুনরায় এবিষয়ে লিখবার আমার ইচ্ছা নেই," এ রকম স্পষ্ট উত্তর লিখে উনি ধোণ্ডুঠাকুর-পোকে খুব বকুনি দিলেন।

এই হঠাৎ একটা গণ্ডগোল হয়ে আর এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের দুজনের মন একেবারে বিষণ্ণ হয়েছিল। একেই তো শংকরঠাকুর আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে ছাড়তেন না, আর তার উপর এই গণ্ডগোল হল! ধোণ্ডুঠাকুরপোকে কিছু বলতে গেলে মশাই আবার উঠে কোথাও চলে যেতেন। এত গোলমালের পর অবশ্যই তাঁর আর পুণায় যাবার সুবিধা রইল না। বাবা ঘরের দরজায়ও আসতে দিতেন না। তখন উপায় কী? তাই আমরা কিছু বকলে-টকলে মশাই আগের মতোই ঘুরে বেড়াতেন, তাই শান্ত ভাবে যতটা সম্ভব তাঁকে আমরা বুঝিয়ে বললাম। তাঁর বাবার কী চিঠি এসেছিল তা আমরা তাঁকে দেখতেও দিই নি, ভালো করে বুঝবেও না সুঝবেও না, এমন মানুষের মন শান্ত রাখা বাতাসের পোঁটলা বাঁধার মতোই ব্যাপার! কিন্তু সে কাজই আমাদের ভাগ্যে এসেছিল!

এই রকমে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। আমি সে চিঠিটা কাউকে দেখাইনি, শুধু তাই নয়, তাতে কী লেখা ছিল তা পর্যন্ত যতদূর সম্ভব যশোদাবাই, লক্ষীবাইকে জানতে দিইনি। কিন্তু এরকম ব্যাপার কি ঢেকে রাখা যায়?

একেবারে অসহ্য হলে কারু কাছে মনের ভাবনা খুলে বলে মন হালকা না করে থাকতে পারা যায় না। মন নিরুদ্বেগ করতে ইচ্ছা করে। এই রীতি অনুসারে আমি দাদাকে একটা বিস্তৃত চিঠি লিখলাম। তাতে কিন্তু আমি আমার মনের কথা খুলে লিখেছিলাম। আর আমার চিঠির সঙ্গে শংকরঠাকুরের আর ঠাকুরপোর চিঠি, দু'টো চিঠিই তাকে দেখাবার জন্য পাঠিয়েছিলাম।

আন্দাজ একমাস কেটে যাবার পর দাদার একটা চিঠি এল,—'আমি এখন কী করব তাই ভাবছি। কোন জেলায় সনদ নিলে লাভ হবে তার খবর জোগাড় করছি। আমার পুণায় থাকতেই বড় ইচ্ছে করে, কিন্তু পুণায় থাকলে বাড়িতে সকলের মিল হওয়া মুশকিল। এক গ্রামে থেকে আলাদা বাড়িতে থাকা অসংগত, নিদেন দেখতে অত্যন্ত মন্দ দেখাবে, আর তেমন করা ভালোও নয়। যদি আলাদা ঘর না করি, তা হলে বাড়ির ঝঞ্ঝাট সইতে পারিনা, মনের মতো আচরণ করতে পারিনা! তাই আমি হতভম্ব হয়েছি। শুধু আদালতে গিয়ে মোকদ্দমার কাজ দেখি। একেবারে সন্ধ্যা হয়ে এলে বাড়িতে খেতে আসি, আর খাওয়া হলে নিজের ঘরে এসে বসি। বাবা এখনো আমাকে আমি এর পরে কী করব তা জিজ্ঞেস করেননি। আমিও নিজে থেকে তাঁকে কী করব ইত্যাদি জিজ্ঞেস করিনি। অনেক জায়গায় চিঠি পাঠিয়ে কোন জেলার কী অবস্থা তার খোঁজ নিচ্ছি। যেখানে ভালো মনে হবে সেখানে যাব। না হলে আবার পুণা তো আছেই। আমার দিকটা যাই হোক আপনার কাজ আমার পছন্দ হয়। আমি বলি, আপনার পরীক্ষাটা হলে আপনিও পুণায় এসেই ওকালতি করুন! আপনি এখানে এলে আমার কোনো ভাবনা থাকবে না। আমার ঘরদুয়োর সব আপনার বাড়িতেই হবে। তখন এখানে বাড়িতে যাই হোক না কেন! যমু, তোমার কী মত?' দাদার চিঠির সারাংশ এই ছিল। এই বিষয়েই যদিও অনেকদিন আলোচনা করেছিলাম, তবু আবার সেই বিচারই করে দেখতে লাগলাম। আমার অবশ্য এই ইচ্ছা ছিল যে দাদা আর আমরা

যেন একই শহরে এক বাড়িতেই থাকি। পুণা আমাদের দুজনেরই পছন্দ ছিল, কিন্তু পুণায় স্বাধীনভাবে থাকা দুজনের পক্ষেই অসম্ভব ছিল। তাই ওঁর একেবারে বোম্বায়ের উচ্চ আদালতের সনদ নেবার ইচ্ছা ছিল। মোটামুটি অবস্থা এই রকম ছিল। ওঁর এখনো পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার কথা মানে হাট বসবার আগেই কোমর বাঁধার অবস্থা! আমার মনে হচ্ছে যে মানুষ পরস্পরের মনের বিচার স্পষ্ট দেখতে পায়না। তেমন কোনো ব্যবস্থা যদি থাকত, তাহলে আমার মনের ছবি দেখে আমার বন্ধুরা গল্প করবার সময় নিশ্চয়ই হাসি-তামাশা করত। কেননা, ভাবীকালের সম্বন্ধে আমি যে বিচার করছিলাম আর আমার মনে কত রকম যে আশা জাগছিল তার সীমা নেই। বোম্বাই আসবার আগেকার আমার মনোরাজ্য তার তুলনায় কিছুই নয়। কেননা, তখন আমার সেরকম সুখের কল্পনাই ছিল না। আজ সে সুখের বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাই তার পরপারের কল্পনা করে মনোরাজ্য নির্মাণ করছিলাম। সে রাজত্ব যে নিশ্চয়ই অদ্বিতীয় ছিল তা বলবার দরকার নেই। সেই রাজপ্রাসাদে তলার উপরে তলা গড়ে উঠছিল!

দাদার চিঠির উত্তর তক্ষুনি দিলাম। তাতে অবশ্যই লিখলাম, 'আমাদের পরীক্ষার ফল বেরোবার আগে তুমি বেশী ব্যস্ত হয়োনা। কিন্তু শুধু শুধু সময় কাটাবার চেয়ে পুণার সনদ নিয়ে কাজ আরম্ভ হোক্।'

আর একটি মাস কেটে গেল। পরীক্ষার শুধু দু' মাস বাকী রইল। উনি খুব বেশী খেটে পরীক্ষার পড়া অভ্যাস করছিলেন। মাঝ রাত পর্য্যন্ত জেগে পড়াশোনা আরম্ভ হল, আমি আমার ক্ষমতামতো যত্ন করতাম। এমন সময়ে দাদার হাতের একখানি চমৎকার চিঠি পেলাম।

দাদার অদ্ভুত চিঠি

অনেক আশীর্ব্বাদ বিশেষ। তুমি যাওয়া অবধি এখানে কত যে গণ্ডগোল আর তোলপাড় হয়েছে তার সীমা নেই। এখন বোধহয় অল্পদিনেই আমাকে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতে হবে। মাঈসাহেবের সঙ্গে এখন নিশ্চিতমতো অমিল হয়েছে তার কারণ এই :—দু'দিন আগে আমি রোজকার মতো আদালতে গেলাম, কিন্তু সেখানে বেশী কিছু কাজ নেই দেখে, বাড়িতে যা লেখার কাজটা ছিল সেটা শেষ করবার জন্য সকাল সকাল বাড়ি ফিরে এলাম। আমার মনে হচ্ছে যে আমি এসেছি তা মাঈসাহেব মোটেই জানতেন না। আমি সোজা পিছনের ঘরে গিয়ে বসলাম। দরজা বন্ধ করে রেখেছিলাম। হঠাৎ মনে হল যে অপর দিকের ঘরে কে যেন কথা বলছে তাই কান পেতে শুনলাম। তখন এই সংলাপ শুন্‌তে পেলাম :—

'আমি ওসব শুনতে চাইনে। আমার জিনিস ভালোয় ভালোয় আমাকে এনে দাও।'

'ও মা! বলছি তো যে, জিনিস এখন নেই।—তবে দেব কোথা থেকে? কাছে থাকলে কি এক মুহূর্ত্তও আমার কাছে রাখতাম? দেবঋষি[1] মশাই বলেছেন......' তার পরের কথা শুনতে পেলাম না। আস্তে আস্তে, ফিস্ ফিস্ করে কথোপকথন হল। আবার উঁচু গলায় কথা হতে লাগল, তখন শুনতে পেলাম। শেষে একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাব এমন উঁচু গলায় কথাবার্তা চলতে লাগল।

'ওগো, আমার বাচ্চাটাচ্চা কিচ্ছু চাইনে। আমার গয়না......কোথা থেকে মার এমন কুবুদ্ধি......'

'আ মরণ! সে কী কথা? যশোদা, তোমার কথার কি কোনো মাথা

১ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা—মারাঠিতে চলতি কথায় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাকে 'দেবঋষি' বলার প্রথা আছে।

মুণ্ডু আছে ? তোমার মা তোমার ভালোর জন্যই তো করল। তুমিই তো বাচ্চার জন্য......?'

'ও সব আমি জানিনা। তুই অলক্ষী আমার গয়না......'তার পর ঝগড়া আরম্ভ হয়ে বোধ হয় অনেক কথা কাটাকাটি হল। শেষে কান্না আর ফোঁপানির আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন ভাবলাম যে বাইরে গিয়ে কী গণ্ডগোল তা দেখি, আর আমার দুয়োর খুলতে ইচ্ছে করল। যমুদিদিমণি, তুমি হয়তো আড়ালে কান পেতে কথা শুনছি বলে আমাকে দোষ দেবে, এরকমে লুকিয়ে চুপিচুপি কারু কথাবার্তা শোনা উচিত নয়, একথা সত্যি। কিন্তু 'ভালোয় ভালোয় আমার জিনিস এনে দাও' এ কথা শোনামাত্র গয়নার কথা মনে পড়ে আমি ভালো মন্দ সব ভুলে গেলাম। অনেক দিন ধরে আমি ভাবছিলাম যে সে গয়নার বিষয়ে একটা কিছু গূঢ় রহস্য আছে। এই বেলা কিছু শুনতে পেলে সেটা পরিষ্কার হবে, তখন এমন সুযোগ ফসকে না দেওয়াই উচিত ভেবে আমি আর কিছু বিবেচনা করে দেখিনি, কিংবা দেখবার অবসরই পাইনি বললেও চলবে। 'গয়না' এই শব্দটা মনে আসামাত্র আমি সব কিছু ভুলেই গেলাম। সেজন্য তুমি আমাকে যা দোষ দেবে তা মাথা পেতে নিতে রাজি আছি।

'মাঈসাহেবের গলা আমি সহজেই চিনতে পারলাম আর তিনি যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন সে যে কে তাও আমি তক্ষুনি অনুমান করলাম। কেননা, সে স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে তুমি আর আমি অনেকবার কথা বলেছি। আর আমি তো তাকে অনেকবার দেখেছি। তা ছাড়া, প্রথম থেকে আমার ধারণা ছিল যে বাড়ির গয়নার সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটির নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে, আর শেষে দেখতে পেলাম যে আমার অনুমানই সত্যি। তুমি যে স্ত্রীলোকটিকে প্রথমে দেখেই তার কথা আমাকে বলেছিলে, এ সেই স্ত্রীলোক। জানিনা, তোমার মনে আছে কিনা, কিন্তু সেদিন তুমি তাদের যে কথোপকথন শুনতে পেয়েছিলে তাতে 'সেই ভদ্রলোক' 'সে ভদ্রলোককে' এরকম কথা শুনতে পেয়েছিলে। আমার মনে হচ্ছে যে 'সেই ভদ্রলোক' মানে আমি সংলাপে যে 'দেবঋষির' নাম শুনেছি, তিনিই। কী রহস্য তা এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু বেশীর ভাগ পরিষ্কার হয়ে গেছে। থাক্ সে কথা।

'কিন্তু তোমাকে যা বলতে চাই তা এর পরের কথা। দরজা খুলে

দেখতে ইচ্ছে হওয়ায় আমি যখন দরজার কাছে গেলাম, তখন কোঁপানি, কান্না আর মাঝে মাঝে, 'মাগো মা, কোথা থেকে এই লক্ষীছাড়ীর সঙ্গে আমার ভাব পাতাবার কুবুদ্ধি হল!' এ রকম, আর 'ঢের হয়েছে, ফের যদি লক্ষীছাড়ী টক্কিছাড়ী বলবি তো খবরদার। লজ্জা করে না?' এরকম দুই গলার কথা কানে এল। সে কথা শোনামাত্র আমার মাথা গরম হল, কিন্তু মনের রাগ তেমনি চেপে রেখে চুপ করে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম আরও কিছু শুনতে পেলে বেশ হবে, আর আমি দরজার পাশের দেওয়ালের খুটির উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ—কি আশ্চর্য। খুঁটিতে ঝোলানো আমার ছাতার দড়ি ছিঁড়ে ছাতাটা ধপ করে মেজেয় পড়ল। ছাতাটা দরজার উপরের দিক থেকে বাঁকা হয়ে নেমে এল কিনা, তাই খুব জোরে আওয়াজ হল।

মাঈসাহেবের কান্না একদম বন্ধ হল! আর তিনি সেখান থেকে চেঁচালেন 'কে?' তিনি কী ভাবলেন ভগবান জানেন! নিশ্চয়ই তাঁর বুক কেঁপে উঠেছিল। প্রথমে অবশ্যই তিনি আশঙ্কাও করেন নি যে আমি ঘরের ভিতরে থাকতে পারি। কিন্তু তাদের সব কথা শেষ হবার পর হঠাৎ যখন তিনি জানতে পেলেন যে ঘরের ভিতরে কেউ আছে, তখন তাঁর মনের অবস্থা কী রকম হয়ে থাকবে? একবার চেঁচিয়ে উত্তর পেলেন না, তখন তিনি আবার বড়ো কর্কশ ভাবে চেঁচালেন, 'বৌমা, ঘরে তুমি আছো নাকি?' তখন নিশ্চয়ই এবার উত্তর না দেওয়া ভালো নয় ভেবে আমি বললাম, 'কেউ নয়, আমি।' আমার সেই কথা শুনে তাঁর মনের অবস্থা না জানি কী রকম হয়েছিল! কিন্তু কী করবেন? এক মিনিটও সেখানে আর থামলেন না। 'আমি' এই শব্দটা উচ্চারণ করেই দরজা খুলে দেখি—সেখানে কেউ নেই, সব্বাই একেবারে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছেন। আমি একবার ভাবলাম যে পিছনে পিছনে গিয়ে সেই স্ত্রীলোকটিকে ভালো করে দেখে নিই, কিন্তু আবার বিচার করে দেখলাম, মাঈসাহেব নিশ্চয়ই ভাবছেন যে আমি সব কথা শুনেছি, তখন আবার তাঁর সামনে গিয়ে তাঁকে লজ্জিত করে দরকার কী? এই ভেবে আমি চুপ করে রইলাম। ততক্ষণে সে স্ত্রীলোকটি চলে গেল, আর আমি নিজের জায়গায় এসে বসলাম। তার কিছুক্ষণ পরেই মাঈসাহেব এসে আমাকে বললেন, 'কেন? আজ আদালত নেই, তাই ঘুমুচ্ছ নাকি? তুমি বাপু বড় ঘুম-পাগল। কিন্তু আমাদের কথাবার্তা

শুনে তোমার ঘুম ভাঙে নি তো?' প্রত্যক্ষ বিদ্যুৎ যদিও আমার পাশেই কোথাও এসে পড়ত, তবুও আমি অত চমকে উঠতাম না। কেন না আমি কখনো ভাবিনি যে মাঈসাহেব অমন সাহস করে আমাকে ওরকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আসতে পারেন। কিন্তু মানুষ হতাশ হলে কী করবে আর কী না করবে তার ঠিক থাকে না, সেই রকমই বোধ হয় তাঁর অবস্থা হয়েছিল। তিনি ও কথা কেন জিজ্ঞেস করতে এলেন তা আমি বুঝলাম। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমি জেগে থেকে তাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি কিনা সেটা জেনে নেবেন। আমার তখন তাঁর উপরে দয়া হল। কিন্তু 'হ্যাঁ' উত্তর দিলে কী অবাক কাণ্ড দেখা যায় তাই দেখবার জন্য আমি বললাম 'না, এই আমি এসে গা এলিয়ে দিয়েছিলাম, পড়ছিলাম।' তক্ষুনি তাঁর সুর পরিবর্তন হল। মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হল, কিছু ক্রোধ, কিছু লজ্জা ইত্যাদির মিশ্রণ তাঁর চেহারায় দেখতে পেলাম। চট্ করে ভ্রূকুটি করে মাথা নেড়ে, 'আচ্ছা, তাই নাকি?' বলতে বলতে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। আমি নিজের জায়গায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলাম।

'আজ চারদিন হল আমার অন্য কিছু ভালো লাগছে না। মাঈসাহেব সব সময় ক্রুদ্ধ থাকেন, তিনি খোলাখুলি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন না। আজ দুদিন দেখলাম যে তোমার বৌদি বড়ো কষ্ট পায়, কিন্তু 'চামারের ঠাকুর পূজো'[১] ভেবে আমি একটি অক্ষর পর্যন্ত বলিনি। আজ দুদিন হল আলাদা রঙ দেখছি। কী জানি কেন—কিন্তু থাক্, এখন এ বিষয়টা শেষ করি। আরও কিছু কম বেশী জানতে পেলে তোমাকে জানাব।

'যমুনা, এমন মজা যে এই ঘটনা যেদিন হল, সেদিন থেকে তোমাকে জানাব কিনা এই ভাবছিলাম, কিন্তু শেষে ঠিক করলাম যে জানানোই ভালো। আর আজ চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছি। এই ঘটনার তদন্ত করে গয়নার বিষয়ের রহস্যটা জেনে নিতেই হবে তা হলেই মন শান্ত হবে। এই ভেবে আমি সে বিষয়ের তলায় ডুব দেব ঠিক করেছি। তুমি কী মনে করো? একবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে থাকত। রঘুনাথরাও নিশ্চয়ই এখন খুব মেহনৎ করে পড়াশোনা করছেন। তাঁর পড়াশোনা সম্বন্ধে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকারই নেই। তিনি এক বারে পাশ

১ একটি মারাঠি প্রবাদ আছে, চামারের ঠাকুর জুতোর পূজো পায়। অর্থ স্পষ্ট।

করবেনই। তারপর তোমাদের একেবারে মজা। তখন বোম্বায়েই বসবাস করবে না অন্য কোথাও যাবে? ভাবলাম যে তারপর তোমরা বিলেত যাবে ভাবছ! যদি যাও, তাহলে সঙ্গে নিয়ে যাবে?......'

এর পরের ঠাট্টার কথাগুলি এখানে দিয়ে দরকার নেই। চিঠির দরকারী অংশ উপরেই দিয়েছি। সেই চিঠি পড়ে আমার মন কেমন হল, তার কল্পনা কি কেউ করতে পারে? গয়নার এই ধাঁধাটা কী? কিছু বুঝতে পারছিলাম না। সেই স্ত্রীলোকটির মারফৎ গয়না কারো হাতে গিয়েছিল এই বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে গয়না গেল কী করে আর কেন, এই আসল কথাটা তেমনি রইল। ঘরের সব গয়না এ রকমে ঘরের বাইরে যাওয়া, আর আবার ফেরত না পাওয়ার মানে কী? নিশ্চয়ই কোনো কেলেঙ্কারী ব্যাপার, এই ভেবে আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। ভাবলাম, বাবা ঐ রকম কী একটা গণ্ডগোল করে নিজের নাম কলঙ্কিত করলেন, এদিকে গয়না হারিয়ে মাঈসাহেব আবার না জানি কী আরম্ভ করেছেন? এসব ভেবে হঠাৎ আমার মা'কে মনে পড়ল আর কান্না পেল। শেষে দাদার ভাবী অবস্থার বিষয়ে ভাবতে লাগলাম আর মোটের উপর দাদার কোনো দিক দিয়েই সুখ নেই ভেবে অত্যন্ত কষ্ট হল। ওঁর পড়াশোনার ব্যাঘাত হবে বলে আমি চিঠিটা ওঁকে মোটেই পড়তে না দিয়ে অমনি রেখে দিয়ে নিজেই দ াকে চিঠি লিখলাম তাতে, 'তুমি ও ঝঞ্ঝাটে এর পরে পড়তে যেও না। আমাদের তা না হলে কিছু ঠেকছে না তো? গয়না গিয়েছে—যাক্ গে। তুমি নিজে উপার্জন করে অনেক গয়নাগাঁটি করবে। ও গয়নার গণ্ডগোলে পড়ে কাজ নেই। —যেমন হবার তা হোক-' এ রকম লিখেছিলাম। সে চিঠি পাঠাবার পর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত দাদার কোনো চিঠি আসে নি, তখন আমার বড় ভাবনা হতে লাগল তাই আমি সেই মর্মেই আর একখানা চিঠি লিখলাম। তার উত্তরে সে লিখেছিল, 'তোমার চিঠি আসামাত্র আমি উত্তর দিয়েছি তবুও 'এতদিনে তোমার চিঠি নাই কেন?' লিখেছ কেন তার অর্থই বুঝতে পারছি না'। আমার অত লম্বা চিঠি গেল, আর তুমি এখনো তার উত্তর দাও নি বলে রাগ করে আমি তোমাকে চিঠি লিখিনি। আর আজ তোমার চিঠি দেখে অবাক হয়েছি। এর মানে কী? তুমি সত্যিই চিঠি পাঠিয়েছিলে নাকি? তাহলে সে চিঠি আমি আমার হাতে পাইনি কেন? গেল কোথায়? এ

ব্যাপারটার তদন্ত করতেই হবে, তাছাড়া উপায় নেই।"

এই কথা পড়ে কিন্তু আমি বড় আশ্চর্য হলাম। ব্যাপার কী? আমি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম তাতে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। তবে সে চিঠি গেল কোথায় আর তার হল কী? অন্য কারো হাতে যায় নি তো? অন্য কারো মানে কার হাতে যাবে? আজ পর্যন্ত এমন কখনো হয় নি। তবে এই সময়েই যদি কেউ নজরে রেখে সরিয়ে নিয়ে থাকে, তা হলে? কথায় বলেই তো মন যা চিন্তা করে তেমন চিন্তা শত্রুও করেনা। শুধু একটা নয়, দুটো নয়, হাজার চিন্তা আমার মনে এল, আর সতর শো সন্দেহ জন্মাল। সে সব এখানে বলতে গেলে একটা গ্রন্থ হবে। আমি তক্ষুনি দাদাকে জানালাম যে আমি তো নিশ্চয়ই চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তার উত্তর এল, 'তা হলে সেটা কার হাতে গেছে তা আমি জানি। তার তদন্ত না করে শান্ত হব না।'

তারপরে আরো কিছুদিন সেসব রইল। আর আমার মনের গতিও অন্য দিকে যাবার কিছু কিছু কারণ ঘটল, তাই সেই গয়নার গণ্ডগোলটা তখন-কার মতো চাপা রইল।

দুর্গার সম্বন্ধে

আরও কিছুদিন কেটে গেল। সব কাজকর্ম যেমন সুস্থিরভাবে চলা উচিত তেমনি চলছিল। উনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। ভাবছিলাম আর কোনো গণ্ডগোল বুঝি নেই। কিন্তু তা কি হয়? যেন ঈশ্বরের নিয়মই ছিল যে আমার মন সর্বক্ষণ হু হু করবে। আবার একবার দাদার চিঠি এল, তাতে গয়নার সম্বন্ধে কিছু ছিলনা, কিন্তু সে লিখেছিল, 'দুর্গার বাবা আমাকে বলেছেন যে দুর্গার স্বামী ফিরে এসেছে আর সে তাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়। কদিন আগেই দুর্গা তার খোকাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সুখে ঘরকন্না করছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন মশাই এলেন। সেদিন বুঝি দুর্গা শ্বশুরবাড়িতে ছিলনা। কী যেন নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের জন্য বাপের বাড়ি এসেছিল, সন্ধ্যাবেলা ফিরে যাবার কথা, কিন্তু যায়নি। তখন মশাই তেঁড়েমেড়ে তার বাপের বাড়ি এলেন আর গালাগালি করতে লাগলেন। বেচারা দুর্গার বাবা সরল মানুষ, তিনি কী করবেন। তক্ষুনি তিনি দুর্গাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে বললেন, কিন্তু ততক্ষণে তার স্বামী তাঁকে টানতে আরম্ভ করল। কী করবে বেচারী? মুখ বুঁজে খোকাকে কোলে করে চলে গেল। তখন থেকে সে নাকি আজকাল রোজ শ্বশুরের দরজায় এসে তাঁকে গালাগালি করে। শাশুড়ীকে, দিদিশাশুড়ী আর দুর্গার ভাইকেও গালি দেয়। তার ভাইয়ের সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল সে তো বলেছিল যে 'আজকাল মা রোজ কাঁদে আর বলে যে এই মেয়েটা একবার মরলে আমার প্রাণের জ্বালা জুড়োয়।'

এ বৃত্তান্ত পড়ে আমার মন কত যে উদ্বিগ্ন হল তা কি কেউ জানে? বেচারী দুর্গার ভাগ্যে এরপরে আর কি সব ছিল? কিন্তু বাপের বাড়ি, শ্বশুর-বাড়িতে যা দু'মুঠো ভাত পেত তা খেয়ে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে তো আপত্তি ছিল না! কিন্তু না। তার জীবনের শত্রু সেই হতচ্ছাড়া তাকে শান্তি দিলে তো? দুর্গার ঠাকুমা সর্বদা বলতেন, 'মাগো মা, এ কী স্বামী। এ যে

আগের জন্মের শত্রু।' একথা কেউ যতই কটু ভাবুক, কিন্তু তাতে মিথ্যার কণাভাগমাত্র ছিল না। অমন সুশীলা, সরলা স্ত্রীকে যন্ত্রণা দিত—আমার তো সেই হতভাগার উপরে এমন ভয়ানক রাগ করত, যে তার সীমা নেই। দাদার সেই চিঠিটা পড়ে আমার গা জ্বালা করতে লাগল যে সেই জ্বালায় আমি বোধ হয় দুর্গীর স্বামীকে লাখ লাখ গালি দিয়েছি।

দুর্গী তার খোকার টানে, তাতেই সুখ মেনে জীবনযাপন করত, এ কথা আমি নিশ্চিত জানতাম, সে সন্তানটি যদি না থাকত, তাহলে সে এর কতদিন আগেই আত্মহত্যা করত। ভাবত যে তার সব সুখ আর সমস্ত জগৎ তার খোকার মধ্যে একত্র হয়ে আছে। স্বামী না এলে, তিনি কোথায় গেলেন, এলেন না কেন ইত্যাদি সে কিছু ভাবত না। কিন্তু সে আবার এসে হয়তো জ্বালাতন করতে আরম্ভ করবে, একথা দুর্গী কখনো ভাবেনি। আর সে-হতভাগা এসে তাকে এরকমে যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করে থাকলে, দুর্গী না জানি এখন কী মনে করে। সে এখন নিজের খোকার আশা ছেড়ে দিয়ে কোনোদিন সত্যই আত্মহত্যা করবে না তো? কিন্তু নিজের অবর্তমানে খোকা অত্যন্ত কষ্ট পাবে ভেবে, তাকে শুদ্ধ পাতকুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো? এর আগে আমি অনেক মেয়েদের এমন কথা শুনেছিলাম যে তারা নিজের সন্তানকে কোমরে বেধে পাতকুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছিল। তাই আর দুর্গীর স্বভাব আমি যা জানতাম, দুয়ে মিলিয়ে আমি নিশ্চয়ই ভাবলাম যে এরকম একটা অবশ্যই হবে। আমার স্বভাব এমন যে যখন একটা কিছু ভাবতে শুরু করি, তখন তার চেয়ে বেশী ভয়ংকর ঘটনা না হওয়া পর্যন্ত সে চিন্তা আমার মন ছেড়ে যেতে চায় না। তাই দাদার সেই চিঠি আসার পর থেকে আমি অন্য কিছু ভাবতেই পারছিলাম না। দুর্গী, দুর্গীর খোকা, আর তার সেই হতচ্ছাড়া স্বামী আর পাতকুয়ো না হলে আফিং, এই শুধু চোখের সামনে দেখতে লাগলাম।

আমার ছোটবেলার বন্ধু, যাকে আমি অতিশয় ভালোবাসতাম, সে অমন বিপদে পড়েছে, এমন সময় আমি তাকে কোনো সাহায্য করতে পারি না এই মনে করে আমি সেদিনই ওঁকে সে কথা বললাম। তখন উনি বললেন, 'আমরা কী সাহায্য করতে পারি? তুমিই ভেবে দেখো, যদি কিছু সাহায্য করতে পারো, তা হলে নিশ্চয় কোরো। আমি কি তোমার কথার বাইরে?' একথা শুনে আমি মনে কত সান্ত্বনা পেলাম। 'আমি কি তোমার

কথার বাইরে ?' একথা যে মুখ দিয়ে বেরুল সে মুখ সামনে দেখছিলাম, আর দুর্গীর আর তার আত্মীয়স্বজন যে-মুখের গালাগালি খেতেন সে মুখ আমার সামনে ছিল। এমন অবস্থায় আমি ওঁর কথায় মনে কত শান্তি পেলাম, আর দুর্গীর জন্য মনে কষ্ট হতেই নিজের জন্য কত ধন্য বোধ করলাম, তার কী কোনো সীমানা আছে ? 'তুমি যদি কিছু করতে পারো, তাহলে নিশ্চয়ই কোরো, আমি কি তোমার কথার বাইরে !'

সে কথা শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অনেকক্ষণ চিন্তাক্রান্ত হয়ে বসে রইলাম। শেষে ভাবলাম যে লক্ষ্মীবাইর কাছে গিয়ে তাঁকে সব ঘটনা বলে তাঁর আর যশোদাবাইর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা না বললে মন শান্ত হবে না। তাই আমি তাঁদের ওখানে গিয়ে তাঁদের দুজনকে সে চিঠিটা দেখালাম আর অনেকক্ষণ বসে সে বিষয়েই কথাবার্তা বললাম। এমন বিপদের সময় নিজের একনিষ্ঠ বন্ধুকে সাহায্য করতে অক্ষম হওয়া কি কম দুঃখের বিষয় ? এই মনে করে আমরা নারীজাতির সাধারণ অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় লক্ষ্মীবাই হঠাৎ বললেন :

তোমাদের বাবার আর তাঁর বাবার মধ্যে খুব ভাব আছে বললে তো ?

হ্যাঁ, আছে।

তা হলে তুমি কিম্বা তোমাদের গণপতরাও তাঁকে কিছু বললে তিনি শুনবেন না ?

আমার তো মনে হচ্ছে যে শুনবেন।

সুন্দর ! গণপতরাওকে তুমি লেখো যে-কোনো উপায়ে তাঁকে—মানে তোমার বন্ধুকে—চুপিচুপি শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি নিয়ে এসে তোমাদের এখানে বোম্বায়ে পাঠিয়ে দিন। সাবধানে করলে ঝঞ্ঝাট চুকবে আর ঝগড়া মিটবে।

প্রথমে যুক্তি আমার বেশ পছন্দ হল ; কিন্তু খানিকক্ষণ পরে সেটা সুসাধ্য হবে মনে হল না। দুর্গীর বাবা তাকে পাঠাবেন কি না, দাদা গিয়ে তাঁকে ও কথা কেমন করে বলবে, শ্বশুরবাড়ি থেকে দুর্গী আসবে কী করে, ইত্যাদি নানা রকমের আশংকা মনে হল, তবুও দু'কথায় লক্ষ্মীবাই সে আশংকা দূর করলেন। তিনি বললেন, 'ওমা ! মুশকিল আর অসুবিধা তো আছেই। আমাদের মনে হলেই অমনি সেই মতো সব কি কখনো হয় ?

নিজের দিক থেকে তার সহায় হবার একটা উপায় আছে,চেষ্টা করে দেখো। কৃতকার্য না হলে তাতে দোষ কি? কিন্তু তুমি যেমন বলছ সে রকম সে যদি খোকাকে সঙ্গে করে আত্মহত্যা করে ফেলে তাহলে এ বলে অনুতাপ করতে হবে না যে যেমন ভেবেছিলাম সেই মতো তাকে নিয়ে এলে এমন অনর্থ হতনা।'

একথা শুনে আবার মন বেশ দৃঢ় হল। আমি ঠিক করলাম যে দাদাকে লিখব। আর তাড়াতাড়ি গিয়ে আমাদের তিন বন্ধুতে যে কথা হয়েছিল তা ওঁকে বলে ওঁর মত জিজ্ঞাসা করলাম। তখন উনি আবার বললেন, 'তোমাকে বললাম তো যে তুমি যা উপায় ভেবে পাবে সেটা অবলম্বন করো, আবার বারবার কেন জিজ্ঞেস করছ? কিন্তু দেখো গণপতরাওকে লেখো, যে যা করবেন তা যেন খুব সাবধানে করেন। তার স্বামী যদি জানতে পারে যে সে এখানে এসেছে, তাহলে সে তার শ্বশুর-শাশুড়ীকে ছেড়ে এখানে আসবে আর তোমাকে আর আমাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করবে। তাহলে তুমি কী করবে?'

তাইতো! তা হলে কিন্তু ধর্ম করতে গিয়ে গলায় দড়ি পড়বে।

আহা! শুধু এই বললে কি হয়? বন্ধুকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে আমাদেরও যাচ্ছেতাই গালাগালি সহ্য করতেই হবে একথা বলা ছেড়ে, 'তাইতো! তাহলে কিন্তু ধর্ম করতে গিয়ে গলায় দড়ি পড়বে বলছ? দূর ছাই! তুমি যে ভীতু দেখছি!'

'শুধু দেখছই তো?...বেশ, তবে লিখব দাদাকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লেখো। তার পরে যা হবে তা দেখা যাবে।'

এই রকমে সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে চিঠি লিখতে কত দেরি? তক্ষুণি দাদাকে চিঠি লিখলাম। আর আমরা একগুণ তো দাদাসাহেব দশগুণ। তিনি ফেরত ডাকে চিঠি পাঠালেন, 'আমি যে কোনো উপায় করে নিশ্চয়ই ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ফন্দি কিন্তু বেশ ভেবে পেয়েছ! আমার মনে হচ্ছে যে ওকে এভাবে বোম্বাই নিয়ে যাওয়া ওর জীবনদান করারই মতো। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। আমি আজ তার বাবার কাছে গিয়ে কথা পাড়ব। বোধ হয় তিনি পছন্দ করবেন। কেন না, তিনি সেই পাজি লোকটার গালাগালিতে বড্ড বিরক্ত হয়েছেন। তা ছাড়া, দেখলাম যে সে রোজ স্ত্রীকে মারধোর করে এই খবর শুনে তিনি একেবারে অশান্ত

হয়েছেন।'

দুর্গীর সম্বন্ধে দাদার মনে আগে থেকেই অত্যন্ত স্নেহ ছিল। আর আমি ঠিকই জানতাম যে তার ওরকম দশা দেখে তার বড়ো দুঃখ হত, তাই তার সুখের জন্য যা কিছু করা সম্ভব তা দাদা করবেই এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। তবে তার চেষ্টা কত দূর সফল হবে এ বিষয়েই শুধু সন্দেহ ছিল।

আমাদের সে সন্দেহ যে একেবারেই অমূলক ছিল না এ কথা তার দ্বিতীয় চিঠিতে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। সে গিয়ে দুর্গীর বাবাকে আমার চিঠির কথা বলতে সে ভদ্রলোকটি আমতা আমতা করতে লাগলেন আর, 'তা কী করে করা যায়? ওকে নিয়ে আসব কেমন করে?' ইত্যাদি অসুবিধা দেখাতে লাগলেন। দাদা অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু দেখতে পেল যে তিনি বুঝতেই পারছিলেন না, তবুও দাদার এই নতুন চিঠির শেষে এই বাক্যটি ছিল, 'তবুও আমি ভয় করিনে, আমার কাছে শেষের একটি রামবাণ উপায় আছে। সেটা ঠিক সময়ে ব্যবহার করলে কার্য সমাধা নিশ্চয়ই হবে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই। সেটা কী অনুমান করো দেখি!'

আমি তার অর্থ ভালো করে বুঝতে পারছিলাম না। নানা রকমে ভেবে দেখলাম। তার রামবাণ উপায়টা কী তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না। দাদা কোনো অন্যায় কাজ করবে না তো, এমন চিন্তা পর্যন্ত মনে না এসে থাকল না। কিন্তু নিশ্চিতরূপে জানতাম যে দাদা অমন কিছু করবে না। তাই সে চিন্তার উদয় আর অন্ত এক সঙ্গেই হল। বেশীক্ষণ সে ধাঁধা আমার মনে টিকল না, কেন না, আবার তার তৃতীয় দিনে দাদার চিঠি পেলাম, 'রামবাণ উপায়টা প্রয়োগ করেছি, নিশ্চয়ই কার্য সফল হবে। হয়েছে বললেও ক্ষতি নেই। আমি ভাবছিলাম যে দুর্গীর মা'র মনে সে কথা ধরিয়ে দিলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে, সেইমতো দুর্গীর মা'র সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন কোনো বাধা নেই। কাজ নিশ্চয়ই সফল হবে। দুর্গীর মা'র তাতে বিশ্বাস জন্মেছে। তাঁকে তোমার চিঠি পড়ে শোনাবামাত্র তিনি বললেন, 'বা! সম্ভব হলে সুন্দর! কিন্তু লক্ষীছাড়া আবার সেখানে গিয়ে তাকে হয়রান না করলেই যথেষ্ট। না হলে একটা করতে আর একটা হয়ে বসবে।' আমি তক্ষুণি বললাম,

'সেখানে গিয়ে কিছু করবার ওর সাধ্য নেই। সেখানে একটুও অমন চাল খাটবে না।' এই রকম অনেক কথায় বুঝিয়ে বলে তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মিয়েছি। এখন অসুবিধা শুধু এই যে দুর্গার বাবা আবার না জানি কী আশংকা করেন! দুর্গার ঠাকুমারও পছন্দ হল। কেন না, তিনি তো স্পষ্ট বললেন, 'আমার ক'দিন আগেই মনে হচ্ছিল যে মেয়েটাকে দুচারদিন কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারলে হয়, কিন্তু পাঠিয়ে দেব কোথায়? ও বেটাচ্ছেলে মেয়েটাকে আর আমাদেরও সর্বক্ষণ হয়রান করছে। ওর শাশুড়ী কাল এসে বসে কেঁদে গেল। তাঁকেই বা কী দোষ দেওয়া যায়? বেচারী জন্মের জন্য দায়ী, কর্ম তো দিতে পারেন না?' এর পর আবার যা হয় কাল জানাব।'

আমি—আর আমার চেয়েও বেশী—বন্ধু দু'জন চাতক পাখীর মতো দাদার চিঠির অপেক্ষা করছিলাম; কিন্তু দ্বিতীয় দিন গেল, তৃতীয় দিন গেল, চার দিনের দিনও সে চিঠি এল না। তখন আমরা নিশ্চয়ই ভাবলাম যে কাজটা ভেস্তে গেছে, একেবারে নিরাশ হলাম। তার দু'দিন পরে দাদার চিঠি এল, 'আসছে রবিবারে দুগার ভাই দুর্গাকে নিয়ে আসছে।' সেই চিঠি পাওয়ামাত্র আমার প্রাণটা যেন জুড়ালো। আমার অবস্থা ভালো, তাই কয়েকদিন তবু বন্ধুকে সুখে রাখতে পারব ভেবে মনে বড় আনন্দ হল। দুর্গা এলে তাকে এই রকম সুখ দেব, সেই রকম সুখ দেব, হেন করব, তেন করব, ইত্যাদি পরিকল্পনা করতে লাগলাম। দুগার আসবার দিক দিয়ে সেখানে কী রকম ব্যবস্থা হল তা আমি জানতে পারিনি। আর সে বিষয়ে খামোকা ভাবতেও বসিনি। ভাবলাম সে এলে সব জানতে পারা যাবে। যখন সে নিশ্চয়ই আসবে ঠিক হল, তখন আমি মাকে তার আসবার কথা বললাম। তার সম্বন্ধে তিনি আগে থেকে অল্প কিছু কিছু জানতেন। আর তিনি স্বভাবতই অতিশয় ভালো মানুষ ছিলেন, তাই তিনি আমার কথা শুনে, 'বেশ, বেশ, আসুক' বলে সন্তোষই প্রকাশ করলেন।

এই রকমে সব সুন্দর বন্দোবস্ত হল। তখন আর কোনো ভাবনা রইল না। শুধু দুর্গা আসারই যা বাকি। ঠিক দিনে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে এল। তার ভাই তক্ষুণি ফিরে গেল। তারপর আমি দুর্গাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তখন সে তার স্বামী তাকে কেমন জালাতন

করত, তার বর্ণনা করল। সে সব ঘটনা শুনে আমার গা শিউরে উঠল। তার বিনুনি টেনে সে ঝাঁকুনি দিয়েছিল, তখন চুলের গোছা উঠে এসেছিল, মাথার সে জায়গাটা দুর্গা আমাকে দেখাল, আর একদিন তার খোকাকে মেরেছিল সে ঘটনা যখন সে বলল তখন তো তার চেহারা বাঘের মতো উগ্র দেখাচ্ছিল। সে বলল, 'যমু, সেদিন আমি সত্যি আত্মহত্যা করতাম। যে হাত দুটো আমার বাছাকে মেরেছে সে হাত দুটো খসে পড়বে, কক্ষণো থাকবে না। আমাকে মারলে ঘুণাক্ষরেও আমি কিছু কখনো বলিনি। এক জন্ম আছি তোমার, যত খুশি জ্বালা দাও। কিন্তু ওই বাছাকে?—আমার বাছাকে?'—এ কথা বলতে বলতে সে তার খোকাকে বুকে চেপে ধরে অবিরাম কাঁদতে লাগল। আমি তার একনিষ্ঠ বন্ধুই। সে সব শুনে আমারও কান্না উপচে এল। তাতে কোনো আশ্চর্য নেই, কিন্তু আমার সেই দুই বন্ধু তার সেই দীনের মতো অবস্থা দেখে যে কী মনে করলেন তার বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই।

দুর্গা আসবার দু'চার দিন পর তার দুঃখময় কাহিনী শুনে কেটে গেল তারপর তার মন একটু শান্ত হল আমাদের নিত্যকারের কাজকর্ম শুরু হল। ওঁর পরীক্ষা একেবারেই কাছে এসে গিয়েছিল, তাই আমি ওঁর পাশে গিয়ে বসতাম না। সমস্ত দিন দুর্গাকে যত্ন করা আর তাকে সান্ত্বনা দেওয়া—এতেই যেন নিমগ্ন থাকতাম। আমাদের সে সপ্তাহের সভা ইত্যাদি প্রথম প্রথম দুর্গার ভালো লাগলনা, আর সে তা নিয়ে কিছু টীকা করল, কিন্তু অল্প দিনেই সে মনে করতে লাগল যে তাতে মন্দ কিছুই নেই আর সে আমাদের সঙ্গে আনাগোনা করতে লাগল। একমাসের মধ্যে তার জীবনধারায় কত পরিবর্তন হল! যথাসম্ভব আমরা তার স্বামীর কথা তুলতামই না, তাই সে কথা তার মনে পড়তনা, আর সে তার খোকাকে যত্ন করে আদর করে, আর আমাদের সুখ সহবাসে আনন্দে ছিল। পুণায় তার স্বামী এখন একেবারে পাগলের মতো হয়ে দুর্গার বাপের বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে তাঁদের লাখ লাখ গালি দিত, আর তার স্ত্রীকে গোপনে কোথাও সরিয়ে ফেলেছেন বলে আদালতে নালিশ করবার ধমক দিত। দুর্গার বাবা ভয় পেয়ে সে সব কথা এসে দাদাকে বলতেন। দাদা তাঁকে সান্ত্বনা আর সাহস দিত। এই রকম চলছিল। সৌভাগ্য এই যে সে এখনো দুর্গা

কোথায় তা জানতে পারে নি, নইলে সে নিশ্চয়ই বোম্বায়ে এসে রোজ সকাল-বিকাল আমাদের সামনে মাথা খুঁড়ত। কিন্তু বোধ হয় আমাদের কিংবা দুর্গার ভাগ্য বলে অনেকদিন তেমন কিছু হল না, আর সে যত ক্ষেপে উঠতে লাগল, ততই দুর্গার বাবা ভাবতে লাগলেন যে এখন দুর্গাকে নিয়ে এলে ও তাকে খুন করতেও ছাড়বে না। তাই সে যেখানে আছে বেশ আছে সেখানেই। মোটামুটি এই রকম অবস্থা ছিল।

* * * *

পরীক্ষা আরম্ভ হল। প্রত্যেক দিন উনি বাড়ি এলেই আমি জিজ্ঞাসা করতাম, 'কেমন হল?'—যেন আমি তার কিছু বুঝতাম! কিন্তু মনে উৎকণ্ঠা থাকত কাজেই উপায় কী? তিন দিনের দিন খাতা দিয়ে যখন ফিরে এলেন আর ঠিক ওই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করলাম, তখন আমাকে কত ঠাট্টা করলেন। গায়ের জামা আর মাথার পাগড়ি খুলে রেখে তিন দিনের প্রশ্নপত্রগুলি বের করে আমাকে বললেন, 'এসো এদিকে, তোমাকে বলি কাগজ কী রকম লিখেছি। এখন তুমি আবার একবার আমার পরীক্ষাই করো না? তা হলে কাগজ কী রকম লিখেছি তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।'

তক্ষুনি আমি বললাম, 'আহা, করব পরীক্ষা, তা আর বেশী কী? মেয়েরা কি কক্ষনো পরীক্ষক হবে না? অত লজ্জা দিতে হবে না গো!'

'ওরে বাপরে! নিজের জাতির কী ভয়ানক পক্ষ সমর্থন!'

'পক্ষ সমর্থন মানে? পুরুষ জাতি ভাবে যে যেন সব তাদেরই জন্য আর তাদেরই হাতে আছে! আমরা যতদিন করিনি ততদিন সব বড়াই!'

'এখন বাপু আর কিছু বলবার সুবিধে নেই। সার কথা, আপনি 'ল' পড়বেন, এই তো? তবে এখন আর এই বইগুলো যথাস্থানে রাখব না। আপনি আজ থেকে এখানে বসবেন।'

'আজ থেকে বসব, এই তো! একমাস হল তোমার সঙ্গে একটি কথা পর্যন্ত বলিনি! এখন আর বইগুলো ছুঁতেও দেব না!'

'ওরে বাপরে! মানে আজ থেকে আমাকে একেবারে কয়েদ করে রাখবে?'

'তা ছাড়া আবার কী? যেদিন বিয়ে হল সেদিনই কারাবদ্ধ করেছি।'

'বাঃ! ভাগ্যক্রমে যদি একবার এরকম কারাবাস লাভ হয়, তা হলে মুক্ত হবার ইচ্ছে কি কেউ কখনো করবে?'

'আহা! কিন্তু আজীবন থাকবে তো এ রকম কারাবদ্ধ হয়ে?'

কী জানি কী মনে করে আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম!

এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমি হাসতে হাসতে ওঁর কাছে যাব, এমন সময় ছুর্গী আমাকে ডাক দিল। সে যেন স্বপ্ন থেকে আমাকে জাগিয়ে তার নিজের অবস্থা আমার চোখের সামনে আনল! আমি তাকে সাড়া দিয়ে ওদিকে যেতে যেতে তার সম্বন্ধেই কথা শুরু হল। বেচারীর ছুর্ভাগ্য! অমন বুদ্ধিমতী হয়েও ছুর্ভাগ্যক্রমে বেচারীর এমন ছুরবস্থা হয়েছে বলে আমরা বিষণ্ণ হলাম।

আগে থেকেই আমি ঠিক করেছিলাম যে সেদিন থেকে পরীক্ষার ফল বেরুবার দিন পর্যন্ত শুধু গল্প করব। গল্পের বই পড়ব, ওঁকে অল্প একটুও পরিশ্রম করতে দেব না, তাই সেই মতো সব আয়োজন আমি করেছিলাম। নানা প্রকারে আমরা তাঁর মনোরঞ্জন করতাম। ছুর্গী ভয়, লজ্জা সব দূর করে আমাদের মধ্যে এসে বসবে এমন নির্ভীক তাকে বানিয়েছিলাম। সে তো এমন চালাক ছিল যে, যেদিকে যাবে সেদিকেই সে ভালো মেয়ে হত। কিন্তু তার অদৃষ্ট আলাদা রকম ছিল, তাতে তার কিংবা অন্য কারো কী উপায়? এখন সে রাত্তিরে কখনো কখনো সকলের মধ্যে এসে বসত, কথাবার্তা বলত, সব কিছু হত। লেখাপড়ার দিকেও তার টান জন্মাল।

এই রকমে বড় সুখে দিন কেটে যাচ্ছিল। এই সময়ই দাদাকে আমি চিঠি লিখলাম যে, 'যেমন করে হোক তুমিও ক'দিনের মতো এসো, কাজ তো সব সময়ই আছে।' পরীক্ষার ফলের সম্বন্ধে কোনো ভাবনাই ছিল না। তা ছাড়া পরীক্ষার শেষের দিন থেকে তার ফল বেরোবার দিন পর্যন্ত মাঝের দিনগুলো বড় মজার। তাই আমি ভাবলাম যে দাদা এসে আমাদের সুখের অংশীদার হোক। পুণায় তার প্রায় কোনো সুখই ছিল না। কাজেই উনি আর আমি অত্যন্ত অনুরোধ করে তাকে আসতে লিখলাম। তা ছাড়া তাকে লিখেছিলাম যে বড়োদিনের ছুটিতে কিংবা মাঝের কোনো অবসরে সকলে মিলে 'ঘারাপুরীর' গুহা* দেখতে যাব। দাদা আসবে কিনা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। সে তক্ষুনি এল, আর তার পরে রসিকতা সুখ আর আনন্দের সীমাই রইল না। এখন তিন সন্ধ্যা শুধু গল্প, অন্য কিছু নয়। সকলেরই ছুটি ছিল, তখন কখনো ভূত কালের, কখনো ভাবী কালের

* বোম্বায়ের অনতিদূরে এই গুহা অবস্থিত।

গল্প, কখনো কোনো বই পড়া, কখনো কখনো পরস্পরের ভাবী অবস্থার সম্বন্ধে ঠাট্টা করা, এই রকম মজা চলছিল।

পরীক্ষার ফল বেরোতে তিন দিন বাকী, এমন সময় হঠাৎ ঘারাপুরী দেখতে যাবার কথা ঠিক হল। সোমবার ফল বেরোবার কথা, কিন্তু শনিবারেই নানা সাহেব বললেন, 'চলুন সবাই ঘারাপুরী যাই।' তখন উনি বললেন : 'পরীক্ষার ফল বেরোক, তারপর যাব, এমন দুরু দুরু মনে গিয়ে দরকার কী?' তাই শুনে দাদা তক্ষুনি বলল, 'ওঁর প্রথম থেকেই এই অভ্যাস, পরীক্ষা পাশ করবেন কিনা এ বিষয়ে ভয় দেখিয়ে কাঁদতে বসেন; আর প্রথম হন।' এই বলে দাদা ভারি ঠাট্টা আরম্ভ করল। শেষে উনি যখন বললেন, 'আচ্ছা বাপু, আমার পরীক্ষার কথা থাক্। চলুন যাওয়া যাক,' তখন দাদা থামল! ঘারাপুরী যাব, তাই আমরা তিন বন্ধু মিলে খাবার দাবারের জিনিস জোগাড় করে, সব আয়োজন করতে লাগলাম।

পরের দিন যাবার কথা। রাত্তিরে আমি নিঝুম ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ আমাকে জাগিয়ে তুলে উনি বললেন, 'দেখো, আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছি। ঘুম আসছে না। আর-আর এই এখানে কেমন ব্যথা করছে।'

ওঁর সে কথা শুনেই কী জানি কী মনে হয়ে হঠাৎ আমার বুক কেঁপে উঠল!

শেষ !

'কী হ'ল ? কোথায় ব্যথা করছে ?' আমি ভয় পেয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলাম। তক্ষুনি অল্প হেসে উনি বললেন, 'আহা, অমন ঘাবড়াবার দরকার কী ? এই অল্প একটু ব্যথা করছে বললাম আর অত ভয় পাচ্ছ ? তবে একটা বিষম অসুখ করলে কী করবে ?'

'না গো না, অমন বড় অসুখ করে দরকার নেই। আর অমন কথা বোলোও না।'

'কেন ? বললেই কি অমনি তাই হয় ? আর না বললে কি যা হবার তা বাধা পায় ?'

'কিন্তু এ কী কথা ?' আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আগে বলো দেখি কোথায় ব্যথা ?'

'এই যে এইখানটায়, বোধ হয় ফিক্ ধরেছে। বুকের পাঁজরে নয়, এই এখানে।...' তারপর উনি কিছু বলবার আগেই আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'তেল দিয়ে মালিশ করে ইঁট গরম করে সেক দেবো ? না গরম জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে সেক দেবো ?'

'পাগল নাকি ? এত রাত্তিরে আবার ওদিকে গিয়ে কাজ কী ? আর সবাই জেনে—বেশ বাপু, অসুখটা যে এমন বড়ো, তাও নয়। তোমরা মেয়ে মানুষ সত্যি অত্যন্ত ভীতু। সামান্য কারণে অযথা হৈ চৈ বাধাও। আমার ঘুম আসছিল না, তাই তোমাকে জাগিয়েছি, ব্যস্।'

'কিন্তু ঠিক সময়ে সারাবার বন্দোবস্ত করলে মন্দ কী ?'

'পাগলী আর কি। তার আবার বন্দোবস্ত কী করবে ? এই খানিকক্ষণ পরে সেরে যাবে।'

তারপর আমি কিছু বললাম না। কিছুক্ষণ অমনি কেটে গেল। কিন্তু ততক্ষণে তিনবার এপাশ ওপাশ ফিরলেন। তা দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। চট করে উঠে বললাম, 'এমন করে চলবে না, ঠিক কোথায়

ব্যথা বলোতো আমায়? তখন থেকে দেখছি তিন-তিনবার এপাশ ওপাশ করছ। দেখি কোথায় ব্যথা?'

অমনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কী করি, কেমন অসুস্থ মনে হচ্ছে। ব্যথা তেমন বেশী নয়, কিন্তু ততটুকুতেই কেমন অস্বস্তি বোধ করছি।'

'ফিক ধরলে কখনো কখনো ওরকম হয়। আমি তেল নিয়ে আসছি', এই বলে আমি উঠে রান্না ঘরে গিয়ে, উনুনে আগুন ছিল তাতে কাঠ দিয়ে ফুঁ দিতে লাগলাম। আগুন যতক্ষণে ধরছিল ততক্ষণে বড় একখানা ইঁটের টুকরো উনুনে পুরে রাখলাম। উনুনের উপরে জলের পাত্র চাপিয়ে, তেলের শিশি নিয়ে আবার ওঁর কাছে গেলাম। আমাকে দেখামাত্র উনি বললেন, 'আমার বড্ড মাথা ঘুরছে...' এ কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওঁর বমি হল। ওমা! দেখলাম যে সে বমি একেবারে লাল!...আবার বমি করবার জন্য উঠতে গিয়ে ধপ্ করে নীচে পড়লেন।

সে ঘটনা দেখামাত্র আমার সর্বাঙ্গ ভয়ে থর্ থর্ করে কাপতে লাগল। হাতের প্রদীপ টুপ্ করে ভুঁয়ে পড়ে নিবে গেল আর আমি চীৎকার করে ডাকলাম 'দাদা'। এমন সময় শুনলাম গোঁ গোঁ করতে করতে উনি বলছেন, 'ও কী? ও কি করছ পাগলের মতো?' আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হল, আর বুক থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল। তবু প্রথম আবেগ কম হওয়ামাত্র একটু হুঁশ পেয়ে আমি নিজেকে সামলে নিলাম, আর ওঁর কাছে গিয়ে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ আবার কী হ'ল? দাদাকে ডাকব? নানা সাহেবকে ডেকে আনব?' কিন্তু উনি শুধু হাত নেড়ে ইশারা করলেন 'না' আর মুখে শুধু বললেন 'উঁহু'।' কিন্তু আমি কি থাকতে পারি? আমি ভয়ানক অধীর হয়েছিলাম। এই রকমে রক্ত বমি হয়ে দু'তিন জনের কী হয়েছিল তা আমি আগে শুনেছিলাম, সে সব কথা আমার মনে পড়তে আমি অন্য কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। আমি সোজা গিয়ে দাদাকে ডেকে নিয়ে এলাম। দাদা শান্তিতে ঘুমিয়েছিল। আমার কথা শুনে সেও ভয় পেল। কিন্তু বাইরে বাইরে সে আমাকে বলল, 'যমু অত ভয় পেয়োনা। কারো কারো ও রকন কখনো কখনো হয়।' কিন্তু আমি কি তাতে সান্ত্বনা পাই? দাদা এসে ওঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'হঠাৎ কী হল?' কিন্তু স্পষ্ট উত্তর এলনা। তক্ষুনি 'দাঁড়ান আমি নানাসাহেব আর বিষ্ণুপন্তকে

ডেকে আনছি' এই বলে দাদা তাঁদের দু'জনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ডেকে নিয়ে এল। তাঁরা সে ব্যাপার দেখে মুখে বললেন, 'না, এতে ভয়ের কারণ কোনো নেই। রঘুনাথ রাও, এই একটু ও পাশে হন দেখি'। কিন্তু বিষ্ণুপন্ত আর দাদা ফিস ফিস করে বললেন, 'কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা বন্ধ করবার চেষ্টা করাই ভালো।' এই বলতে বলতে তাঁরা বাইরে গেলেন।

আমি একেবারে পাগলের মতো হয়ে এদিক ওদিকে ঘুরতে লাগলাম। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, নানাসাহেবের দিকে দেখছিলাম, আর বলছিলাম, 'এ কী হল হঠাৎ?' তাই শুনে উনি বলছিলেন, 'কী করব? আমি সত্যি কেমন অস্বস্তি বোধ করছি।' তাঁকে সাহায্য করা রইল দূরে। এমন সময় লক্ষ্মীবাই আর যশোদাবাইও ঘুম থেকে উঠে এলেন, আর আমাকে সাহস, সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। আমি বারবার এর মুখের দিকে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম আর জিজ্ঞাসা করছিলাম 'আর অমন বমি হবেনাতো?' কেউ সান্ত্বনাপূর্ণ দু'কথা বললে আমার মন একটু শান্ত হত। আরও পাঁচ মিনিট গেল। উনি পাশ ফিরলে কিংবা নিঃশ্বাস ফেললেই, 'আবার বমি হবে বুঝি' মনে করে ভয় পাচ্ছিলাম, এই রকম চলছিল। এমন সময় দুর্গাও উঠে এল। তাকে তো আমি আকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু মন্দ হবে না তো?'

অনেক ক্ষণ কেটে গেল। মনে হল যে উনি একটু ঘুমিয়েছেন। হঠাৎ আবার উঠতে গেলেন আর মুখ দিয়ে রক্ত বেরোল! তখন আমার মনের অবস্থা কী ভয়ংকর হল। আমি ভেউ ভেউ করে' কাঁদতে লাগলাম। আর 'মাকে ডেকে নিয়ে এসো কেউ' বলে ব্যাকুল ভাবে মিনতি করতে লাগলাম। মা সে সব কাণ্ড দেখে কী মনে করবেন, তাঁর মনের অবস্থা কী রকম হবে, সে চিন্তা আমার মনেও এল না। কেউ মায়াময় মানুষ আসবে আর কোনো নতুন উপায় করবে ভেবে, যে কেউ সেখানে ছিলনা তাকে তাকে আমি ডাকতে লাগলাম। মা নিচে গোপিককাকীমার কাছে শুতেন। তিনি এখনো এসব ব্যাপারের কিছুই জানতেন না। আমি দুর্গাকে 'যা ভাই মাকে ডেকে নিয়ে আয়' বলামাত্র উনি হাত উঁচু করে নেড়ে 'না না' এই রকম ইশারা করতে লাগলেন। আমি কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ওঁকে বললাম, 'আজ কেন এমন অসুস্থ হয়েছে?' তখন অতিশয় ক্ষীণ সুরে উনি বললেন,' কিছু না, তুমি অমন কেঁদো না।' কিন্তু আমি

কি না কেঁদে থাকতে পারি!

'দাদা, ডাক্তারবাবুকে তবু নিয়ে এসো। নানা সাহেব একেবারে নিশ্চিন্তে বসলেন যে!' এই বলে আমি চেঁচাতে লাগলাম। তখন দাদা বলল, 'যমু দিদিমণি, ওকী পাগলামি করছ? বিষ্ণুপন্ত অনেক আগেই ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছেন, এখুনি তাঁকে নিয়ে আসবেন। তুমিই যদি এরকম করতে আরম্ভ করো তা হলে আমাদের সকলের ধৈর্য থাকবে কেমন করে?' দাদা এ কথা বলামাত্র উনি ঈশারা করে প্রকাশ করলেন যে 'গা জ্বালা করছে বাতাস করো।' আমি তাড়াতাড়ি পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলাম। মনে মনে হাজার ঠাকুরদেবতাকে মানত করছিলাম। যোগেশ্বরী তলুজাপুরের ভবানী, কোলহাপুরের অম্বাদেবী,—কোনো ঠাকুরদেবতাকে বাদ দিইনি। কিন্তু আমার সর্বান্তঃকরণ ওঁর দিকে ছিল। দ্বিতীয় বার বমি হবার পর অনেকক্ষণ হয়েছিল, ভাবলাম যে বোধহয় আর বমি হবে না। আমি যার তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম 'আর বমি হবে না, না? এখন ঘুম আসবে?'

এমন সময় বিষ্ণুপন্ত ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এলেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমাদের বেশ জানাশুনা ছিল। তিনি অনেকবার আমাদের বাড়ি এসেছেন। তিনি এসেই পরীক্ষা করলেন আর বললেন, 'এতে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এখন এই করুন যে এঁর চারিদিকে দু'একজনের চেয়ে বেশী কাউকে থাকতে দেবেন না। এমন অবস্থায় একটুও গোলমাল করবেন না। গণপতিরাও, একেবারে সব্বাই যাক এখান থেকে।' অমনি নানাসাহেব নিজেই উঠলেন সেখান থেকে। বিষ্ণুপন্ত নিজের আর নানা সাহেবের স্ত্রীকে যেতে ইশারা করলেন। তাঁরা সবাই আমাকে যেতে বলতে লাগলেন। কিন্তু আমি ধরে বসলাম যে, 'যাবো না।' আমার পা কি সেখান থেকে বেরোতে পারে? দাদাও বলল, 'তুমি এখানে বসে গোলমাল করো, কাঁদো। তুমি এখানে বোসো না। দুর্গা দিদি ওকে কোনো মতে বাইরে নিয়ে যাও। আমি এখানে একা যথেষ্ট আছি। আর দরকার হলে বিষ্ণুপন্ত আর যশোদাবাঈ থাকবেন, কিন্তু যমু বাইরে যাক্।' কিন্তু আমি নাছোড়-বান্দার মতো বললাম যে, 'আমি কখনো এখান থেকে নড়ব না।' কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দিল না। লক্ষ্মীবাই আর দুর্গা আমাকে জোর করে সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেল। আমি তাদের পায়ে পড়লাম

আর বললাম, 'না গো না, আমাদের এমন করে বিচ্ছিন্ন করো না। কেন এমন করছ? মা গো মা। এ কাল-বমি কোথা থেকে এল।' এরকম চেঁচাতে চেঁচাতে বাইরে এলাম।

ঠিক সেই সময় মা কীসের গোলমাল তাই দেখতে উপরে এসেছিলেন। তাঁকে দেখেই আমার দুঃখের পরাকাষ্ঠা হল। 'আপনি তবু পাশে গিয়ে বসুন, দেখুন ভিতরে কী হয়েছে। হঠাৎ একী হল।' এই বলে চেঁচিয়ে তাঁকে একেবারে ভীড় করে ফেললাম। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোকার মতো আমাদের সকলের দিকে আর লক্ষ্মীবাইর দিকে দেখতে লাগলেন, আর দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী? আমার খোকার কি কিছু হয়েছে?' তক্ষুনি, 'ওমা হ্যাঁ। আমাদের অদৃষ্ট—কী ভয়ানক সে বমি। আমি এখানে এলাম আর গেলাম, মাত্র সেই টুকু অবসরে—দুর্গা দুর্গা, ভাই তুমি তবু গিয়ে দেখে এসো আবার বমি হল নাকি! আমায় যেতে দিচ্ছে না, তোমরা তবু বারবার গিয়ে দেখে এসে আমায় বলো উনি কেমন আছেন। সবাই এমন নিষ্ঠুর কেমন করে হলে গো?' এই রকম পাগলের মতো আমি কী বলছিলাম তার ঠিক নেই। আমার প্রলাপ অবিরাম চলছিল।

এমন সময় মা ওদিকে গেলেন। তাঁকে একবার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু তিনি আমার মতো আক্ষেপ করতে লাগলেন। তখন যশোদা-বাই আর গোপিকা কাকিমা যেমন তেমন করে তাঁকে বাইরে নিয়ে এলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, সকলে বললেন, 'আপনারা অত ভয় করবেন না। অসুখটা সত্যিই একটু অদ্ভুত, কিন্তু এত ভয় পাবার মতো কিছুই নেই। আমি এমন ওষুধ দিয়েছি, খাণিকক্ষণ পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া, আজ আমি এখান থেকে যাচ্ছি না। কিন্তু আপনারা এমন আক্ষেপ করবেন না। রঘুনাথরাও যেমন আপনার ছেলে, তেমনি আমি তাঁকে আমার ভায়ের মতো ভালবাসি। বৌদি, কাকিমা, আপনারা একটুও চিন্তা করবেন না। যদি আমাদের বৈদ্যক্রিয়ার কোনো কেরামত থাকে, তাহলে এই এখুনি চার ঘন্টার মধ্যে ওঁকে সুস্থ করে ফেলব দেখবেন।'

ডাক্তারমশায়ের এ কথা শুনে আমি মুহূর্তের জন্য কত ধৈর্য পেলাম। কিন্তু এরকম ধৈর্য কতক্ষণ টিঁকতে পারে? কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই

আমি, 'যাওনা, আবার বমি হয় নি তো?—দেখে এসো। ডাক্তারবাবু কী বলছেন শুনে এসো।' এ রকম প্রলাপ বকতে লাগলাম। কেউ না উঠলে নিজেই দরজার কাছে ছুটে যাবার জন্য উঠবার চেষ্টা করলাম, তখন একজন দরজা পর্যন্ত গিয়ে এসে আমাকে কিছু খবর দিতেন। মাকে গোপিকাকাকিমা আবার নিচে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি সেখানে বসলেন না বেশীক্ষণ। আবার উপরে এলেন আর আমার কাছে এসে 'মা, আজ আমাদের অদৃষ্টে এ কী?' এই বলে আমার কাছে বসে, আমার মতোই পাগলের মতো হয়ে ঠাকুর দেবতাকে মানত করতে লাগলেন।

এই রকম অবস্থায় কখন যে রাত পোহাল তা আমরা জানতেও পারিনি। আমরা একেবারে নিরাশ হয়ে অতিশয় আর্তভাবে মিনতি করছি দেখলে কেউ একবার ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনত আর তিনি আমাদের সান্ত্বনা দিতেন। এই রকম চলছিল। হঠাৎ আমি ভাবলাম যে গোপাল ঠাকুরকে 'তার' করা দরকার। আর আমি সে কথা খোশু-ঠাকুরপোকে বললাম। তখন প্রথমে একবার 'কেন? তাঁকে আবার ভয় দেখিয়ে দরকার কী?' ইত্যাদি তো হলই। কিন্তু আমি পাগলী ভাবছিলাম যে নতুন কেউ এসে ভালো ওষুধ দেবে। কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কি কম স্নেহের ছিলেন? কিংবা কম খাটুনি করবেন এমন ছিলেন? কিন্তু না, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আমি আর মা সনির্বন্ধ অনুরোধ করাতে নিরুপায় হয়ে তক্ষুনি 'তার' করলেন। এ দিকে ডাক্তারের যাওয়া আসা চলছিলই। ভিতরে কী চলছিল তার খবর কিন্তু যে যেমন বাইরে বেরুল তেমন তেমন আমাদের কানে এল; আর কিছু নয়। দুপুর বারোটা বাজল। তবুও আমাদের ওঘরে যেতে না দিয়ে, শুধু কখনো, 'উনি ঘুমিয়েছেন,' কখনো 'অনেকক্ষণ হল আর বমি হয় নি' ইত্যাদি খবর আসল। কিন্তু যারা খবর আনল তাদের সকলের চেহারা দেখে আমি ঠিক বুঝলাম যে তারা সত্যি ব্যাপার কী তা বলছে না। তাদের কথা একেবারে মিথ্যে মনে করে আমি আর মা দু'জনে ভিতরে গিয়ে বসবার জন্য অতিশয় কান্নাকাটি করতে লাগলাম। আমরা যত বেশী আক্ষেপ করতে লাগলাম, তাঁরা তত বাইরে থাকবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। 'আমাদের বিচ্ছিন্ন করে তোমাদের

কী লাভ? কেন মাকে-ছেলেকে আলাদা করে রাখছ?' এ কথা পর্যন্ত মার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল! কিন্তু কেউ তা গ্রাহ্য করল না।

বেলা দু'টোর সময় একজন সাহেব ডাক্তার এসে গেলেন। তখন আমি ভয়ংকর ভয় পেলাম। মনে মনে ঠিক করলাম যে তিনি ফিরে যাওয়ামাত্র নিশ্চয়ই ভিতরে যাব। কিন্তু অনেকক্ষণ যে ডাক্তার বাইরেই আসছিলেন না। তিনি যাবেন কখন আর আমি ভিতরে যেতে পাব কখন—এই ভেবে আমি অতিশয় উতলা হয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তো গেলেনই না, অথচ তাঁর লেখা দু'তিনখানা কাগজ হাতে করে আগেকার ডাক্তার বাইরে এলেন। তিনি আসামাত্র আমি একেবারে দীনের মতো, কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম 'কী? ডাক্তারমশাই কী বলছেন?' 'কিছু না, তিনি বলছেন যে বাইরে একেবারে শান্তি চাই। এখন কাউকে একেবারে গোলমাল করতে দেবেন না, তা হলেই হল। শুধু এই বলছেন।' এই বলে নানা সাহেবের হাতে কাগজগুলো দিয়ে চট্ করে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন আর তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ফেললেন।

তখন আমার মনের অবস্থা কী ভয়ানক হল! তেমন অবস্থায়ও কেমন গোঁ এল আর দরজায় ধাক্কা মেরে ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে করল, কিন্তু ভাবলাম যে না জানি তাদের কথাই যদি সত্যি হয়, তা হলে আপন হাতে কুঠারাঘাত করা হবে! আর আমি তেমনি মার কাছে বসে ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। কী করব? মা তো মালা হাতে করে জপ করতে লাগলেন। আমার অবিশ্রাম কান্না পাচ্ছিল, কিন্তু মার কাছে রয়েছি মনে করে যতদূর সম্ভব আমার কান্না চেপে রাখছিলাম। আমাদের মোটেই ওখানে যেতে দিচ্ছিলেন না বলে মাঝে মাঝে সবাইকে নিষ্ঠুর বলে ওদিকে যাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করলেও লক্ষ্মীবাই, দুর্গী আমাকে উঠতেই দিচ্ছিলেন না।

এমন সময় আরও একজন সাহেব ডাক্তার আর দু'জন আমাদের দেশী ডাক্তার এলেন আর তাঁরাও ভিতরে গেলেন। তাঁরা সেখানে বসে কী করলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমি বারবার জিজ্ঞাসা করলেও সকলে, 'কিছু না, ভালো আছেন, এই এখুনি সবাই মিলে নতুন ওষুধ দিয়েছেন, সেটা খুব ভালো। তিনি এখন আরোগ্য লাভ করবেন, আপনারা এমন ভয় পাবেন না। আপনারা ঘাবড়ে গেলে আমাদের

কোনো উপায় খাটে না—' এরকম নানা কথা তাঁরা বললেন। কিন্তু আন্দাজ সাড়ে বারোটার সময় আমি ঠিক করলাম যে যাই হোক্, যা হবার তা হবে, আমি ওঁর পাশে গিয়ে বসবই। এই ভেবে আমি চট্ করে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ভালো মন্দ কিছু ভেবে দেখলাম না। 'একী একী,' বলতে বলতে উপস্থিত সকলে দু'পাশ হলেন। সকলের মুখ একেবারে চুণ হয়ে গিয়েছিল।

রক্তে ভেজা রাশি রাশি কাপড় সেখানে পড়ে ছিল! সেই রাশি দেখে তক্ষুনি দাদার দিকে ঘুরে আমি বললাম, 'দাদা তুমিও এত নিষ্ঠুর হলে? তুমিও এসব আমাকে লুকিয়ে রাখলে?' কিন্তু সে 'যমু দিদিমণি, তুমি কি ভাবছ যে তুমি এখানে থাকলে এর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারতে?' শুধু এই বলে কাঁদকাঁদ মুখে একটু দূরে সরে গেল। আমি সটান গিয়ে ওঁর মাথার কাছে বসলাম। তখন সে অবস্থা দেখে আমার চোখের জল যেন শুকিয়ে গেল। কান্নাই আসছিল না। কী কারণ কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। তিন-তিন বার ওঁর বুকে, কপালে, হাত রাখছিলাম, উনি শুধু চোখ মেলে চেয়ে দেখছিলেন। আর কিছু করবার শক্তিই তাঁর ছিল না। হাত তুলবার শক্তি পর্যন্ত নেই, এপাশ ওপাশ করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই, এমন অবস্থা হওয়া পর্যন্ত নির্দয়ভাবে সকলে আমাকে দূরে রাখলেন দেখে আমি কী যে মনে করলাম তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই। এতটুকুও ভেবে দেখিনি যে আমি কাছে থাকলে কি অসুখ কম করতে পারতাম? কিন্তু না—আমি থাকলে কী যে হত ভাবছিলাম তা কিছুই বলতে পারছিনা। এক জায়গা থেকে উঠে অন্য জায়গায় বসছিলাম মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে বসছিলাম, হাত দুটি আমার হাতে ধরে ছিলাম, গায়ের কাপড় ঠিক করছিলাম, কখনো উনি কিছু বলছেন ভেবে ওঁর মুখের কাছে কান পাতছিলাম। এই রকম বারবার চলছিল। হঠাৎ ডাক্তার বাবুর দিকে ফিরে বললাম, 'আপনাদের সব ওষুধ ফুরিয়েছে? আমাকে তবে কোনো ভালো ওষুধ দিন, তা হলে ওঁর সঙ্গেই...'

আমার মুখ দিয়ে এই কথা শেষ হতে না হতেই ওঁর মুখ দিয়ে আবার সেই কাল রক্ত বেরিয়ে এল। তা দেখেই আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল আর আমি ধপ্ করে অন্য দিকে পড়ে গেলাম। এমনি কতক্ষণ গেল তা আমি বুঝতেই পারিনি। আমাকে সেখান থেকে তুলে কে কোথায়

নিয়ে গেল জানতেও পারিনি।

বহুক্ষণ মড়ার মতো পড়ে থাকব আমার অত পুণ্য কি ছিল? এই পোড়ারমুখীর কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরে এল। ঠিক অপরাহ্ণ সময়ে, আমাকে এনে কোথায় যেন কারা শুইয়ে রেখেছিলেন, আর আমার পাশে দুর্গী আর লক্ষীবাই বসেছিলেন। জেগে উঠেই আমি আবার খেপে উঠলাম। 'ওগো, কেন তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে? আমি তোমাদের কাছে এমন কী অপরাধ করেছি যে তোমরা আমাকে এমন যন্ত্রণা দিচ্ছ?' এই ভাবের কী সব বিড়্ বিড়্ করতে করতে—হ্যাঁ, ভাবেরই বলতে হবে, কেন না, তখন আমি কী বললাম আর কী করলাম তা কি এখন আমার মনে আছে? আবার জোর করে ভিতরে গেলাম; তখনো সবাই আগের মতোই বসেছিল। মাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি কাছে যাওয়ামাত্র উনি আমার হাতে নিজের হাত রাখলেন, আর আমার মনে হল যে ঠোঁট নেড়ে কী যেন বলবার চেষ্টা করছেন! আমি 'দাদা, দাদা' বলে চেঁচালাম। দাদা কাছে এল। দাদার হাত ধরে আমার দিকে চাইলেন, আর মুখের ভাব এমন করলেন যে তাঁর বোধহয় আমাকে কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল।

তখন আমার কোথা থেকে ধৈর্য এল কী জানি! আমি কোনো গোলমাল না করে ওঁর মুখের কাছে আমার কান পাতলাম, তখন 'মাকে—দূর—কোরো না—কেউ—নেই—শংকর মামা—'শুধু গোটাকতক এই শব্দ আমি শুনতে পেলাম। আবার দাদার দিকে মুখ করে অস্পষ্ট ভাবে বললেন, 'পলিসি—বাক্সর—' তার পর ওঁর কী বলবার ইচ্ছা ছিল সে সব ওই দু'টি শব্দের পরেই যে বমি হল তাতে মিলিয়ে গেল। সর্বাঙ্গ কেমন একটা অদ্ভুত মোচড় দিল! আমি চীৎকার করে বললাম 'মাকে অন্ততঃ ডেকে নিয়ে এসো।' আবার 'আমি কি তোমার কথার বাইরে?—এই বলে, ওগো, তবে কেন এখন বাইরে চললে?' এই রকম কী যেন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ওঁর হাত শক্ত করে ধরে আমি স্পষ্ট বললাম, 'দাঁড়াও, আমাকে সঙ্গে আসতে দাও' আর ঢিপ করে জোরে মাথা খুঁড়লাম। এই পর্যন্ত আমার স্পষ্ট মনে আছে। তারপরে সব অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু সে অন্ধকার কি চিরকাল থাকতে পারে? মাথা খুঁড়লে যদি আঁধার হত, তা হলে অন্ত কোন্ সৌভাগ্যের অপেক্ষা করতাম?

তার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কী হল আমি জানিনা। সেই অবসরে আমার কী ভ্রান্তি হয়েছিল না মরণ হয়েছিল—কিন্তু আমি অভাগিনী কোথা থেকে মরণ পাব?—কিছু বুঝতে পারিনি। সেই ভ্রান্তি না কী তা যখন ভাঙল, তখন প্রথমে কানে শুনলাম—'আমি অলক্ষ্মী যেখানে যাব সেখানেই কি এই হবে?' একথা দুর্গা উচ্চারণ করেছিল। তার সামনে দাদা দাঁড়িয়েছিল। তারা বোধ করি জানতে পারেনি যে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কেন না, দাদা বলল 'ও কী কথা দুর্গা দিদি, তুমি কী দোষ করেছো? তোমার কী দোষ? মরবার সময় মা আমার কানে এই কথাই বলেছিল জানো? কিন্তু আমার তা মনেও ছিলনা, আর কখনো মনে পড়লে তাতে কোন তাৎপর্য নেই ভেবে আমি তা উড়িয়ে দিতাম।' এই কথা বলে দু'জনেই স্তব্ধ হল। তখন তাড়াতারি উঠে আমি, 'দাদা, দাদা, তবে তুমি পুণায় কার সঙ্গে এখন ওকালতি করবে? তুমি একথা জানতে, তবে আমায় বলোনি কেন? আমি তোমার কথার বাইরে নই বুঝলে? এখন কোথায় যাব? এ্যাঁ? আমি আজীবন কারাবদ্ধ করেছিলাম, কিন্তু শিকল ভেঙে চলে গেলেন তো?' এ রকম কিছু কিছু প্রলাপ বকতে লাগলাম একথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে।

তার পর দু' তিনদিন বোধহয় আমার মাথার বিকৃতি, হয়েছিল, কেননা, সেই সময়ের কিছুই আমার স্পষ্ট মনে পড়ছেনা। মা কোথায় ছিলেন, দাদা কোথায়, আমি কোথায় কিছুই বোধহয় আমার মনে ছিল না। কিন্তু সে ভ্রান্তি কেটে আমি ভালোভাবে সচেতন কী করে হলাম তা আমার বেশ মনে আছে। আমি যে ঘরে বসেছিলাম সে ঘরে চার দিনের দিন সকালে বোধ হয় আর কেউ ছিল না। আমি দারুণ দুঃখে মাটিতে না একটা পুরোনো কাপড়ের উপর লুটিয়ে পড়ে ছিলাম। আমার পাশে হঠাৎ কার যেন পায়ের সাড়া পেলাম। আমি স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলাম 'ওকে? দাদা?' কিন্তু উত্তর পেলাম, 'দাদা নয় আমি বৌমা। যা হারিয়েছে তা তো ফিরে পাওয়া যায়না? কিন্তু লোকাচার মতো সব কিছু...'

এই কথা কানে শুনলায়, তক্ষুনি সে গলা আমি চিনতে পারলাম, আর বুক কেটে জোরে চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'দাদা!'—চোখের সামনে আবার সেই শেষের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। ওঁর শেষের সেই শব্দটা—'শংকর মামা—' যেন কানে শুনতে পাচ্ছি। এ রকম ধারণা হল। শুধু তাই নয়, স্পষ্ট মনে

হল যে সেই আমার প্রিয় মুখ দিয়ে, 'সাবধান, ও তোমায় সর্বনাশ করবে' একথা বেরিয়ে আমার কানে প্রবেশ করছে। স্বপ্নে যেমন কোনো ঘটনা সত্য মনে হয়, তেমনি শেষের সেই সমস্ত দৃশ্য আমি যেন স্পষ্ট দেখতে লাগলাম। ওর সেই শেষের কথা কানে গুনগুন করছিল, এমন সময় যখন সেই শংকরঠাকুররূপী যমের মূর্তি চোখে দেখতে পেলাম, তখন আমার বুক ফেটে গেল।

আমি 'দাদা' বলে চেঁচালাম, আর দাদা যখন এলনা, তখন সাহস পেয়েই বোধহয় শংকরঠাকুর এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি কি তাকে নরকে ঠেলতে চাও?' হে ভগবান! সে নিষ্ঠুর কথা শুনতে কেন আমাকে জীবন্ত রাখলে? তোমার কাছে আমি কোন অপরাধটা করেছি? কিন্তু ভগবানকেই বা দোষ দেব কেন? আমার অদৃষ্টে যা যা ছিল, তা ঘটল। শংকরঠাকুরের সেই কঠোর কথা মুখ বুঁজে শুনতে হল। বেশী কিছু বলতে পারছিলাম না। সেখান থেকে উঠেও যেতে পারছিলাম না। শুধু চীৎকার করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু সামনের সেই মূর্তি দেখে আমার জিভ যেন এঁটে জুড়ে বসেছিল। শংকর ঠাকুর এগোতে এগোতে কি বিড় বিড় করছিলেন, 'সবাইকে বলো যে ঠাকুরের কথা আমাকে শুনতে হবে। যাচ্ছেতাই সংস্কার ধরে বসে যাচ্ছেতাই আচরণ কোরো না। আমাদের বংশ কলঙ্কিত কোরো না। আগে যা সব হয়ে গেছে, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, বুঝলে বৌমা। তোমার ভাইটিও একটি অদ্ভুত লোক। সেদিন আমি কথা আরম্ভ করা মাত্র আমায় বলল, 'খুন করব'। তখন কী বলব?'

তাঁর প্রত্যেক শব্দ লোহার তপ্ত শিকের মতো আমার মর্মে ছ্যাঁকা দিয়ে মর্ম পুড়িয়ে ফেলল। তাঁকে চোখের সামনে থেকে দূরে সরাবার জন্য আমি ভয়ানক উতলা হয়েছিলাম, কিন্তু উপায় কী? আবার তিনি যখন বললেন, 'কী কথা বলছ না যে? ও নরকে পচবে তাই তোমার পছন্দ হচ্ছে?' তখন আমি হতাশ হলাম আর গায়ের সর্বশক্তি এক করে জোরে চীৎকার করলাম 'দাদা'! তক্ষুনি বাইরে থেকে সাড়া পেলাম 'আসছি', আর শংকরঠাকুর অমনি 'কাঁদো বসে। ব্যাটার অদৃষ্টে নরক থাকলে তুমি কী করবে? আর তোমার কারণে তার সর্বনাশই যদি অদৃষ্টে থাকে তাহলে আমাদেরই বা উপায়

কী? আমাদের নামের জন্ত আমাদের মন কেমন করে!' এইরকম বিড়্‌বিড়্‌ করতে করতে মশাই বাইরে গেলেন।

এমন সময় বাইরে শুনতে পেলাম, 'বাবা, তুমি বৌদির ঘরে গিয়েছিলে? এমন সময়ে তার ঘরে যেতে তোমার লজ্জা করল না?'

'চুপ কর্‌ বজ্জাত! মুখ দেখাসনে আমায়! সব ছোঁড়ারা কুল ধ্বংস করে ফেলছে।'

ধোণ্ডু ঠাকুরপো আর তার পিছু পিছু দাদাও ভিতরে এল, তক্ষুনি ছুটে গিয়ে আমি তার গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। কী হল তা সে বুঝতেই পারল না। সে আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল? ব্যাপার কী?' কিন্তু আমার মুখ ফুটে শব্দই বেরোচ্ছিল না, তখন আমি তাকে বলব কী? কিন্তু ধোণ্ডু ঠাকুরপো বললেন 'বাবা এখনি এখানে এসেছিলেন, তখন……'

তাই শুনেই ক্ষেপে আগুন হয়ে 'কে? কে? তোর বাবা এখানে এসেছিল? এই ঘরে? এঁ্যা?…' এই বলতে বলতে দাদা আবার বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম এখন না জানি কী কাণ্ড হবে!

শংকর ঠাকুর

আগের পরিচ্ছেদটি লেখার পর দেড়মাস পৌনে দু'মাস হল। এই সময়ের মধ্যে আমি সে কাগজগুলোর দিকে চেয়েও দেখিনি। দেখবার মতো মনের বলই আমার ছিল না। যখন দাদা আর আমি ঠিক করলাম যে, আমি আমার সমস্ত জীবন-চরিত লিখব, তখন নিশ্চয়ই আমি জানতাম যে এই অংশটাও আমাকে লিখতে হবে, তবুও যখন সে সব ঘটনা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে লাগলাম আর মনে হল যে সে সব আবার ঘটছে, তখন আমার মতো হতভাগিনীর মনের উপরে যা প্রতিক্রিয়া হবার তা না হয়ে কি থাকতে পারে? তার পরে কিছু লিখে দরকার নেই। যা লিখেছি তাই যথেষ্ট, এই মনে করে আর তা ছাড়া আমার কাশি আর জ্বর একটু বেড়েছিল, তাই আমি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবু হাতের এই কাজটি যদি শেষ হয় তা হলেই তার কিছু প্রয়োজন আছে এই ভেবে, আর দাদা'কে যা আশ্বাস দিয়েছি তা পূর্ণ হবার আগেই যদি আমার মরণ হয় তা হলে কী হবে, এই ভয়ে আবার ভাবছি যে সে লেখা আবার একেবারে আজকার ঘটনাগুচ্ছ লিখে শেষ করব। ভগবানের দয়ায় যা হবার তা হবে! আমাদের হাতে কী আছে! সম্প্রতি যা ভুগছি, কিংবা পরে যা ভুগতে হবে সেসব যন্ত্রণা চুপ করে সহ্য করে সে যন্ত্রণা শেষ হয়ে প্রাণটা কবে জুড়োবে—সে দিনের পথ চেয়ে থাকা, এর চেয়ে বেশি আমরা কী করতে পারি? যেদিন তাঁর ইচ্ছা হবে সেদিন তিনি নিয়ে যাবেন! ততদিন এই রকমই চলবে। থাক্ সে কথা।

কোন পর্যন্ত লিখেছি তাই দেখছি, আর দেখতে পাচ্ছি যে 'দাদা ক্ষেপে আগুন হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল' এইখানে এসে থেমেছি। আমি অবশ্যই ভাবলাম যে সে যখন আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে গেছে, তখন নিশ্চয়ই ভয়ানক ঝগড়া হবে! আর আমার ভয় করতে লাগল। ভাবলাম,

দিনগুলো কী রকম, আর এ কী কাণ্ড? তাড়াতাড়ি ধোণ্ডুঠাকুরপোকে বললাম, 'যান, যান আপনি পিছনে পিছনে,' কিন্তু তিনি বেচারী কী করবেন? তার পরে সত্যি কী হল তা আমি জানতে পারিনি। আমি ঘরের ভিতরে দুঃখমগ্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছি, আর এমন সময়ে এসে যেমন খুশি বলবার আস্পর্দ্ধা হল কী করে? লোকটার কি হৃদয় নেই? এ রকম অদ্ভুত ভাবনা আমার মনে আসতে লাগল। আজকেই যদি এই অবস্থা, তাহলে পরে আমার কী রকম অবস্থা হবে? এই চিন্তায় আমার মন ভয়ানক অশান্ত হল। আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল যে মাকে ছেড়ে আমি কক্ষনো থাকব না। কিন্তু শুধু আমি সংকল্প করলে হবে কী? সে কথা মার পছন্দ হলে তো? তিনি যদি শ্বশুরবাড়ি থাকাই ভালো মনে করেন, তাহলে এখন আমি বলব কী করে? আর আমিই বা থাকব কোথায়? বাপের বাড়ির সঙ্গেই বা এখন আমার মিল হবে কেমন করে? যখন কারো কিছু ধার ধারতাম না তখনকার কথা ঠিক ছিল, কিন্তু যখন নিরাশ্রয় হয়েছি, তখন যে কোনো অবস্থাতে আমার কষ্ট হবেই! এ রকমও কিছু কিছু ভাবনা হতে লাগল। ভাবলাম, আমার বন্ধু লক্ষ্মীবাই, যশোদাবাই এদের কাছে কি একথা প্রকাশ করব? তাদের মত কী তা জিজ্ঞাসা করব? এরকম ঝড় আমার মনে বইতে লাগল।

যে আমি তিনচারদিন আগেও ভাবছিলাম যে আমি স্বর্গসুখে ভাসছি, আমার মতো সুখী আমিই, সেই আমাকে আজ নরকের যন্ত্রণার চেয়েও অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে! এই আমার দুর্দশা! কিন্তু আমার কপাল ভেঙেছে, সুতরাং উপায় কী? এক দিনে আগের সব উজ্জ্বল আলো নিবে গেল, আর অন্ধকারে মুখ গুঁজে লুকিয়ে বসবার পালা এল। না জানি আমার মতো আরও কত অসহায় মেয়ে আছেন আর তাঁদের কত কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে! এ বিষয়ে যা কানে শুনেছিলাম তার উপর নির্ভর করে আমি প্রবন্ধ লিখতাম, বক্তৃতা করতাম, আর আজ আমি নিজেই সেই অবস্থায় পড়ে দুঃখের পাঁকে একেবার তলায় তলিয়ে গেছি! এ রকম কত কী যে আমি মনে মনে তোলপাড় করছিলাম তার সীমা নেই।

আমি এ রকম দুরবস্থায় পড়েছি দেখে দুর্গী আমার কাছে আসতেই চাইত না। সে ভাবতে লাগল, আর সে কথা সে কত বার স্পষ্ট প্রকাশ করল যে, সে যেখানে যাবে সেখানে কারো কক্ষনো কিছু ভালো হবে

না। তার এই চিন্তাধারা দেখে আমার জন্ত তার মনে কত দুঃখ হয়েছিল তা সহজে বুঝতে পারা যায়! যাক্।

আরও দুদিন পরে দাদা আমার কাছে এল। আর বলল, "যমুনা, যা হারিয়েছে তা আর ফিরে পাব না! কিন্তু এর পরে কী হবে? দেখতে পাচ্ছি যে তোমাদের শংকরঠাকুর তোমার শাশুড়ীকে তাদের বাড়ি নিয়ে যাবেন। তুমি তো বলছ যে মা'কে ছেড়ে তুমি একদণ্ডও থাকবে না। তুমি তাদের ওখানে যদি যাও, তা হলে তোমার কী হবে? শংকর-ঠাকুর তোমাকে একটুও শান্তি দেবেন না। আমার ইচ্ছে যে তুমি এর পরে আমার কাছেই বাস করো। এখন আমরা এখান থেকে প্রথমে বাড়ি যাব। মাস দুমাসের অভিজ্ঞতা দেখে—যদি সব ঠিকমতো হয়, তাহলে ঠিকই, না হলে অন্ত কোথাও যাব। কিন্তু এর পরে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থেকো না, আর আমি তোমাকে দূরে থাকতেও দেব না।"

আমি নিশ্চয়ই জানতাম যে কোনো একটা সময়ে দাদা এ কথা ভুলবেই। আর গোপালঠাকুরকে 'তার' করা সত্বেও তিনি না এসে যখন শংকরঠাকুর এলেন, তখন কোনো কিছুই ভালোভাবে হবে না এও আমি বেশ বুঝেছিলাম। প্রথম দিনই গণ্ডগোল হত; হয়তো হয়েও ছিল, কিন্তু আমি জানতে পারি নি। কিন্তু যে দিন শংকর ঠাকুর আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার দুঃখে ব্যথিত মর্ম পুড়িয়ে ফেললেন, সেদিন থেকে তিনি ঘরের এদিকে ওদিকে কী যেন খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন, এ কথাও আমি শুনেছিলাম। কিন্তু সে কথা আমি দাদাকে ঘুণাক্ষরেও বলিনি। আমি ভাবলাম, 'আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি! এখন এটা-সেটার জন্ত কি আমার সংসারে ঠেকবে?' দুর্গী আমাকে খবর দিত। আজকাল সে ঘরে সে থাকত; আমি আপন দুঃখে একটা ঘরে শুয়ে থাকতাম, মা অন্ত কোথাও থাকতেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। ঘরের বাইরে যেতে আমার মন কেমন করত। মা'র আমার কাছে আসতে ভালো লাগত না। লক্ষ্মীবাই কিংবা যশোদা-বাই একজন আমার কাছে থাকতেন। ঘরের কাজকর্ম সব দুর্গী করত, তাই সে শংকরঠাকুরের সব খেলা দেখতে পেত। আর সে সব সে এসে আমায় আগাগোড়া বলত। এক দিন আমার কাপড়চোপড়ের বাক্স খুলে দেখছেন, আর এক দিন আমার গয়নার বাক্স খুলে দেখছেন, এইরকম চলছিল।

সাতদিনের না আটদিনের দিন দিদিশাশুড়ী নিজে এলেন দশদিনের ক্রিয়াকর্ম সেরে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। তিনি এলে পরে দুঃখের প্রকাশ একটু হল, কিন্তু জনরীতি[১] মতো যা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল তা হল না, আর যখন দেখলেন যে তা পরেও হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন তাঁর গা জ্বলে উঠল। তাতে তেল ঢেলে দিতে শংকরঠাকুর প্রস্তুত ছিলেনই। এখন নিজের বুড়ীমার সাহায্য পেয়ে তাঁর যেন দ্বিগুণ স্ফূর্তি হল। আর তিনি দাদার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে এসে যাচ্ছেতাই কথা বলে আমাকে জ্বালাতন করতে আরম্ভ করলেন। যে ব্যাপার স্বামীর মোটেই পছন্দ ছিল না, তেমন বিপদ যেন আমার না হয়, আমি যেন স্বাধীন-ভাবে থাকতে পারি এই জন্য উনি সব ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার কৃত-সংকল্প ছিল যে, ওঁর মনের বিরুদ্ধ কিছু করব না। কিন্তু তাদের দু'জনের মুখের জ্বালায় আর হতাশ হয়ে আমি ভয় করতে লাগলাম যে না জানি কোন মুহূর্তে আমি ভাবব যে তাদের ইচ্ছামতোই না হয় হোক। যতটা সম্ভব আমি আমার মনকে শক্ত করেছিলাম, কিন্তু অতিশয় বাড়াবাড়ি হলে হঠাৎ কী করে বসব এই ভয় করছিল! ন' দিনের দিন এল, আর দশমদিন যেমন কাছে আসতে লাগল, তেমন দিদিশাশুড়ীর মুখ বেশী বেশী চলতে লাগল। সেদিন রাত্তিরে দাদা আমার ঘরে ঘুমোলো আর তিনি ঘরে আসা-মাত্র সোজাসুজি তাঁকে বলল, 'আপনি এঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমি কখন থেকে আপনাদের ঘ্যানর ঘ্যানর শুনছি। আমি যতদিন বেচে আছি ততদিন কেউ ওর শরীর স্পর্শ করতে পারবে না বলে দিচ্ছি। দশদিনও হয়নি, তোমরা এর মধ্যে আর কিছু ভেবে পাচ্ছ না? তোমাদের গয়না চাও তো নিয়ে যাও, আমার তোমাদের গয়নার কিংবা কানাকড়িরও দরকার নেই। কিন্তু কেউ যদি ওকে স্পর্শ......'

হঠাৎ দুর্গী বলল, 'এখনো কি গয়না না নিয়ে চুপ করে বসে আছেন ভাবছ? গয়না আর ভালো কাপড়গুলো ঢের আগেই শংকররাও গুটিয়ে নিয়েছেন।'

ওই হয়েছে! একেবারে হৈ চৈ কাণ্ড বেধে গেল। আমার কান্নার আর সীমা রইল না। এবার এ সব ব্যাপার কোথা পর্যন্ত গড়াবে কিছুই

১ এই উপন্যাস রচনাকালে স্বামী মারা গেলেই মেয়েদের কেশমুণ্ডন করবার নিষ্ঠুর প্রথা মহারাষ্ট্রে ছিল।

বুঝতে পারছিলাম না। তবু, তারপর দাদা চুপ করল, তাই অল্পেই শেষ হল।

দ্বিতীয় দিকে যাচ্ছেতাই বকুনি অবিশ্রাম চলছিল, কিন্তু শংকর ঠাকুর কিছু বলছিলেন না। শুধু দিদিশাশুড়ীর মুখ চলছিল, তিনি কী গজর গজর করছিলেন আর কী না করছিলেন, তার শেষ নেই। কিন্তু সেই বুড়ির সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে' লাভ কী? এই ভেবে দাদা চুপ করল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! এত সব গোলমালেও শংকর ঠাকুর কিছুই বলছিলেন না! গয়নাগাঁটি ইত্যাদি সব হজম হয়েছে মনে করে বোধহয় তাঁর আনন্দ হয়েছিল আর সেই আনন্দে শেষে তিনি দাদাকে বললেন, 'গণপত রাও, এমন রাগ করো কেন? আমরা পুরোনো লোক, আমাদের পুরোনো সংস্কার, সেইমতো আমরা উপদেশ দিতে গেলাম, তোমাদের পছন্দ না হলে আমাদের তো জোর নেই। আমরা কী এমন বিপদ চেয়েছিলাম? এখন যা ঘটেছে তাতে কারো কোনো উপায় নেই তো? তাই বুড়ি হয় তো মনে করল যে যা আমাদের বংশে কক্ষনো হয়নি, তা আজও যেন না হয়। ওর মনের ওই গঠন—যাক্ ছেড়ে দাও। আবার সে সম্বন্ধে আমরা ঘুণাক্ষরেও কিছু বলব না। হ্যাঁ, শুধু শুধু শত্রুতা উৎপন্ন হয়ে কাজ নেই। সে মারা গেল, তাই তোমাদের-আমাদের শত্রুতা হওয়া কি ভালো? সে যদিও আর নেই, তবু তোমার ভগিনী যে আমাদের বৌমা থাকবেন না, এমন তো হয় না? আমরা তাকে যত্ন করবই। তার মাথায় এমন কুঠারাঘাত হওয়ামাত্র আমরাই তো ছুটে এলাম? অন্য কেউ কি আসে? এমন রাগ করবেন না মশাই। ওহে তুমি আমি যদি এমন ঝগড়াঝাঁটি করি, তা হলে এদের দুজনের কী রকম অবস্থা হবে? এখন এ রকম করে কাজ কী? আমার মত এই যে আমাদের সকলেরই কাল এখান থেকে যাওয়া যাক্, আমার ইচ্ছে যে এখন সেখানে গিয়েই যা করবার তা করা যাক্। এখন তুমি আর আমি দু'জনে মিলে বিচার না করে দেখে কিছু করা হবে না।'

এই রকম আরও কত কী বিরক্তিকর ঘ্যান ঘ্যান তিনি করছিলেন। তাতে আমি কিছু মনে করিনি। কিন্তু দাদা একেবারে মুখ বুজে সব সহ্য করল, তার উপরে একটি কথা পর্যন্ত বলল না দেখে আমার তখন আশ্চর্য মনে হল, আর এখনো আশ্চর্য মনে হচ্ছে। সে অতিশয় শান্ত ভাবে বলল, 'ঠিক।

আপনার কথা বড় বিচার করে দেখবার যোগ্য। আমরা একসঙ্গেই যাব। কিন্তু আমি ওকে আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব না। ওকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব, তার পরে ওর যদি যেতে ইচ্ছে থাকে, আর আপনি যদি ওকে আসতে দেন, তা হলে ও আপনাদের বাড়ি আসবে। দশ দিন শেষ হবার আগেই ঝগড়ার একটা কারণ উৎপন্ন হওয়া আমার মতে ভালো নয়! কিন্তু যা খুশি অন্যায় কথা যদি আপনি আরম্ভ করেন তাহলে কিন্তু আমি তা সহ্য করব না।' দাদার সে শান্তভাব আর তাও শংকরঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার সময়, দেখে আমি অবাক্ হলাম।

যাই হোক্, তার কিন্তু খুব ভালো ফল হল। এ দিকে এ সব চলছিল তখন আমার মনে আলাদাই চিন্তাই ছিল। সেটা এই যে মা'র সঙ্গে আমার আড়ালে দেখা হবে কেমন করে, আর তাঁর সঙ্গে আমি আড়ালে দু'টি কথা বলতে পাব কেমন করে? তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর আর আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে বিচার করে দেখা দরকার ছিল; কিন্তু তা ঘটবে কেমন করে? শেষে আমি সে চিন্তা লক্ষ্মীবাই আর যশোদাবাইর কাছে প্রকাশ করলাম আর তাঁদের কোনো উপায় ভেবে দেখতে বললাম। গোপিকা কাকিমার দ্বারা সে-কাজ তত ভালো করে হবে বলে মনে হচ্ছিল না। তবু ভাবলাম যে তিনি যদি মাকে কখনো একলা নিয়ে আসেন, তাহলে আগে লক্ষ্মীবাই কথা আরম্ভ করবেন আর তার পরে আমি নিজে কথা বলব। ভয় শুধু এই ছিল যে একে তো সে রকম প্রসঙ্গ ওঠানো মুস্কিল, আর ওঠাতে পারলেও আমার মনের উদ্দেশ্য তাঁকে জানিয়ে তাঁর সেটা পছন্দ হওয়া আর স্বাধীনভাবে থাকতে রাজি হওয়া, এ এক মহা সমস্যা। আমি ভাবতাম যে নারায়ণ দুঃসহ অবস্থা এনেছেন এটা তো সত্যিই কিন্তু এখন আমরা দু'জনে একমন হয়ে এক সঙ্গে বাস করি, অন্ততঃ তিনি যত দিন বেঁচে আছেন তত দিন এক জায়গায় থাকি আর গত কালের স্মরণ করে, পরমেশ্বর যেমন রাখবেন সেই অবস্থায় দিন কাটাই সেই ভালো। কিন্তু তা সম্ভব মনে হচ্ছিল না।

একেবারে শেষে উনি আমাকে বলেছিলেন, 'মাকে দূর কোরো না। তাঁর কেউ নেই। শংকর মামা—' শংকর মামার সম্বন্ধে ওঁর না জানি কী বলবার ইচ্ছা ছিল। শেষে না জানি কী ভেবেছিলেন, ওঁর মনের অবস্থা কীরকম হয়েছিল, আমি কিছুই জানিনা। শেষ পর্যন্ত আমাকে কেউ কাছেও যেতে

দেয় নি, তাই না জানি আমাকে কতবার ডেকেছিলেন! ভালো থাকতে কখনো আমাকে এক মুহূর্তও চোখের আড়াল হতে দিতেন না। 'আমি এখন তোমাকে ছেড়ে কোথাও থাকব না, তোমার অপছন্দ কখনো কিছু আমি করবনা, তোমার জন্য অমুক করব, তোমার জন্য তমুক করব', সে সব এখন কোথায় গেল? পাতকুয়োয় অর্ধেক নামিয়ে দড়া কেটে ফেলার মতো হল।

এখন আমি করব কী? দাদাতে আমাতে বেশ মিল হবে, কিন্তু বৌদির সঙ্গে আমার বনবে কেমন করে? আমার উদ্দেশ্যমতো মা যদি থাকতে রাজি হন তা হলে ঠিকই। পুণা থেকে দিদিশাশুড়ী আর তাঁর পিছনে পিছনে শংকর ঠাকুর যদি না আসতেন, তা হলে হয়তো সে সব সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হত, কিন্তু এখন সে সব অসম্ভব হয়ে পড়ল। গোপিকা কাকিমাকে দিয়ে মা'কে ডেকে আনাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা নিষ্ফল হল। কেননা, তাঁকে কখনো একলা পাওয়াই গেল না। আর দ্বিতীয়তঃ জানতে পেলাম যে তিনি কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছেন। কারো সঙ্গেই কথা কইতেন না, আর যদি কিছু বলতেন তা হলে নিজেই তা বুঝতেন কিনা সন্দেহ! এমন অবস্থায় আমার মনের কথা তাঁকে বলে হবে কী?

আমি এমন চিন্তামগ্ন ছিলাম, আর সে অবস্থাতেই মা, দিদিশাশুড়ী আর শংকরঠাকুর সবাই পুণায় চললেন। দাদা বলল, 'আমরা এখন না গিয়ে পরে যাব।' কিন্তু আমি তার কথা মোটেই শুনলাম না। আমি তাকে বললাম যে 'আমি মার সঙ্গেই যাব, এই আমার সংকল্প। দাদাও আর সকলে আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন যে, 'তুমি ওদের সঙ্গে যেও না, পরে যেও!' শেষে আমি যখন দাদাকে স্পষ্ট বললাম যে, 'তুমি এখানে থাকো, কিন্তু আমি থাকতে পারব না।'—তখন সে আসতে রাজি হল আর আমরা সবাই রাত্তিরের গাড়িতে রওনা হলাম।

পুণায় ফিরে আসা

আজ পর্যন্ত আমরা পুণায় কতবার এসেছিলাম আর ফিরে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখনকার অবস্থায় আমার মনে কত চিন্তা ছিল তার কল্পনা কি কেউ করতে পারে? আমরা যখন প্রথম বোম্বাই গেলাম তখনকার আমার মনের অবস্থা আর এই সময়ের অবস্থার মধ্যে যা বৈষম্য ছিল তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবার ক্ষমতা তো আমার নেইই, কিন্তু আমার এই জীবনচরিতটি যাঁরা পড়বেন তাঁদের কত জনের হৃদয় এমন কঠোর হতে পারে যে তাঁরা সে বৈষম্যের কল্পনা করতে পারবেন না? সেই মা, আর সেই আমি, কিন্তু একটি বন্ধন ছিঁড়ে যাওয়া মাত্র তাঁর সঙ্গে শুধু কথা কইতেও আমার কত ভয় করতে লাগল। ওঁকে নির্ভর করে যে শংকরঠাকুরকে আমি একটুও ভয় করতাম না, সেই শংকর ঠাকুরকে কত ভয় করতে লাগলাম। মোট কথা. বোম্বায়ের কত সুখময় ঘটনা মনে পড়তে লাগল, আর সে সব কথা মনে পড়লে, এমন অবস্থায় মাথা খারাপ হয়ে আমি পাগল হইনি এটাই আমার আশ্চর্য মনে হচ্ছে!

গাড়িতে দুর্গী আমার পাশে বসেছিল। সে একেবারে চুপ করে বসেছিল। আমি তার অপরদিকে এক কোণে বসে হাঁটুতে মাথা গুঁজে আপন মনে কাঁদছিলাম। আমার অপর দিকে বেঞ্চির উপরে মা শুয়েছিলেন। আমার মনে হল যে তিনি বুঝি ঘুমিয়েছেন। তার অপর পাশের বেঞ্চির উপরে দিদিশাশুড়ী পা এলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিলেন। শংকরঠাকুর, ধোণ্ডুঠাকুরপো আর দাদা আলাদা কামরায় ছিলেন। রাত্তির তখন দু'টো, আমাদের গাড়ি খুব বেগে ছুটছিল। এমন সময় হঠাৎ মা অদ্ভুত কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে মাণিক, তোকে আর আমি ছাড়ব না, এমনি করে ধরে রাখব!' দুর্গী তাঁর মাথার কাছেই বসেছিল, মা তার হাত ধরে টানতে লাগলেন। সে অবশ্য ভয় পেয়ে আমার গায়ে ঘেঁষতে লাগল। হঠাৎ 'ওকী, আজ এমন কেন করছ?' এই বলে

মা হাসতে লাগলেন। তখন কিন্তু আমার মনে একটা অদ্ভুত সন্দেহ জাগল! ভাবলাম মার মাথার ব্যামো হয়নি তো? আর তক্ষুনি আমার কান্না উপচে এলো! আমি জোরে কাঁদতে আরম্ভ করলাম, আবার গোলমাল হল। দিদিশাশুড়ী জেগে উঠে তাঁকে ঘুমুতে অনুরোধ করতে লাগলেন, কিন্তু না, আমার সন্দেহই সত্যি হল। মা ঘুমিয়ে স্বপ্নে ওঁকে দেখলেন, আর দেখেই তাঁর যে ভয়ানক আনন্দ হল, সেই আনন্দেই তিনি মেতে রইলেন! তখন থেকে তিনি চোখের সামনে আর কাউকে দেখতে পেতেন না। পালা করে তিনি একবার হাসতেন, একবার কাঁদতেন, আর যা খুশি বলতেন। বোম্বায়ে তাঁর সঙ্গে আমার মোটে দেখাই হয়নি, কিন্তু একবার দুবার শুনেছিলাম যে তিনি কখনো কথা বলেনই না, আর যদি কিছু বলেন তাহলে সে কথা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন কি না সন্দেহ হয়। তার কারণ এখন আমি বুঝলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম যে সে সময় তা কেউ বুঝতে পারেননি আমার তো মনে হল যে তখন থেকেই বোধহয় তাঁর মাথা খারাপ হয়েছিল। এখন তো স্পষ্টই হল যে তিনি অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না!

তার পর আর তাঁর ঘুম এল না। কিছুক্ষণ গা এলিয়ে দিতেন, আবার উঠে বসতেন। হঠাৎ ওকে নাম ধরে ডাকতেন, আবার আমাকে ডাকতেন। মাঝে মাঝে বিড়্‌বিড়্ করতেন, আর গোপিকাকাকিমার নাম ধরে ডেকে আবার কিছু কিছু বলতেন।

পুণায় পৌছুনো পর্যন্ত এই রকম চলছিল। পুণা ষ্টেশনে গাড়ি থেকে নেমেই কোথায় যাব, কী করব, ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি অক্ষর পর্যন্ত না বলে. শংকরঠাকুর নিজের পোঁটলাপুঁটলি তুলে নিয়ে দিদিশাশুড়ির দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকিয়ে ধোণ্ডুঠাকুরপোকে বললেন, 'বারুদিদির হাত ধরে ওকে নিয়ে আয়'—আর সটান সামনে চলতে লাগলেন। আমি যাব কোথায়? দাদার সঙ্গে যাবো না তাদের সঙ্গে যাব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবু আমি মার দ্বিতীয় হাতটা ধরে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলাম। দাদা আর দুর্গী চুপ করে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে আমার সঙ্গে চলতে লাগল। ষ্টেশনের দরজার বাইরে আসামাত্র শংকরঠাকুর প্যাঁট্ প্যাঁট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মার যে হাতটা আমার হাতে ছিল সেটা খপ করে

ধরে টানলেন আর, 'তুমি আর তোমার ওই সংস্কারক দাদা যাও, যেথায় খুশি যাও। এখন কেন ওর হাত ধরছ? এখন তুমি আমাদের কে? আর আমরা তোমার কে?' এই কথা উচ্চারণ করে তিরস্কারের হাসি হেসে তিনি মাকে দিদিশাশুড়ীর দিকে ঠেলে দিলেন। আমার চোখ ছাপিয়ে জল এল, ভাবলাম বুঝি বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসবে। মাথা ঘুরতে লাগল। আর মনে হতে লাগল বুঝি ভুঁয়ে ভেঙে পড়ব। শংকর ঠাকুরের সেই দৃষ্টি আর হাসি আমার চোখের সামনে থেকে সরতে চাইছিল না। তিনি তক্ষুনি নিজের লোকদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমি পাগলের মতো তাঁর পানে চেয়েছিলাম, আর আমার চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল, লোকে হয় তো আমার দিকে চেয়ে দেখছে, তারা কী মনে করবে, ইত্যাদি কিছুই আমি ভাবিনি। দাদা আমার কাছেই হাত-দেড় হাত তফাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, তাও আমি জানতে পারিনি। কিন্তু সেও রেগে আগুন হয়ে একেবারে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। লোকে দেখছিল, তারা না জানি মনে মনে কী বলছিল, একথা সেও বোধহয় ভেবে দেখেনি। লোকে হাসলেও ভালো, কিন্তু রাগের ঝোঁকে দাদা কিছু করল না। কেউ বলবে না দাদা যে শংকর-ঠাকুরের দিকে তেড়ে মেড়ে ছুটে গিয়েছিল এটা কি খুব ভালো হল? না হলে স্টেশনেই তামাশা হত! আমি কাঁদতে কাঁদতে তার দিকে চেয়ে দেখলাম আর আস্তে বললাম 'দাদা'! অমনি যেন হুঁশ পেয়ে সে একটা গাড়ি ভাড়া করল। দুর্গাকে গাড়িতে তুলে দিল, আমাকে তুলে দিল, আর নিজে বসতে বসতে বলল, 'যমু দিদিমণি, আমি তোমাকে বলিনি যে তুমি ওদের সঙ্গে যেও না! আমি ঠিক ভেবেছিলাম যে এ বজ্জাতটা এই রকম করবে!'

'দাদা, তাতো সত্যিই। কিন্তু মার কেমন অবস্থা হয়েছে দেখলে তো? এমন অবস্থায় আমার তাঁকে ছেড়ে থাকা তুমি কি উচিত মনে করো? আমার মনে হয় যে যাই হোক্ না কেন, আমার পক্ষে এখন তাঁকে ছেড়ে দূরে বাস করা ভালো নয়।'

'বেশ, কিন্তু এখন গাড়িতে কথা-কাটাকাটি কেন?' এই বলে সে চুপ করল, আর সে কথা সেখানেই থামল। দুর্গাকে তার বাপের বাড়িতে ছেড়ে দিলাম। সে গাড়ি থেকে নামবামাত্র আবার আমার চোখ বেয়ে

অশ্রুধারা গড়াতে লাগল। কোন অবস্থায় দুর্গীকে নিয়ে গেলাম আর কোন অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে আনলাম! একথা মনে না এসে কি থাকতে পারে?

বাড়ি এসে আমি দাদার ঘরে গিয়ে বসা পর্যন্ত আমার কী যে মনের অবস্থা হয়েছিল, তা এখন আমি লিখতে পারছি না। তার চেয়ে সবাই তা মনে মনেই ভালো বুঝতে পারবে। আমাকে দেখে ঠাকুরমা না জানি কী মনে করেছিলেন! সংবাদ পাওয়ামাত্র যাবার তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কী জানি কী জন্য মাইসাহেব বাধা দিলেন, আর সে কথা ঠাকুরমা যখন আমাকে বললেন, তখন মাঈসাহেবের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে আমি কী মনে করলাম এসব কথার বর্ণনা এখন আমি মোটেই করতে পারছি না। আমার কলম এগোচ্ছেই না, আমি কী করব? বললাম যে মাঈসাহেবের নিষ্ঠুরতা দেখে আমি একটু অবাক হলাম। কিন্তু পরে গয়নার কী হল সে কথা যখন দাদা আমাকে বলল, তখন আমার বিস্ময় একটু কম হল। আর যখন জানতে পারলাম যে আমার একখানা চিঠি হাতে পেয়ে তিনি খুলে পড়েছিলেন, তখন সে বিস্ময় একেবারে গেল।

শুনলাম যে মাঈসাহেব বলেছিলেন, 'ওর শাশুড়ীরা ওখানে আছেন। সেখানে গিয়ে গয়নার জন্য তাদের সঙ্গে ঝগড়াই করবেন তো? ওর সেই দিদিশাশুড়ীটি বড়ো দজ্জাল, আর মামাশ্বশুরও বড়ো গরম মেজাজী। একটা বিষম কাণ্ড বাধবে! ইনি আবার গিয়ে সে দুঃখ দেখে দরকার কী? গণপতরাও আছে, নিয়ে আসবে ওকে!' শুনে দাদার ভয়ানক রাগ হল। কিন্তু পরে সে আড়ালে আমাকে বলল, 'এক দিক দিয়ে বেশ হল, ঠাকুরমা গেল না, কিছু মন্দ হয় নি।' এই আমার ফিরে আসার বৃত্তান্ত।

কাল সব কিছু সুখিস্তত করে, একথা মিথ্যা নয়। আমার মনের দুঃখ কাল যদিও আজও কিছু কম করতে পারিনি, তবু তখনকার সেই দুঃখের আবেগ আস্তে আস্তে করতে লাগল। পোনর দিন হয়ে গেল। আমার ঘরের বাইরে যাওয়া অসম্ভব তাই মার খবর কিছুই পেতাম না। রোজ আমি দাদাকে অনুরোধ করতাম, 'তুমি একটু গিয়ে খবর নিয়ে এসো। তিনি যতদিন আছেন, ততদিন আমাকে তাঁর ওখানে যেতে হবে। সম্ভব হলে তাঁর কাছে থাকতে হবে।' কিন্তু সে কথায় সে মোটেই কেয়ার করত না। শেষে একদিন আমি তাকে বললাম, 'দাদা, এখন যদি তুমি তাঁকে

দেখে না আসো, তা হলে আমি যেমন খুশি করব, নিজেই ওবাড়ি যাব।' এই রকমে আমি যখন মাথা কুটতে লাগলাম, তখন তার পরের দিন দাদা ওখানে গিয়ে মাকে দেখে এসে বলল, 'তাঁর মাথার ব্যামো তেমনি আছে, আর তাঁর জ্বর হয়।' সে কথা শুনেই আমার বুক কেঁপে উঠল। 'মাকে দূর কোরো না', ওঁর এই শেষ কথা আমার কানে গুন্ গুন্ করতে লাগল। সেখানে যাবার কী উপায় করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম শংকর-ঠাকুর যদি সেখানে আমাকে দেখতে পান তাহলে তিনি কী বলবেন? কী করবেন?

দাদাকে বলে খোশুঠাকুরপোকে ডেকে আনালাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'পিসিমার শরীর খুবই খারাপ হয়েছে, তিনি আর কিছুই বুঝতে পারেন না। সব সময় তোমাকে আর (ওঁর নাম করে বললেন) ডাকেন; গোপাল ঠাকুর কতবার তোমাকে একবার নিয়ে আসবার কথা পেড়েছিলেন, কিন্তু বাবা (শংকরঠাকুর) 'অমন অনাচার আমাদের বাড়িতে চাইনে' বলে মাথা নাড়লেন।' এই কথা শুনে আমার মনের অবস্থা কী ভয়ানক হল! একবার ভাবলাম, তাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হোক্। কিন্তু তক্ষুণি ওঁর মূর্তি আমার চোখের সামনে আসত, আর মনে হত উনি বুঝি তিরস্কারও পূর্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আবার ভাবতাম যে এইটুকু হলেই কি শংকরঠাকুর আমাকে সুখে থাকতে দেবেন? তবে এ চিন্তা করেই বা কাজ কী? এই রকম চলছিল।

দাদা দু'তিনবার গোপালঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলেছিল যে আমার সেখানে যেতে বড় ইচ্ছে করে। এই অবস্থায় আরও পোনর দিন গেল। এই এতদিনের অবসরে একটি কথা আমার একেবারেই মনে ছিল না। একেবারে শেষে উনি দাদাকে যে দু'টি কথা বলেছিলেন সেই দু'টি কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। দাদা আর বোম্বায়ের লোকেরা দরকার-মতো সব কাজ করছিলেন। একদিন দাদা নানাসাহেবের এক-খানি চিঠি পেল, তিনি লিখেছিলেন, 'আপনার নির্দেশমতো সব কাজ হয়েছে। এখন টাকা আদায় করতে হবে। সহি করবার জন্য কাগজ পাঠিয়েছি। দরকার মতো ব্যবস্থা করবেন।' সে সময়ে সে কথা বললে আমার বড়ো দুঃখ হত, তাই দাদা তাদের সে কাজের সম্বন্ধে আমাকে একটি অক্ষরও জানতে দেয়নি। কিন্তু এখন আর উপায় ছিল না। আর

কিছুদিন হয়েছেও, এই মনে করে সেদিন রাত্তিরে দাদা সে কথা আমাকে বলল। তখন আমার এত কান্না পেল যে তা বলবার জো নেই। ভাবলাম যে এখন টাকা নেবার চেয়ে কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা করি সেই বেশ। সেই লক্ষণ বুঝতে পেরে দাদা সে কথা ছেড়ে দিল আর অন্য কথা আরম্ভ করল। তার পর দিন আমি নিজে থেকে তাকে বললাম, 'কোনো আপত্তি নেই, তুমি গোপাল ঠাকুরের ওখানে যাও আর তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা করবার তা করো। মাকে নিয়ে আলাদা বাস করতে তো এখন পারব না। এই কাজ তবু করো যে গোপালঠাকুরের পরামর্শ মতো যা করবার তা করে যা কিছু আছে তা মাকে দিয়ে ফেল। তিনি থাকতে আমি আমার হাতে কিছু নেব না।'

আমার সে কথা শুনে দাদা বহুভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল, কিন্তু আমি তার কথা মোটেই শুনলাম না। তাকে স্পষ্ট বললাম, 'আজীবন যিনি ভরণপোষণ করেছেন তাঁর তত্ত্বাবধানেই সব কিছু থাকা উচিত। আর যতদিন ম. আছেন ততদিন আমি তোমার কথা শুনব না।' শেষে সে যখন দেখল যে আমি তার কথা শুনতেই চাইছিলাম না, তখন সে গোপালঠাকুরের ওখানে যেতে রাজি হল। গোপালঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে দুজনে সে বিষয়ে আলোচনা করলেন। তাঁদের কথাবার্তা শংকর-ঠাকুর জানতে পেলেন কি না তা আমি জানতে পারিনি। ধোণ্ডুঠাকুরপোর মুখে শুনলাম যে তিনি জানতে পেরেছিলেন। আর পরে যে সব ঘটনা হল তাতে তো স্পষ্টই বুঝলাম যে তিনি জানতে পেরেছিলেন। সেই দিনই, না তার পরের দিন তাঁর মুখে এই বাণী ফুটল, ও 'যখন শুনতেই চায়না, তখন থাক সে কথা। কিন্তু ও যখন তার শাশুড়ীকে অত ভক্তি করে, আর শাশুড়ীও কত বার ওকে ডাকছে, তখন এক দিন ওকে নিয়ে এসো।' আর সেইমতো মাকে দেখতে আসবার জন্য আমি সংবাদ পেলাম। দুচারদিন পরে শংকর ঠাকুর নিজে এলেন। বাবার আর দাদার সঙ্গে দেখা করে 'বৌমাকে কখনো কখনো পাঠিয়ে দেবেন। শাশুড়ী আর বৌ দু'জনেই পরস্পরকে বড়ো ভালোবাসে। সে সর্বক্ষণ বৌমাকে নাম ধরে ডাকছে, ওকে পাঠিয়ে দেবেন।' এই খবর দিতে আর দাদাকে টাকার সম্বন্ধে কী খবর দিতে তিনি এসেছিলেন। পরে দাদার যখন গোপালঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল তখন সে জানতে পেল যে তিনি সে রকম কোনো সংবাদই পাঠাননি।

শংকরঠাকুরের মুখের সেই খবর এমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল যে তখুনি দাদার সন্দেহ হয়েছিল, হবেও বা—ভেবে সে সেই খবর চুপ করে শুনেছিল। গোপালঠাকুর স্পষ্ট 'না' বললেন না, বললেন যে, 'আমি খবর পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারেনি।'—ইত্যাদি কিছু কিছু বলে তিনি ইঙ্গিত করলেন যে 'পরের সব ব্যবস্থা সাবধানে গোপনে কোরো। শংকরদাদা যেন জানতে না পারেন। সেই ভালো।' আর ঠিক হল যে যা টাকা পাওয়া যাবে তা দরকার থাকলে আদায় করা যাক, না হলে জমা রাখাই ভালো। আমি তখন তাতে একটুও মন দিইনি। অল্প দিনেই সব ব্যবস্থা হল। শংকরঠাকুর কিন্তু তার কিছু জানতে পারেননি। দুতিন দিন বাদ বাদ তিনি আসতেন আর মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতেন। দাদাও মিষ্টি কথা বলে তাঁকে প্রলুব্ধ করে তাঁর মেজাজ খুশি রাখছিল। একদিক থেকে তাই ভালো ছিল।

শ্বশুরবাড়িতে

তাঁর সেই প্রলোভনে আমার এখন কী লাভ হল তা বললেই যথেষ্ট হবে। পরে তার পরিণাম কী হল তা এখুনি বলে দরকার নেই। কেন না, সে কথা আমার এর পরের জীবন কাহিনীতে (এর পরের জীবন মানে নরক যন্ত্রণার চেয়েও বেশী জ্বালাই তো!) আসবেই। যারা সেই ভয়ংকর মৃত্যুর বার্তা শুনত তারা—বিশেষতঃ মেয়েরা—বলত, 'অলক্ষী স্ত্রীটি বেঁচে আছে তো? তার কি মরণ হয়?'—আর তারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলত। 'ওগো, পাপ পাপ যাকে বলে তা কি দূরে? এই পাপ! আগের জন্মে কার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল, তাই এ জন্মে ভগবান কেড়ে নিলেন।' এ রকম বাক্য শুনে আমার মনের কী যে অবস্থা হত। আজ পর্যন্ত আমার জীবনে যে যে ঘটনা হয়েছে, সে সব আনন্দময় ছিল, তাই তার যথোচিত বর্ণনা আমি দিতে পেরেছি। দেখতে পাচ্ছি যে অনেক দুঃখের প্রসঙ্গও আমি বিস্তৃত-ভাবে লিখেছি, কিন্তু এর পরে প্রতিমুহূর্তে প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি বেশী দুঃসহ এইভাবে যে সব ঘটনা এল তার বর্ণনা আমি করব কেমন করে? যেটা যেমন মনে পড়বে তেমন লিখব, ব্যস। তবে তার পূর্বসূত্র ঠিক আছে কি না, আগে বলবার কথা আগে আর পরে বলবার কথা পরে বলছি কি না, তাও আমি নিজেই বুঝতে পারব কি না জানি না!

এই আমি বলেছি যে শংকরঠাকুর সেই টাকার আশায় প্রলুব্ধ হয়েছিলেন তাই আমার বড় লাভ হল। সে লাভটা এই যে আমি শ্বশুরবাড়ি যাবার অনুমতি পেলাম। যে শংকরঠাকুর আমাকে চোখের সামনে দেখতে পারতেন না, আমাকে ঘৃণা করতেন, সেই শংকরঠাকুর আমাদের বাড়ি এসে বাবাকে আর দাদাকে বললেন, 'ওর শাশুড়ীর অসুখ, ওকে পাঠিয়ে দিন। দুজনে যখন পরস্পরকে বড়ো ভালোবাসে, তখন ওকে পাঠিয়ে দিন। ওদের বিচ্ছিন্ন করে লাভ কি? হ্যাঁ, বৌমার এই ব্যাপারটা[১]

[১] বিধবা হওয়া সত্ত্বেও মাথায় ক্ষৌর না করা।

আমাদের রীতিনীতিতে মানায় না। কিন্তু বৌমা সম্প্রতি ওকথা পছন্দ করে না। এক বছর[১] হলে ও নিজেই বুঝবে, আর আমাদের মতো অনেক গেরস্তবাড়িতে এ রকম মেয়েরা আছেই তো? নিজের মেয়েকে অমন অবস্থায় দেখা কি সহ্য হয়?' এই অভিপ্রায়ের কথা বলে তিনি আমাকে শ্বশুরবাড়িতে যাবার অনুমতি দিলেন। তক্ষুনি আমি দাদাকে বলে যাবার আয়োজন করলাম। কেননা, মা'র শরীর দিনে দিনে বেশী খারাপই হচ্ছিল। তাঁর এমন অসুখ, পাগলের খেয়ালে তিনি আমাদের দুজনকে জোরে জোরে ডাকতেন, আর আমি বেঁচে থাকতে তাঁর কাছে না যাওয়ার চেয়ে মন্দ কী হতে পারে? তাই সেই অনুমতি পেয়ে আমার দুঃখে-পোড়া মন একটু সান্ত্বনা পেল এতে কা আশ্চর্য। এ সব আমি দাদাকে বললাম আর আমার শ্বশুরবাড়ি যাবার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলাম। সে শান্তভাবে সব শুনে শেষে আমাকে বলল, 'ষমুদিদিমণি, তুমি শ্বশুরবাড়ি যেও, কিন্তু সেখানে বাস করতে যেও না। রোজ তুমি যেও আর সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসো। সেখানে তোমার ভয়ানক কষ্ট হবে তা কি তুমি জানো না?'

'দাদা, এখন আমার যা হয়েছে, তার চেয়ে মন্দ কী জগতে থাকতে পারে? তবে আমি এখন শুকনো জ্বালার ভয় করব কেন? তাও মা'র শরীর যদি ভালো থাকত, তাহলে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর শরীর এ রকম, আর আমি বেঁচে থাকতে চুপ করে বসে থাকব কেমন করে?'

'না, আমি তা বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয় যে সেখানে তোমাকে অতিশয় জ্বালাতন করবে, সেটা বিচার করে দ্যাখো। অন্ততঃ আর ক'দিন সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসো।' আমি কিছুই বললাম না।

এটা ভাবতে বসবার সময় নয়—এই ভেবে একদিন সন্ধ্যার সময় শ্বশুরবাড়ি গেলাম। তখন আমার মনে হল যে সবাই তিরস্কার-পূর্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে দেখছে, কিন্তু আমি তা একটুও লক্ষ্য না করে সোজা মা'র ঘরে গেলাম। সেখানে তাঁর অবস্থা দেখে আমার মন হু হু করে উঠল। আমি তাঁর পায়ের কাছে বসতে গেলাম। একটু দূরেই দিদিশাশুড়ী বসেছিলেন,

১ যে মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর দশ দিনের মধ্যে কিংবা তার পরে যত শীঘ্র সম্ভব মস্তক মুণ্ডন না করতেন, তাঁরা সচরাচর মস্তক মুণ্ডন করতেন প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধের সময়।

তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'দূর হ, দূর হ। ওর জল অপবিত্র হবে, ছুঁসনে।' মাকে দেখে আমার কান্না উপচে এসেছিল, তবু আমি অতি কষ্টে সে কান্না চেপে রেখেছিলাম, কিন্তু দিদিশাশুড়ীর সে কথা শোনামাত্র আমার সেই কান্না জোরে বেরিয়ে পড়ল আর আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলাম। তাই দেখে দিদিশাশুড়ী কিছু বললেন না। কী জানি, হয়তো আমার দুঃখ দেখে তাঁর মন একটু গলেছিল।

কিন্তু আমার দুঃখের ঘায়ে নুন ছড়িয়ে দেবে এমন লোকের কি অভাব ছিল? বড়ঠাকুরঝি সেখানে ছিলেন, দেখতে পেলাম যে তিনি যেন কী বলে আমাকে যন্ত্রণা দেবেন তাই ভাবছিলেন। আমার কান্না শুনে তিনি চট্ করে বললেন, 'ও কী বৌদি? আমাদের ভরা ঘরে, একেবারে সন্ধ্যে-বেলায়,এমন অলক্ষ্মীর মতো কাঁদছ যে।' তাঁর সেই কথা যেন তপ্ত লোহার মতো আমার বুকে ছ্যাঁকা দিল। তাই সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেইটুকু বলে তার কথা শেষ হল না, তিনি আবার বললেন, 'তোমার কপাল পুড়েছে, তা আমাদের ঘরে জ্বালা কেন?' এ রকম কথা শুনে আমার মনের কি অবস্থা হল তা কল্পনা না করাই ভালো! তক্ষুনি গিয়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করল, কিন্তু প্রাণটা তো পোকা মাকড় কিংবা পিঁপড়ে নয় যে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেললেই হল!

শ্বশুরবাড়ি যাওয়া মাত্র যখন এই অভ্যর্থনা হল তখন পরে আমার অবস্থা কেমন হবে তা বেশ বুঝতে পারলাম। তবু আমি সংকল্প করেছিলাম যে, যাই হোক সেদিকে লক্ষ্য না করে আমার মন শক্ত করে নিজের শাশুড়ীর জন্য সেখানে থাকব। তখন কার সাধ্য আমাকে বাধা দেবে? আর ঠিক করলাম যে আমি নিশ্চয়ই যাব আর মা'র পায়ের দিকে বসে অন্ততঃ তাঁকে চোখে দেখব। সেইমতো আমি রোজ শ্বশুরবাড়ি আসতে লাগলাম। কিন্তু সেই দুঃখে অল্প একটু সান্ত্বনা ছিল যে শংকরঠাকুর আমাকে তত্টা জ্বালাতন করছেন না। তিনি শুধু এই বলতেন যে, 'লোকে হাসে কী উপায়? বৌমা এখনো বুঝতে পারে না; এখন তাতে কী শোভা? আস্তে আস্তে ওর মন প্রস্তুত হবে, তখনই ঠিক হবে।' বাকী মামীশাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী, বড়ঠাকুরঝি ইত্যাদি প্রত্যেক জন প্রতি মুহূর্তে 'হেন কোরো না, তেন কোরো না, ওটাতে হাত দিও না, সেটা ছুঁয়ো না,' এই বলে আমাকে অবহেলা করত।

একদিন মার কাছে কেউ ছিল না, আমি একা বসেছিলাম। এমন সময় তিনি মাথার দিকে হাতড়াতে লাগলেন, তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী চাই?' তক্ষুণি তিনি বললেন, 'জল', অমনি আমি আত্মহারা হয়ে চট্ করে তাঁর জলের ঘটি থেকে জল ঢেলে জলের পাত্র তাঁর মুখের কাছে ধরলাম। ঠিক সেই সময়ে বড়ঠাকুরঝি সেখানে এলেন। ওই হয়েছে! আমি মাকে জল খাইয়েছি বলে হৈ চৈ বাধিয়ে তিনি দিদিশাশুড়ীকে নিয়ে এলেন। তখন তিনি কী ভয়ানক বকতে লাগলেন। যাচ্ছেতাই বকে তিনি আমার বিড়ম্বনা করলেন। তাঁর সে কথা লেখা ভালো নয়, কিন্তু থাকতে পারছি না, তাই লিখছি—'মাথার উপরের ওই রাশি একবার কেটে ফেলে, নষ্ট কর, তার পরে আমাদের বাড়িতে গিন্নিপনা করিস। পোড়ারমুখী যেন একেবারে হয়রান করেছে। বোম্বায়ে ওকে বিরক্ত করেছিস তাই যথেষ্ট হয়েছে, আর এখানে করতে হবে না, বুঝলি? ওর যা হবার তা নিরাপদে হোক। তুই এখানে আসিস বা কেন? মরি। মরি। শাশুড়ীর ওপর ভারি মায়া গো। এখন তোর কী?—শাশুড়ী মরল না বাঁচল তোর তাতে কী? যা, মাথার উপরের ওই ভারাটা একবার পরিষ্কার করে আয়, তারপরে আসবি—।'না, তার পরের কথা আর আমি লিখতে পারছি না। সে সব আমি মুখ বুজে সহ্য করলাম। আপন মনে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সে কথা দাদার কানে যেতে দিলাম না। সে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করত তা হলে বলতাম কিছু না, ভালো আছি, আর একান্তে গিয়ে কাঁদতাম। এই রকম চলছিল। মন খুলে কাঁদবারও সুবিধা ছিল না।

শ্বশুরবাড়িতে অবস্থা এই রকম ছিল। বাপের বাড়ির অবস্থাটা যদিও ততদূর গড়ায়নি, তবু আস্তে আস্তে মাঈসাহেব দুএকটা কথা বলতেন। তবু ঠাকুরমাকে একটু ভয় ছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সে ভয় বেশীদিন টিকতে পারল না। জলে ডোবা মানুষকে যেমন জল আরও বেশি টানে সেইমতো একবার সেই যে ভয়ংকর সংকট এল, তার পিছনে পিছনে একের পর এক বিপদ আসতে লাগল। বাপের বাড়িতে যে স্নেহময়ী আমাকে ভালোবাসতেন, আর সহায় ছিলেন, সেই আমার ঠাকুরমা হঠাৎ মারা গেলেন। অসুখ-বিসুখ নেই. কিছু না; আজ বেশ ভালো ছিলেন, আর কাল অদৃশ্য হলেন। সকালে গা ধুয়ে পুজো-টুজো করলেন, উপোস ছিল তাই

কয়েকটা চিনে বাদাম খেলেন, আর রাত্তিরে হঠাৎ পেটের অসুখ আর বমি আরম্ভ হয়ে মরেও গেলেন। তাই ভাবছি বোধহয় তাঁর ইচ্ছামতোই আমার একের পর একটা বিপদ হচ্ছিল। তিনিই কর্তা! তাঁর ইচ্ছামতো আমাদের রাখবেন। যেমন তাঁর খুশি। মরবার সময় কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরমা আমায় বললেন, 'যমু, এই যদি চার মাস আগে আমার মরণ হত তাহলে কী মন্দ হত? তোর এই দুঃখটা তবু চোখে দেখতাম না। কিন্তু তা কী হয়?' তাঁর একথা শুনে আমার মনে যে কী হল! 'জামাইবাবুর চেয়ে আমি মরলে কত ভালো হত!'—একথা তিনি তখন থেকে লক্ষ বার বলেছিলেন। যাক।

ঠাকুরমা মারা গেলেন। আমার পক্ষে সেটা বড়ো খারাপ ঘটনা হল। তিনি যদি থাকতেন তাঁকে আমরা চেয়েছিলাম। দাদার সংসার তিনি দেখতে পেতেন। কিন্তু তার সঙ্গেই কত রকম দুঃখ আর ভাবনা সহ্য করতে হত, তার সীমাই ছিলনা।

ঠাকুরমা মারা যাবার পর বাড়িতে মাঈসাহেবের সম্পূর্ণ রাজত্ব সুরু হল। দাদা অত্যন্ত বিরক্ত হল। তার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল যে অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে বসবাস করবে। কিন্তু সে যখন দেখল যে আমি কোনো মতেই নড়তে রাজি নই, তখন সে ঠিক করল যে সে এখানেই থাকবে। 'মার যখন অসুখ, তখন আমি অন্য কো' :ও যাব কেমন করে?'—এই আমার বিচার। আর কিছুটা দাদাও তা উচিত মনে করল। আমি থাকলে মার কোনো লাভই ছিল না।' তারা আমাকে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতে দিতনা। আমাকে শুধু চুপ করে তাঁর কাছে বসতেও দিত না। এতদূর অবস্থা ছিল, তবুও আমি রোজ গিয়ে তার পাশে বসতাম। আমার এ রকম একনিষ্ঠা দেখে পাথর পর্যন্ত হয় তো গলত, কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদের পাথরের মন গলল না।

সেখানে আমার পক্ষ নিতে শুধু দু'জন ছিলেন। একটি ছোটঠাকুর, দ্বিতীয়জন ধোণ্ডুঠাকুরপো। বেচারী গোপাল ঠাকুর বাড়িতে থাকবেন কতক্ষণ আর করবেন কী? মাঝে মাঝে যদি কখনো কিছু দেখতে কিংবা শুনতে পেতেন, তা হলে তিনি যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর কথায় কান দিত কে? সেই সময়টুকু সকলে 'আচ্ছা, আচ্ছা,' করত, আবার যা করবার করত। গোপাল ঠাকুরের যখন এই অবস্থা,

তখন খোণ্ডু ঠাকুরপোর কী রকম ছিল তা সহজেই বোঝা যাবে। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা ছিলেন, তাই ঠিক সময়ে ঠাকুরমাকে, আর যাকে খুশি যা খুশি বকতেন। দিদিশাশুড়ীকে প্রত্যুত্তর করতেন, যেমন খুশি বকতেন, আর কখনো কখনো—শুধু শুধু আমার জন্যই নয়—অন্য কোনো কারণেও তাঁর বাবার সঙ্গে বিষম ঝগড়া হত। বয়ুঠাকুরঝির সঙ্গে তো ওঁর কুরুক্ষেত্রই লেগেছিল। যেতে যেতে আসতে আসতে তিনি তাঁকে গালি দিতেন। না হলে তার স্বামীর সম্বন্ধে বিচ্ছিরি কথা বলে তাঁকে বিরক্ত করতেন। এই রকম চলত। কিন্তু তাঁরা দুজনে পরস্পরকে খুব ভালোবাসতেন। কখনো কখনো মার মাথার কাছে বসে পরস্পরের দোষ দেখিয়ে ঝগড়া করতেন কিংবা গালাগালি করতেন। তখন কোনো বিচার সম্ভ্রম বজায় থাকত না। মোটামুটি এই রকম অবস্থা ছিল।

বাপের বাড়ির ওরকম অবস্থা, আর শ্বশুর বাড়ির এরকম অবস্থা। তথাপি মার মুখ চেয়ে আমি দিন কাটাচ্ছিলাম। দেখলাম যে ভগবান আমার সম্পূর্ণ পরীক্ষা করবেন ঠিক করেছিলেন। দাদা শংকরঠাকুরকে সেই টাকার সম্বন্ধে প্রলুব্ধ করেছিলেন, কিন্তু সে প্রলোভন কতদিন টিকবে? সত্যি কী ব্যবস্থা হয়েছিল তা যখন তিনি জানতে পারলেন তখন তাঁর আচরণ বদলে গেল। এ রকম হবে তা আমি আগে থেকেই জানতাম। কেমন করে তিনি সেকথা জানতে পারলেন তা আমি জানতে পারিনি। কিন্তু যেই তিনি জানলেন যে, যে-টাকার উপরে তিনি লোভ করেছিলেন তা তিনি হাতে পাবেন না, ঠিক তখন থেকে মশাই আবার আমাকে জালাতন করতে আরম্ভ করলেন। অমনি যাচ্ছেতাই কথা বলা আরম্ভ হল, তাছাড়া অন্য কিছু আর তাঁর ভালো লাগত না। পদে পদে আমার কষ্ট হতে লাগল। ভয় হতে লাগল হয় তো সে বাড়ি যাওয়া আমার বন্ধ হবে। এদিকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে মার অসুখ আর মাথার ব্যামো বাড়ছিল। এমন অবস্থায় হতাশ হয়ে দুঃখে ভেঙে পড়ে কখনো কখনো আমি ভাবতাম যে শংকরঠাকুর আর অন্য সকলের মনের মতোই না হয় হোক্! এখন আমি যে কোনো অবস্থাতেই থাকলাম, তাতে কী আসে যায়। আর কখনো কখনো সেরকম কথা আমার মুখে বেরিয়ে যেত। এই রকমে আমি ভয়ানক চিন্তায় ছিলাম, এমন সময় একদিন লক্ষীবাই আর যশোদাবাইর একখানা চিঠি পেলাম :—

'বিনতি বিশেষ। আপনি এখান থেকে যাওয়া অবধি আপনাকে বিস্তৃত চিঠি লিখে আপনার কুশল জানবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দোয়াত কলম আর কাগজ নিয়ে লিখতে বসলেই কী লিখি ভাবতে ভাবতে মন বিচলিত হয়ে যেত, আর বাধ্য হয়ে আবার কাগজ কলম গুছিয়ে রাখতাম। এর আগে দু'তিন খানা চিঠি লিখেছি কিন্তু একটিরও উত্তর পেলামনা। কেন? সেদিন গণপতরাও-দাদার চিঠি পেয়ে জানতে পেলাম যে দিনে দিনে আপনি দুর্বল আর ক্লান্ত হচ্ছেন আর শ্বশুরবাড়ির লোকের জ্বালাতনে বিরক্ত হয়ে অভদ্র চিন্তা আপনার মনে আসতে আরম্ভ হয়েছে। তা কি ভালো? যা হারিয়েছে তা তো আর ফিরে আসবেনা? আমরা কতই আফশোষ করলাম, নিজের প্রাণে কতই বিরক্তি হল, তবু তাতে নিজের প্রাণেই কষ্ট আর দুঃখ ছাড়া আর তো কোনো লাভ হবে না? যিনি চলে গিয়েছেন বলে আপনি এ রকম করেন, তিনি কি তাতে শান্তি লাভ করবেন? বরং তিনি যদি স্বর্গ থেকে আপনার এই দুঃখ দেখতে পান, তা হলে তিনি কী মনে করবেন? এ কথা কেন দেখেন না ভাই? তিনি বেঁচে থাকলে আপনাকে এমন কষ্টে জীবন যাপন করতে দিতেন কি? প্রাণের অযত্ন করতে দিতেন? এই ভাবে আপনি আপনার শরীরের অবহেলা করছেন দেখলে তিনি কী মনে করতেন? আমরা সকলে বসে যখন যখন গল্প করতাম, তখন আপনার মতো দীন অবস্থার মেয়েদের কথা আরম্ভ হলে তাঁর কত কষ্ট হত, আর এমন মেয়েদের উন্নতি সাধন করবার জন্য কী কী করা দরকার, কিংবা তিনি নিজে কী করবেন ইত্যাদির সম্বন্ধে তিনি কী বলতেন, সে সব আপনার দুঃখের আবেগে আপনি কী একেবারে ভুলে গিয়েছেন? যিনি আপনাকে এত ভালোবাসতেন, তাঁর ইচ্ছা এই ভাবে ভুলে যাওয়া কি ভালো? এ সব আপনাকে লিখতে হবে, এমন নয়; কিন্তু জানতে পারলাম যে আপনি দিনে দিনে ক্ষীণ হচ্ছেন, স্বাস্থ্যের দিকে একেবারেই যত্ন করেন না, গণপতরাও-দাদার কথা শোনেননা, তাই না লিখে থাকতে পারিনা।

'শংকরঠাকুর আর অন্য সবাই আপনাকে জ্বালাতন করছেন, তা আমরা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। 'যে মারে তার হাত ধরতে পারা যায়, কিন্তু যে কথা কয় তার মুখ ধরতে পারা অসম্ভব', কিন্তু অতিশয় বাড়াবাড়ি হলে সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় কী? আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার স্বামী আপনাকে সব সময় এই উপদেশ দিতেন যে এমন

লোকের কথা অগ্রাহ্য করাই উচিত। তবে আপনি সেই মতো আচরণ করেন না কেন? আপনার সত্যি অবস্থা কী রকম তা আমরা জানিনা। দাদার মত এই যে আজকাল আপনি তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলেন না। এই অবস্থায় আমাদের কি সব কিছু জানতে পারা সম্ভব? আর আপনাকে কোনো উপায় জানাবার ইচ্ছা থাকলে তাও কি সম্ভব?

'দেখুন, অমন করবেন না। আপনি এই দীনের মতো অবস্থায় পড়েছেন এ কথা তো সত্যিই। কিন্তু তাতেও নিজের মতোই যাদের অবস্থা সে রকম অন্য ভগিনীদের উন্নতি সাধন করবেন ঠিক করলে আপনি যে কিছুই পারবেন না এমন নয়, আজই যে কিছু কাজ আরম্ভ করতে হবে তাও নয়। আপনারা আর আমরা যে ইস্কুলের কথা বলেছিলাম সেটা এখন দূরেই রইল; কিন্তু—যাক, এ সব পরের কথা। আগে আপনি নিজের অবস্থা বিস্তৃত ভাবে লিখে পাঠান দেখি। আমরা দু'জনে চাতক পাখীর মতো পথ চেয়ে আছি। সব দুঃখ, সব ভাবনা কিছুক্ষণ দূরে সরিয়ে, মন শক্ত করে আগে দোয়াত কলম নিয়ে মন খুলে নিজের অবস্থা কী রকম তা লিখে আমাদের জানাবেন। একটুও ইতস্ততঃ করবেন না। আমরা যদি আপনার সত্যি সত্যি বন্ধু হই, তা হলে আপনি নিশ্চয়ই লিখবেন। যদি পাঁচ-ছদিনের মধ্যে আপনার চিঠি না পাই তা হলে আমাদের একজন সেখানে এসে আপনার পিছনে থাকব। এই আমাদের দৃঢ় সংকল্প।'

আমার বন্ধুদের সেই চিঠি আমি কতবার পড়লাম। অন্য কেউ সে-চিঠি পেয়ে বিশেষ কিছু মনে করত না। কিন্তু আমি কী মনে করলাম তার বর্ণনা আমি করতে পারছিনা। দাদা আমাকে কত যত্ন করত, কত ভালো বাসত তা কি আমি জানতাম না? কিন্তু আমি একটু জিদ্ করলেই সে একেবারে মুখ ভার করে বলত, 'আচ্ছা', আর আলোচনার বিষয়টা ছেড়ে দিত। আমি যেন মনে একটুও ব্যথা না পাই, সেই জন্য সে কত সতর্ক থাকত। আমাকে সে এত ভালোবাসত, তাই আমার কোনো কথা পছন্দ না হলে সে শান্তভাবে আমার কথাটা শুনত। শেষে বোধ হয় সে মনে করল যে অন্য কাউকে দিয়ে কোনো উপায় করাই হয়তো ভালো হবে, আর তাই বোধ হয় সে ওরকম অদ্ভুত আর বিস্তৃত চিঠি তাদের দুজনকে লিখেছিল। তাদের সে চিঠি পড়েই আমি ভাবলাম, জগতের সব লোকই আমার বিরুদ্ধে নেই। আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে এমন কয়েকজন

এখনো আছে। আর গতদিনের অনেক ঘটনা মনে পড়ে কিছু প্রেম, কিছু দুঃখ ইত্যাদি মনের ভাব প্রবল হয়ে এত জোরে আমার কান্না উপচে এল যে একেবারে পরাকাষ্ঠা হল। অনেকক্ষণ যখন একান্তে বসে কাঁদলাম মনটা হালকা হল, আর সুবিচার মনে আসায় আমি ঠিক করলাম যে সে চিঠির উত্তর দেব।

কিন্তু যখন লিখতে বসলাম, তখন, কী লিখব ভেবে মনে সব গোলমাল হয়ে গেল। কত কথা আমার মনে এল! সে-সব কথা তাদের বলব কেমন করে? আর যদি বিস্তৃতভাবে সব ঘটনা লিখি, তা হলে দাদা সে চিঠি দেখতে পেলে কি মনে করবে? আমার তো বিস্তৃত লেখার ইচ্ছা ছিল। কেননা, মনের ব্যথা একবার কারো কাছে খুলে না বললে মন হালকা হয় না। তা ছাড়া, যশোদাবাই আর লক্ষ্মীবাইর মতো একনিষ্ঠ বন্ধুদের চিঠি পেয়েছিলাম। আমার চিঠিতে এমন অনেক কথা লেখা দরকার ছিল যা দাদা কক্ষণো জানতে না পারে, না হলে সে ক্ষেপে আগুন হত! এত সব ভেবে দেখে আমি চিঠিটা তো লিখলামই। তাতে কী কী লিখেছিলাম, কেমন কেমন লিখেছিলাম, তা এখন আমার মনে নেই। ছিল সব কান্নাকাটিই। বাড়িতে কি রকম কষ্ট পাই, মাঈ সাহেব কী রকম আচরণ করেন, কী ভাবে কথা বলেন, বৌদির কথা বলা কেমনতরো, তার স্বভাবের কত পরিবর্তন হয়েছিল, শং ্ব ঠাকুর কী বললেন, বন্নু ঠাকুরঝির মেজাজ কেমন আছে, তিনি কেমন কথা বলেন, দিদিশাশুড়ী কী বলেন,—সে কি এক কথা?—একবার লিখতে বসলাম, আর মনে কত কী ছিল, অবিরল তাদের সকলের বকুনি আর জ্বালাতন মনে পড়ছিল, সে সব লিখলাম, আর শেষে মা-র শরীর কেমন আছে লিখে, "আপনারা যা লিখেছেন তা সত্যি। আমার ও রকম করা উচিত নয়, কোনো পরোপকারী কাজে মন নিমগ্ন করা উচিত। অন্ততঃ বিনা-বেতনে কাউকে পড়ানো ভালো, কারো কোনো অভাব থাকলে নিজের ক্ষমতামতো সাহায্য করা দরকার, এই পথ আমিও দেখতে পাচ্ছি; তিনি আমাকে কিছু শিক্ষা আর জ্ঞান দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, সাধারণতঃ অভাবের জ্বালায় যেন পুড়ে না যাই, এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন, ভগবানের দয়ায় দাদার মতো ভাই পেয়েছি, কিন্তু, কিন্তু—মাকে এ রকম অবস্থায় ছেড়ে আমার দূরে যেতে ইচ্ছা করছে না। আর পুণায় বাস করে যদি এরকম কিছু করবার চেষ্টা করি, তা হলে শংকর ঠাকুর এক মুহূর্তও আমাকে শান্তি

দেবেন না। তাই মা যতদিন না আরোগ্যলাভ করবেন, ততদিন ওসব কিছু ভাবতে পারি না। আমার শরীর—সেটা এখন এরকমই থাকবে। তার ভালো আবার হবে কী? আর ভালো না হলে ঠেকছে কীসে? আপনাদের কারো আসার দরকার নেই।

"এই চিঠিটা আমি দাদাকে দেখাইনি। সে যেন এটা দেখতে না পায়, আর এতে যে সমস্ত কথা লিখেছি তা সে যেন জানতে না পারে এই আমার ইচ্ছে। তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করে শুধু এই বলতে চাই যে আপনারা যদি আমার সত্যিই বন্ধু হন্—তাহলে চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলবেন। একবার পড়বেন, দুবার পড়বেন, কিন্তু তার পরে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবেন। আমি যদি শুনি যে আপনারা আমার এই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেন নি, তা হলে আমার এত কষ্ট হবে যে তা আমি বলতে পারছি না। মাঈ সাহেবের, বিশেষতঃ বৌদির আচরণের সম্বন্ধে আর বকুনির সম্বন্ধে আমি যা লিখেছি তা আমি আমার মরণ হলেও দাদাকে জানতে দেব না। অতিশয় বাড়াবাড়ি হয়েছিল, কোথাও মন হালকা করতে পারলে বাঁচি—এ রকম অবস্থায় আমি ছিলাম, এমন সময় আমি আপনাদের চিঠি পেলাম; আর থাকতে পারলাম না। তাই যত কিছু জমাট বেঁধে ছিল সে সব লিখেছি। তাতে নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারবেন।"—এই রকম কী যেন সেই চিঠির শেষে লিখেছিলাম—এ কথা আমার বেশ মনে পড়ছে। আরও অনেক কিছু আমি লিখতাম, কিন্তু হঠাৎ ধোণ্ডু ঠাকুরপো শ্বশুরবাড়ি থেকে এলেন, আর বললেন যে পিসীমার (আমার শাশুড়ীর) শরীর বেশী খারাপ হয়েছে; আর তার সঙ্গে সঙ্গেই তার দ্বিতীয় মা—তাঁর মুখের কথা লিখব কেমন করে? তা লিখতে পারবই না—আমাদের দ্বিতীয় উমাশাশুড়ীর ঋতুদর্শন হয়েছিল সে খবরও তিনি দিলেন। তাই চিঠিটা তক্ষুনি শেষ করে, আমি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, একথাও বোধ হয় আমি চিঠিতে লিখেছিলাম। কিন্তু এখন তা ঠিক মনে নেই।

শ্বশুরবাড়িতে কেউ আমাকে আসতে বলেনি। কিন্তু ধোণ্ডু ঠাকুরপোর মুখে যখন শুনলাম যে মা-র শরীর বেশী খারাপ, তখন আমি নিজেই সেখানে গেলাম। তখন নতুন মামী-শাশুড়ীর ঋতুদর্শনের অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছিল। মিছিলের পাল্‌কি-টাঙাকির ব্যবস্থা হচ্ছিল। দিদিশাশুড়ী ভারি ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি এমন ভ্রূকুটি করলেন আর এমন

গালাগালি করতে লাগলেন যে তা বলবার জো নেই।—অত গালাগালি কেন?—এমন মঙ্গল অনুষ্ঠানের সময় এই অলক্ষ্মী বাড়ি এল কেন?—এই সব বলে তিনি যাচ্ছেতাই বকতে লাগলেন। তখন সত্যি আমার কান্না পেল তাতে কিসের আশ্চর্য? আমার কান্না দেখে দ্বিগুণ জোরে গালি বর্ষণ আরম্ভ হল। বললেন, বাড়িতে মঙ্গল অনুষ্ঠান, আর সময় না বুঝে আমি কাঁদতে আরম্ভ করলাম, মানে ব্যাপার কী? কিন্তু আমি কোনো কথা না বলে সটান মা-র বিছানার পাশে গিয়ে বসলাম। সেদিন মা-র শরীর সত্যিই বেশী খারাপ হয়েছিল। আর বাড়ির সবাই মঙ্গল অনুষ্ঠানের কাজে ব্যস্ত ছিল, তাই তাঁর কাছে আসবার কারো সময় ছিল না। আমিই তাঁর সেবা করবার জন্য সেখানে বসলাম আর চারদিন আমি তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতে পারলাম। সে চারদিনে তাঁর পেটের অসুখ বেড়েছিল। সে-সেবা আর কারো দ্বারা হবে মনে হল না, তাই বোধ হয় তাঁরা আমাকে বকাবকি না করে তাঁর সেবা করতে দেবেন ঠিক করেছিলেন। এখন কেউ তাঁর পাশে বসতেও রাজি ছিল না। একা দিদিশাশুড়ীই কখনো কখনো আসতেন। এই রকম অবস্থায় মা-র পাশ থেকে উঠতেও আমার মন হত না। ভাবলাম যে, এতদিন সকলের গালাগালি সহ্য করে এই লাভ হল যে মা-র সেবা করতে পেলাম। তাই সে চারদিন আমি বাপের বাড়িও গেলাম না। প্রথম দিন .িত্তিরে দাদা আমাকে নিতে এল, তখন আমি তাকে বললাম, "মা-র এমন অবস্থা, তাই আমি এখন যাব না।" সে-চারদিন আমি সেখানে ছিলাম। তাই শংকর ঠাকুরের সব শখ দেখতে পেলাম। দেখে আমার গা শিউরে উঠেছিল। থাক্ সে কথা।

সাত আট দিন পরে, মা-র শরীর একটু ভালো ছিল; আর দাদাও আমাকে নিতে এল। দিদিশাশুড়ী গর্জন করলেন, "যা। শাশুড়ীর জন্য তোর বড় মায়া! মরুক না শাশুড়ী ওদিকে! তোর তাতে কী? পোড়ামুখী, ওর প্রাণ ওদিকে ছটফট্ করছে, আর তুই বাপের বাড়ি চল্লি? যা। যদি কিছু দয়ামায়া থাকে তো সন্ধ্যেবেলা আসবি।" এ কথা শুনলে পরে আমার কি সাধ্য যে যাব? গেলামই না। তার পাঁচ ছ'দিন পরে নতুন শাশুড়ীর ফুলশয্যার অনুষ্ঠান ছিল। তার আয়োজন চলছিল। সেদিন আমি যাইনি, তাই দাদার বড় কষ্ট হয়েছিল। তবুও আমি গেলাম না। তার পরের দিন আমার মনে হল.কী জানি কেন, তারা ফিস্‌ফিস্ করে

কিছু আলোচনা করছে। আমার সম্বন্ধেই বোধহয় তারা কথা কইছিল। ব্যাপার কী তা বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু শংকর ঠাকুরের মুখের অস্পষ্ট কথা শুনতে পেলাম, "কী যে জ্বালা! লক্ষ্মীছাড়িকে অন্ততঃ চারদিন বাপের বাড়ি তাড়িয়ে দাও। বাবদেও ভট্ট বলছিল সে যাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, সে নাকি বলছে 'আমি যেতে পারব না,—আমার অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে।—" তার পরের কথা আমি শুনতে পাইনি। তার পরেই আমাকে বাপের বাড়ি যেতে কড়া হুকুম করা হল। যেন আমি ফুলশয্যার অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত—কিংবা একেবারেই যেন এ বাড়িতে না আসি! মা-র শরীর একটু ভালো ছিল, আর ভাবছিলাম যে ফুলশয্যার সেই আনন্দোৎসব দেখার দুর্ভাগ্য যদি এড়াতে পারি তা হলে ভালোই, সেই রকমই হল আর একটু সান্ত্বনা পেয়ে বাপের বাড়ি গেলাম।

শেষ ! ! !

যেদিন আমি বাপের বাড়ি গেলাম সেদিন দাদার চেহারা বড়ো ম্লান দেখাচ্ছিল। তাই তাড়াতাড়ি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সে চুপ করে রইল। তাই সে সময়টা অমনি যেতে দিয়ে পরে আবার জিজ্ঞাসা করব ঠিক করে আমি সে কথা সেখানেই ছিড়ে দিলাম। আমাদের সন্ধ্যা-বেলার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে পরে আমি তার ঘরে গিয়ে আবার সেই প্রশ্ন করলাম, তবুও সে চুপ করে রইল। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তবুও সেই অবস্থা! শেষে আমি তাকে স্পষ্ট বললাম, 'দাদা, তুমি কেন এমন করছ? আমি বারবার তোমায় জিজ্ঞেস করছি, তবু তুমি কিছুই বলছ না, এ কী রকম?' এ কথা আমি এমন ব্যাকুলভাবে বললাম যে সে আর থাকতে পারল না। সে হঠাৎ ধরা গলায় আমায় বলল, 'যমু দিদিমণি, আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি যে আমার বরাতে একটুকুও সুখ নেই। চার মাস আগে আমি কী আশা কে ছিলাম, কী পরিকল্পনা করেছিলাম, আর আজ··· ···আজ······' তারপর সে একটি অক্ষর পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারছিল না। তার সে অবস্থা চোখে দেখে আমার মনের কী রকম অবস্থা হল, তা কি বলতে পারি? কত কথা আমার মনে পড়ল! কত চিত্র চোখের সামনে দেখ্‌তে লাগলাম! তক্ষুনি আমি দাদার গলা জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলাম। আর কী করব? এই রকমে দুঃখের আবেগ একটু কম হলে আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। কেউ কিছু বলছিলাম না। অনেকক্ষণ পরে সে আমাকে আস্তে আস্তে বলল, 'এখন আমার যেসব কথা মনে পড়ল, তা কিছুই নয়, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো অদ্ভুত আর ভয়ংকর প্রসঙ্গ·········' কিন্তু হঠাৎ জিভ কেটে সে আমাকে বলল, তা যাই হোক্, কিন্তু তোমার শাশুড়ি কেমন আছেন?' আমি তাকে কিছু উত্তর দিতে যাব, এমন সময় মনে হল যে বাইরে কারা বুঝি ফিস্ ফিস্ করে কথা বলেছে। আমার মনে হচ্ছে যে দাদা বোধ হয় কিছু কিছু শব্দও শুনতে পেয়েছিল।

সে দরজা ঠেলে বাইরে গেল। অনেকক্ষণ সে ফিরে এল না। ঠিক সেই সময় আমি শুনতে পেলাম :—

'কী করব? হাজার বার বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আদুরে মেয়ে, তাকে কিছু বলবার সুবিধা নেই। কিন্তু এ কী ভালো? যার সঙ্গে দেখা হয় সে বলে 'ও কী, এত বড়ো মেয়ে—এখনো মাথার উপরে ওই চাকনি—লক্ষীছাড়িরা—না একটা উপায়—আঁর ভায়ের—।' তার পরের কথার দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। কেননা, ভয় করতে লাগল যে ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে মেড়ে, সে কথা যে ব্যক্তি বলছিল দাদা তার কী দুর্দশা করবে। আমি যদিও তার পরের কথা শুনতে পাইনি, তবুও সে বোধহয় শুনেছিল। সেই 'উপায়টি' বোধকরি তার মর্ম বিদ্ধ করেছিল। তার চেহারা অত্যন্ত উগ্র হল। সে পাগলের মতো এদিকে ওদিকে চাইতে লাগল। চট্ করে আমার হাত ধরে সে আমাকে আলোর কাছে নিয়ে গেল, আর আমার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে দেখে সে বলল, 'যমুনা, যা ঘটেছে তাতে আমার—তা কেন? স্বয়ং ব্রহ্মারও কোনো উপায় নেই! কিন্তু এটা আমি কখনো হতে দেবো না। যে হাত বাড়াবে তার গলা টিপে খুন করব।' একথা উচ্চারণ করার সময় তার চেহারা ভারি ভয়ংকর দেখাতে লাগল। সে যে কথা বলছিল তার চেয়ে তার চেহারা দেখেই আমার ভয় করতে লাগল।

আমি তাকে 'দাদা, হল কী?' এরকম কিছু বলতে যাব, এমন সময় সে আমার পিঠের উপর হাত রেখে বলল, 'ব্যস্, যাই হোক্ যমু, পরশু দিন আমার খেড়গাঁয়ে যাবার কথা। দু'দিনে, নয় তিনদিনে ফিরে আসব। কিন্তু এসেই চারদিনের মধ্যে আমি আলাদা বাসা করব। অন্য কিছু বিচার নেই। এরা দু তিনজনে মিলে কখন কী করবে তার ঠিক নেই। বাবা তো এখন আছেন কি না তাও বুঝতে পারা যায় না। হুঁ! এমন জমদগ্নির মতো মানুষ, এই একটা কারণে এত পরিবর্তন হয়! আমার মনে হচ্ছে যে তিনিও সেদিকে চোখ রাখবেন না। সে যাই হোক্—মনে যখন সন্দেহ জন্মেছে, তখন খুব সাবধানে থাকাই ভালো।' একথা যেন সে নিজের মনেই বলছিল। কেননা এখন সে আমার দিকে চেয়ে না দেখে, কোথায় যেন শূন্যে চেয়ে সে কথা আপন মনে বিড়বিড় করছিল বললেও বাধা নেই। আমি ভাবলাম, একথার উপরে আমি কি বলব? এমন সময় বৌদি জলের ঘটি হাতে করে এসে বলল, 'ঠাকুরঝি, এখন আমার ঘুম পেয়েছে, বুঝলে? ভাবছি যে এখনি

উঠবে আর খানিকক্ষণ পরে উঠবে…' তার পরের কথা শুনতে আমি কি সেখানে দাঁড়াই! চট্ করে উঠে চলে গেলাম। দেখলাম যে আমি গিয়েছি তা দাদা জানতেও পারেনি। আর তাই ভালো হল। না হলে স্ত্রীর সে কথা শুনে আর আমাকে চলে যেতে দেখে সে কী বলত তার আন্দাজ নেই। আর তার মনের অবস্থা ছিল ওরকম উদ্বিগ্ন!

আমি সেখান থেকে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম আর আমার কত কথা যে মনে পড়তে লাগল আর কত চিন্তা মনে আসতে লাগল সে সব যদি লিখি, তা হলে একটা গ্রন্থ হবে! তা ছাড়া সে সময়কার আমার চিন্তায় দুঃখ আর বিষণ্ণতা ছাড়া আর কিছু তো ছিল না! তাই বারবার ঘুরে ফিরে সেই কথা লিখে কাজ কী? সে রাত্তিরে আমার ছেলে বেলা থেকে সেদিন পর্যন্ত সব বিষয়ে মনে পড়ল। বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন হতে হতে আজ কোন অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছি, এর চেয়ে বেশী মন্দ অবস্থা কি থাকতে পারে? আমার মতো অভাগিনী মেয়ে না জানি কত আছে? তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে তাদের উন্নতি সাধন করবার জন্য আমি কা করতে পারি? যদি কোনো ইস্কুলে পড়াতে যাই, তা হলে কি কাউকে কিছু সাহায্য করতে পারব? না হলে বোম্বায়ের মিশনারি মহিলাদের মতো যেখানে সম্ভব গিয়ে, এ রকম অসহায় মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের কিছু শিক্ষা দিলে তারা কি অল্প কিছু ․ ন্তনা পাবে? যে মিশনারি মহিলারা পরোপকার করে জীবন যাপন করেন তাদের উঁনি কত প্রশংসা করতেন! 'আমাদের দেশের মেয়েরা যদি এমন হয়, তাহলে কত উপকার হবে!' এই কথা ওঁর মুখ দিয়ে কতবার বেরিয়েছিল! টাকাকড়ির দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে, আমার একার পেটের ব্যবস্থা হয়ে কিছু বেশি থাকতে পারে এমন ব্যবস্থা আছে, তবে আমি এরকমই কোনো পরোপকারের কাজ করে ওঁর ইচ্ছামতো জীবন যাপন করায় আপত্তি কী? তা হলে নিরন্তর ওঁর আজ্ঞা পালন করলাম এই সান্ত্বনা পাব। আমার আজীবন খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাই পেটের দায়ে আমার অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবার দরকার নেই। যখন খুশি আমি স্বাধীন ভাবে থাকতে পারি। এ কথা জানা ছিল, তাই বোধহয় আমাকে আর সকল অনাথ মেয়েদের মতো জ্বালা সহ্য করতে হতনা। কিন্তু যাদের পেটের দায়ে শ্বশুরকে, খুড়শ্বশুরকে, দেওরকে, কিংবা শংকরঠাকুরের মতো আত্মীয়স্বজনকে নির্ভর করে দিন

কাটাতে হয়, এরকম ভণ্ড লোক তাদের না জানি কত যন্ত্রণা দেয়! না জানি কত বিড়ম্বনা করে! না জানি কত নিষ্ঠুর আচরণ তাদের সঙ্গে করে! আমার অল্প অভিজ্ঞতার জোরে তার কল্পনা আমি করতে পারছিলাম। আমার নিজের অবস্থা সেরকম নয়, যেমন ইচ্ছা স্বাধীনভাবে থাকতে পারব, দাদার মতো ভাই আমার অনুকূল। এত সব থাকতে আমার এমনভাবে জীবন কাটাবার দরকার কী? কক্ষনো তা করব না।

এই ভেবে সেই রাত্রেই আমার লক্ষ্মীবাই আর যশোদা বাইকে একখানা বেশ লম্বা চিঠি লিখতে ইচ্ছা করল। ভাবলাম যে আমার এই চিন্তাধারা বিস্তৃতভাবে লিখে তাদের মত কী তা দেখি। কিন্তু অত রাত্তিরে দোয়াত কলম আর কাগজ কোথায় পাব? তাই তার পরের দিনই চিঠি লিখব ঠিক করে শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে লাগলাম।

ভাবতে ভাবতে আমার দুর্গীকে মনে পড়ল। আমার চেয়ে তার অবস্থা কত দুঃসহ ছিল! আজকাল তার স্বামী নাকি এখানেই ছিল, আর তাই সে বেচারি শ্বশুরবাড়ির দুয়োরের বাইরেও আসতে পারত না। পুণায় আসা অবধি তার সঙ্গে আমার দেখা নেই। কিন্তু শুনে জানতে পেরেছিলাম যে তাকে বোম্বাই নিয়ে যাওয়ার ফলে বিষম ক্ষেপে, দুর্গী ফিরবার দ্বিতীয় দিনই সে খবর পেয়ে সে তাদের বাড়ি গিয়ে গালগালাজ করে দুর্গাকে বাড়ি নিয়ে গেল। আর এখন অন্য কিচ্ছু কাজ নেই, খালি তাকে মারধোর করা, আর একটা নতুন কাজ আরম্ভ করেছিল—দুর্গীকে ঘরে দরজাবন্ধ করে রাখা! যখন শুনলাম যে সে দুর্গীকে যখন তখন মারধোর করে আর দরজা বন্ধ করে আটকে রাখে, তখন তাকে বোম্বাই নিয়ে যাবার জন্য আমার কত অনুতাপ হল। তাকে মনে পড়লেই আমি ভাবতাম যে আমি যদি তাকে বোম্বাই নিয়ে না যেতাম, তা হলে তাকে এই নতুন কষ্ট সহ্য করতে হতনা। তার কথা আর সঙ্গে সঙ্গে তার মতো আরো অনেক অভাগিনী মেয়ের কথা আমি ভাবতে লাগলাম। ভাবলাম পরোপকারের কাজ আরম্ভ করতে হলে আমাকে দূরে যেতে হবে না। বেচারি দুর্গীকে নিয়েই কাজ শুরু করতে পারব। তাকে আমার কাছে রাখতে পারলে ভালোই.........।

সে কী এক কথা? নানা রকমের চিন্তা মনে এসে ভাবতে ভাবতেই আমি ভোরের সময় ঘুমিয়ে পড়লাম, আর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। মনে হল

দুর্গী আমার কাছে এসে অবিরল কাঁদছে। 'যমুদিদিমণি অভাগিনী আমি যেখানেই যাই, সেখানে আমার সঙ্গেই দুর্ভাগ্যকে যে টেনে নিয়ে যাই—' এই রকম কী যেন আকুলভাবে বলে সে আমার দিকে চেয়ে আছে আর আমি কিছু কিছু বলে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। এই সব আমি স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছিলাম! কিন্তু কী আশ্চর্য! আগের দিন রাত্তিরে এই স্বপ্ন দেখলাম, আর ঠিক তার পরের দিন সত্যিই দুর্গী আমার সঙ্গে দেখা করতে এল! আর যা মনে তা স্বপনে, কিংবা যা স্বপনে তা মনে, এইমতো দুর্গীর চেহারা স্বপ্নে যেরকম দেখতে পেয়েছিলাম ঠিক সেইরকম ছিল। যখন বোম্বায়ে ছিল তখনকার চেয়ে কত শুক্‌নো কত রোগা দেখাচ্ছিল। শুধু অস্থিচর্ম। চোখ কত গর্তে ঢুকে গিয়েছিল, নাক কত উঁচু দেখাচ্ছিল—আমি তার দিকে চেয়ে দেখতেও পারছিলাম না। শুনেছিলাম দুয়োরের বাইরেও তাঁকে ছাড়ত না, তাকে দেখে তাই আমি অবাক হলাম। আর তক্ষুনি পরস্পরের চোখাচোখি হয়ে কান্না উপচে এল।

মাঈসাহেব কিংবা বৌদি যেন তা দেখতে না পায়, এই মনে করে আমি তাকে নিয়ে দাদার ঘরে গেলাম। সেখানে প্রথম আবেগ কম হওয়ামাত্র আমি তার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করলাম। সে যা বলল তা আমি যেমন শুনেছিলাম সেরকমই ছিল। শরীরের কত জায়গায় তার মার লেগেছিল, ঘা হয়েছিল, সেসব সে আম.র দেখাল। আসবার সময় সে তার খোকাকে নিয়ে আসেনি ; কিন্তু শুনলাম যে তার স্বামী তাকেও বিষম মারত। কথা বলতে বলতে একবার দুর্গী বলল, 'যমু, দেখবি একদিন আমি খোকাকে বেশী আফিং খাওয়াবো, আর নিজেও খাব। একলা থাকলে এর কত আগেই আমি আত্মহত্যা করতাম! মার হতভাগা কত মারবি মড়াকে! —কিন্তু যমু, খোকার জন্য—মাণিক আমার কতগুণ! আমার গায়ে হাত তুললে অমনি কাঁদতে আরম্ভ করে। কিন্তু উনি তাতে কিছুই মনে করেন না। সারাদিন মারবার জন্য হাতদুটি যেন জলতে থাকে! বেশ হয়েছে, পোড়ামুখ নিয়ে মিনসে বুঝি এখন বোম্বাই গিয়েছে। তাই তো আমি বাপের বাড়ি আসতে পেরেছি।'

তার এ কথা শুনে আমার মনের অবস্থা কী ভয়ানক হল! কিন্তু উপায় কী? তার দুঃখ হালকা করে তাকে সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে?—এই ভেবে আগের দিনের রাত্তিরের কথা মনে পড়ল, আর ঠিক

করলাম যে যতটা সাধ্য দুর্গাকে সাহায্য করব। দাদা বাইরে গিয়েছিল তাই আমরা অনেকক্ষণ তার ঘরে বসলাম। কিন্তু বৌদিরাণীর তা সহ্য হল না। আগের দিনের রাত্তিরের মতো রেগেই তিনি বললেন, 'ঠাকুরঝি, তুমি নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারো না দেখছি! আমি এখন এ ঘর ঝাঁট দেবো। তোমার যেন অন্য কোনো কাজ নেই। ওমা! দুর্গা দিদি এসেছেন বুঝি? তবে গল্পের পার্বনই। এই রকম স্বচ্ছন্দে থাকতে চাও, আর শ্বশুরবাড়ির লোকে বকলে—তারা নাকি জ্বালাতন করে! তাদের মতের মতো যদি আচরণ করবে না—'

আমি তাড়াতাড়ি দুর্গাকে বললাম, 'চল দুর্গা, তোর দেরি হতে পারে। পরে আবার একেবার তিনসন্ধ্যে হবে।' এই বলে তাকে বাইরে নিয়ে এলাম, আর তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

আমি এখানে আসা অবধি মাঈসাহেব কিংবা তাঁর মা আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলতেন না। কিন্তু বৌদির প্রত্যেক খোঁচা শুনে জানতে পারতাম সে আমার অনুপস্থিতিতে তাঁরা আমার অনেক নিন্দে করতেন। কিন্তু আমি সেদিকে কখনো মন দিইনি। আজ দুর্গার আর আমার কথোপকথন হবার পর আমি চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় মাঈসাহেব বড় আদর করে আমাকে ডেকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, 'জগতের রীতিনীতির মতো আচরণ করাই ভালো। যা হয়ে গেছে তার উপরে আমাদের তো কোনো হাত নেই! তোমার সেই মামীশাশুড়ী আমাকে বলতে এসেছিলেন যে তোমার বড়ো মামীশাশুড়ীর ঋতু দর্শনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। দু'তিন দিন পরে বুঝি ফুলশয্যা। লোকে কী বলবে?—' এই রকমের কথা কানে শুনছিলাম। আমি চুপ করে বসেছিলাম, একটি অক্ষর পর্যন্ত বলিনি। শেষে আমি কিছুই কথা বলছিনা দেখে তিনি, 'বেশ, তবে ওঁদের ইচ্ছামতো তাঁরা যা খুশি করবেন' এই রকম বিড়্ বিড়্ করতে লাগলেন। আমি সে কথার বিন্দুমাত্র অর্থ বুঝতে পারলাম না। বুঝব কেমন করে?

তার পরের দিন সকালে দাদা আমাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে খুব গম্ভীরভাবে বলল, 'যমুনা, আজ আমি খেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু কী জানি কেন আমার মন কেমন করছে। আর ভাবছি যে না যাওয়াই ভালো। কিন্তু সেই মক্কেলের টাকা নিয়ে বসেছি। আরো পঞ্চাশ টাকা পাব। কেন

যে যেতে ইচ্ছে করছে না তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। কালেক্‌-টারের আদালতে মকদ্দমা, কোনো অসুবিধা নেই, তোমাদের গোপাল-ঠাকুর সঙ্গে আছেন। আমার মনে হচ্ছে যে মফস্বলের এটা একটা বড়ো মামলা, তাই বোধহয় কেমন অস্বস্তি বোধ করছি।—আচ্ছা, তা যাই হোক্‌। তুমি এই ফুলশয্যার অনুষ্ঠানের জন্ম শ্বশুর বাড়ি যেয়ো না, বুঝলে? না হলে তুমি যাবে, আর শংকরঠাকুরের অসভ্যতা তুমি সহ্য করতে পারবে না, আর তোমার কষ্ট হবে, তুমি কাঁদবে, আর মিছিমিছি গালাগালির পর্বকাল হবে।'

'আহা, তারা যখন আমাকে ইচ্ছে করে পাঠিয়ে দিয়েছে, তখন আমি যাব কেন? মা'র...'

কিন্তু এই সময়ে ঘোড়াগাড়ি এসে গেল, তাই তাকে উঠতেই হল। দাদার এই প্রথম মোকদ্দমা। মফস্বলে কোথায় যেন ক্ষেতে গিয়ে কী পরীক্ষা আর অনুসন্ধান করার কাজ ছিল। সেখানে তার মক্কেলের পক্ষে দাদার নিজের হাজির হওয়া দরকার ছিল। আমি সে সব ভালো করে বুঝতেও পারিনি। একবার ভাবতাম যে দাদা সব সময় যেন এই রকমই গিয়ে টাকাকড়ি উপার্জন করতে পারে। আর কখনো কখনো মনে হত, কোথায় আবার একলা গিয়ে কাজ করবে? অবশ্যই এটা আমার বোনের প্রাণের যুক্তিহীন মমতা, ।...ছ ভয়। যাক্‌।

দাদা গেল। দুপুরে আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর পেলাম, "তোমাকে ডেকেছে।" আমি সেটা গ্রাহ্য করলাম না। কেননা, আমি ভাবলাম যে, বাড়িতে ফুলশয্যার মতো অনুষ্ঠান, আর আমাকে একেবারেই তাড়িয়ে দিয়েছিল, তা ভালো নয় মনে করেই বোধ হয় আমাকে আসতে খবর পাঠিয়েছে। কিন্তু আমার না যাওয়াই ভালো। কিন্তু একেবারে সন্ধ্যাবেলা খবর এল যে, "বাক্রদিদির শরীর ভয়ানক খারাপ হয়েছে, তোমাকে ডেকেছে, যেমন আছ, তেমনি চলে এসো।" আমি ভয়ানক ভয় পেলাম। তক্ষুনি বেরোলাম। কেননা, ঝী কেমন যেন অদ্ভুতভাবে কথা বলল। আমি সেখানে পৌঁছুবার জন্ম ভয়ানক উতলা হলাম। হ্যাঁ, অন্ততঃ শেষে তবু মা'র কাছে থাকতে পেলেও যথেষ্ট। এই ভেবে ঘরে প্রবেশ করলাম। আমি সটান মা'র ঘরে গেলাম। আর দেখলাম, ওমা! সেখানে শংকর ঠাকুর। আমি আৎকে উঠে পিছিয়ে এলাম। আমাকে দেখামাত্র দিদি-

শাশুড়ী বললেন, "এসো, এখন একটু ভালো আছে। একটু আগেই গোঙাচ্ছিল, কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে দেখছিল! জোরে জোরে তোমাকে ডাকতে আরম্ভ করল। ভাবলাম, মাগো! এখন কী যে হবে! তাই তোমাকে আসতে খবর পাঠালাম। এখন একটু ঘুমিয়েছে। আমরা বসলাম, কিন্তু তুমি বৌমা আর যেও না।" দিদিশাশুড়ীর এ কথা কত স্নেহভরা ছিল! আমি তো ভাবলাম যে তিনি যখন সে কথা আমাকে বললেন ঠিক সেই সময় মা আমাকে ডাকলেন, তাই বোধ হয় তাঁর মন অমন কোমল হয়েছিল। তাতো স্বাভাবিকই। আমার মনে হল যে শংকর ঠাকুরও কত ভালোবাসার চোখে আমার পানে চেয়ে দেখছেন! আমি স্বভাবতই ভাবলাম যে সেই মরণকালের মতো দৃশ্য দেখেই কি তাদের মন অমন কোমল হয়েছিল? কিন্তু ভগবানের দয়ায় তখনকার সেই ভড়কার সময়ই মা'র মরণ হল না। মনে হচ্ছিল যে মা ঘুমিয়েছেন। মাঝে মাঝে শুধু 'উ' করছেন। এখন আমি অবিশ্রাম মার কাছে বসে থাকব—এই ভাবতে ভাবতে মার দেহের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

না জানি মার কত ক্লেশ হয়েছে, আর কী জানি কতদিন বেচারির ক্লেশ হবে, এই ভেবে আমি আপনমনে দুঃখিত হয়েছিলাম। হঠাৎ ঠাকুর বড় কোমল স্বরে বললেন, 'বোসো বৌমা, বোসো। দাঁড়িয়ে কেন?' আর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। আমি মার কাছে গিয়ে বসলাম।—কিন্তু তাঁর তেমন কিছু পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। আমি যাবার সময় তিনি যেমন ছিলেন, সেই রকমই দেখলাম। এমন সময় দিদিশাশুড়ীও উঠে চলে গেলেন। আর আমি একলাই সেখানে রইলাম। রাত্রে আমি সেখানেই ঘুমোলাম। কিন্তু মন উদ্বিগ্ন হয়েছিল তাই শান্তভাবে ঘুমুতে পারিনি।

ভোরবেলা আন্দাজ চার-পাঁচটার সময় আমার ঘুম এল আর মনে হল যে কেমন যেন অদ্ভুত দেখছি। স্বপ্নে আমি মাকে দেখলাম, আর মনে হল যে মা আমাকে বলছেন, 'আচ্ছা যমু, আমি শীগগিরই তোকে নিয়ে যাব।' কিন্তু ঠিক সেই সময় কে যেন আমার মাথার কাছে এল আর আমি জেগে উঠলাম। শুনলাম কে যেন বলছে, 'সীতা, এ দিকে এসো তো মা।' তখনও অন্ধকারই ছিল। কিন্তু আমাদের ঘরে বাতি ছিল, তাই দিদিশাশুড়ীকে তক্ষুণি চিনতে পারলাম। আমি চট্‌ করে উঠলাম।

তখন তিনি বললেন, 'কিছু না, ওই ও-ঘরে জিনিসটা আছে, বড় দরকার, নিয়ে এসো তো বৌ, চলো।' 'কোন্ ঘরে' বলে আমি এগিয়ে গেলাম। তিনি বললেন 'ওই ওদিকের ঘরে—'। ওমা! যে-ঘরে আমি সেই দিন প্রথমে বসে কাঁদছিলাম, আর একেবারে প্রথমেই উনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—সেই ঘরেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। আমি ঘরের ভিতর পা ফেলতেই আমার পিছন পিছন বড়ঠাকুরঝি আর দিদি-শাশুড়ী এলেন। আর আমি শুনতে পেলাম :—'এখন ভালোয় ভালোয় যা হতে চলেছে তা হতে দাও, না হলে দেখবে!' আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ঘুরে দেখলাম—ওমা দরজার গোড়ায় শংকর ঠাকুর! আর—আর—আর—তাঁর সঙ্গে—

তাকে দেখেই আমি সব ব্যাপার বুঝতে পারলাম। আর প্রাণপণে চীৎকার করব— এমন সময় 'চেঁচা হারামজাদী—চেঁচা— তোর এই গুণের জ্বালায় গর্ভাধানের অনুষ্ঠানের জন্ম ব্রাহ্মণ পাওয়া অসম্ভব হয়েছে। আর ও নরকে পচে দরকার নেই,বুঝলি? এগিয়ে এসো নাপিতভায়া।' কঠোর-হৃদয় শংকরঠাকুরের তার পরের কথাগুলি আমি শুনতে পেলাম না। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। মাথা ঘুরতে লাগল!! মনে হল যে আমি কাকে যেন হাতে হেঁচড়া মেরে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি—তারপর ধপাস করে পড়ে গেলাম!!

শেষ পরিচ্ছেদ

(যমুনার ভাই গণপত রাও-কর্তৃক লিখিত)

যে হাত আমাদের দুজনের জীবনকাহিনী এত সূক্ষ্মভাবে লিখেছে, অভাগা আমি সে হাত আর কক্ষনো দেখতে পাব না। আমার সেই অত্যন্ত স্নেহময়ী, অত্যন্ত পবিত্র বোন-এর আগের পরিচ্ছেদটি শেষ করার পর পোনর দিনও বাঁচেনি। উপরের ঘটনার বর্ণনা যে দিন সে লিখল সে রাত্তিরেই সে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখল। সে স্বপ্নে সে দেখল যে সেই সমস্ত ঘটনা চোখের সামনে আবার ঘটছে! অমনি সে চীৎকার করতে আরম্ভ করল আর তার ফলে তার ভয়ানক জ্বর হল। সেই জ্বরে তার কাশির ধমক খুব বেশি হল। দিনে দিনে তার শরীর আগেই ক্ষীণ হয়েছিল, তার ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল, আর পোনর দিনের দিন ভোর ছ'টার সময় তার দেহান্ত হল। সে সময় আমি তার একেবারে কাছে বসেছিলাম। দুর্গাদিদি রোজ আসত। আমি তাকে আগের দিন খুব অনুরোধ করে আমাদের বাড়ি থাকতে বলেছিলাম। লক্ষণ আমার ভালো মনে হচ্ছিল না, তাই দুদিন আগেই বোম্বায়ে 'তার' করে লক্ষীবাই আর যশোদাবাইকে জানিয়েছিলাম। তাঁরা দুজনেও এসেছিলেন। তাঁদের দেখে যমুনার কত আনন্দ হল! কিন্তু সে বেশী কিছু বলল না। তাঁরা দুজনে তার মাথার পাশে বসেছিলেন আর যমুনা তাঁদের দুজনের হাত ধরে আকুলভাবে তাদের দিকে চেয়েছিল! সে দৃশ্য কখনো কি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হতে পারে?

'এমন পবিত্র লোককে এত জ্বালাতন করল!' এই কথা লক্ষীবাইর মুখ দিয়ে বেরুবা-মাত্র নিজের হাত কপালে ঠেকিয়ে যমুনা আমাদের সকলের দিকে যেভাবে চেয়ে দেখল, আমার স্মৃতি থেকে কখনো কি তা মুছে যাবে? এত সব দুঃখ তাকে সহ্য করতে হল। কতদিন ধরে সে এই যক্ষ্মা রোগে ক্ষীণ হচ্ছিল, কিন্তু শেষে সে খুব শান্তভাবে আর সুখে মরণকে বরণ করল। সে যাদের ভালোবাসত তাদের মধ্যে এক বাবা ছাড়া আমরা সবাই তার পাশে

ছিলাম। আমি, দুর্গী, লক্ষীবাই, যশোদাবাই অহোরাত্র তার কাছে ছিলাম।

মধ্য রাত্রের সময়ে সে আস্তে আমাকে ডাকল। আমি তার কাছে গেলাম, ভাবলাম তার বোধ করি কোনো ইচ্ছা আছে, আর সে আমাকে সেই ইচ্ছা বলতে চায়। অন্ততঃ তার শেষ ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করতে পারলে—আর অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি আমার কান তার মুখের কাছে পাতলাম। সে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলল, 'দাদা আমার কথা শুনবে ভাই?'—'যমুনা, এ কী কথা? বলো, তুমি কি বলতে চাও! আমি কক্ষনো তোমার কথা অগ্রাহ্য করব না।' অতিশয় আকুল হয়ে আমি তাকে বললাম। এক মুহূর্ত সে কিছু বলল না। তারপর আমার হাত ধরে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে রইল। নিজের দ্বিতীয় হাত, একটু কাছেই তার বৌদি দাঁড়িয়ে ছিল, সেদিকে দেখিয়ে সে বলল, 'ওকে কোনোদিন উপেক্ষা কেরোনা দাদা।' আর আমি কী উত্তর দিচ্ছি তাই শুনবার জন্য আশাপূর্ণ চোখে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। যে মানুষ তাকে সারাজীবনে কখনো সুখ দেয়নি, বরং অত্যন্ত দুঃখের সময়ে তাকে যথাসম্ভব যন্ত্রণা দিয়েছিল, সেই মানুষের জন্য এত প্রীতি দেখে আমি কী মনে করলাম, তা যাদের যমুনার মতো বোন আছে তারাই বুঝবে। অন্য কেউ কি তা বুঝতে পারে? আমি অবিরল কাঁদছিলাম। আমি আলাদা বাসা করার পরেও আমার স্ত্রী তাকে কত জ্বালাতন করত, কত খুঁচিয়ে কথা বলত, তার কল্পনা আমার ছিলনা। আমি শুধু এইটুকু জানতাম যে আমার স্ত্রী তাকে কষ্ট দেয়, আর আমি যথাসাধ্য তা না হবার জন্য চেষ্টা করতাম। আমি যদি যমুনার সামনে আমার স্ত্রীকে বকতাম, তাহলে যমুনা বড় রাগ করত, তাই আমি তার সামনে আমার স্ত্রীকে বকতাম না। আমার সামনে যা হত তার বন্দোবস্ত আমি করতাম, কিন্তু যা আমার পিছনে হত তা আমি জানব কেমন করে? যমুনার কাছে জানতে পারা অসম্ভব! পরে তার এ সব লেখা যখন দেখলাম, তখন দুতিনটে টুকরো পেয়েছি, সেগুলিও এখানে তুলে দিচ্ছি। এই সব কাগজের টুকরো থেকে আমি জানতে পারলাম যে সে কত কষ্ট পাচ্ছিল।

সে উপরোক্ত কথা বলবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা সকলে চুপ করে বসেছিলাম। সে কিছু বলল না, কিংবা ইশারা করল না। অপলকে তাকিয়ে

দেখছিল। ভোর তিনটে পর্যন্ত এই রকম চলছিল। আবার তিনটের সময় সে আমার হাত ধরল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'কী?' তখন সে দুর্গীকে নির্দেশ করে বলল, 'ওর কী অবস্থা হবে?' এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব? শেষে সে নিজেই বলল, 'আমার টাকা এলে ওর ব্যবস্থা কোরো, ওকে ভুলো না।'

'না না। টাকা আসুক আর নাই আসুক, আমি ওকে ভুলব না। আমার ক্ষমতা মতো আমি ওকে সাহায্য করব। তুমি মোটেই চিন্তা করো না।'

এই উত্তর আমার মুখ দিয়ে বেরোবা-মাত্র সে কত সান্ত্বনা পেল! প্রশান্তভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি নিজে থেকে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার আর কী ইচ্ছা?' সে উত্তর দিল, 'কিছু না।' খানিকক্ষণ পরে সে আমাদের সকলকে কাছে আসতে ইশারা করল। আমরা কাছেই ছিলাম তবু আরও কাছে গেলাম। লক্ষ্মীবাই একেবারে তার মাথার কাছে ছিলেন। যমুনা তাঁর কোলে মাথা রেখেছিল। একটা হাত সে যশোদা-বাইর হাতে দিল, অন্য হাতটা আমি হাতে ধরলাম। দুর্গী তার গায়ের উপরে হাত রেখেছিল। এই রকম অবস্থায় আমাদের সেই মনপ্রাণের বোন আর বন্ধু আমাদের ফেলে চলে গেল!

উপরের পরিচ্ছেদে উল্লিখিত টুকরো অংশ

'সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে যে অত্যন্ত অসহ্য হলে কোথাও মন হালকা করতে ইচ্ছা হয়। যতই চেপে রাখো, যতই শপথ করো, কিন্তু উপযুক্ত মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়া-মাত্র একটুও ভেবেচিন্তে না দেখে, সব খুঁটিনাটি বলে ফেলতে ইচ্ছা করে। শুধু তাই নয়, একবার আরম্ভ করলে সে গতি থামানো মানুষের ক্ষমতার বাইরে। দাদা আমাকে কত ভালোবাসত, আর আমি দাদাকে কত ভালোবাসতাম, তা আর নতুন করে বলতে হবেনা। আমার জন্য তার প্রাণ হু হু করত, এখনো করে, তা কি আমি জানি না! কিন্তু কি জানি কেন, তাকে আমার সকল দুঃখ খুলে বলতে ইচ্ছা করে না। ভাবি যে, আমার কপাল ভেঙেছে তাই যখন-তখন তাকে বলে আমার সঙ্গে তাকে দুঃখ দিয়ে কাজ কী? এইতো আমি এখনই বলেছি যে কোনো বিষয়ে আমার যেন দুঃখ না হয়, আমি কখনো যেন মনে কোনো আঘাত না পাই, এই জন্য সে সর্বদা সতর্ক থাকত। এই অবস্থা ছিল, তাই আমরা দু'জনে পরস্পরের যাতে দুঃখ হতে পারে এমন বিষয় আমাদের কথাবার্তায় আনতাম না। শুধু তাই নয়, আমি আমার সব চিন্তা চেপে রাখতাম। 'হ্যাঁ, আজ তোমার দাদা আমাকে বলল যে এখন থাকছ তো আমাদেরই কাছে? আর তখন কি অহংকার!' আর 'ওর মন তো যেন একেবারে নিজের হাতে নিয়ে বসেছ। এইটুকু জল খাও, অমনি সেইটুকু জল খাবেন! বোনের কথার বাইরে যাবে কে? স্ত্রী মরুক না কেন, সে যাই করুক! কী ভেবে তুমি এমন করো? আমাদের দু'জনেতে বিরোধ ঘটিয়ে তোমার কী লাভ? তোমার কপাল ভেঙেছে, তা কি জোড়া লাগবে?' এ রকম কুঠারাঘাত সে আমার বুকে করে—এ কথা তাকে বলে তার মন কলুষিত করব কেন? সে আমাকে এত ভালোবাসে তাই বৌদি এখন এত হিংসে করতে লাগল? কিন্তু গত জন্মে কী করেছি, তাই ভগবান আমার সামনের মিষ্টান্নের থালা লাথি মেরে উড়িয়ে দিলেন? এ জন্মে তো আমি আমার ক্ষমতামতো ভালো আচরণ

করেছি ; সে যেন তার স্বামীর সঙ্গে ভালো থাকে, তার স্বামী যেন তার সঙ্গে একটুও অসদ্ব্যবহার না করে, এই জন্ম আমি প্রথম থেকে কত চেষ্টা করেছিলাম, আর এখনো কত চেষ্টা করছি তা এক পরমেশ্বরই জানেন! বৌদি সবই বিপরীত দেখে। কী করব? আমি যদি আলাদা থাকতে ইচ্ছে করি, তাহলে তা পারব না এমন নয়, আর আমি দূরে থাকলে তাদের দুজনেতে যদি ভালো মিল হয়, তাহলে আমি আলাদা বাস করব কিনা তা দেখতে—হে ভগবান, তুমিই সাক্ষী! কিন্তু তাতে কী? আমি এখন এ জগতে আর কদিন আছি? কী জানি, দশ-পোনর দিন বাঁচব কিনা!!'

* * * *

আজ দাদা বলছিল যে যাদের এ-রকম দুঃখময় অবস্থা সে মেয়েরা যদি লেখাপড়া শেখে আর তারা নিজে, কিংবা যারা লিখতে পড়তে পারে তাদের বলে নিজেদের সমগ্র জীবনচরিত লিখে রাখে, তাহলে তা তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করার একটা পথ হতে পারে! দাদার এটা কত বড় একটা ভুল! আমাদের দীন, অসহায়, অবলাদের সত্যি সত্যি অবস্থা কী রকম, কারণে-অকারণে আমাদের উপরে কত অত্যাচার হয়, মেয়েদের অজ্ঞতা কায়েমী রাখার ফলে আমরা নিজেদের কত হানি করি, আমাদের মন প্রফুল্ল করতে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বিষয় না পেয়ে আমাদের মনের টান গয়নাগাঁটি, চোলী-কাপড় নিন্দা-কুৎসা ইত্যাদির দিকেই থাকে। জ্ঞানের অভাবে আমাদের মনের উপরে দুষ্প্রবৃত্তির কত ভীষণ মেঘ থাকে, তা দূর করা কত বড় মুশকিল, তেমনি 'ধর্ম! ধর্ম!!' 'নীতি, নীতি'!! করে যারা চেঁচামিচি করে, তাদের শতকরা ৮০।৯০ জন লোক আমাদের কত কোণঠাসা করে, তা কেউ কি দেখতে পায়না? যে চোখ মেলে দেখবে সে দেখতে পাবে যে খবর নেবে সে খবর পাবে, কিন্তু চোখ মেলে দেখতে চায় কে? আর খবর কে রাখে?'

* * * *

'করুন, ঠাকুর, যত খুশি আপনি আমাদের দু'জনের নিন্দে করুন। তা না হলে লোকে আপনার ধর্মের গৌরব, বংশের গর্ব দেখতে পাবে কেমন করে? এমন করে যদি আপনি সুখী হন, তাহলেই যথেষ্ট! আমি তো আর অল্পদিনের সঙ্গী! আমার মরণ হলে তো আর এ সব কথা কানে শুনতে

পাব না? এতদিন যা করেছেন তাতে আপনার সন্তোষ হল না? আরও জ্বালাতন করুন: যত বিড়ম্বনা করতে চান করুন। আপনি তাতে পিছপাও হবেন কেন?'

সেই নরাধম যেদিন এই বিশ্বাসঘাতকের নিষ্ঠুর কাজ করল, সেদিন আমি ছিলাম না এ কথা যমুনা তার কাহিনীতে লিখেছে। ভাবছি যে তার পরের ঘটনা এই পরিচ্ছেদে যোগ করে দিলে ভালো হবে, তাই সেটুকু লিখছি। কিন্তু একেবারে সংক্ষেপে লিখব, কারণ, একে তো আমি সেসব তার মতো লিখতে পারব না, আর পারলেও এখন আমার লিখতে ইচ্ছে করছে না। লিখে কী দরকার? সে আমাদের চলে গেছে, সব কিছু শেষ হয়ে গেছে!

আমি তিন দিনের দিন ফিরে এলাম। সেদিন আমি কিছুই জানতে পারিনি। যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে যমুদিদিমণি কোথায়, তখন উত্তর পেলাম যে তার শাশুড়ীর শরীর অত্যন্ত খারাপ, তাই সে গিয়েছে। কিন্তু তার পরের দিনই ধোণ্ডু যখন জানতে পারল যে আমি এসেছি, তখন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল আর আমাকে সেই ভয়ংকর ঘটনা বলল। শুধু সে কথা লিখব ভেবেই আমার গা শিউরে উঠ্‌ছে, আর মনে হচ্ছে যে আমি তা লিখতে পারব না। তাই আমি সংক্ষেপে বলছি। কত দিন ধরে সে নরপশু এমন অকর্ম ক.:ত চেয়েছিল। কিন্তু সে আমাকে ও গোপাল ঠাকুরকে ভয় করত। আমরা দুজন ছিলাম না, তাই অনায়াসে সুবিধা হল। গর্ভাধানের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ আসতে চায়না এটা একটা কারণ ছিল, তাই সে কথা নিষ্ঠুর বুড়ির মনে ভরিয়ে দিয়ে সে-কসাই অসহায় অভাগিনীকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল! সে বেচারি স্বপ্নেও ভাবেনি যে এমন নেমকহারামী হবে! সে একলা—তারা তিন রাক্ষসী, আর সে বজ্জাত যে ধর্মের নামে ভণ্ডামি করত, কী নাম রাখব তার?—সে যমুনার মূর্ছিত অবস্থাতেই সে নিষ্ঠুর কর্ম করিয়ে ফেলল। অল্পক্ষণ পরে তার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন সে অমানুষের মতো চেঁচাচ্ছিল, 'পুনর্বিবাহ করো! পুনর্বিবাহ করো! এই ব্যাটাদের এমনি পিষে ফেলতে হবে!' এমন সময় চীৎকার শুনে ধোণ্ডু ছুটে সেখানে গেল। সে তার বাবাকে ভয়ানক গালি দিল। কিন্তু পাথরের কী হবে? এ সব ব্যাপার সেই আমাকে বলেছে।

যেদিন নিজের স্ত্রীর গর্ভাধানের অনুষ্ঠান নিরাপদে সমাধা করার জন্য সে-

পশু এই নিষ্ঠুর কর্ম করল, সেদিনই যমুনাকে জ্বরে ধরল। কিন্তু সে কথা সে আমাদের জানায়নি। আমি ফিরে এলে ধোণ্ডু যখন আমাকে সব বলল, তখন আমি ছুটে গেলাম—আর ঘরে প্রবেশ করেই দেখলাম যে সেই নরপশু—এখন তাকে কী নাম দেব? আমার কাছে কোনো উপযুক্ত কথাই নেই—নিজের নতুন স্ত্রীর পাশে বসে আচার অনুষ্ঠানে মত্ত। আমার গা কী ভয়ানক জ্বলে উঠল, তা কি কেউ বুঝবে? আমি তাকে সেখানে গালাগালি করলাম, ধমক দিলাম যে মোকদ্দমা করব, সব করলাম। শেষে সেদিনই সন্ধ্যাবেলা যমুনাকে নিয়ে আলাদা বাসায় বাস করতে গেলাম।

আমার ঠিক সন্দেহ ছিল যে মাঈ সাহেবের হাত এ কাজে ছিল। তার পর তদন্ত করে জানলাম যে আমার সন্দেহ সত্যি। পরে সে বজ্জাতকে মোকদ্দমায় টানবার জন্যে যমুনাকে খুব অনুরোধ করলাম, কিন্তু যমুদিদিমণি রাজি হল না। সেদিন যে তাকে জ্বরে ধরল, সেই তার অসুখের সূত্রপাত, তার উপরে পরে শাশুড়ী মারা গেলেন। যমুনার কাশি হল আর তার পরিণতি হল যক্ষ্মারোগে। সারাদিন সে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকত। একবার, দুবার তাকে বোম্বায়ে নিয়ে গেলাম। কিন্তু কোথাও তার ভালো লাগতনা। বোম্বায়ে আমরা মিলে তার যে কাজ পছন্দ হতে পারে এমন কোনো কাজে তার মন নিমগ্ন করবার জন্য তাকে তার জীবনকাহিনী লিখতে অনুরোধ করলাম। সে কাজ তার পছন্দ হল, পুণায় এসেই সে লিখতে আরম্ভ করল। আর রোজ যতদূর সম্ভব লিখে যেতে লাগল। আমি তার লেখা পড়ে দেখে বারবার তাকে উৎসাহ দিতাম। আর একবার আরম্ভ করার পর তার নিজেরই সেকাজ বেশ পছন্দ হল আর মন নিমগ্ন হল। তার শরীরের ভালোমন্দ অবস্থার মতো সে যেমন পারত তেমন লিখত। কয়েক পরিচ্ছেদ লেখা হলে সে কাগজ গুছিয়ে রেখে দিত। আর আটদিন দশদিন সেদিকে চেয়েও দেখত না।

এই রকম চলছিল। শেষে রঘুনাথ রাওর মৃত্যুর পরিচ্ছেদটা লেখা শেষ হবার পর কয়েকদিন সে তার লিখতে বসার জায়গায় পর্যন্ত যায়নি। তারপর যখন লিখতে আরম্ভ করল তখন তার শরীর বেশী ক্ষীণ হতে লাগল তাই সে ভালো করে গুছিয়ে লিখতেও পারতনা; তবুও সে লিখত। শেষে সেই ভয়ানক ঘটনা লিখে সে কলম রেখেই দিল! সে ঘটনা যেদিন হল, সেদিন থেকে তার অসুখের আরম্ভ হল, আর সে ঘটনার বর্ণনা লিখবার

সময় সে-চিত্র তার চোখের সামনে এসে তার মনে বিষম ধাক্কা দিল, তাতেই তার অন্ত হল।

যমুনার এই জীবন-চরিত যদি পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়, তা হলে কাকে উৎসর্গ করবে এ বিষয়ে একবার দু'বার রসিকতা করে কথাবার্তা হয়েছিল তখন যমুনাকে একটা 'উৎসর্গ' লিখতে বলেছিলাম। সে কাগজও আমার কাছে আছে।

সমাপ্ত

উপসংহার

যখন এই পাণ্ডুলিপি আমি হাতে পেলাম আর আমার বন্ধু গণপতরাও এই জীবনকাহিনী সম্পূর্ণ ছাপতে অনুমতি দিলেন, তখন আমি তাঁর দ্বারা শেষের ভাগের উত্তরার্ধ লিখিয়ে নিলাম। পূর্বার্ধ মানে—যমুদিদির মৃত্যুর ঘটনা। সেটা তিনি তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই লিখে রেখেছিলেন। আমি যখন এই চরিতটি পড়ে দেখলাম, তখন এতে দু' চারটি ঘটনা একেবারে অসমাপ্ত অবস্থায় আছে তা আমি বুঝতে পারিনি। মন এই কাহিনীতে এত নিমগ্ন হয়েছিল যে তার বর্ণনা আমি করতে পারছিনা। কিন্তু পরে এটি ছাপবার উদ্দেশ্যে যখন পরিচ্ছেদানুক্রমে আবার পড়লাম তখন যমুদিদিমণির আকস্মিক-ভাবে মৃত্যু হওয়াতে অনেক কথা শেষ পর্যন্ত লেখা হয়নি দেখতে পেয়ে সে-সম্বন্ধে গণপতরাওকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও এই উপসংহার ছাপবার জন্য সে বিষয়ে এই পত্র পাঠিয়েছেন :—

শ্রী

সাষ্টাঙ্গনমস্কার বিনতি বিশেষ*

আপনি যা জানতে চান তার দু-একটি ঘটনা আমি নিজে আপনাকে সুস্পষ্ট করে বলেছি। কিন্তু চরিতটি সম্পূর্ণ হতে হলে আপনি আমার হাতের পত্রই যখন চান, তখন আপনার মতো বন্ধুর অনুরোধ আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। তাই এই চিঠি লিখছি। বাস্তবিক আমি আপনাকে যে বিষয়ে কিছু বলতে পারি তেমন ঘটনা শুধু দু'টিই আছে। একটি, গয়নার সত্যি সত্যি হল কী?—তাও এখন যে স্পষ্ট লিখতেই হবে, এমন নয়। গয়নার আর কী হবে? আমাদের মাঈসাহেবের মা যখন কাশীযাত্রা করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর এক বান্ধবীকে মাঈসাহেবের দেখাশোনা

* মারাঠি চিঠি লেখার রীতি-বিশেষ।

করতে বলে গিয়েছিলেন। সে স্ত্রীলোকটি উপর্য্যুপরি আসতে লাগল। আস্তে আস্তে টাকাকড়ির দেনা পাওনা আরম্ভ হল। ছেলে হচ্ছিলনা তাই ঠাকুর-দেবতার দৈব উপাচার শুরু করবার উপদেশ দিয়ে, মাঈসাহেবের অবশ্যই দেবঋষি ইত্যাদির পালা আরম্ভ হল। দেবীর উৎসবের সময় দেবীর মূর্তিকে পরাবার জন্য গয়না গেল—আর ফিরে এল না—একেবারে শেষ পর্যন্ত এল না। আসল গয়নার বদলে নকল গয়না গড়ানো হল। আমার সন্দেহ হওয়াতে আমি সত্যি ব্যাপার তদন্ত করে জেনে নিলাম, পরে সেকথা বাবাকে বললাম পর্যন্ত। কিন্তু 'যার ভাগ্য তার সঙ্গে' শুধু এই কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল, আর দেখলাম যে তাঁর মুখ অতিশয় ম্লান হল। যমুদিদিমণির এমন অবস্থা হল দেখে তিনি মনে ভীষণ ধাক্কা পেলেন। দ্বিতীয়বার বিবাহের পর সব কিছুর সম্বন্ধে তাঁর যে এক রকমের উদাসীনতা এসেছিল, তা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ধরে বসল আর তিনি যেমন-তেমন করে দিন কাটাতে লাগলেন। কখনো কখনো আমার মনে হত যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন তাই,—অন্ততঃ ও রকম স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছিলেন তাই—তাঁর বোধ হয় অনুতাপ হয়েছিল। সে যাইহোক একথা সত্যিই যে আমাদের বাবার মতো মানুষের বেলা আগের আচরণে আর দ্বিতীয় বিবাহের পরের আচরণে এত তফাৎ কেন হয়, এটা একটা নিশ্চয়ই রহস্য।

যমুনার মাথায় শেষে ওরকম আঘাত করবার কাজে মাঈসাহেবের হাত ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেন না, পরে আমি জানতে পারলাম যে তার আগে অনেক দিন থেকে তিনি বাবার কানের কাছে খিটখিট করছিলেন, 'একী, পৃথিবীশুদ্ধ লোক মুখে গোবর দিচ্ছে! কেউ বাইরে মুখ বার করতে দিচ্ছে না। আমাদের মতো পুরনো ধরনের গেরস্তের বাড়িতে একি ভালো দেখায়? পুরুতঠাকুর পর্যন্ত বাড়িতে আসা বন্ধ করবে!' আর বাবা বোধহয় বলেছিলেন, 'তা হবে না, আমি তা সহ্য করতে পারব না।' কেননা, তাঁর কথা শুনে মাঈসাহেব বলেছিল, 'তুমি যদি সইতে না পারো তাহলে ওকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে যা হবার তা হোক্। যে-সে ব্যাপারে আজকাল গণপতির কথা শোনে, এ কী রকম? আমাদের কুলে কলঙ্ক লাগবে না? লোকে নিন্দে করবে কাকে?' একথা যখন জানতে পারলাম তখন আর কোনো সন্দেহই রইল না। কিন্তু তার পর আমি

স্পষ্ট জানতে পারলাম যে আমি মফস্বলে যাব এই খবর দিয়ে মাঈ সে কাজে সাহায্য করেছিল। যমুদিদিমণি যেতে ইতস্ততঃ করবে তাই সকাল থেকে তার সামনে 'ওমা, শুনছি যে তোমার শাশুড়ীর অসুখ, আর তুমি ওবাড়ি যাচ্ছ না যে? ও কী? যখন-তখন কি নেমন্তন্ন চাই? শাশুড়ীর মড়া বাইরে নিয়ে এলে তবে যাবে?' এ রকম গজরগজর আরম্ভ করেছিলেন। দু'তিন দিন আগে তার কাছে ওবাড়ির মেয়েরা এসে, 'কী উপায়? ওর এই জিদ তাই আমাদের বাড়ি গর্ভাধানের অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণ পাওয়া মুশকিল হয়েছে'—ইত্যাদি বলেছিলেন। এতসব যখন জানতে পারলাম, তখন সেই নিষ্ঠুর কাজে মাঈসাহেবের হাত ছিল এ বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

যমুনা যতদিন বোম্বাই ছিল ততদিনে নানা আর বিষ্ণুপন্তের বন্ধু গণপতরাও সেখানে একেবারে যান নি তা নয়, কিন্তু পরে তার নামের উল্লেখ কোথাও নেই, তেমনি নানা সাহেবের ভগিনীর সম্বন্ধেও একেবারে অল্প লেখা আছে দেখে আমারও আশ্চর্য মনে হল। কিন্তু এখন আমার মনে পড়ছে যে সে একবার বলেছিল 'একটা বিশেষ বিষয়ের সম্বন্ধে আমি দুটো আলাদা পরিচ্ছেদ লিখব।' সে দুটি পরিচ্ছেদ সে লিখেছিল কি না তা জানবার কোনো উপায় নেই। গণপতরাওকে সে বড়ো শ্রদ্ধা করত, আর গোদাবরী সম্বন্ধেও তার মনে বড়ো প্রীতি ছিল। তবুও কী জানি সে কথা না লেখা রইল কী করে! কিন্তু যখন মনে পড়ে যে শেষের দশ পোনরটি পরিচ্ছেদ লেখার আগে থেকে তার মন স্থির ছিল না তখন আমার ততটা আশ্চর্য মনে হয় না। আর দ্বিতীয়তঃ, তার নিজের জীবনচরিতের পরিণাম গণপতরাওর মনের উপরে যদিও ভয়াবহ হয়েছিল তবু তার চরিতের সঙ্গে গণপতরাওর সম্পর্ক তত বেশি নেই, তাই কোনো ত্রুটী মনে করবার কারণ নেই।

সেই পাঁচহাজার টাকার সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে এর মধ্যে সে-সম্বন্ধে কিছু প্রকাশিত করা উচিত নয়—এই আমার মত। কেন, তা আমি স্বয়ং এসে আপনাকে বলব। আরও অনেক কিছুর সম্বন্ধে আপনি জানতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি সে সব বিষয়ে কিছু জানি না। আর মানুষের জীবন অকালে শেষ হলে অনেক কিছু সে নিজের হাতে পূর্ণ করে যেতে পারে না। সেইমত যমুদিদিমণির হাতেও অনেক কথা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সে সব জানতে পারলেই তবে চরিত্র সুবোধ্য হবে এমন তো নয়?

আমি তো আগে থেকেই আপনাকে বলেছিলাম যে সে যেমন নিজে লিখেছে সেই রকমই ছাপবেন, আর যেখানে সে শেষ করেছে সেখানেই শেষ করবেন, কিন্তু আপনি বললেন যে সেটা তেমনি রাখলে একেবারেই অসম্পূর্ণ দেখাবে তাই আমি এই শেষের পরিচ্ছেদটি আর এই চিঠি আপনাকে লিখে দিলাম।

এখন সেসব খুঁটিনাটি কথা তেমনি থাকুক। এতক্ষণ তার সর্বান্তঃকরণে লেখা জীবনচরিত পড়ে শেষে এই সংক্ষিপ্ত শুষ্ক কথার দরকার কী? আপনাকে বলছি—পন্ত—আমাকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে আমার বোন এত গুণবতী ছিল তা আমি পুরোপুরি জানতাম না। রঘুনাথরাও আর সে দুজনে যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে বিষ্ণুপন্ত আর লক্ষ্মীবাই, নানাসাহেব আর যশোদাবাই, গণপতরাও আর স্বরস্বতীবাই এ—দম্পতিরা মিলে সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য না জানি কত কাজ করতেন! রঘুনাথরাও তো মারা গিয়েই ছিলেন, কিন্তু একা দিদিমণি আমার যদি বেঁচে থাকত তবুও সে নিশ্চয়ই তার ভগিনীদের আজকের অবস্থা কিছু পরিবর্তন করে তাদের উন্নতি সাধন করত। তার ভারগ্রহণের ক্ষমতা বিলক্ষণ ছিল। আমরা সবাই যদি তাকে উৎসাহ দিয়ে এগোতে বলতাম, তাহলে নিশ্চয়ই সে অগ্রসর হত। কিন্তু তার স্বাস্থ্যই যখন একেবারে ক্ষীণ হতে লাগল, তখন তারই বা কী উপায়? তবুও সে তার শেষের কটা দিন আমার কাছে ছিল, ততদিনে সে যত পরোপকারের কাজ করেছিল, তা আমার মত মানুষ সারা জীবনেও করতে পারবে না। সে নিয়মিত ভবে কোনো ক্লাসটাশ যদিও শুরু করেনি, তবু সে তার কত ভগিনীদের শেলাই টেলাই আর আর শিক্ষা দিয়েছিল।

আর—আর কী বলব? সে প্রতি পদে যে সব ভালো কাজ করত তার একটা লম্বা ফর্দ দিয়ে তো শেষ হবে না? যে সে-সব নিজের চোখে দেখেছে সেই সে সব কাজের মহত্ত্ব বুঝবে। অন্য কেউ কি পারে? আর আমি যে বললাম যে সে মহিলাসমাজের হিতের কত কাজ করত, তার সত্যতাও অন্য কেউ বুঝবে না। কিন্তু এখন তা বলে কী লাভ?

কবি তাই সত্য বলেছেন :—

Of all the words of tongue and pen
the saddest are these—It might have been.

'এমনটা হতে পারত'—এই হচ্ছে সব চেয়ে বিষাদময় কথা।

বসুদিদিমণির অভাগা ভাই

আর

আপনার পরম বন্ধু,

গণপতি।

* * * যেদিন রঘুনাথরাওর মৃত্যুর পরিচ্ছেদ 'করমণুক' পত্রে প্রকাশিত হল, ঠিক সেই দিন আমাদের বন্ধু শ্রীযুত গণপতরাও কেশব ভাটবন্ধের বি. এ., এল্. এল্. বি. ঠিক সেই রকম রোগে হঠাৎ রক্তবমি করে মারা গেলেন। তিনি এল্. এল্. বি. পরীক্ষা পাশ করার পর ৮।১০ দিনও হয়নি। এ ঘটনাটি অত্যন্ত শোচনীয়, কিন্তু উল্লেখযোগ্য মনে হল, তাই এখানে উল্লেখ না করে থাকতে পারছিনা।

—গ্রন্থ প্রকাশক